প্রবন্ধ সমগ্র

নবম খণ্ড

অন্নদাশঙ্কর রায়

ডি. এম. লাইব্রেরী / কলকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশক :
শ্রীঅমূল্যগোপাল মজুমদার
ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, বিধান সরণি
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদপট : প্রণবেশ মাইতি

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৭১

মুদ্রাকর :
শ্রীশ্যামলকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়
রুমা প্রিণ্টার্স
৬৩এ/৩, হরিঘোষ ষ্ট্রীট
কলকাতা-৬

প্রবন্ধ সমগ্র

নবম খণ্ড

সম্পাদনা

ধীমান দাশগুপ্ত

সম্পাদকের ভূমিকা

অন্নদাশঙ্করের প্রবন্ধসাহিত্যের একটি খুব বড় ভাগ হলো জীবনীমূলক। এর মধ্যে সাহিত্যগুরু ও সাহিত্যিকদের জীবনের কথা যেমন আছে, তেমনি সাহিত্যিক নন এমন আরও বহু ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে লেখকের মূল্যায়ন ও স্মৃতিচারণও আছে। আছে লেখকের আত্মজীবনীমূলক ও জীবনস্মৃতিমূলক প্রবন্ধাবলিও।

প্রবন্ধ সমগ্রের এই খণ্ডে স্থান পেয়েছে লেখকের জীবনীমূলক, জীবনস্মৃতিমূলক ও আত্মজীবনীমূলক বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধ-সংকলন। যেমন আত্মজীবনমূলক ও আত্মশিল্পমূলক গ্রন্থ 'বিনুর বই', জীবনস্মৃতিমূলক রচনা 'জীবন যৌবন' এবং তিনটি প্রাসঙ্গিক সংকলনগ্রন্থ : 'আমার কাছের মানুষ', 'শতাব্দীর মুখে' ও 'নতুন প্রবন্ধ'। এর মধ্যে বিশেষত 'বিনুর বই' নিয়ে আলাদাভাবে আলোচনা করা দরকার।

'বিনুর বই'-এর নায়ক বিনু লেখকের প্রতিরূপ না হলেও অনুরূপ-কল্পরূপ-ভাবরূপ-প্রতীকী রূপ যে-কোনোটি হতে পারে এবং প্রকৃতই লেখকের এই সমস্ত রূপের একটি সমবায় বিনু। বিনু চরিত্রটির প্রথম উপস্থাপন ঘটেছিল 'বিনুর বই'-য়ের আগেই 'জীবনশিল্পী' গ্রন্থে, সেই প্রথম লেখকের আত্মপ্রক্ষেপে বিনু চরিত্রটির উদ্ভব। 'বিনুর বই'-এর প্রথম পর্ব এক সাহিত্যিকের শিক্ষানবিশির কাহিনি, তাঁর প্রস্তুতিপর্বের কাহিনি; আর দ্বিতীয় পর্ব তাঁর ক্রমবিবর্তনের ও চূড়ান্ত পরিণতির বৃত্তান্ত। একদিকে দেশকালপাত্রের অন্যদিকে লেখকের জীবনের ও মনের বিকাশেরও রূপান্তর বা সংক্রমণের সাহিত্যিক-নান্দনিক রূপরেখা। প্রথম পর্বে বিনুর প্রথম জীবনের কথা, দ্বিতীয় পর্বের 'বিনুর পূর্বকথা' প্রবন্ধে বিনুর প্রথম ও মধ্য জীবনের কথা, লেখকের ভাষায়, জীবনের প্রথম তিনটি পর্ব এবং প্রথম ও দ্বিতীয় যৌবনের কথা। ফলে লেখকের সাহিত্যিক-জীবনদার্শনিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রতিনিধির স্থান পাবার যোগ্য রচনাটি। এই রচনা থেকে 'বিনুর নিশ্চিতি' প্রবন্ধ পর্যন্ত বিনুর অভিব্যক্তি।

বিনুর কথা বিস্তারিত আলোচনা করলে আমরা দেখব, বিনু অন্নদাশঙ্করের ক্ষেত্রে যতটা না বিষয় ও পদ্ধতি, তার চাইতে বেশি অ্যাপ্রোচ বা প্রতিন্যাস। অন্নদাশঙ্কর—বিনু—'আমি'-চরিত্র : এই তিন ধারার বিরহ-মিলনের ফলাফল দিয়ে অন্নদাশঙ্করকে বিচার করলে এ-কথা বোঝা যাবে।

মানুষের সচেতনতার প্রধানত চারটি বিভাগ : চিন্তা বা মনন, আবেগ, স্বজ্ঞা, ও ইন্দ্রিয় চেতনা তথা প্রবৃত্তি। সাহিত্যিকের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় গুণগুলি হলো তাই—মনন, আবেগ, স্বজ্ঞা, প্রবৃত্তি, কল্পনা ও অভিজ্ঞতা। এর মধ্যে অন্নদাশঙ্করের ক্ষেত্রে মূল চালকশক্তি মননশীলতা। তাঁর সাহিত্যে সক্রিয় প্রধান গুণদুটি হচ্ছে মনন ও তার পাশাপাশি স্বজ্ঞাও। তাই তাঁর প্রধান রচনার বেশ কিছু মননশীল ও যুক্তিবাদী তো আর কিছু উপলব্ধিপ্রসূত ও মরমী। তাঁর রচনা বিশেষভাবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নির্ভরও। বস্তুত তাঁর সাহিত্যকর্মের একটি বড় অংশই হয় আত্মজৈবনিক নয় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত (যদিও তার মধ্যে কল্পনার অনুপ্রবেশও ঘটেছে)। একদিক থেকে দেখলে তাঁর সব রচনাই কোনো-না-কোনোভাবে আত্মমূলক (আত্মজীবনমূলক, আত্মশিল্পমূলক, আত্মস্মৃতিমূলক, ইত্যাদি)।

অন্নদাশঙ্করের আত্মজীবনমূলক বিভিন্ন রচনা, আত্মশিল্পমূলক চরিত্র বিনুর জবানীতে রচিত বিবিধ রচনা এবং 'আমি' নামক নানান চরিত্র ও নানান নামের আমি-চরিত্রের মধ্য দিয়ে কথিত রচনাদি (বিশেষত বিভিন্ন নায়ক-কেন্দ্রিক ছোট উপন্যাসগুলি ও বেশ কয়েকটি বড় গল্প) পাশাপাশি রেখে ত্রিমাত্রিক প্রতিতুলনা করলে উপর্যুক্ত বক্তব্যের পর্যাপ্ত প্রমাণ মিলবে।

অন্নদাশঙ্করের সাহিত্যকর্মে এইভাবে বিকাশের তিনটি ধারা বর্তমান—

১. আপন জীবনের ধারা ('জীবন যৌবন' গ্রন্থ ও অসংখ্য নিবন্ধ থেকে যার পরিচয় মেলে)

২. আত্মশিল্পের ধারা (বিশেষত 'বিনুর বই' ও 'আর্ট' গ্রন্থ থেকে যার পরিচয় মেলে)

৩. আমি-চরিত্রের ধারা (যেখানে মুখপাত্র লেখকও নন, বিনুও নয়, কথক—এই জাতীয় উপন্যাস ও গল্পের মধ্য দিয়ে যার প্রকাশ ঘটে)।

অন্নদাশঙ্করের সাহিত্যসম্ভার এই তিন ধারার বিরহ-মিলনের ফলাফল। এর দরুনই তাঁর সাহিত্যকর্ম একই সঙ্গে কাহিনি ও নির্মাণ, ব্যক্তিগত ও ঐতিহাসিক, মরমী ও মনস্বী। এই অ্যাপ্রোচ থেকে অন্নদাশঙ্কর বিষয়ে একটি সামগ্রিক গ্রন্থই রচনা করা যায়। আপাতত এখানে একক একটি উদাহরণ দিয়ে এই প্রতিন্যাসের রূপরেখাটি উত্থাপন করতে চাই। এর জন্য যেকোনো একটি বিষয় ও সেই বিষয়ের প্রতিনিধিত্বকারী একটা ঘটনা বা প্রতিমা বাছা যাক। আমি বেছে নিচ্ছি বিষয় হিসেবে জীবনদেবতার কাছে ইলুমিনেশনের বর প্রার্থনা ও প্রতিমা হিসেবে ইনার ভিশন বা অন্তর্দৃষ্টির জন্য নিরন্তর প্রয়াসের প্রতিমা (উৎস : 'হাজারদুয়ারী' গল্প)।

গল্পটির নায়ক ও কথক মেঘবরণ, চরিত্রটির বাস্তব অনুপ্রেরণা অন্নদাশঙ্কর স্বয়ং। মেঘবরণ বিশুদ্ধ কাল্পনিক চরিত্র যেমন নয়, তেমনি পুরোপুরি আসল অন্নদাশঙ্করও নয়, আসল ও কল্পনার মিশেল।

এখানে আমরা দেখব মেঘবরণ আসলে যে-অন্নদাশঙ্কর (প্রথম ধারা), গল্পে কথক-নায়ক মেঘবরণ হিসেবে তার কী রূপারোপ (তৃতীয় ধারা) এবং কোন্ শিল্পপদ্ধতির মধ্য দিয়ে এই রূপান্তর ঘটে (দ্বিতীয় ধারা)। প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিমার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ধৃতি দেওয়া যাক—

প্রথম ধারা : 'সব দেশের সব ধর্মের মানুষের কাছে আমি পেয়েছি তিল তিল করে আমার সত্য। তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে আমার নিজের নিভৃত উপলব্ধি। একবার স্কুল জীবনে, একবার কলেজ জীবনে আমার মানস নয়নে বিশ্ব সংসার আলোয় আলোময় হয়ে গেছে।

পরবর্তী বয়সের নিবিড় অন্ধকারের মধ্যেও আমাকে বাঁচিয়েছে আমার নিজের সেই জ্যোতির্ময় Vision. সব মিথ্যে হতে পারে, কিন্তু প্রত্যক্ষ উপলব্ধি কখনও মিথ্যা হতে পারে না। ইনটেলেকট যেখানে পরাস্ত হয়েছে ইনটুইশন সেখানে শেষরক্ষা করেছে।...

...জীবনদেবতার কাছে জীবনভর আমি যে তিনটি বর চেয়েছি তার প্রথমটি(ই) হলো (এই) ইলুমিনেশন। আমার অন্তর যেন আলোয় ভরে যায়। বিশ্বরহস্য যেন আমি সেই আলো দিয়ে ভেদ করতে পারি। সমস্ত যেন আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়।'

(—'আমার জীবনদর্শন' প্রবন্ধ থেকে)

দ্বিতীয় ধারা : '...বাবা একবার বিনুকে সকালে কিছুক্ষণ ধ্যান করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি নিজে ধ্যান করতেন। কাকে ধ্যান, কিসের ধ্যান, কেন ধ্যান? বিনু দু'চার দিন চোখ বুজে রয়। তারপর ছেড়ে দেয়। চোদ্দ পনেরো বছর বয়সে একদিন তার চোখ থেকে পর্দা সরে যায়। সব আলো হয়ে যায়। এক মুহূর্তের জন্যে সে বিশ্বরূপ দর্শন করে। দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে আরো এক জগৎ আছে, এই জগৎই সমগ্র জগৎ নয়, দুই মিলিয়ে সম্পূর্ণ সৃষ্টি। বিনুর আরো একবার এই উপলব্ধি হয় বিশ একুশ বছর বয়সে। মুহূর্তের জন্যে সব আলো হয়ে যায়। সে সমগ্রকে দেখতে পায়। কিন্তু খোলা চোখে নয়। কিন্তু ইচ্ছা করলেই আবার এই দিব্যদৃষ্টি লাভ হয় না। এটা পরমাত্মার অনুগ্রহ। আবার কবে তাঁর অনুগ্রহ হবে কে জানে!...

...এখন সে নব্বইতে পড়েছে। তার জীবনসঙ্গিনী বিগত। এখন নতুন করে তার চাইবার কী আছে? পাবারই বা আছে কী? আছে। আছে। কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে দু'বার তার দৃষ্টি খুলে গিয়েছিল। এক মুহূর্তের জন্যে তার ধ্যানদৃষ্টিতে এ বিশ্বের সব কিছু পরিষ্কার দেখা দিয়েছিল। সে আরো একবার ফিরে পেতে চায় সেই দিব্যদৃষ্টি।'

(—'বিনুর বই' গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্ব থেকে)

তৃতীয় ধারা : "রাত যতই গভীর হতে থাকে আলাপও ততই গভীর হয়। মেঘবরণ বলতে আরম্ভ করেন—

'ছেলেবেলায় কোথায় যেন পড়েছিলুম। বোধ হয় আরব্য উপন্যাসে। এক যে ছিল রাজপুত্র। সে জন্ম অবধি দেখে আসছে তার চারদিকে বিশাল রাজপুরী। হাজারদুয়ারী। সে যে দুয়ারেই হাত দেয় সে দুয়ার খুলে যায়। সে ভিতরে ঢুকে দেখে কতরকম ধন রত্ন মণি মাণিক। ভোগ্য সামগ্রী। বিলাস দ্রব্য। গীতবাদ্য। জ্ঞানবিজ্ঞান।

মানুষ যা কিছু কামনা করে। ধ্যান করে। সন্ধান করে। দেখতে দেখতে তার চোখ ধাঁধিয়ে যায়। একটি কক্ষেই এত ঐশ্বর্য আছে যে দেখতে দেখতে জীবন ভোর হয়ে যাবে। তাই সে জোর করে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। নইলে আর সব কক্ষ ঘুরে ঘুরে দেখা হয় না। আয়ু অফুরন্ত নয়।

একদিন তার নজরে পড়ে একটি দুয়ার বন্ধ। হাত দিলে খোলে না। ঘা দিলেও খোলে না। হাজারদুয়ারীর ন'শ নিরানব্বইটি দুয়ার খোলা, কিন্তু একটি দুয়ার বন্ধ। সে বুঝতে পারে না কেন। অবাক হয়। মাকে জিজ্ঞাসা করে।...মা বললেন, কেউ কখনো ও ঘরে যায়নি। ও ঘরে বিপদ।

সকলের মুখে সেই একই কথা। ও ঘরে বিপদ। এখন পর্যন্ত কেউ ওই বন্ধ দুয়ার খুলে দেখেনি। কোনো রাজপুত্রই না। রাজপুরীতে কিসের অভাব যে সাধ করে বিপদের মুখে পড়বে! মানুষের জীবনে যা কিছু কাম্য তার প্রত্যেকটি পাওয়া যায় ন'শ নিরানব্বইটি ঘরে। মুঠো মুঠো পাওয়া যায়। লুট করলেও নিঃশেষ হয় না। কেন তা হলে বন্ধ দুয়ারে ঘা দিতে চাওয়া?...ও যে আদ্যিকালের বন্ধ দুয়ার।

রাজপুত্রের ক্রমে প্রত্যয় হয় ওই যে বন্ধ দুয়ার ওই দুয়ারের ওপারের সত্যিকার জগৎ স্বাধীন জগৎ। ওই দুয়ারটা এক হিসাবে অন্দরমহলের লৌহকপাট। ওটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ওধার থেকে।

একটি দরজা বন্ধ রাখাও সদর মহলকে বাইরে রাখা। রাজপুত্র অনুভব করে যে

রাজপুরীর একটি দুয়ারও যদি বন্ধ থাকে তাহলে সমস্ত সদরটাই বাইরে থেকে যায়। সেই একটি দুয়ার যতক্ষণ না অবারিত হচ্ছে ততক্ষণ আর সব দুয়ার অবারিত হয়েও মোটের উপর বারিত।

রাজপুত্র হাজারদুয়ারীর আর ন'শ নিরানব্বইটা দুয়ারের কথা না ভেবে সেই একটি দুয়ারের কথায় বিভোর থাকে। কেমন করে সে ওই লৌহ যবনিকা ভেদ করবে? কেমন করে তার ওপারে যাবে?...

হাজারদুয়ারীর সেই একটা মহলই (যে) আর সব কটা মহলের সমবেত ঐশ্বর্যের চেয়ে ঐশ্বর্যময়।'

. . . .

(মেঘবরণ বলে যেতে লাগলেন) 'আমাদের হাজারদুয়ারীতে(ও) আমি যা চেয়েছি, সব পেয়েছি। তবু আমার মনে হয়েছে একটি দুয়ার বন্ধ। বাবার ইচ্ছা নয় যে আমি সেটা খুলি।'

'কী সেটা'? রাজীব কৌতূহলী হলেন।

'সত্য,' মেঘবরণ তাঁকে আর এক চমক দিলেন।

...'সত্য! তার মানে কী, সন্তু?'

'তার মানে তার চেয়েও দুর্বোধ্য। আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না, বাবলু। বছর বারো তেরো বয়সে আমার চেতনায় যেদিন সত্যের জন্যে ক্ষুধা জাগে সেদিন আমিও জানতে চেয়েছি সত্য বলতে কী বোঝায়। ন'শ নিরানব্বইখানা পুঁথির উপরে আরো একখানা পুঁথি আছে। তাতে কী লিখেছে কেউ তা জানে না। কেউ বলতে পারে না। সেইজন্যেই তো আমি সেটা খুলে পড়তে চাই। বাবা শুনে বলেন, পণ্ডশ্রম। বৃথা চেষ্টা। তার চেয়ে বাকী ন'শ নিরানব্বইখানায় মন দে। খান কয়েক তো পড়ে বুঝবি। আপেক্ষিক সত্য নিয়েই আমাদের কারবার। তাই ঠিকমতো শেখ। আমি বলি, শিখছি তো। কিন্তু আপেক্ষিকের উপরে যে সত্য তারই জন্যে আমি ক্ষুধিত ও তৃষিত।'

. . . .

'আমার জীবনটাই এমনি ধারা। একটার পর একটা দুয়ারে ঘা দিই। খুলে যায়। কিছুদিন বাদে বুঝতে পারি ঢের হয়েছে। আর না। বেরিয়ে আসি। সব সময় মনে পড়ে ন'শ নিরানব্বইয়ের উপরে আরো একটি দুয়ার আছে। সেটি সহজে খোলবার নয়। সেটি খুলতেই হবে। কিন্তু সাহসে কুলোয় না। সত্যকে জানতে যাওয়া দারুণ দুঃসাহসের কাজ।' মেঘবরণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

'তারপর?' রাজীব ক্লান্ত স্বরে সুধালেন, 'এখনো কি সে দুয়ার বন্ধ?'

'এর উত্তর, হাঁ ও না।' মেঘবরণ বললেন হেঁয়ালীর মতো করে। আরো কিছুদিন যদি বাঁচি তা হলে হয়তো এ প্রশ্নের দ্ব্যর্থহীন উত্তর নিয়ে যেতে পারব।'

এরপরেও (ট্রেন আসতে) যথেষ্ট সময় ছিল। কিছুক্ষণ পায়চারি করে ঘুমকে ঠেকিয়ে রাখা গেল। মেঘবরণ বললেন, 'আমার দুঃখের কথাই কেবল শুনলে। সুখের কথা তো শুনলে না?'

'শুনি? শুনি?' যুবকের মতো অধীর হলেন রাজীব।

'আমার মনে হচ্ছে,' মেঘবরণ আকাশের দিকে চেয়ে জ্যোতির্বিদের মতো বললেন, 'দুয়ার বন্ধ থাকা সত্ত্বেও আমি বেশ খানিক দূর দেখতে পাচ্ছি। দুয়ার না খুলুক, দৃষ্টি খুলছে।

আরো খুলবে, আরো খুলবে, আরো আরো খুলবে। যদি আরো কিছুদিন বাঁচি।'

'বাঁচবে। বাঁচবে।' রাজীব তাঁকে আশ্বাস দিলেন, 'আরো অনেকদিন।...' ”

(—'হাজারদুয়ারী' গল্প থেকে)

একই আশ্বাসের কথা ধ্বনিত হয়েছে লেখকের 'পঞ্চাশপূর্তি', 'জীবনদর্শন' ইত্যাদি কবিতাতেও—

'একদিন খুলে যাবে মায়াময় মন্দিরের দ্বার
নিহিত প্রকৃত সত্য রূপ নেবে সম্মুখে আমার।
প্রতীক্ষায় আছি তারই, জরাজীর্ণ মরণের নয়,
বুক হবে রসে ভরা, ত্রিনয়ন হবে আলোময়।'

(—'বাণী আটাত্তরী' কবিতা থেকে)

তিনটি ধারার যে উদ্ধৃতি দিয়েছি তার মধ্যে, বলা বাহুল্য, তৃতীয় ধারাটি প্রথম দুই ধারার তুলনায় অনেক বেশি পরিপুষ্ট, বেগবান, সংক্ষুব্ধ ও জটিল। যদিও প্রথম দুই ধারা তৃতীয় ধারাকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত, এবং সমৃদ্ধও, করেছে। আবার দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধারার স্রোতের পারস্পরিক আদান-প্রদানের ফলেই এক এক পর্বে অন্নদাশঙ্কর এক এক ধরনের লেখক। যেমন প্রথম পর্বে তিনি মূলত মননশীল লেখক; দ্বিতীয় পর্বে তিনি প্রেমিক লেখক, রসিক লেখক; আর তৃতীয় পর্বে এসে ও শেষ পর্যন্ত তিনি বুদ্ধিজীবীর চেয়ে বড়, হৃদয়জীবী, রসিকের চেয়ে বেশি, ক্রান্তদর্শী।

লেখকের আমি-চরিত্রের ধারার উপন্যাস ও গল্প তাঁর তিনটি পর্বেই লেখা হয়েছে, যদিও বেশির ভাগ দ্বিতীয় পর্বে লেখা। আমিধর্মী চরিত্র যখন লেখকের প্রথম ও তৃতীয় পর্বের রচনাতে এসেছে লেখক তখন সেখানে বিষয়কে বেছে নিয়েছেন, কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে, বলা যায়, বিষয়টাই তাঁকে বেছে নিয়েছে। সেই বিষয়টা হলো প্রেমের অন্বেষা, রসের অন্বেষা, আর্টের অন্বেষা।

আর্ট জীবনের থেকে নেয়। জীবনকে অনুসরণ করেই অতিক্রম করে। তখন জীবন আর্টের অনুসরণ করে। এটাই অন্নদাশঙ্করের মৌল ধারণা। ফলে দ্বিতীয় ধারাটিকে আমি জীবনশিল্পের ধারা বলব। শিল্পে কল্পনার খাদ মেশাতে হয়। কল্পনা সোনা নয়। সোনা হচ্ছে সত্য উপলব্ধি। তা যার জীবনে যতটুকু বা যতবেশি তার শিল্প তেমনি মূল্যবান বা তত অমূল্য তথা তত সুন্দর।

অন্নদাশঙ্করের শিল্পে তিনটি প্রবাহের প্রতিটি অন্য দুটির মধ্যে অনেকটা ডুবে গিয়ে কিছুটা জেগে থাকে। শুধু একটি বিষয় ও প্রতিনিধিত্বকারী একটি প্রতিমার ক্ষেত্রে নয় (যে প্রতিমায়নের তিনটি ধারার বর্ণনা-বিশ্লেষণের কোনো তুলনামূলক/প্রতিতুলনাকর আলোচনার মধ্যে আমি গেলাম না, কেননা পাঠক একাধিকবার পাঠের মধ্য দিয়ে নিজেই সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য-বিবর্তন-বিপ্রতীপতা ইত্যাদি স্পষ্ট অনুধাবন করে উঠতে পারবেন), অন্নদাশঙ্করের সমগ্র সাহিত্যকর্মের ক্ষেত্রেই সার্বিকভাবে বিশ্লেষণের এই রীতি প্রযোজ্য।

লেখকের আমিধর্মী চরিত্রের নির্বাচন ও রূপারোপ কীরকম সূক্ষ্মজটিল তা লেখকের বক্তব্য থেকেই বোঝা যায়—মডেল একটা লাগে। কিন্তু বেশ কিছু অদল-বদল করতে হয়। হয়কে নয় করতে হয়। নয়কে হয়। পুরুষকে নারী বানাতে হয়। নারীকে পুরুষ। দেশ থেকে চলে যেতে হয় বিদেশে। বিদেশকে টেনে আনতে হয় দেশে। পুরাতনকে করতে হয়

সাম্প্রতিক। সাম্প্রতিককে পরাতে হয় পুরাতন বেশ।

আর আমি-চরিত্রের ধারার গল্প-উপন্যাসের গঠনকর্ম কেমন তা বোঝা যায় লেখকের এই বক্তব্য থেকে—লেখকের ব্যক্তিগত জীবন থেকে নেয়া হলেও এ-প্রকার (গল্প) উপন্যাসের জীবন লেখকের জীবন নয় বা তার পরিপূরণ নয় বা তার ক্ষতিপূরণ নয় বা তার সম্প্রসারণ নয়। এই উপন্যাসের জীবনও তার আপনার জীবন, তার নায়ক নায়িকার জীবন, নায়ক নায়িকার সঙ্গে যুক্ত বহু মানব মানবীর জীবন, জীবনের আভ্যন্তরীণ নিয়ম বা নিয়তি, জীবনের বৃহত্তর পটভূমি, জাগতিক ব্যাপার রিয়ালিটি। উপন্যাসের সীমান্ত গিয়ে ঠেকেছে দর্শনের সীমানায়। ব্যক্তিগত জীবনের বাইরে যেতে বা উর্ধ্বে উঠতে না জানলে কবিতা লেখা চলে, উপন্যাস লেখা চলে না।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধারার মিথস্ক্রিয়ার ধরন হলো এরকমই সূক্ষ্ম-জটিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে তৃতীয় ধারার জন্য একটি সারণীর ও তিনটি ধারার মিথস্ক্রিয়ার একটি রেখাচিত্রের উল্লেখ করে এ-ভূমিকা শেষ করছি।

আমি-চরিত্রের ধারা : একটি সারণী

উৎস গ্রন্থ/গল্প	আমি-চরিত্র	সহচরিত্র	বাস্তব অনুপ্রেরণা	ভাববস্তু/ বিষয়বস্তু
রত্ন ও শ্রীমতী	রত্ন	শ্রীমতী	সরলা দেবী	শাশ্বতা নারীর অন্বেষণ
না	প্রিয়দর্শন	অন্নদাশঙ্কর	প্রমথ চৌধুরী	চিরন্তন নারীসৌন্দর্যের অন্বেষণ
ও	মি. সুর	'আমার ও'	ভিনাস ডি মাইলো	সৌন্দর্যদেবীর অন্বেষণ
হাজারদুয়ারী	মেঘবরণ	রাজীব	অন্নদাশঙ্কর	ইনার ভিশন বা অন্তর্দৃষ্টির জন্য নিরন্তর প্রয়াস
বিশল্যকরণী	হারীত	জোন	চিত্রশিল্পী জয়স	সৌন্দর্যের দায়
তৃষ্ণার জল	প্রবাহন	ইলেন	লীলা রায়	'শাশ্বতীর দেখা পাই মানবীর বেশে'
রাজঅতিথি	নিরঞ্জন	গোলাপ পিসি	সদানন্দ সরস্বতীর কন্যা	'প্রেমের কী অমোঘ শক্তি!'
ক্রান্তদর্শী	মানস	সৌম্য স্বপনদা	মূর্ত সত্যাগ্রহী গান্ধী	সত্যের অন্বেষণ

তিনটি ধারার মিথস্ক্রিয়া : একটি রেখাচিত্র

(সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতের দিক থেকে)

১. প্রথম ধারা : অন্নদাশঙ্কর-লীলা রায় (অ ⇄ লী)

২. দ্বিতীয় ধারা : বিনু-মীরা (বি ↔ মী)

৩. তৃতীয় ধারা : রত্ন-শ্রীমতী (র ⇅ শ্রী)

('রত্ন ও শ্রীমতী'কে উৎস হিসেবে নিয়ে)।

অন্নদাশঙ্করের উপন্যাস/বড় গল্পের গঠন-কাঠামো এইভাবে পূর্বোক্ত তিনটি ধারার মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে। উপন্যাস/গল্পের ন্যারেটিভের দিক থেকে তার গল্পাংশ ও ভাববস্তু, আঙ্গিক ও কাহিনি, এবং প্রজাতি ও শৈলী সেই ন্যারেটিভের মধ্যে যথাযথ ও নির্দিষ্ট স্থান পায়। এইভাবে বিনু তথা আত্মশিল্পের ধারার মধ্য দিয়ে অন্নদাশঙ্করের প্রবন্ধসাহিত্য তাঁর কথাসাহিত্যের অঙ্গীভূত হয়ে যায়।

সূচিপত্র

সম্পাদকের ভূমিকা	[৫]
বিনুর বই	১
জীবন যৌবন	১৬৫
আমার কাছের মানুষ	৩১৫
শতাব্দীর মুখে	৩৯১

বিনুর বই

প্রথম পর্বের ভূমিকা

"আমি প্রবীণদের মহলে নবীন, নবীনদের মহলে প্রবীণ।... নবীন ও প্রবীণ উভয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি পরস্পরকে পরিচিত করাতে পারি। প্রবীণদের বোঝাতে পারি নবীনরা কী ভাবে, যদিও নবীনদের সঙ্গে আমার পরিচয় অপ্রচুর। আর নবীনদের বোঝাতে পারি প্রবীণদের মনোভাব, যদিও প্রবীণদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ স্বল্প।...আধুনিক সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে সাধারণের ভ্রান্তি আছে, আমি চেষ্টা করব নিরসনের। আধুনিকদের কাছে অত্যাধুনিকদের নানা জিজ্ঞাসা আছে, আমি উত্তরদানের চেষ্টা করব। এই দুই কর্তব্য এক সঙ্গে করা হয় যদি অভিভাষণটিকে কাহিনীর আকার দিই।...আমি যার কাহিনী বলতে যাচ্ছি তার নাম দেওয়া যাক বিনু।"

প্রায় চার বছর আগে জামশেদপুর প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে এই ছিল আমার গৌরচন্দ্রিকা। বিনুর সে কাহিনী পরে 'জীবনশিল্পী'র অন্তর্গত হয়েছে। কাহিনীটিকে একটু বড় আকারে লেখবার ইচ্ছা ছিল। এতদিন পরে তার সুযোগ পাওয়া গেল। এটি কিন্তু কাহিনী হল না। কাহিনী যদি হয়ে থাকে তবে জীবনের নয়, মনের। কিন্তু জীবনকে বাদ দিয়ে নয়।

২ অক্টোবর ১৯৪৪ — অন্নদাশঙ্কর রায়

প্রথম পর্ব

আদি অন্ত

জল না পেলে গাছ শুকিয়ে যায়, রস না পেলে মানুষ। বিনুর জনম অবধি রসের অনাবৃষ্টি হয়নি। বলতে নেই, কিন্তু সত্যি বলতে কি, যা হয়েছে তা অতিবৃষ্টি। অতিবর্ষণেও গাছ মরে। বিনুরও মরণ হত। কিন্তু তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন তিনিই যিনি অলক্ষ থেকে রসের যোগান দেন। জল যাতে দাঁড়িয়ে না থাকে তার জন্যে কাটতে হয় নালা। রস যাতে নিঃসরণের পথ পায় তার জন্যে সাধতে হয় সংগীত বা কাব্য, অভিনয় বা নৃত্য, ভাস্কর্য বা চিত্র। বিনুকে যিনি রসে অনুমগন করেন তিনিই তার শিরে লিখেছেন কেমন করে কাকে নিবেদন করে রসের উপচয় থেকে উদ্ধার পেতে হয়।

কিন্তু তিনি কী লিখেছেন তা ভালো করে পড়তে তার জীবনের বিশ বছর কাটল। কপালের লেখা তো নিজের চোখে দেখবার জো নেই। দেখতে হয় পরের চোখে। পর হয়তো আপনার চেয়েও আপন। বিনুও একদিন একজনের চোখের তারায় দেখতে পেল নিজের কপালের লেখা। তখন তার আর সন্দেহ রইল না যে সে কবি। আগে সন্দেহ ছিল বলেই তার আগেকার রচনা তাকে তার পথের সন্ধান দেয়নি। সে সব যেন তার সাধন নয়, প্রসাধন।

তা হলেও তার প্রথম বিশ বছর তার সাধনার শামিল, যেমন যুদ্ধের শামিল তার উদ্‌যোগ। কতকটা তার অজান্তে, কতকটা স্বপ্নের ঘোরে, কতকটা আর পাঁচজনের অনুকরণে, কতকটা সঙ্গদোষে বা সঙ্গগুণে তার সাধনার কয়েকটি সোপান সে অতিক্রম করে এসেছিল। এমন কি তার ভুলগুলোও তাকে সাহায্য করেছিল, যেন ভুল নয়, সুবুদ্ধি।

সাধনার শেষ কথা মোক্ষ। বিনুর সাধনা রসমোক্ষণের, তাই তার অন্তিম সোপান রসমোক্ষ। কবে সেখানে পৌঁছবে, আদৌ পৌঁছবে কি না কেমন করে জানবে! কিন্তু সেই তার পথ, নান্যঃ পন্থাঃ। পরবর্তী বয়সে আবার সে সংশয়ে পড়েছে, আলো হারিয়েছে, আলেয়ার দিকে চলেছে, কিন্তু মার্গভ্রষ্ট হয়নি, ঘুরে ফিরে মার্গস্থ হয়েছে।

ছেলেবেলায়

বিনুর একটা সুবিধা ছিল, তার সমবয়সীদের ছিল না। বিনুর ছিল সাত খুন মাফ। রাত্রে আর সবাই পড়া মুখস্থ করে, কিন্তু বিনু তার ঠাকুমাকে কবিকঙ্কণ চণ্ডী পড়ে শোনায়, কিংবা বেরিয়ে যায় কীর্তনে। দিনের বেলা আর সবাই ক্লাসে হাজির থাকে, কিন্তু বিনু কখন এক সময় উঠে গিয়ে কমন রুমে মাসিকপত্র ওল্‌টায়, কিংবা লাইব্রেরিতে যত অপাঠ্য বই। বাড়িতেও তার নিজের একটা লাইব্রেরি ছিল, বাবার দেওয়া। সেখানে বসে নভেল নাটক পড়লে কেউ দেখতে যেত না, শুধু তার মা তার হাতে যে কোনো বই লক্ষ করলেই মন্তব্য করতেন, "হুঁ! নভেল পড়া হচ্ছে!" তার বাবা তাও বলতেন না। কিন্তু বিনু তাঁকে বলবার কারণ দিত না, তাঁকে ভয় করত বলে একটু আড়ালে পড়ত ওসব। কেবল একটা জিনিস

পড়ত তাঁকে দেখিয়ে শুনিয়ে। সেটা খবরের কাগজ। আর মাসিকপত্র। এই ছিদ্র দিয়েই শখ প্রবেশ করে। বিনুরও সাধ যায় লিখতে। হাতে লেখা মাসিকপত্র চালাতে। যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না। প্রায় রচনাই নকল। নকলনবিশী করে তার শিক্ষানবিশী শুরু। এ কাজে যদি কারো উৎসাহ থাকে তবে তার নাম বিনু নয়। তার উৎসাহের আরো অনেক ক্ষেত্র ছিল।

উপরে বলা হয়েছে মাসিকপত্রের ছিদ্র দিয়ে শখ প্রবেশ করে। আর একটা ছিদ্র ছিল। সেটা রাজবাড়ির থিয়েটার। তার বাবা ছিলেন থিয়েটারের ম্যানেজার, অবৈতনিক। কেন যে তাঁর মতো রাশভারী লোককে ম্যানেজার করা হয়েছিল সে এক রহস্য। বোধহয় তিনি ম্যানেজ করতে জানতেন বলে। সময়মতো আরম্ভ, সময়ে শেষ, তারপরে ভুরিভোজন, এ ছিল প্রতিবারের প্রোগ্রাম। কোনোরকম বিশৃঙ্খলা বরদাস্ত করবার পাত্র ছিলেন না তিনি। তারপর তাঁর রসবোধ ছিল অন্তঃসলিল। পাশা খেলাই হোক, লীলাকীর্তনই হোক, তিনি উপস্থিত না থাকলে আসর জমত না। কিন্তু তিনি গাইতে পারতেন না, অভিনয়েও বড়ো একটা নামতেন না। মাসে দু'মাসে দু-একবার থিয়েটার হত। বিনুও যেত। নাটক দেখে তারও সাধ যেত নাটক লিখতে। লিখে অভিনয় করাতে। তার বয়স্যেরা তার ছাইভস্ম অভিনয় করে তাকে কৃতার্থ করত, কিন্তু তাকে কোনো প্রধান ভূমিকা দিত না। কী আফসোস!

তাগিদ

ধীরে ধীরে বিনুর উৎসাহ নিবে গেল। নিবে গেল মানে ক্ষেত্রান্তরে গেল। আমাদের এই আখ্যায়িকা বিনুর জীবনী নয়, এতে তার প্রাকৃত জীবনের সামান্যই থাকবে। ক্ষেত্রান্তরের কথা অবান্তর।

বিনুর মাসিকপত্র বন্ধ হয়ে গেল, ঘরোয়া থিয়েটারও। কারণ কোনো দিক থেকে তাগিদ ছিল না। না ভিতরের দিক থেকে, না বাইরের দিক থেকে। যে সৃষ্টি করে সে নিজের খেয়ালেই করে, কিন্তু খেয়ালের পিছনে একটা গরজ না থাকলে খেয়ালকে ঠেলা দিতে কেউ থাকে না, ঠেলা না খেলে খেয়াল এক সময় থেমে যায়। গরজটা হয় স্রষ্টার, নয় সৃষ্টিভোক্তার। নয় দু'পক্ষের। যার গরজ সে তাগিদ করবে, তবেই লেখনীর ঝরনা দিয়ে রস ঝরবে। বাঁশির রব দিয়ে রসের মধু ক্ষরবে। তুলির রং দিয়ে রস রূপ ধরবে।

বাইরে থেকে তাগিদ ছিল না। না থাকারই কথা। এগারো-বারো বছরের বালকের রচনা তার সমবয়সী ভিন্ন আর কে চাইবে! সমবয়সীদের নিজেদেরই কতরকম খেয়াল ছিল, তা ছাড়া ছিল পড়াশুনার চাপ। বিনুর মাসিকপত্রে যারা লিখত তারা লিখতে ভুলল, একাই সবটা ভরাতে গিয়ে সে দেখল মিছে খাটুনি, একজনও পড়বে না। থিয়েটারে—ঘরোয়া থিয়েটারে—দেখা গেল, অভিনেতারা যা খুশি আওড়ায়, পতন ও মৃত্যুর পর উঠে দাঁড়ায়, আর এক হাত লড়াই করে ও বাহবা পায়। নাট্যকারকে কেউ কেয়ার করে না, তার নাটকের যে অভিনয় হচ্ছে এই তার সাত পুরুষের ভাগ্যি। তাহলে নাটক লিখে ভারি তো সুখ!

তার চেয়ে বড়ো কথা ভিতর থেকে তাগিদ ছিল না। খেয়াল বা শখ দু'দণ্ডেই নিবে যায়। তাকে সারা রাত জ্বালিয়ে রাখতে হলে বাইরের উস্কানিও যথেষ্ট নয়, ভিতরে থাকা চাই জ্বালা। লিখতেই হবে এমন কোনো ব্যাকুল ব্যগ্রতা ছিল না। বোধহয় তার যথার্থ কারণ,

অন্তরে রস যা ছিল তা উপচে পড়বার মতো নয়। রস জমতে জমতে এক সময় ছাপিয়ে পড়ে, তখন বাইরের চাহিদা থাক বা না থাক ভিতর চায় ভারমুক্ত হতে। তখন রসমোক্ষণ না হলে মানুষ বেদনা বোধ করে। তখন যদি তার হাতে লেখনী থাকে সে লিখবেই। মানা দিলেও লিখবে, বাধা দিলেও লিখবে।

কলাবিদ্যা

লিখবেই, না লিখে মুক্তি নেই। কিন্তু লিখলেও মুক্তি নেই, যদি না জানে কেমন করে লিখতে হয়। তার জন্যে শিখতে হয় কলাবিদ্যা। এ শিক্ষা একদিনের নয়, এক জীবনের। যার এ শিক্ষা হয়নি তার রসোদ্গার অপরকে পীড়া দেয়।

এ সত্য আবিষ্কার করতে বিনুর বিশ বছর কেন তার বেশি লাগল। কিন্তু বারো-তেরো বছর বয়সে সে যেন এর আভাস পেয়েছিল অপরের রসরচনা আস্বাদন করতে করতে। 'সবুজপত্র' পড়তে পড়তে এই কথাই তার মনে এল যে, লিখতে হয় তো বীরবলের মতো।

আর্ট কথাটা সে 'সবুজপত্রে'ই পায়। কথাটা তার মনে তখন থেকে গাঁথা। যদিও তার লিখতে উৎসাহ ছিল না তবু জানতে উৎসাহ ছিল কিসে লেখা আর্ট হয়, কিসের অভাবে আর্ট হয় না, কার কোন লেখা আর্ট, কার কোন লেখা ভালো হলেও আর্ট হতে পারেনি। একবার 'সবুজপত্র' পড়বার পর তার দৃষ্টি গেল বদলে। আর যত মাসিকপত্র আগে গো-গ্রাসে গিলত এখন থেকে তাদের গ্রাস করবার আগে সতর্ক দৃষ্টিপাত করল। নভেল নাটক গেলা আগের মতো সোজা বোধ হল না। গিলতে গিয়ে গলায় আটকাল।

ক্লাসে যারা ফার্স্ট সেকেণ্ড হত বিনু তাদের একজন ছিল না। সুতরাং তাকে চতুর বলা চলে না। তখনকার দিনে কেউ তাকে চিনতই না। যারা ভালোবাসত তারা চতুর কিংবা গুণী বলে নয়, বিনু বলেই ভালোবাসত। এমন যে বিনু তাকে চতুর করে তুললেন 'সবুজপত্রে'র লেখকপুঞ্জ। তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথও ছিলেন। ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথও।

চতুর শুধু লিপিচতুর নয়। জীবনচতুর! রবীন্দ্রনাথ বা প্রমথ চৌধুরীর লিপিচাতুর্য জীবনের চাতুর্য। তাঁদের চোখ চতুর, কান চতুর, রুচি চতুর। তাঁদের মন চতুর। এক প্রকার মন আছে, বিদগ্ধ মন। যার সে মন নেই সে যদি লিপিচতুর হতে যায় তবে রসের বদলে দেয় রসাভাস। তাতে প্রাণ জুড়ায় না। একটু চমক লাগে এই যা। 'ঘরে বাইরে'র বা 'চার ইয়ারী'র চাতুর্য ওষ্ঠগত নয়। বৈদগ্ধ্যের বিদ্যুৎস্ফুরণ। 'মেঘদূতে'র চাতুর্যও তাই। এমনি করে ক্লাসিকের প্রতি বিনুর কৌতূহল জন্মায়। কিন্তু তার মনের ছাঁদ রোমান্টিক।

সহজ

কোনো কোনো কবির বেলায় এ নিয়ম খাটে না। তাঁরা লিখতে শিখবেন কি, নিরক্ষর। তাঁরা মুখে মুখে গান বাঁধেন, যেমন মেয়েরা মুখে মুখে ছড়া কাটে। কান সজাগ বলে ছন্দ পতন হয় না, পদের সঙ্গে পদ মেলে। তাঁদের কবিতা লোকের ভালো লাগে চাতুরীর জন্যে নয়, অন্তর্নিহিত মাধুরীর জন্যে। মাধুরী অন্তর থেকে উৎসারিত হয়ে রচনায় সঞ্চারিত হয়েছে।

কলাবিদ্যার অপেক্ষা রাখেনি।

বাল্যকালে বৈষ্ণব কবিতা আস্বাদন করে বিনুর বিস্ময়ের সীমা ছিল না। তার বিশ্বাস হত না যে চণ্ডীদাস বিদগ্ধ বা চতুর বা কলাবিৎ। অথচ তাঁর পদাবলী হৃদয়ের বার্তা হৃদয়ের কাছে পৌঁছে দিত। চোখে জল আসত। সে জল যেমন বিনুর চোখের, তেমনি কবির চোখের। ব্যথায় ব্যথিয়ে দেওয়া কি সহজ কাজ! অথচ তিনি সহজ কবি। তাঁর রচনার কোথাও কোনো প্রয়াস নেই।

তখন বিনু এর রহস্য ভেদ করতে পারেনি, পরে করেছে। রস নিবিড় হলে আপনি আপনার পথ করে নেয়, মনের সাহায্য নেয় না। যেসব কবিতা বুকের রক্তে লেখা, মন তাদের উপর খবরদারি করে একটু আধটু বদলে দেয়, নতুবা মনের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ সুদূর। সেসব ক্ষেত্রে মনের চাতুরী একটা উপসর্গ, সাধক তাকে ভয় করে। সাধক চায় সম্পূর্ণ সহজ সরল নিরলঙ্কার হতে, সব অভিমান ভুলতে। ঐশ্বর্যের লেশ রাখতে চায় না, বিভূতির পরিচয় গোপন করতে চায়। এও এক প্রকার বৈদগ্ধ্য। কিন্তু মনের নয়, হৃদয়ের। সংসারের পোড় খেয়ে নয়, প্রেমের দহনে।

'বড় কঠিন সাধনা, যার বড়ো সহজ সুর।' রবীন্দ্রনাথও এ সাধনার সংকেত জানতেন। 'গীতাঞ্জলি' তার সাক্ষী। 'খেয়া' থেকেই বোধহয় এ সাধনার শুরু। বালক বয়সে যখন 'চয়নিকা' তার হাতে পড়ে তখন সব চেয়ে মিষ্টি লেগেছিল 'খেয়া'র কবিতা। উত্তরকালে সে কবির পূর্ব কবিতা পড়ে মুগ্ধ হয়েছে। 'মানসী',.'সোনার তরী', 'চিত্রা'। কিন্তু প্রথম পরিচয়ের রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সহজ কবি। বিনুর ভালো লাগত কবির উদাসমধুর সুর। বৈষ্ণবের নয়, বাউলের। পশ্চিমের লোক যে তাঁকে মিষ্টিক বলেছিল, ভুল বলেনি। সহজের ছলে যাঁরা পরম সত্য শোনান তাঁরা মিস্টিক।

সাংবাদিকতা

বিনুর ঠাকুরদা তাকে চায়ের নেশা ধরিয়েছিলেন, বাবা ধরিয়েছিলেন খবরের কাগজের নেশা। একটু বড়ো হয়ে সে যখন ইংরেজি পত্রিকা পড়ল তখন তার নেশাকেই করতে চাইল পেশা। তাও স্বদেশে নয়, সারা দুনিয়া জুড়ে, প্রধানত আমেরিকায়। বলা বাহুল্য, ইংরেজি ভাষায়। সুধীন্দ্র বসু, সন্ত নিহাল সিং, এঁদের দৃষ্টান্ত তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। কিছুকালের জন্যে সাহিত্য চলে গেল তার দৃষ্টির আড়ালে।

বিনুর স্বভাবে একটা অস্থিরতা ছিল। সে কোথাও চুপ করে বসে থাকতে পারত না, চারদিক বেড়িয়ে আসত বিনা কাজে। দেশ-বিদেশ বেড়ানো তার আশৈশব সাধ। বিদেশ বলতে যদিও বহু দেশ বোঝায় তবু তার পক্ষপাত অতি অল্প বয়স থেকে আমেরিকার উপর। একদিন তার বাবা তাকে বলেছিলেন সে বড়ো হলে জর্জ ওয়াশিংটন হবে। একখানা বই তার হাতে পড়েছিল, তাতে আমেরিকার স্বাধীনতার ইতিকথা ছিল। ওয়াশিংটনের মতো জেফারসনকেও তার ভালো লেগেছিল এবং পরবর্তী যুগের লিংকনকে। স্বাধীনতার লীলাভূমি আমেরিকা, সেখানে সব মানুষ সমান, সেখানে প্রাচ্য পাশ্চাত্য ভেদ নেই, সেখানে যে-ই যায় সে-ই উন্নতি করে। ইংরেজি মাসিকপত্রে আমেরিকাপ্রবাসী ভারতবাসীদের জবানবন্দী পড়ে সে দিন গুনত কবে বড়ো হবে, কবে জাহাজের খালাসী হয়ে সাগর পাড়ি

দেবে। তারপর আমেরিকায় পৌঁছে খবরের কাগজের আপিসে ভরতি হবে।

সেদেশে বা এদেশে কলেজে পড়বার বাসনা কোনোকালেই তার মনে উদয় হয়নি, তার বাবাও তেমন বাসনা জাগিয়ে দেননি। তিনি নিজে স্কুলের পড়া সাঙ্গ করার আগে জীবনসংগ্রামে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাই জীবনসংগ্রামকে স্কুল-কলেজের চেয়ে কার্যকর শিক্ষায়তন বলে বিশ্বাস করতেন। স্কুল কলেজ থেকে বেরিয়ে মানুষ হয় ক'জন! প্রায় সবাই তো গোলাম। তাঁকেও চাকরি করতে হয়েছিল বলে চাকরির উপর তাঁর অভিশাপ ছিল। তাঁর ছেলে মানুষের মতো মানুষ হবে এই প্রার্থনা তিনি করতেন, চাকুরের মতো চাকুরে হবে এ প্রার্থনা নয়। তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্বাধীনচেতা লোক, ইস্তফা দিয়েছিলেন একবার। তাঁকে আঠারো বছর বয়সে চাকরি করতে হয়েছিল বাপ-মায়ের খাতিরে, ভাই-বোনের খাতিরে। বিনুকে যেন পরিবারের খাতিরে চাকরি করতে না হয়।

খেলাঘর

কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের একটি সনেট আছে, তাতে তিনি বলেছেন স্বাধীনতার খেলাঘর পাহাড় আর সমুদ্র। বিনুর জন্ম পাহাড়ের দেশে। পাহাড়গুলো ছোট কিন্তু মানুষটি আরো ছোট। ছেলেবেলায় তাই তার মনে হত এসব পর্বতের চূড়া আকাশে ঠেকেছে, হাত বাড়ালেই স্বর্গ। এদের আড়ালে কি অন্য কিছু আছে? না বোধহয়। পৃথিবী ফুরিয়ে গেছে পাহাড়ের ওপারে।

দিনের পর দিন সকালে বিকালে দুপুরে দেখা হয় তাদের সঙ্গে, দেখা হয় রাত্রে, জেগে থাকলে রাত দুপুরে! বাড়ি থেকে সব সময় দেখা যায়, কষ্ট করে খুঁজে নিতে হয় না। সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত দেখতে চাইলে পাহাড় না দেখে উপায় নেই। আষাঢ়ের নব মেঘ পাহাড়েই পতাকা ওড়ায়। বৃষ্টির পরে ধীরে ধীরে যবনিকা ওঠে, রঙ্গমঞ্চে সমাসীন—শৈল।

এইসব খেলার সাথীর সঙ্গে একটানা চোদ্দ-পনেরো বছর কাটিয়ে বিনু স্বাধীনতার মূল্য বুঝেছিল। কী করে বুঝল তা কী করে বোঝাবে! কিন্তু তার কাছে স্বাধীনতা বিকিয়ে দেবার প্রশ্ন তখনি ওঠে যখন স্বাধীনতার চেয়ে মূল্যবান অনুভূতির জন্যে দাম দেবার তাগিদ আসে। তেমন তাগিদ পরে তার জীবনে এসেছে, কিন্তু তার দ্বারা স্বাধীনতার মূল্য কমেনি, বরং স্বাধীনতা যে কত মূল্যবান সেই কথাই মনে হয়েছে। যে নারী তার একমাত্র বাস দান করেছিল প্রভু বুদ্ধের জন্যে তার কাছে তার একমাত্র বাসের যা মূল্য বিনুর কাছে তার স্বাধীনতারও তাই।

চোদ্দ-পনেরো বছর বয়সে সমুদ্রসন্দর্শন ঘটল। সন্ধ্যাবেলা পুরীতে নেমে তার প্রথম কাজ হল সাগরসম্ভাষণে বেরোনো। অন্ধকারে কানে আসছিল অনাস্বাদিত কলরোল, গায়ে লাগছিল স্নিগ্ধ সিক্ত বাতাস। এমন প্রবল আকর্ষণ সে জীবনে অনুভব করেনি। সমুদ্র তাকে মাতাল করল। তারপরে তার পড়ার ব্যবস্থা হল পুরীতে। দিনের পর দিন রাতের পর রাত সমুদ্র তীরে কাটল। সমুদ্রের সঙ্গে তার পরিচয় পাকা হল, যেন কত কালের সখা। কলেজের বন্ধে সমুদ্র তাকে ডাক দিত পুরীতে। পরে একদিন সে সমুদ্রযাত্রাও করল। তার জীবনের উপর স্বাধীনতার ছাপ আঁকা হয়ে গেল সিন্ধুর নীল রঙে।

মন্দির

বিনুর যেখানে জন্ম সেখানকার প্রাণ ছিল মন্দির। প্রাচীন ভারতের মন্দিরকেন্দ্র সভ্যতা দেশীয় রাজ্য থেকে এখনো বিলুপ্ত হয়নি, অন্তত তখন পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিল। বিনুর মা ঠাকুমা প্রায়ই মন্দিরে যেতেন, তাঁদের সঙ্গে বিনুও। মন্দির যেমন বৃহৎ তার বেড়া তেমনি বিস্তৃত। সে যে কেবল মূর্তির পায়ে মাথা ঠেকাত তা-ই নয়, বিরলে বসে এমন কিছু পেত যা সব ধর্মের সার অনুভূতি। বাড়িতে ফিরতে তার ইচ্ছা করত না। ফিরত, কারণ না ফিরলে নয়। এও এক প্রকার পলায়ন। এ পলায়ন সংসার থেকে সংসারের বাইরে নয়, সংসারের মূলে। অনন্ত অসীম অপার বিশ্বের অধিবাসী বিনু, সংসার সে পরিচয় ভোলে ও ভোলায়, মন্দিরে গেলে মনে পড়ে। নয়তো পুণ্য করার জন্যে তার মাথাব্যথা পড়েনি। এমন কী পাপ করেছে যে পুণ্যের জন্যে মন্দিরে মাথা খুঁড়বে?

ধর্ম সম্বন্ধে তার একটা কৌতূহলও ছিল। তাই তার কাকার সঙ্গে গির্জায় গেছল, যোগ দিয়েছিল উপাসনায়। মসজিদে যায়নি, কিন্তু মহ্‌রমে লাঠিখেলার জন্যে তাকে ও তার ভাইকে বলা হয়েছিল। ঠাকুমার মানত। বাড়িতে সত্যপীরের সিন্নি আসত, যিনি আনতেন তাঁর নাম বোখারী সাহেব। তাঁকে বিনুরা ভক্তি করত। এই ভক্তিবৃত্তি তাকে একাদশীর উপবাস করিয়েছে, যদিও দয়াময়ী মা তাকে ফলার খাইয়ে উপবাসের জ্বালা জানতে দেননি। নগরকীর্তনে বাহু তুলে নাচিয়েছে, যদিও সেটা হরির লুটের লোভে উদ্বাহু হওয়া।

ধর্ম সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা ক্রমশ তাকে ব্রাহ্মমতে বিশ্বাসবান করে। সে সাকারবাদে আস্থা হারায় চিরকালের মতো। তারপরে যদি বা মন্দিরে গেছে সেটা উৎসবের টানে, সৌন্দর্যের খোঁজে। ধর্ম বাদ দিলেও আমাদের সভ্যতার অনেকখানি থাকে, মন্দির তার কেন্দ্র। মন্দির বাদ দিলে ঐতিহ্য বাদ দেওয়া হয়, বিনু তার জন্যে প্রস্তুত ছিল না, প্রস্তুত নয়। সে সাকারবাদী না হয়েও হিন্দু, কারণ সে তার স্বদেশের ধারাবাহিক ঐতিহ্যের সঙ্গে বিচ্ছেদ কল্পনা করতে পারে না। কিন্তু এর জন্যে যতটা নৈতিক সাহসের দরকার ততটা তার নেই। মন্দিরে যাব, মাথা নোয়াব না, প্রসাদ পাব না, কী করে তা সম্ভব? অগত্যা মন্দিরে যাওয়া বন্ধ করতে হয়। তাই শেষ পর্যন্ত ঘটল। এটা একটা সমাধানই নয়। এইটেই পলায়ন।

রহস্যময়ী

দেবমন্দির বললে শুধু দেবতা নয়, আরো অনেককে বোঝায়। শহরে সকলে সমবেত হয় সেখানে, মেয়েদেরও অবাধ গতি। সব জাতের, সব শ্রেণীর মেয়ে। বিনু একটু কম বয়সে পেকেছিল। না পাকবেই বা কেন? ছ'মাস বয়স থেকে তার বিয়ের নির্বন্ধ লেগে রয়েছিল। অতগুলি কনের সঙ্গে বিয়ে হলে তার বিরাট অন্তঃপুর হত। যাকেই দেখেন তাকেই নাতবৌ করবেন বলে কথা দেন তার ঠাকুমা। বেচারা বিনু সবুর করতে করতে নিরাশ হয়। কেন বৌ আসছে না সুধালে জবাব পায়, বড়ো হলে আসবে। বড়ো হওয়া কি তার হাতে? বিনু হাল ছেড়ে দেয় বিয়ের। কিন্তু চোখের দেখার নয়। মন্দিরে গেলে যাঁদের দেখা পায় তাঁরা দেবী নন, মানবী। অথচ বিনুর কাছে তাঁদের আকর্ষণ দেবতার অধিক। এখানে খুলে বলতে হয় যে বেশি বয়সের মেয়েদের উপরেই তার দৃষ্টি ছিল বেশি। কারণ তাঁরা বালিকা নন, নারী! রহস্যরূপিণী।

আমাদের পুরাতন সভ্যতায় নরনারীর মেলামেশার ও চেনাশোনার প্রধান স্থল ছিল মন্দির বা মেলা। রথযাত্রায়, শিবরাত্রিতে, দোলপূর্ণিমায়, ঝুলনের রাতে, রাসপূর্ণিমার ভোরবেলার স্নানে, বারুণীর যোগে—বিনুর জন্ম বারুণীর দিন—বিনু তাঁদের দেখতে পেত যাঁদের দেখা মিলবার নয়। তখনকার দিনে অবরোধ প্রথা এখনকার মতো শিথিল হয়নি। কয়েকটি পরিচিত পরিবারের মধ্যে যাওয়া আসা চলত, কিন্তু সেগুলি তো এক একটি গোষ্পদ। মন্দির না থাকলে, মেলা না থাকলে, স্নান না থাকলে অবরোধ প্রথার অলঙ্ঘ্য ব্যবধান সমাজের সব পুরুষকে বঞ্চিত করত সব রমণীর শ্রী থেকে। কূপের মধ্যে রূপ দেখা যেত না বিচিত্ররূপিণীর।

রথযাত্রার দিন দলে দলে সুসজ্জিতা যাত্রিণী তাদের বাড়ি আসত পল্লী অঞ্চল থেকে। জল খেতে চাইত, গল্প করত বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে, সম্বন্ধ পাতিয়ে যেত চির দিনের। রথযাত্রার রাত্রে রথের পাশে মহিলাদের সমাবেশ হত, মা ঠাকুরমাদের সঙ্গে বিনুও থাকত। দেবতার প্রতি ভক্তি ছিল অকৃত্রিম, কিন্তু মানবীর মাধ্যাকর্ষণশক্তি দুর্বার। তখনো সে দেহসচেতন হয়নি, কিন্তু রূপসচেতন হয়েছিল। সাজসচেতন, মাধুরীসচেতন। রহস্যসচেতন।

সম্বন্ধ

সম্বন্ধ পাতানোর প্রথা বোধহয় ভারতবর্ষের বিশিষ্টতা। কোনো দিন যাকে চিনিনে সে একদিন হঠাৎ এসে পরিচয় দিয়ে বলে, আমি তোমার মেসো। কেননা, তোমার মা আমার স্ত্রীকে বোন বলে ডাকতেন। কিংবা আমি তোমার ভাই। তোমার বাবা আমার বাবাকে ভাই বলতেন, কিংবা আমি তোমার শাশুড়ি।

বিনুর জীবনে এ রকম হরদম ঘটত। তাদের বাড়ি কেবল যে রথযাত্রার দিন গ্রামের মেয়েরা আসত তাই নয়, আসাযাওয়ার বিরাম ছিল না। এক দল সাপুড়ে বছরে এক বার করে অতিথি হত। ঠাকুরদাকে তারা শ্রদ্ধা করত, তিনি সাপের মন্ত্র জানতেন। নানা রকম তুকতাক, গাছগাছড়া, ওষুধপত্র জানা ছিল তাঁর। গরু বাছুরের সেবা ও চিকিৎসা তাঁর মতো কেউ জানত না। সাপুড়েরা তাঁকে 'জারমহরা' দিত। সাপের মাথার মণি দিত। বিনুর সঙ্গে তারা সম্বন্ধ পাতিয়েছিল। তাদের একজনকে সে দাদা বলে ডাকত।

দোকানদারদের অনেকেই ছিল তার মেসো। তাদের একজন তাকে একটা "ডারা" দিয়েছিল। খঞ্জনীর মতো। বিনুর সেটা ছিল প্রিয় বাজনা। এমনি রাজ্যিসুদ্ধুর সঙ্গে তার একটা না একটা সম্বন্ধ পাতানো হয়েছিল, সাধারণত তার অজ্ঞাতে। সম্বন্ধ পাতানোর ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন তার ঠাকুমা। তাঁর বেয়ানদের সংখ্যা অগণিত, কিন্তু সব চেয়ে মজার কথা তারা সব জাতের। ধোপানী, গয়লানী, ময়রানী, মালিনী, মেথরানী কেউ বাদ ছিল না। ঠাকুমা যদিও সেকালের লোক, তিনি ছিলেন আশ্চর্য রকম উদার। হিন্দুদের রামায়ণ মহাভারত, মুসলমানদের গোলেবকাওলী, ক্রিশ্চানদের দু-চারটে গল্প ও দেশবিদেশের রূপকথা ছিল তাঁর ঝুলিতে। তাই তাঁর পাতানো বেয়ান বা মেয়ে নাতি-নাতনিদের মধ্যে মুসলমান ক্রিশ্চানও ছিলেন। বিনুর মায়ের শুচিবাতিক, তাই তাঁরা বড়ো একটা আসতেন না বিনুদের বাড়ি। কিন্তু বিনু তাঁদের বাড়ি মাঝে মাঝে যেত। মুরগির ডিম খেতে চাইলে যেতে হত পাঠান মাস্টারনীর বাড়ি। তিনি ছিলেন পিসিমা কি খুড়িমা। একদিন তিনি এক হিন্দু

ছাত্রের সঙ্গে অন্তর্ধান করেন। হালুয়া আসত এক মুসলমান হাকিমের বাড়ি থেকে। তিনি ছিলেন পাতানো ভগ্নীপতি। বিনুর মা অতটা পছন্দ না করলেও তাঁরও ছিলেন অনেকগুলি পাতানো ভাই-বোন বাপ-মা। বিনু তাঁদেব বাড়ি যেত। তাঁদেরও বিভিন্ন জাত। এমনি করে বিন্দু জাতিভেদে বিশ্বাস হারায়।

শ্রেণীভেদ

রাজবাড়িতে কতবার গেছে, রাজারা কেমন থাকতেন তাও অজানা ছিল না। আবার 'পাণ'দের পাড়ায়, 'শবর'দের পাড়ায় বেড়িয়েছে, তারা কেমন থাকত তাও তার জানা। সমাজের শ্রেণীবদ্ধ রূপ তার চোখে পড়েছিল, কিন্তু একালের মতো পীড়া দেয়নি। শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিচ্ছেদ ও বিরোধ এমন করে দৃষ্টি ছায়নি।

ঐ যে পাতানো সম্বন্ধের কথা বলেছি ও প্রথা যত দিন সজীব ছিল ততদিন উঁচু-নিচুর ব্যবধান সহ্য হয়েছিল। কিন্তু ওটা মৌখিক সম্বন্ধ। বোধহয় তাও নয়, এখন কেউ কারুর সঙ্গে মৌখিক সম্বন্ধও পাতায় না সহজে। মৌখিক সম্বন্ধের দ্বারা এত বড়ো একটা ব্যবধান চাপা পড়বার নয়। মুখোস খসেছে। তাই শ্রেণীসমস্যা আজকের দিনে মহাসমস্যা।

যে করেই এর সমাধান হোক, মানুষের সঙ্গে মানুষের সেই সম্প্রীতির স্মৃতি বিনুর মনে উজ্জ্বল রয়েছে ও রইবে। যাদের সঙ্গে তার স্বার্থের সম্পর্ক ছিল না, তার পিতামাতার স্বার্থের সম্পর্ক ছিল না, তারা মুখের সম্বন্ধকেও সত্য সম্বন্ধ বলে তাকে একদিন বিশ্বাস করতে দিয়েছিল। বিশুদ্ধ স্নেহ প্রীতি ভালোবাসা তার বরাতে জুটেছিল সমাজের অসম স্তরে। এখনকার দিনে এটা স্বপ্ন। তখনকার দিনে কিন্তু বাস্তব। একজনের জীবনে এককালে যা বাস্তব হয়েছে তা সর্বজনের জীবনে সর্বকালে বাস্তব হবে না কেন, যদি তার মধ্যে সত্য থাকে?

কবি তো সামাজিক সমস্যার সমাধান করতে জন্মায় না, সে কাজ অন্যের। কবি যা দেখে তা যদি সত্য হয়ে থাকে তবে তার জীবনে তো সত্য। সে যদি সকলের প্রতিনিধি হয়ে থাকে তবে সকলের জীবনেও সত্য। যদি সব কালের প্রতিনিধি হয়ে থাকে তবে সব কালের জীবনেও সত্য। বিনু আজ বড়ো হয়েছে বলে তার ছোটবেলার বিশ্বাস হারাবে না। বিশ্বাস হারানো যে বিশ্বাসঘাতকতা। তার পাতানো মাসিপিসি ভাইবোন মিতাদের প্রতি।

কবিরা যদি এই বিশ্বাস নিয়ে বাঁচে, মানুষ বাঁচবে। আর সাহিত্য যদি অবিশ্বাসীদের হাতে পড়ে তবে শ্রেণীসংঘাতের বিষফোঁড়া সমাজের সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করে সাহিত্যেও সংক্রামিত হবে। হচ্ছেও।

ঐতিহ্য

বিনু যদি কোনোদিন লেখাপড়া না শিখত, পেয়ারা গাছে বসে সারাদিন কাটাত, পুকুরের জলে দিনের বেলা সাঁতার কেটে সন্ধ্যা বেলা আবার ঝাঁপ দিত, তাহলেও রামায়ণ মহাভারত ও বৈষ্ণব কবিতা তাকে ভারতের অন্তরাত্মার সঙ্গে সংযুক্ত রাখত। কবিকঙ্কণ চণ্ডীও। তার ঠাকুমা তাকে মুখে মুখে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী বলেছিলেন, মোটামুটি নয়, পুঙ্খানুপুঙ্খ

রূপে। বই পড়ে সে তার বেশি শেখেনি। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর গল্প দুটিও সে তাঁর মুখে শুনেছিল। বাড়িতে চণ্ডী পড়া হত সুর করে। বিনু প্রথমে ছিল শ্রোতা, পরে হল পাঠক। আর বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী তো কীর্তনের সময় তার কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশেছিল। সেও হত দোহার। থিয়েটার, যাত্রা ও কথকতা তাকে প্রাচীন সংস্কৃতি সম্বন্ধে সজ্ঞান করেছিল। বিনা অধ্যয়নে।

এর প্রভাব তার জীবনব্যাপী। অতীতের সম্মোহন তাকে স্বকালের প্রতি অচেতন করেনি, সে অতীত বলতে অজ্ঞান নয়, বরং অতীতের ভুলভ্রান্তির জন্যে বর্তমান ভারতের এ দশা, এ কথা সে উচ্চকণ্ঠে জানায়। নির্মমভাবে সমালোচনা করে। কিন্তু গঙ্গোত্রীর সঙ্গে সম্বন্ধ ছেদ করলে প্রাণগঙ্গা শুকিয়ে যাবে, দেশ থাকবে বটে, কিন্তু দেশের মাটিতে রস থাকবে না। যে দেশের অতীত নেই, তার ভবিষ্যৎ নেই। অতীত নেই মানে অতীতের সঙ্গে যোগসূত্রও নেই। ভবিষ্যৎ নেই মানে নব নব উন্মেষশালিনী সংস্কৃতি নেই। মিশরের যা হয়েছে।

যোগসূত্র ছিন্ন করা চলবে না। দেশের যেসব সন্তান ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাঁদের প্রাণে এই ছেদচেতনা রয়েছে বলেই তাঁদের কাছ থেকে তেমন কোনো সৃষ্টি পাওয়া যাচ্ছে না। যাঁরা ইসাই হয়েছেন তাঁরা কিন্তু সূত্রচ্ছেদ করেননি। তাই 'মেঘনাদ বধ' সম্ভব হয়েছে। বিনুর জীবনে বিভিন্ন ধর্মমতের সংমিশ্রণ ঘটেছে, বিদেশের সঙ্গেও তার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কিন্তু তার স্বদেশের ঐতিহ্য থেকে, চার-পাঁচ হাজার বছরের ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা থেকে, ততোধিক পুরাতন শিকড় থেকে সে তার আপনাকে বিচ্ছিন্ন বা বঞ্চিত করেনি। ভারতের কবি-পরম্পরায় বিনুও একটি মুক্তা। এক সূত্রে গাঁথা।

স্বকাল

কিন্তু কবি হল সে কবে! কবিকে আড়াল করে দাঁড়াল সাংবাদিক। তার সাংবাদিক হতে চাওয়ার হেতু তার স্বকালের প্রতি টান। অক্ষর-পরিচয় হতে না হতেই তার হাতে পড়ল খবরের কাগজ। তার কাছে দূত পাঠাল বর্তমান কাল। শেষে এমন হল যে সে নিজেই দূত হতে চাইল। সাংবাদিক হচ্ছে বার্তাবহ। যে বার্তা সে বহন করে সে বার্তা যুগের। বার্তাবহের সেইজন্যে দেশবিদেশ নেই, যদি থাকে তো আকস্মিক। না থাকলেও চলত। কিন্তু কালবোধ আছে। না থাকলে চলত না।

বিনুর কালবোধ তার দেশবোধকে একেবারে ঢেকে না রাখলেও ধীরে ধীরে ঢাকছিল মেঘ যেমন করে আকাশকে ঢাকে। দিন রাত আমেরিকার কথা ভাবতে ভাবতে সে হয়তো কিছু দেশবিমুখ হয়েছিল। তাই অমৃতসর তার প্রাণে সাড়া তোলেনি ও অসহযোগের প্রস্তাব তার কাছে সংকীর্ণচিত্ততার পরিচয় বয়ে এনেছিল। কিন্তু দেশ যখন ক্রমে ক্রমে আগুন হয়ে উঠল তখন আগুনের আঁচ লাগল তার গায়েও। সে অসহযোগ করবে স্থির করল। পরীক্ষাটা নামমাত্র দিল, ফল খারাপ হবে জানত, এবং খারাপ হলেও কোনো ক্ষতি ছিল না, কারণ কলেজে যেতে তার রুচি ছিল না। অথচ জেলে যেতেও মতি ছিল না।

তারপর সাংবাদিক হবার জন্যে সে রওনা হল কলকাতায়। সেখান থেকে একদিন সুযোগ বুঝে আমেরিকা পাড়ি দেবে এই ছিল অভিপ্রায়। কিন্তু জাহাজের চেহারা দেখে তার

মুখ শুকিয়ে গেল। এ জাহাজে গঙ্গা পারাপার করতে ভরসা হয় না, কালাপানি পারাপার করবে! জাহাজের চেহারা দেখে যেমন বিনুর মুখ গেল শুকিয়ে, তেমনি বিনুর চেহারা দেখে সম্পাদকদের। তাঁরা যখন শুনলেন যে ও ছেলে ইংরেজি বাংলা দুটো ভাষাতেই লায়েক, সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখতে চায়, তখন কিছুক্ষণ মাথায় হাত দিয়ে ভাবলেন। তারপর একজন বললেন, তুমি আপাতত তর্জমা করো। অপর জন বললেন, প্রুফ সংশোধন করো। একজনও একটা "যৎকিঞ্চিৎ" লিখতে দিলেন না দেখে বিনু অবাক হল। দিন কতক পরে তার শরীর বেঁকে বসল, আর সহকারী গোছের এক ভদ্রলোক পরামর্শ দিলেন, আগে গ্রাজুয়েট হও, তার পরে এলাইনে আসতে চাও এসো। কথাটা বিনুর মনে বাজল। কিন্তু বাড়ি ফিরে সেরে উঠে কলেজেই ঢুকল সে।

এ.ই.

শরীর অন্তরায় না হলে বিনু বোধহয় একূল ওকূল দুকূল হারাত। না হত তার আটলান্টিকের পশ্চিম কূলে যাওয়া, অর্থাৎ আমেরিকায়। না হত আটলান্টিকের পুব কূলে, অর্থাৎ ইংলন্ডে। যেদিন কলেজে ঢুকল ঘাড় হেঁট করে সেদিন জানত না যে নিয়তি তাকে এক কূল থেকে ফিরিয়ে দিল আর এক কূলে টানতে।

কলেজে ঢুকলেও বিনুর সংকল্প অটুট রইল। সে গ্রাজুয়েট হয়ে খবরের কাগজের আপিসে কাজ করবে, সেই তার পেশা। এবং নেশা। যেখানে যত পত্রিকা পায় পড়ে, মনে মনে লিখতে শেখে। হাতে কলমেও একটু আধটু লিখত। কিন্তু ছাপতে দিত না।

ক্রমে তার আদর্শ হয়ে উঠলেন আইরিশ কবি ও সম্পাদক জর্জ রাসেল। তাঁর ছদ্ম নাম এ.ই.। তাঁর একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল, তাতে তিনি লিখতেন চাষি গয়লা তাঁতী কামার প্রভৃতির দরকারী কথা। কী করে ফসল বাড়ানো যায়, পোকামাকড়ের উৎপাত থেকে বাঁচানো যায়, কী করে সমবায় পদ্ধতিতে কেনাবেচা করতে হয়, দালালকে বাদ দিতে হয়, উৎপাদন ও বিনিময়ের ব্যবস্থা কেমন করে ধনশক্তির হাত থেকে জনশক্তির হাতে আসবে, অথচ হানাহানি বাধবে না।

তাঁর স্বদেশের কো-অপারেটিভ মুভমেন্ট ছিল তাঁর জীবন। তাঁর সম্পাদনা ছিল জীবনব্রতের উদ্‌যাপন। তেমন কোনো জীবনব্রত যার নেই সে যদি সম্পাদনা করে তো সংসার চালানোর জন্যে। বিনুর সংসারী হতে ইচ্ছা ছিল না। বিবাহের উপর তার বিরাগ জন্মিয়েছিল। অথচ প্রণয়ের উপর ছিল পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা। সে ভালোবাসবে, কিন্তু বিয়ে করবে না, বাঁধা পড়বে না। ভালোবাসার ফলে যদি সন্তান হয় তার দায়িত্ব নেবে সমাজ। সমাজকে তার জন্যে ঢেলে সাজাতে হবে। সমাজসংস্কার হবে বিনুর অন্যতম ব্রত। তা ছাড়া, দেশ উদ্ধার তো রয়েছেই। আমেরিকা যদি যায় তো ভারতের স্বাধীনতার জন্যে প্রচারকার্য চালাবে।

নিজের কলমের উপর তার আস্থা ছিল, কিন্তু সে কলম সাহিত্যিকের নয়, সেবকের তথা সংস্কারকের। তখনো তার অন্তরে রসের উপচয় হয়নি। সে আবিষ্কার করেনি সে রসিক, সে কবি।

গান্ধীজী

যীশু জন্মগ্রহণ করবেন জানতে পেরে কয়েকজন জ্ঞানী তাঁর জন্মস্থানে যাত্রা করেছিলেন নবজাতককে দর্শন করতে। দর্শন করে তাঁদের সন্দেহ জন্মাল। এ কি জন্ম! না এ মৃত্যু! প্রত্যাবর্তনের পরে তাঁদের মনোভাব কেমন হল তা টি.এস.এলিয়ট থেকে উদ্ধার করি।

"...I had seen birth and death,
But had thought they were different; this Birth was
Hard and bitter agony for us, like Death, our death,
We returned to our places, these Kingdoms,
But no longer at ease here, in the old dispensation,
With an alien people clutching their gods."

ভারতের রাজনৈতিক আস্তাবলে গান্ধীজী যখন ভূমিষ্ঠ হলেন তখনকার দিনের জ্ঞানীরা বড়ো আশা করে হতাশ হলেন। ছোট হরফের 'গড'গুলির নাম আধুনিক সভ্যতা, অতিকায় যন্ত্রপাতি, পার্লামেন্টারি শাসন, সশস্ত্র বিপ্লব, যেন তেন প্রকারেণ উদ্দেশ্যসিদ্ধি, প্রয়োজন হলে অসত্যাচরণ। বড়ো 'গড'টির নাম স্বরাজ। গান্ধীজীকে তাঁরা বরণ করেছিলেন স্বরাজের খাতিরে। তা বলে তাঁরা মিলের কাপড় ছেড়ে চরকার সূতোর খদ্দর পরবেন কোন্ দুঃখে! কাউন্সিল য়্যাসেম্বলীর মায়া কাটাবেন কত দিন! হানাহানি না করলে তাঁদের পৌরুষ ক্লীবত্ব পাবে যে! উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে অহিংস উপায় মেনে নিলেও সেই উপায় যে একমাত্র বা অব্যর্থ এ বিশ্বাস তাঁরা পোষণ করবেন কোন্ যুক্তিতে? সত্যের উপর এতখানি জোর দিলে সাধু সন্ন্যাসী হওয়া উচিত, কর্মক্ষেত্রে ওসব চলবে কেন! আর আধুনিক সভ্যতা! আহা! স্বরাজ চাই বলে দু'শ বছর পেছিয়ে যাব!

জ্ঞানীদের জীবন থেকে সোয়াস্তি চলে গেল কিন্তু। বিনুর জীবন থেকেও। গান্ধীজী যে ক্ষণজন্মা পুরুষ সে বিষয়ে তার সন্দেহ ছিল না, কিন্তু তাঁর জন্ম যে একটা যুগের মৃত্যু, শুধু বৈদেশিক শাসনের নয়, সেটাও তো প্রত্যক্ষ। বিনু বিষম দোটানায় পড়ল। গান্ধীজীর 'হিন্দ্ স্বরাজ' তাকে চমৎকৃত করল। সেও হাড়ে হাড়ে নৈরাজ্যবাদী। কোনো রকম শাসন তার সয় না। নিয়ম যদি মানতে হয় তবে তা অন্তরের নিয়ম। অথচ গান্ধীজীর কথায় দুশ বছর পেছিয়ে যেতে সে একেবারেই নারাজ ছিল। না হয় নাই হল স্বরাজ।

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ নাইট উপাধি পরিত্যাগ করে প্রমাণ করেছিলেন যে তিনি তাঁর দেশের অসম্মান অসহায়ের মতো অবলোকন করবার পাত্র নন। সুতরাং তিনিই যখন গান্ধীজীর অসহযোগ নীতির প্রতিবাদী হলেন তখন বিনুর মতো অনেকের একটা জবাবদিহি জুটল। নইলে কলেজে পড়ার কলঙ্ক কপালে জ্বলজ্বল করত। বিনু ইতিমধ্যে কবির পক্ষপাতী হয়ে উঠেছিল, এখন থেকে গোঁড়া রবীন্দ্রপন্থী হল। যাকে বলে অন্ধ ভক্ত। ওদিকে গান্ধীজীর সম্বন্ধে তার একটা দুর্বলতা ছিল। বোধহয় 'হিন্দ্ স্বরাজ'-এর প্রভাবে। তাই মোটা ভারী খদ্দরের বাহন হল। তার নিজের চেয়ে তার পোশাকের ওজন বেশি। এদিকে রবীন্দ্রনাথের অনুসারক কি-না। তাই ওগুলোকে রাঙিয়ে নিল নানা রঙে। এমন ডগডগে রং যে এক

ক্রোশ দূর থেকে ষাঁড় তাড়া করে আসে। জন বুল নয়, জনতার চক্ষু। তখনকার দিনে রঙের দোষ ছিল ওই।

যদিও সে কবির প্রায় সব রচনাই পড়েছিল, পড়ে মুগ্ধ হয়েছিল, তবু তাঁর সঙ্গে তার সম্বন্ধ ঠিক সাহিত্যঘটিত ছিল না। ছিল ধর্মবিশ্বাসজনিত। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন উপনিষদের ঋষি, আর বিনু ছিল জীবনজিজ্ঞাসু। তার জীবনজিজ্ঞাসার উত্তর গান্ধীজীর মুখে ছিল না, ছিল রবীন্দ্রনাথের মুখে। তিনি বিনুর মতো জিজ্ঞাসুদের ডাক দিয়ে যেন বলতেন, শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

মৃত্যুকে অতিক্রম করার কথা তার মনে এল মাতৃবিয়োগের পর থেকে। তার এত বড়ো শোকে শান্তি দিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য', 'খেয়া', 'গীতাঞ্জলি'। এগুলি সে সাহিত্য হিসাবে পড়েনি, কাব্য কি-না বিচার করেনি। বাণীর জন্যে পড়েছে, অমৃতের সন্ধান পেয়েছে। "তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যতদূর আমি যাই—কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু কোথা বিচ্ছেদ নাই।" এসব তো পড়ে-পাওয়া তত্ত্ব নয়, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি। যিনি উপলব্ধি করেছেন তিনিই তো ঋষি, সত্যদ্রষ্টা। বিনু তাঁকে অভ্রান্ত বলে ধরে নিল। সেই জন্যে তিনি যখন গান্ধীজীর বিরুদ্ধে 'সত্যের আহ্বান' লিখলেন তখন বিনুর প্রত্যয় হল যে মনের মতো জবাবদিহি মিলেছে।

অমরত্ব

পুঁথিতে যেমন এক অধ্যায় সারা না হলে আর এক অধ্যায় শুরু হয় না, জীবনে তেমন নয়। জীবনে এক সঙ্গে তিন-চার অধ্যায় চলে। বিনুর জীবনে যখন সাংবাদিকতার চন্দ্রগ্রহণ তখন সাহিত্যের আলো এক দম নিবে যায়নি, অবচেতনায় অবস্থান করছে। সে যদি মরে তবে তার আত্মা অমর হবে, কিন্তু তাই যদি যথেষ্ট হত মৈত্রেয়ী কেন প্রশ্ন করতেন, যেনাহং নামৃত্যাস্যাং কিমহং তেন কুর্যাম? অতএব আত্মার অমরত্ব যদিও ধ্রুব তা হলেও আর এক অমরত্ব আছে, তার সাধনা করতে হবে। বিনা সাধনায় যা পাবার তা তো পাবই, সাধনা করে যা পাবার তা যেন অর্জন করি।

সে যখন মরে যাবে তখন কি এমন কিছু রেখে যাবে না যা অমর? যা অমর হয়েছে বিশেষ কোনো অনুভূতির বা উপলব্ধির দৌলতে? যা মানবজীবনের চরম অনুভূতির বাঙ্ময় প্রকাশ? রবীন্দ্রনাথের কথাই ধরা যাক। তিনি অমর, যে অর্থে মানবাত্মা অমর। উপরন্তু অমর, যে অর্থে তাঁর বাণী অমর, সৃষ্টি অমর। বিনু কি তাঁরই মতো সৃষ্টি করে যাবে না কিছু যাতে বিনুকেও অমর করে রাখবে? যে অমরত্ব সৃষ্টিসাপেক্ষ তার জন্যে বিনুর অন্তরে একটা আকুলতা জাত হল। আমি বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই আমার কীর্তির মধ্যে। "মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"

সে সৃষ্টি করবে। কী সৃষ্টি করবে? করতে চাইলেই কি অমনি হয়? পুঁজি লাগে না? কোথায় তার পুঁজি? দেখল, সে যা উপলব্ধি করেছে তাই তার পুঁজি, কিন্তু তা কতটুকু! পুঁজি বাড়ানো দরকার। বই কাগজ পড়ে পুঁজি বাড়ে না। বাড়ে ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়লে। পথের দু ধারে ছড়ানো রয়েছে কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা। দু হাতে তুলে নিলে পুঁজির অভাব

হয় না। দশখানা বই পড়ে একখানা বই লিখতে সবাই পারে। কিন্তু সে বই সবাই পড়ে না। লেখকের আগেই তার লেখার বিলোপ ঘটে। বাকী যা থাকে তা যাদুঘরের কঙ্কাল। তেমন ভাগ্য কে চায়! বিনু চায় তার লেখা জীবনে চিরজীবী হবে, যাদুঘরে নয়। সাধারণের যাদুঘরে নয়, প্রতি জনের জীবনে। তার আবেদন নিত্যকালের প্রতিটি পাঠকের প্রতি। তার আয়োজনও তদনুরূপ হবে।

খাঁচার পাখি

কলেজের ছ বছর সে খাঁচার পাখির মতো কাটিয়েছে বনের পাখির ব্যাকুলতা নিয়ে। কলেজকে সে কোনোদিন ক্ষমা করতে পারেনি, করবে না। প্রথম যৌবনের ছ'টি বছর যেন ছ'টি যুগ। যৌবন এত অফুরন্ত নয় যে এই নিদারুণ অপচয় সইবে। এর কোনো ক্ষতিপূরণ নেই, এটা নিতান্তই ক্ষতি। তবে লোকসান না পোষালেও মানুষ একেবারে মারা যায় না, বেঁচে থাকলে সামলে নেয়। সেও এক কথা। তাছাড়া, লোকসানের মধ্যেও সান্ত্বনার বিষয় একটু-আধটু থাকে বই-কি। এও এক কথা।

বিনুর সান্ত্বনা, সে পেয়েছিল জনকয়েক অসাধারণ বন্ধু। জীবনে বন্ধুভাগ্য মহাভাগ্য। তাই কলেজ তার অসহনীয় লাগেনি। লেগেছিল শেষের দিকে যখন দয়িতাভাগ্য এসে সব সান্ত্বনা কেড়ে নিল।

অপর সান্ত্বনা, রাশি রাশি বিদেশী গ্রন্থ অধ্যয়নের সুযোগ। ইউরোপের ইতিহাস এই সময় তার প্রিয়পাঠ্য হয়। তার থেকে ইউরোপ হল প্রিয় প্রবাস। ইউরোপীয় সাহিত্য তাকে উন্মনা করল। ইউরোপের জীবন কত বিচিত্র আর ভারতের জীবন কী একঘেয়ে! এও এক কারণ। আরো এক কারণ, ইউরোপীয় সাহিত্যে দেশকাল নিরপেক্ষ বহু মহৎ সৃষ্টি আছে। বিনু যদি সৃষ্টি করে তো বিনুর সৃষ্টি তাদের সমান হওয়া চাই। তার রচনার আদর্শ যেন তাদের চেয়ে খর্ব না হয়।

কিন্তু অতটা সে একদিনে ভাবেনি। সাংবাদিকতা তাকে আচ্ছন্ন করেছিল অতি দীর্ঘকাল। তার পরে এল সমাজসংস্কারের সংকল্প। সমাজ ভাঙা-গড়ার স্বপ্ন। বিশুদ্ধ সাহিত্যে পৌঁছতে বোধ হয় পুরো দু-বছরই লেগেছে। গোড়ার দিকে ইবসেন, বার্নার্ড শ, বারট্রান্ড রাসেল, এইচ. জি. ওয়েল্‌স্‌, এঁরাই ছিলেন তার প্রিয় লেখক বিদেশীদের মধ্যে। অনুরূপ কারণে শরৎচন্দ্র ও সত্যেন্দ্রনাথ স্বদেশীদের মধ্যে। বঙ্কিমচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালকে সে শৈশবে আবিষ্কার করেছিল, অলক্ষে অতিক্রম করছিল। শরৎচন্দ্র ও সত্যেন্দ্রনাথ কখন এক সময় তাঁদের চেয়েও প্রিয় হয়ে উঠলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর চেয়ে নয়। টলস্টয় ও রম্যাঁ রলাঁর চেয়ে নয়। ডস্টয়েভ্‌স্কি ও বালজাকের চেয়ে নয়। শেলী ব্রাউনিং ও শেক্সপীয়রের চেয়ে নয়। পরবর্তী বয়সের আবিষ্কার গ্যেটের চেয়ে নয়। চেখভের চেয়ে নয়।

পোষা প্রাণী

সে নিজে খাঁচার পাখি বলে তার স্বাভাবিক সহানুভূতি ছিল যেখানে যত খাঁচার পাখি তাদের সকলের প্রতি। মেয়েরাও খাঁচার পাখি। খাঁচার পাখিও বটে, পোষা প্রাণীও বটে। কেবল যে

অবরোধ প্রথা আছে বলে বন্দিনী তা নয়, তারা পরনির্ভর, তাদের স্বতন্ত্র জীবিকা নেই। যেখানে স্বতন্ত্র জীবিকা আছে, যেমন নিচের স্তরে, সেখানেও তারা পুরুষের পোষ-মানা প্রাণী। বনের পাখি নয়। কোনো স্তরেই তাদের স্বভাবে বন্যতা নেই। এমন কি, সমাজের বাইরে যাদের স্থিতি তারাও পুরুষের পণ্য হয়ে ধন্য, তাদের আর্থিক স্বাধীনতা তত দিন পুরুষের নেক নজর যত দিন।

নারীর জন্যে সে যা চেয়েছিল তা বনের পাখির বন্যতা। নিজের জন্যেও তাই চেয়েছিল। মেয়েরা কলেজে পড়বে কি আপিস করবে, এটা অবশ্য নগণ্য দাবি নয়, কিন্তু এতে কি তাদের জীবন ভরবে! এতে কি আছে পথে বেরিয়ে পড়ার সুখ! পথের ঝড় বৃষ্টি ধুলো! বজ্রপাত বা সর্পাঘাত! এও তার সেই নিরাপদ প্রাণধারণ যার জন্যে নারী বিকিয়ে দিয়েছে তার বন্যতা। হতে পারে এর নাম নরনারীর সমানাধিকার। যারা সাম্য চায় তাদের এই লক্ষ্য। কিন্তু সাম্য তো অনেক সময় জেল কয়েদীর সাম্য। তেমন সাম্য কি কারো কাম্য!

বিনু যদিও ফেমিনিস্ট বলে নিজের পরিচয় দিল, এক প্রোফেসারের ইংরেজি পদ্যের পাল্টা ইংরেজি পদ্য লিখে ছাপাল, তবু তার ফেমিনিজম নরনারীর সমানাধিকারে আবদ্ধ ছিল না, সমান স্বাধীনতার আকাশে ডানা মেলত। এ কথা একবার একটি বাংলা প্রবন্ধে বোঝাতে গেল মাসিকপত্রে। সম্পাদক ছাপলেন। কিন্তু প্রতিবাদ এল মহিলাদেরই তরফ থেকে। তাঁরা যে মহিলা। এর পরে বিনু হৃদয়ঙ্গম করল যে মেয়েরা সত্যিকার স্বাধীনতার জন্যে প্রস্তুত নয়। পুরুষরাও নয়। সত্যিকার স্বাধীনতা আসবে সমাজের আমূল পরিবর্তনের সঙ্গে। মানুষের কাছে যখন জীবন যৌবনের অপচয় অসহনীয় হবে, যখন পোষ-মানা প্রাণ রাখা না রাখা এক হবে, তখন চোখের সুমুখে ঝিকিয়ে উঠবে পথ। পথেও নরনারীর সমান অধিকার।

দোরোখা নীতি

সমাজের আমূল পরিবর্তন কবে হবে, তার জন্যে সংস্কারক অপেক্ষা করতে পারে না। বিনুর মধ্যে যে সংস্কারক ছিল সে সংস্কারমুক্তির জন্যে কলম ধরল। এত দিনে একটা ব্রত পাওয়া গেল যার জন্যে জীবনপাত করা চলে।

তার নিজের সংস্কারগুলো একে একে কাটল। বিধবাবিবাহকে সে ভয় করত। ভয় ভাঙল। বিবাহবিচ্ছেদকে ঘৃণা করত। ঘৃণা ঘুচল। বিবাহ প্রথাটাকে শাশ্বত ভাবত। কোনো প্রথাই শাশ্বত নয়। যার উদ্‌ভব হয়েছে তার বিলয়ও হবে, নিশ্চিত জানল। সতীত্বকে স্বর্গীয় মনে করত। দেখল ওর মধ্যে সাড়ে পনেরো আনা বাধ্যতা ও দাস্য। যেটুকু স্বেচ্ছা সেইটুকুই মূল্যবান। বিবাহপ্রথার বিলয় হলেও সেটুকু থাকবে। বরং তখনি মর্যাদা প্রতিপন্ন হবে।

তার পর হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করল যে নারীর এক বার পদস্খলন হলে সে যাবজ্জীবন পতিতা, অথচ পুরুষের পতন নেই এক দিনও। স্ত্রী থাকতে স্বামী অকারণে আবার বিয়ে করে, কিন্তু স্বামী থাকতে—এমন কি, স্বামীর মৃত্যুর পরেও—স্ত্রী সকারণে আবার বিয়ে করতে পারে না। বিধবার তবু আইনের বাধা নেই, পতিপরিত্যক্তার সে দিকেও বাধা। নির্যাতিতার দৈব সখা, মানুষ তার শরীরের কষ্ট লাঘব করতে পারে, কিন্তু মনের ওষুধ জানে না, জানলেও কিছু করবে না। রবীন্দ্রনাথের নারীচরিত্রের দশা দেখে কবির প্রতি

তার অভিযোগের ভাব এল, ঠিক একই কারণে শরৎচন্দ্রের প্রতি মাথার পাগড়ি খুলে পায়ে রাখার ভাব। ইবসেনের প্রতিও। ইবসেনই তো নাটের গুরু।

এই দোরোখা নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ইবসেনকে মহিমান্বিত করেছিল, শরৎচন্দ্রকেও। বিনুরও মনে হল তার কাজ বিদ্রোহ করে যাওয়া, ফল কতটুকু হবে তা ভেবে দেখবার সময় নেই। এমনি করে সাহিত্যের দিকে তার লেখনীর গতি। নিছক সাংবাদিকতায় অতৃপ্তি। একটা ঠেলা, একটা গরজ তাকে চালিয়ে নিল কথকতার আসরে। তার অন্তিম লক্ষ্য স্বাধীন জীবন, স্বাধীন যৌবন। নরনারী উভয়ের। আপাত লক্ষ্য সংস্কারমুক্তি। দোরোখা নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

কর্তব্য

বিনুর স্বভাবটা আয়েসী। সে আয়াস স্বীকার করতে চায় না। তার ভালো লাগে পায়চারি করতে, পায়চারি করতে করতে সে ভাবে। ভালো লাগে শুয়ে থাকতে, শুয়ে শুয়ে সে স্বপ্ন দেখে, কিংবা পড়ে। কিন্তু ভালো লাগে না বসতে। বসতে ভালো লাগে না বলে তার ভালো করে খাওয়া হয় না, গল্প করা হয় না, হয় না চিঠি লেখা। এমন যে বিনু সে কোন্ দুঃখে সাহিত্য লিখতে বসে। একটা গরজ, একটা ঠেলা না থাকলে সে লিখতে বসত না, বসলেও উঠে পালাত।

বিশ বছরের বিনুকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করত, কেন লিখবে, তবে উত্তর পেত, কর্তব্য। নামের নেশা আদৌ ছিল না বললে সত্যের অপলাপ হবে, কিন্তু নামের জন্যে আয়াস স্বীকার করা অন্য কথা। কর্তব্য অবশ্য সামাজিক বা মানবিক। তেমন করে যে সাহিত্যসৃষ্টি হয় না এ কথা বেশ বুঝলেও তার ঝোঁক ছিল সাহিত্যসৃষ্টির উপর নয়, সমাজসংস্কারের উপর, সংস্কারমুক্তির উপর। মানুষের কতকগুলো বদ্ধমূল সংস্কার সে ভেঙে চুরমার করবে, মানুষ যেসব প্রথাকে বিশ্বাসকে আচারকে এত কাল মূল্য দিয়ে এসেছে সেসব যে মূল্যহীন তা হাতে কলমে প্রমাণ করবে। এর জন্যে যদি উপন্যাস লিখতে হয় তাও সই। কালাপাহাড়ির জন্যেই কলম ধরা, কষ্ট করে বসা। তবে বিনুর কালাপাহাড়ি বিশুদ্ধ ভাঙন নয়। সংস্কারকেরা ভাঙে বটে, কিন্তু নদীর মতো এক কূল ভাঙে আর এক কূল গড়তে। কী করে গড়তে হয় তাও জানে। কী গড়তে হয় তাও। নব-সমাজের স্বপ্ন দেখা বিনুর দ্বিতীয় প্রকৃতি হয়েছিল। ওমর খৈয়ামের মতো সে তার কল্পসহচারীকে বলত—

"Ah, Love could thou and I with Fate conspire
To grasp this sorry Scheme of Things entire,
Would not we shatter it to bits–and then
Re-mould it nearer to the Heart's Desire!"

একটু একটু করে অলক্ষিতে বিনুর ঐতিহ্যপ্রীতি শিথিল হয়ে এল। নিজেকে সে হিন্দু বলতেও দ্বিধা বোধ করল এবং ভারতীয় বলতেও কুণ্ঠিত হল। কী তবে সে? যার কোনো লেবেল নেই। নিশ্চিহ্নিত মানুষ।

স্টাইল

কেন লিখবে, এ প্রশ্নের উত্তর, কর্তব্য। কিন্তু আর একটি প্রশ্ন ছিল। কেমন করে লিখবে? এর উত্তর, যেমন তেমন করে নয়। লেখার স্টাইল বা শৈলী সম্বন্ধে বিনু বরাবরই খুঁতখুঁতে। বিষয়ের উপর পরের ফরমাশ খাটে, পরীক্ষকদের মর্জি। কিন্তু বিন্যাসের উপর বিনুর নিজের রুচি। আপ রুচি খানা, পর রুচি পরনা।

আয়েসী বিনু একান্ত আয়াসে তার স্টাইলটি সেধেছিল, কখনো মনে মনে, কখনো মুখে মুখে, কখনো লিখে লিখে। চিঠি লেখাও লেখা। সেই যে একটা কথা আছে, ঈশ্বরকে ডাকতে হয় মনে বনে ও কোণে, এও অনেকটা তাই। এ সাধনায় বিনু এক দিনও ঢিলে দেয়নি, আপস করেনি। পরীক্ষার কাগজেও সে তার স্টাইল ফলিয়েছে, সাজা পেয়েছে। আবার পুরস্কারও পেয়েছে। খবরের কাগজের জন্যেও সে যেমন তেমন করে লিখতে রাজি ছিল না, সমাজসংস্কারের উদ্দেশ্য নিয়ে লিখলেও তার লেখার ধরন তার স্বকীয়। স্টাইল তার ভালো কি মন্দ সে ভাবনা তার নয়। স্টাইল তার নিজের হলেই সে খুশি।

এর জন্যে তাকে অনেকের কাছে শিক্ষানবিশী করতে হয়েছে। প্রথমত বীরবলের কাছে, দ্বিতীয়ত রবীন্দ্রনাথের, তৃতীয়ত গান্ধীজীর। ইংরেজিতে বলে স্টাইলের নাম মানুষ বা স্টাইলটাই মানুষ। মানুষটাকে বাদ দিয়ে তার স্টাইলটুকু শেখা যেন চাঁদটাকে বাদ দিয়ে তার আলোটুকু দেখা। সেটা সম্ভবও নয়, সংগতও নয়। বিনু যাঁদের শাগরেদ হয়েছে তাঁদের স্টাইলের রূপ নিরীক্ষণ করে নিরস্ত হয়নি, রূপের তলে যে সত্তা, তার অনুসন্ধান করছে। সত্তার প্রভাব সত্তার উপর পড়ে যত দিন না স্বভাব সুনির্দিষ্ট হয়। আত্মস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রভাব কেটে যায়, তার আগে কাটিয়ে উঠতে চাওয়া যেন ঘাটে ভিড়বার আগে নৌকা থেকে লাফ দিতে যাওয়া।

শিক্ষানবিশীর একমাত্র উদ্দেশ্য আপনাকে চেনা। এক বার আপনাকে চিনলে তারপর আর অনুসরণ বা অনুকরণ নয়, আপনার পরিচয় দেওয়া, আত্মদান। তার আগে, অনুকরণ না হয় লজ্জাকর, অনুসরণেও যার শরম সে সাধক নয়।

কস্মৈ দেবায়

কেমন করে লিখবে, এর উত্তর, নিজের মতো করে। আরো একটি প্রশ্ন আছে, তখনো ছিল। কাদের জন্যে লিখবে? বীরবলের রচনা পড়লে মনে হয় তিনি রসিকদের জন্যে লেখেন, অরসিকের কাছে রসের নিবেদন করতে রাজি নন। সংসারে রসিক জন আর ক'জন! শিক্ষাবিস্তারের পরেও তাঁদের সংখ্যা ডজন ডজন বাড়বে না। বীরবল সকলের জন্যে লেখেন না, এই সিদ্ধান্তই সার। রবীন্দ্রনাথ? রবীন্দ্রনাথের সব রচনা সকলের জন্যে নয়, কতক রসিকদের, কতক খেয়ালীদের, কতক সাধকদের। কিন্তু প্রচুর সর্বসাধারণের।

কলেজে ভর্তি হবার আগে বিনু টলস্টয়কে আবিষ্কার করেছিল, সেই টলস্টয়কে যিনি দ্বিতীয় ধূম্রলোচনের মতো নিজের লেখার সমালোচনা করেছিলেন, 'সমর ও শান্তি', 'আনা কারেনিনা' প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কীর্তির জন্যে অনুতপ্ত হয়ে কৃষকদের জন্যে উপকথা রচেছিলেন। সাহিত্যের ইতিহাসে এর তুলনা নেই। সচরাচর আমরা আমাদের অপকীর্তিকেও মহাকীর্তি ভেবে আত্মহারা হই, অনুতাপ করা দূরে থাক, সন্তানস্নেহে অন্ধ হই। টলস্টয়ের বিন্দুমাত্র

মমতা ছিল না সেরা লেখার উপরেও, যেহেতু সেগুলি চাষি ও মজুরদের বিদ্যাবুদ্ধির অতীত। যেহেতু বারো বছরের ছেলেরা সেগুলি পড়ে বাহাত্তুরে বুড়োদের মতো ব্যথিত হবে না, মানুষকে ভাই বলে জড়িয়ে ধরে ক্ষমা করবে না। যেহেতু সেগুলি মুষ্টিমেয় শিক্ষিত, সভ্য, বিত্তবান ও অবসরবিহারী পরগাছাদের জন্যে। এটা অবশ্য টলস্টয়ের বাড়াবাড়ি। তিনি যখন যা করতেন চরম করতেন। যৌবনকে ভোগ করেছিলেন ভর্তৃহরির মতো, তাই উত্তর বয়সে পাপবোধটা কিছু প্রখর হয়েছিল তাঁর। পাপাচারীদের জন্যে লিখেছেন এ কথা মনে হলেই তিনি শাপ দিতেন নিজের লেখনীকে, ছাপা বইয়ের মুখ দেখতে চাইতেন না।

সে যাই হোক, বিনুও ক্রমে ক্রমে তাঁর সঙ্গে একমত হল যে সব চেয়ে সার্থক সৃষ্টির লক্ষ্য হবে জনসাধারণ বা পিপ্‌ল্‌। চাষি ও মজুর, মাঝি ও জেলে। তারা যদি বিদ্বান ও বিদগ্ধ হয় তো ভালোই, না হলেও ক্ষতি নেই, কেননা চোখের জল ও বুকের রক্ত দিয়ে যে কথা বলা হয় সে কথা সব মানুষের আঁতে ঘা দেয়, হোক না কেন যতই নির্বোধ বা নিরক্ষর। তা বলে আর সব রচনা যে অসার্থক, তা নয়। আর্ট নয়, তা নয়।

টলস্টয়

টলস্টয়ের কাছে বিনুর শিক্ষানবিশী স্টাইলের জন্যে নয়, স্টাইলকে অতিক্রম করার জন্যে। শিক্ষানবিশীর শুরু কবে, তা মনে নেই, সারা এখনো হয়নি। লেখকের জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন সে পাঠকের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চায়, মাঝখানে কোনো প্রাচীর রাখতে চায় না। অতি সূক্ষ্ম ব্যবধানও তাকে পীড়া দেয়। সাধকের মতো লেখকেরও শেষ কথা, শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ। তন্ময় হওয়ার আগে স্টাইল একটা সহায়, কিন্তু তন্ময় হওয়ার ক্ষণে স্টাইল একটা বাধা। কুঞ্জের দ্বার অবধি গিয়ে সখী বিদায় নেয়, নতুবা সে সখী নয়, সতীন।

টলস্টয়ের কিছুই গোপন নেই, তিনি কিছুই হাতে রাখেননি, যখনকার যা তখনকার তা পাঠকের হাতে সঁপে দিয়েছেন, জীবন-যৌবন পাপ-পুণ্য জ্ঞান-অজ্ঞান। পাঠকের সঙ্গে একাত্ম হতে চেয়েছেন, বোধ হয় পেরেছেনও। এর জন্যে তাঁকে অনেক ত্যাগ করতে হয়েছে। সাধকের মতো লেখকেরও শত্রু তার বিভূতি, তার অলঙ্কারের ঝঙ্কার, তার অহঙ্কারের টঙ্কার। ঈশ্বরের কাছে যে ঐশ্বর্য নিয়ে দাঁড়ায় সে কি তাঁর আলিঙ্গনের জন্যে জায়গা রেখেছে? সর্বাঙ্গে জড়োয়া ও কিংখাব। সেসব যে খুলে ফেলে দিয়েছে, তাদের আসক্তি কাটিয়েছে, সেই তো উত্তমা নায়িকা, উত্তম সাধক। তেমনি উত্তম লেখক। তার অন্তিম পাঠক সব মানুষের অন্তরাত্মা। "এই মানুষে আছে সেই মানুষ।" সেই মানুষের প্রেম পেতে হলে সব ছাড়তে হয়।

এ কেবল স্টাইলের বেলায়, তা নয়। টলস্টয় তাঁর মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বে গৃহত্যাগ করেছিলেন। জীবনের কাছে সত্যরক্ষার জন্যে তেমন সিদ্ধান্তের প্রয়োজন ছিল। যার জীবন সত্য নয় তার লিখন সত্য হবে কোন্ জাদুবলে? সমাজের চিন্তা থেকে কোনো এক সময় জীবনের চিন্তা বিনুকে পেয়ে বসল। সেখানেও টলস্টয় হলেন তার দৃষ্টান্ত। কী যে সার, কী যে অসার, এ সম্বন্ধে টলস্টয়ের সঙ্গে তার নির্ণয়ের সাদৃশ্য ছিল। কিন্তু যুবক টলস্টয়ের সঙ্গে। বর্ষীয়ানের সঙ্গে তার মতভেদই অধিক, কিন্তু সেও স্বীকার করে নিয়েছে সে সাযুজ্যেই মুক্তি। লেখকের মোক্ষ পাঠকের সঙ্গে সাযুজ্যে। পাঠক হচ্ছে দৃশ্যত 'পিপ্‌ল' বা জনগণ।

নেপথ্যে সব দেশের সব কালের পাঠকসত্তম। "সেই মানুষ।"

জীবনযাপন

কাদের জন্য লিখবে, এই প্রশ্নের উত্তর একজন এক ভাবে দেয়, আর একজন আর এক ভাবে। যে যেভাবে দেয় সে সেইভাবে জীবনযাপন করতে প্রস্তুত হয়। কেউ যদি বলে, চাষিদের জন্যে লিখব, তা হলে চাষিদের জীবনের সঙ্গে জীবন জড়ানোর আয়োজন করে। না করলে তার লেখায় চাষিদের জীবনের সুর বাজে না। তেমনি কেউ যদি বলে, মজুরদের জন্যে লিখব, তা হলে তাকে মজুরদের জীবনের সঙ্গে জীবনের গাঁটছড়া বাঁধতে হয়। না বাঁধলে তার লেখায় মজুরদের জীবনের সুর বাজে না।

জীবনযাপন করার উপর নির্ভর করে শেষ পর্যন্ত কার লেখা চাষিরা পড়বে, কার লেখা মজুরেরা। অবশ্য এমন হতে পারে যে লেখাপড়া শিখে চাষিরা আর চাষাড়ে থাকবে না, মজুরেরা গোঁয়ার। রাজ্য তাদের হলে তাদের চেহারা বদলে যাবে। কিন্তু যতদিন চাষিরা চাষ করবে, মজুরেরা গতর খাটাবে ততদিন তাদের জীবনের মূল সুর পালটানো শক্ত। সেইজন্যে তাদের জীবনের সুরের সঙ্গে সুর মেলানোর দরকার থেকে যাবে অনেক কাল। সমাজের সব স্তরের জীবন একাকার হতে ঢের দেরি, সোভিয়েট রাশিয়াতেও! সুতরাং লেখকদের জীবনযাপনের ধারা এক রকম হলে চলবে না। যে যাদের জন্যে লিখবে সে সেই অনুসারে বাঁচবে।

বিনুর সাধ যেত পথে বেরিয়ে পড়তে, সকলের সঙ্গে সব কিছু হতে। চাষির সঙ্গে চাষি, মাঝির সঙ্গে মাঝি, কাঠুরের সঙ্গে কাঠুরে, বাউলের সঙ্গে বাউল। এদের মধ্যে চাষির উপরেই ছিল তার পক্ষপাত টলস্টয়ের প্রভাবে। চাষি কিনা অক্ষয় বট, মাটিতে তার শিকড়। সকলের উচ্ছেদ হলেও চাষির হবে না। চাষির সঙ্গে চাষি হয়ে চাষানী বিয়ে করলে, মাটির প্রাণরহস্য আয়ত্ত করতে পারবে বিনু। যে সব উপলব্ধি এলিমেন্টাল, অর্থাৎ আদিতন, মৌল, সেসব যদি কোথাও সম্ভব তো কৃষকের জীবনে। বিশেষ করে চাষির কথা ভাবলেও সাধারণভাবে 'পিপ্‌ল'-এর কথা তাকে উন্মনা করত গান্ধী আন্দোলনের পর থেকে। তাজা ভাব ও তাজা ভাষা জনস্রোতে ভাসছে। ঝাঁপ না দিলে তাদের নাগাল পাওয়া যায় না। পুঁথির ভাষা ও পুঁথিগত ভাবের উপর তার অরুচি এসেছিল।

বাঁচোয়া

জীবনযাপনের ধারা বদলের জন্যে বিনু এক এক সময় অস্থির হয়ে ওঠে। কিন্তু যতদিন একা ছিল ততদিন বরং সেটা সম্ভব ছিল, এখন তার জীবন তার একার নয়। এ বড়ো আশ্চর্য যে তার জীবনের জন্যে জবাবদিহি তার একার, ভাবী কাল তাকে একক বলে ধরে নিয়ে বিচার করবে, অথচ সে তার একার অভিপ্রেত জীবনযাপন করতে গেলে একাধিকের অভিপ্রেত জীবন বিপর্যস্ত হবে। বিপর্যয় বলতে যে কতখানি বোঝায় ভাবী কাল তা ঠিক বুঝতে পারবে না। যতটুকু অনুমানে বোঝা যায় ততটুকু বুঝবে।

টলস্টয় তাঁর একার অভিপ্রায়ের সঙ্গে একাধিকের অভিপ্রায় মিলছে না দেখে অর্ধেক

জীবন তুষের আগুনে দগ্ধেছেন, মৃত্যু আসন্ন আন্দাজ করে আর ইতস্তত করেননি, একার জীবনযাপনের ধারায় ঝাঁপ দিয়েছেন। তাই মরে যাবার আগে তরে গেছেন। ওটুকু যদি না করতেন তা হলে চিরকালের মতো হেরে যেতেন। গান্ধীজীর মধ্যে ইতস্তত ভাব নেই, তিনি তাঁর অভীষ্টের জন্যে নিজে তো ভুগবেনই আরো পাঁচ জনকেও ভোগাবেন। ক্রমে তাঁর পরিজন বাড়তে বাড়তে পাঁচ জনের জায়গায় পাঁচ-দশ লাখ হয়েছে, একদিন হয়তো চল্লিশ কোটি হবে। তাদের সবাইকে টেনে নিয়ে যাবার মতো আত্মার জোর তাঁর আছে, কিন্তু বিনুর অত মনের জোর নেই যে আর পাঁচজনকে নিয়ে সত্যের পরীক্ষা করবে।

বাঁচোয়া এই যে কৃষক শুধু কৃষক নয়, মানুষও বটে। তাই রামায়ণ মহাভারত তাকে আনন্দ জোগায়, যদিও যাঁরা লিখেছেন তাঁরা কৃষকের সঙ্গে কৃষক হননি, কৃষক-জীবনের সুর শোনেননি, বাজাননি। কয়লার মজুর গয়লা নয়, তবু রাধাকৃষ্ণের লীলা তাকে রসের রসায়নে বৃন্দাবনের গোপগোপীর একজন করে। পদকর্তারাও গয়লার সঙ্গে গয়লা বনেননি। রসের রসায়নে এক হয়েছে। এই রকমই চলে আসছে এত কাল। জীবনযাপনের ধারা বদলানো অসাধ্য না হলেও দুঃসাধ্য। যাঁরা পেরেছেন তাঁরা নমস্য, যাঁরা পারেননি তাঁদের জীবন যে ব্যর্থ যায়নি তারও নজির আছে। বিনু যদি না পারে তা হলে যে তার রচনা বুর্জোয়াপাঠ্য হবে, প্রোলিটারিয়ানদের আনন্দ দেবে না, এমন নয়। বাঁচোয়া এই যে তারাও তারই মতো মানুষ।

শ্রেণীসাহিত্য

বিনু বারবার চেয়েছে সাহিত্যে মানবজীবনের সমগ্র রূপ দেখা দিক। সমগ্র সুর বেজে উঠুক। রাজারাজড়ার জীবন ঢের হয়েছে, অভিজাতদের জীবন যথেষ্ট হয়েছে, মধ্যবিত্তদের জীবন বলো জীবনের দৈন্য বলো তাও হয়েছে বিস্তর। আরো তো মানুষ আছে, তাদেরও তো রূপ আছে, সুর আছে, সুধা আছে। তাদের পরিচয় না নিলে, সাহিত্যে না দিলে, তারা হয়তো বঞ্চিত হবে না, কেন-না পড়ার জন্যে তাদের তাড়া নেই। কিন্তু আমরা তো বঞ্চিত হব, আমরা যারা পড়তে শিখেছি, পড়ে শিখি। আমাদের লেখকরা কেন আমাদের বঞ্চিত করে রাখবেন? কেনই বা সমগ্র জীবনের স্বাদ পাবেন না, পাওয়াবেন না? রামায়ণ মহাভারতের যুগে না হয় এর একটা কৈফিয়ৎ ছিল, তখন এত বড়ো পাঠক সম্প্রদায় ছিল না। এ যুগে তেমন কোনো কৈফিয়ৎ আছে কি?

নেই। কিন্তু খোঁজ নিলে দেখা যাবে, লেখকদের জীবনযাপনের ধারা সংকীর্ণ ও শুষ্ক। বিনুরই মতো তাঁদের অনেকের সাধ আছে, সাধ্য নেই। টলস্টয় এ যুগের লেখকদের প্রতিভূ। তাঁর শক্তি ছিল বলে তিনি শেষ পর্যন্ত ঝাঁপ দিতে পারলেন, সেটাও একটা প্রতীক।

তা হলে উপায় কী? উপায় হচ্ছে গোর্কীর মতো শত শত লেখকের জন্ম। যতদিন তাঁরা জন্মাননি ততদিন কৃষক শ্রমিকের জীবন সাহিত্যের বাইরে থেকে যাবে, ভিতরে আসবে না। আসবে কেবল একটা মেঠো সুর হাওয়ার সঙ্গে ভেসে, মিঠে সুর লোকসাহিত্যের জানালা দিয়ে। খিড়কি দিয়ে ঢুকবে একটা বিদ্রোহের সুর, ভাঙনের সুর। এটা সংবাদ-সাহিত্যের শামিল। কারণ, এর মধ্যে আছে প্রচারের ভাব। লোকসাহিত্যের জানালা, সংবাদ-সাহিত্যের খিড়কি, আসল সাহিত্যের সদর দরজা নয়। সে দ্বার দিয়ে প্রবেশ

করেছেন খ্যাতনামাদের মধ্যে গোর্কী। অখ্যাতনামাদের মধ্যে আরো কয়েকজন।

গোর্কীর সৃষ্টি কী শ্রেণীসাহিত্য? পরে যাঁরা আসবেন তাঁদের সৃষ্টি কি শ্রেণীসাহিত্য হবে? না, সাহিত্য চিরদিন সাহিত্য, চিত্র চিরদিন চিত্র, সংগীত চিরদিন সংগীত, আর্ট চিরদিন আর্ট। আর্টের জহুরীরা যেখানে সোনার দাগ দেখবেন সেখানে বলবেন, খাঁটি সোনা। অন্যত্র মেকি সোনা। সোনার আর কোনো শ্রেণী নেই।

উপায়ান্তর

গোর্কীর মতো শত শত সাহিত্যিকের জন্যে যাঁরা অপেক্ষা করতে রাজি নন তাঁদের একজনের নাম বিনু। বিনু বরাবর ভেবে এসেছে, অপর কোনো উপায় আছে কি-না। তার মনে হয়েছে, আছে। লোকসাহিত্যের জানালাগুলো কেটে দরজা বসালে সাহিত্যের ঘর আলো বাতাসে ভরে যায়, লোকসাহিত্যের একটু-আধটু পরিবর্তন করলে তাই হয়ে দাঁড়ায় সাহিত্য। সাহিত্যের ইতিহাসে এর ভূরি ভূরি নজির। ফাউস্ট ছিল লোকসাহিত্য। গ্যেটে তাকে সাহিত্যে উত্তীর্ণ করলেন। গ্যেটের আগে মার্লো। বাউলদের গান ঠিক লোকসাহিত্য না হলেও রবীন্দ্রনাথ তাকে সাহিত্যে উত্তীর্ণ করেছেন। ওরা নিজেরা পারেনি। বৈষ্ণব কবিতার কুলজী ঘাঁটলে রাখাল-রাখালীদের পূর্ব প্রচলিত গীতি উদ্ধার হবে। সেসব হারামণি হারিয়েই যেত, যদি না বৈষ্ণব সাধনার অঙ্গ হয়ে পদকর্তাদের জপমালায় যোজিত হত। মাঝিমাল্লাদের ভাটিয়ালী যদি শক্তি-সাধনার অঙ্গ হয়ে থাকত তাহলে আমরা পেয়ে থাকতুম আরো এক সার রত্ন। লোকসাহিত্য হিসাবে নয়, আসল সাহিত্য হিসাবে।

পরবর্তী বয়সে বিনু নিজে যত্নবান হয়েছে। সময় পায়নি, যদি কোনো দিন পায় তো দৃষ্টান্ত দেখাবে। কেন যে এ কালের কবিদের দৃষ্টি এ দিকে পড়ে না বিনু ভেবে পায় না। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের ভিত ব্যক্তিবিশেষের মানসে নয়, গোষ্ঠী বা জাতিবিশেষের চেতনায়। ব্যক্তিকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে সৃষ্টি করবার, কিন্তু ভিত যার মৃত্তিকাভেদী নয়, চূড়া তার অভ্রভেদী হলেও পতন তার অবশ্যম্ভাবী। বৈষ্ণব কবিতা এত দিন মাথা তুলে খাড়া আছে কেন, সেই বৈষ্ণবদেরই আরো অনেক কাব্য কেন চিৎপাত হয়েছে? এর উত্তর পদাবলী সারা দেশের সমসাময়িক চেতনার ভিত্তি স্বীকার করে নিয়ে তার উপর নির্মিত হয়েছে। কাব্যগুলি তেমন নয়। আমাদের আধুনিক কবিতার সঙ্গে যদি আধুনিক লোকগাথার সম্পর্ক থাকত তা হলে আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ থাকত। আর লোকগাথাও সেই সূত্রে অমর হত। সাহিত্যেও আমরা পেতুম লোকসাহিত্যের প্রাণরহস্য।

জীবনবেদ

রামায়ণ মহাভারত শিশুবয়স থেকে বিনুর প্রিয়। এ কালে কেন কেউ এপিক লেখে না, এ প্রশ্ন মাঝে মাঝে তার মনে উদয় হত। এ কালে ব্যাস নেই, বাল্মীকি নেই, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তো রয়েছেন, রয়েছেন শ্রীঅরবিন্দ। ভারতবর্ষে ঋষির অভাব কবে ঘটল? এই এক শতাব্দীর মধ্যে রাজর্ষি, মহর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, মহাযোগী, পরমহংস, অংশাবতার, পূর্ণাবতার, মহাত্মা জন্মগ্রহণ করলেন কত। এক দেবর্ষি ব্যতীত আর সকলেই সমুপস্থিত। দেবর্ষিও আছেন অন্য নামে।

নইলে কথায় কথায় দাঙ্গা বাধে কেন? বাধায় কে?

প্রশ্নের উত্তর, এপিক কোনো একজন ব্যক্তির সৃষ্টি নয়। রামায়ণকে বাল্মীকি একটা স্থায়ী রূপ দেবার আগে অস্থায়ী রূপ দিয়েছিলেন আরো অনেকে। তাঁদের কেউ চারণ, কেউ ভাট, কেউ কথক, কেউ ঘুমপাড়ানী মাসি-পিসি বা ঠাকুমা দিদিমা। বলতে গেলে রামায়ণ একটা জাতির সৃষ্টি। মহাভারতও তাই। এ কথা বললে বাল্মীকির কি ব্যাসদেবের গৌরব হানি হয় না। না বললে এপিক সৃষ্টির রহস্য অনধিগম্য থাকে। এ কালে এপিক হয় না, তার কারণ জাতির সৃষ্টি এপিক আকার নিতে অক্ষম। রামায়ণ মহাভারতের মতো তেমন কোনো কাহিনী বা কিংবদন্তী প্রচলিত নেই। আছে এক কৃষ্ণলীলা। তা এপিকের নয়, লিরিকের বিষয়। তা নিয়ে হাজার হাজার লিরিক রচনা হয়েছে।

তাহলে কি এপিকের আশা ছাড়তেই হবে? না, ব্যক্তির পক্ষে যতটা সম্ভব ততটা করতে হবে। টলস্টয় রাশিয়াকে তাঁর এপিক উপন্যাস 'সমর ও শান্তি' দান করেছেন। রম্যাঁ রলাঁ পশ্চিম ইউরোপকে দিয়েছেন 'জন ক্রিস্টোফার'। এখানিও এপিক উপন্যাস, সংগীতকার বেঠোফেন এর নায়কের মডেল। বিনুর জীবনে 'জন ক্রিস্টোফার' পড়া এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। এপিকের লক্ষণ ওতে আছে কি নেই, অত তর্কে কাজ কী? ও যে আধুনিক ইউরোপের, পশ্চিম ইউরোপের, জীবনবেদ। ওর নায়ক যুদ্ধবিগ্রহের বীর নন, জীবনযাপনের বীর। কেমন করে বাঁচতে হয়, বাঁচা উচিত বেঠোফেনের জীবন তার নিঃশব্দ জবাব। বিনু খুঁজছিল জীবনযাপনের বিভিন্ন ধারা। এ ধারা তাকে অনুপ্রাণিত করল। কিছু কালের জন্যে এ বই হল তার জীবনবেদ। সেও যদি এমন একখানি বই লিখে যেতে পারত!

দুই বিনু

যারা সংগ্রামবিমুখ, যারা অন্যায়ের সঙ্গে আপস করে, যারা প্রাণকে মূল্য দেয় সত্যের চেয়ে বেশি তাদের ক্ষমা করা বিনুর পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল 'জন ক্রিস্টোফার' পড়ার পর থেকে। মানুষমাত্রেই হবে বীর, হলই বা দীন-দরিদ্র, হলই বা শিক্ষাদীক্ষায় বঞ্চিত। দৈহিক দুর্বলতা কাপুরুষতার অজুহাত হতে পারে না। যে যত রকম অজুহাত দেখায় সে তত বড়ো কাপুরুষ। সাফল্যের জন্যে ব্যস্ত না হয়ে অন্যায়ের সঙ্গে সংঘাত বাধানোই পৌরুষ।

অথচ তার মধ্যে আর এক বিনু ছিল যে রণছোড়। যে খেলা করতে ভালোবাসে, হাসতে ভোলে না। জীবনটা তার চোখে দ্বন্দ্ব নয়, লীলা। বাল্যকালের বৈষ্ণব প্রভাব এর জন্যে দায়ী। দায়ী রবীন্দ্রনাথের প্রভাব। এককথায় ভারতবর্ষের স্বভাব।

দুই বিনুর দোটানা এক দিনও বিরতি পায়নি, একই মানুষের একই লেখনীমুখে ব্যক্ত হয়েছে। কখনো বীরভাব প্রবল, কখনো সলীলভাব। কখনো হাসি, কখনো ট্র্যাজেডি, কখনো কমেডি। দুই বিনুর রচনা এক নামেই চলে।

এই দোটানা হয়তো থাকত না ইউরোপের সঙ্গে—ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে—অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ না পাতালে। দেশ দেখার শখ চিরকাল ছিল, কত লোক দেশ দেখতে যায়, বিনুও যেত। কিন্তু ইউরোপের জীবনকে নিজের জীবনের অঙ্গ করা তো শখ নয়, ওতে বিপদ আছে। ভারতবাসীর ব্যক্তিগত বা ঘরোয়া জীবনে সংঘাত কোথায়? যা আছে তা বাদ-বিসংবাদ, তা সংঘাত নামের অযোগ্য। আমরা স্কুল-কলেজে লেখাপড়া শিখে চাকরি বা

ওকালতি করি। তার পরে করি বাপ-মায়ের ইচ্ছায় বিয়ে। তার পরে ছেলেকে পড়াই, চাকরি জুটিয়ে দিই, বিয়ে দিই। আর মেয়েকে দু'পাতা পড়িয়ে বা না পড়িয়ে পাত্রস্থ করি। এর মধ্যে ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার ঘাতপ্রতিঘাত কোথায়? ট্র্যাজেডির বস্তু কই? আধি ব্যাধি আপদ্ বিপদ্ প্রাণহানি বা ধনহানির নাম ট্র্যাজেডি নয়, দুর্ভাগ্য।

বিনু ক্রমে ক্রমে দেশটার উপর চটে গেল। দেশের জীবনযাপনের ধরণ ধারণের উপর। এ দেশের জীবন যদি এই রকম থাকে তবে এ দেশে না হবে এপিক, না ট্র্যাজেডি। অথচ তার ভিতরে আর একটি বিনু ছিল, সে সুরসিক। সে রাগতে জানে না। জানে অনুরাগ ও কেলি।

দায়

বৈষ্ণবদের একটি কবিতা আছে, আমি ঠেকেছি পীরিতের দায়ে, আমায় যেতেই যে হবে গো। বিনুর জীবনেও এমন একটি দিন এল যেদিন তাকেও মানতে হল, আমি ঠেকেছি প্রণয়ের দায়ে, আমায় লিখতেই হবে গো। কেন লিখতে হবে, কেমন করে লিখতে হবে, কার জন্যে লিখতে হবে, কী লিখতে হবে, এসব পুঁথিপড়া মনগড়া প্রশ্ন এতদিন আসর জুড়ে বসেছিল, দায় যেদিন এল সেদিন বিদায় নিল অলক্ষে। তাদের জায়গায় বসল, লিখতেই হবে—শুধু এই একটি অনুজ্ঞা।

বিনু চেয়ে দেখল তার সামনে অকূল পাথার। পাথার পার হতে হবে, কিন্তু না আছে তরী, না আছে কাণ্ডারী। কেউ তাকে পার করে দেবেন না, দিতে চাইলেও পারবেন না। না রবীন্দ্রনাথ, না টলস্টয়, না রলাঁ। তার একমাত্র ভরসা সে নিজে। আর তার লেখনী।

দূরের মানুষ তাকে চিঠি লিখেছে। দূরত্বের পারাবার পার হয়ে তাকে কাছের হতে হবে। কাছের মানুষ হয়ে শান্তি নেই, এক মানুষ হতে হবে। এই তার দায়। দায়ে পড়ে লিখতেই হবে।

বিনু তার হৃদয়গ্রন্থি একে একে খুলল। এক দিনে নয়, একাধিক সহস্র দিবসে। তার অজ্ঞাতসারে একখানি গ্রন্থ রচিত হল, সে গ্রন্থের পাঠিকা মাত্র একজন। অথচ সেই একটিমাত্র পাঠিকার জন্যে লেখকের কী নিদারুণ অধ্যবসায়! নিজের লেখা তার না-পছন্দ হয়। ছিঁড়ে কুটি কুটি করে। আবার লেখে। নিজের বিচারে যদি চলনসই হল পাঠিকা হয়তো ভুল বুঝলেন. অভিমান করলেন। তখন তাঁকে ঠিক বোঝানোর জন্যে, মন পাবার জন্যে, আবার কাগজ কলম নিয়ে বসতে হয়, ভাবতে ভাবতে রাত ভোর। লেখা যতক্ষণ না নিখুঁত হয়েছে, হৃদয় যতক্ষণ না স্বচ্ছ হয়েছে, রস যতক্ষণ না মুক্ত হয়েছে, ততক্ষণ তার ছুটি নেই। বুকের রক্ত জল হয়ে চোখের দুকূল ভাসায়। শ্রান্ত ক্লান্ত ব্যথার্ত দেহমন অবশ হয়ে এলিয়ে পড়ে। এক আধ দিন নয়। দিনের পর দিন। একটানা তিন বছর। তখন তো সে জানত না যে শুঁয়োপোকা মরে প্রজাপতি জন্মায় কত দুঃখে! ঐ তিনটি বছর যেন মৃত্যু ও জন্মান্তর। জীববিজ্ঞানের পরিভাষায় মেটামরফোসিস (metamorphosis)।

বাঁশি

যে মরল সে সাংবাদিক, যে জন্মালো সে সাহিত্যিক। এ যেমন মানুষের বেলা তেমনি লেখনীর বেলা। যেটা গেল সেটা কাঁসি, যেটি এল সেটি বাঁশি। কখন যে গেল, কখন যে এল তা ঘড়ি ধরে বলা যায় না। কেউ লক্ষ করেনি।

বাঁশির উদ্দেশ্য সংগীতসৃষ্টি নয়, অন্তরের পরিচয় দান। কিন্তু পরিচয় দিতে দিতে সংগীতসৃষ্টিও হয়ে যায়। যার অন্তরে রস জমেছে তার বাঁশিতে রসের মুক্তি ঘটলেও সংগীত সৃষ্ট হয়। বিনুর লেখনী তার বাঁশি। তাই দিয়ে সে অন্তরাত্মার পরিচয় দান করত, পরিচয় দিতে দিতে সাহিত্য সৃষ্টি করত। কখনো অজ্ঞাতে, কখনো সজ্ঞানে।

তখনো তার ভবিষ্যৎ তার কাছে পরিস্ফুট হয়নি। তখনো সে সাংবাদিকবৃত্তির স্বপ্ন দেখছে, যদিও তাতে আর সুখ পাচ্ছে না। সাহিত্যিকবৃত্তি সম্বন্ধে তার পরিষ্কার ধারণা নেই। শুনেছে মাসিকপত্রে লেখা পাঠিয়ে ও মাঝে মাঝে বই ছাপিয়ে কোনো কোনো সাহিত্যিক সংসার চালান। কিন্তু নিজের উপর তার এতটা বিশ্বাস ছিল না যে সেও ঘরে বসে লেখার উপস্বত্বে জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে। মূলধন থাকলে সে তার নিজের সাপ্তাহিক বা মাসিক বার করত। পরের চাকরি করত না। কিন্তু তা যখন নেই তখন যত দিন তার পুঁজি জুটছে তত দিন কোনো সংবাদপত্রের বা সাহিত্যপত্রের আপিসে চাকরি করতে বাধ্য। এটার নাম সাংবাদিকবৃত্তি। সাহিত্যিকবৃত্তি কি এর সঙ্গে বেখাপ? চারু বন্দ্যোপাধ্যায় কি সাহিত্যিক তথা সাংবাদিক নন? রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কি সাংবাদিক তথা সাহিত্যিক নন? বিনুও প্রথমে চারুবাবুর মতো চাকুরে ও পরে রামানন্দবাবুর মতো স্বাধীন হবে।

লেখনীকে জীবিকার উপায় করতে তার অন্তরের বাধা ছিল। তার মধ্যে যে বীর জেগেছিল সে তো প্রস্তাব শুনে আগুন। জীবিকার জন্যে আর যাই করো, মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ। তার পাঠিকাও বলতেন সেই কথা। যাও, সৈনিক হও, ডাক্তার হও, কর্মী হও। কিন্তু পেটের দায়ে লেখক! ছি! লেখনী যে বাঁশি। বাঁশি বাজিয়ে প্রেম করা যায়। পয়সা? ছিঃ! বিনুর ভিতরে যে রসিক জাগছিল সে বিকার বোধ করল ও প্রস্তাবে। প্রস্তাবটা তা হলে কার? শুঁয়োপোকার। তাতে আপত্তি কার? প্রজাপতির!

নীতিবিচার

লিখে দু'পয়সা রোজগার করা কি অন্যায়? কই, কেউ তো ও কথা বলে না আজকাল। তখনকার দিনে কিন্তু অনেকে বলত। বিনু যে বংশের ছেলে সে বংশে কেউ কোনো দিন বীর্য বিক্রয় করেননি, অর্থাৎ বর পণ নেননি। চাকরি করাকে তাঁরা আত্মবিক্রয় মনে করতেন। চাকরি করার রেওয়াজ শুরু করলেন বিনুর বাবা, এর জন্যে তাঁর গ্লানির অবধি ছিল না। বিদ্যা বিক্রয়ের উপরে তখনো দেশের লোকের ধিক্কার ছিল। সুতরাং রচনা বিক্রয় যে নিন্দনীয় হবে এতে আশ্চর্য হবার কী আছে? লেখনী যে বাঁশি এ বোধ যত দিন ছিল না তত দিন বিনুর জীবিকা সম্বন্ধে দ্বিধা বোধ ছিল না। কিন্তু সাংবাদিক থেকে সাহিত্যিক হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসার ঢেউ উঠতে থাকল।

বিনুর সেসব চিঠি যদি কোনোদিন ছাপা হয় তবে হয়তো সাহিত্য বলে গণ্য হবে, হয়তো সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকা দাম দিয়ে সেই বই কিনবেন, হয়তো সেই বই হবে তার

আয়ের আকর। কিন্তু লজ্জা করবে না সে আয় স্পর্শ করতে? বিনু কি কখনো সেসব লিখত যদি জানত যে টাকার জন্যে লিখছে, লিখলে এক দিন না এক দিন টাকা হবে? ছি ছি ছি! একজন পাঠিকার জন্যে প্রেমের দায়ে যা লিখেছে তাতে যদি কেউ কোনো দিন পেটের দায় আরোপ করে তবে বিনু বরং মরবে, তবু প্রকাশ করবে না। করতে দেবে না।

একজন পাঠিকার সঙ্গে এক লাখ পাঠক-পাঠিকার তফাতটা কী? কবি যা লেখে তা আপাতত একজনের জন্যে লিখলেও আখেরে সকলের জন্যে লেখে। আপাতত এক দেশের জন্যে লিখলেও আখেরে সব দেশের জন্যে। আপাতত স্বকালের জন্যে লিখলেও আখেরে সব কালের জন্যে। লেখা হচ্ছে ভালোবাসার ধন, প্রাণের জিনিস। যে লেখে সে জানে যে প্রেমের দায় না থাকলে লিখে আনন্দ নেই, তৃপ্তি নেই। প্রেমের দায় ব্যতীত অন্য কোনো দায় থাকলে লেখার মর্যাদা নেই। সেইজন্যে লিখে দু'পয়সা উপার্জন করাটা একটা গৌরবের কথা নয়। বিনা মূল্যে দিতে পারছিনে বলে মাথা তুলতে পারছিনে। কী করি, আমারও তো অন্নচিন্তা আছে। সমাজ যদি সে ভার নিত আমি কেন আমার প্রিয়জনদের কাছ থেকে লেখার দাম নিতুম? আমার প্রিয়জন আমার সব পাঠক-পাঠিকা। বিনু ভাবে।

নেশা ও পেশা

শুঁয়োপোকার নীতি ও প্রজাপতির নীতি এক নয়। প্রজাপতির নীতি উচ্চ স্তরের। সাংবাদিক তাঁর নেশাকে পেশা করতে পারেন অকুতোভয়ে, কিন্তু সাহিত্যিক তাঁর নেশাকে পেশা করতে গেলে পদে পদে ভয় পান। যে কোনো দিন যে কোনো দুর্মুখ তাঁর নামে রটাতে পারে, সীতার সতীত্ব যেমন সোনার হরিণকে লক্ষ্য করে সোনার লঙ্কায় হারালো এঁর কবিত্বও তেমনি সোনার মোহরকে মোক্ষ করে সোনার বাংলায় হারাবে।

কারো কারো জীবনে তাই ঘটেছে। বিয়ের বাজারের মতো লেখার বাজার বলে একটা বেচাকেনার হাট বসেছে। সেখানে লেখকের ও পাঠকের ভিড়। ভাগ্যপরীক্ষার জন্যে সেখানে যদি কোনো প্রতিভাবান আসেন তবে তিনি লাভবান হতে ইচ্ছা করেন। তখন তিনি যা লেখেন তা দান নয়, ইনভেস্টমেন্ট। একজন ভাগ্যবান পুরুষকে মন্তব্য করতে শোনা গেছে, আমার এক একখানা বই হচ্ছে এক একখানা জমিদারি। আমার জমিদারি মারে কে!

বিনুর বরাত ভালো তখনকার দিনে এই ব্যবসাদারি বা সওদাগরি ছিল না। থাকলে কী ভয়ংকর বিপদের মাঝখানে গিয়ে পড়ত সে! দুর্মুখের কথাই ফলত। না, তার এক একখানা বই এক একখানা জমিদারি নয়। এক একটি মালা। প্রিয়জনের পরশ পেলে ধন্য হবে, তারপর ধুলোয় লুটোবে। মাড়িয়ে যাবে যার খুশি সে। মারবে মহাকাল। এর জন্য তার পাওনা যদি থাকে তো প্রীতির বিনিময়ে প্রীতি, মালার বদলে মালা। তার বেশি যদি পায় তবে মাথায় করে নেয়, প্রয়োজন আছে। সে তো পার্থিব প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে নয়। কিন্তু সেটা মোক্ষ নয়।

লেখনী যে বাঁশি, বাঁশি যে প্রেমের খেয়াতরী, একজনকে আর একজনের কাছে পৌঁছে দেয়, এক হৃদয়কে আর এক হৃদয়ের কাছে, লেখনীর এ মর্যাদা অকলঙ্ক থাকলে লেখকেরও মর্যাদা অকলঙ্ক থাকে। সীতার সতীত্বের মতো সাহিত্যের সম্মান স্বর্ণলঙ্কা থেকে ফিরলেও কালের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

বিভ্রাট

বিনু একরকম ঠিক করে রেখেছিল, কলেজ থেকে বেরিয়েই কোনো একটা পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হবে, ক্রমে সম্পাদক, পরে পরিচালক, শেষে মালিক। কিন্তু এতদিন যার জন্যে মনে মনে প্রস্তুত হয়েছে সেই সাংবাদিকতা যে নেশা নয়, পেশামাত্র, এটা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হল। আর সাহিত্যিকতা যে পেশা নয়, নেশামাত্র, এটাও দিন দিন প্রতীয়মান হল। সাহিত্যিকতা ভিন্ন অপর কোনো পেশা যদি স্বীকার করতেই হয় তবে সাংবাদিকতা কেন? কোনখানে তার জাদু? দুনিয়ায় আর কি কোনো পেশা নেই? স্কুলমাস্টারি, প্রোফেসারি, ওকালতি, কপালে থাকলে ওকালতি থেকে ব্যারিস্টারি?

না, স্কুলমাস্টারি নয়। প্রোফেসারি নয়। পরের ছেলেদের খাঁচায় পুরলে তারাও তো অসুখী হয়। কী করে সে বনের পাখি হয়ে খাঁচার পাখিদের আগলাবে? যদি খাঁচার দ্বার খুলে দিয়ে উড়তে শেখায় তা হলে কি তাদের অভিভাবকেরা তাকে আস্ত রাখবেন? অগত্যা সে নিজেই হয়ে উঠবে চিরকেলে খাঁচার পাখি। তার মুখে বনের বাণী মানাবে না, তার লেখনীর মুখে যৌবনের বাণী, তার বাঁশির মুখে প্রণয়বাণী। কেন সে মস্ত মস্ত থিসিস ফাঁদবে, ডক্টরেট পাবে, স্থবির হবে, কিন্তু চিরতরুণ হবে না, কেলিকুশল হবে না।

না, ওকালতি নয়। ব্যারিস্টারি নয়। ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা বলতে বলতে সত্যমিথ্যার পার্থক্য ভুলে যাবে, সত্য বললেও সত্যের মতো শোনাবে না। রিয়ালিটির সহজজ্ঞান হারিয়ে রিয়ালিস্ট হবে, সত্যাসত্যবোধ হারিয়ে বাস্তববাদী। বস্তুতান্ত্রিকদের সে ভয় করত।

একজনের ইচ্ছা সে সৈনিক হয়। তার মানে তখনকার দিনে স্যান্ডহার্স্টে যাওয়া। খরচ যোগাবে কে? আর ডাক্তার যদিও আধুনিকাদের চোখে প্রায় সৈনিকের মতনই রোমান্টিক তবু বিনুর রোমান্সের ধারণা অমন মেয়েলি ছিল না। বাকি থাকে কর্মী। হাঁ, কর্মী হতে সে রাজি ছিল। কিন্তু কর্মটা কি জুতো সেলাই, না চণ্ডীপাঠ, না মাঝামাঝি একটা কিছু? এর উত্তরে জানতে পেরেছিল, রাজনৈতিক কর্মী। কিন্তু রাজনৈতিক কর্মী হলে তো আর একজনের ভার বইতে পারবে না। ভারবাহীদের জন্যে তেমন কর্ম নয়। চাষের আইডিয়া সে টলস্টয়ের কাছে শিখেছিল। চাষ করতে বেরিয়েছিলেন তার বন্ধুশ্রেষ্ঠ। চাষই হয়তো সে করত। তার ফলে তার সাহিত্য প্রাণপূর্ণ ও মহান হত। কিন্তু—

অন্তঃস্রোত

বিনুর অন্তরে আর একটা স্রোত ছিল, সেটা তাকে অনবরত ইউরোপের দিকে টানছিল, যেমন করে টানে সমুদ্রের অন্তঃস্রোত। আমেরিকা যাওয়া ঘটল না, আমেরিকার স্থান নিয়েছিল ইউরোপ। ইউরোপে যাবার দ্বিতীয় কোনো উপায় না দেখে সে এক এক বার ভাবত সিভিল সার্ভিসের প্রতিযোগিতায় নামলে কেমন হয়। কিন্তু ভাবনা বাধা পেত দুটি বদ্ধমূল সংস্কারে। একটি, চাকরির প্রতি বিরাগ। আর একটি, সরকারী চাকরির প্রতি। একে চাকরি, তায় সরকারী চাকরি। গ্লানির উপর গ্লানি।

বিনুর তো প্রবৃত্তি ছিল না গ্লানির ভরা পূর্ণ করতে। ছিল না আর এক জনেরও। কিন্তু দয়িতার দায়িত্ব যার দায়িত্ব পালনের দুর্ভাবনা তো তারই। রত্নাকরকে দস্যুতা করতে হয়েছিল পারিবারিক দুর্ভাবনায়। পরে আবার তিনিই বাল্মীকি মুনি হলেন। তাঁর পূর্ব পরিচয়

পুড়ে ছাই হয়ে গেল তপস্যার তুষানলে। বিনুরও তাই হতে পারে। তবে দ্বিধা কিসের?

দুর্ভাবনার তাপে প্রথমে গলল প্রথমোক্ত সংস্কার। এটা আগে থাকতে অনেকটা গলেছিল। বাকিটুকু গলতে সময় নিল না। তার পরে গলল দ্বিতীয়োক্ত সংস্কার। চাকরিই করতে হল যদি, তবে সরকারী চাকরি কেন নয়? উট গিলবে, মশা গিলবে না কেন? কিন্তু যুগটা অসহযোগের। বিনুর উপর তার প্রভাব পড়েছিল। তার মনে হত সরকারী চাকরি এক প্রকার দেশদ্রোহিতা। এমন কি, কলেজে পড়া সম্বন্ধেও তার সেই রকম একটা অপরাধবোধ ছিল।

সেইজন্যে বিনুর পক্ষে মনঃস্থির করা সম্পূর্ণ অসম্ভব হত, যদি না তাকে তলে তলে আকর্ষণ করত ইউরোপ। কলেজের গ্লানি ধৌত করেছিল যে অন্তঃস্রোত সরকারী চাকরির গ্লানিও ধৌত করবার প্রতিশ্রুতি দিল সেই স্রোতই। ইউরোপের আহ্বান তার চরণে টান দিল। কানে কানে বলল, বেশিদিনের জন্যে নয়। বাল্মীকির জীবন মনে থাকে যেন। রত্নাকরের ওপার থেকে ফিরে তুমিও তোমার রত্নাকরত্ব বিসর্জন দিতে পার।

বিনু বিশ্বাস করল। তখন ছিল বিশ্বাস করবার বয়স। সংসারের কতটুকুই বা জানত! যারা জানত তারা বলত, অভিমন্যুর মতো যারা ঢোকে তারা বেরোয় না, এমনি সুরক্ষিত ব্যূহ। বিনু রাগ করত। সে যে বিনু, সে যে বিষয়বিমুখ। তাকে ধরে রাখবে কোন্ ব্যূহ! তার প্রয়োজনই বা কতটুকু। আর একজন তো এক দিন স্বাবলম্বী হবে। নিজের ভার নিজে বইবে। তারপর?

জীবিকা

পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে জীবিকার চেষ্টা করতে হয়, একথা যেমন কীটপতঙ্গের বেলায় তেমনি পশুপাখির বেলায় তেমনি অধিকাংশ মানুষের বেলায় সত্য। অধিকাংশ মানুষ বলছি এই জন্যে যে, এক শ্রেণীর মানুষ পরের পরিশ্রমের উপস্বত্বভোগী। জীবিকার জন্যে তাদের ভাবতে হয় না, যা ভাবার তা পিতামহেরা ভেবে রেখেছেন। তাঁদের কেউ ডাকাতি করে জমিদারি ফেঁদেছেন, কেউ ডাকু-জমিদারকে পরকালের পাথেয় দিয়ে নিষ্কর জমি পেয়েছেন, কেউ দুর্ভিক্ষ ঘটিয়ে ও দুর্ভিক্ষের সময় সাতগুণ দামে ধানচাল বেচে লক্ষ টাকার যক্ষ হয়েছেন, কেউ দু-হাতে ঘুষ লুটে সাত পুরুষের সেবাপূজার জন্যে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও দেবোত্তর সম্পত্তি উৎসর্গ করেছেন। বংশধরেরা জীবিকার জন্যে হাড়-ভাঙা খাটুনি খাটে না, তবে পরের ঘাড়-ভাঙা খাটুনি খাটে বই-কি। মামলা-মোকদ্দমা, আদায়-উশুল, হিসাব-কিতাব নিয়ে এত ব্যস্ত থাকে যে দেখলে মনে হয় এরাও জীবিকার জন্যে আজীবন পরিশ্রম করছে।

জীবিকার বাইরে বা জীবিকার থেকে বিচ্ছিন্ন করে জীবনের কতটুকু বাকি থাকে? যেটুকু থাকে সেটুকু অবশ্য অকিঞ্চিৎকর নয়, অমূল্য। কিন্তু বিনুর তাতে সন্তোষ নেই। সে চায় আরো, আরো, আরো জীবন। আরো যৌবন। আরো অবসর। আরো খেলা। আরো সাধনা। আরো বেদনা। আরো সৃষ্টি। আরো অমৃত। এক কথায়, জীবিকার ভাগ পনেরো আনা নয়, চার আনা। জীবনের ভাগ এক আনা নয়, বারো আনা। জীবিকাকে একেবারে বাদ দিতে চায় না, বাদ দেবার উপায় নেই যে। কীটপতঙ্গ পশুপাখি সবাই যে নিয়মে বাঁধা তার নাম মর্তের শর্ত। সমাজের ব্যবস্থা যে রকমই হোক না কেন মানুষকে তার অন্ন বস্ত্র ও

বাসগৃহের জন্যে জীবনের খানিকটে ত্যাগ করতে হবে।

বিনু এ নিয়ম স্বীকার না করে পারে না। কিন্তু এর জন্যে সে লজ্জিত। মানুষমাত্রেই লজ্জিত। বোধ হয় প্রাণীমাত্রেই। সান্ত্বনা এই যে প্রকৃতি আমাদের জন্য প্রচুর আয়োজন করেছে, আমরা জানিনে বলেই এত কষ্ট পাই ও দিই। ভবিষ্যতে জানব। তখন জীবিকার ভাগ কমবে, জীবনের ভাগ বাড়বে। তখন মর্তের শর্ত এত কঠোর মালুম হবে না।

ব্যবস্থা

সমাজের ব্যবস্থা যুগে যুগে বদলেছে, ভবিষ্যতেও বদলাবে। বদলানো উচিত। নইলে মর্তের শর্ত অধিকাংশের অসহ্য হবে। বিনু বরাবর পরিবর্তনের পক্ষে। যারা পরিবর্তনের বিপক্ষে বিনু তাদের বিপক্ষে।

কিন্তু বিনুর দৃষ্টি রাহুর উপরে নয়, চাঁদের উপরে। জীবিকার উপরে নয়, জীবনের উপরে। সমাজের নতুন ব্যবস্থা যদি শুধুমাত্র নতুন হয় তবে তার নূতনত্ব অচিরেই পুরাতন হবে। নতুন ব্যবস্থা চাই, সেই সঙ্গে এও চাই যে, সে ব্যবস্থা সত্যিকারের ভালো ব্যবস্থা হবে। ভালো ব্যবস্থার কথা বিনু তখন থেকে ভাবছে। বলা বাহুল্য, ভালো ব্যবস্থা বলতে নতুন ব্যবস্থাও বোঝায়।

ভালো ব্যবস্থার ভালোটুকু মেপে দেখতে হবে জীবনের মাপকাটিতে। যারা বলে, জীবিকার মাপ্‌কাটিতে, তাদের সঙ্গে বিনুর গোড়ায় অমিল। জীবিকা যে জীবনের অনেকখানি বিনু তা বোঝে ও মানে। রাহু যে চাঁদের অনেকখানি চন্দ্রগ্রহণের সময় এ কথা না মেনে নিস্তার নেই। তা বলে রাহুকে বাহু বাড়িয়ে বন্দনা করা চলে না। তোমরা জীবিকার ধরণ ধারণ বদলে দিতে চাও। বেশ তো। কিন্তু জীবিকার ভাগটা কি কমবে তাতে? জীবনের ভাগ কি বাড়বে? হয়তো জীবিকার ভাগ কমবে। কিন্তু কেবল ভাগ কমলে কী হবে, যদি গুণ না কমে? যদি প্রতিপত্তি না কমে? যদি মানুষের পরিচয় দেওয়া ও নেওয়া হয় শ্রমিক বা কিষাণ বলে? মানুষ যখন ষোলো ঘণ্টা খাটত ও আট ঘণ্টা বাঁচত তখন তাকে শ্রমিক বা কিষাণ বললে বেমানান হত না। যখন চার ঘণ্টা খাটবে ও বিশ ঘণ্টা বাঁচবে তখনো কি সে তার জীবিকার দ্বারা চিহ্নিত হবে? তাই যদি হল তবে রাহুই জিতল, চাঁদ হারল।

তার পরে আরো এক কথা। জীবিকার সময়টাও জীবনেরই অংশ। আয়ুর শামিল। যখন পেটের দায়ে কাজ করছি তখনো যেন মনে করতে পারি যে প্রাণের আনন্দে বাঁচছি। নইলে জীবনের অখণ্ডতার স্বাদ পাব না। জীবনকে দ্বিখণ্ডিত করলে জীবিকার ভাগ যত কম হোক না কেন অখণ্ডতার ক্ষতিপূরণ হয় না। বিনু এটা মর্মে মর্মে বুঝেছে। জীবিকাকে জীবন্ত না করতে পারলে মানুষের জীবন অখণ্ড হবে না।

ধর্ম

জীবিকাকে জীবন্ত করে ধর্ম। জীবিকাকে জীবন্যাস করে ধর্মবিশ্বাস। নইলে মানুষ অখণ্ড জীবনের স্বাদ না পেয়ে মরমে মরে। সে মরণ নরক সমান। তাই তার ইতিহাসে এতবার ধর্মের আবির্ভাব ঘটেছে। এখনো ঘটছে। সাম্যবাদ গত শতাব্দীতে ধর্মরূপেই গৃহীত হয়েছিল

বহু ব্যক্তির জীবনে। এখনো হচ্ছে। তবে এখন তার কর্মকাণ্ড ধর্মের জায়গা জুড়েছে।

জাতীয়তাবাদও একপ্রকার ধর্ম। বিশেষত যে দেশ স্বাধীন হতে চেষ্টা করছে সে দেশে। অথবা স্বাধীনতা রাখতে চেষ্টা করছে সে দেশে। তা যদি না হত কোটি কোটি মানুষ যুদ্ধে যোগ দিত না, বিদ্রোহ করত। রুশ দেশেও জাতীয়তাবাদ এখনো সতেজ। যারা সাম্যবাদী তারা জাতীয়তাবাদীও। এক সঙ্গে একাধিক ধর্মে বিশ্বাস মানবচরিত্রের এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য। এ দেশেও আমরা শাক্ত বৈষ্ণবের সমন্বয় দেখেছি। এমন কথাও শুনেছি যে, যাঁর নাম শ্যামা তাঁরই নাম শ্যাম। যার নাম অসি তারই নাম বাঁশি। আমরা জাতকে-জাত সমন্বয়বাদী। এক দিন এমন কথাও শুনব যে যাঁর নাম কৃষ্ট তাঁরই নাম খ্রিস্ট, যার নাম বাইবেল তারই নাম বেদ।

বিনু কোনো দিন মনে প্রাণে জাতীয়তাবাদী হতে পারল না, সাম্যবাদীও না। বাদীদের সঙ্গে তার বিবাদ বেধে যায়। কিন্তু তারও একটা ধর্মজিজ্ঞাসা ছিল, এখনো রয়েছে। ধর্মের কাজ জীবনকে অখণ্ডতা দেওয়া। কেবল দৈনন্দিন জীবনকে নয়। সমগ্র জীবনকে। সমগ্র জীবন বলতে কি শুধু ইহকালের জীবন বোঝায়? পরকালের জীবন কি নেই? যদি থাকে তবে ইহপরকালব্যাপী অখণ্ড মণ্ডলাকার জীবন যার দ্বারা ধৃত হয়েছে তারই নাম ধর্ম। ধর্ম ব্যক্তিকে নিবিড় করে বেঁধেছে সমষ্টির সঙ্গে, কিন্তু বাঁধনটা বিধিনিষেধের নয়, স্বার্থের বা সুবিধার নয়, অবিভক্ত জীবনের। সেও একটি অখণ্ড বৃত্ত, আমরা তার এক একটি বিন্দু।

ধর্মই বলো, প্রেমই বলো, তার সার হচ্ছে ঐক্যবোধ। মানুষে মানুষে ঐক্যবোধ, মানুষে পশুতে পাখিতে বনস্পতিতে ঐক্যবোধ, প্রাণীতে বস্তুতে ঐক্যবোধ, বস্তুতে শক্তিতে ঐক্যবোধ, শক্তিতে সত্তায় ঐক্যবোধ। এ শৃঙ্খল কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে কে জানে! শেষ একটা কথার কথা, যেমন আরম্ভ একটা কথার কথা। আদিও নেই, অন্তও নেই। বিনু অনুভব করে।

লিখব না বাঁচব

লেখাটাকে জীবিকা করলে এ প্রশ্ন উঠত কি না বলা শক্ত। কিন্তু অন্য এক জীবিকা মনোনয়ন করে বিনু পড়ল ফাঁপরে। জীবিকাকে জীবনের বড়ো অংশ দিয়ে বাকি যেটুকু থাকে সেটুকু যদি লিখে কাবার করে তবে বাঁচবে কখন? যদি বাঁচে তবে লিখবে কখন?

লেখা ও বাঁচার এই দোটানা এখনো মেটেনি। দু পৃষ্ঠা লিখতে না লিখতে তার মনে পড়ে যায়, ঐ যা! বাঁচতে ভুলে গেছি। আজকের দিনটা ঠিকমতো বাঁচা হল না। আবার, দু দিন লেখা বন্ধ থাকলে তার মন কেমন করে। কই, কিছুই তো লিখে যেতে পারলুম না। যা লিখতে চাই তার তুলনায় যা লিখেছি তা কতটুকু, তা কত অসার! ওটুকু লেখা কদ্দিন টিকবে!

বিনু এক বার ভাবে, জীবনটা ব্যর্থ গেল। এক ভার ভাবে, লেখনীটা অক্ষম। তার পর ভাবে, এখনো সময় আছে। যদি ঠিকমতো বাঁচতে পারি তো ঠিকমতো লিখতে পারব। বাঁচাটাই আগে।

কিন্তু তাই বা কেমন করে হবে? জীবিকা ও জীবন মিলে অখণ্ড নয় যে। ধর্ম সাহায্য করছে না। যেখানে অখণ্ড জীবনের স্বাদ নেই সেখানে আগে বাঁচলে কী হবে? সে বাঁচা কি

ঠিকমতো বাঁচা? তার থেকে যা আসবে তা কি ঠিকমতো লেখা?

অথচ জীবিকাকে ছেঁটে বাদ দেবার উপায় নেই। এ জীবিকা না হয়ে আর কোনো জীবিকা হলে তফাৎ যা হত তা উনিশ বিশ। একমাত্র সমাধান সাহিত্যকে জীবিকা করা। বিনু এ কথা অনেকবার ভেবেছে। কিন্তু জীবিকার জন্যে সাহিত্য লিখতে বসলে এত বেশি লিখতে হয় যে বিনু কোনো কালে এত বেশি লিখতে চায়নি, এত বেশি লিখলে বেশির ভাগ লেখা হবে অনিচ্ছায় লেখা। অনিচ্ছায় লেখা কদাচ ভালো হয়। বাজে লেখায় হাত খারাপ করলে সে হাত দিয়ে পরে ভালো লেখা বেরোয় না। প্রকৃতির প্রতিশোধ।

সুতরাং জীবিকার জন্যে আর যাই করো, মা লিখ, মা লিখ। যদিও পরম শ্রদ্ধাস্পদ যামিনী রায় বলেন আর্টকে জীবিকা না করলে ভালো আর্ট হয় না।

আপনাকে চেনা

বিনু আপনাকে চিনল প্রেমিকার চোখে। চিনল, সে কবি। আরো চিনল, সে নায়ক। একাধারে কবি ও নায়ক, বাল্মীকি ও রাম। যে লেখে ও যাকে নিয়ে লেখা হয়। যে লেখে ও যে বাঁচে।

তার এই যুগ্ম পরিচয় সে একদিনের জন্যেও ভোলেনি। তাই সে লেখা নিয়ে মাতামাতি করেনি। লেখা নিয়ে মশগুল থাকলে যাকে নিয়ে লেখা হয় তার কথা মনে থাকে না। বিনু তাকে মনে রেখেছে, তাই বাঁচার জন্যে ব্যাকুল হয়েছে। যে বাঁচতে জানে সে যদি কবি হয়ে থাকে তো লিখতে জানে। যদি কবি না হয়ে থাকে তো তাকে নিয়ে আর কেউ লিখবে। যে দিক থেকেই দেখা যাক না কেন যে বাঁচে সে ঠকে না। যে বাঁচে না সে হাজার লিখলেও ঠকে। তার লেখা বাঁচে না, পাঠক পাঠিকাদের বাঁচায় না। তাতে জীবনের স্বাদ নেই।

পরবর্তী বয়সে বিনু উপলব্ধি করেছে যে, বাঁচাটাও লেখা। কালি-কলম দিয়ে নয়, প্রাণ দিয়ে মন দিয়ে তনু দিয়ে লেখা। লেখা বলতে যদি শুধু লেখনী চালনা বোঝায় তবে তার জন্যে ঢের লোক রয়েছে, লোকের অভাব হবে না কোনো দিন। কিন্তু তারা নায়ক হবে না, তাদের কারো জীবন নিয়ে কাব্য রচা হবে না। যে নায়ক হবে তাকে বাঁচতে হবে নায়কের মতো, লিখতে হবে বুকের রক্ত দিয়ে প্রেমের তুলিতে। তা যদি না পারে তবে শুধু কাগজ ভরিয়ে কী হবে! কোন্ মোক্ষ লাভ হবে!

বিনু যেমন উপলব্ধি করেছে যে বাঁচাটাও লেখা, তেমনি আরো উপলব্ধি করেছে যে, লেখাটাও বাঁচা। সে যখন তন্ময় হয়ে লেখে তখন তার তন্ময়তা লেখার প্রতি নয়, লক্ষ্যের প্রতি। পাঠিকার প্রতি। পাঠকের প্রতি। যিনি পড়বেন তাঁর প্রতি। দেশকাল অতিক্রম করে যে অন্তিম পাঠক আছেন, যে আল্‌টিমেট রিডার (ultimate reader), তাঁর প্রতি। লেখা দিয়ে তাঁর পরশ পাওয়াও বাঁচা। লিখতে লিখতে অনেক সময় মনে হয়েছে সৃষ্টিরহস্য আমার নখদর্পণে। সৃষ্টি করেই বুঝতে পারি সৃষ্টির অর্থ কী। জ্ঞান দিয়ে যাঁকে পাওয়া যায় না, ধ্যান দিয়েও না, সৃজন দিয়ে তাঁর সঙ্গ পাই। কারণ সৃজন হচ্ছে আত্মদান। আপনাকে দেওয়া।

লেখাটাও বাঁচা, যদি লক্ষ্যের প্রতি শরবৎ তন্ময় হতে পারি। উপলক্ষ্যের প্রতি নয়। লেখাটা উপলক্ষ্য, যিনি পড়বেন তিনি লক্ষ্য।

ডায়ালেকটিক

এটা হল পরিণত বয়সের সিন্‌থেসিস। বিনুর বিশ-একুশ বছর বয়সে এর অস্তিত্ব ছিল না। তখন ছিল থীসিস ও য়্যান্টিথীসিস। থীসিসের নাম, নায়ক। য়্যান্টিথীসিসের নাম, কবি। নায়ক মানে যে বাঁচে। কবি মানে যে লেখে। নায়ক, যেমন রাম। কবি, যেমন বাল্মীকি। প্রকাশ থাকে যে, বিনুর জীবনের আদর্শ রাম নন, কবিত্বের আদর্শ বাল্মীকি নন।

বিনুর বয়স্যেরা পরিহাস করে বলতেন, ডায়ালেকটিকল রোমান্টিসিজম। বিনু বলত নামে কী আসে যায়! গোলাপকে যে নামেই ডাকো সে তেমনি সৌরভ বিলায়। কিন্তু তার ভালো লাগত এ কথা ভাবতে যে সে রোমান্টিক। পীত বর্ণের পাঞ্জাবি পরে কলেজে যেত। পীতবসন বনমালী। পাঞ্জাবির নিচে রক্তরাঙা গেঞ্জি। ও তার বুকের রক্ত! তার কথাবার্তার ভাষা ছিল সুভাষিতবহুল। এক একটা কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেত, আর বন্ধুরা ঠাওরাত বিনু মুখস্থ করে এসেছে। হেসে উড়িয়ে দিত।

তখনকার দিনে তার মস্ত ক্ষোভ ছিল যে কেউ তাকে ঠিকমতো বুঝল না। যে দু-একজন বুঝতেন তাঁদের সঙ্গে তার আলাপ প্রধানত পত্রযোগে। চিঠি লিখে সে যেমন নিজেকে বোঝাতে পারত কথা বলে তেমন নয়। এমনি করে সে লেখার দুঃখ বরণ করে। নইলে লিখতে যে তার ফুর্তি লাগত না নয়। তার ফুর্তি লাগত হাঁটতে, সাঁতার কাটতে, ক্রিকেট খেলতে, তর্ক করতে, বই ঘাঁটতে, এক সঙ্গে পাঁচ-সাতখানা বই পড়তে বা পড়ার ভান করতে, ভিড় দেখলেই ভিড়ে যেতে, তামাশা দেখতে। এমন লোকের উপর ভার পড়ল দিন রাত চিঠি লেখার, কবি হওয়ার। সে যে মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হবে, ধর্মঘট করবে, তার বিচিত্র কী!

চাইনে লিখতে, শরতের জ্যোৎস্না নষ্ট করতে। যাই, ঘুরে বেড়াই। শীতের সকালটি মিষ্টি লাগছে, লেখা কি তার চেয়ে মিষ্টি! যাই বলো, লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকার মতো মিষ্টি কিছু নেই, যদি এক বাটি গরম মুড়ি থাকে হাতের কাছে। এক পেয়ালা গরম চা যদি কেউ দয়া করে দিয়ে যায়। বিনুর স্বভাবটা স্বাপ্নিকের। তার স্বপ্ন যদি সকলের হত তা হলে হয়তো সে লিখত না। সকাল সন্ধ্যা মাটি করত না।

কিন্তু আরেকজনের কথা মনে পড়লেই সে আহারনিদ্রা অবহেলা করে দিস্তা দিস্তা কাগজ ভরাতে বসত, ছিঁড়ত বেশি, পাঠাত কম। তাও কিছু কম নয়।

দ্বিধাদ্বন্দ্ব

এত দিনে একটা সিন্‌থেসিস হয়েছে, কিন্তু বড়ো সহজে হয়নি। দুটি গল্প বলব। বিনুর মুখে শুনেছি।

বিনু যখন স্কুল থেকে বেরিয়ে কলকাতা যায়, তার পিতৃবন্ধু তাকে সম্পাদকের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেন। তিনিই তাকে বলেছিলেন, এটা কি একটা জীবন! আমার গায়ে যদি জোর থাকত আমি জাহাজঘাটে গিয়ে মোট বইতুম। তখন বিনু ঠিক বুঝতে পারেনি। বুঝতে পারেনি কেন মুটের জীবন শ্রেয়, লেখকের জীবন হেয়।

পরে তার এক বন্ধু কলেজ থেকে বেরিয়ে ডেপুটি হন। তিনিও বিনুর মতো একটু আধটু লিখতেন, দু'জনের লেখা একসঙ্গে ছাপা হত। তিনি তাকে এক দিন বলেছিলেন,

আমি তো ভাই আজকাল সময় পাইনে, ঘোড়ার পিঠে বসে লিখি। বিনুর তখন মনে হল, এই তো জীবন। ঘোড়ায় চড়ে গ্রামে ঘোরা। এমনি করে বেদুইনের মতো বাঁচতেই আমার সময় যাবে, লিখতে সময় থাকবে না, তবু যদি লিখতেই হয় তবে ঘোড়ায় চড়ে লিখব।

ঘোড়ায় চড়ে লেখার উপর তার হঠাৎ এত শ্রদ্ধা সঞ্চার হল যে সে ঘোড়ার অভাবে গাছে চড়ে লিখল। ঘোড়ায় চড়া যত রোমান্টিক গাছে চড়া তত নয়। এ খেয়াল বেশি দিন ছিল না। কিন্তু এই ধরনের খেয়াল আরো কত বার জেগেছে। ঘরে বসে লেখা হচ্ছে নিতান্তই লেখা, আর ঘোড়ায় চড়ে লেখা হচ্ছে লেখা এবং বাঁচা। লেখার চেয়ে বাঁচার ভাগটা প্রধান। লেখার মধ্যে সেই বাঁচার ক্রিয়া চলবে। ফলে লেখাটা হবে প্রাণবান ও বেগবান।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে ওর মতো কুসংস্কার আর নেই। এখনো শোনা যায় যে যুদ্ধের কবিতা যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন তাজা হয় দূর থেকে তেমন নয়। একজন ইংরেজ সাহিত্যিক নাকি সরাবখানায় বসে নিত্য নিয়মিত লেখেন, সেখানকার হট্টগোলে তাঁর লেখা জীবন পায়। বিনু আর ওসব বিশ্বাস করে না, কিন্তু এক কালে তার মনে হত ঘরে বসে লেখার মধ্যে একটুও পৌরুষ নেই, বীরত্ব নেই, লিখতে হলে বাইরে গিয়ে জীবনের স্পন্দন অনুভব করতে হবে। যেন বহির্জীবনটাই জীবন, অন্তর্জীবনটা কিছু নয়।

পৌরুষ

লেখা যে একটা ডিসিপ্লিন বিনু ক্রমে উপলব্ধি করল। সৈনিকের ডিসিপ্লিন এর চেয়ে কঠোর হতে পারে না, সুতরাং লেখকের জীবনও সৈনিকের জীবনের সমতুল্য। তার ঘোড়া নেই, কিন্তু ঘোড়ার দরকারও নেই। তার খোঁড়া চেয়ারটাই তার ঘোড়া। ভোঁতা কলমটাই তার সঙীন।

কিন্তু প্রথম বয়সে তার বিশ্বাস ছিল অন্য রকম। সে বলত দূর! এটা কি পুরুষের কাজ! এই যে আমি দিন রাত লেখা নিয়ে খেলা করছি। হ্যাঁ, হত বটে পুরুষোচিত, যদি আমার লেখার স্ফুলিঙ্গ থেকে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠত একটা দাবানল। সমাজ সংসার ভস্ম হয়ে যেত। আর সেই ভস্ম থেকে উঠে আসত নতুন সমাজ, নবীন সংসার।

তখনো বিশুদ্ধ আর্টের উপর তার আস্থা জন্মায়নি। আর্টকে সে পুরুষের কাজ বলে মানতে প্রস্তুত হয়নি, যদি না ওর দ্বারা সামাজিক কার্যসিদ্ধি হয়। তবে কি ওটা অকর্তব্য? না, অকর্তব্য কেন হবে? জগতে কি কেবল পুরুষ আছে, নারী নেই? যে কাজ পুরুষোচিত নয় সে কাজ মহিলাযোগ্য তো বটে। জগতে যেমন ফুলের মালা আছে, মালিনীরা গাঁথে, তেমনি রসের কবিতাও থাকবে, যারা লিখবে তারা একটু যেন মেয়েলি। রবীন্দ্রনাথকেও লোকে তাই বলত। বিনুর একমাত্র পাঠিকা বিনুকেও বলতেন মেয়েলি। বিনুর তাতে শরম লাগত না। কারণ মেয়েরা যে দেবী।

তা হলেও বিনুর ঝোঁক চেপেছিল ঘোড়ায় চাপতে, ঘোড়ায় চড়ে লিখতে। পুরুষের কাজ, হয় না-লেখা, নয় ঘোড়ায় চড়ে লেখা। বাকিটা মেয়েদের ও মেয়েলি মেজাজের পুরুষদের। তাঁরা বসে বসে আর্ট সৃষ্টি করুন, আমরা গিয়ে সমাজ ভাঙি গড়ি। আমাদের অন্য কাজ আছে। আমরা পুরুষ।

আর্ট যে যুদ্ধবিগ্রহের মতো পুরুষেরই কাজ, গৃহযুদ্ধের মতো মেয়েদেরও, এ জ্ঞান এল অভিজ্ঞতার থেকে। এটা পড়ে পাওয়া নয়, ঠেকে শেখা। সেই দারুণ ডিসিপ্লিন তিন বছরে বিনুকে ত্রিশ বছর বয়স্ক করেছিল। পরিণত মন নিয়ে সে অন্যান্য সত্যের সঙ্গে এ সত্যও শিখল যে সামাজিক কার্যসিদ্ধি আর্টের উদ্দেশ্য নয়, আর্ট ফর আর্টস সেক।

আর্ট ফর আর্টস্ সেক

আর্টের সাধনা যদি প্রেমের সাধনার সঙ্গে তুলনীয় হয় তবে প্রেমের সাধনায় যেমন ফলাকাঙ্ক্ষা রাখতে নেই আর্টের সাধনায়ও তেমনি। ফল হয়তো ফলবে, হয়তো ফলবে না, কিন্তু ফলের কথা ভাবলে লাভের চিন্তা জাগে, পাটোয়ারী বুদ্ধি প্রবল হয়। সেইজন্যে বলা হয়েছে, মা ফলেষু কদাচন। যে সাধক ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করেননি তিনি যা লাভ করেন তার নাম সিদ্ধি নয়, সিদ্ধাই। আর যিনি সে আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করেছেন তিনি হয়তো সিদ্ধি লাভ করবেন না, কিন্তু কাজ নেই তাঁর সিদ্ধাই নিয়ে। তাঁর সাধনাতেই সুখ। পথ চলাতেই আনন্দ!

যাঁরা কখনো ভালোবেসেছেন তাঁদের বোঝাতে হবে না যে প্রেমের সবটাই দেওয়া। বরাতে থাকলে পাওয়াও ঘটে, কিন্তু যদি না ঘটে তা হলেও প্রেমিকের চিন্তা নেই। প্রেমিক যখন পান তখন আকাশভাঙা অঝোর ধারায় পান। যেমন বেহিসাবী দেওয়া তেমনি বেহিসাবী পাওয়া। কিছুই যদি না পান তা হলেও তিনি খুশি। দু'হাত খালি করে বিলানোই তাঁকে প্রেমিক করেছে। নইলে তিনি হতেন পাটোয়ারী।

প্রেমের মতো আর্টের সবটাই দেওয়া, দু'হাত খালি করে বিলানো। কেউ দু'হাত ভরে ফিরে পান, কেউ তারও বেশি। আবার কারো কপাল মন্দ, যা পান তা সামান্য, হয়তো কিছুই নয়। সেইজন্যে পাওয়ার প্রত্যাশা পুষতে নেই, তাতে অনর্থক দুঃখ। যদি ব্যবসা করতে হয় তো আর্ট ভিন্ন আরো কত কারবার আছে। তাতে জমাখরচের হিসাব রাখা চলে, লাভ লোকসানের অঙ্ক কষা যায়। সেসব ছেড়ে যদি কেউ আর্টের পথে পা দেন তবে তাঁর পথ চলাতেই আনন্দ।

আর্ট ফর আর্টস্ সেক বলতে বিনু বোঝে এই তত্ত্ব। যাঁরা আর্টের কাছে কোনো একটা ফল দাবি করেন তাঁরা হয় তো প্রচলিত অর্থে পাটোয়ারী নন, কিন্তু সমাজের মঙ্গল, দেবত্বের বিকাশ, ইতিহাসের উদ্দেশ্যসিদ্ধি, রাষ্ট্রীয় বিপ্লব, নৈতিক উন্নয়ন, লোকশিক্ষা প্রভৃতি যত রকম ফল আছে সমস্তই লাভের তুলিকায় লাঞ্ছিত। সে পথে পথ চলার আনন্দ নেই।

উদ্দেশ্য ও উপায়

"The Swami had once asked Pavhari Baba of Gazipur, 'What was the secret of success in work?' and had been answered, 'To make the end the means, and the means the end."

লিখে গেছেন ভগিনী নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-কথায়।

এ কথা যে-কোনো কর্মের বেলায় সত্য। কলাসৃষ্টিও একটা কর্ম, সুতরাং তার বেলায়ও। উদ্দেশ্যকে উপায় করতে হবে, উপায়কে উদ্দেশ্য, যে-কোনো সাধনায় এই হল

সিদ্ধির গূঢ় মর্ম। আর্টের সাধনাতেও।

সৃষ্টিই হচ্ছে সৃষ্টির উদ্দেশ্য, সৃষ্টিই হচ্ছে সৃষ্টির উপায়। সেইজন্যে বিনু বলে, আর্টের খাতিরে আর্ট। আর্টই আর্টের উদ্দেশ্য, আর্টই আর্টের উপায়। আর্ট যখন লক্ষ্য ভেদ করে তখন আর্টেরই লক্ষ্য ভেদ করে, আর্ট হয়েই তার উত্তীর্ণতা বা উদ্ধার। তখন তাকে সামাজিক মাপকাটিতে মাপতে পারো, হয়তো তাতেও সে ওতরাবে। কিন্তু কেবলমাত্র তাতেই নয়। আর্টের মানদণ্ড আর্টের ভিতরে। তাই তার সার্থকতা আর্ট হওয়াতে। আর যা-কিছু তা অধিকন্তু। অধিকন্তু ন দোষায়। তাকে দিয়ে যদি সমাজের মঙ্গল বা দেবত্বের বিকাশ হয়, যদি চতুর্বর্গ ফল লাভ হয়, তবে সেটা অধিকন্তু। তাতে দোষ নেই। কিন্তু আর্টের উদ্দেশ্য সেটা নয়, উপায় তো নয়ই।

গায়ের জোরে সেটাকে সরিয়ে রাখারও দরকার দেখিনে। লেখার মধ্যে যদি সমাজের ভালোমন্দের কথা আসে তো আসুক। ঠেকাতে যাওয়া ভুল। কিন্তু ভুল হয় যখন সমাজের ভালোমন্দকে আর্টের ভালোমন্দ বলে গোলমালে পড়ি। আর্টের ভালোমন্দ যদিও সংসার ছাড়া নয়, তবু সাংসারিক ভালোমন্দের সঙ্গে তার সব সময় মেলে না, অনেক সময় সংসারের দিক থেকে যা ভালো, আর্টের দিক থেকে তা মন্দ, আর্টের দিক থেকে যা ভালো, সংসারের দিক থেকে তা মন্দ। তা বলে তাই নিয়ে বাড়াবাড়ি করাও ঠিক নয়। ভালো আর্ট যদি আর সব দিক থেকে ভালো হয় তো সব চেয়ে ভালো। কিন্তু প্রথমে তাকে ভালো আর্ট হতে হবে। অন্তত শুধু আর্ট হতে হবে। যা কোনো জন্মে সাহিত্য নয় তাকে সৎসাহিত্য বলা হাস্যকর। যা কোনো কালেই কাব্য নয় তাতে সামাজিক তাৎপর্য থাকলেই কি তা সাম্প্রতিক কাব্য হবে?

কবিত্ব

কবিতার প্রাণ হচ্ছে কবিত্ব। প্রাণ যদি না থাকে তবে সামাজিক তাৎপর্য আছে বলেই তা কবিতা নয়। তা কবিতার ভান। তাকে দেখতে কবিতার মতো, কিন্তু প্রতিমাকেও তো দেখতে সরস্বতীর মতো।

যেখানে কবিত্ব আছে সেখানে যদি সামাজিক তাৎপর্য থাকে তবে সেটা অধিকন্তু। তাতে দোষ নেই। কিন্তু তাতে গুণ যা আছে তাও সাময়িক। সমাজের পরিবর্তন হলে তার গুণটুকুর কদর থাকবে না। আদর থাকবে কিন্তু কবিত্বের। কবিত্বকে গুণ না বলে প্রাণ বলাই সংগত।

যেখানে প্রাণ নেই সেখানে প্রাণের অভাব গুণ দিয়ে পূরণ করা যায় না। সেইজন্যে প্রাণেরই আবাহন করতে হয় আগে। আগে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা, জীবন্যাস। তার পরে সামাজিক তাৎপর্য বা আধ্যাত্মিক উচ্চতা। কল্পিত বা প্রকৃত গুণ। তারও স্থান আছে। কিন্তু প্রাণের স্থান নিতে পারে না সে। কবিত্বই প্রাণ।

গুণ সম্বন্ধে যা বলা হল রূপ সম্বন্ধেও তাই বলা চলে। প্রাণের অভাব পূরণ করার সাধ্য রূপেরও নেই। আগে প্রাণ, তার পরে রূপ। ভাষা, ছন্দ, অলংকার, মিল, এ সকলেরও স্থান আছে, কিন্তু প্রাণের স্থান, কবিত্বের স্থান, যদি এরা দখল করে তো কবিতাই হবে না। যা কবিতাই নয় তাকে আধুনিক কবিতা বললে রূপকেই প্রাণের স্থান দেওয়া হয়। তাতে হয়তো

ঠাট বজায় থাকে, কিন্তু পুজোর চার দিন পরে কেউ প্রণাম করে না। প্রাণহীন রূপ যার সম্বল সে নিতান্তই আধুনিক, দু-চার বছর পরে তার আধুনিকতার ইতি।

আঙ্গিক নিয়ে বিনু কোনো দিন মাথা ঘামায়নি, তা বলে আঙ্গিকের উপর তার অবজ্ঞা নেই। যেমন সামাজিক তাৎপর্যের উপর তার অশ্রদ্ধা নেই। যেটা আগে সেটা হচ্ছে কবিত্ব। ভাগ্যবানরা কবিত্ব নিয়ে জন্মায়, বিনু তেমন ভাগ্যবান নয়। তাকে ও জিনিস অর্জন করতে হয়েছে, এবং রক্ষণ করতে। সে যদি প্রেমে না পড়ত কবিত্বের ধার ধারত না, খোঁজ নিত না যে তার অন্তরে কবিত্বের ধারা ফল্গুর মতো বইছে। কবিত্বকে কবিতা করতে হবে। এই তার সাধনা।

রূপচর্চা

কী লিখব, এ কথা তাকে ভাবতে হয়নি, একজন তাকে ভাববার সময় দেননি। সকালের ডাকে চিঠি এসেছে, বিকালের ডাকে—হয়তো এক দিন পরের বিকালে—জবাব গেছে। কিন্তু কেমন করে লিখব, এ প্রশ্ন তাকে প্রত্যহ ভাবতে হয়েছে, সেইজন্যেই চিঠির জবাব গেছে এক দিন দেরিতে।

এটা রূপের প্রশ্ন। লেখা কী করে রূপবান হবে, যা লিখব তাতে কী করে লেখকের রূপ ফুটবে, ভাব কী করে রূপ ধরবে, এসব প্রশ্ন একই প্রশ্নের শাখা-প্রশাখা। বিনু আঙ্গিকের জন্যে মাথা ঘামায়নি, কিন্তু অনঙ্গকে অঙ্গ দেবার জন্যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলেছে। আঙ্গিক যদি এর থেকে স্বতন্ত্র হয় তো বিনু তার মহিমা বোঝে না। যদি এর অন্তর্গত হয় তো আঙ্গিকের প্রতি উদাসীন নয় সে। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো জিনিস রূপ, সুষমা, সুমিতি, অর্থবোধ, ব্যঞ্জনা। গদ্যই হোক আর পদ্যই হোক, প্রত্যেক বাক্যের একটা ছন্দ আছে, প্রত্যেক শব্দের একটা ধ্বনি আছে। তার জন্যে কান তৈরি করতে হয়। যেমন বাইরের কান তেমনি ভিতরের কান। তারপর কান যে রায় দেয় সে রায় কলমকে মেনে নিতে হয়।

সংগীতের মতো সাহিত্যের রূপ নয়নগোচর নয়, শ্রুতিগোচর। চোখ দিয়ে নয়, কান দিয়ে দেখবার। পদ্যের ছন্দ যে গীতধর্মী সকলে তা মানবেন, কিন্তু গদ্যেও একরকম ছন্দ আছে। যারা জানে তারা মানে। অতি সাধারণ আটপৌরে গদ্য তার প্রচ্ছন্ন ছন্দের লীলায় সংগীতের মতো লাগে। ইংলন্ডে ইংরেজের মুখের কথাবার্তা বিনুর কানে গানের রেশ আনত। বিনু তাই গদ্যকে পদ্যের মতো ভালোবেসেছে। কিন্তু গদ্যকে পদ্যের মতো করে সাজিয়ে পদ্য বলে চালাতে চায়নি। গদ্যের ছন্দ কখনো পদ্যের ছন্দ হবে না, পদ্যের ছন্দ তার ভিন্নতা রক্ষা করবে। পুরুষকে নারীর ও নারীকে পুরুষের পোশাক পরিয়ে ফ্যান্সি ড্রেস পার্টি করা যায়, কিন্তু তাতে তাদের পার্থক্য দূর হয় না। বিনু দু'রকম ছন্দই অনুশীলন করতে যত্নবান হয়েছে, যার যেখানে স্থান তাকে সেখানে বসিয়েছে, একের জায়গায় অপরকে বসায়নি। তার কবিত্ব গদ্য ও পদ্য উভয়ের আশ্রয় নিয়েছে। যখন পদ্যের আশ্রয় নিয়েছে, তখন তা হয়েছে কবিতা। যখন গদ্যের আশ্রয় তখন প্রবন্ধ বা কাহিনী।

প্রেরণা

বিনু প্রেরণায় বিশ্বাস করে। সম্পাদকের তাগিদে বা প্রিয়জনের সংকেতে যা কলমের মুখ দিয়ে বেরোয় তাতে রূপ গুণ ও প্রাণ থাকলেও তা ডাইনামিক নয়। প্রেরণা যেন অনুকূল বায়ু, যখন বয় তখন তরী আপনি চলে, তাকে চালিয়ে নিতে হয় না, কেবল দিক ঠিক রাখতে হয়। যখন বয় না তখন নৌকা চলে গরজের ঠেলায়। ঘাটে পৌঁছয় বই-কি, কিন্তু তাতে ফূর্তির নাম গন্ধ নেই। লেখা উতরে যায়, হয়তো হাজার বছর বাঁচে, কিন্তু নাচে না, নাচায় না।

বিনুকে বলেছিলেন এক আলাপী, "মশাই, গুটিকতক কবিতা কি গল্প লিখুন দেখি, যা পড়ে মউজ পাব, মাতোয়ারা হব। তা নয় তো ভাষার হেঁয়ালি, ভাবের কুহেলী, নিজেও খাটবেন, আমাকেও খাটাবেন।"

কথাটা বিনুর মনে লেগেছিল। লেখার পিছনে বিস্তর খাটুনি থাকে, খুব বড়ো বড়ো লেখকদেরও। কিন্তু তাঁরা সে খাটুনি গোপন করতে জানেন। এমন ভাব দেখান যেন হাওয়ায় উড়ছেন, স্রোতে ভাসছেন, একটুও ভয় ভাবনা নেই, তাগিদ বা গরজ বা ঠেলা কাকে বলে খোঁজ রাখেন না। অসাধারণ ফুর্তিবাজ লোক তাঁরা, অন্তত রচনা পড়ে তাই মনে হয়। কাউকে তাঁরা বুঝতে দেন না যে ফুর্তির আড়ালে আর এক মূর্তি আছে। দারুণ অধ্যবসায়, অক্লান্ত শ্রম, অসংখ্য কাটাকুটি তাঁদের দৈনিক বরাদ্দ।

রূপ গুণ ও প্রাণচর্চা উত্তম, কিন্তু যথেষ্ট নয়। বিশ্বসৃষ্টির মূলে রয়েছে কী এক দুর্বার প্রেরণা, সে প্রেরণা জীবসৃষ্টির মূলেও। সে যখন আসে তখন বোবা মানুষ গান গেয়ে ওঠে, পঙ্গুর পায়ে নাচন লাগে, শুষ্ক তরু মুঞ্জরে। কবির শোক তখন শ্লোক হয়ে উড়ে যায় এমন অবলীলায় যে সকলের মনে হয় স্বতঃস্ফূর্ত। লোকের ধারণা বাল্মীকিকে এক মুহূর্ত ভাবতে হয়নি নিষাদের কাণ্ড দেখে। হয়তো তাই, কিন্তু তার আগে তপস্যা করতে হয়েছিল এক মনে। সে তপস্যা দিনের পর দিন। দৈনন্দিন। সে সাধনা বাণীর সাধনা।

প্রতীক্ষা

প্রেরণার জন্যে প্রতীক্ষা করতে হয়। কার বরাতে কখন আসে জোর করে বলা যায় না। সমুদ্রের জোয়ার কখন আসে মাঝিরা তা জানে, আকাশের হাওয়া কখন আসে তাও বোধ হয় তাদের জানা। কিন্তু প্রেরণার আসা-যাওয়ার সময়-অসময় নেই। কবিরা এইটুকু খবর রাখেন যে, প্রেরণা হঠাৎ কখন এসে হাজির হয়, কবিকে প্রস্তুত হবার অবকাশ দেয় না, প্রায়ই অপ্রস্তুত অবস্থায় পায়। এমন কবি নেই যিনি প্রেরণার করুণা থেকে বঞ্চিত। কিন্তু এমন কবির সংখ্যাই বেশি যাঁরা প্রেরণার করুণার মুহূর্তে অন্য কাজে রত। কাজটা হয়তো দরকারী, হয়তো বৈষয়িক। কিন্তু প্রেরণা তার জন্যে দাঁড়াবার পাত্রী নয়।

সেইজন্যে কবিদের মতো দুঃখী আর নেই। কবি অর্থে এখানে শিল্পীদের সবাইকে বুঝতে হবে। শিল্পীরা দীর্ঘকাল অপেক্ষা করেও যার দেখা পান না সে হয়তো একদিন অতি অসময়ে এসে দেখা দিল, তখন তার জন্যে না আছে আয়োজন না আছে অবসর। হাতের কাজ ফেলে তার জন্যে তাড়াতাড়ি তৈরি হতে না হতেই সে হয়তো অদর্শন হয়েছে। তখন অনুশোচনাই সার।

তাঁরই জিত যে কবি সব সময় সতর্ক থাকেন, অন্য কাজে হাত দিলেও কান খাড়া রাখেন প্রেরণার পদধ্বনির জন্যে। কিন্তু তেমন কবি ক'জন। বিনু তো অনেক চেষ্টা করেও তাঁদের একজন হতে পারল না। দৈবাৎ এক আধ দিন সে আঁচল দেখে হাতের কাজ ফেলে উঠে আসে, পলাতকার আঁচল চেপে ধরে, ছাড়ে না। কিন্তু তেমন এক আধ দিন তো আঙুলে গোনা যায়। জীবনে ক'দিন। হাতের কাজ ফেলে উঠে আসার স্বাধীনতা তার নেই, জীবিকার দেবী ঈর্ষাপরায়ণা। তিনি অবশ্য নিত্য নিয়মিত বিশ্রাম দেন। কিন্তু প্রেরণাও এমন মানিনী যে বিশ্রামের সময় আসবে না, যদি আসে তো বিনুর শক্তি থাকে না তাকে ধরবার। সেইজন্যে তার সব থেকেও কিছু নেই। রূপ গুণ প্রাণ তার তূণে রয়েছে, তূণ থেকে নিয়ে ধনুকে জুড়তে পারছে না, প্রেরণা নেই। প্রেরণা যদি পায় তো শক্তি পায় না। শ্রান্ত। কিংবা সময় পায় না। ব্যস্ত।

প্রজ্ঞা

প্রেরণা এমনিতে অন্ধ। তার হাতে ছেড়ে দিলে তরী যে কোন্ পাথরে আছাড় খেয়ে ডুববে, কোন্ ঘূর্ণিতে ঘুরতে ঘুরতে তলিয়ে যাবে, তার ঠিকানা নেই। সেইজন্য প্রেরণার সঙ্গে চাই প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞার কাজ দিক দেখানো।

প্রেরণারও প্রয়োজন আছে, প্রজ্ঞারও। কেউ কারো স্থান পূরণ করতে পারে না। বিনুর এক কবি-বন্ধুর দিনরাত প্রেরণা আসত, তিনি দিবারাত্রি লিখতেন। কিন্তু কবি ও কবিতা উভয়েরই কেমন এক দিশাহারা ভাব। জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, ভাব আসে তাই লিখি। আমি তো অত ভেবেচিন্তে লিখিনে যে তোমাদের বুঝিয়ে দিতে পারব কোন্ দিকে যাত্রা, কী আছে সে দিকে।

এই নিরুদ্দেশ যাত্রার একটা উন্মাদনা আছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা নিষ্ফলতাও আছে। ট্রেনে চড়তে প্রথমটা বেশ ফুর্তি লাগে, কিন্তু ট্রেন যদি কোথাও পৌঁছে না দেয়, যদি ভুল রাস্তায় চলে বা নামবার স্টেশন অতিক্রম করে যায়, তা হলে ফুর্তির পরে আসে বিরাগ। সেটা কবির জীবনেও অবশ্যম্ভাবী। যদি না প্রেরণার সাথী হয় প্রজ্ঞা।

নিয়ে যাবার ভার প্রেরণার উপর। পৌঁছে দেবার ভার প্রজ্ঞার উপর। যাঁর মধ্যে প্রজ্ঞা জাগেনি তাঁকে প্রজ্ঞার জন্যে তপস্যা করতে হবে। কেবল সৃষ্টির আবেগ নয়, দৃষ্টির আলোকও কবির প্রার্থনীয়। সত্যিকার কবিকে একধারে স্রষ্টা ও দ্রষ্টা হতে হবে। যাঁর দৃষ্টি নেই বা চোখের উপরকার পর্দা খোলেনি তিনি লৌকিক অর্থে কবি হতে পারেন, শিল্পী হতে পারেন, কিন্তু সত্যিকার কবি বা শিল্পী হচ্ছেন মানবজাতির নেতা। জনগণমন অধিনায়ক। তিনিই যদি অন্ধ হন তবে তাঁর দ্বারা নীয়মান যারা তাদের দুর্ভাগ্য।

রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতির এই অংশটি সুবিদিত।

> "সদর স্ট্রিটের রাস্তাটা যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে সেইখানে বোধ করি ফ্রী স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেইদিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন,

আনন্দ এবং সৌন্দর্য সর্বত্রই তরঙ্গিত।"

সেই দিনই কবি 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' রচনা করেন। অনুরূপ স্বপ্নভঙ্গ অন্য অনেক কবির জীবনে ঘটেছে। বিনুরও।

দৃষ্টিলাভ

বিনুর জীবনের একটি বিশেষ দিনে নয়, একটি বিশেষ বয়সেও নয়, কিন্তু অন্তরে অকস্মাৎ দীপ জ্বলে উঠেছে। তার মনে হয়েছে সে যেন এই বিশ্বব্যাপারের তল পর্যন্ত দেখতে পেয়েছে। তার কাছে সব পরিষ্কার হয়ে গেছে, কোথাও কিছু অপরিচ্ছন্ন নেই। এ যেন সহসা বিদ্যুতের আলোয় দিক দেখা। পর মুহূর্তে সব অন্ধকার। বরং আরো নিবিড় অন্ধকার।

এ রকম একটা অভিজ্ঞতা হয়তো পাঁচ-সাত বছরে এক বার আসে। হয়তো আরো দীর্ঘ ব্যবধানে। কিন্তু যখন আসে তখন সংশয় সরিয়ে দেয় একটি চমকে। সেই একটি পলকের পরে স্বপ্নের মতো মনে হয় কী যেন দেখেছি, কিন্তু নিজের চোখকে বিশ্বাস হয় না।

স্বপ্নের মতো অলীক বোধ হলেও বিনু তার নিজের চোখে দেখেছে, এ বিশ্বের কোথাও কোনো অপূর্ণতা নেই, সব পূর্ণ। অসার্থকতা নেই, সব সার্থক। অসুন্দর নেই, অশিব নেই, অসত্য নেই, সব সত্য শিব সুন্দর। সব অমৃতময়। উজ্জ্বল।

কিন্তু দেখলে কী হবে, বিশ্বাস করা সহজ নয়। যে দেশে বারো ঘণ্টা অন্তর দিন হয় সে দেশে সূর্যের আলোয় বিশ্বাস করা সহজ। কিন্তু যে দেশে ছ'মাস রাত্রি, ছ'মাস দিন, সে দেশে যদি কোনো শিশুর প্রত্যয় না হয় যে সূর্যের আলো বলে কিছু আছে, যদি ভ্রম হয় যে আপন চোখে যা দেখেছে তা স্বপ্ন, তবে তাতে আশ্চর্য হতে নেই। সে দেশের শিশুর পক্ষে সেইটেই স্বাভাবিক।

তেমনি বিনুর পক্ষে। সে যা সত্যি দেখেছে তাও মায়া বলে সন্দেহ করেছে, কিন্তু যতই অবিশ্বাস করুক না কেন একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেনি। জীবনে যতবারই নাস্তিক বা অজ্ঞেয়বাদী হয়েছে প্রতিবারই একটি জায়গায় ঠেকেছে। ধ্যান করলেই এ জগতের পরিপূর্ণ রূপ অন্তরে উদ্‌ভাসিত হয়, যদিও তা এক নিমেষের তরে, যদিও তা স্বপ্নের মতো অলীক। বাইরের কোনো মাপকাটি দিয়ে তাকে মাপা যায় না, সেইজন্যে আরো অবাস্তব লাগে।

তা হলেও বিনুকে বাঁচিয়ে দিয়েছে তার আকস্মিক দৃষ্টিলাভ। স্বপ্নই হোক আর মায়াই হোক, আর মতিভ্রমই হোক, সে যা দেখেছে তা আছে।

রিয়ালিজম

পলকের জন্যে হলেও বিনুর দৃষ্টিতে পূর্ণতার একটা আভাস ঝলকেছে। সেই আভাসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে অতি বাস্তবকেও অপূর্ণ মনে হয়। যথার্থই তা অপূর্ণ কি না বিনু কী করে জানবে! কিন্তু যতদিন পূর্ণতার একটা আলেখ্য হাজার অস্পষ্ট হলেও জাগরূক রয়েছে তার অন্তরে, তত দিন সে আর পাঁচ জনের মতো বাস্তববাদী হতে অক্ষম। সাধারণত বাস্তব সত্য বলে যা বিকায় তা বিনুর মতে অপূর্ণ সত্য।

বিনু যে কেন রিয়ালিস্ট বলে আত্মপরিচয় দেয় না এই তার কৈফিয়ৎ। তা বলে রিয়ালিটি সম্বন্ধে তার বৈরাগ্য নেই। বরং রিয়ালিটিকেই তার দরকার বলে রিয়ালিজমে অনাস্থা। মধু চায় বলেই সে গুড় দিয়ে কাজ সারে না। তবে পৃথিবীতে গুড়ও থাকবে, গুড়ের চাহিদাও থাকবে, এমন মানুষও থাকবে যারা গুড় পেলে মধু চাইবে না। এও বড়ো মজার কথা যে, যারা মধু ভালোবাসে তারা গুড়ও ভালোবাসে এবং মাঝে মাঝে মুখ বদলায়। রিয়ালিজমে অনাস্থা আছে বলে বিনু যে রিয়ালিস্টদের রচনা দূরে সরিয়ে রাখে তা নয়। পড়ে তারিফ করে।

কিন্তু তার জিজ্ঞাসার নিরসন হয় না তাতে। এর জন্যে তাকে যেতে হয় মিস্টিকদের কাছে। মিস্টিক বলে যাঁদের পরিচয় তাঁদের রচনার সবটা আবার মিস্টিক নয়, তাই নির্বিচারে গ্রহণ করা চলে না। খাঁটি রিয়ালিজম যত না দুষ্প্রাপ্য খাঁটি মিস্টিসিজম তার চেয়েও দুর্লভ। কল্পনার মিশাল উভয়ত্র। ভাগ্যক্রমে কল্পনা কাকে বলে বিনু তা বোঝে। দেখলেই চিনতে পারে। নিজেও সে একজন কল্পনাবিহারী। নীর বাদ দিয়ে ক্ষীর যেটুকু থাকে সেইটুকু সে নেয়। নিতে নিতে সে এক সময় রিয়ালিটির স্বাদ পায়। রিয়ালিস্ট বলে যাঁরা চিহ্নিত তাঁদের লেখাতেও। মিস্টিকদের লেখাতেই বেশি। নামে কী আসে যায়! লোকে যাঁকে রিয়ালিস্ট বলে তিনি যে আদপেই মিস্টিক নন এটা ভ্রান্তি। আর লোকে যাঁকে মিস্টিক বলে তিনিও এক এক সময় রিয়ালিস্ট। একই মানুষ দুই হতে পারে। হয়ে থাকে।

দুঃখের বিষয়, মিস্টিকরা প্রায়শ সাহিত্যিক গুণে বঞ্চিত। তাঁদের লেখনী সাহিত্যিকের লেখনী নয়, তাই তাঁদের হাতে যা হয় তাকে সাহিত্য বলতে বাধে। পক্ষান্তরে রিয়ালিস্টরা সাহিত্যনিপুণ।

সত্যের অপলাপ

পূর্ণ সত্য দূরের কথা, আংশিক সত্যকেও যাঁরা সাহিত্যে রূপায়িত করতে চেয়েছেন তাঁরা লিখতে লিখতে আসলটি হারিয়ে ফেলেছেন, জোড়াতালি দিয়ে খাড়া করেছেন কাল্পনিককে। হামেশা এ রকম ঘটে। সত্য—তা সে পূর্ণই হোক আর অপূর্ণই হোক—সহজে ধরা দেয় না। ফাঁক পেলেই পালায়। পলাতকের পশ্চাদ্ধাবন করব, না লেখা শেষ করব? যদি লেখা শেষ করার তাড়া থাকে তবে কল্পনার সাহায্য নিতে হয়। রিয়ালিস্টরা দু'বেলা এই কর্ম করেন, মিস্টিকরাও তাড়া খেলে।

তাড়া জিনিসটা ভালো নয়। কিন্তু দুনিয়া জায়গাটাও সুবিধের নয়। বিনুর এক লেখক-বন্ধু তাকে একবার বলেছিলেন, "আমরা যদি ডস্টয়েভস্কি হতুম, পেটের জ্বালায় লিখতুম, আর তা হলেই আমাদের লেখা প্রাণ পেত। ক্ষুধার মতো বাস্তব কী আছে!" বিনু লক্ষ করেছে যে যাঁরা নিয়মিত লেখেন তাঁদের সকলের না হোক, অধিকাংশেরই একটা না একটা জ্বালা আছে। কিন্তু জ্বালার তাড়নায় লিখতে গেলে কল্পনার মিশ্রণ অপরিহার্য।

যেক্ষেত্রে ত্বরা নেই, প্রচুর অবসর পড়ে রয়েছে, সে ক্ষেত্রেও লেখনী বিশ্বাসঘাতকতা করে। লিখতে বললে এমন কথা বানিয়ে লেখে যা লেখকের অভিপ্রেত নয়। কার অভিপ্রেত তাও সে জানে না। লেখনীর অভিপ্রেত বললে বিশ্বাসের অযোগ্য হবে। মানতে হয় যে লেখকের ভিতরেই একজন রয়েছেন, যাঁর নাম রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'কৌতুকময়ী'।

লেখকের কল্পনাবৃত্তি তার কলমের রাশ কেড়ে নেয়, কলম চালায়। লেখক চেয়ে দেখে, তার মন্দ লাগে না।

যেমন করেই হোক কল্পনার সংক্রমণ ঘটে সত্যের সহিত। তাতে যদি সত্যের অপলাপ হয় তবে সাহিত্যে সত্যের চেয়ে সত্যের অপলাপই অধিক। সত্যের সন্ধানীদের তা হলে অন্যত্র যেতে হয়। তাঁরা দর্শন ও বিজ্ঞান অধ্যয়ন করুন। কিন্তু সাহিত্য কোনো দিন কল্পনার আঁচল ছাড়বে না। কল্পনার সঙ্গে তার আদ্যি কালের সম্পর্ক, বোধ হয় অন্ত্য কালেরও।

রক্ষা এই যে কল্পনার সাহায্য নিলে সত্যের অপলাপ ঘটে না। অন্তত বিনুর তো তাই বিশ্বাস।

সাহিত্যের সত্য

সাহিত্যের সত্য দর্শনবিজ্ঞানের সত্য নয়। কারণ সাহিত্যের সত্য কল্পনামিশ্রিত। দর্শনবিজ্ঞানের সত্য কল্পনাবর্জিত। এটা একটা মস্ত তফাৎ। কিন্তু আরো একটা তফাৎ আছে, সেটা আরো বড়ো।

দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিকরা হৃদয় দিয়ে দেখেন না, হৃদয় দিয়ে লেখেন না। তাঁদের হৃদয় আছে নিশ্চয়, কিন্তু হৃদয়ের জবানবন্দী তাঁরা প্রমাণ বলে স্বীকার করেন না। সত্য তাঁদের হৃদয়ের ভিতর দিয়ে আসে না, আসে মস্তিষ্কের ভিতর দিয়ে। তাতে হৃদয়ের শোক তাপ উল্লাস উন্মাদনা নেই। থাকতে পারত আবিষ্কারের আনন্দ। অন্বেষণের বেদনা। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক তাঁর আনন্দ বেদনা ব্যক্ত করেন না। তাঁর এক মাত্র বচনীয়, সত্য। পক্ষান্তরে সাহিত্যিক তাঁর নিজের অনুভূতির ছাপ রেখে দেন তাঁর সত্যের সর্বাঙ্গে। এমন কি, তাঁর অনুভূতিটাই অনেক সময় তাঁর সত্য। আদি কবির প্রথম শোকে উক্ত হয়েছে, অন্য কোনো মহান সত্য নয়, তাঁর নিজেরই শোকাকুল অনুভূতি।

কবিকে বেশি দূর যেতে হয় না, সে তার ঘরে বসে তার নিজের হৃদয়ে যা অনুভব করে তাও সত্য। তেমন সত্য সে প্রতি দিন জগৎকে দিতে পারে একটা অভিনব আবিষ্কার হিসাবে নয়, একটা পরিচিত অভিজ্ঞতা রূপে। সাহিত্যে কেউ কিছু আবিষ্কার করেছেন বলে শোনা যায় না। যেসব সত্য নিয়ে সাহিত্যের কারবার সেসব কোন মান্ধাতার আমলের। কবিরা চিরপুরাতনকে নিত্য নূতন অনুভব করেন, আর অপরের অনুভূতি উদ্রেক করেন। যাঁরা পড়েন তাঁদেরও সেটা একটা পুরাতন অথচ নূতন অনুভূতি।

বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক সত্যের সঙ্গে সাহিত্যিক সত্যের তুলনা হয় না প্রধানত এই কারণে। সাহিত্য মানুষের জ্ঞানের সীমা বাড়িয়ে দেয় না, সে কাজ দর্শন বিজ্ঞানের। কিন্তু সাহিত্য মানুষের হৃদয়কে একদিনও নীরস হতে দেয় না। চিরহরিৎ রাখে। সাহিত্যের সত্য হাজার হাজার বছর আগে যা ছিল আজও তাই। জীবন-মরণ সুখ-দুঃখ নিয়ম-প্রকৃতি বিরহ-মিলন প্রেম-অপ্রেম—এদের নিয়ে অন্তহীন আদিহীন বিশ্বপ্রবাহ। সতত সে পূর্ণ, সার্থক, শিব, সুন্দর, সত্য।

পরিবর্তন

সবই যদি ছিল ও রয়েছে ও থাকবে তবে পরিবর্তন কি মিথ্যা? তবে বিবর্তন কি ভ্রম? মানুষ কি মানুষ ছিল দশ লাখ বছর আগে? দশ লাখ বছর পরে মানুষ কি মানুষ থাকবে?

না, পরিবর্তন মিথ্যা নয়। বিবর্তনও নয়। জগতের প্রত্যেকটি কণা পরিবর্তমান। বিবর্তমান। দশ লাখ বছর পরে মানব বলে যদি কোনো জাতি থাকে তবে বিবর্তিত ভাবে থাকবে, হয়তো বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান হয়ে সে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে উপনিবেশ স্থাপন করবে। হয়তো এক একটি ব্যক্তি এক এক হাজার বছর বাঁচবে। হয়তো জরা ব্যাধি দারিদ্র্য কারো জীবন কালো করবে না। সব অবিচার সব অত্যাচার বিলুপ্ত হবে।

কিন্তু হাসি-কান্না সুখ-দুঃখ প্রেম-অপ্রেম যাবে কোথায়! দশ কোটি বছরের পরেও বিরহ-মিলনের অবসান নেই। আর মৃত্যু? মর্ত্য যতকাল মৃত্যু ততকাল। কাল যতকাল মর্ত্য ততকাল। ততকাল মানুষ হয়তো টিকবে না, বিজ্ঞানের বল অসীম নয়। কিন্তু যে থাকবে সে মানুষেরই মতো বাঁচবে ও মরবে, হাসবে ও কাঁদবে, পাবে ও হারাবে, ভালোবাসবে ও ভালোবাসা চাইবে। এ সকলের পরিবর্তন নেই, যদি থাকে তো বাইরের দিকে। এদের পরিবর্তন ধরণ ধারণে।

তখনকার মানুষ বা নরদেব এমনি ব্যর্থ হবে বিশ্বব্যাপারের অর্থ খুঁজে। এমনি পুরস্কৃত হবে অকস্মাৎ চপলা চমকে। এমনি সাধনা করবে অপরূপকে রূপ দিতে, অনির্বচনীয়কে বচন দিতে। দিতে গিয়ে হারাবে, যা দেবে তার অনেকখানি কল্পনা। কৌতুকময়ী তখনো তার লেখনী নিয়ে খেলা করবে। আর তার অনুভূতি তাকে বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক হতে দেবে না, সাহিত্যিক বা শিল্পী হইয়ে ছাড়বে।

বিনুর সেইজন্যে এক এক সময় মনে হয়, কাল একটা মায়া। যা আছে তা সত্তা আর তার রূপ রূপান্তর। এ-ই রিয়াল, বাকি আনরিয়াল। বিনু মাঝে মাঝে মায়াবাদী হয়ে ওঠে।

প্রকৃতি

বিনুর হুঁশ হয় যখন খিদে পায়, শীত করে, মাথা ধরে। তখন আর মায়াবাদ নয়, রূঢ় বাস্তববাদ। তখন সে বেশ ভালো করেই বুঝতে পারে সন্ন্যাসীরা কেন প্রকৃতির প্রতি বিরূপ। প্রকৃতি ঠাকরুন এমন সুরসিকা—অথবা এমন অরসিকা—যে, শীতকালে শীত পাইয়ে দেন, রাত্রিকালে ঘুম পাইয়ে দেন, দিনে অন্তত একবার খিদে পাইয়ে দেন। বয়সকালে আর যা পাইয়ে দেন তা বলে কাজ নেই।

প্রকৃতির এই দাসত্ব কারই বা সহ্য হয়! মানুষ তাই যুগে যুগে এর থেকে পরিত্রাণ চেয়েছে এবং তাকেই ঠাওরেছে মুক্তি। বিনুরও বিশ্রী লাগে যখন তার অনুভূতি বা কল্পনার মাঝখানে হঠাৎ আবির্ভাব ঘটে ক্ষুধার বা পিপাসার। ওসব ছোট কথা ভাবতে নেই, কিন্তু যতক্ষণ না এক গ্লাস জল বা একটা ফল পেটে পড়েছে ততক্ষণ সব বড়ো বড়ো চিন্তা ঘুলিয়ে যায়। ভীষণ রাগ ধরে প্রকৃতি ঠাকুরানির উপর। এ কী রঙ্গ তাঁর! অসময়ে রসভঙ্গ কেন!

বিনুকে কত লোক বলেছে, "জীবনটা তো বেশ ভালোই। কিন্তু যদি পেটটা না থাকত!" বিনু কি সহজে তা মানতে চায়, কিন্তু সময় মতো চারটি খেতে না পেয়ে মানতে

বাধ্য হয়েছে। ছেলেবেলায় ভাবতে হয়নি, মা-ঠাকুমা ছিলেন। বড়ো হয়ে কলেজের মেসে হস্টেলে পেট ভরে খেতে পায়নি, অগত্যা মেনেছে। শোনা যায়, জলতেষ্টার সময় একটু জল খেতে না পেয়ে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য শক্তি-বন্দনা করেছিলেন। গঙ্গার স্তোত্র। প্রকৃতি আমাদের সকলেরই মাথা হেঁট করিয়ে ছাড়ে! এক ভদ্রমহিলা বেশ একটু ঢং করে বলেছিলেন, "ওমা! ভাবতে ঘেন্না লাগে, গুরুদেব দাঁত দিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে খান।" তিনি নাকি শক পেয়েছিলেন স্বচক্ষে দেখে। তাঁর বোধ হয় ধারণা ছিল গুরুদেব যখন, তখন কোনো অলৌকিক উপায়ে জীবন ধারণ করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকেও আহার করতে হয়। দাঁত দিয়ে।

প্রকৃতি দেবীর এই রাগরঙ্গ যে মানুষকে কত রকম শোচনীয় অবস্থায় ফেলে ও অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করায় তার লেখাজোখা নেই। রিয়ালিস্ট বলে যাঁরা পরিচয় দেন তাঁদের প্রধান কর্ম হল প্রকৃতির হাতে মানুষের বাঁদর নাচ ফলাও করে আঁকা। বিনু কিন্তু ওটাকে পরিহাস বলে উড়িয়ে দেয়। দাসত্বের গ্লানি তার গায়ে লাগে না, কারণ যাঁর দাসত্ব তিনি যে রঙ্গিণী।

নখদন্ত

কিন্তু তামাশা নয়। ইংরেজিতে একটা বচন আছে, প্রকৃতি নখদন্তে রক্তিম। ক্ষুধার আহার আহরণ করবার জন্যেই এসব। প্রতিদিন কী নৃশংস জীবহত্যা চলেছে গ্রামে নগরে জঙ্গলে জলে! এমন কি আকাশেও! পাখিদের ডানা দেওয়া হয়েছে খোরাক জোটানোর জন্যে।

মানুষের সমরসম্ভার—সঙিন বন্দুক মেশিনগান কামান ট্যাঙ্ক এরোপ্লেন—সেই নখদন্ত ও ডানার রকমফের। মানুষ এসব দিয়ে আহার সংগ্রহ করে, দুর্বলের রক্ত শোষে। সভ্যতার মুখোশ খসে পড়ে যুদ্ধ বিগ্রহের উত্তেজনায়। শিউরে উঠতে হয় দাঁত দিয়ে চিবিয়ে খাওয়া দেখে। বিনুবাবু যে সন্দেশ খান সে কোন গরিবের ছেলের না-খাওয়া দুধ। তিনি যে নিরামিষাশী হয়ে ত্রাণ পাবেন সে পথ বন্ধ।

তারপর খবরের কাগজে নারীধর্ষণের বার্তা পড়ে সে আঁতকে ওঠে। কী সর্বনাশা প্রবৃত্তি! দেয়ালে টিকটিকির কাণ্ড দেখে তার গায়ে কাঁটা দেয়। এই বিভীষিকার নাম বংশরক্ষা! মানুষ বলো, ইতর প্রাণী বলো, পৃথিবীতে এসেছে এই করে, টিকে আছে এই করে, লক্ষ লক্ষ বছর টিকে থাকার দাবি রাখে এই করে। রূঢ় বাস্তব। নিষ্ঠুর বাস্তব।

প্রকৃতি যার নাম সেটা একটা দুঃস্বপ্ন। তার হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে সন্ন্যাসী হওয়াই শ্রেয়। কেবল সন্ন্যাসী নয়, পওহারী। বায়ুভুক্। এ কথা বিনু কত বার ভেবেছে। কিন্তু তার অন্তর সায় দেয়নি। আবার এর বিপরীতটাও ভেবেছে। বীরাচারী হতে চেয়েছে। তাতেও অন্তরের আপত্তি। প্রকৃতির সঙ্গে অসহযোগের নাম সন্ন্যাস। অতি সহযোগের নাম বীরাচার। উভয়ের উদ্দেশ্য একই। সেই দুঃস্বপ্ন থেকে নিস্তার।

কিন্তু সত্যিই কি সেটা একটা দুঃস্বপ্ন? না, বিনু যে তাকে শুভদৃষ্টির আলোয় দেখেছে। যদিও চকিতের দেখা তবু চিরকালের চেনা। যাই হোক না কেন তার বাইরের পরিচয়, সে দুঃস্বপ্ন নয়। তার হাত থেকে নিস্তারের কথা ওঠেই না। ওটা এক প্রকার প্রচ্ছন্ন জড়বাদ। ওতে মুক্তি নেই। সত্যিকার মুক্তি প্রকৃতিকে স্বীকার করে, তার সঙ্গে সম্বন্ধ পাতিয়ে, তার

উদ্দেশ্যের সঙ্গে উদ্দেশ্য মিলিয়ে, ছন্দের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে। সত্যিকার মুক্তিলীলার নামান্তর। নিত্য লীলার।

ছন্দ রক্ষা

সূর্য চন্দ্র গ্রহ তারা থেকে অণু পরমাণু পর্যন্ত যেখানে যে কেউ আছে, যা-কিছু আছে, সকলেই আপন আপন অস্তিত্বে অন্তর্হিত ছন্দ রক্ষা করে চলেছে। কারো মুখে কোনো নালিশ নেই। একমাত্র ব্যতিক্রম মানুষ। প্রকৃতি দেবী বোধ হয় জানতেন না যে মানুষ তাঁর শাসন মানবে না, বিদ্রোহ করবে।

বিদ্রোহের কারণ কি নেই? প্রতি দিন এ জগৎ মানুষের দেহমনকে আঘাত করছে, মানুষের বুকে বাজছে। কয়েকদিন আগে দেখি একটা বাচ্চা হনুমান আমার আপিসঘরে ঢুকে কী করছে। আমাকে দেখেই চেঁচামেচি করতে করতে জানালা দিয়ে এক লাফ। কিন্তু লাফ দেবার পর ক্ষণেই পুনঃপ্রবেশ। তাকে তাড়িয়ে দিয়ে জানালাটা বন্ধ করে দেওয়া গেল। কিন্তু তার পরে যা শুনলাম তাতে আমার মনে হল অন্যায় করেছি। ও ছিল শরণাগত। অনেকক্ষণ ধরে শুনতে থাকলুম বাইরে লাফালাফি দাপাদাপি চলেছে, একটা হনুমান তাকে মারতে তাড়া করে আসছে, তার মা তাকে কোলে চেপে ধরছে, অন্যান্য মায়েরাও তাকে ঘিরে বসছে। শুনলুম হনুমানের দলে একটিমাত্র পুরুষ আর সকলে নারী। যেমন বৃন্দাবনে। এই হতভাগা শিশু হনুমানটি পুরুষ। তাই এঁর জনক স্বয়ং এঁকে বধ করতে চান। জনকের চোখে ইনি সন্তান নন। ইনি প্রতিদ্বন্দ্বী। এঁকে বড়ো হতে দেওয়া নিরাপদ নয়। এই বয়সেই দাঁত দিয়ে পেট চিরতে হবে। শুনলুম এ রকম দৃশ্য প্রায়ই দেখা যায় যে, হনুমান তার ছেলের পেট চিরে রাস্তায় ফেলে গেছে। বীভৎস দৃশ্য।

তবে এও শোনা গেল যে মায়েরা তাদের ছেলেদের কোনো মতে বাঁচিয়ে সন্ন্যাসী হনুমানের দলে ছেড়ে দেয়। সে দলে সকলেই পুরুষ সকলেই চিরকুমার। সেই চিরকুমার সভার সভ্য হয়ে শিশুটি প্রাণে বাঁচে। আমাদের রামায়ণের হনুমান বোধ হয় সন্ন্যাসী হনুমানের দলে 'মানুষ' হয়েছিলেন। পালের গোদা হলে তিনি এক পাল স্ত্রী নিয়ে আটকে পড়তেন, শ্রীরামের দূত হয়ে লঙ্কায় লাফ দিতে গেলে হারেমটি বেহাত হত। বালীর হারেম তো সুগ্রীবকে ভজনা করল বালী মরতে না মরতে। হনুমানদের সমাজে গণিকা আছে কি না খবর নিলে হয়। তা হলে মানব-সমাজের প্যাটার্ন মানব-বিবর্তনের পূর্বেই স্থির হয়ে গেছে বলতে হবে।

বিদ্রোহের কারণ কি নেই? মানুষের ন্যায় অন্যায় বোধ, দয়া মায়া, কেমন করে সহ্য করবে এ ব্যবস্থা!

ছন্দ-জিজ্ঞাসা

মানুষ যা হয়েছে তা বিদ্রোহ করতে করতেই হয়েছে। প্রকৃতির শাসন মেনে নিলে এত দিন হনুমান হয়ে রইত! মানুষের ছন্দ রক্ষা তা হলে বিদ্রোহের অধিকার অব্যাহত রাখা। তার ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় রক্তের দাগ। এটা অকারণ নয়। যখনি যে টুঁ শব্দটি করেছে পালের

গোদা তার গলা টিপে ধরেছে, কোনো মতে ছাড়ান পেয়ে সে গোদার বিরুদ্ধে দল পাকিয়েছে, পরে এক দিন নিজেই গোদা হয়ে গদিয়ান হয়েছে। তখন তার বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ।

কিন্তু এই কি সব? মানুষ কি কেবল বিদ্রোহ করেছে, বিদ্রোহের দ্বারাই এক প্রকার ছন্দ রক্ষা করেছে? না, না। মানুষ তো শুধু মানুষ নয়, সে সত্তা। সে সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র নীহারিকার সাথী। সে চলে অণু পরমাণুর সাথে তাল রেখে। তাকে ডাক দিয়ে যায় শরতের মেঘ, বসন্তের হাওয়া। সে সাড়া দেয় বাঁশের বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে। গুহার গায়ে হিজিবিজি এঁকে। এমনি করে সংগীতের বিবর্তন, চিত্রকলার বিবর্তন হয়েছে। কাব্যের, ভাস্কর্যের, স্থাপত্যের। আর্ট এই ভাবে বিবর্তিত হয়েছে। আর্টের সঙ্গে সংগতি রেখে রিলিজন। কিংবা রিলিজনের সঙ্গে সংগতি রেখে আর্ট।

মানুষকে বিদ্রোহী বললে অর্ধেক বলা হয়, হয়তো অর্ধেকেরও কম। মানুষ যে পরিমাণে পৃথক সে পরিমাণে বিদ্রোহী। যে পরিমাণে অভিন্ন সে পরিমাণে সূর্য নক্ষত্রের ধারাবাহী। তার ছন্দরক্ষা তাদেরই মতো অস্তিত্বের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য মেনে চলা। হঠাৎ মনে হতে পারে এটা একটা নিরুদ্দেশ যাত্রা। কিন্তু সেটা আমাদের ভ্রম। এই বিরাট বিশ্বব্যাপারের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য আমাদের জ্ঞানবুদ্ধির কাছে নিত্য নিয়ত একটা চ্যালেঞ্জ। রহস্যভেদ করতে কৃতসংকল্প হয়ে আমরা দর্শন বিজ্ঞানের শিখরে উঠেছি। কিন্তু শিখরের পরে শিখর, তার পরে শিখর, একটা আর একটার চেয়ে উঁচু। কবে যে আমরা চরম উচ্চতায় উপনীত হব কেউ বলতে পারে না, বোধ হয় কোনো দিনই না। ইন্‌টেলেক্ট দিয়ে যতটা রহস্যভেদ সম্ভব ততটা হবে। সঙ্গে সঙ্গে চর্চা চলবে ইন্‌টুইশনের। আর্ট, রিলিজন, এসব ইন্‌টুইশন-মার্গী।

বিনুর প্রিয়া তার কণ্ঠে শুনেছিলেন একটা বিদ্রোহের সুর, তাই তাকে ভালোবেসেছিলেন। সে বলল, যাকে তুমি ভালোবেসেছ সে আমার সবটা নয়। আমি কেবল বিদ্রোহী নই। আমি স্রষ্টা। আমি দ্রষ্টা।

দ্বন্দ্ব ও ছন্দ

সে ছান্দসিক। সে সুরসিক। সে সুপুরুষ। "জনম কৃতারথ সুপুরুষ সঙ্গ।" যে তাকে ভালোবাসবে সুপুরুষ বলেই ভালোবাসবে, সঙ্গ চাইবে। তা যদি না পারে, যদি ভালোবাসে একালের পালের গোদাদের দুশমন ও ভাবীকালের পালের গোদা বলে, তবে তার অভিমানে বাজে। এই হতভাগা হনুমানগুলোই কি তা হলে পৌরুষের প্রতিমান? এদের সঙ্গে বলপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এদেরই অনুরূপ হওয়া কি তার জীবনের সার্থকতা? যদি এদেরই অনুরূপ না হয় তবে কী রূপ হবে? অতিহনুমান?

দ্বন্দ্বের যেমন একটা বীরত্বের দিক আছে তেমনি আছে একটা অনুকরণের দিক। হনুকরণের। মানুষ যার সঙ্গে লড়াই করে তারই ধারা ধরে। তারই ধাঁচে গড়ে ওঠে। এটা যে তার আন্তরিক অভিলাষ তা নয়। কিন্তু যুদ্ধে জেতার অপরিহার্য শর্ত। নাৎসীদের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে ডেমক্র্যাটরাও নাৎসী হয়ে উঠছে না কি?

বিনু অবশ্য তখনকার দিনে অতটা ভাবেনি, অত দেখতে পায়নি। কিন্তু এটুকু সে

ভালো করেই বুঝেছিল যে তার প্রিয়া তাকে যা হতে বলেছেন তা যদি সে হয় তবে নিজের মনের মতো হবে না। নিজেকে হারিয়ে বসবে। যে মানুষ তার আপনাকে হারিয়েছে সে যদি সারা দুনিয়াটা পায় তবে তার এমন কী লাভ? বাইবেলে এ কথা জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। এটা প্রকারান্তরে উপনিষদেরও জিজ্ঞাসা। যাতে আমাকে অমৃত করবে না তা নিয়ে আমি কী করব? বিনু বিদ্রোহী বটে, কিন্তু সেই তার একমাত্র পরিচয় বা শ্রেষ্ঠ পরিচয় নয়। সে তার শ্রেষ্ঠ পরিচয়টাই বহন করবে। এর জন্য যদি দ্বন্দ্ব থেকে সরে দাঁড়াতে হয় তাও সই।

না, সরে দাঁড়াতে হবে না। দ্বন্দ্ব করা যাবে। কিন্তু চোখ খোলা রেখে। জয়ের জন্য সর্বস্ব না দিয়ে। সে বরং একশো বার হারবে, তবু আপনাকে হারাবে না। দ্বন্দ্ব বড়ো নয়, ছন্দই বড়ো। বিশ্বব্যাপারের বৃহত্তর বিধান ছন্দ রক্ষা। তার মধ্যে দ্বন্দ্বের স্থান আছে। তার উপরে নয়।

বিনুর দ্বন্দ্ব

বিনুকে অনেক দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে। কিন্তু আমরা তার জীবনী আলোচনা করছিনে। তার সাহিত্যিক হয়ে ওঠার পিছনে কোন্ কোন্ শক্তি চক্রান্ত করছিল তাদেরই উপর আলোকপাত করছি। যারা সে চক্রান্তে যোগ দেয়নি তাদেরও গায়ে হয়তো আলোর ছটা পড়েছে। সেটা অনিচ্ছাকৃত ও অবান্তর। তা বলে তাদের বাদ দেওয়া যায় না।

দ্বন্দ্ব যে অপরিহার্য বিনু তা মানত। না মেনে উপায় ছিল না। কিন্তু দ্বন্দ্বের জন্য যে সব দিতে হবে, সব দিতে দিতে আত্মাকেও, কিছুতেই এটা তার সইত না। যা সইতে পারে না তারই বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহ যখন তার সহনের অতীত হয় তখন বিদ্রোহের বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহী হয়।

তার বন্ধুরা খোঁচা দিয়ে বলেন সে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী। সে তা স্বীকার করে নেয়। আত্মস্বাতন্ত্র্যবাদী বললে বোধ হয় আরো যথার্থ হত। কী করে যে কেউ তার আত্মস্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিতে পারে বিনুর তা বোধগম্য হত না, এখনো হয় না। আত্মসম্মান বিসর্জন দিক দেখি! তখন সকলে ছি ছি করে উঠবে। কিন্তু আত্মস্বাতন্ত্র্যের বেলা উলটো বিচার।

এই নিয়ে ঠোকাঠুকি বেধে যায় তার নিজের বন্ধুদের সঙ্গে। সে যে কোনো দিন দল গড়তে পারে না, দলের একজন হতে পারে না, দলে টিকতে পারে না এটা আশ্চর্য নয়। অথচ দলই তো একালের বলপরীক্ষার পূর্বস্থল। দলের আখড়ায় পাঁয়তারা না কষে কেউ কি আজকাল বাইরের ময়দানে কুস্তি লড়ে? কোনো দলেই যার ঠাঁই নেই কুরুক্ষেত্রে সে একলব্য। একলব্যেরই মতো তার বুড়ো আঙুল কাটা।

বিনুর দ্বন্দ্ব সেইজন্যে নিষ্ফল। একা মানুষের কলম চালনায় কোনো হনুমানের হনু ভাঙে না, তার দাঁত আস্ত থাকে। তা হলেও তাকে এক হাতে লড়াই চালাতে হবে।

বিনুর ছন্দ

আমি স্বতন্ত্র—এ যেমন সত্য, আমি অভেদ—এও তেমনি। বিশ্বের কেন্দ্র যেখানে সেইখানে আমারও কেন্দ্র। জীবনের কোনো অবস্থায় যেন কেন্দ্রচ্যুত না হই। যেন কেন্দ্রের সঙ্গে

সংযুক্ত থাকি। বিনু যাকে ছন্দ বলে তার অন্য নাম কেন্দ্রানুগত্য।

সে যতই স্বতন্ত্র হোক না কেন উৎকেন্দ্রিক নয়। তেমন স্বাতন্ত্র্যের ফল ছন্দপতন। নাচতে নাচতে তাল কেটে গেলে স্বর্গের অপ্সরাদেরও স্বর্গ হতে বিদায়। কবিদেরও কারো কারো জীবনে তাই ঘটে। স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য তাঁদের মত্ত করে, তাঁরা ভুলে যান যে জগতের কোথাও একটা কেন্দ্র আছে, সেই কেন্দ্রের প্রতি বিশ্বস্ততার দায় আছে, কেননা সেটা তাঁদের নিজেদেরই কেন্দ্র। এই বিস্মৃতির পরিণাম উৎকেন্দ্রিকতা। সেটা একটা অভিশাপ। অবশ্য শাপমোচনের পথ খোলা থাকে।

বিনুর ছন্দের আদর্শ তখন থেকে একই রকম আছে। প্রেমই তাকে তার ছন্দের আদর্শ দেয়। কিন্তু তার প্রিয়ার এতে ঠিক সহযোগ ছিল না। তাঁর চোখে দ্বন্দ্বের আদর্শই বড়ো ছিল। এত বড়ো যে ওর তুলনায় ছন্দের আদর্শ অকিঞ্চিৎকর। বিনু তাঁকে যত বার বোঝাতে যেত তত বার ব্যর্থ হত। তিনি মনে করতেন বিনু দ্বন্দ্বকাতর বলেই ছন্দের আড়ালে মুখ ঢাকছে। তার হাতে তলোয়ার নেই, আছে শুধু ঢাল। কোনো মতে আপনার চামড়াটি বাঁচানো একটা মহৎ আদর্শ নয়। তেমন করে এ ধরণী নবীন হবে না।

এই আদর্শবিরোধ বিনুর ভিতরেই রয়েছে। দুই আদর্শের ঠোকাঠুকি তাকে বিনিদ্র করেছে, সে নিজেই অনেক সময় বুঝতে পারেনি, বোঝাবে কাকে!

কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে এসব কথা বোঝাও যায় না, বোঝানোও যায় না। অনুভূতি দিয়ে বুঝতে হয়। কবিতার ছন্দের জন্যে যেমন কান তৈরি করতে হয় তেমনি জীবনের ছন্দের জন্যে অন্তঃকরণ।

প্রেমের দ্বারা অন্তরের বিকাশ হয়। বিনুর জীবনে যেদিন প্রেম এল সেদিন এল বিকাশের প্রতিশ্রুতি। এক দিনের কাজ নয়, প্রতি দিনের কাজ। হয়তো এক জীবনের নয়, কোটি জীবনের। প্রেমের যেমন সীমা নেই, শেষ নেই, বিকাশেরও নেই চরম। সাহিত্য এই বিকাশের প্রকাশিত রূপ।

প্রেম

প্রেম হচ্ছে সেই রস যা বিশ্ববনস্পতির মূল থেকে ফুল পর্যন্ত প্রবাহিত। আদি রস বললে ভুল বলা হয় না, কিন্তু তাই যথেষ্ট নয়। আদি রস, মধ্য রস, অন্ত্য রস, অনাদি ও অনন্ত রস। সর্ব রস। শুদ্ধ রস। রস।

বিশ্বব্যাপারের সঙ্গে যার এমন সম্পর্ক তাকে নিছক জৈব ব্যাপার কিংবা মানবিক ব্যাপার বললে খাটো করা হয়। ছোটখাটো মানুষেরা সেই রকমই ভাবে। তাদের জীবনযাত্রার সুবিধা অসুবিধার দিক থেকে ভাবলে আগুনকেও তেমনি ছোটোখাটো দেখায়। উনুনের আগুন। লণ্ঠনের আগুন। বিড়ির আগুন। তাদের বিশ্বাস হয় না যখন শোনে, সেই একই আগুন জ্বলছে আকাশ জুড়ে তারায় তারায়। জলের স্থলের প্রতি কণিকায়।

কার ঘর কখন পোড়ে তার জন্যে আগুনের মাথাব্যথা পড়েনি, সে তার নিজের নিয়মে চলে। সেটাও একটা নৈতিক বিধান। অনীতি বা দুর্নীতি নয়। গার্হস্থ্য নীতির সঙ্গে তার যদিও স্বতোবিরোধ নেই তবু সব সময় মিলও নেই। মাঝে মাঝে হাতও পোড়ে, কালেভদ্রে ঘরও পোড়ে, কদাচিৎ মানুষও পোড়ে। সকলে স্বীকার করে যে সেটা স্বাভাবিক।

এত দূর স্বাভাবিক মনে করে যে বোমার আগুনে যখন শহরকে শহর পুড়ে যায় তখনো আগুনকে দোষ দেয় না। যারা আগুন নিয়ে খেলা করে তাদের নিরস্ত হতে বলে না।

অথচ প্রেমের বেলায় অন্য কথা। এখানে পারিবারিক ও সামাজিক নীতি অগ্রগণ্য। এর বাইরে বা উপরে যদি কিছু থাকে তবে সেটা দুর্নীতি ও অনীতি। ইহুদী সমাজে লোষ্ট্রাঘাতের ব্যবস্থা ছিল, যীশু এসে বললেন, কে আগে ঢিল ছুঁড়বে! কে এত নির্মল! অন্যান্য সমাজে আর কিছু না হোক বহিষ্কারের ব্যবস্থা আছে। অসম্মানের ব্যবস্থা। মোটের উপর, মানুষের সমাজে প্রেমের স্বীকৃতি ভয়ে ভয়ে, ডুবে ডুবে, চুপে চুপে। এটা প্রেমের পক্ষে কলঙ্কের নয়, মানুষের পক্ষেই কলঙ্কের।

হাঁ, মানুষ এখনো পিছিয়ে রয়েছে। তার নীতিবোধ এখনো সংকীর্ণ। তাই কথায় কথায় প্রেমকে বলা হয় দুর্নীতি বা অনীতি। আর্টকে বলা হয় ইম্‌মরাল বা আমরাল। বিনু এটা মানে না, মানতে পারে না, কারণ সে একটা বৃহত্তর নীতির আভাস পেয়েছে। তাতে বিপদ আছে। কিন্তু বিপদ বরণ করাই তো মনুষ্যত্ব।

প্রেমের গুরু

বিনুর জীবনে প্রেমের আবির্ভাব এই প্রথম নয়। কিন্তু এবার যে এল সে আগুন। এমন প্রচণ্ড দাবি তার কাছে কেউ কোনো দিন করেনি। এই দাবির প্রচণ্ডতা তাকে পুরুষ করে তুলল। মানুষ করে দিল। সে দায়িত্ব নিতে, বিপদ বরণ করতে শিখল।

প্রেমের রাজ্যে এত দিন তার পথপ্রদর্শক ছিলেন চণ্ডীদাস ও দান্তে। চণ্ডীদাসের মতো সেও একদিন সহজিয়া হবে, উত্তমা নায়িকার সঙ্গলাভ করবে, নায়িকার মধ্যে দেবতাকে পাবে। "এই মানুষে আছে সেই মানুষ।" ভালোবাসতে জানলে এই মানুষের মধ্যেই সেই মানুষকে ভালোবাসা যায়। যারা ভালোবাসতে জানে না তারাই মানুষকে ফেলে মূর্তি পূজা করে, তীর্থে তীর্থে বেড়ায়, হিমালয়ে অদৃশ্য হয়। বিনুর ভগবান উত্তমা নায়িকা। সে সহজিয়া।

তারপর দান্তের প্রভাব পড়ল তার জীবনে। তখন সে ভাবল, ইহলোকে হয়তো তার বিয়াত্রিসের সঙ্গসুখ পাবে না। কিন্তু ইহলোক আর কতটুকু! মৃত্যুর পরে এক দিন তার বিয়াত্রিস তার সঙ্গিনী হয়ে তাকে ধন্য করবে, তাকে নিয়ে যাবে তারা হতে তারায়, লোক হতে লোকান্তরে, স্বর্গ হতে বৈকুণ্ঠে। তাকে পৌঁছে দেবে দেবতার চরণপ্রান্তে। দুজনে মিলে বন্দনা করবে তাঁকে। নারীর হাতেই দেবমন্দিরের চাবি। নারীর করুণা হলে দেবতার করুণা। মধ্যযুগের ইউরোপীয় কবিদের মতো বিনুর মনে হতে লাগল সেও একজন ত্রুবাদুর (troubadour)। সে আর নারীকে ইহলোকের জন্যে চাইল না, দূরে দূরেই রাখল।

দূরের মানুষ যে এই জীবনেই আপনি এসে তার কাছে টানবে এর জন্যে সে প্রস্তুত ছিল না। কেমন করে তার হাতে পড়ল সুইডিশ লেখিকা এলেন কেই-র লেখা 'প্রণয় ও পরিণয়'। তখন থেকে তিনিই হলেন তার পথপ্রদর্শক। সোক্রেটিসের যেমন ডিওটিমা, বিনুর তেমনি এলেন। তিনি যদি বেঁচে থাকতেন বিনু ইউরোপে গিয়ে তাঁর কাছে পাঠ নিত।

পরম প্রেম

এলেন কেই (Ellen Key) বিনুর মতো জিজ্ঞাসুদের জন্যে লিখে গেছেন :

"The power of great love to enhance a person's value for mankind can only be compared with the glow of religious faith or the creative joy of genius, but surpasses both in universal life-enhancing properties. Sorrow may sometimes make a person more tender towards the sufferings of others, more actively benevolent than happiness with its concentration upon self. But sorrow never led the soul to those heights and depths, to those inspirations and revelations of universal life, to that kneeling gratitude before the mystery of life, to which the piety of great love leads it."

পরবর্তী জীবনে বিনুর ধর্মে বিশ্বাস টলেছে, আর্টে বিশ্বাস টলমল করেছে; কিন্তু প্রেমে বিশ্বাস অটল রয়েছে। প্রেমে বিশ্বাস দৃঢ় থাকায় একে একে দৃঢ় হয়েছে আর্টে বিশ্বাস, ধর্মে বিশ্বাস। শক্তি সবচেয়ে প্রেমেরই বেশি। বিনু তার সাক্ষী।

"How can Love, one of the great lords of life, take its freedom from the hands of society any more than Death, the other can do so? ...Love and Death...only these two powers are comparable in majesty."

একথাও লিখে গেছেন তিনি বিনুর মতো বিশ্বাসীদের জন্যে।

প্রেম বনাম সমাজ

বিশ্বের মূলনীতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে নরনারীর প্রেম নীতিসম্মত, সমাজের সম্মতি থাক বা না থাক। তাকে কাম বলে ধিক্কার দিয়ে লাভ নেই, কেননা বিশ্বের মূলনীতি তার স্বপক্ষে। আর ধিক্কার শুনে কেউ কোনো দিন বিরত হয়নি, যদি না ইতিমধ্যে অবসাদ এসে থাকে।

কিন্তু একান্নবর্তী পরিবারে অনেক সময় দাম্পত্য প্রেমও ভর্ৎসিত হয়। কারণ তাতে গুরুজনের সেবাযত্নের ত্রুটি ঘটে। বিবাহের বাইরে যে প্রেম তার নিন্দা সকলের মুখে। কেননা তার দরুন সমাজে বিশৃঙ্খলা জন্মায়। সামাজিক প্রেম গুরুজনের মনঃপূত না হলেও তাকে দুর্নীতি বলার সাহস নেই কারো। কিন্তু অসামাজিক প্রেমকে দুর্নীতি বলতে সাহসের অভাব হয় না। তাই ওটা দুর্নীতি। সকলেই যখন একমত তখন দুটিমাত্র মানুষের প্রতিবাদে কী আসে যায়!

বিনুর মনটা সমাজের বিরুদ্ধে রুখে রয়েছিল তখনকার দিনে। যে সমাজ নারীকে সতী আখ্যা দিয়ে জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরেছে একশ বছর আগে তার নীতিবোধের উপর বিনুর ভরসা ছিল না। ইংরেজরা চলে গেলে সতীদাহ প্রথার পুনঃপ্রবর্তন হবে না, কে এ কথা জোর করে বলতে পারে! ইংরেজরা বহুবিবাহ করে না বলে ইংরেজি শিক্ষিতরাও করছে না। কিন্তু সামান্য একটু ছুতো পেলেই আর একটা বিয়ে করতে বাধে না। মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে না দেখে খবরের কাগজে বহুবিবাহের জন্যে হাহুতাশও ছাপা হয়।

তারপর এক এক সমাজের এক এক রীতি! মুসলমান সমাজে তালাক চলে, তিব্বতে এক নারীর একাধিক স্বামী গ্রহণ। বর্মায় বিবাহের বাঁধাবাঁধি নেই, মালাবারে ক্ষত্রিয় কন্যাদের

নামমাত্র ব্রাহ্মণের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে একই আসরে ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়। বিচিত্র সংসার। বিচিত্রতর সংস্কার।

এ সমস্ত দেখেশুনে বিনুর ধারণা দৃঢ় হয় যে, সমাজের বিচারে যা দুর্নীতি তা নিরপেক্ষ বিচারে সুনীতি হতে পারে। নিরপেক্ষ বিচারক সামাজিক মানদণ্ড নির্বিবাদে স্বীকার করে নেন না। তাঁর মানদণ্ড বৃহত্তর বিশ্বের মূলনীতির মানদণ্ড। মূলনীতিও বটে, স্থির নীতিও বটে। তার নড় চড় হয় না।

স্থির নীতি

স্থির নীতি বলে অস্থির জগতে কিছু আছে কি না বিনু দীর্ঘকাল অন্বেষণ করেছে। থাকবে না কেন? চক্রের সবটাই কি অস্থির। যেটা তার কেন্দ্র সেটা কি ঘোরে। গতি যেমন সত্য স্থিতিও তেমনি। তা যদি না হত গতি কোন দিন ফুরিয়ে যেত।

বিনু জড়বাদী বা বস্তুবাদী নয়, যদিও প্রচলিত অধ্যাত্মবাদেও তার অভক্তি। সে বিশ্বাস করে যে ভালো মন্দ ন্যায় অন্যায় প্রভৃতি নৈতিক শক্তিও এ জগতে কাজ করছে, যদিও তাদের কেউ দূরবীক্ষণ বা অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখতে পায় না, যদিও তাদের কোনো ওজন বা পরিমাণ নেই। তাদের অস্তিত্ব অঙ্ক কষে প্রমাণ করা যায় না, তবু তারা আছে ও আমাদের জীবনে আলো আঁধারের ছক কাটছে।

একজনের পক্ষে যা ভালো আর এক জনের পক্ষে তা ভালো নয়। এই যুক্তি দিয়ে স্থানকালপাত্রনিরপেক্ষ মঙ্গলকে উড়িয়ে দিতে বিনু পারে না। কিংবা স্থানকালপাত্রনিরপেক্ষ ন্যায়কে। অথচ প্রমাণ করাও তার সাধ্যের অতীত। যার নীতিবোধ জাগেনি সে কিছুতেই বুঝবে না। যার নীতিবোধের চেয়ে স্বার্থবোধ প্রবল সে বুঝেও বুঝবে না। তা বলে কবিরা যদি সন্দিহান হন তবে গ্রীক ট্র্যাজেডি নিরর্থক, রামায়ণ মহাভারত তাৎপর্যহীন। বিনু অবশ্য ইঙ্গিত করছে না যে, ন্যায়ের জয় বা মন্দের ক্ষয় প্রতিপাদন করতে হবে। প্রতিপাদন করা কবিদের কর্ম নয়, কিন্তু জগতে যেমন প্রকৃতির লীলা চলেছে তেমনি নিয়তির খেলা চলেছে, কবিরা তার সাক্ষী। এত বড়ো একটা দৃশ্য যাঁর চোখে পড়েনি তিনি মহাকবি হবার অযোগ্য।

সত্য অসত্য, প্রেম অপ্রেম—এরাও নৈতিক অথবা আধ্যাত্মিক শক্তি। এদের ঘাত প্রতিঘাত যে কোনো ডিটেকটিভ নভেলকে হার মানায়, যদি লিপিবদ্ধ হয়। কোনো নাট্যকার কি এদের উপেক্ষা করতে পারেন? কিন্তু প্রচারকের মনোবৃত্তি নিয়ে নাটক বা নভেল লিখলে কেউ বিশ্বাস করবে না। সেই করেই তো লোকের বিশ্বাস নাশ করা হয়েছে। এখন হয়েছে উলটো ফ্যাসাদ। লোকের বিশ্বাস হয় না বলে কবিদের চোখে পড়ে না। যাঁদের পড়ে তাঁদেরও তটস্থ ভাব, পাছে কেউ বলে প্রচারক। তার চেয়েও বড়ো গালাগাল আদর্শবাদী।

আধ্যাত্মিকতা

বিনু যখন নীতিনিপুণদের খোঁচায় তখন নীতি জিনিসটাকে উড়িয়ে দেয় না। নীতি বলতে বিনু বোঝে উচ্চতর নীতি, দেশকালপাত্রনিরপেক্ষ। আর তাঁরা বোঝেন দেশাচার, কালাচার, সমাজরক্ষকদের মতে যেটা শিষ্টাচার। যে দেশে যাই সে ফল খাই, এ যদি একটা নীতি হয়

তবে মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ নিশ্চয়ই একজোড়া নীতি। রাজনীতি যদি নীতি হয় তবে সমাজনীতি কী দোষ করল? রণনীতি যদি নীতি হয়. শস্ত্রনীতি যদি নীতি হয়, তবে শাস্ত্রনীতিও তাই।

কিন্তু উচ্চতর নীতির মধ্যে একটা দ্বৈতভাব আছে, সেটা বিনুকে ব্যাকুল করে। ভালো মন্দ, ন্যায় অন্যায়, সত্য অসত্য, প্রেম অপ্রেম, আলো ছায়া। কেন এ দ্বৈত? এর উত্তর, এই রকমই হয়ে থাকে। 'ইহাই নিয়ম।' কার নিয়ম? কে তিনি?

তিনি বা তৎ, সগুণ ভগবান বা নির্গুণ ব্রহ্ম, দুই নন। এক। সেই এক আমাকে নিয়েই এক, আমার থেকে আলাদা হয়ে নয়। সেই একের মধ্যে সব আছে। সবই এক। একই সব। এ দুটি শব্দ সমার্থক। যখন বলি, এক, তখনি বুঝি, সব। সবাইয়ের থেকে আলাদা হয়ে এক নয়।

সেই এককে যদি হিসাবের মধ্যে আনি তবে এই বিশ্বরহস্যের অর্থ এক নিমেষে পরিষ্কার হয়ে যায়। আর তাঁকে যদি বাদ দিই তবে এ ধাঁধার জবাব খুঁজে পাইনে। এর জবাব না পেয়ে শান্তি নেই। বিনুকে মহা অশান্তির ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে। সাংসারিক অশান্তি নয়। আধ্যাত্মিক অশান্তি। যাকে বলে স্পিরিচুয়াল আন্‌রেস্ট। সমস্তক্ষণ ভয়াবহ অনিশ্চয়তা। আত্মা আছে কি না, থাকলেও অমর কি না, অমৃতের অধিকারী কি না? সার্থকতা যদি এক জীবনে না জোটে অন্য জীবনে কি জুটবে? এ জীবনে যে কিছুই পেল না তার অপ্রাপ্তিই কি চরম? এমন কি হতে পারে যে না পাওয়াটাই এক প্রকার পাওয়া, যাতে হৃদয় ভরে? অপূর্ণতাই কি পূর্ণতা?

এমনি কত কথা।

আদর্শবাদী

বাস্তববাদী হয়ে সুখ না থাক, সোয়াস্তি আছে। বাস্তববাদীকে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। না পরের কাছে, না নিজের কাছে। তাঁকে যদি জিজ্ঞাসা করো, কেন এত দুঃখ, কে এত কু? তিনি উত্তর করবেন, আমি কী করে বলব? শুধাও তোমাদের ভগবানবাবুকে! আমি যেমনটি দেখেছি তেমনটি দেখিয়েছি।

অনেকের ধারণা সাম্যবাদীরা বাস্তববাদী। কিন্তু তাঁরাও তলে তলে একপ্রকার আদর্শবাদী। তাঁরা যেমনটি দেখেন তেমনটি দেখিয়ে হাত গুটোন না। তাঁরা বলেন, এ যা দেখছ সব ক্যাপিটালিজমের কারসাজি। ক্যাপিটালিজম তুলে দাও, সব ঠিক হয়ে যাবে।

তবে আদর্শবাদীদের জবাবদিহির দায় অত সহজে মেটে না। সব ঠিক হয়ে গেলেও সব জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয় না। মানুষ তো কেবল সুখ সুবিধায় তৃপ্ত হবে না। ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ। ক্যাপিটালিস্টরা যখন অপসারিত হবে, সোশ্যালিস্টরা যখন নিষ্কণ্টক হবেন, তখন সেই আদর্শ সমাজে এমন প্রশ্ন এক দিন উঠবেই, মৃত মনুষ্যসম্বন্ধে এই যে এক সন্দেহ আছে—কেউ কেউ বলেন, 'আছে", কেউ কেউ বলেন, "নেই"—আমি তোমার কাছে এই বিষয় জানতে চাই, আমার বরের মধ্যে এইটি তৃতীয় বর। তখন নচিকেতাকে তার প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

বাস্তববাদীরা তাকে হাঁকিয়ে দেবেন। আর লোকায়তবাদীরা তাকে লোভ দেখাবেন,

শতবর্ষায়ু পুত্রপৌত্র প্রার্থনা করো, বহু পশু হস্তী স্বর্ণ অশ্ব এবং বৃহদাকার ভূমি প্রার্থনা করো এবং স্বয়ং যত বৎসর ইচ্ছা জীবন ধারণ করো। যদি অন্য কোনো বর এর সমতুল্য মনে করো, যথা, বিত্ত এবং চির জীবিকা, তাও প্রার্থনা করো। তুমি প্রশস্ত ভূমিখণ্ডের উপর রাজা হও, তোমাকে সব কামনার কামভাগী করব। কিন্তু নচিকেতার সেই একই কাম্য। সে চায় তার প্রশ্নের উত্তর।

তখন ডাক পড়বে আদর্শবাদীদের। যাঁদের কাছে আছে ওর সম্পূর্ণ উত্তর। এ কি কখনো হতে পারে যে দু শ কোটি মানুষের মেলায় এমন একজনও থাকবেন না যাঁর কাছে থাকবে উপযুক্ত উত্তর! সাহিত্যের তরফ থেকে ওরূপ জিজ্ঞাসার অন্তত আংশিক জবাব দিতে হবে বিনুকে।

দায়িত্ব

তখন থেকেই বিনু দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত হচ্ছে। শুধু ওই একটি জিজ্ঞাসার উত্তর দেবার দায়িত্ব নয়, জীবন সম্পর্কে যার মনে যে কৌতূহল জাগে সে কৌতূহল নিরাকরণের। ধার্মিকের বা দার্শনিকের মতো নয়, কবির বা সাহিত্যিকের মতো। উপনিষদ্ বা গীতা লিখে নয়, মহাভারত বা রামায়ণ লিখে। তা যদি না পারে তবে পদাবলী ও গীতিকা লিখে। তাও যদি না পারে তবে ছড়া ও বচন লিখে।

সেইজন্যে সে কারুর কোনো জিজ্ঞাসায় নিরুত্তর থাকে না। ঠিক হোক ভুল হোক যা হয় একটা জবাব দেয়, তার পর আরো ভাবে। তার মুখে মুখে জবাব শুনে এক বন্ধু তাকে পরিহাস করেছিলেন। বলেছিলেন, কবে এত মুখস্থ করলে? কোথায় পেলে এসব?

এত বড়ো দায়িত্ব যার সে যদি চুরি করে মুখস্থ করে থাকেই, তাতে কী! তাতে তার লজ্জা নেই। লজ্জা নিরুত্তরতায়। অথবা সীনিকের মতো ব্যঙ্গ বিদ্রূপে। যাও, সুধাওগে তোমাদের ভগবানবাবুকে।

মানুষের বিরুদ্ধে তার হাজার নালিশ, কিন্তু ভগবানের বিরুদ্ধে একটিও নয়। মাঝে মাঝে সে নাস্তিক হয়েছে, তার মনে হয়েছে ভগবান নেই। যিনি নেই তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ করার কথা ওঠে না। অরণ্যে রোদন করা, মানুষের কাছে কাঁদুনি গেয়ে বেড়ানো, যেমন হাস্যকর তেমনি নিষ্ফল। ব্যঙ্গ বিদ্রূপও এক প্রকার রোদন।

তার চেয়ে মহিমা বেশি এগিয়ে গিয়ে দায়িত্ব নেওয়ায়। এ বিশ্ব যেমনি হোক আমি একে স্বীকার করলুম। আমিই আমার অপন হস্তে গ্রহণ করলুম এর ভার। এ যদি আমার মনের মতো না হয় কার কাছে অভিযোগ করব! না, আমার কোনো অভিযোগ নেই বিধাতার বিরুদ্ধে। আমি যে দায়িত্বভাগী। আমি যে সৃষ্টিকর।

বাপ তার কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন রাখে। বাপের চোখে সে তাই। এ বিশ্ব হাজার কুৎসিত হোক সৃষ্টিকরের চোখে সর্বাঙ্গসুন্দর। কালোর মধ্যেও সে আলোর দিশা পায়। মন্দের মধ্যে ভালোর।

সংকট

এক দিকে অন্তহীন অনিশ্চয়তা, অন্য দিকে সীমাহীন প্রত্যয়। বিনু মন দিয়ে বুঝতে পারত না কী আছে, কী নেই। হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করত সব আছে, এক আছেন। বুদ্ধি বলত, নেতি নেতি। স্বজ্ঞা বলত, ইতি ইতি। দর্শন বিজ্ঞান তাকে শেখাত ক্রিটিকাল হতে। কাব্য ও প্রেম শেখাত ক্রিয়েটিভ হতে। ক্ষুরধার পন্থা। কোনো এক দিকে একটু হেলান দিলেই অপঘাত। দায়িত্বের জন্যে প্রস্তুত হওয়া চলেছে, অথচ সংশয় মোচন হচ্ছে না। তখনকার দিনে অর্থাৎ তার বাইশ-তেইশ বছর বয়সে কেউ যদি তাকে দরদ দিয়ে চিনত তা হলে একই দেহে দেখত দু জন মানুষকে। দু জনেই বিনু। কিন্তু দু জনের দুই মার্গ, দুই স্বভাব, দুই সাধনা।

এ দু জনকে তফাত থেকে অনাসক্ত ভাবে দেখত আরো একজন বিনু। সে কোনো পক্ষে নয়। অপক্ষপাত। তার দেখার ধরন বৈজ্ঞানিকের মতো বিষয়মুখ বা অবজেকটিভ। অথচ যাদের দেখছে তারা তার থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, পৃথক নয়। তাই তার দেখাটা প্রকৃতপক্ষে আত্মমুখ বা সাবজেকটিভ। সে তার আপনাকেই দেখত নাটকের বা উপন্যাসের দুটি চরিত্র রূপে। চরিত্র দুটি সে নিজেই। কিন্তু তাদের উপর তার কোনো হাত নেই। সে শুধু সাক্ষী। এবং লিপিকর। লিপিকরপ্রমাদ যদি ঘটে তো তার অজ্ঞাতসারে। ঘটা বিচিত্র নয়, কারণ চরিত্র এবং চরিতকার একই ব্যক্তি।

এমনি করে বিনু কবি থেকে ঔপন্যাসিক হয়। কিন্তু তখনকার দিনে জানত না যে ঔপন্যাসিক হওয়া অনিবার্য। উপন্যাস লেখার সাধ অবশ্য ছিল মনের এক কোণে। সেটা যেন আকাশে ওড়ার সাধ। এরোপ্লেনে চড়ার। সমুদ্রযাত্রার অনিবার্যতা ছিল না তাতে। ছিল কাব্যরচনায়। কী করে যে কী হল, পরবর্তী জীবনে ঔপন্যাসিক এগিয়ে গেল সামনে, কবি পড়ে রইল পিছনে। তেইশ বছর বয়সে এ রকম কোনো কথা ছিল না। কিন্তু অলক্ষে এর জন্য প্রস্তুত হওয়া চলছিল। প্রস্তুতির সময় বোঝবার উপায় নেই কিসের প্রস্তুতি ও কেন। বিনুর জীবনে এমন অনেক বার ঘটেছে। সে কখন কীভাবে প্রস্তুত হয়েছে তা টের পায়নি, পরে তার প্রস্তুতির মর্ম অবগত হয়েছে।

তখনকার দিনে তার আভ্যন্তরিক সংকট তাকে দারুণ কষ্ট দিয়েছে। এত কষ্ট যে ক্ষুধা তৃষ্ণাও মানুষকে তত কষ্ট দেয় না।

কথক

ঔপন্যাসিক শব্দটা বিদ্‌ঘুটে। তার চেয়ে কথক ভালো। বিনু যা হয়েছে তার নাম কথক। কবির সঙ্গে তার তলে তলে যোগ রয়েছে। যেমন নদীর সঙ্গে হ্রদের। সেকালে গদ্য ছিল না, পদ্য ছিল কবি ও কথক উভয়েরই বাহন। বাল্মীকি যেদিন নিষাদকে অভিশাপ দিয়েছিলেন সেদিন ছিলেন কবি, যেদিন রাম সীতা রাবণের তিন-কোনা কাহিনী লিখলেন, সেদিন হলেন কথক। কিন্তু পদ্যে লিখলেন আর কবিপ্রসিদ্ধি অর্জন করার পর লিখলেন। তাই কথক বলে চিহ্নিত হলেন না। কবি বলেই অমর হলেন।

কিন্তু ব্যাসদেবকে কবি না বলে কথক বললে অসংগত হয় না, কারণ তিনি গদ্যের অনুপস্থিতিতে পদ্য দিয়ে কাজ চালিয়েছিলেন, গদ্যের চল থাকলে পদ্যের শরণ নিতেন না। একালের কথকরা সেকালে জন্মালে এক একজন কবি বলে গণ্য হতেন। কালক্রমে গদ্যের

প্রবর্তন ও বিবর্তন হয়েছে বলে তারা এখন কথক বলে পরিচিত। গদ্যের দ্বারা যে কাজ সহজে হয় সেই কাজ যদি কোনো কথক পদ্যের দ্বারা করাতে যান তবে যে তিনি সত্যি সত্যি কবি হবেন তা নয়। ওটা তাঁর ভ্রান্তি।

কাব্য প্রধানত আত্মমুখ। নাটক উপন্যাস বিষয়মুখ। একই ব্যক্তি এক বয়সে আত্মমুখ ও অপর বয়সে বিষয়মুখ হতে পারেন, হয়ে থাকেন। কেউ কেউ একই বয়সে দ্বিমুখ। কিন্তু কাব্যের সঙ্গে নাটক উপন্যাসের প্রভেদ সেকালে যেমন ছিল একালেও তেমনি। কাহিনীকে পদ্যের রীতি মানালেই তা কবিতা হয়ে যায় না। কবিতাকে গদ্যের রীতি ধরালেও তা কবিত্বহীন হয় না। তবে গাছের সঙ্গে পাখির যেমন সহজ সম্পর্ক খাঁচার সঙ্গে তেমন নয়। সেইজন্য পদ্যে কবিতা লেখার রীতি আবহমান কাল চলে আসছে ও চলতে থাকবে। কদাচিৎ এক আধজন কবি খাঁচায় পাখি পোষার মতো গদ্যে কবিতা লিখবেন। আর নাটক উপন্যাস এত কাল পরে তাদের উপযুক্ত আশ্রয় পেয়েছে। লক্ষ লক্ষ বছর গাছে গাছে বিচরণের পর মানুষ বেঁধেছে তার কুঁড়ে ঘর। এর পরে কেউ যদি গাছের ডালে শোয় তো শখ করে। পদ্যে নাটক বা গল্প লেখা একটা শখ।

অনিবার্যতা

বিনুর প্রাণে শখ নেই তা নয়। সে শৌখিন লোক। কিন্তু লেখা জিনিসটার পিছনে অনিবার্যতা থাকলে যেমন হয় শখ থাকলে তেমন নয়। যা অনিবার্য তাকে সাহায্য করছে সমস্ত প্রকৃতি, প্রকৃতির সমস্ত শক্তি। যে শক্তি ক্রিয়া করছে বিশ্বসৃষ্টির মূলে সেই শক্তিই সাহিত্যসৃষ্টির মূলে। মানুষের ভিতর দিয়ে ক্রিয়া করছে বলে মানুষ তাকে নিজের শক্তি ভেবে আত্মপ্রসাদ পায়। কিন্তু সে শক্তি যদি কোনো কারণে অসহযোগ করে মানুষের প্রাণে হাজার শখ জাগলেও লেখা তেমন জোরালো হয় না, হতে পারে না।

কিন্তু অনিবার্যতার অর্থ সম্পাদকের তাগিদ কিংবা অভাবের তাড়না নয়। বিনু তার দয়িতাকে চিঠি লিখত, প্রেমের দায়ে। পাঠক-পাঠিকাদের চিঠি লেখে প্রবন্ধ বা কাহিনী আকারে, প্রীতির দায়ে। কোনো দিন তাঁদের চোখে দেখবে না। তাঁদের কেউ ভারতবর্ষে কেউ রাশিয়ায়। কেউ বিংশ শতকে, কেউ দ্বাবিংশ শতকে। তবু তার প্রীতির দায় সত্য। সেই অনিবার্যতা তাকে শক্তি জোগায়। সবসময় নয়, কেননা তার অনেক লেখা প্রীতির দায়ে নয়, মত জাহির করার ঝোঁকে। কতক লেখা নামের নেশায়। কিছু লেখা নূতনত্বের মোহে, আধুনিকতার কুহকে। বাকি লেখা শখের খাতিরে, খেয়ালের বশে।

সাহিত্যের ইতিহাসে এমনও দেখা গেছে, শখের লেখা বা খেয়ালের লেখা অমর হয়েছে, অনিবার্য লেখা দাগ রেখে যায়নি। কাজেই এ বিষয়ে গোঁড়ামি ভালো নয়। কোনো বিষয়েই নয়। কে জানে কী টিকবে, কী টিকবে না! মহাকালের মনে কী আছে! রচনার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিঃস্পৃহ হওয়াই বিজ্ঞতা। যেমন সন্তানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। তা বলে উদাসীন হওয়া অনুচিত। সংকল্প করতে হবে, সাধনা করতে হবে, প্রীতির দেনা শোধ করতে হবে। তা যদি কেউ করে তবে প্রকৃতি সাহায্য করবে, বিধাতা করবেন। কাজটা তো তাঁদেরই। মানুষের সৃষ্টি বিশ্বসৃষ্টিরই অঙ্গ।

বিনু সাধারণত অনিবার্য না হলে লেখে না। বাঁচবে কখন যদি দিন রাত লেখে! কিন্তু

প্রেরণা পেলে দিন রাত না লিখে শান্তি নেই। মুক্তিও নেই।

পুরস্কার

এর কি কোনো পুরস্কার আছে? একজন যুবক তার যৌবন ক্ষয় করছে ভালোমন্দ লিখে। যৌবন কি আর ফিরবে? যৌবনের কি কোনো ক্ষতিপূরণ সম্ভব? ধন মান যশ কি তার বিনিময়? অমরত্ব?

না, তাও নয়। দেবতাদের অমরত্বের সঙ্গে অজরত্ব ছিল, না থাকলে নিছক অমরত্ব তাঁদের বিস্বাদ লাগত। বিনু কি শুধু অমরত্ব চেয়েছে? সে চেয়েছে অমৃত যা পান করে দেবতারা অজর তথা অমর। কে তাকে তেমন কোনো পুরস্কার দেবে?

প্রেমের প্রতিদানে প্রেম? প্রীতির প্রতিদানে প্রীতি? না, তেমন পুরস্কার সে প্রত্যাশা করতে পারে না। সে যা দিচ্ছে তা দায়ে পড়ে। কেউ যদি তারই মতো দায়ে পড়ে দিতেন সে নিত, নিয়ে কৃতার্থ হত। কিন্তু অত বড়ো পুরস্কার প্রত্যাশা করা যায় না। ও তো পুরস্কার নয়, সৌভাগ্য।

বিনু বলে, এই যে আমি আপনাকে পাচ্ছি এই আমার পুরস্কার। আমার পুরস্কার আত্ম আবিষ্কার। এর জন্যে একটা দিনও অপেক্ষা করতে হয় না। একটা যুগ তো দূরের কথা। যে মুহূর্তে লিখি সেই মুহূর্তে পাই। হাতে হাতে লাভ। নগদ বিদায়।

এই আমার যৌবনের ক্ষতিপূরণ। এও সেই যৌবন। বিশ্বপ্রকৃতির নিত্য যৌবনের প্রবাহ আসে এই উৎস হতে। তিনিও আপনাকে অনবরত দিচ্ছেন, অনবরত পাচ্ছেন, পেয়ালা তাঁর উপুড় হয়েই ভরে উঠছে। শূন্য হলেই পূর্ণ হয়। যার উড়িয়ে দেবার সাহস আছে তার ফুরিয়ে যাবার শঙ্কা নেই। যে ধরে রাখে সেই হারায়।

বিনু বলে, আমি যেন একটা সোনার খনি আবিষ্কার করেছি। সেখান থেকে সোনা এনে দু'হাতে বিলিয়ে দিচ্ছি। যত দিচ্ছি তত পাচ্ছি। যেদিন দিইনে সেদিন পাইনে। সঞ্চয় করলেই বঞ্চিত হই। যে দিন ভাবি, আমি দেদার দিয়েছি, আমার দানের ইয়ত্তা নেই, সেদিন আমার বয়স বেড়ে যায়। ভাঁড়ারে সোনা বাড়ন্ত। যেদিন ভাঁড়ার খালি করে বিলিয়ে দিই সেদিন দেখি আপনি ভরে উঠেছে। আমার তারুণ্য ফিরে এসেছে।

"আপনাকে এই পাওয়া আমার ফুরাবে না।" জীবনেও না, মরণেও না। এই অন্তহীন পূর্ণতার নাম অমৃত। বিনু বলে, এই আমার পুরস্কার।

ভাঙন

ওদিকে বিনুর প্রেমে ভাঙন ধরেছিল। যা সে কল্পনা করতেও অক্ষম ছিল তাই বাস্তবিক ঘটল। প্রেম তার নিজের নিয়মে আসে, নিজের নিয়মে যায়। কাউকে দোষ দিয়ে কী হবে? দোষ যদি দিতে হয় তবে নিয়তিকে।

এই অঘটনের জন্যে বিনু কিংবা তার প্রিয়া প্রস্তুত ছিলেন না। দু জনেরই স্বপ্নভঙ্গ হল। এটা অবশ্য নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ নয়। কাব্য লেখার মতো মনের অবস্থা ছিল না। চিঠিতে রইল না চিঠি লেখার আনন্দ। আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে দায়েরও বিদায়। অনিবার্যতা অন্তর্হিত

হল।

যে মানুষ তিন বছর ধরে অবিরাম লিখে আসছে সে কি চুপ করে বসে থাকতে পারে! সে তার শূন্যতা ভরিয়ে নেয় পূর্ণতা দিয়ে। অন্তরের পূর্ণতা।

বিনু দেখল তার অন্তর পূর্ণ। আনন্দে না হোক অনির্বচনীয় বিষাদে। তার প্রেম তাকে মুক্তি দিয়ে গেছে। আর কিছু করবার নেই। এখন তার ছুটি। সে লিখবে। চিঠি নয়, কবিতা। প্রবন্ধ। কথা।

কিছু দিন পরে সে ইউরোপে যাবার ছাড়পত্র পেল। আর এক দফা মুক্তি। এত কাল পরে তার বহুবাঞ্ছিত বিদেশযাত্রা। ছ বছর সবুর করার পর মেওয়া ফলল। আশা ছিল না যে ফলবে। এক স্বপ্ন ভেঙে গেল, আর এক স্বপ্ন জোড়া লাগল। নিয়তি তাকে এক চোখে কাঁদাল, আর এক চোখে হাসাল। বিষাদের মেঘ, আনন্দের রৌদ্র। তার লেখনী দিয়ে সে ব্যক্ত করবে দুই। লিখবে কবিতা, প্রবন্ধ, কথা। লিখবে ভ্রমণকাহিনী। লিখবে সকলের তরে। প্রীতি ভরে।

এমনি করে বিনু তার নিজেকে পেল। আবিষ্কার করল আপনাকে। তার অন্তর পূর্ণ। তার কিছুরই অভাব হল না। ভাষার, ছন্দের, বিষয়ের, কল্পনার, অনুভূতির। কে জানে কোথায় ছিল তার মোহিনী শক্তি বা চার্ম্‌। বোধহয় প্রেমের প্রয়োজনে এর উদ্ভব হয়েছিল সাগরমন্থনে। রসের সাগর। এ শক্তি তার সাহিত্যের প্রয়োজনে লাগল।

যাত্রা

মানুষের জীবনের সর্বপ্রধান ঘটনা আপনাকে পাওয়া। লেখকের জীবনে এর একটু বিশেষ তাৎপর্য আছে। লেখক আপনাকে পায় আপনাকে বিলিয়ে।

বিনুর মনে হল, কোনো দিন কোনো অবস্থায় তার পূর্ণতার অভাব হবে না। দুর্ভিক্ষে রাজদ্বারে শ্মশানেও তার পূর্ণতা সমান অফুরন্ত। তখনো তার লেখা আপনি আসবে ভিতর থেকে। সে লিখবে কাব্য, নাটক, উপন্যাস। যেকোনো অবস্থায় পড়ুক সে তার অন্তরের খনি থেকে সোনা তুলে এনে ছড়াবে। সংসার তাকে জব্দ করতে পারবে না। তাকে স্তব্ধ করতে পারে এমন ক্ষমতা সম্পাদকের নেই, প্রকাশকের নেই, সমালোচকের নেই, সেন্‌সরের নেই, আর কারো নেই, আছে একমাত্র তার নিজের।

এমনি এক গভীর আত্মপ্রত্যয় ও ক্ষমতাবোধ নিয়ে বিনুর যাত্রা শুরু। সমুদ্রযাত্রা তথা সাহিত্যযাত্রা।

এবার কলকাতা নয়, বম্বে। জাহাজ দাঁড়িয়েছিল তাকে অকূলে নিতে। দুরুদুরু করছিল বুক মায়ের কোল ছাড়তে। জননী জন্মভূমির দিকে ফিরে ফিরে তাকায় আর সজল হয় তার দৃষ্টি। যেদিকে তাকায় সেদিকে দেখতে পায় আরো এক জোড়া চোখ, সজল কাজল। শেষ বিদায় তো নেওয়া হয়ে গেছে। তবে কেন মায়া!

জাহাজ যখন দুলল বিনুর বুকও দুলে উঠল। এতক্ষণে চলল তার তরী, তার জীবনের তরী, তার সাহিত্যের তরী। চলল তার দেখা, চলল তার লেখা। ডেক থেকে ভিতরে গিয়ে সে চিঠির কাগজ নিয়ে বসল। এবার কিন্তু চিঠি নয়। ভ্রমণকাহিনী। কবিতা।

দেশে তখন সাত ভাই সাইমন এসেছেন বা আসছেন। কিন্তু বিনুর কাছে দেশ তখন

ছায়া। বিদেশও তাই। মাঝখানে বিশাল সিন্ধু। বিষাদ সিন্ধুও বটে। তার যেন কোথাও কেউ নেই, সে সর্বহারা। জাহাজে যারা আছে তারা দু দিনের সাথী। দু দিন পরে কে কোথায় ছিটকে পড়বে, যার যেখানে কাজ। একমাত্র বিনুই চলবে কালের তরীতে করে মহাকালের কূল থেকে অকূলে।

শেষ

শেষ নয়, অশেষ। তবু এখনকার মতো শেষ।

বিনু, তোমার কথা তো সারা হল, এবার আমার কথা বলি। তোমার মনে রাখার জন্যেই বলা। তোমার মতো আরো অনেকের।

বিশ্ব তার আনন্দ বেদনা নিঃশব্দে বয়, তার মুখে ভাষা নেই। মানুষের মুখে ভাষা আছে বলে মানুষ বড়ো গোলযোগ করে। সে যদি মাঝে মাঝে নীরব হত শ্রোতাদের প্রাণ শীতল হত। যাঁদের লেখনীর মুখে ভাষা আছে তাঁরাও যদি নীরব হতে জানতেন তবে সাহিত্য আজ মেছোহাটা হয়ে উঠত না।

"যেমন চলার অঙ্গ পা তোলা পা ফেলা" তেমনি বলার অঙ্গ বলা ও না-বলা। যত বলতে হয় তত হাতে রাখতে হয়। নিঃশেষে বলার মতো ভুল আর নেই। তোমরা আধুনিক সাহিত্যিকরা বকতে জান, চুপ করতে জান না। এত উঁচু গলায় কথা কও যে কেউ কারো কথা শুনতে পায় না। তাতে তোমাদেরও গলা ফাটে, বিশ্বেরও তাল কাটে, শান্তিভঙ্গ হয়।

ভুলে যেয়ো না, চার দিকে অন্তহীন নৈঃশব্দ্য। বিরাট জগৎ মহামুনির মতো মৌন। যদি কিছু জানতে চায় তো ইশারায় জানায়। মানুষকে শব্দ দেওয়া হয়েছে শব্দ করবার জন্যে নয়। নিঃশব্দতাকে আরো নিঃশব্দ করবার জন্যে নয়। শব্দ দেওয়া হয়েছে নিঃশব্দতার সঙ্গে দ্বন্দ্ব করবার জন্যে নয়, ছন্দ মেলাবার জন্যে। যেমন চলার ছন্দ পা ফেলা ও পা তোলা তেমনি বলার ছন্দ বলা ও না-বলা।

বিনু, তুমি কথা বলার আর্ট শিখেছ। না-বলার আর্ট শেখো।

দ্বিতীয় পর্ব

বিনুর পূর্ব কথা

একটি আলোকরেখা কোন সুদূর দ্যুলোক থেকে ভূলোকে এসে একদিন মানবরূপ ধারণ করে। সবাই তাকে বিনু বলে ডাকে। শুনতে শুনতে তারও নামটি আপনার হয়ে যায়। একটু একটু করে সেও ভুলে যায় যে একদা সে ছিল এক নামরূপহীন আলোকরেখা। একটু একটু করে মনে রাখে সে একটি মানুষ, একটি পুরুষ, একটি ব্যক্তি।

এখানে কেউ তাকে চেনে না, সেও চেনে না কাউকে। কিন্তু চিনতে চিনতে সকলেই তার চেনা হয়ে যায়। পরিবারে ও পরিবারের বাইরে সকলেই তাকে চেনে। পাড়া ও পাড়ার বাইরে। যারা জন্মসূত্রে আত্মীয় নয় তারাও পাতানো আত্মীয় হয়। আর তাদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যায়। পশুপাখি গাছপালাকেও বিনু আপনার করে নেয়। তারাও তাকে। ভালোবাসা পেতে পেতে ও দিতে দিতে সে বড়ো হয়ে ওঠে।

অক্ষর পরিচয়ের পর থেকে সে যা হাতে পেত তাই পড়ত। পাঠ্য অপাঠ্য বিচার করত না। করতে জানত না। একদিন সে চার ছয় ছত্রের একটি পদ্য লিখে বাড়ির এক জায়গায় টাঙিয়ে রাখে। যার নজরে পড়বে সে-ই পড়বে, এটা জানত। এটা কিন্তু তার মনের কথা ছিল না। বিশেষ একটি মেয়ে পড়বে এটাই সে মনে মনে চেয়েছিল। মেয়েটি পড়বে আর ভাববে, বিনু তো সামান্য ছেলে নয়। আর কেউ যা পারে না বিনু তা পারে। সে কবিতা লিখতে পারে। সে একজন কবি।

মেয়েটির প্রশংসাই তার কাম্য ছিল। কিন্তু বিশেষ করে সেই মেয়েটির প্রশংসা কেন? তবে কি বিনু তাকে ভালোবাসত ও তার ভালোবাসা কামনা করেছিল? না, বছর এগারো কি বারো বছর বয়সে সে বাসনা জাগেনি। বাড়িতে অনেক কাব্য গ্রন্থ ছিল। স্কুলের লাইব্রেরিতে তো ছিলই। বৈষ্ণব পদাবলী পড়তে পড়তে বিদ্যাপতির এ দুটি পদ তার মর্মে গেঁথে যায় :

> "জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
> নয়ন না তিরপিত ভেল।
> লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু
> তবু হিয়া জুড়ন না গেল।"

আরো বড়ো হয়ে সেও লিখতে চেয়েছে এমনি দুটি কথাই। সে রূপমুগ্ধ। সে প্রেমবদ্ধ। একদিন সেও হয়ে উঠত একজন বৈষ্ণব কবি। সেই মধ্যযুগের মতো। মধ্যযুগের পাশ্চাত্য প্রেমিক কবিদের সঙ্গেও বৈষ্ণব কবিদের কিছু সাদৃশ্য ছিল। বিদ্যাপতির যেমন লছমা দেবী, চণ্ডীদাসের যেমন রামী, দান্তের তেমনি বিয়াত্রিস, পেত্রার্কের তেমনি লরা। নরনারীর সম্পর্ক পরিণয়মূলক নয়, প্রেমমূলক।

বৈষ্ণব সাধকরা তাঁদের সাধন সঙ্গিনীদের বলেন তাঁদের প্রকৃতি। প্রকৃতির সঙ্গেই নারীর তুলনা। ওতে নারীর মর্যাদা বাড়ে। বৈষ্ণবদের কাছে কৃষ্ণের চেয়ে রাধার মর্যাদা বেশি। মধ্যযুগের পাশ্চাত্য ত্রুবাদুর কবিদের চোখেও তাই। সেকালের নাইটরাও সেই মর্মে কবিতা লিখতেন। এক এক নাইটের আরাধ্যা এক এক লেডি। যার সঙ্গে পরিণয় সম্পর্ক

নেই। কামগন্ধহীন প্রণয় সম্পর্ক। নিজের বিবাহিতা সহধর্মিণীকে উদ্দেশ করে প্রেম নিবেদন সেকালের কবিদের কারো রীতি ছিল না। তাঁদের মতে পরকীয়াতেই প্রেমের স্ফূর্তি হয়, স্বকীয়াতে নয়।

কলেজ জীবনের পূর্বেই বিনু অনেক ইংরেজি বই পড়েছিল। কলেজ লাইব্রেরি লুট করে ইংরেজিতে অনূদিত বিস্তর ইউরোপীয় গ্রন্থ পাঠ করেছিল। দেশের দিক থেকে যা পাশ্চাত্য কালের দিক থেকে তা আধুনিক। বিনু ক্রমে ক্রমে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উপনীত হয়। সে কেবল ভারতের সন্তান নয় বিংশ শতাব্দীরও সন্তান। বিংশ শতাব্দীকে ভালো করে চিনতে হলে তার পশ্চিম মুখে যাত্রা করা অত্যাবশ্যক। পশ্চিম ইউরোপই আধুনিকতার মুখ্য স্রোত। মুখ্য স্রোতে অবগাহন না করলে নয়। পশ্চিমের প্রতি তথা আধুনিকতার প্রতি সে এক দুর্বার আকর্ষণ অনুভব করে।

তখন সেটা অসহযোগ আন্দোলনের আমল। দেশ যতদিন না স্বাধীন হচ্ছে ততদিন দেশেই থাকতে হবে। যেতে হবে গ্রামে। জনগণের সঙ্গে একাত্ম হতে হবে। করতে হবে চাষবাস বা কারিগরি। লিখতে হলে জনগণের হৃদয় স্পর্শ করার মতো লেখা। তারা যেমন অকৃত্রিম, তাদের কথাবার্তা যেমন অকপট তেমনি অকৃত্রিম ও অকপট হবে তাদের জন্যে রচিত কাহিনী বা কবিতা। তাদের উপর তথাকথিত সভ্যতার কৃত্রিমতা ও কপটতা চাপিয়ে দিতে চাওয়া অনুচিত। এই বিষয়ে টলস্টয় যা বলেছেন তাই সার কথা। রুশোও তো বলেছেন প্রকৃতির কাছে ফিরে যেতে। গ্রামে ফিরে যাওয়াও প্রকৃতির কাছে ফিরে যাওয়া। গান্ধীজীর উপদেশই গ্রাহ্য। রবীন্দ্রনাথও তো ডাক দেন—

'ফিরে চল মাটির টানে।'

বিনু পড়ে যায় দারুণ দোটানায়। জীবন নিয়ে সে কী করবে? কেমন করে কাটাবে? কোথায় কাটাবে? তার ধারণা ছিল সে বেশিদিন বাঁচবে না। তার মা বেঁচেছিলেন মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর। সেও তেমনি দুব্‌লা পাতলা। শেলী, কীট্‌স পড়তে পড়তে তারও মনে হয়েছিল ত্রিশ না পেরোনোই রোম্যান্টিক। যৌবন চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে জীবনও যেন চলে যায়, এই মর্মে সে একটা কবিতাও লিখেছিল। কিন্তু তার আগেই যেন সে তার জীবনের কাজ সারা করে যেতে পারে।

সে ভাবতে পারেনি যে ইউরোপে গিয়ে আধুনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে গা মিলিয়ে নিতে নিতে তার লেখালেখির পরিকল্পনাও পালটে যাবে। জীবনের সব দিক দেখাতে হলে লিখতে হয় মহাকাব্য বা এপিক। একালে মহাকাব্যের স্থান নিয়েছে বিরাট ক্যানভাসে আঁকা ছবির মতো এপিক উপন্যাস। যেমন রম্যাঁ রলাঁর 'জাঁ ক্রিস্তফ' বা টলস্টয়ের 'ওয়ার অ্যান্ড পীস'। বিনুর সাধ যায় তেমনি একটি এপিক লিখতে, যদিও তার সাধ্য কেবল লিরিক।

একটা প্রতিযোগিতায় সফল হয়ে সে যখন ইউরোপে যায় তখন তার বয়স তেইশ বছর। দু বছর বাদে দেশে ফিরে এসে রাজকর্মের অবকাশে সে যখন তার পাঁচখণ্ডের উপন্যাস লিখতে শুরু করে তখন তার বয়স পঁচিশ বছর। সে বয়সে টলস্টয় বা রলাঁ অত বড়ো উপন্যাসে হাত দেননি। জীবনের অভিজ্ঞতা কম। সৃজনের অভিজ্ঞতাও কম। কিন্তু বিনুর কি অপেক্ষা করার জোর ছিল? পঁয়ত্রিশ বছরের আগেই তাকে তার বৃহৎ উপন্যাস সম্পূর্ণ করতে হবে। কিন্তু কেন? কী দরকার অত বড়ো উপন্যাস লেখার? কেনই-বা সে সাধ করে অমন একটা দায় নিজের ঘাড়ে চাপায়? টাকার জন্য নিশ্চয়ই নয়। ওটা তার

প্রেমের পরিশ্রম। সে একজন স্রষ্টা ও দ্রষ্টা।

যার প্রধান পটভূমিকা ইউরোপ তা কি বাংলাদেশের মহকুমায় বা জেলা সদরে বসে লেখা যায়? কিছুদিন পরেই বিনুর ইউরোপের স্মৃতি ঝাপসা হয়ে যেত। লিখতে গিয়ে সে বিপাকে পড়ত, যদি না অপরিচিতা এক নারী তার জীবনে পশ্চিম দেশ থেকে আবির্ভূত হতেন। গ্রীক নাটকে যেমন আসমান থেকে দেবতা নেমে আসেন। এর পর থেকে তিনি তাকে পরামর্শ দিয়ে সাহচর্য করতে থাকেন।

কিন্তু সহধর্মিণীর সাহচর্যে উপন্যাস লেখা এক জিনিস আর পুলিশের সাহচর্যে অপরাধ নিবারণ ও জেলের সাহচর্যে অপরাধ দমন অন্য জিনিস। অহিংস নৈরাজ্যবাদী বিনু পুলিশ বা জেল কোনোটাতেই বিশ্বাস করে না। মার্কসবাদী না হলেও সেও বিশ্বাস করে যে রাষ্ট্র ক্রমে ক্রমে শুকিয়ে যাবে। কিন্তু রাজকর্মে নিযুক্ত থাকলে তার আগেই শুকিয়ে যাবে বিনুর অন্তঃকরণ, যা তার সাহিত্য সৃষ্টির উৎস। তাকে হতে হচ্ছে দিন দিন হার্ড হেডেড তথা হার্ড হার্টেড। এমন মানুষ যার মস্তিষ্ক যেমন কঠিন হৃদয় তেমনি কঠোর। সারস্বত সমাজে হয়তো সে এখন ইন্‌টেলেকচুয়াল বলে গণ্য হবে, কিন্তু একজন আর্টিস্ট বলে নয়। অথচ আর্টিস্ট হতেই তার দুরাকাঙ্ক্ষা। কেউ যখন বলে বিনু একজন কবি তখন সে ধন্য হয়ে যায়। সে বর সরস্বতী সবাইকে দেন না। যাঁরা পান তাঁরাই তাঁর বরপুত্র। এক্ষেত্রে সে রবীন্দ্রনাথের অনুগামী। তিনি মহাশিল্পী। সে তাঁর মতো মহান্ না হলেও সেও তাঁরই মতো রূপদক্ষ হতে চায়।

বিনু উপলব্ধি করে অপরাধ নিবারণ ও দমনের প্রকৃষ্ট উপায় লোকটির অন্তর পরিবর্তন। ভয়ের শাসনে কিছুতেই তা হতে পারে না। প্রেমের প্রভাবেই সেটা সম্ভব। বিচারককে হতে হবে দয়াময়ী মাতা ও ক্ষমাশীল পিতা। সাহেবরা তো দাবি করেন যে সরকার মা বাপ। কতক হিসাবে সেটা সত্য। কিন্তু মোটের উপর সরকারের যে ভাবমূর্তি সেটা একটা বিরাট নৈর্ব্যক্তিক শাসন যন্ত্রের। বিনু সেই যন্ত্রের ক্ষুদ্র একটি অঙ্গ। তাকে আইন মেনে কাজ করে যেতে হয়। সে দয়াও করে না, মায়াও করে না। করলে উপরওয়ালাদের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। পুলিশও চটে। পুলিশের চোখে সে একজন প্রচ্ছন্ন জাতীয়াতাবাদী, আর জাতীয়তাবাদীদের চোখে সে একজন প্রকাশ্য দেশদ্রোহী।

কিন্তু একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে যে সে তত্ত্বগত ভাবে অহিংস নৈরাজ্যবাদী বলে কার্যক্ষেত্রেও তাই ছিল। বিশের দশক শেষ হবার পূর্বাহ্নে তার ইংরেজ জেলাশাসক তাকে বলেন. "আমরা চলে গেলেই জাপানীরা ভারত আক্রমণ করবে। স্বাধীন ভারত আত্মরক্ষা করবে কী করে?" বিনু আশা করে জাপানীরা আক্রমণ করবে না। সেটা কিন্তু যুক্তি নয়। সেটা বিশ্বাস। সে বিশ্বাস দূর হয় চল্লিশের দশকে। কলকাতায় জাপানী বোমা যখন পড়ে বিনুর কাছে তখন গোপন নির্দেশ আসে জাপানীরা এলে কী কী করতে হবে জেলা শাসককে, জেলা জজকে। ইংরেজরা যে বর্মা রক্ষা করতে পারল না সেটা তো স্পষ্ট। বাংলাদেশ রক্ষা করতে পারবে না সেটাও সম্ভবপর। অথচ ভারতীয়রা যে একাই দেশরক্ষা করতে পারবে এটার মতো প্রস্তুতি কোথায়?

ত্রিশের দশকে বিনু দেখে, হিন্দু মুসলমান কথায় কথায় দাঙ্গা বাধাচ্ছে আর দোষ দিচ্ছে ইংরজেদের। তাদের সংহত করতে যদি নেতারা অক্ষম হন তাহলে তো বিনুর মতো রাজকর্মচারীদেরই সে কাজ করতে হবে। হ্যাঁ, গ্রেফতার করতে হবে, জেলে পাঠাতে হবে,

নাচার হলে গুলি চালাতে হবে। পারতপক্ষে সৈন্য তলব করা চলবে না। তলব করলে সৈন্যদলের কর্তাকেই ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হবে। বিনুকে ততদূর যেতে হয়নি। সে নিজের হাতেই সব ক্ষমতা রেখেছে। কিন্তু তাকে স্বীকার করতে হয়েছে যে দেশকাল অহিংস নৈরাজ্যবাদের জন্যে প্রস্তুত নয়।

ব্রিটিশ অপসরণের পরও কমিউনিস্টদের সহিংস বিপ্লব প্রয়াস লক্ষ করে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়েছে। জনগণ অহিংস বিপ্লবের জন্যে প্রস্তুত নয়। বিপ্লব আর প্রতিবিপ্লবের দ্বন্দ্ব হিংসার সঙ্গে প্রতিহিংসার বলপরীক্ষা। তার পরিণতি হবে অরাজকতায়। বিনু যদি ক্ষমতার আসনে থাকে তাকে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের আইন কানুনের প্রয়োগ করতে হবে। পুলিশের সাহায্যে, জেলের সাহায্যে, দরকার হলে সৈন্যদলের সাহায্যে। দেশ নৈরাজ্য বরণ করলে কাল তা মানে না। নৈরাজ্য অরাজকতা নয়। জনগণ বরাবরই একজন না একজন রাজার অধীনে থেকেছে। সে রাজা হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক আর ইংরেজই হোক। রাজতন্ত্র ছেড়ে প্রজাতন্ত্র বরণ করলেও রাষ্ট্র জিনিসটা থাকবে আর তার সেই চারটি অঙ্গই কায়েম হবে। পুলিশ আর আদালত আর জেল আর সৈন্য।

সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ না করলে, কখনো ম্যাজিস্ট্রেট ও কখনো জজ না হলে, ভয়ঙ্কর সব পরিস্থিতির সম্মুখীন না হলে বিনুর প্র্যাকটিকাল শিক্ষা হত না। সে থিয়োরি নিয়েই দিন কাটাত। তবে কি অভিজ্ঞতার ফলে তার আদর্শের পরিবর্তন হল? না, শুধুমাত্র স্বীকার করতে হল যে এই শতাব্দীতে নয়, বোধহয় আগামী শতকেও নয়, হয়তো তার পরের একশো বছরেও নয়, কিন্তু একদিন না একদিন সমাজে কেউ অপরাধও করবে না, কেউ দণ্ডদানও করবে না। রাষ্ট্র শুকিয়ে যাবে।

বিনুর মনে হয় সে পড়ে গেছে এক আখমাড়াই কলে। যদি আরও বেশিদিন বহাল থাকে তার চাকরিতে তবে ভিতরকার রসকষ বেরিয়ে যাবে, বাকি থাকবে শুধু ছিবড়ে। তার সতীর্থদের পক্ষে সেটা উন্নতির সোপান, কিন্তু তার পক্ষে অবনতির। তার সেই এপিক উপন্যাস সমাপ্ত হয় ছয় খণ্ডে আটত্রিশ বছর বয়সে। সেই সময়ই পদত্যাগ করে পশ্চাৎ অপসরণ করা উচিত ছিল, কিন্তু বিকল্প তো আবার এক চাকরি। গ্রামে গিয়ে চাষবাসের সেই পুরাতন স্বপ্ন সে ভুলে যায়নি, কিন্তু যুদ্ধকালে অবাস্তব। মন্বন্তর আসন্ন। পরবর্তী ন'বছর ধরে বিনু পায়চারি করে। ন যযৌ। ন তস্থৌ। দেশের স্বাধীনতা তার নিজের স্বাধীনতা নয়। বরং আরো অক্ষমতা। ইতিমধ্যে তার সাহিত্যসৃষ্টি মাথায় উঠেছিল।

সাতচল্লিশ বছর বয়সে বিনু সেই সিদ্ধান্তটি নেয় যেটি তাকে, আর শিল্পী সত্তাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়। কোনো উপরওয়ালাকে সন্তুষ্ট করতে হয় না। কোনো নীচেওয়ালাকে চালনা করতে হয় না। সে তার ইচ্ছা-মতো বাঁচে। তার সৃষ্টিশক্তিকে বাঁচিয়ে রাখে। সৃষ্টিশক্তিও একপ্রকার আগুন। যে আগুন নক্ষত্র নীহারিকায় জ্বলছে সে আগুন বিনুর অন্তরেও। তাকে জ্বালিয়ে রাখাই তো তার সাহিত্যিক হওয়ার পূর্ব শর্ত। সঙ্গে সঙ্গে তার দীর্ঘ আয়ুরও। নতুবা সে কবে মরে যেত।

তার জীবনের তৃতীয় পর্ব শুরু হয় সাতচল্লিশ বছর বয়সে। সেইরকম বয়সে প্রমথ চৌধুরীর প্রার্থনা ছিল দ্বিতীয় যৌবনের।

"হারানো প্রাণের ফের করিতে সন্ধান
সভয়ে চলিনু ফের বাণীর ভবনে

যেথায় উঠিছে চির আনন্দের গান
আবার ফুটিল ফুল হৃদয়ের বনে
সেদেশে প্রবেশি গেল মনের আক্ষেপ
করিলাম পদার্পণ দ্বিতীয় যৌবনে।"

একদা বিনুর প্রার্থনা ছিল যৌবন চলে গেলে যেন জীবনও চলে যায়। প্রথম যৌবন রইল না। কিন্তু দ্বিতীয় যৌবন তার স্থান নিল। তাই জীবন হল দীর্ঘতর। এটা অপ্রত্যাশিত। জীবনের তৃতীয় পর্ব দ্বিতীয় যৌবন এনে দেয়। বহুদিন ধরে তার মনে লালিত হচ্ছিল আর একটি বৃহৎ উপন্যাস রচনার সাধ। এবার তার জন্যে চাই সর্বাত্মক প্রস্তুতি। প্রেমের উপন্যাসের ভাষা হবে প্রেমিক প্রেমিকার মনের মতো ভাষা। কোমল মধুর কান্ত পদাবলী, প্রকারান্তরে বৈষ্ণব কবিতা। আধুনিক যুগ থেকে বিনু ফিরে যায় মধ্যযুগে। মননশীলতা থেকে হৃদয়বত্তায়। যৌবনের পরিবেশ ফিরিয়ে আনে অন্তর্জীবনে। মাঝখানে কেটে গেছে ত্রিশ বছর। কত কী ঘটে গেছে জগতে। লিখতে বসে সেসব ভুলে যায় বিনু।

কাহিনীটা ছিল বেশ রোম্যান্টিক। এক অচেনা অদেখা তরুণী নায়ককে চিঠি লিখে জানায় তার বিয়ে হয়েছে তার অনিচ্ছায় এমন একজনের সঙ্গে যাকে সে ভালোবাসে না, যার অন্য প্রণয়িনী ছিল ও আছে, যার শয্যা থেকে মুক্তির জন্য সে সংগ্রাম করে চলেছে। কোথায়ই বা সে যাবে? পিতৃগৃহে নয়, সেখানে সকলের ধারণা অমন স্বামী আর হয় না। একাধারে জমিদার ও কংগ্রেস নেতা। ওদের ধারণা নায়িকা বিমুখ বলে তার স্বামী অন্যাসক্ত।

প্রথম দর্শনেই প্রেম, কিন্তু নায়িকা এমন দুটি বাক্য উচ্চারণ করে যা নায়ককে চমকে দেয়। তার স্বামী তাকে ধর্ষণ করেছে। সে তার স্বামীকে বলেছে গর্ভপাত করবে। নায়কের পরামর্শ চাই। নায়ক বলে, না, না ওতে অজাত সন্তানের প্রতি অন্যায়। নায়িকা জানতে চায়, তাহলে মুক্তির কি উপায়? মুক্তি না পেলে তো আবার ধর্ষণ, আবার সন্তান। তা হলে কি সে আত্মহত্যা করবে? নায়ক বলে, না, না। ওতে নিজের প্রতি অন্যায়।

নায়িকার এক আত্মীয়কে নায়ক বিশেষ শ্রদ্ধা করত। কলেজ-ত্যাগী, নির্ভীক দেশসেবক। তিনি তার বন্ধু হন। দুই বন্ধুতে মিলে নায়িকার মুক্তির দায় মাথায় তুলে নেয়। কিন্তু মাঝপথে তাঁর বিয়ে হয়ে যায়, নায়ক নিঃসঙ্গ। তা সত্ত্বেও সে তার অঙ্গীকারে স্থির থাকে। নায়িকার পুত্রসন্তান লাভের পর স্বামী স্ত্রীতে সন্ধি হয়। আপাতত নায়িকা স্বেচ্ছাবন্দিনী। তাঁর মুক্তির প্রশ্ন সন্তান বড় না হওয়া তক্ জরুরি নয়। সে নায়ককে বলে ততকাল অপেক্ষা করতে। নায়ক অনুভব করে যে বন্দিনীকে মুক্ত করতে এসে সে নিজেই বন্দী হয়েছে। তার নিজের মুক্তিই জরুরি। সে বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরা যাত্রা করে। প্রেমিক হিসাবে সে দোষী। প্রেমিকা হিসাবে নায়িকা নির্দোষ। নায়ক হেরে গেছে। নায়িকা জিতেছে।

কাহিনীটার প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ লেখার পর বিনুর মনে বিষম খটকা বাধে। প্রথম দর্শনে নায়িকা নায়ককে যে দুটি উক্তি শুনিয়েছিল সে দুটি কি রাখবে না বাদ দেবে? এই নিয়ে মনের মধ্যে তোলাপাড়া করছে এমন সময় এক চিঠি। "ত্রিশ বছর আগে তোমাকে আমি বিশ্বাস করে যা বলেছি তা তুমি যদি প্রকাশ কর তবে তুমি বিশ্বাসভঙ্গ করবে। আমাকে না দেখিয়ে তুমি কিছু প্রকাশ করতে পারবে না। করলে অভিশাপ দেব।"

বিনু লেখা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু বছর দশেক বাদে তার মনে হয় তার বাবার মতো সেও একষট্টি বছর বয়সে দেহ রাখবে। মৃত্যুর পূর্বে অসমাপ্ত উপন্যাসকে সমাপ্ত করাই

কর্তব্য। তার জন্যে যদি কিছু বাদ দিতে হয় তো তাও সই। বই থেকে দুটি বাক্য বাদ যায়। বিনুর ধারণা সে প্রেমের বেলায় হেরেছিল, লেখার বেলায়ও হারল। তার জীবনের তৃতীয় পর্ব শেষ হয় ছেষট্টি বছর বয়সে। দ্বিতীয় যৌবনও নিঃশেষ।

বিনুর উত্তরকথা

বিনুর বয়স যখন মাত্র দশ বছর তখনই তার মনে হত এ জীবন যদি সেই বয়সেই শেষ হয়ে যায় তা হলেও তার খেদ নেই। সে যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছে। যথেষ্ট আস্বাদন পেয়েছে মাধুর্যের। যথেষ্ট দর্শন পেয়েছে সৌন্দর্যের। ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যেও জীবন পরিপূর্ণ হতে পারে। কিন্তু একথাও তার মনে হত সে যাবার সময় কেবলই তো নিয়ে গেল, দিয়ে গেল কী? ঋণ শোধ হবে কী করে?

বিনু তার এই আনন্দ ঋণ, মাধুর্য ঋণ, সৌন্দর্য ঋণ শোধ করতে লেখার কাজে ব্রতী হয়। কৈশোরে খেলার মতো করে। যৌবনে লীলার মতো করে। তার যৌবন গত হলে সে প্রার্থনা করে দ্বিতীয় যৌবনের। যযাতির মতো নয়। প্রমথ চৌধুরীর মতো। দ্বিতীয় যৌবন পেয়ে তিনি 'সবুজপত্র' সম্পাদনা করেন, 'চার ইয়ারী কথা' লেখেন। বিনুও তার প্রার্থনার উত্তর পায়। লাভ করে দ্বিতীয় যৌবন। সমাপ্ত করে তার প্রেমের উপাখ্যান। কেটে যায় পনেরো বছর। তার বয়স তখন বাড়তে বাড়তে ছেষট্টি।

না, সে বয়সে আর তৃতীয় যৌবন প্রার্থনা করা চলে না। জীবনই বা আর ক'দিন? আয়ু যেটুকু অবশিষ্ট আছে সেটুকু দিয়ে সম্পন্ন করতে হবে বকেয়া যত কাজ। বেশ কিছু কাল ধরে সে ভাবছিল তার স্বদেশের পুনর্যৌবনের কথা। দেশেরও চাই পুনর্যৌবন। পুনঃস্বাধীনতাই সব নয়। পরাধীনতা দূর হলেও পাঁচ হাজার বছরের এই প্রাচীন দেশ জরাগ্রস্তই থাকবে। তার জরা দূর হবে না। বিনু তাই চিন্তা করে তার স্বদেশের পুনর্যৌবনের কথা। চিন্তার ফল তাকে প্রকাশ করে যেতে হবে। এটা তার কর্তব্য। সৃষ্টি নয়, কৃত্য। বিনু কি কেবল একজন স্রষ্টা? সে একজন নাগরিক। ভারতীয় নাগরিক। সেই সঙ্গে বিশ্বনাগরিক। দেশকে সে বিশ্বের একটি অঙ্গ বলেই জানে। ভারত বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপ নয়। যাকে প্রাচীনরা বলতেন জম্বুদ্বীপ। বোধহয় সেই ধারণায় সমুদ্র যাত্রা নিষিদ্ধ হয়েছিল। ফলে এ দেশের লোক হয়েছিল কূপমণ্ডুক।

সমুদ্রপথে ওপার থেকে কেউ না এলে এপারে রেনেসাঁস হত না। রেনেসাঁস ছিল বিদেশ থেকে আসা রাজপুত্রের সোনার কাঠির স্পর্শ লেগে রাজকন্যার নবজাগরণ। বিদেশের সঙ্গে সম্পর্ক যখন শাসক শাসিতের সম্পর্ক হয়ে অগৌরবের হেতু হয় তখন তার পালটা রিভাইভাল বা পুনরুজ্জীবন বলে অপর এক শক্তি জেগে উঠে প্রাচীন গৌরবের বাণী শোনায়। ফলে স্বদেশের রেনেসাঁস এক শতাব্দীর মধ্যেই তার গতিবেগ হারায়। জোয়ার পরিণত হয় ভাঁটায়। অতীতের প্রতি পিছুটান প্রবল হয়ে ওঠে। জরার জয়গান শুনে রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'সবুজের অভিযান' ও 'ফাল্গুনী'। বিনু তার কৈশোরেই সেসব পড়ে মুগ্ধ হয়। পরে সেও যৌবনের প্রবক্তা হয়ে ওঠে। দেশের তথা জাতির যৌবনের।

রেনেসাঁস পশ্চিম থেকে এলেও তার মূল কথা শুধু পাশ্চাত্য নয়। সে বলে এ জগতের কেন্দ্রবিন্দু দেবতা নয়, মানব। ধর্মের পরিবর্তে সে প্রচার করে মানবিকবাদ।

হিউমানিজম। এতে মানবের মহিমা বাড়ে, দেবতার মহিমা কমে। মানবমহিমার নজির প্রাচীন গ্রীসে ছিল। কিন্তু খ্রিস্টধর্মের প্রচলনের ফলে সে নজির লোকে ভুলে যায়। এই বিস্মৃতির যুগকে ধার্মিকরা বললেন আলোকের যুগ, এর পূর্বের যুগকে অন্ধকার যুগ। কিন্তু চাকা ঘুরে যায়। তুর্কদের আক্রমণে স্থানভ্রষ্ট হয়ে গ্রীক পণ্ডিতরা আশ্রয় নেন ইটালীতে। শুরু হয়ে যায় গ্রীকদের অনুসরণে কাব্য, নাটক, দর্শন, বিজ্ঞান, চিত্রকলা ও ভাস্কর্য চর্চা। দেখতে দেখতে ইটালীর তথা পশ্চিম ইউরোপের সাংস্কৃতিক রূপান্তর ঘটে। একেই বলা হয় রেনেসাঁস বা পুনর্জন্ম। আধুনিক যুগের সূত্রপাত হয়। তখন আধুনিকরা বলেন মধ্যযুগটা ছিল অন্ধকার যুগ, আধুনিক যুগটা হল আলোকের যুগ। ধর্মগুরুদের সঙ্গে মনীষীদের মতভেদ যেন উত্তর মেরুর সঙ্গে দক্ষিণ মেরুর। মনীষীদের উপর নির্যাতন আরম্ভ হয়। রেনেসাঁসের বিপরীতে কাউন্টার রেনেসাঁস চালানো হয়। শেষপর্যন্ত যেটা হয় সেটা এক প্রকার সহ-অবস্থান। ধর্মও থাকে, মানবিকবাদও থাকে। যার যাতে অভিরুচি সে তাকে গ্রহণ করে। ক্রমে ধর্মের সঙ্গে মানবিকবাদের এক প্রকার সমন্বয়ও হয় অনেক ব্যক্তির চিন্তায় ও বিশ্বাসে। মানবিকবাদীদের মধ্যে যেমন নিরীশ্বরবাদী আছেন তেমনি ঈশ্বরবিশ্বাসীও রয়েছেন।

আজকাল খুব কম ধর্মীয় নেতাই বিশ্বাস করেন যে প্রাচীন গ্রীকরা ছিল আলোকবর্জিত পেগান, অন্ধকার থেকে তাদের বংশধররা আলোকে উত্তীর্ণ হয় খ্রিস্টধর্ম গ্রহণে। তেমনি খুব কম মানবিকবাদী মনে করেন যে মধ্যযুগটা ছিল আলোকবর্জিত অন্ধকার যুগ, রেনেসাঁসই মধ্যযুগেব মানুষকে আলোকে উত্তীর্ণ করে। কোনো যুগই শুধুমাত্র আলোকের বা অন্ধকারের ছিল না বা নয়। তা হলেও মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণ একটা ঐতিহাসিক পরিবর্তন। সেটা সম্ভব হয় রেনেসাঁসের কল্যাণেই। একথা যেমন ইউরোপের ইতিহাসে সত্য তেমনি ভারতের ইতিহাসেও। রেনেসাঁসকে পাশ্চাত্য না বলে আধুনিক বলা ভালো। তা দেশনিরপেক্ষ তথা ধর্মনিরপেক্ষ।

এখানেও আবার এক 'কিন্তু'। পুরাতনের প্রত্যাবর্তন চাইনে, কিন্তু পুরাতনের সমস্তটাই কি পুরাতন? চিরন্তন বা চির নতুন কি পুরাতনের মধ্যে নেই। নচিকেতার প্রশ্ন, মৈত্রেয়ীর প্রশ্ন কি পুরাতন না সনাতন? বুদ্ধের উপদেশ 'আত্মদীপো ভব' কি সেকালের না সব কালের?

বিনুকে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর চিন্তা করতে হয় পুরাতনের থেকে বাছাই করে কী কী রাখতে হবে, কী কী ফেলতে হবে। ধর্মে, সমাজে, রাষ্ট্রে, সাহিত্যে, চারুকলায়, দর্শনে, বিজ্ঞানে, প্রযুক্তিবিদ্যায়। সব কিছুই আজ নতুন আগামী কালে পুরানো। তারই মধ্যে হয়তো কিছু চির নতুন। তার লেখাও তো দু'দিন পরে পুরাতন হবে। কালোত্তীর্ণ হবে এমন কিছু কি সে লিখেছে বা লিখবে? বিনু এ প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম।

চেষ্টা করলে লেখাকে রূপোত্তীর্ণ করা সম্ভব, চেষ্টা করলে রসোত্তীর্ণ করাও সম্ভব, কিন্তু কালোত্তীর্ণ করা লেখকের হাতে নয়। বিশ্বসাহিত্যে যেসব বই ক্লাসিক হয়েছে সেসব বই হাজার দু'হাজার বছরের পুরাতন হয়েও চির নতুন। যেমন কালিদাসের 'মেঘদূত' কিংবা ওমর খৈয়ামের 'রুবাইয়াৎ'। বাংলাভাষায় বহু লেখক অনুবাদ করেছেন।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের যা কালোত্তীর্ণ তাকে বর্জন না করে স্বাধীন ভারতকে নবীন ভারত করতে হবে। রেনেসাঁসের যুগ পার হয়ে গেছে। এখন যেটা চাই সেটার ইংরেজি নাম রিনিউয়াল। বাংলায় নবায়ন। দম সঞ্চয় করতে করতে বিনুর বয়স হয় পঁচাত্তর। আবার

একখানা বৃহৎ উপন্যাস লিখতে বিনুর দম ছিল না। চার খণ্ডের উপন্যাস তো দমের কাজ। দেশের জন্যে বইখানা লিখে শেষ করতে অন্তত চারবছর তো লাগবেই। স্বাস্থ্য অনুকূল না হলে আরো ক'বছর কে জানে?

এক জ্যোতিষী বলেছিলেন তার পরমায়ু পঁচাত্তরের বেশি নয়। জ্যোতিষে যদিও তার বিশ্বাস নেই তবু মনে হয় পঁচাত্তরটা পার হয়ে যাক আগে, তার পরে শুরু করা চলবে। যদি বেঁচে থাকে। পঁচাত্তর যথাসময়েই অতীত হয়। জ্যোতিষ যে অভ্রান্ত নয় তা সম্যক উপলব্ধি করার পরে বিনু তার বৃহৎ উপন্যাসে হাত দেয়। আশি বছর তাকে বাঁচতে হবে, যদি চার খণ্ডে লিখতে হয়। সে বেছে নেয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরম্ভ থেকে মহাত্মা গান্ধীর আগে পর্যন্ত সময়সীমা আবদ্ধ ভারত ইতিহাস। সে আপনি যার ভিতর দিয়ে নিঃশ্বাস নিয়েছে। সে নিজে একজন প্রত্যক্ষ সাক্ষী। চল্লিশের দশকের অধিকাংশই এই উপন্যাসের ঘটনাকাল। মহাযুদ্ধের অনুষঙ্গে ঘটেছে জাতীয় সংগ্রাম, মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক মহামারী, স্বাধীনতা।

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হবার ন'বছর বাদে বিনু বিলেত যায় ও তার ফিরে আসার দশ বছর বাদে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধে। যে দু'বছর সে বিলেতে ছিল সে সময়টা ছিল দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী শান্তিপ্রচেষ্টার সময়। তখন কারো মাথায় আসেনি যে হিটলার বলে একটা অজানা অচেনা লোক জার্মানদের জননায়ক ও রণনায়ক হয়ে আবার এক মহাযুদ্ধের অঙ্গনে ইংরেজ, ফরাসী রুশ ও মার্কিনকে সমবেত করবে। দুই ফ্রন্টে লড়তে লড়তে জার্মানরা অবশেষে পরাস্ত হবে এটা তো অবধারিত। কিন্তু নাৎসীদের ধারণা ছিল কমিউনিস্ট ও ক্যাপিটালিস্ট কখনো একজোট হবে না, হতে পারে না। সুতরাং ক্যাপিটালিস্টদের ঘায়েল করে তারা কমিউনিস্টদের খতম করবে। ভুলটা হল এই গণনাতেই যে দুই বিপরীত মেরু কখনো পরস্পরের সঙ্গে হাত মেলাতে পারে না। কিন্তু অঘটন আজও ঘটে। মহাশত্রু স্টালিনের কাছে দূত পাঠিয়ে চার্চিল তাঁকে অবহিত করলেন যে হিটলার তাঁর সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করে যুদ্ধে নামতে উদ্যত। পরে চার্চিল স্বয়ং স্টালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে মস্কো যান, স্টালিন লন্ডনে আসেন না। রুজভেল্টও যান স্টালিনের সঙ্গে মিলিত হতে। স্টালিন তাঁর সঙ্গে ইউরোপ ভাগাভাগি করেন। চার্চিলের পরিকল্পনা মান্য করেন না। তবে চার্চিলই ইংলন্ডকে বাঁচান। কিন্তু তাঁর প্রেস্টিজ যখন তুঙ্গে তখন ইংরেজরা তাঁকে না করে অ্যাটলিকে করে প্রধানমন্ত্রী আর অ্যাটলি ভারতকে মুক্তি দেন। লেবার পার্টি প্রতিশ্রুত হলেও কার্যকালে চার্চিলের সম্মতির প্রয়োজন ছিল। তিনি রাজী হন তাঁর চিরশত্রু গান্ধীকে ভারতের একাংশ থেকে বঞ্চিত আর উভয় অংশকে কমনওয়েলথভুক্ত দেখে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে গান্ধীজীর পলিসি ছিল একরকম, কংগ্রেস হাইকমান্ডের আরেক রকম, সুভাষচন্দ্রের আরো এক রকম, কমিউনিস্টদের আরো এক রকম, মুসলিম লীগের আরো এক রকম, হিন্দু মহাসভার আরো এক রকম। ভারতের জনমত কেবল বিভক্ত নয়, বিভ্রান্ত। ভারতের হয়ে কথা বলার একক অধিকার গান্ধীজীর বলে বড়লাট লিনলিথগাউ স্বীকার করেন না। তিনি জিন্না সাহেবকেও গান্ধীজীর সঙ্গে বন্ধনীভুক্ত করতে চান। ফলে গান্ধীজী সরে দাঁড়ান ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে কংগ্রেসের সভাপতি তথা প্রতিভূ করেন। জিন্না সাহেব এটা মেনে নিতে পারেন না, সুতরাং বড়লাটও মেনে নেন না। কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যায়। তখন কংগ্রেসের অনুরোধে গান্ধীজী ব্যক্তি সত্যাগ্রহ পরিচালনা করেন সিভিল লিবার্টির দাবিতে। অর্থাৎ যুদ্ধবিরোধী প্রচারকার্যের স্বাধীনতার ইস্যুতে।

কোনো সরকারই যুদ্ধকালে তা করতে দেয় না। ব্যক্তি সত্যাগ্রহ চলে। বহুসংখ্যক কংগ্রেস কর্মী কারাবরণ করেন।

গান্ধীজী বলেছিলেন পরে এক সময় গণ অভ্যুত্থান আপনা থেকেই হবে। হত হয়তো যুদ্ধের শেষের দিকে, কিন্তু ইতিমধ্যে শুরু হয়ে যায় জাপানী অভিযান, বর্মা দখল হয়, ভারত আক্রান্ত হবার মুখে নেতা ও কর্মীরা খালাস হন। আবার কথাবার্তা। এবার ক্রিপসের সঙ্গে। জাপানীরা ভারতে এলে ভারত হয়ে উঠবে রণাঙ্গন। তখন ব্রিটিশ সেনা তাদের রুখতে পোড়ামাটি নীতি অনুসরণ করবে। সরকারে যোগ দিয়ে কংগ্রেস নেতারা তা ঠেকাতে পারবেন না। মাঝখান থেকে কলকারখানা বন্দর ব্রিজ প্রভৃতি ধ্বংসের জন্যে দায়ী হবেন। তাই তাঁরা দাবি করেন যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষমতা। ব্রিটিশ সেনার উপর এক্তার। ক্রিপস নারাজ। কথাবার্তা বন্ধ। তখন 'কুইট ইন্ডিয়া' প্রস্তাব পাশ। গণ সত্যাগ্রহ করার আগে গান্ধীজী বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেতেন, কিন্তু বড়লাট তাঁকে বন্দী করে বিদ্রোহের আগুন উস্‌কে দেন। তাঁর মতে সেটা উস্‌কানি নয়, সেটা তড়িঘড়ি নেবানো। দেশজুড়ে হিংসাত্মক কাণ্ড ঘটে। গান্ধীজীকে দায়ী করে দুনিয়াময় রটানো হয় যে গান্ধীজী জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে ইংরেজের পরাজয় চান। তিনি জাপানীদের আসার পথ সুগম করে দিচ্ছেন। তাঁকে এই অপবাদের বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রকাশের স্বাধীনতা না দেওয়ায় তিনি একুশ দিন অনশন করে দুনিয়াকে জানান দেন যে তিনি নির্দোষ।

যুদ্ধ শুরু হবার সময় গান্ধীজী বলেছিলেন এ যুদ্ধ শেষ হবে একটি মরাল ইস্যুতে। হলও তাই। হিরোশিমার উপর পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ সেই মরাল ইস্যু। নিরীহ নিরস্ত্র দেড় লক্ষ শিশু, নারী ও বৃদ্ধকে সতর্ক না করে ও পলায়নের সুযোগ না দিয়ে নির্মমভাবে হত্যা না করলে জাপানীরা বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করত না। এটা একটা নৈতিক পরাজয়। বিজেতা পক্ষের। ওদিকে নাৎসীরাও যুদ্ধকালে ষাট লক্ষ নিরীহ নিরস্ত্র ইহুদীকে গ্যাস চেম্বারে পুরে হত্যা করে। সেটাও তাদের নৈতিক পরাজয়। উপরন্তু সামরিক পরাজয়।

যুদ্ধকালে বিনুর অর্ধেক নজর ছিল ইংরেজের উপরে, অর্ধেক নজর কংগ্রেসের উপরে। তখন সে ভাবতেই পারেনি যে ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে। সেটা জিন্না সাহেবের ডাইরেক্ট অ্যাকশন। এর বিরুদ্ধে গান্ধীজীর কোনো আয়ুধ ছিল না। হিন্দু মুসলমানের যুদ্ধে তিনি হিন্দু শিবিরের যোদ্ধা ছিলেন না। তিনি ছিলেন দুই পক্ষের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দুই পক্ষকে নিবৃত্ত করার জন্যে তৎপর শান্তিবিধায়ক পীসমেকার। ফলে উভয় শিবিরের যোদ্ধাদের চোখে দুশমন। ইংরেজরা যখন স্বেচ্ছায় কুইট করার নোটিস দেয় তখন তিনি পরামর্শ দেন, মুসলিম লীগকে গদি ছেড়ে দাও। কংগ্রেস নেতারা ইতিমধ্যেই গদিয়ান হয়েছিলেন। তাঁরা গদিও ছাড়েন না, গদাযুদ্ধও করেন না। তাঁদের মন্ত্র হল, 'সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।' ইতি পণ্ডিত নেহরু। তবে অর্ধেক নয়, এক-চতুর্থাংশ। ভারতের মুসলমান সংখ্যাও ছিল প্রায় এক-চতুর্থাংশ। কাজীর বিচারে দেশভাগ ও প্রদেশ ভাগ হয়ে যায় নিক্তির ওজনে।

গান্ধীজীর সত্যিকার কাজ ছিল দুটি। ভারতের স্বাধীনতা অর্জন ও অহিংস উপায়ের মাহাত্ম্য প্রতিপাদন। যার জন্যেই তিনি মহাত্মা। স্বাধীনতা যে উপায়ে অর্জিত হল তা যে পুরোপুরি অহিংস নয় তা তিনি জানতেন ও মানতেন। অর্ধেক অহিংসা আর অর্ধেক হিংসার পরিণাম যে খণ্ডিত স্বাধীনতা হবে তা তিনি দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করেন। ইচ্ছা করলে তিনি

পার্টিশনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারতেন, কিন্তু তা হলে ঘটে যেত তাঁর নিজের সেনার সঙ্গেই বিচ্ছেদ। জবাহরলাল ও বল্লভভাই তাঁকে ছাড়তেন। সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ কংগ্রেসকর্মী। অসহায় মহাত্মার একমাত্র কর্তব্য হল সংখ্যালঘু মুসলমানদের উপরে সংখ্যাগুরু হিন্দুদের সহিংস আক্রমণ অহিংস উপায়ে রোধ। ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায় নিরাপদ হলে পাকিস্তানের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ও নিরাপদ হবে। কতক হিন্দু এটা বুঝল, কতক বুঝল না। তাদের মতে এটা মুসলিম তোষণ। তাদের ধারণা মুসলিম বিতাড়নই ছিল হিন্দু বিতাড়ন রোধের মোক্ষম উপায়। তাঁকে পীড়া দেয় তাঁর বিশ্বস্ত সহকর্মীদের মধ্যেই উগ্র হিন্দু মনোভাব। তিনি অনশন করেন। সফল হন। সফল হন বলেই নিহত হন। সফল না হলে অবশ্য অনশনে দেহত্যাগ করতেন। তাঁর নিধনের পর অতিপ্রিয় সহকর্মীর মন্তব্য হল, "তিনি অনশনে মরলেই ভালো হত।"

রাজনীতিক্ষেত্রে অহিংসার প্রয়োগ গান্ধীজীর সঙ্গেই আরম্ভ গান্ধীজীর সঙ্গেই শেষ। বিনু আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত অহিংসার পরীক্ষার মনোযোগী ছাত্র। শুধু ভারত ইতিহাসে নয়, মানব ইতিহাসেও তাঁর অহিংসা নিয়ে পরীক্ষা একটি অভূতপূর্ব অধ্যায়। গান্ধীজী যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহের পরীক্ষা শুরু করেছেন তখন টলস্টয় তাঁকে চিঠি লিখে উৎসাহ দেন। যা বলেন তার মর্ম তিনি যে কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন সেটাই পৃথিবীতে সবচেয়ে আবশ্যক, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্ম। গান্ধীজীর পূর্বসূরী ছিলেন টলস্টয় ও থোরো। টলস্টয় প্রেরণা পেয়েছিলেন রুশদেশের গ্রামীণ কৃষক দুখোবরদের জীবনধারা থেকে। তারা অস্ত্র ধরত না, অস্ত্র ধরতে বাধ্য করলে প্রতিরোধ করত। গণ-প্রতিরোধের অহিংস নজির সেইখানে। শেষপর্যন্ত তাদের দেশান্তরী হতে হয়। 'রেজারেকশন' উপন্যাস লিখে টলস্টয় যা উপার্জন করেন তা দুখোবরদের মহানিষ্ক্রমণে সাহায্য করেন।

বিনু পুনর্নবায়ন নিয়ে চিন্তান্বিত ছিল, কিন্তু তার যেটুকু সঙ্কেত পেল সেটুকু গান্ধীজীর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যেই নিহিত। যুদ্ধবিগ্রহের ভিতর দিয়ে নবায়ন হয়, বিপ্লব প্রতিবিপ্লবের ভিতর দিয়েও হয়, কিন্তু বিনুর আকাঙ্ক্ষিত নবায়ন হবে শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে। ত্যাগ ও তপস্যার ভিতর দিয়ে। হিংসার মতো পুরাতন আর কী আছে?

তার তৃতীয় বৃহৎ উপন্যাস সমাপ্ত হয় বিরাশি বছর বয়সে। আশ্চর্য। তখনো সে বেঁচে আছে। তখনো তার হাতে বহু দিন থেকে ভেবে রাখা অথচ অনারব্ধ লেখা বড় মাপের নয়। তবু বিশেষ মূল্যের। পুনর্ভাবনায় অনেক ভুলভ্রান্তির, অনেক মোহের অবসান হয়েছে। তা বলে অতিবাহিত জীবনকে এডিট করা চলে না। পাপ নেই, তাপ নেই, এমন জীবন রক্ত-মাংসের মানুষের জীবনে দেখা যায় না। বিনু রক্ত মাংসের মানুষ।

তবে সাহিত্যে সব কিছু খুলে বলা যায় না। মিথ্যা না বললেই হল।

বিনুর বিকাশ

ভবভূতি বলে গেছেন, 'কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ বিপুলা চ পৃথ্বী।' সেই নিরবধি কালকে মানুষ সুবিধামতো শতাব্দীতে ভাগ করে নিয়েছে। আর সেই বিপুলা পৃথ্বীকে বিভিন্ন দেশে। দেশও সত্য, শতাব্দীও সত্য, তবু পূ᠎র্ণ সত্য নয়। পূর্ণ সত্য হচ্ছে নিরবধি কাল ও অখণ্ড দেশ।

যে লেখে তার দেশ আছে, যুগ আছে। কিন্তু যা লেখা হয় তা দেশ থেকে দেশান্তরে

ও যুগ থেকে যুগান্তরে ছড়িয়ে পড়তে পারে। সূর্যের আলোর মতো। সমুদ্রের তুফানের মতো। বাইরের মানুষটার জাত কুল বংশপরিচয় আছে, ভিতরের মানুষটার তা নেই। তার লেখনীর মুখ দিয়ে যা নিঃসৃত হয় তা যদি অতি গভীর স্তরের বাণী বহন করে আনে তবে তা গ্রীকের না ভারতীয়ের না চৈনিকের না আরবের না পারসিকের না ইংরেজের না ফরাসীর না জার্মানের না রুশের না নরওয়েজিয়ানের ও গণনা লঘুচেতাদের। উদারচারিতের কাছে বসুধার সকলেই কুটুম্ব।

এ শিক্ষা বিনু তার শৈশব থেকেই পেয়েছিল। তার পিতামহী তাকে তাঁর কাছে শুইয়ে রোজ রাত্রে শোনাতেন রামায়ণ মহাভারতের উপাখ্যান, সেই সঙ্গে গোলেবকাওলি পরীর কাহিনী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সম্বন্ধে খোশগল্প। তার কাকারা ও তাদের সহপাঠীরা শেক্সপীয়ারের নাটকের দৃশ্য অভিনয় করতেন। সে ছিল কনিষ্ঠ দর্শক। বিনুদের বাড়িতে যে দুর্গাপূজা হত তাতে প্রতিমা থাকত না। পরিবর্তে থাকত একটা জলচৌকির উপরে কিছু বইপত্র ও একটা তলোয়ার। বইপত্রের মধ্যে ইংরেজি শেক্সপীয়ার গ্রন্থাবলী। সরস্বতী পূজার সময় তলোয়ার অন্তর্হিত, কিন্তু শেক্সপীয়ার সুরক্ষিত। তা ছাড়া বাড়িতে বাইবেলও ছিল। ছোট কাকার পরীক্ষা পাশের দরুন উপহার।

খ্রিস্টানদের সঙ্গে বিনুর সম্পর্ক আজন্ম। যাঁর হেপাজতে সে ভূমিষ্ঠ হয় তিনি একজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান লেডি ডাক্তার। বিনুদের বাড়ির সামনে দিয়ে তিনি গাড়ি করে রাজপ্রাসাদে যাতায়াত করতেন। খোঁজ করতেন বিনুর ও তার ভাইবোনের। সকলেরই জন্ম তাঁর হেফাজতে। পাড়ায় একঘর খ্রিস্টানও ছিলেন, তাঁদের পরিবারের ছেলেদের সঙ্গেও বিনু খেলত। বিনুদের বাড়ির পেছনেই থাকতেন একঘর মুসলমান। তাঁদের ছেলে এসে বিনুর সঙ্গে খেলত, মেয়ে বেড়ার ওপার থেকে দুটি একটি কথা বলত। কাকাদের বন্ধু পাঠান মাস্টার রোজ আসতেন চা খেতে ও গল্প করতে। বোখারি সাহেব মাঝে মাঝে সত্য পীরের সিন্নি দিয়ে যেতেন। রাজকর্মচারী আতাহার মিয়াঁ দিয়ে যেতেন হালুয়া। মহরমের মিছিল বাড়ির সামনে এসে লাঠি খেলা দেখাত। বিনুর ঠাকুমার মানত ছিল বিনুও মহরমে লাঠি খেলবে। বিনু কিন্তু মনে মনে বাঘের নাচ নাচত। নাপিতের ছেলে সিরিয়ার মতো। মহরমে হিন্দুদের উৎসাহ কম নয়। বাজনদাররা সবাই হিন্দু।

অন্দরের দুয়ার খুলে যায়, যখন বিনুর আট বছর বয়সে তার মা বাবা বৈষ্ণব দীক্ষা নিয়ে বাড়িতে গোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। সপ্তাহে সপ্তাহে কীর্তন, মাসে মাসে মোচ্ছব। আহূত, অনাহূত, রবাহূত সকলেই স্বাগত। কীর্তনীয়ারাও বাইরের লোক বেশির ভাগ। দুর্গাপূজা, সরস্বতী পূজা আর হয় না। বিনুকে বলা হয় না কবিকঙ্কণ চণ্ডী সুর করে পড়তে। তার মা সুর করে জয়দেব থেকে গান করেন। আর বাবা সুর করে বিদ্যাপতি থেকে আবৃত্তি করেন। শুনতে শুনতে বিনুর ছন্দের কান তৈরি হয়ে যায়। মা বাবার কাছে ভগবান হচ্ছেন পুত্রের মতো প্রিয়। তাঁদের সাধনা বাৎসল্য রসের সাধনা। কিন্তু লীলাকীর্তন শুনলে মনে হয় বৈষ্ণবদের সাধনা মধুর রসের সাধনা। ভগবান তাঁদের কান্ত। বিনুর বয়সে এসব বোঝা সম্ভব ছিল না। সেও কীর্তনের শেষে জয়ধ্বনি দিয়ে বলত, "রাধারাণী কী জয়"। অথচ রাধারাণীর বিগ্রহ বাড়িতে ছিল না। কিশোর কৃষ্ণেরও না। এর জন্যে তাকে যেতে হত রাজমাতার প্রতিষ্ঠিত রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে। সুন্দর যুগল মূর্তি।

একদিনে নয়, এক বছরেও নয়, দীর্ঘকাল ধরে তার অন্তরে চলতে থাকে ধর্মবিশ্বাসের

ক্রম পরিবর্তন। গৃহদেবতা গোপালের প্রতি তার মা বাবা বাৎসল্য রস অনুভব করতে পারেন, সে কী করে পারবে? ভাইয়ের বেলা যে ভালোবাসা অনুভব করা যায় তা ভগবানের বেলা কি সম্ভব? মা বলতেন গোপাল তার ছোট ভাই। ছোট ভাইকে কি কেউ প্রণাম করে? রবীন্দ্রনাথ তথা ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে সে ক্রমে ক্রমে একেশ্বরবাদী ও নিরাকারবাদী হয়ে ওঠে।

অথচ বৈষ্ণব মত সে সরাসরি ত্যাগ করতে পারে না। আরো বড়ো হয়ে সে যখন আত্মপরীক্ষা করে তখন উপলব্ধি করে সে লীলাবাদী। জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ নিত্য লীলার সম্বন্ধ। বৈষ্ণবদের মতো সেও বিশ্বাস করে যে সমস্তই ভগবানের লীলা।

বোধহয় রক্তের ভিতরে মায়াবাদ নিহিত ছিল। তাই মা বলতেন, 'এটা মায়ার সংসার। কেউ কারো নয়।' শঙ্করাচার্য বলছেন, 'কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ।' তিনি মায়াবাদী। কথাটা মাকে কেউ শিখিয়ে দেয়নি। সেটা তাঁর অন্তর থেকে স্বতঃ উৎসারিত। মা খুব কম বয়সেই ছেলেমেয়েদের মায়া কাটিয়ে চলে যান। তাঁর প্রিয় পুত্র গোপালেরও। সংসারের ধকল তাঁর দুর্বল শরীরে সহ্য হচ্ছিল না। কখনো তো বিশ্রাম করেননি। তবে তাঁর মৃত্যুর পরও কীর্তন মোচ্ছব একই ভাবে চলতে থাকে। যেটা বন্ধ হয় সেটা প্রতি সন্ধ্যায় জয়দেব থেকে গান। বাবা ক্রমশ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অথরিটি হয়ে ওঠেন। স্বয়ং রাজমাতা তাঁকে ডেকে পাঠাতেন ও তাঁর পরামর্শ নিতেন।

আট দশ বছরের ছেলেকে কি তার বাপ যা ইচ্ছা তাই পড়ার স্বাধীনতা দেন? বিনু যে কেবল ইংরেজি বাংলা সাপ্তাহিক পড়ত তা নয়, তার একটা লাইব্রেরি ছিল। তাতে ছিল বৈষ্ণব পদাবলী, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর, বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, দারোগার দপ্তর প্রভৃতি বই। বেশির ভাগই 'বসুমতী'র উপহার। বুঝুক আর না বুঝুক বিনু গোগ্রাসে গিলত। ওদিকে তার হাইস্কুলের হেডমাস্টার মশাই তার উপর কমন রুমের ভার দিয়েছিলেন। চাবি খুলে যখন ইচ্ছা রাশি রাশি মাসিকপত্র পড়ত। তার মধ্যে কিছু ইংরেজি মাসিক ও সাপ্তাহিকও ছিল। বিনুকে সব চেয়ে আকর্ষণ করত 'সবুজপত্র'। ওড়িশার এক দেশীয় রাজ্যে 'সবুজপত্রে'র সমজদার বোধহয় শিক্ষকদের মধ্যে বাঙালি হেডমাস্টার মশাই আর ছাত্রদের মধ্যে বিনু।

স্কুলের লাইব্রেরিটি ছিল আশ্চর্যরকম আধুনিক। প্রাক্তন হেডমাস্টার মশাইরা শিক্ষকদের জন্যে আনিয়ে রেখেছিলেন ইতিহাসের বই। তা ছিল কলেজ স্তরের চেয়েও উচ্চতর স্তরের। ইংরেজি শিশু বিশ্বকোষও ছিল। কিছু ব্রাহ্ম ধর্মগ্রন্থ। স্কট, ডিকেন্স প্রভৃতির সংক্ষেপিত নভেল। বিস্তর বই রবীন্দ্রনাথের, সত্যেন্দ্রনাথের, রজনীকান্তের, আরো অনেকের। বিনু একদিন আবিষ্কার করে চারখানি ইংরেজি বই। কেউ পড়েনি। পাতা কাটা হয়নি। বাংলা করলে দাঁড়ায় 'যা প্রত্যেক বালকের জানা উচিত', 'যা প্রত্যেক তরুণের জানা উচিত' ইত্যাদি। যৌন বিষয়ক জ্ঞান যথেষ্ট শালীনতার সঙ্গে পরিবেশিত। বিনুটা এমন ন্যাকা সে তার বাবাকে বলে, "এ বইতে লিখেছে পুরুষের উচিত নয় নারীদের সঙ্গে শোওয়া। কেন?"

তিনি তাঁর বন্ধুর সঙ্গে বসে শাস্ত্র পাঠ করছিলেন। বিনুর প্রশ্ন শুনে দু'জনই হেসে ওঠেন। বাবা বলেন, "তা না হলে সৃষ্টি রক্ষা হবে কী করে?" বন্ধুও পুনরুক্তি করেন।

বন্ধুর কন্যার নামও ছিল 'সৃষ্টি'। মা মরা মেয়ের বিয়ে দিয়ে যিনি সংসার ত্যাগ করেছেন।

সৃষ্টি রহস্য বিনু সেই সূত্রেই জেনেছিল। ওরকম বই যে কেমন করে ওরকম জায়গায় এল সেইটেই আশ্চর্য। বিষয়টা তখনকার দিনে বিলেতেও নতুন। কিন্তু চিরপুরাতন। সব দেশে সব স্ত্রী পুরুষ জানে কিন্তু জানায় না। বিনু আরো বড় হয়ে অসংখ্য বিদেশী পুস্তক পড়েছে। প্রেমের কাহিনী। অথচ কাম পর্যন্ত এসে সম্পূর্ণ নীরব। কারণটা পরে টের পায়। কড়া আইন কানুন। না মানলে জেল, জরিমানা, বাজেয়াপ্তি। লেখক, সম্পাদক, প্রকাশক আদালতের কাঠগড়ায়। লাঞ্ছনার শিকার ফ্লোবেয়ার, জোলা, ডি এইচ লরেন্স, জেমস জয়েস, আঁদ্রে জিদ প্রমুখ।

যেখানে যত নিষেধ সেখানে তত কৌতূহল। কৌতূহলই নিষিদ্ধ গ্রন্থের মূল্য বাড়িয়ে দেয়। নিষেধ তুলে দিলে দেখা যায় বইখানা সত্যি এমন কিছু মূল্যবান নয়। কৌতূহল মিটে গেলে চলনসই।

একটি বনেদী শাক্ত পরিবার রাতারাতি বৈষ্ণব বনে যাওয়ায় যে পরিবর্তনটা ঘটে সেটা এক হিসাবে বৈপ্লবিক। এতকাল যে দেবী প্রতিমা বেদী জুড়ে বসেছিলেন তাঁকে স্থানান্তরিত হতে হয়। গোপাল বসেন রাজ আসনে। রান্নাঘরে মাছ মাংস ঢুকতে পারে না। জীবে দয়া বৈষ্ণবধর্মের প্রথম অনুশাসন। জীব হত্যা বারণ। সবাই নিরামিষ খায়, বিনু মাঝে মাঝে বাড়ির বাইরে বাগানের এককোণে মাংস রেঁধে বনভোজন করে। বাবা আঘাত পান। তিনি একদা শিকার করতেন, তাঁর একটি বন্দুক ছিল। সেই তিনি ডুবন্ত পিঁপড়েকে জল থেকে উদ্ধার করেন। মাছি মারলেও তাঁর কষ্ট হয়। এর মধ্যে ভণ্ডামি ছিল না। তিনি যখন যেটা করতেন চূড়ান্ত করতেন। মাকেও তা মানতে হত। কিন্তু ছেলেমেয়েরা যে অবোধ।

বৈষ্ণব ধর্মের দ্বিতীয় অনুশাসন হল নামে রুচি। নামসংকীর্তন! বিনুদের তাতে বিরাগ ছিল না, অনুরাগ ছিল। তিনটে খোল কিনে দেওয়া হয় তিন ভাইকে। মেজভাই ওস্তাদ হয়ে ওঠে। বিনু বাজাতেই পারে না। কিন্তু নগরসংকীর্তনে বেরিয়ে বাহু তুলে নাচে। কিছুদিন পরে তাতেও অনীহা আসে।

বাবা তাকে বিশ্বাসের স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। সে যেটুকু বিশ্বাস করত সেটুকু স্বাধীনভাবেই করত! কারো কথায় নয়। বাবাকে প্রণাম করলে তিনি বলতেন, 'কৃষ্ণে মতি হোক।' তার বেশি মুখ ফুটে চাইতেন না। কোনো এক বন্ধু তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন ছেলেদেরও বৈষ্ণব দীক্ষা দিতে। তিনি সে পরামর্শ অগ্রাহ্য করেন। তাঁর বিশ্বাস তিনি ওদের উপর চাপিয়ে দেবেন না। ওদের বয়স হলে ওরা নিজেরাই তেমন কোনো সিদ্ধান্ত নেবে! নিলে গুরু বেছে নেবে। তিনি নিজে যা করেছিলেন।

তবে বাবা একবার বিনুকে সকালে কিছুক্ষণ ধ্যান করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি নিজে ধ্যান করতেন। কাকে ধ্যান, কিসের ধ্যান, কেন ধ্যান বিনু দু'চার দিন চোখ বুজে রয়। তারপর ছেড়ে দেয়। চোদ্দ পনেরো বছর বয়সে একদিন তার চোখ থেকে পর্দা সরে যায়। সব আলো হয়ে যায়। এক মুহূর্তের জন্যে সে বিশ্বরূপ দর্শন করে। দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে আরো এক জগৎ আছে, এই জগৎই সমগ্র জগৎ নয়, দুই মিলিয়ে সম্পূর্ণ সৃষ্টি। বিনুর আরো একবার এই উপলব্ধি হয় বিশ একুশ বছর বয়সে। মুহূর্তের জন্যে সব আলো হয়ে যায়। সে সমগ্রকে দেখতে পায়. কিন্তু খোলা চোখে নয়। কিন্তু ইচ্ছা করলেই আবার এই দিব্যদৃষ্টি লাভ হয় না। এটা পরমাত্মার অনুগ্রহ। আবার কবে তাঁর অনুগ্রহ হবে কে জানে!

বিনুর অন্তরে একজন মিস্টিক ছিল, তাই সে কখনো পুরোপুরি র‍্যাশনালিস্ট হয়নি। তেমনি, তার ভিতরে একজন বিশ্বনাগরিক ছিল, তাই সে কখনো পুরোপুরি ন্যাশনালিস্ট হয়নি।

তার বারো তেরো বছর বয়সে বাবা একবার বলেছিলেন, "তুই হবি জর্জ ওয়াশিংটন আর চিনু হবে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট।" শুনে বিনু পুলকিত হয়নি। তার মতে নেপোলিয়নই বীরশ্রেষ্ঠ। ওয়াশিংটন তাঁর দেশকে স্বাধীন করেছিলেন তা ঠিক। তা বলে নেপোলিয়নের চেয়ে বড় নন। বাবা কি মনে করেন বিনু চিনুর চেয়ে খাটো? অবশ্য গায়ের জোরে চিনু বিনুকে হারিয়ে দেয়।

বিনু ওয়াশিংটন হতে চায়নি, তবে পিতার আশীর্বাদ তো ব্যর্থ হবার নয়। সে আমেরিকায় পালিয়ে যাবার প্ল্যান করেছিল। সেদেশে গিয়ে সন্ত নিহাল সিং বা ধনগোপাল মুখার্জির মতো একজন লেখক হত। সেভাবেও ভারতের স্বাধীনতার জন্যে কাজ করা যায়। কলম তো তলোয়ারের চেয়ে বলবান। লোকে একদিন স্বীকার করবে যে বিনুও একজন মুক্তিদাতা ওয়াশিংটন।

আমেরিকা গেলে সে সেখানেই বিয়ে করত। এটাও তার কল্পনায় ছিল। রূপকথার রাজপুত্র সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে গিয়ে সেদেশের রাজকন্যাকে বিয়ে করত। গুরুজন সেটা মেনেও নিতেন। বিনুর বেলা অন্য রকম হবে কেন? সে অবশ্য কোনোদিন একথা কাউকে জানতে দেয়নি। কথাটা সত্যি সত্যি ফলে যায় তার জীবনে অনেক বছর বাদে। সাত সাগর পার থেকে আসেন এক মার্কিন কন্যা। বিনুর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়ে যায়। মা তখন নেই, থাকলে কী মনে করতেন কে জানে। বাবার তো আপত্তির কোনো সঙ্গত কারণ ছিল না। তিনি বলেও রেখেছিলেন যে বিনু জাতপাত ভেঙে বিয়ে করলেও তিনি সম্মতি দেবেন। অতটা ভেবে দেখেননি যে কন্যাটি বিদেশিনী হবে। যাই হোক, সব ভালো যার শেষ ভালো। বিনুর বৌকে তিনি আশীর্বাদ করেন। বৌমাও শ্বশুরকে যথাযোগ্য সম্মান ও প্রণতি জানায়।

বিনুকে তার বাবা একান্তে বলেন, "তোদের ছেলেমেয়ে হলে তাদের বিয়ে হবে কোন্ সমাজে?"

"হিন্দু সমাজ ততদিনে উদার হবে।" বিনু আশ্বাস দেয়।

বছর ছয়েক বাদে তিনি অকস্মাৎ মারা যান। চিনু মুখাগ্নি করে। বিনু আর তিনু অন্যত্র কর্মরত। শ্রাদ্ধের সময় তিন ভাই একত্র হয়। কুলপুরোহিত বলেন, "চিনু মুখাগ্নি করেছে, চিনুই শ্রাদ্ধের অধিকারী। বিনু তো হিন্দু মতে বিয়ে করেনি, বিয়েতে আমাকে তো ডাকেনি। আমি কেমন করে ওকে শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়াব?" বিনু হতবাক। তিনু বলে, "বাবা তো তাঁর বড় ছেলেকে ত্যাজ্য পুত্র করেননি। বাবার ইচ্ছা মান্য করতে হবে।" কুলপুরোহিত বিধান দেন যে তিন ভাই পাশাপাশি বসে শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়বে। তখন সারিবদ্ধভাবে ক্রিয়াকর্ম করে তিনজনে। বিনু মনে মনে আহত হয়। অভিমান ও অপমান চেপে রাখে। মন্ত্রতন্ত্রে ওর বিশ্বাস ছিল না। যন্ত্রের মতো আওড়ায়।

স্থানীয় ব্রাহ্মণরা ভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন না। বলেন, "উনি মেম বৌকে ঘরে নিয়েছিলেন। আমরা ওর শ্রাদ্ধে খাব না।" অথচ এঁরাই এককালে বাবার অনুগ্রহে চাকরি বা প্রমোশন পেয়েছেন বা অন্য কোনো সুবিধা। বিনু যদি দোষ করে থাকে তবে তার বাবা কেন শাস্তি পাবেন? চিনু রাগ করে শহরের মুসলমানদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসে। ঠাকুরঘরের

বারান্দায় পরিবারের লোকজনের সঙ্গে তাদের বসিয়ে দেওয়া হয়। বাবার বিশেষ বন্ধু ছিলেন এক ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব। স্থানীয় নন, বহিরাগত। তিনি আপনি এসে হাজির হন ও প্রধান অতিথির আসনে বসেন। ওসব সংস্কার তাঁর ছিল না। বিনুকে তিনি নৈতিক সমর্থন জোগান। সবচেয়ে আনন্দ মুসলমানদের। এ বাড়ির অন্দরে তারা কখনো ঢুকতে পারেনি। তারা তো কীর্তনীয়া নয়।

স্থানীয় ব্রাহ্মণরা নাকি পরে অনুতপ্ত হন। চিনুকে বলেন,"আবার আমাদের ডাকো। ডাকিলেই খাইব।"

প্রকৃত প্রতিবেশী কে? বাইবেলে গুড সামারিটানের প্যারাবল আছে। বিপদের দিনে যে জন সহায় সে বিদেশী বা বিধর্মী হলেও সে-ই প্রকৃত বান্ধব। সামারিটানদের সঙ্গে ইহুদীদের ছিল নিত্য কলহ। ডাকাতের হাতে জখম ইহুদীর দিক থেকে স্বজাতি যখন মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে যায় তখন বিজাতীয় পথিক তাকে সরাইতে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে, নিজের খরচে।

হিন্দু মুসলমানের নিত্য কলহে উদ্‌ভ্রান্ত হলেও বিনু ভুলতে পারে না যে মুসলমানদের মধ্যেও গুড সামারিটান আছে। হিন্দুদের মধ্যেও। পার্টিশনের অনতিকাল পূর্বে ময়মনসিংহে এক ভদ্রলোক তার সঙ্গে দেখা করেন। কথাপ্রসঙ্গে বিনু জানতে পারে তাঁর গ্রামে তিনিই একমাত্র হিন্দু গৃহস্থ। বাড়িতে স্ত্রীকে একা রেখে টুর করেন। "সে কী! আপনার ভয় করে না? বিপদের সময় কে রক্ষা করবে তাঁকে!" বিনু প্রশ্ন করে।

"কেন? পাড়ার মুসলমানরা। তারাই তো এতকাল রক্ষা করে এসেছে। আমরা তাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।" তিনি উত্তর দেন।

পার্টিশনের ঠিক আগে ঢাকা থেকে এক ভদ্রলোক ময়মনসিংহ আসেন। বিনু জিজ্ঞাসা করে, "আপনি কি থাকছেন না যাচ্ছেন?" তিনি স্মিত মুখে বলেন, "আমি থাকছি। মানুষের অন্তর্নিহিত গুডনেসে আমি বিশ্বাস করি।"

এই অন্তর্নিহিত গুডনেসে বিশ্বাস করতেন বিনুর বাবা। তাই তাঁর মুসলিম বন্ধুর অভাব ছিল না। তাঁদেরই একজন বিনুকে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার পূর্বে সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে কমিশনারের সকাশে নিয়ে যান। একদা তিনি ছিলেন বাবার স্কুলের সহপাঠী। মাঝখানে কেটে গেছে পঁয়ত্রিশ বছর। তিনি উচ্চপদস্থ, বাবা নিম্নপদস্থ। বন্ধুতা জাত ধর্মের বিচার করে না। প্রেমও তেমনি।

বিনুর প্রস্তুতি

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার সময় বিনুর মাতৃবিয়োগ হয়। তিনি বেঁচে থাকলে তাকে চোখের আড়াল করতেন না। সে কলেজে পড়তে গেলে তিনিও তাকে নিয়ে বাড়ি ভাড়া করে বাস করতেন। বিনুর কিন্তু অন্যরকম পরিকল্পনা। সে কলকাতা গিয়ে সংবাদপত্রে শিক্ষানবিশী করবে। তারপর সুযোগ পেলেই জাহাজের খালাসি হয়ে আমেরিকা যাত্রা করবে। তার নিজের জীবনটাকে সে নিজের মতো করে বাঁচবে। গুরুজনের ইচ্ছামতো নয়। তার বাবার ইচ্ছা সে পরের চাকরি না করে স্বাধীনভাবে চাষবাস করে। কিছু জমিও তিনি কিনেছিলেন। তবে সাংবাদিক বৃত্তিও স্বাধীন বৃত্তি। তাতে তাঁর আপত্তি ছিল না। বিনু তাঁর অনুমতি নিয়েই

কলকাতা যায়। তিনি তাঁর এক বন্ধুকে চিঠি লিখেন। বন্ধু তাঁর সম্পাদক বন্ধুদের চিঠি লেখেন। বিনু তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে।

বাংলা দৈনিকের সম্পাদক তাকে পরামর্শ দেন আগে ইংরেজি শর্টহ্যান্ড ও টাইপরাইটিং শিখতে। ওই দুটি বিদ্যা শিখতে গিয়ে বিনু দেখে ট্রেনিং ক্লাসে তার সতীর্থরা সকলেই কেরানি হবার জন্যে তালিম নিচ্ছে। সে তো কেরানি হতে চায়নি। তবে কেন সময় নষ্ট করবে? তার পর ইংরেজি দৈনিকের সম্পাদক বলেন আগে প্রুফ রিডিং শিখতে। যাঁর কাছে পাঠান তিনি বলেন, 'আপনাকে যদি শেখাই তো আপনি আমার দানাপানি মারবেন।' বিনু তাঁকে বোঝায় সে প্রুফরিডার হতে আসেনি, সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখতে এসেছে। "তা হলে আপনি কলেজে গিয়ে গ্র্যাজুয়েট হয়ে আসুন।" ভদ্রলোক পরামর্শ দেন। বিনু অপমানিত হয়ে বিদায় নেয়।

কলকাতায় থাকা নিরর্থক, টাকাও ফুরিয়ে আসছে। কিন্তু কোন্ মুখে বাড়ি ফিরে যাবে? চাষবাসে তার মন ছিল না। কায়িক পরিশ্রমকে সে চিরকাল এড়িয়ে এসেছে। সে বর্তে যায় যখন তার ছোটকাকা তাকে কলেজে ভর্তি হতে ডেকে পাঠান। তখন অসহযোগের আমল। কলেজ মানে গোলামখানা। মাথা হেঁট করে বিনু সেই গোলামখানায় নাম লেখায়। সান্ত্বনা এই যে তারই মতো আরো কয়েকজনও সেখানে জুটেছে। তারা তার সঙ্গে মিলে একটি গোষ্ঠী গঠন করে। পাঁচজনে মিলে একটি হাতে-লেখা পত্রিকায় যে যা খুশি লেখে। যে কোনও ভাষায়। বিনু লেখে বাংলা, ওড়িয়া, ইংরেজি তিন ভাষায়। অন্যেরা একটি বা দুটি ভাষায়। অচিরেই বিনু ও তার বন্ধুদের লেখা ছাপার অক্ষরে দেখা দিল বিভিন্ন ভাষার পত্রিকায়।

তারা তখন জানত না যে ওড়িয়া ভাষায় একটি নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। তারাই সে যুগের পুরোধা। যুগটির নাম সবুজ যুগ। তার স্থায়িত্ব প্রায় বারো বছর। বিনু কিন্তু ততদিন সে যুগের অন্তর্ভুক্ত থাকে না। ছ'বছর পরে সে বিলেত চলে যায় সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষায় সফল হয়ে। তার এক বছর আগেই সে স্থির করে যে কেবল একটি ভাষাতেই সমস্ত শক্তি নিয়োগ করবে। একই কালে তিনটিতেই সাহিত্যের সাধনা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। যেমন একই কালে তিনটি নারীকে নিয়ে প্রেমের সাধনা। তার পক্ষে সেই একটি হবে বাংলা ভাষা। তার এই সিদ্ধান্তে বন্ধুরা বিস্মিত হয়। কারণ ওড়িয়া ভাষায় তাঁর কবিতা 'উৎকল সাহিত্য' সম্পাদক প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করতেন। এক একটি সংখ্যায় একাধিক প্রবন্ধ তার স্বনামে বা ছদ্মনামে পত্রস্থ হত। ওদিকে কলেজ ম্যাগাজিনেও তার ইংরেজি প্রবন্ধ বেরোত প্রায় প্রতিটি সংখ্যায়। তার বাংলা রচনা তুলনায় কম। তবে 'প্রবাসী' একবার সম্পাদকীয় প্রসঙ্গের পর সম্মানের আসন দিয়েছিল তার একটি সুদীর্ঘ কবিতাকে। 'ভারতী'ও তার প্রবন্ধ মাঝে মাঝে প্রকাশ করত। একবার তো 'বঙ্গনারী' (অনিন্দিতা দেবী) তার বিরুদ্ধে মসীতে অসিধারণ করেন। লেখা পড়ে তাঁর ধারণা হয়েছিল বিনু পূর্ণবয়স্ক পুরুষ। তিনি জানতেন না যে আঠারো-উনিশ বছর বয়সের সেই ছেলেটি পুরীর সমুদ্রকূলে প্রতিদিন তাঁর পিছন পিছন বেড়াত, যখন পুরীতে ছুটি কাটাতে যেত। তাঁর পুত্র অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে পরবর্তীকালে বিনুর বন্ধুতা জমে ওঠে।

বিনুর বাংলা ভাষার শিক্ষানবিশী কেবল মুদ্রিত রচনায় সীমাবদ্ধ ছিল না। কলেজের শেষ তিন বছর সে রাশি রাশি চিঠি লিখেছিল রোজ একবার কি দু'বার। ছোট বড় প্রায়

হাজারখানেক চিঠি একই নারীকে লেখা। সংগীতের যেমন রেওয়াজ, সাহিত্যেরও তেমন অভ্যাস। নিয়মিত ও নিরলস সেই অভ্যাস ছিল বিনুর আত্মবিশ্বাসের মূলে। সেসব চিঠি হারিয়ে গেছে। সেসব ছিল প্রেমপত্রের চেয়ে কিছু বেশি। বিনু তার অধীত বিষয়ের অংশ দিত তার পাঠিকাকে। আর তার অধীত বিষয় ছিল প্রধানত ইউরোপীয় সাহিত্য তথা ইউরোপের ইতিহাস। লাইব্রেরি উজাড় করে সে বই নিয়ে আসত ও পড়ত।

এক এক সময় বিনুর মনে হত জীবনে দুটি মাত্র আনন্দ আছে। পাটনার গঙ্গায় সন্তরণ ও ইউরোপের ইতিহাস অধ্যয়ন। পরীক্ষার পড়ার চেয়ে বেশি ছিল তার ইতিহাস চর্চা। ইউরোপের মানসলোকের প্রবেশপত্র তার ইতিহাস। ইউরোপের সাহিত্য তো তার চিরপরিচিত। শেক্সপীয়ার ও বাইবেল তার ছেলেবেলা থেকেই চেনা। প্রাইজও সে পেয়েছে স্কুল থেকে কত ইংরেজি বই। কিন্তু কলেজে গিয়ে পেয়ে যায় বিশ্বসাহিত্যের সম্ভার। ইবসেন, ব্যোর্নসেন, স্ট্রিন্ডবার্গ, টলস্টয়, টুর্গেনিভ, ডস্টয়েভস্কি, আনাতোল ফ্রাঁস, রম্যাঁ রলাঁ, বারট্রান্ড রাসেল, এইচ জি ওয়েলস, অস্কার ওয়াইল্ড, বার্নার্ড শ প্রমুখের গ্রন্থ।

এসব বই পড়তে পড়তে লেখার আর্ট সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা জাগে। আশ্চর্যের ব্যাপার, কিছুই টলস্টয়ের মনে ধরে না। আর্ট বলতে তিনি যা বোঝেন তা লোকসাহিত্য বলে গণ্য হয়ে থাকে। তাঁর নিজের 'সমর ও শান্তি' আর 'আনা কারেনিনা' তাঁর মতে আর্টের নিকষে উত্তীর্ণ নয়। কেবল তেইশটি উপকথা'ই উত্তীর্ণ। বিনু তা পুরস্কারস্বরূপ পায় ও তার থেকে একটি বাংলায় অনুবাদ করে। 'প্রবাসী'তে বেরয়।

সে একদিন শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করে, 'আর্ট কি এতই ভালো যে মানবচিত্তের প্রতিদিনের আহার্য হতে পারে না?' তিনি উত্তর দেন, "তা কী করে হবে? উচ্চতর গণিত কি অনায়াসে বোঝা যায়?" তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই নিয়ে ভাষণ দিতে যাচ্ছিলেন। বিনুকে বলেন তাঁর ভাষণ বিশদ করবেন। বিনু সে ভাষণ শোনেনি। পরে জেনেছিল তাতে তিনি তার প্রশ্নের উল্লেখ করেছিলেন।

তাঁর সঙ্গে শুধু টলস্টয়ের নয়, রম্যাঁ রলাঁরও মতপার্থক্য ছিল। আর বিনু তখন এই দুই মনীষীর প্রভাবেও পড়েছে। এঁদের দৃষ্টি বিদগ্ধ নাগরিকদের উপরে নয়, অন্তেবাসী জনগণের উপরে। বিনুর সহানুভূতিও তাদের উপরে। চিরকাল তারা ধনসম্পদ থেকে বঞ্চিত। উচ্চবর্ণের বা উচ্চশ্রেণীর দ্বারা নিষ্পেষিত। গান্ধীজীও তো তাদের জন্যেই চরকায় সুতো কেটে একাত্মতা প্রকাশ করতে বলেন। নিজে শ্রমিক না হলে শ্রমিকের অন্তর বোঝা যায় না।

কিন্তু তাদের জন্যে তাদের মতো করে লিখলেই কি সেটা আর্ট হিসাবে উত্তীর্ণ হবে? যদি আর্ট হিসাবে উত্তীর্ণ না হয়, তবে তা কি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যাবে না? বিনু নিজের মতো করে লিখতে চায়। পরের মতো করে নয়। পরের গ্রহণযোগ্য হলে সে প্রীত হয়। না হলেও সে সৃষ্টির আনন্দে বিভোর।

তা হলেও সে স্বীকার করে যে জনগণের জন্যে তারও কিছু করা উচিত। সে চরকা কাটে না, কিন্তু খাদি পরে। এমন কী বিষয় আছে যা নিয়ে জনগণের জন্যে সাহিত্য সৃষ্টি করা যায়? সমসাময়িক রাজনীতি বাদে। বিনু ভাবে।

ইতিমধ্যে সে নারীর মুক্তি ও নরনারীর সাম্য নিয়ে লিখতে শুরু করেছিল। তার এক বন্ধু জাতপাতের বিরুদ্ধে লিখতেন। একদিন সে দেখে কলেজ ম্যাগাজিনে ইংরেজিতে এক

কবিতা বেরিয়েছে। লিখেছেন তাদের ইংরেজির অধ্যাপক। কবিতার নাম 'অ্যান অ্যান্টিফেমিনিস্ট ক্রাই'। বিনুর গা জ্বলে যায়। সেও ইংরেজিতে কবিতা লিখে কবির গানের চাপানের উতোর দেয়। তার কবিতার নাম, 'আ ফেমিনিস্ট কাউন্টার-ক্রাই'। কলেজ ম্যাগাজিনের সম্পাদক সেটাও প্রকাশ করেন। অধ্যাপক আর উচ্চবাচ্য করেন না।

আর একদিন বিনুর বিরোধ বাধে সংস্কৃতের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায়ের সঙ্গে। নারী কখনো পুরুষের সমান হতে পারে না শুনে সে দাঁড়িয়ে উঠে প্রতিবাদ করে। তিনি তাকে ক্লাসের শেষে বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে একান্তে বলেন, "তুমি যাই বল না কেন, প্রকৃতি ওদের নিচু করেছে। যেমন মৈথুনের সময়।" পিতৃবয়সীর মুখে এ যুক্তি শুনে বিনু তো লজ্জায় নিরুত্তর। ধরা পড়ে যাবে, যদি বলে বিপরীত বিহারের সময় নারী উপরে, পুরুষ নীচে। সে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে পড়েছিল।

'ভারতী'তে প্রকাশিত 'বারোয়ারি উপন্যাস' বেরোলে ওই রকম একটি যৌথ উদ্যোগের পরিকল্পনা করে বিনু ও তার বন্ধুরা। বিনুকে লিখতে হয় মাঝখানের তিনটি পরিচ্ছেদ। কষ্ট হয় জোড় মেলাতে। বাইরে থেকে কয়েকজনের সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। তাদের তিনজন মহিলা। উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয়। নিন্দা প্রশংসা দুই জোটে।

সমাজ সম্বন্ধে বিনু এত কম জানত যে তার পক্ষে সামাজিক উপন্যাসে হাত দেওয়া ধৃষ্টতা। নিজেকে জেনে কবিতা লেখা যায়, কিন্তু উপন্যাস লিখতে হলে সমাজকে জানতে হয়। বিশেষত পরের জীবনকে। দশখানা উপন্যাস পড়ে একখানা উপন্যাস লিখতে সকলেই পারে, কিন্তু নিজস্ব জ্ঞান ও নিজস্ব অভিজ্ঞতা না থাকলে তেমন উপন্যাস যেন কাগজের ফুল। বিনু কাগজ দিয়ে কাগজের ফুল বানাতে চায় না, সে ফোটাতে চায় জীবনের ফুল। তার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। আর ওরকম যৌথ উদ্যোগ সাহিত্যে সাজে না। তবে দু'জনে মিলে উপন্যাস লেখার নজির আছে। তার জন্যে হতে হয় অভিন্নহৃদয়। সেটা দুরাশা।

আর্ট জিজ্ঞাসার মতো জীবনজিজ্ঞাসাও বিনুর চিন্তা জুড়ে ছিল। এ জীবন নিয়ে সে কী করবে? এ জীবন যিনি দিয়েছেন তিনি তাঁকে কী করতে বলেন? কী হতে? এ দেশের রঙ্গ মঞ্চে, এ যুগের নাটকে তার কী ভূমিকা? একজন শিল্পী না একজন কর্মী না একজন ভাবুক না একজন প্রেমিক? না চারটি ভূমিকায় একই অভিনেতা যখন যেমন তখন তেমন?

তাকে সঙ্কটে ফেলেছিল তার আদর্শের সঙ্গে তার ভাবী জীবিকার অসঙ্গতি। টলস্টয় ও গান্ধীর মতো সেও মনে করত রাষ্ট্র হচ্ছে একটা শাসনযন্ত্র। শাসন বলতে বোঝায় মানুষের উপর মানুষের আধিপত্য। এর জন্য চাই সৈন্যদল, পুলিশ, আদালত, কারাগার। ইদানীং যোগ দিয়েছে আইনসভা। আইন দিয়ে মানুষ মানুষকে চালনা করেন। আদর্শ সমাজে এসব বালাই থাকবে না। মানুষ শাসনমুক্ত হবে। সেই সঙ্গে শোষণমুক্ত। শাসকরা শোষকদেরই অন্তরঙ্গ।

পার্লামেন্ট সম্বন্ধে বিনুর নেতিবাচক মনোভাব ছিল না। তাছাড়া বাকি সব বিষয়ে সে নেতিবাদী। বলা যেতে পারে নৈরাজ্যবাদী। অবশ্য অহিংস নৈরাজ্যবাদী। এমন মানুষের পক্ষে রাষ্ট্রে শাসনচক্রের একজন চক্রধর হতে চাওয়া কি পরধর্ম নয়? পরধর্ম ভয়াবহ। গ্রাজুয়েট হয়ে সাংবাদিক হলেই সে ভালো করত।

কিন্তু 'চার ইয়ারী কথা'র ইংলন্ড তাকে টানছে। ফরাসী বিপ্লবের ফ্রান্স তাকে টানছে। আধুনিক জগতের মুখ্য স্রোত এই দুই দেশেই। বিংশ শতকের সন্তান সে, তাকে অবগাহন করতে হবে তার স্বযুগের মুখ্য স্রোতে। তা বলে স্বদেশকে সে ভুলবে না। ভারতে ফিরে আসবে দু'বছর বাদে। চাকরি ছাড়বে আরো পাঁচ বছর বাদে। সম্পাদক হতেই তার সাধ। তবে সাধনা তার সাহিত্যিক হওয়ার। তাকে অন্তত পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের মধ্যেই সাধনা সাঙ্গ করতে হবে। যে বয়সে মা গত হন।

পূর্বদিক আর পশ্চিমদিক বলে দুটো দিক আছে, বিনু তা জানে ও মানে। ভৌগোলিক অর্থে পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন কোনো কালেই হবে না। কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কি সেকথা খাটে? অবশ্য সংগীতের ক্ষেত্রে, নৃত্যের ক্ষেত্রে অন্য কথা। কিপলিং যে বলেছেন, প্রাচী হচ্ছে প্রাচী আর প্রতীচী হচ্ছে প্রতীচী আর তাদের মিলন কোনকালে হবে না— এতে বিনুর আন্তরিক আপত্তি। 'সবুজপত্র' থেকে সে যেসব আইডিয়া পেয়েছিল তার একটি হল প্রাচী প্রতীচ্য সমন্বয়। এর জন্যে তাকে প্রতীচ্য সম্বন্ধে সমান অভিজ্ঞ হতে হবে। তার জন্যে প্রতীচ্য দেশে বাস করতে হবে। সেখানকার জীবনের সঙ্গে জীবন যোগ করতে হবে। শুধু বই পড়া ও লেকচার শোনাই যথেষ্ট নয়, বিনুকে সশরীরে ইউরোপ যেতে হবে, ভারতের সঙ্গে কোথায় মিল আর কোথায় অমিল তা নিজের চোখে দেখতে হবে ও নিজের মন দিয়ে বিচার করতে হবে।

প্রাচীর মানুষ প্রাচীন আর প্রতীচীর মানুষ আধুনিক। এটা কিন্তু এক হিসাবে ঠিক। প্রাচীনত্বের জন্যে ভারতীয়রা গর্বিত। আধুনিকতার জন্যে ইউরোপীয়রা। কিন্তু প্রাচীও আধুনিক হতে পারে, আধুনিকতার জন্যে গর্বিত হতে পারে। তার দৃষ্টান্ত জাপান। ভারতই বা সেই অর্থে আধুনিক হতে পারবে না কেন? কিন্তু সত্যিকার আধুনিকতা কেবলমাত্র ফলিত বিজ্ঞানের যান্ত্রিক কুশলতায় নয়, মননশীলতায় ও সামাজিক পুনর্বিন্যাসে। জাপান কি সেই অর্থে অধুনাতন না পুরাতন?

ভারতীয়রাও বাইরে অধুনাতন ও ভিতরে পুরাতন হতে পারে। তার লক্ষণ বিনু স্বদেশের নাগরিক জীবনে লক্ষ করছে। গ্রামগুলি কি শহরগুলোর মতো হবে? গান্ধীজী সেটা চান না। কিন্তু তারা যদি কোন অর্থেই আধুনিক না হয় তবে তো মধ্যযুগেই থেকে যাবে। শহর আর গ্রামের মধ্যে কি দুই তিন শতাব্দীর ব্যবধান থাকবে? তবে কি শহরগুলোও মধ্যযুগে ফিরে যাবে? "গ্রামে ফিরে যাও" মানে কি মধ্যযুগে ফিরে যাওয়া? বিনু গ্রামে যেতে রাজি আছে প্রকৃতির আরো কাছাকাছি থাকতে, জনগণের সঙ্গে একাত্ম হতে। রুশোর শিক্ষাও তার মনের উপর কাজ করছিল। সভ্য মানুষ প্রকৃতির কাছ থেকে সরে আসতে আসতে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে উঠছে। টলস্টয়, থোরো, গান্ধী এর জন্যে সভ্যতাকেই দোষ দিচ্ছেন। বিনু এর একটা মীমাংসা চায়। এর জন্যেও তার ইউরোপে যাওয়া দরকার।

প্রতীচীর যৌবনের উপর তার অপরিসীম বিশ্বাস। কচ গিয়েছিলেন অসুরগুরুর কাছে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র শিখতে। বিনুর মনে হয় সেও যাচ্ছে আধুনিক প্রতীচীর কাছে অনুরূপ জরা সংযুবনী মন্ত্র শিখতে। যা শিখে আসবে তা শেখাবে। ভারতও হবে নবযৌবনের দেশ। অপরপক্ষে ভারতও প্রতীচীকে শেখাবে গান্ধীজীর কাছে সত্য ও অহিংসার সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ।

বিনু ও তার বন্ধুরা মিলে যে বারোয়ারি উপন্যাসে হাত লাগায় গোষ্ঠীর বাইরে থেকে

তিনজন লেখিকাও তাতে হাত মেলান। তাঁদের একজন বিবাহে অসুখী মুক্তিপ্রাণা। বিনুর ভিতরে একজন মধ্যযুগীয় নাইট ছিল। লেডি ইন ডিসট্রেস দেখে তার শিভালরি জাগ্রত হয়। সে তাঁকে মুক্ত করবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। সেই সূত্রে সঞ্চারিত হয় প্রেম। প্রণয় থেকে পরিণয়ের অভিলাষ অঙ্কুরিত হয়। ইতিমধ্যেই সাংবাদিকতায় বিনুর অনীহা জন্মেছিল। সে হতে চায় কবি, মনীষী, অন্তর্দর্শী। জীবিকা হিসাবে সে বেছে নেয় ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস। প্রতিযোগিতায় সফল হলে আকৈশোর প্রতীক্ষিত সমুদ্রযাত্রা। যাবে আমেরিকার পরিবর্তে ইউরোপে। বিলেতে দু'বছর শিক্ষানবিশী। তাঁকেও সে সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়। যেটা সম্ভব নয় সেটা বিদেশে সম্ভব। অর্থাৎ বিবাহবিচ্ছেদপূর্বক পুনর্বিবাহ। কিন্তু তিনি ইতিমধ্যে মা হয়েছিলেন। স্বামীর সঙ্গেও সন্ধি হয়েছিল। তিনি মুক্তির প্রশ্ন শিকেয় তুলে রাখেন। বিনু তার প্রতিশ্রুতি থেকে মুক্তি পায়। জীবিকার প্রতিযোগিতায় প্রাণপাত পরিশ্রম করে প্রথম হলেও প্রেমের পরীক্ষায় সে বিফল হয়। এইটুকু তার সান্ত্বনা যে সে ইউরোপ দর্শনে যেতে পারছে। সেখানেই তার "tryst with Destiny".

প্রেমের উপলব্ধি না হলে প্রেমের কবিতা লেখা যায় না। কিংবা প্রেমের গল্প উপন্যাস। বিশ্বসাহিত্যে প্রেমের কবিতা, প্রেমের কাহিনী আদিকাল থেকেই সর্বমানবের মহামূল্য উত্তরাধিকার। বিনুরও অভিলাষ ভাবীকালের জন্য সেরূপ উত্তরাধিকার রেখে যাওয়া।

তার সে অভিলাষ কতক পরিমাণে পূর্ণ হয় যখন প্রেম এসে আর্টের সঙ্গে যোগ দেয়। তার জীবনে প্রেম আর আর্ট একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। প্রেম যদি মিলনান্ত নাও হয়, তা হলেও সে আর্টের প্রাণস্বরূপ। বিশ্বসাহিত্যে বিয়োগান্ত প্রেমই তো সংখ্যায় বেশি। কমেডির চেয়ে ট্রাজেডিরই আধিক্য। বিদগ্ধ পাঠকের কাছে ট্রাজেডিই প্রিয়তর।

বিনুর মনে হয় তার সমবয়সী বন্ধুদের চেয়ে তার বয়স তিন বছর বেড়ে গেছে। বাড়িয়ে দিয়েছে তার প্রেমের অভিজ্ঞতা। তার দেহের তুলনায় হৃদয় হয়েছে আরো পরিণত। তাকে পরিণত করেছে প্রেমের তিক্ত মধুর রস। আনন্দের সঙ্গে বেদনার মিশ্রণ। প্রেম তাকে হাসিয়েছে, কাঁদিয়েছে, নাচিয়েছে, জ্বালিয়েছে, খাটিয়েছে, মাতিয়েছে, খেলিয়েছে, ভাবিয়েছে, লড়িয়েছে। সব কিছু তোলা রয়েছে পরে এক সময় সাহিত্যে রূপায়িত হবার জন্যে। শিল্পীর জীবনে কোন অভিজ্ঞতাই বৃথা নয়। প্রেমের অভিজ্ঞতা তো নয়ই। কারো কারো জীবনে তারই মূল্য সব চেয়ে বেশি। সেদিক থেকে বিচার করলে বিনু একজন ভাগ্যবান শিল্পী।

শেলি, কীট্স প্রমুখ রোম্যান্টিক কবিদের সঙ্গেই ছিল তার অ্যাফিনিটি। একই সঙ্গে ছিল বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রমুখ বৈষ্ণব কবিদের সঙ্গেও। কবি হতেই সে চেয়েছিল, ঔপন্যাসিক হতে নয়। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাকে ঔপন্যাসিক হতে হয়।

বিনুর নিয়তি

বারো বছর বয়সে 'সবুজপত্র' পড়ার পর থেকে বিনুর মনে গেঁথে যায় চার-পাঁচটি আইডিয়া। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলির বিকাশ হয়। একটি আইডিয়া হল প্রাচ্য প্রতীচ্য সমন্বয়। প্রতীচ্যে না গেলে, নিজের চোখে না দেখলে, লোকের সঙ্গে না মিশলে কেমন করে তার সঙ্গে সমন্বয় ঘটানো যায়? ইটারনাল ফেমিনিন আর একটি আইডিয়া। তার অর্থ বুঝুক

আর না বুঝুক সে তার সন্ধানে বেরোতে চায় রূপকথার রাজপুত্রের মতো সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে। আর একটি আইডিয়া হল আর্ট। কথাটার মানে কী তা জানার জন্যে সে আরো কয়েক বছর অপেক্ষা করে টলস্টয়ের 'আর্ট কী' পড়ার পর রবীন্দ্রনাথের সন্নিধানে যায়। আরো এক আইডিয়া অফুরন্ত যৌবন। কায়িক অর্থে নয়, মানসিক অর্থে। এর অর্থ অনুধাবন করতেও আরো কয়েক বছর লাগে। যে আইডিয়াটা সবচেয়ে আগে কাজে পরিণত করা সম্ভব হল সেটা চলতি বাংলায় টলস্টয়ের একটি উপকথা অনুবাদ পূর্বক প্রকাশ করায়।

সে সতেরো বছর বয়সে বাড়ি থেকে রওয়ানা হয়েছিল আমেরিকার অভিমুখে সমুদ্রপথে। পাগলামি! কলকাতা থেকে ফিরে এসে কলেজে ভর্তি হয়। কথা ছিল গ্রাজুয়েট হয়েই কলকাতা ফিরে গিয়ে সাংবাদিকতায় ব্রতী হবে ও পরে এক সময় আমেরিকায় যাবে। কিন্তু গ্রাজুয়েট হয়ে সে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস প্রতিযোগিতায় সফল হল। এখন তাকে যেতে হবে শিক্ষানবিশীর জন্যে বিলেতে, সেখানে থাকতে হবে দু'বছর। এও তো সেই সমুদ্রযাত্রা। যদিও আমেরিকা অভিমুখে নয়, ইউরোপ অভিমুখে। হ্যাঁ, এটাও তার মনের আড়ালে কাজ করছিল। বারো বছর বয়সে 'চার ইয়ারী কথা' পড়ার পর থেকে। ইউরোপে না গেলে সে কোথায় দেখা পাবে Venus de Milo-র। আমেরিকার লিবার্টি মূর্তি তার সমতুল্য নয়। কলেজে গিয়ে বিনু ইউরোপীয় সাহিত্য ও ইতিহাসে বুঁদ হয়ে পড়ে। সেই সূত্রে ইউরোপ তাকে চুম্বকের মতো টানে। ইউরোপে যাবার সুযোগটা এনে দেয় প্রতিযোগিতা। সফল না হলে সে সাংবাদিক ব্রতেই ফিরে যেত। তার কাছে সাংবাদিকতা একটা বৃত্তি নয়, একটা ব্রত। "ইটারনাল ভিজিলান্স ইজ দ্য প্রাইস অভ্ লিবার্টি।" স্বাধীনতার মূল্য অতন্দ্র প্রহরা। সৈনিকদের মতো সংবাদপত্রকাররাও দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করে বলে বিনু সেই ব্রত বেছে নিয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে সে উপলব্ধি করেছিল যে তার লেখনী সাংবাদিকের নয়, সাহিত্যিকের লেখনী। সে রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর পন্থী। তাই সাংবাদিকতার মায়া কাটাতে কষ্ট হয় না। একটি বিশিষ্ট মাসিকপত্রে ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনী লেখার জন্যে সে প্রতিশ্রুতি দেয়। জাহাজে ওঠার আগেই লিখতে শুরু করে। বিলেত থেকে প্রতি মাসেই এক-একটি কিস্তি পাঠায়।

দেশ থেকে বিদায়ের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল প্রিয় নারীর সঙ্গে বিচ্ছেদের বিষাদ। আর সেই বিষাদের সঙ্গে মিশেছিল মুক্তির স্বাদ। সে ফিরে পেয়েছে তাঁর প্রেমে পড়ার স্বাধীনতা। হয়তো আবার প্রেমে পড়বে। কে জানে কোনো এক দেবযানীর সঙ্গে সেকালের সেই কচের মতো। বিনু তার হৃদয়ের দুয়ার খোলা রেখেছিল। তার মনের দুয়ার তো খোলা ছিলই। নতুন দেশের জন্যে, নতুন মানুষের জন্যে, নতুন অভিজ্ঞতার জন্যে। তবে ইউরোপ তার কাছে পুরোপুরি নতুন নয়। অসংখ্য বই পড়ে, পত্রিকা পড়ে সে ইউরোপের মানসের সঙ্গে ও মানুষের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল। যতসব উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা তার চেনা। দেশে থাকতেই সে ইংরেজ অধ্যাপকদের সংস্পর্শে এসেছিল। ইংরেজ লাটসাহেবের হাত থেকে সোনার মেডাল পেয়েছিল।

বিনুকে যিনি পৃথিবীতে আসতে সাহায্য করেছিলেন তিনি একজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান লেডি ডাক্তার। বিলেত যাবার আগে সে যায় তাঁর আশীর্বাদ নিতে। তিনি বলেন, "তুই ওদেশের মেয়েদের পাল্লায় পড়বি না তো? জানিস ওদেশের মেয়েরা কেন এত ফরসা হয়? ফল। খুব ফল খায় ওরা। আপেল। আপেল খেয়েই ওরা হয় এত ফরসা। তুইও যত পারিস্

আপেল খাস্।" বিনু হাসিমুখে বিদায় নেয়। তার মনে পড়ে অ্যাডামকে এই পরামর্শ দিয়েছিলেন ইভ।

তার জন্মকাল থেকেই বিধাতার নির্বন্ধ সে একদিন পশ্চিম যাত্রা করবে। সেটা সতেরো বছর বয়সে সম্ভব না হয়ে তেইশ বছর বয়সে হল। জাহাজের ডেকে পা রেখে বিনু ভুলতে আরম্ভ করল ভারতকে, ভাবতে আরম্ভ করল ইউরোপকে। যতদিন ইউরোপে থাকবে ততদিন পুরোপুরি ইউরোপের ভাবনাই ভাববে। দুনিয়াকে দেখবে ইউরোপীয় দৃষ্টিকোণ থেকে। অথচ লিখবে বাঙলা ভাষায়। বাঙালি পাঠক-পাঠিকাদের জন্যে। এমনি করে দু'বছর কাটাবে।

তার জীবনে কত দু'বছর এসেছে গেছে। কিন্তু সেই দু'বছরের মতো আর কোন দু'বছর নয়। দেশে ফিরে আসার পরও সেই দু'বছর তাকে আবিষ্ট করে রাখে আরো বারো বছর। সেই দু'বছরের পটভূমিকায় পাঁচ খণ্ডে উপন্যাস লিখতে বসে ছয় খণ্ডের উপন্যাস লেখে। একে নিয়তি না বলে আর কী বলা যেতে পারে?

সাত সাগর পারে নয়, তিন সাগর—আরব সাগর, লোহিত সাগর, ভূমধ্য সাগর—পারে বিনুর জাহাজ ছোঁয় ফ্রান্সের বন্দর মার্সেলস। সেই জাহাজেই বিনু লন্ডন অবধি যেতে পারত, কিন্তু তার সতীর্থদের সঙ্গে সেও নেমে পড়ে। এই সেই মার্সেলস যেখানে রচিত হয়েছিল বিপ্লবগীতি 'লা মার্সেইলেস'। বিপ্লবের প্রাক্কালে। বিপ্লবের প্রেরণা দিতে। এখনো ফরাসিদের জাতীয় সংগীত। বিনু ফ্রান্সের মাটিতে পা রেখে শিহরণ বোধ করে।

প্যারিসে ট্রেন বদল। ফরাসি বিপ্লবের স্মৃতি। রোমাঞ্চ। ক্যালে থেকে জল পথে ডোভার। ইংলন্ডের মাটি। বিনুর কতকালের স্বপ্ন সার্থক। এর পরে রেলপথে লন্ডন। বিনু আনন্দে অধীর। ইতিমধ্যেই সে স্থির করেছিল অক্সফোর্ডের একটি প্রসিদ্ধ কলেজে সিট পেলেও লন্ডনেই থাকবে। সে তো ডিগ্রি চায় না। শিক্ষানবিশী লন্ডনেও করা চলে। লন্ডন শুধু সাম্রাজ্যের রাজধানী নয়, বিশ্বনাগরিকধানী। সে সব কিছু দেখতে, সব কিছু শুনতে, সব কিছু জানতে চায়। থিয়েটার, অপেরা, ব্যালে, কনসার্ট, মিউজিয়াম, আর্ট গ্যালারি, স্টুডিও, সভাসমিতি, হাইড পার্ক, পার্লামেন্ট, সেন্ট পল্‌স। জীবনে এমন সুযোগ আর মিলবে না। দু'বছর লন্ডনবাস। কিন্তু তার হিতৈষীদের চক্ষে সে একটা বোকা ছেলে। ভারতের হাই কমিশনার সার অতুল চ্যাটার্জি একদিন তাকে বকুনি দেন। "অক্সফোর্ড ছেড়ে লন্ডন? এক্ষুণি যাও।"

বিনু ব্রিটিশ মিউজিয়ামের পাঠাগারে পড়ার জন্যে কার্ড জোগাড় করে। সময় পেলেই সেখানে গিয়ে বিচিত্র বা নিষিদ্ধ পুস্তক পড়ে। একটি গুপ্ত কক্ষে প্রহরীসমেত যাতায়াত করতে হয়। শিক্ষানবিশীর অঙ্গ নয় এটা। শিক্ষানবিশ হিসাবে তাকে যেতে হত চারটি কলেজ ও কলেজসদৃশ স্কুলে। ইউনিভার্সিটি কলেজ, কিংস কলেজ, লন্ডন স্কুল অভ ইকনমিক্স, লন্ডন স্কুল ফর ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ। তা ছাড়া, তাকে উচ্চ ও নিম্ন আদালতে গিয়ে মামলার বিচার শুনতে ও টুকে রাখতে হয়। মাঝে মাঝে উলউইচে গিয়ে ঘোড়ায় চড়তে হয়। কিন্তু এহো বাহ্য। তার আসল কাজ হল তার সহকর্মী ইংরেজ সিভিলিয়ানদের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নেওয়া। সার্ভিসটার ব্রিটিশ চরিত্র যেন বজায় থাকে। ওটা নামেই ইন্ডিয়ান।

কিন্তু বিনুর কাছে জীবিকার চেয়ে জীবন বড়ো। তাই সে যত কম সময় সম্ভব তত

কম সময় শিক্ষানবিশীকে দিয়ে বাকিটা দেয় জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে। ডিকেন্স প্রতিদিন লন্ডনের পথেঘাটে ঘুরে বেড়াতেন। বিনু প্রত্যহ না হলেও প্রায়ই পথে-পথে ঘোরে। তবে বাসায় ফিরতে রাত করে না। সে চেয়েছিল কোনো এক ইংরেজ পরিবারে পেয়িং গেস্ট হতে। কিন্তু তার এক বন্ধুর অনুরোধে তার দিদির ও জামাইবাবুর সঙ্গে মিলে ফ্ল্যাট ভাড়া করতে হয়। ফলে সে বাঙালিই থেকে যায়, ইংরেজ বনে না। এতে সাহিত্যের সুরাহা হয়। ওঁদের অগণ্য বাঙালি বন্ধু-বান্ধবী বাঙালি সমাজে। বিনু তাঁদের সঙ্গ পায়। তার উপন্যাসের বহু চরিত্রের মডেল আপনি জোটে। না, উপন্যাস সে লন্ডনে বসে লিখবে না। দেশে ফিরে এসে লিখবে। ইংলন্ডে লেখা হয় ভ্রমণকাহিনী ছাড়া কবিতা ও প্রবন্ধ, গল্প ও নাটিকা। পরে সে ইংরেজ পরিবারেও পেয়ং গেস্ট হয়েছিল। কিন্তু সেখানে সে তেমন বন্ধু সমাগম দেখেনি।

কলেজের অবকাশে বিনু বেরিয়ে পড়ত লন্ডনের বাইরে সাগরতীরে বা ভিন্ দেশে। প্রথম অবকাশেই সে চলে যায় সুইটজারল্যান্ডে রম্যাঁ রলাঁর সন্নিধানে। তার এক অগ্রজপ্রতিম সাহিত্যিক বন্ধু সে সময় সুইটজারল্যান্ডপ্রবাসী ছিলেন। তিনিই হন দোভাষী। বিনুর সেই একই জিজ্ঞাসা, যা নিয়ে সে রবীন্দ্রসন্দর্শনে গিয়েছিল কলেজজীবনে। "আর্ট কি এতই ভালো যে মানবপ্রকৃতির প্রতিদিনের আহার্য হতে পারে না?"

"কেন হতে পারবে না?" রলাঁ উত্তেজিত হয়ে উত্তর দেন, "রেনেসাঁসের যুগে ইটালির কারিগররা সাধারণ মানুষের নিত্যব্যবহার্য সামগ্রী সুন্দর করে বানাত। সকলে তা উপভোগ করত।"

রবীন্দ্রনাথের উত্তর ছিল এর বিপরীত। রলাঁ 'পিপলস থিয়েটার' বলে একখানি বই লিখেছিলেন। বিনু জানত জনগণের প্রতিই তাঁর টান। কিন্তু উচ্চতর গণিত কী করে তারা বুঝবে, যদি তার উপযোগী প্রস্তুতি না থাকে? বিনু রলাঁর সঙ্গে তর্ক করে না। তিনি তাঁর স্বমতে অটল। আর বিনুও জনগণের কাছে পৌঁছতে উৎসুক।

বিনুর অপর এক প্রশ্নের উত্তরে রলাঁ বলেন, "হ্যাঁ, সাহিত্যিক সমসাময়িক প্রশ্ন নিয়ে লিখবেন বইকি। শেক্সপীয়ারও লিখেছেন।"

বিনু শেক্সপীয়ার যেটুকু পড়েছিল সেটুকুতে তা লক্ষ্য করেনি। হয়তো নাট্যকার তির্যকভাবে তাঁর মত প্রকাশ করেছিলেন।

আরো কয়েকটি বিষয়ে কথাবার্তা হয়। বিদায় দেবার সময় রলাঁ বলেন, "আপনি টাকার জন্যে আর কিছু করবেন, নিজের খুশির জন্যে লিখবেন।"

আর্ট নিয়ে বিনুর ভাবনা চিন্তা সেইখানেই শেষ হয়ে গেল না। কাদের জন্যে লিখবে তার চেয়ে বড়ো কথা কী লিখবে। বিষয়বস্তুটা কী? যেখানে বলবার বিষয় নেই সেখানে বাগ্‌বিস্তার কি সাহিত্য? তার পরে আরো এক জিজ্ঞাসা। কেমন করে লিখবে? যেমন তেমন করে লিখতে অনেকেই পারে। তারা সবাই কি সাহিত্যশিল্পী? না, জনগণের জন্যে লিখলেও শিল্পী হওয়া যায় না, যদি কেমন করে লিখতে হয় তা না জানে। বিনু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়। লেখাও একপ্রকার রান্না। রান্নাও একপ্রকার কলা। থিওরি জানাই যথেষ্ট নয়। প্র্যাকটিস চাই। আর্ট হওয়া না হওয়া নির্ভর করে প্র্যাকটিসের উপর।

ফেরার পথে প্যারিসে বিনু লুভর মিউজিয়াম দেখতে যায়। সেখানে দর্শন পায় Venus de Milo-র। এই সেই ইটারনাল ফেমিনিন। গ্রীক ভাস্কর্যের অপরূপ নিদর্শন। এমনি

কিছু নিদর্শন দেখেই রেনেসাঁসের ভাস্কররা উদ্দীপিত হন। তাঁরা সাধারণ কারিগর ছিলেন না। তাঁদের সৃষ্টিও নিত্য-ব্যবহার্য সামগ্রী নয়। রলাঁ কী বলবেন একে? অপর একটি কক্ষে মোনালিসা। লেওনার্দো দা ভিঞ্চির রহস্যময়ী নারীর প্রতিকৃতি। বিনু রহস্যভেদ করতে পারে না। জনগণ কী করে পারবে!

অগস্ত্য ঋষি এক গণ্ডুষে সমুদ্র পান করেছিলেন। বিনুরও অভিলাষ দু'বছরে ইউরোপ গ্রাস। পরে একটি অবকাশে সে বেরিয়ে পড়ে তার সেই অগ্রজপ্রতিম বন্ধুর সঙ্গে জার্মানি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি ইত্যাদি বেড়াতে। থিয়েটার, অপেরা, জাদুঘর, ক্যাথিড্রাল কত কী দেখা হয়। মানুষও চেনা হয় পথে, হোটেলে, হসপিসে, পাঁসিঅতে। খাদ্য অখাদ্য কত কী খাওয়া হয়। মিউনিকের বীয়ার-হলে বীয়ার পান। হিটলারের প্রিয় স্থান। তখন কিন্তু নাৎসি নায়কের নাম কেউ বলেননি।

বিনু যে দু'বছর ইউরোপে ছিল সে সময়টা ছিল দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সন্ধিকাল, ১৯২৭ থেকে ১৯২৯। চার বছর ধরে মানুষ একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে বাস করেছিল। তার কুপ্রভাব থেকে জেগে উঠছে। ভাবতেই চায় না যে আবার এক দুঃস্বপ্ন অবশ্যম্ভাবী। দশ বছর পরে নেমে আসবার অপেক্ষায় আছে। মুসোলিনি ইতিমধ্যেই ফাসিস্ট ডিক্টেটরশিপ জারি করে দেখিয়ে দিয়েছেন গণতন্ত্র কত ঠুনকো। ওদিকে রাশিয়াতে বিপ্লবী জমানা। জার্মানির কমিউনিস্টরা চান তার সম্প্রসারণ। সোশ্যাল-ডেমোক্রাট সরকার আন্তর্জাতিক ঋণ শোধ করতে গিয়ে মুদ্রাস্ফীতিতে হিমশিম খাচ্ছেন। লোকের ধারণা ওই পরিস্থিতির সুযোগ নিচ্ছে ইহুদী ব্যবসায়ীরা। সন্দেহ তামাম ইহুদী জাতিটাকে। তারাও জাতি হিসাবে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর। আর্য জাতীয়তায় বিশ্বাসী জার্মানদের সঙ্গে বেজোড়। তেল আর জল।

লন্ডনে কয়েকজন শান্তিবাদীর সঙ্গে বিনুর পরিচয় হয়। এঁদের প্রতিষ্ঠানের নাম ফ্রেন্ডস অভ দ্যা লীগ অব নেশন্‌স। এঁদের বিশ্বাস লীগ যদি শক্তিশালী হয় তবে যুদ্ধ বাধবে না, বাধলে থামাতে পারা যাবে। কিন্তু লীগের সদস্য-নেশনদের মধ্যে না আছে আমেরিকা, না রাশিয়া বা সোভিয়েত ইউনিয়ন, না জার্মানি। অথচ ভারত রয়েছে। ভারতের প্রতিনিধি জাস্টিস স্যার বসন্তকুমার মল্লিক ছিলেন জাহাজে বিনুর সহযাত্রী। তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় সিভিল সার্ভিসের সুবাদে। সার্ভিসের ভিতরে থেকে দেশের কাজ করা সম্বন্ধে।

লীগের বন্ধুজনদের মধ্যে ছিলেন একজন ইংরেজ মহিলা। অসমবয়সিনী কুমারী। চিত্রকর। ভারত হিতৈষিণী। তাঁর সঙ্গে বিনুর সম্পর্ক একটু-একটু করে পরিণত হয় বন্ধুতায়। তাঁর সৌজন্যে ব্রিটেনের উচ্চবংশীয় সমাজসেবীদের সঙ্গে বিনুর মেলামেশা সম্ভব হয়। তাঁদের অনেকেই মানবদরদী। অনেকেই ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে। তবে তাঁদের একজনের প্রশ্ন হল ভারত স্বাধীন হলে দেশীয় রাজাদের ভাগ্যে কী আছে। দেশীয় রাজ্যে বিনুর জন্ম। রাজবংশের সঙ্গে সদ্‌ভাব। তবু সে একটা কঠোর উক্তি করে। রাজাদের জোর করে ফেডারেশনভুক্ত করতে হবে। তিনি মিষ্টি করে বলেন, "না, না, ওঁদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করাতে হবে।"

বান্ধবীর বান্ধবী মুরিয়েল লেস্টার তাঁর যুদ্ধে নিহত ভ্রাতা কিংসলির নামে লন্ডনের ইস্ট এন্ডে একটি 'সেটলমেন্ট' স্থাপন করে তার নাম রেখেছেন 'কিংসলি হল'। গরিব এলাকায় শ্রমিকশ্রেণীর জীবনের শরিক হবার জন্যে উচ্চশ্রেণীর পুরুষ বা মহিলারা এ রকম

আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে সেখানে বসবাস করেন। তাঁদের জীবনযাত্রা একান্ত সাদাসিধে। সংসারের বন্ধন নেই। একদা শ্রমিকদলের নেতা অ্যাটলি থাকতেন এইরকম একটি সেটলমেন্টে। মুরিয়েল কিন্তু পলিটিকসের ধার ধারেন না। অথচ ধর্মেরও বাধ্যতা নেই। একনিষ্ঠ মানবহিতৈষী সেবাকর্মী। বিনুর বান্ধবী একদিন তাকে মুরিয়েলের আশ্রমে নিয়ে যান। সেটা এক হিসাবে শ্রমিকশ্রেণীর ছেলেমেয়েদের ক্লাব। অবসর পেলেই তারা সেখানে এসে খেলাধূলা করে। গানবাজনাও হয়। নির্দোষ আমোদপ্রমোদে মুরিয়েল তাদের সাথী। বাসযোগ্য কয়েকটি সেল ছিল। বিনু তার একটিতে শুয়ে রাত কাটায়। দু'বছর বাদে মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর দলবল সেইখানেই মুরিয়েলের অতিথি হন। রাউন্ড টেবল কনফারেন্সের সময় ব্রিটিশ সরকারের অতিথি হননি। পার্টিশনের পূর্বে মুরিয়েল এসেছিলেন ভারতে। বলেছিলেন, "এই ভ্রাতৃহত্যা বন্ধ করো। হিন্দু মুসলমান ভাই-ভাই।"

অ্যাটলি ছিলেন ফেবিয়ান সোস্যালিস্ট। তাঁরই মতো সোস্যালিস্ট সিডনি ওয়েব শ্রমিকদের প্রগতির কথা চিন্তা করে লন্ডন স্কুল অভ্ ইকনমিক্স প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে সেটি মধ্যবিত্তদেরও সুশিক্ষার অন্যতম পীঠস্থান হয়। বিনু সেখানে লেকচার শুনতে যায়। তখনো অন্যান্য কলেজে তরুণ-তরুণীদের সহশিক্ষা প্রবর্তিত হয়নি। এখানে হয়েছে। বিনুর সঙ্গে যাঁরা ক্লাস করেন তাঁরা তার সমবয়সিনী। কলেজ থেকে বেরিয়ে চাকরির সন্ধান করবেন। আগে চাকরি, তারপরে বিবাহ। যদি বর জোটে। বিনু 'নিউ উওম্যান' দেখতে চেয়েছিল। নিউ উওম্যানকে দেখল। যে নারী পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পড়াশুনা করে। তাকে হারিয়েও দিতে পারে। লন্ডন স্কুল অভ্ ইকনমিক্সে একজন অধ্যাপিকা ছিলেন। তিনিও বিনুকে পড়াতেন। নারীস্বাধীনতা ও নারীপুরুষের সাম্য দুটোই ছিল ফেমিনিস্টদের অন্বিষ্ট। দুটোরই দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করে বিনু অতিশয় প্রীত।

একটি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে পেয়িং গেস্ট হয়ে সে মায়ের আদরযত্ন পায়। মা সব দেশেই মা। ইতিমধ্যে এক তটবর্তী শহরে বেড়াতে গিয়ে সে তার বোর্ডিং হাউসের কর্ত্রীর সঙ্গে মাতৃ সম্পর্ক পাতিয়ে এসেছে। তিনি হয়েছেন তার দ্বিতীয় মাতা। অথচ তিনি বিয়েই করেননি। এখন যাঁর বাড়িতে পেয়িং গেস্ট তার ভাগ্নী একদিন বেড়াতে আসে। দু'জনের দু'জনকে এত ভালো লেগে যায় যে সেইদিনই ওরা ভাইবোন পাতিয়ে বসে। পরে আর দেখা হয় না। কিন্তু চিঠিপত্রে ভাইবোন মত বিনিময় করতে থাকে। বিদুষী কন্যা। শিক্ষিকা হয়। পরে বিয়েও করে। কিন্তু চাকরি ছাড়ে না।

দেশ এক নয়, ভাষা এক নয়, ধর্ম এক নয়, বর্ণ এক নয়, তা সত্ত্বেও মানুষে মানুষে এত বেশি মিল যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বলে দুটো আলাদা সত্তা শনাক্ত করা যায় না। একথাও বলতে পারা যায় না যে প্রাচ্য চিরদিন প্রাচ্য আর প্রতীচ্য চিরদিন প্রতীচ্য, মিলন তাদের কোনোদিন হবে না। কিপলিং-এর উক্তি যেমন অসার তেমনি অসার ভারতীয় মনীষীদের ধারণা যে প্রাচী হচ্ছে অধ্যাত্মবাদী আর প্রতীচী জড়বাদী। কোলোনের ক্যাথিড্রাল আর প্যারিসের নোতরদাম পরিদর্শন করে বিনু উপলব্ধি করে ইউরোপের মানুষও এশিয়ার মানুষের মতোই ধর্মপ্রাণ। মন্দির, মসজিদ, গির্জা তার সাক্ষ্য।

আসলে যেটা ঘটেছে সেটা ইউরোপের রেনেসাঁস, রেফরমেশন, এনলাইটেনমেন্ট, ব্রিটেনের গণতান্ত্রিক বিপ্লব, ফ্রান্সের প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লব, পশ্চিম ইউরোপের শিল্প বিপ্লব, রুশ দেশের সমাজ বিপ্লব। এসব না ঘটলে ইউরোপ এগিয়ে যেত না, এশিয়া পেছিয়ে থাকত না,

অগ্রসর আর পশ্চাৎপদের বৈষম্যকে আধ্যাত্মিকতা বনাম জড়বাদের বৈপরীত্য বলে রায় দিত না। প্রভেদটা আসলে মধ্যযুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের। পশ্চাৎপদরাও ক্রমে অগ্রগামীদের ধরে ফেলবে। হয়তো ছাড়িয়ে যাবে। যেমন জাপানে।

কিন্তু সেটার জন্যে চাই জরা সংযুবনী শক্তি। বিনু দেখতে পায় যুবকরা নিজেরাই দ্বিধাগ্রস্ত। একদল যদি চায় সমাজতন্ত্রে উত্তরণ আরেকদল ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে উন্নয়ন। এই দ্বিধা একদিন দ্বন্দ্বের রূপ ধারণ করতে পারে। সে দ্বন্দ্ব লন্ডনের ইস্ট এন্ডের সঙ্গে ওয়েস্ট এন্ডের। কিপলিং যা বলেছেন তা ইস্ট বনাম ওয়েস্ট নয়, ইস্ট এন্ড বনাম ওয়েস্ট এন্ডের বেলায় খাটতে পারে। গৃহযুদ্ধ করবে ধনী ও দরিদ্র নগর ও অঞ্চল। 'সেটলমেন্ট' স্থাপন করে হ্যাভ-নটশ্রেণীকে ভুলিয়ে রাখা যাবে না। হ্যাভ শ্রেণীকে ধনসম্পত্তি ভাগ করার কাজে ব্রতী হতে হবে। সেটা কি স্বেচ্ছায় হবে?

শেষের ক'দিন সুধায় গেল ভরে। বিনুর বান্ধবী তাকে নিয়ে গেলেন হল্যান্ড হয়ে জার্মানিতে, সেখান থেকে চেকোস্লোভাকিয়ায় তাঁর বান্ধবীর সমীপে, সেখান থেকে আবার জার্মানিতে। তার আগে দেখা হয়ে গেল গ্যেটের ভাইমার। বার্লিন তেমন পছন্দ হয়নি। কিন্তু ড্রেসডেন বিনুর হৃদয় হরণ করল। ইটারনাল ফেমিনিন রাফেলের আঁকা সিসটিন ম্যাডোনা। যীশুজননী। অতুলনীয়। জার্মানি থেকে বিনু লন্ডনে ফিরে যায়, পাট গুটিয়ে আবার বান্ধবীর সঙ্গে যোগ দেয় ইটালির মিলান নগরে। দেখতে পায় লেওনার্দোর আঁকা দেওয়াল-চিত্র যীশুর শেষ ভোজন। অপূর্ব। ভেনিস আর ফ্লোরেন্সের বিভিন্ন মিউজিয়ামে তাঁর আমলের আরো অনেকের কালজয়ী চিত্রসম্পদ, ভাস্কর্যসম্পদ। পরিশেষে রোম। ভাটিকানে সেন্ট পিটার গির্জায় মিকেল আঞ্জেলোর আঁকা সিলিং চিত্র। ঈশ্বর অ্যাডামের আঙুলে আঙুল ছুঁইয়ে প্রাণ সঞ্চার করছেন। সেই শিল্পীর গড়া মোজেস মূর্তি দেখল রোমের অন্য এক গির্জায়।

এসব অনবদ্য সৌন্দর্যসৃষ্টি রেনেসাঁস আমলের। স্রষ্টারা ছিলেন ক্যাথলিক ধর্মমতে গভীর বিশ্বাসী। রেফরমেশন আমলে প্রটেস্টান্ট ধর্মমতে বিশ্বাসী শিল্পীরা ধর্মীয় বিষয়ে মন দেননি। কিন্তু প্রোটেস্টান্ট সংগীতকাররা সে অভাব পূরণ করেছেন কন্ঠ ও যন্ত্র-সংগীতে মহৎ সংগীত সৃষ্টি করে।

এনলাইটেনমেন্টের আমলে ইউরোপ সেকুলার ধারা অবলম্বন করে। ধর্মবিশ্বাস আর তেমন প্রেরণা জোগায় না। প্যারিসই হয়ে ওঠে আর্টের কেন্দ্রস্থল। সংগীতের কেন্দ্র কোনো এক স্থলে নয়। তবে জার্মানি ও অস্ট্রিয়াই সেরা সংগীতকারদের সাধনাভূমি। বিনু প্যারিসে বেশি সময় দিতে পারেনি। তার বান্ধবীও সময় পাননি সেখানে নিয়ে যাবার। সংগীতে তার বিশেষ অভিনিবেশ থাকলেও বিনু পাশ্চাত্য সংগীত আদপেই বুঝত না। হ্যাঁ, সংগীতে প্রাচ্য প্রতীচ্য ভেদ আছে বইকি। নৃত্যেও। বিনু বিভিন্ন সময়ে পাভলোভার ব্যালে দেখেছে, পাডেরেভস্কির পিয়ানো শুনেছে। তার পরে শুনেছে ক্রাইজলারের বেহালা, শালিয়াপিনের কন্ঠসংগীত। অসাধারণ, অসামান্য, কিন্তু বিনুর পক্ষে দুরূহ। বুঝতে হলে তাকে আরো কয়েক বছর ইউরোপে বাস করতে হত।

মনীষীদের সংসর্গও সে কলেজের বাইরে বড়ো একটা পায়নি। কারণ তাঁদের বাড়ি যায়নি। পাবলিক লেকচার শুনেছে বার্নার্ড শ আর বারট্রান্ড রাসেলের। দুই মহীরূহের। আরো কিছুকাল থাকতে পারলে ফরাসি ও জার্মান বনস্পতিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করত। আর

ইটালিতে বেনেদেত্তো ক্রোচের সঙ্গে।

তার নিজের লেখার কাজও তো ছিল। দু'বছরে যা লিখেছে তা দিয়ে চারখানা কবিতার বই, দুখানা ভ্রমণের বই, একখানা প্রবন্ধের বই দেশে ফেরার আগে ও পরে ছাপা হয়ে যায়। হাতে থাকে এত বেশি মালমশলা যে প্রথমে ভাবে তিন খণ্ডের উপন্যাস লিখবে তাই দিয়ে, পরে পাঁচ খণ্ডের। কিন্তু তাতেও কি সব কথা বা সকলের কথা বলা হবে? আত্মীয়তা সে পাতিয়েছিল অচেনা অজানা কত লোকের সঙ্গে জার্মানিতে, ফ্রান্সে, চেকোশ্লোভাকিয়ায়। ক্ষণিকের জন্যে। সেসব তো তার উপন্যাসের ফ্রেমে আঁটা যাবে না।

তার বান্ধবী তাকে রোম থেকে মার্সেলসে রেলপথে রিভিয়েরার ভিতর দিয়ে নিয়ে যান ও জাহাজে উঠিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যান। আবার সেই বিষাদ, আবার সেই আনন্দ। বিদায়ের বেদনা, ঘরে ফেরার উল্লাস। বিনু জাহাজের ডেকে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। ফ্রান্সের উপকূল ধীরে-ধীরে মিলিয়ে যায়। ইউরোপ হয়ে যায় মায়া।

বিনুর দ্বৈতসত্তা

পরাধীন দেশে নাগরিক মাত্রই পরাধীন। সরকারি চাকরি যারা করে তারা দ্বিগুণ পরাধীন। আই সি এস যেন একটি সোনার খাঁচা। বিনু সেই খাঁচায় অস্বস্তি বোধ করে। তার সংকল্প সে যৌবন ফুরোবার আগেই আই সি এস থেকে ইস্তফা দেবে। তার বিশ্বাস আই সি এস হয়ে সে ভুল করেছে। সময় থাকতে সংশোধন চাই।

অথচ এটাও তো ঠিক যে আই সি এস প্রতিযোগিতায় সফল না হলে সে বিলেত যেতে পারত না। বিলেত না যেতে পারলে ভ্রমণকাহিনী লিখতে পারত না। ভ্রমণকাহিনী না লিখতে পারলে বাংলা সাহিত্যের আসরে সহজে ঠাঁই পেত না। রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর তারিফ কি কখনো জুটত!

আই সি এসের সুবাদেই তার বাংলাদেশে নিযুক্তি। জীবনের প্রথম পঁচিশ বছর সে বাংলাদেশের বাইরেই কাটিয়েছে। ওড়িশায়, বিহারে ও বিলেতে। বাংলাদেশের বাইরে নিযুক্ত হলে সে শান্তিতে থাকতে পারত, তার পদোন্নতিও ত্বরান্বিত হত। কিন্তু সে বাংলাদেশের জেলায় জেলায় মহকুমায় মহকুমায় ঘুরে রূপসী বাংলাকে চিনত না, তার মানুষের মন জানত না। ভাষাটাও দেশের মাটির সঙ্গে জড়িত। বাংলাভাষার লেখককে বাংলার মাটির থেকে রস আকর্ষণ করতে হবে। তা না হলে ওই একখানা কি দু'খানা গ্রন্থই রসোত্তীর্ণ হবে। সাহিত্যসাধনা বেশিদূর এগোবে না।

সরকারি চাকরির মতো সাহিত্যেরও নিয়ম অনেকজনকে ডাকা হয়, কয়েকজনকেই বেছে নেওয়া হয়। বিনু হতে চায় সেই কয়েকজনের একজন। এর জন্যে একাগ্র সাধনা করতে হবে, তা সে জানে। সেইজন্যে তার ভয় তার চাকুরে সত্তা আর সাহিত্যিক সত্তাকে অসপত্ন হতে দেবে না। আই সি এস বিনু সাহিত্যসাধক বিনুকে উপরে উঠতে দেবে না। সে নিচে পড়ে থাকবে। আই সি এস-দের পাঁচ ছ বছর চাকরির পর পদোন্নতি ঘটে। কিন্তু বিনু সেই পাঁচ ছয় বছরে তার পাঁচ খণ্ডের উপন্যাস শেষ করতে পারলে কৃতার্থ হবে। নাই বা হল পদোন্নতি। তার চেয়ে শ্রেয় সাহিত্যে ঊর্ধ্বগতি।

বিনু নারীশক্তির অভাব অনুভব করে। নারীশক্তির প্রেরণা বিনা কোনো দুঃসাধ্য কীর্তি

সম্ভব হয় না। সেই যে আই সি এস প্রতিযোগিতা তার পেছনেও নারীশক্তির প্রেরণা ছিল।

"শুক বলে আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল। সারী বলে আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল। নইলে পারবে কেন?" কোথায় সেই নারী যে তার সাহিত্যিক সৃষ্টিতে শক্তি সঞ্চার করবে। আই সি এস পাত্রকে বিয়ে করতে অনেকেই উৎসুক। বিনু সে আই সি এস ছাড়বে শুনলে কেই বা বিয়েতে রাজি হবে?

বিনু তার নিজের পরিকল্পনা অনুসারে বাঁচতে পারে, পাঁচ খণ্ডের উপন্যাস লিখতে পারে, পাঁচ বছর বাদে সোনার খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে, কিন্তু তার নিজের পরিকল্পনা অনুসারে প্রেমে পড়ে প্রেম পেয়ে বিয়ে করতে পারে কি তেমন একটি নারীকে যে তাকে বিনু বলেই ভালোবাসবে, আই সি এস বলে নয়? আর যে তাকে বিয়ে করতে রাজি হবে সে আই সি এস ছাড়বে জানা সত্ত্বেও। স্বদেশে কি তেমন কেউ আছে?

বিনু তার জন্যে দুয়ার খোলা রেখে প্রতীক্ষা করতে পারে, কিন্তু তার যৌবন অপেক্ষা করবে না, বিদ্রোহী হবে। জীবনের পক্ষে পাঁচটা বছর খুব বেশি সময় নয়, কিন্তু যৌবনের পক্ষে অনন্ত কাল। বিনু সেই পলাতককে কোন্ মন্ত্রে বেঁধে রাখবে। যৌবন আর প্রেম আর পরিণয় আর আর্ট আর জীবিকা একসূত্রে গাঁথা কি সম্ভব? বিনুর বিশ্বাস হয় না। বিবাহের বেলা সে নেতিবাদী হয়ে প্রত্যেকটি সম্বন্ধ নাকচ করে। কন্যাপক্ষের ধারণা সে নীলামে দর বাড়াতে চায় বলেই নেতি নেতি করছে, বিনু কিন্তু পণ যৌতুক নেবে না, নেবে কন্যাটিকেই।

তবে তার নিজের ভবিষ্যৎ যখন অনিশ্চিত তখন একটি নারীকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করা সমীচীন হবে না। বিবাহবন্ধন তো তার নিজের পক্ষেও বন্ধন। সেটাও একপ্রকার খাঁচা। হয়তো বাঁশের খাঁচা। অথচ নীড় বাঁধতে হলে বিবাহই শ্রেয়। বিবাহের বাইরে নীড় বাঁধার নজির ইউরোপে আছে। শিল্পীরা বোহেমিয়ান জীবনধারা পছন্দ করেন। তাঁরা বিবাহবিমুখ। নীড় বাঁধতে চাইলে বিবাহের বাইরেই বাঁধেন। সন্তান হয় না। হলে অবৈধ হয়। বিনু শিউরে ওঠে। না, অবৈধ সন্তান কিছুতেই না। তার চেয়ে নিঃসন্তান থাকা শ্রেয়। তা হলে আবার বাৎসল্য রসটা অনাস্বাদিত থেকে যায়। সে রসও বিনু আস্বাদন করতে চায়। তার মধ্যে একজন বৈষ্ণব লুকিয়েছিল। যার চক্ষে শিশুমাত্রেই গোপাল। তার ঘরে গোপাল থাকবে না, তা কি হয়? তার জায়া হবে "রাধা ও মাডোনা একাকারা।" মোহিতলালের উক্তি।

এই অলীক দিবাস্বপ্ন সরিয়ে রেখে বিনু তার কাজকর্মে মন দেয়। প্রথম কাজটি প্রথমে। মাসকাবারের পর মাইনেটি সব আগে। বিনু সময় পেলেই লিখতে বসে যায়। সময় করে নিতে হয়। টেনিস কোর্টে বিলিয়ার্ডস খেলতে ক্লাবে যায়, কিন্তু তাস খেলতে গেলে রাত বাড়ে। তাই তাস খেলে না। আড্ডা দেয় না। তার সাহিত্যিক সত্তা যে অসপত্ন নয়, ম্যাজিস্ট্রেট সত্তা যে ওর সপত্নীসমান এর জন্যে সে দুঃখিত। প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যই তার অন্দরে দুয়োরাণী। সে ষোল বছর বয়স থেকেই বিভিন্ন পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করেছিল।

সবচেয়ে ভালো হত যদি সাহিত্যই হত সাহিত্যিকের জীবিকা। কিন্তু রম্যাঁ রলাঁ বিনুকে টাকার জন্যে লিখতে বারণ করেছিলেন। টাকার জন্যে লেখা মানে বাজারের চাহিদা অনুসারে যোগান দেওয়া। পাঠকরা দাম দিয়ে কেনে ডিটেকটিভ উপন্যাস, অলৌকিক কাহিনী, ভূতপ্রেতের গল্প, সেন্টিমেন্টাল কমেডি, প্রচ্ছন্ন পর্নোগ্রাফি। তাই সিরিয়াস বিষয়ে যাঁরা লেখেন তাঁদের অন্য কোনো আয়ের উৎস থাকে। কারো চাকরি, কারো জমিদারি, কারো পৈত্রিক বিষয়সম্পত্তি, কারো পিসি মাসির অর্থসাহায্য। অবশ্য দু-চারজন ব্যতিক্রমও

দেখা যায়। যেমন বার্নার্ড শ, টোমাস মান, ভার্জিনিয়া উলফ, ডি এইচ লরেন্স।

বিনু সিরিয়াস বিষয়ে লিখতে কৃতসংকল্প। তার পাঁচ খণ্ডের উপন্যাস ক'জনেই বা পড়বে? ক'জনই বা কিনবে? তার কবিতারই বা চাহিদা কতটুকু? কিংবা তার প্রবন্ধের। মাসিকপত্রের সম্পাদকরা দক্ষিণা দেন না। প্রকাশক ছাপতে রাজি হন, সে যদি ছাপার খরচটা দেয়, কাগজের খরচ তিনি দেবেন। পরে হিসাবনিকাশ হবে। লাভ হলে সে লাভের অংশ পাবে। বিনু একখানা চটি বইয়ের মুদ্রণব্যয় যোগাতে পারবে, কিন্তু একখানা তিনশো পৃষ্ঠার উপন্যাসের মুদ্রণদায় সে বহন করতে পারবে না, প্রকাশকও নারাজ হবেন কাগজের দাম মেটাতে। হালকা বিষয়ের উপন্যাস হলে অন্য কথা। প্রকাশকই সমস্ত ভার বইবেন। তা হলে বিনুকে কেবল হালকা উপন্যাসই লিখতে হয়। বছরে চারখানা। তাতেও কি জীবনযাত্রার দুই প্রান্ত মেলাতে পারা যাবে। আর কারো পক্ষে সম্ভব হতে পারে, বিনুর পক্ষে নয়। তার ঝুলিতে অতগুলো কাহিনী নেই। স্ত্রীপাঠ্য বা শিশুপাঠ্য কাহিনী লিখে সে সরস্বতীর বর পাবে না। তার অভিপ্রেত পাঠক-পাঠিকারা বিদগ্ধ, জনসংখ্যায় অল্প।

বিনুর আশা এঁরাই তার বড়ো মাপের বই কিনবেন ও এঁদের মুখ চেয়ে প্রকাশক তার বই নিজের ব্যয়ে প্রকাশ করবেন। সত্যি সত্যি তেমন একজন প্রকাশককে পাওয়া গেল। তিনি পাঁচ খণ্ডের উপন্যাস শুনে ভয় পেলেন না। বিষয়টা আধুনিক বিশ্বের বিবিধ চিন্তাভাবনা, তাও প্রতীচ্য পটভূমিকায়, একথা শুনেও তিনি প্রকাশ করতে সম্মত। তাঁর অনুরোধ বিনু যে সপ্তাহে যতটুকু লিখবে ততটুকু তাঁকে পাঠাবে। তিনি অবিলম্বে প্রুফ পাঠাবেন। বিনু প্রুফ দেখে ফেরৎ পাঠাবার সময় নতুন কপি পাঠাবে। বই বার হবে পুজোর পূর্বে। পুরো বইখানা বিনু প্রেসে দেবার আগে দেখতে পাবে না। সে রাজি হয়ে যায়।

যে বিষয়ের চাহিদা নেই তার চাহিদা সৃষ্টি করতে হবে। যে বিষয়ের পাঠক নেই তার পাঠক তৈরি করে নিতে হবে। পরীক্ষা করে দেখা গেল গুরুপাক উপন্যাসেরও চাহিদা আছে, পাঠক আছে। ওটা প্রকাশকের পক্ষে লোকসানের কারবার নয়। আর বিনুর পক্ষে দুধে জল মেশাবার ব্যবসা নয়। সে খাঁটি দুধই সরবরাহ করে। তবে বিক্রী কম।

রম্যাঁ রলাঁর কথামতো বিনু নিজের খুশির জন্যে লিখেছে, পাঠকের খুশির কথা ভেবে দেখেনি। পাঠকসাধারণ যদি তার বই না কেনে তবে সে কাকে দায়ী করবে? ইউরোপের প্রথম যুদ্ধোত্তর তথা দ্বিতীয় যুদ্ধপূর্ব মধ্যবর্তী দু'বছরের একটি মানসচিত্র আর কেউ বাংলা ভাষায় আঁকেনি। বিনুই এঁকেছে। তার সঙ্গে মেলাবার প্রয়াস রয়েছে শাশ্বত ভারতের। নতুন ও পুরাতন বহুবিধ জিজ্ঞাসার উত্তর অন্বেষণ করা হয়েছে। হয়তো মেলেনি, তবু বৃথা নয়। বিনু তার রক্ত দিয়ে যা লিখেছে তা নিছক একজনের খুশির জন্যে নয়। আরো অনেকের অবগতির জন্যেও। তাঁরা যদি মুষ্টিমেয় হনও তবু তার শ্রম সার্থক। বর্তমান কালের পাঠকরাই একমাত্র পাঠক নন। সত্য-ভিত্তিক হলে বইটির ভবিষ্যৎ আছে। পাঁচ খণ্ডের এই উপন্যাস একটি চওড়া ক্যানভাসে আঁকা মসীচিত্র।

বইটি কি না লিখলে চলত না? না, চলত না। বিনু ছাড়া আর কেউ কি লিখতে পারত না? না, পারত না। বিনুকেই কি সাহিত্য সরস্বতী এ কাজের জন্য বরাত দিয়েছেন? তাই তো মনে হয়। সম্পাদক তার ভ্রমণকাহিনী শেষ হবার পর তার কাছে চেয়েছিলেন একটা উপন্যাস। সে লিখতে পারত একখানা বাজার চলতি উপন্যাস। সম্পাদক সানন্দে প্রকাশ করতেন। সে লিখতে শুরু করে দেয় তার পাঁচ খণ্ডের উপন্যাস। বলতে গেলে এটা

তার ভ্রমণকাহিনীর অন্তরালে থাকা অন্তরঙ্গ কাহিনী। এতে ঘটনার চেয়ে ভাবনা বেশি। তথ্যের চেয়ে তত্ত্ব বেশি। দৃশ্যের চেয়ে চরিত্র বেশি। বহিঃপ্রকৃতির চেয়ে অন্তঃপ্রকৃতি প্রধান। বর্ণনার চেয়ে মানসিক বিবর্তন প্রধান। বিবরণের চেয়ে বক্তব্য প্রধান। এককথায় এটি একটি ইন্‌টেলেকচুয়াল উপন্যাস। যাতে আইডিয়ার সঙ্গে আইডিয়ার ঘাত-প্রতিঘাত ও বোঝাপড়া।

ইউরোপ হতে চলে আসার পর থেকে সেখানকার স্মৃতি ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে আসছিল। খুঁটিনাটি ভুলে যাওয়ার ফলে লিখতে গিয়ে ভুল হয়ে যাচ্ছিল। অন্য কারো সঙ্গে পরামর্শ করার দরকার ছিল। কিন্তু বাংলাদেশের মফস্বলে কাকেই বা হাতের কাছে পাবে? এমন সময় ঘটে যায় এক অঘটন। এক বিদেশিনীর সঙ্গে অকস্মাৎ পরিচয়, পরিচয় থেকে প্রণয়, প্রণয় থেকে পরিণয়। সমস্তটাই মাস দুয়েকের মধ্যে। মানতে হয় এটা প্রজাপতির নির্বন্ধ। জীবনদেবতার ইচ্ছা। বিনু তার প্রয়োজনের সময় পরামর্শ পায়। না পেলে তার উপন্যাস ত্রুটিগ্রস্ত হত। তাহলে বলতে হয় সরস্বতী এই বিবাহের পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন। বিনুকে ও মীরাকে জানতে দেননি। মীরা নামকরণ হয় বিবাহের পরে। বিদেশিনী বনে যান স্বদেশিনী। শাড়ি পরেন। বাংলায় কথা বলেন। নিজের দেশ ছাড়েন, ন্যাশনালিটি ছাড়েন, কিন্তু ধর্ম ছাড়েন না। বিনুও ধর্মান্তরিত হয় না। যার যার ধর্ম তার তার। বিনু অসবর্ণ বিবাহে বিশ্বাস করত। অসধর্ম বিবাহও সে বাল্যকাল থেকে দেখে এসেছিল।

মীরাকে বিনু বিয়ের আগেই জানায় সে আই সি এসে বেশিদিন থাকবে না। ও যদি তাকে আই সি এস বলে বিয়ে করে তবে ভুল করবে। মীরা তাকে আশ্বাস দেয় যে আই সি এস বলে সে ওকে বিয়ে করছে না, ভালোবাসে বলেই বিয়ে করছে। তবে বিনু নিজেই দু'বার ভাবে। যেটা একজন অবিবাহিত পুরুষের পক্ষে ঠিক, সেটা একজন বিবাহিত পুরুষের পক্ষে ঠিক নয়। সন্তান হলে তো কথাই নেই। আই সি এস ছাড়ার আগে ওদের জন্যে ব্যবস্থা করতে হবে। ওদের সম্মতি নিতে হবে।

গোলাপ। গোলাপ। গোলাপ। সমস্তটা পথ গোলাপ বিছানো। প্রথমে আপত্তি করলেও বিনুর গুরুজন মীরাকে দেখে ও তার ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে এ বিবাহ মেনে নেন ও তাকে বধূরূপে বরণ করেন। ধর্মভেদ, বর্ণভেদ, দেশভেদ, ভাষাভেদ অন্তরায় হয় না। সবার উপরে মানুষ সত্য।

কাঁটা। কাঁটা। কাঁটা। মীরার গুরুজন এ বিবাহ মেনে নিতে রাজি নন। বিনুকে জামাতা বলে স্বীকার করেন না। মীরাকে বলেন বিবাহভঙ্গ করতে। সে সম্মত হয় না। তখন তাঁরা তাকে পিতৃগৃহ থেকে বহিষ্কার করেন। সে ত্যাজ্য কন্যা হয়।

বিনুর কাছে যা রোম্যান্টিক মীরার কাছে তা ট্র্যাজিক। এমন বিবাহ সাধারণত সুখের হয় না। কিন্তু বিনু ও মীরা দু'জনে দু'জনকে নিয়ে সুখী। প্রেম তাদের নীড় বাঁধতে শেখায়। দূর দিগন্তের দুটি পাখির মতো প্রেমের সঙ্গে যোগ দেয় সাহিত্য ও সংগীত। মীরা পিয়ানো নিয়ে এসেছিল। সেও রলাঁ ও রবীন্দ্রনাথকে ভক্তি করত। ভারতের স্বাধীনতা তারও কাম্য ছিল। সেও বিনুর মতো খাদি পরত। শ্বেতাঙ্গ সমাজে সে একজন নেটিভ। কে একজন শ্বেতাঙ্গ টিপ্পনি কাটেন, "উনি ভারতকে ভালোবাসেন বলেই ভারতীয় বিবাহ করেছেন।"

মীরা যে ভারতকে ভালোবাসে একথা সত্য। তা না হলে এদেশে বরাবরের জন্যে থেকে যেত না। গ্রীষ্মকালে দগ্ধ হত না। স্বামীকে ফেলে পাহাড়ে যাবার মতো মেমসাহেব সে নয়। বাংলাদেশের যেখানেই গেছে সেখানেই ঘরের মতো বোধ করেছে। বিনু যেমন

ইউরোপের সর্বত্র বোধ করেছিল। সব দেশই মানুষের দেশ। সবাই তার স্বজন। প্রেমের বন্ধন থাকলে তো কথাই নেই।

ইউরোপে ইউরোপীয় স্টাইল মানায়, ভারতে নয়। বিনু পারতপক্ষে ভারতীয় ধরনে থাকত। সে জানত তাকে একদিন পদত্যাগ করতে হবে। তখন সাহেবিয়ানা চলবে না। বাবুয়ানাও এই গরিব দেশে বেমানান। একদিন সে গ্রামে গিয়ে চাষি ও কারিগরদের সঙ্গে জীবন যোগ করবে। মীরাকেও সে তার সাথী করবে। সুতরাং জীবনযাত্রা যত সাদাসিধে হয় তত ভালো। ওরা প্রাতরাশের সময় চিঁড়ে মুড়ি খায়। তা শুনে বাঙালি সাহেব মহলে হাসাহাসি পড়ে যায়। ওটা যে আই সি এস ত্যাগের প্রস্তুতি কে তা বিশ্বাস করবে? বিনুর সে প্রস্তুতি তলে তলে চলছিল ও মীরা তার সক্রিয় সহযোগিনী ছিল। সে কষ্ট সইতে প্রস্তুত।

প্রথম দর্শনের সময় বিনু মীরাকে—তখন তার নাম মীরা ছিল না—দু'তিনটি বাংলা শব্দ শিখিয়েছিল। তখন সে স্বপ্নেও ভাবেনি যে ওর সঙ্গে তার বিয়ে হবে। বিয়ের পরে মীরা বিনুর সঙ্গে বাংলায় কথা বলতে শেখে ও বাংলাই হয় ওদের ছেলেমেয়েদের মাতৃভাষা। ওদের ইংরেজি শেখানো হয় না। যদিও ওদের মা ইংরেজিভাষিণী। এতে মীরার আন্তরিক সম্মতি ছিল। নইলে ছেলেমেয়েরা মিশত কাদের সঙ্গে? মফস্বলে ওদের সমবয়সীরা সবাই বাংলাভাষী। দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজি? না, তাতেও বিনুর আপত্তি ছিল। মীরা তার সঙ্গেই একমত হয়। আট বছর বয়স পর্যন্ত এই শিক্ষানীতি রবীন্দ্রপ্রভাবে। গান্ধীজীর প্রভাবও কাজ করছিল। পাছে ইংরেজি শিখতে গিয়ে আত্মমর্যাদা হানি হয়। আগে তো পুরোদস্তুর বাঙালি হোক। তার পরে ইংরেজি ফরাসি জার্মান যে কোনো ভাষা শিখবে।

বিনুর চাকরিতে নিযুক্তির কিছুদিন পরে লাহোরে কংগ্রেস স্বাধীনতাপ্রস্তাব গ্রহণ করে। তার কিছুদিন পরে শুরু হয় গান্ধীজীর ডাণ্ডি যাত্রা ও লবণ সত্যাগ্রহ। ঘটে যায় চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। বিনুকে কাজ করতে হয় অশান্ত পরিবেশে। দেশ দুই শিবিরে বিভক্ত। তার স্থান ইংরেজদের শিবিরে। সে শিবিরে গণ্যমান্য অনেক ভারতীয় ছিলেন। সে তাঁদের তুলনায় নগণ্য। তবু তার বিবেক তাকে দায়ী করছিল। দমনকার্যের জন্যে নয়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখার জন্যে।

অথচ সে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সমর্থকও ছিল না। তার মতে হত্যামাত্রেই পাপ। দেশের মুক্তির জন্যে পাপ করা কিছুতেই ভালো হতে পারে না। রাজনীতির দিক থেকেও তা অদূরদর্শিতা। কয়েক বছর পরে দেখা গেল ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ বাংলার হিন্দুদের প্রতি প্রতিকূল। অথচ অন্যান্য প্রদেশের প্রতি প্রতিকূল নয়। সেসময় মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট পদে থাকতে বিনুকেও সশস্ত্র বডিগার্ড নিয়ে ঘোরা-ফেরা করতে হত। ফলে লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে গেলে বিনু বিব্রত বোধ করত।

চাকরির গোড়ায় বিনু যখন অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিল তখন তার উপর কোনো গুরুদায়িত্ব অর্পিত ছিল না, সে আদালতে বসে ছোট ছোট মামলার বিচার করত, ক্লাবে গিয়ে টেনিস ও বিলিয়ার্ডস খেলত, রাতে ও সকালে ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষার জন্যে পড়াশুনা করত, তারই ফাঁকে কবিতা বা উপন্যাস লিখত। জেলার সদরে থাকায় সরকারি ও বেসরকারি মহলের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে তার আলাপ পরিচয় হত। লাটসাহেব থেকে আরম্ভ করে রাজা মহারাজ, নবাব বাহাদুর, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা জজ, সিভিল সার্জন, পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট, পুলিশ বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল, জেল বিভাগের ইন্সপেক্টর

জেনারেল, এমনি সব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে খানাপিনা বা খেলাধূলা বা মোলাকাত। অনেক সময় নামমাত্র। তার প্রথম জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন শিল্পরসিক। পালযুগের আর্ট সম্বন্ধে তাঁর একখানি বই ছিল। ইউরোপীয় আর্ট প্রসঙ্গে বিনুর সঙ্গে কথাবার্তার পর তাকে ডেকে পাঠান হলঘরের দেওয়াল কোন্ রঙে রাঙাবেন তা নিয়ে পরামর্শ করতে। তিনি ইউরোপীয়।

কিন্তু মহকুমার ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট পদে বদলির পর বিনু হয়ে যায় উপরমহলের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। তার পরিবর্তে আসে গ্রামঅঞ্চলের জনগণের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার সুযোগ। তার দ্বিতীয় ইউরোপীয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাকে উৎসাহ দেন ও পথ দেখান। সেও তাঁবু নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। তাঁবুতে রাত কাটায়। সুইস কটেজ তাঁবুতে ঘরের আরাম পায়। ততদিনে সে বিবাহিত। মীরাকেও সঙ্গে নিয়ে যায়। শিশুপুত্রকেও। দিনের বেলা শিশুকে নিয়ে দু'জনে পায়ে হেঁটে বেড়ায়। গ্রামের লোক এসে আর্জি ও অভিযোগ জানায়। কতরকম সমস্যা। সম্ভব হলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেয় বিনু। নয়তো নোট করে নিয়ে যায়। পরে ব্যবস্থা নেয়। এমনি করে বিনু বনে যায় একজন ম্যান অভ্ অ্যাকশন। সরকার ও জনগণের মাঝখানে সেতুবন্ধন করে। ক্রমশ উপলব্ধি করে যে রাষ্ট্রের একটা দক্ষিণ মুখও আছে। কেবল রুদ্র রূপ নয়। সে একজন জনসেবক, কেবল দণ্ডমুণ্ডের কর্তা নয়।

মাঝে মাঝে একজনের বাসযোগ্য কাবুলীপাল তাঁবু নিয়ে দুর্গম অঞ্চলে ডেরা বাঁধে। একবার কালবৈশাখী ঝড়ের মুখে কাবুলীপাল যায় উড়ে। ঝড়ের রাতে তাকে আশ্রয় দেন এক ব্রাহ্মণ গৃহস্থ। বিছানা পাতা হয় একই ঘরে পরিবারের স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গে। সকলেই অচেনা। ভদ্রলোক কোনো রকম প্রতিদান চান না। সেটা নিছক অতিথিসেবা।

মাঝে মাঝে হাতির পিঠে চড়েও বিনু আরো দুর্গম অঞ্চলে যায়। জমিদারদের হাতি। একভাবে না একভাবে প্রত্যুপকার করতে হয়। তেমনি মাঝে মাঝে হাউসবোট নিয়ে সফর করতে হয়। ঠাকুরবাবুদের কিংবা চৌধুরীবাবুদের হাউসবোট। রবীন্দ্রনাথ যে বোটে চড়তেন পতিসরে যেতে আসতে বিনুও সেই বোটের যাত্রী। সঙ্গে মীরা। নদীর দু'ধারের দৃশ্য দেখতে দেখতে লেখার কাজও করা যায়। রবীন্দ্রনাথ তাই করতেন। বোট এমনভাবে তৈরি হয়েছে যে দিনের বেলা যেটা লেখার টেবিল বা খাবার টেবিল, রাতের বেলা সেটা মেঝের সামিল। তখন ঢালা বিছানায় শোওয়া যায়। পতিসরে বিনু ও মীরা বোট থেকে নামে না। সেখানেই রাত কাটায়।

মাঝিমাল্লারা মুসলমান। একান্ত অনুগত প্রজা। প্রধানত মুসলমান প্রজাদের নিয়েই হিন্দুদের জমিদারি, তালুকদারি, জোতদারি। জমিদাররা নানা উপলক্ষে খাজনার উপর আবওয়াব আদায় করেন। পরিবর্তে প্রজার জন্য কিছু করেন, এর দৃষ্টান্ত বিনু লক্ষ করে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের জমিদারিতেই। তাঁর প্রতিষ্ঠিত কল্যাণবৃত্তি তহবিলে প্রজারা দেয় খাজনার টাকায় এক আনা চাঁদা, জমিদার দেন টাকায় এক আনা চাঁদা। তহবিলের খরচে তিনটি হাসপাতাল, তিনটি স্কুল চলে। জমিদারির তিনটি বিভাগে। তাদের একটি হাইস্কুল।

বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে হিন্দু মুসলিম সমস্যার অপর নাম হচ্ছে জমিদার বনাম প্রজা, মহাজন বনাম খাতক সমস্যা। বিনু বুঝতে পারে বাংলাদেশের হিন্দু মুসলিম সমস্যার মূলে ব্রিটিশ সরকারের ভেদনীতি যার অন্য রূপ জমিদার ও মহাজনদের শোষণনীতি। আইনে এর কোনো প্রতিকার নেই। বিনু আইনের বাইরে কিছু করতে পারে না। শুধু শুভবুদ্ধির কাছে আবেদন করে। ওদিকে মুসলিম প্রজা ও খাতকদের প্ররোচনা যোগাবার

জন্যে রাজনীতিকরা ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট গান্ধীপন্থী নেতাও। জমিদারকে খাজনা না দিলে সবকারের রেভিনিউতেও টান পড়ে। সরকারকে বাধ্য হয়ে ধরপাকড় করতে হয়। যে কোনো একটা ইস্যুতে জেলে যাওয়া কি সত্যাগ্রহ? মুসলমানদের হৃদয় জয় কি অত সহজ?

গাঁজা চাষিদের সমবায় সোসাইটির সদস্যদের নিকট-সংস্পর্শে এসেছিল বিনু। তাদের সকলেই মুসলমান, একজন বাদে। লেখাপড়া না করেও তারা সমিতির পরিচালনায় সুদক্ষ। প্রায় সকলেই সম্পন্ন চাষি। তাদের ছেলেরা সরকারি চাকরির উমেদার না হয়ে যদি কৃষিবিজ্ঞান শিখে আরো ভালো ভাবে চাষ করে তবে গাঁজা চাষের উপর নির্ভর করতে হয় না। সেটা সমাজের পক্ষে অহিতকর। গাঁজা সোসাইটির অর্থসাহায্য নিয়ে তিনটে হাই স্কুল চলত। কিন্তু কোনোটারই মান উচ্চ নয়। বিনুর ইউরোপীয় কালেক্টরের বক্তব্য হল তিনটির জায়গায় একটিই সেন্ট্রাল হাই স্কুল হোক, তার অধীনে থাকুক তিনটি মাইনর স্কুল। বিনুর উপর ভার পড়ে এই বক্তব্য অনুসারে কাজ করার। সে তার নিজের বক্তব্য জুড়ে দেয়— সেন্ট্রাল হাই স্কুলের অতিরিক্ত শিক্ষণীয় বিষয় হবে কৃষিবিজ্ঞান। কালচার আর এগ্রিকালচার এটাই আদর্শ। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল চাষির ছেলেরা কেউ কৃষির ক্লাসে যায় না, যায় বিনুর হেডক্লার্কের ছেলে, ব্রাহ্মণ সন্তান, চাকরির আশায়। ওদিকে তিন হাই স্কুলের পরিচালকরা উপরের চারটি ক্লাস সেন্ট্রাল হাই স্কুলে স্থানান্তরিত করেন না। তাঁরা বরং গাঁজা সোসাইটির অর্থসাহায্য নেবেন না, নিজেরাই ভিক্ষা করে চালাবেন। তাঁদের ছেলেরা চাষি হবে কেন? তারাও পাশ করে সরকারি চাকুরে হবে।

হিন্দু মুসলিম সমস্যার মূলে এটাও একটা কারণ। সবাই চায় সরকারি চাকরি, অন্যথা ডাক্তারি ওকালতি ইত্যাদি ভদ্রলোকের পেশা। তা হলেই সমাজে মর্যাদা পাবে। এর পেছনে রয়েছে শ্রমের অমর্যাদা। শ্রমকাতরতা। হীনতাবোধ। মুসলমানরাই যৌথ সমাজের নিম্নতর স্তরে। ইংরেজি লেখাপড়া শিখে হিন্দুর সমান স্তরে ওটাই তাদের স্বপ্ন। এতদিন পরে ওরা সমঝেছে যে ইংরেজি শিক্ষাকে বয়কট করে মাদ্রাসার শিক্ষাকে আঁকড়ে ধরা মুসলিম সম্প্রদায়ের পক্ষে ভ্রান্তনীতি হয়েছে।

গরিব মুসলমান ছাত্ররা মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারে 'জাগির' পায়। বিনা খরচে খাবার ও শোবার ব্যবস্থা হয়। খুব একটা ভালো ফল দেখাতে না পারলেও তারা তাদের সম্প্রদায়ের জন্যে নির্দিষ্ট চাকরির কোটায় জায়গা পেয়ে যায়। যোগ্যতর হিন্দুর ছেলেরা পায় না।

যোগ্যতর হিন্দুকে ডিঙিয়ে কম যোগ্য মুসলমানকে চাকরির ভাগ দেওয়ার এই যে নীতি বিনুও এর ভুক্তভোগী। প্রতিযোগিতার প্রথমবারেই সে পঞ্চম হয়েছিল, কিন্তু তাকে বাদ দিয়ে একজন মুসলমানকে নেওয়া হয়। বিনু তখন প্রতিজ্ঞা করে সে দ্বিতীয়বারের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করবেই। ভগবান তার মুখ রক্ষা করেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার পরীক্ষার জন্যে যদি তার বয়স না থাকত তা হলে সে কোনোদিনই আই সি এস হতে পারত না, বিলেত যেতে পারত না, ফিরে এসে বাংলাদেশে নিযুক্ত হতে পারত না, এতরকম লোকের সঙ্গে মিশতে পারত না। তাব সাহিত্যিক সত্তারও ক্ষতি হত। একজন সাংবাদিক হয়ে সে এমন কিছু লিখতে পারত না যা রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর প্রশংসাযোগ্য হত।

সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের পর থেকে শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যেও একটু মুসলিমবিদ্বেষ

জাগে। কেউ কেউ বলতে আরম্ভ করেন,

"O Hindu is Hindu and Muslim is Muslim
And never the twain shall meet."

বিনু তা শুনে ব্যথিত হয়। যারা পরস্পরের নিকটতম প্রতিবেশী, এক ভাষায় কথা বলে, এক মাঠে চাষ করে, এক নৌকায় নদী পার হয়, এক বন্যায় ভাসে, এক দুর্ভিক্ষে মরে তারা কি ইংরেজদের মতোই পর, তারা কি সাত আট শতাব্দীর পরেও আপন হয়নি? হবেও না ব্রিটিশশাসনের অবসানে? ভেদনীতির অন্তর্ধানে? বিনু হিন্দু মুসলমানদের বেলাও মনে করে—"কেউ হিন্দুও নয়, কেউ মুসলমানও নয়, যেখানে উভয়েই ভারতীয়, উভয়েই বাঙালি।"

পরস্পরের প্রতি টান উভয় সম্প্রদায়ের সাধারণ লোকের মধ্যেই। তা না হলে মুসলিমপ্রধান গ্রামে পাঁচ দশ ঘর হিন্দু টিকতে পারত না। অথবা হিন্দুপ্রধান পাড়ায় দু'চার ঘর মুসলমান। তার নিজের জন্মস্থানে তাদের পাশের বাড়ির বাসিন্দারা মুসলমান। ধারেকাছে মুসলিম বসতি নেই। কই, কখনো তো মনোমালিন্য হয়নি। রোজ বিকেলবেলা মুসলিম মাস্টার চা খেতে আসতেন। বিনুর আর একজন কাকা আত্মীয়ের মতো ব্যবহার করতেন ও পেতেন। কলেজেও তার মুসলিম বন্ধু ছিল। তাদের সঙ্গে সে এক হস্টেলে প্রায় দু'বছর থেকেছে।

দাঙ্গার সময় বিনু কড়া হাকিম। হিন্দু বা মুসলমান কাউকেই রেয়াত করে না। সে তখন ধর্মনিরপেক্ষ রাজপুরুষ বা জনসেবক। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন তার কর্তব্য। সেটাই সরকারি নীতি। ইংরেজদের মধ্যে দু'একজন কালো ভেড়া থাকতে পারে, কিন্তু মোটের উপর তারা ধর্মনরিপেক্ষ ন্যায়নিষ্ঠ অফিসার। তবে এটাও ঠিক যে বিনু যে দু'জন আইন অমান্যকারীকে ধরে চালান দিয়েছিল, জেলাশাসক তাদের একজনকে সঙ্গে সঙ্গে খালাস দেন, অন্যজনকে সাতদিন পরে। মুসলিমটিকে বলেন, মুসলমানদের সঙ্গে তো ইংরেজদের কোনো বিরোধ নেই। তারা এই আন্দোলনে যোগ দিচ্ছে কেন? হিন্দুটিকে বলেন, বাড়ি যান, আর এমন আন্দোলনে যোগ দেবেন না।

আই সি এস না হলে সে সরকারের ভিতরের খবর জানতে পেত না। সেই জেলাশাসক তার দিকে একটা ফাইল বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, "এঁকে পুলিশের লোক জেল থেকে খালাস করে এনে বিয়ে দিচ্ছে। বিয়ের পরে আর সন্ত্রাসবাদী কাজে লিপ্ত হবেন না।"

ইংরেজদের নীতি নির্বিচারে দমনমূলক ছিল না। পুলিশের ভিতরেও বিবেচক অফিসার ছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেটদের মধ্যেও। আবার এমন লোক ছিলেন যাঁরা একটি বারো-তেরো বছরের ছেলে মুনসেফের আদালত শীর্ষে জাতীয় পতাকা উড়িয়েছে আর বিনু তাকে শুধুমাত্র ধমক দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে শুনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গেল গেল বলে আঁতকে উঠেছেন। জেলাশাসক—ইনি অন্য একজন—বিনুকে বলেন, ওই পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট যুদ্ধে শেল শক পেয়েছেন। তাই একটুতেই অন্ধকার দেখেন।

গান্ধীজীর আন্দালনের আসল ঘাঁটি ছিল মেদিনীপুর জেলা। বিনুর মহকুমা রাজশাহী জেলায়। সে আন্দোলনের আঁচ অতদূর পৌঁছয়নি। তাই বিনুকে কড়াহাতে দমন করতে হয়নি। গান্ধীপন্থীদের সঙ্গে তার সদ্‌ভাব ছিল। সরকারও সেটা জানতেন। বিনুর বরাত ভালো যে সন্ত্রাসবাদী ঘটনা তার এলাকায় ঘটেনি। ঘটলে তাকে মুশকিলে পড়তে হত। দণ্ড

দিলে দেশের লোক ভাববে দেশদ্রোহী। না দিলে সরকার মনে করবে রাজদ্রোহী। বিনু পাপকে ঘৃণা করত, কিন্তু পাপীকে নয়। অপরাধীর জন্যে তার অন্তরে একটা নরম কোণ ছিল। দণ্ড দিলেও সে অত্যন্ত গুরুদণ্ড দিত না। তবে ধর্ষণের বেলা সে বজ্রাদপি কঠোর।

লোকাল বোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ডের নির্বাচন যৌথ পদ্ধতি অনুসারে হত। হিন্দু প্রার্থী, ভোটার মুসলমান। মুসলিম প্রার্থী, ভোটার হিন্দু। সাধারণত মুসলিম ভোটে হিন্দু প্রার্থীরাই অধিকাংশ স্থলে জয়ী হতেন। যদিও এলাকাটা মুসলিম প্রধান। এই প্রথা কেন্দ্রীয় তথা প্রাদেশিক স্তরে প্রচলিত থাকলে মুসলিমপ্রধান বাংলাদেশের নির্বাচিত আইন সভা হিন্দুপ্রধান হতে পারত। সেটা এড়াবার জন্য মুসলিম রাজনীতিকরা স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতির দাবি তোলেন, পেছনে ইংরেজ শাসকদেরও কূটনীতি ছিল। ওঁরা মনে মনে স্থির করে রেখেছিলেন যে কয়েকটা প্রদেশ হবে মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ। আর সেই কয়েকটা প্রদেশের নির্বাচিত সরকারও মুসলিমপ্রধান। আবশ্যক স্বতন্ত্র নির্বাচনপদ্ধতি। সেই জিনিসটিই দাবি করেন মুসলিম রাজনীতিকরা।

মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও রাজশাহী—তিনটি জেলাই ছিল মুসলিমপ্রধান। কিন্তু তিনটি জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যানরা ছিলেন হিন্দু। তাঁদের যাঁরা সমর্থক তাঁদের মধ্যে মুসলমানও ছিলেন। জেলাবোর্ডের মধ্যে বিনুরও প্রবেশ ছিল। সেখানে সে হিন্দু মুসলিম বিভেদ লক্ষ করেনি। চেয়ারম্যানের স্বপক্ষে তথা বিপক্ষে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সদস্য। কংগ্রেস বা মুসলিম লীগ কোনোটারই অস্তিত্ব জেলাবোর্ডের সভায় ছিল না।

একদিন শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপিকার আরনল্ড বাকে আসেন বিনুর ও মীরার অতিথি হয়ে। তিনি চান বাংলার লোকগীতি রেকর্ড করতে। সঙ্গে রেকর্ড করার যন্ত্র। বিনুর অনুরোধে লোকগীতি গবেষক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন কোনখান থেকে নিয়ে আসেন এক ফকির ও তার ফকিরনীকে। ফকিরনী গেয়ে শোনায়—

"প্রেম করো মন প্রেমের মর্ম জেনে
প্রেম করা কি কথার কথা রে গুরু লহ চিনে।
চণ্ডীদাস আর রজকিনী প্রেম করিত তারাই জানি
এক মরণে দু'জন ম'লো রে প্রেমপূর্ণ প্রাণে।"

মুসলমানের মুখে চণ্ডীদাস আর রজকিনীর প্রেমের আদর্শ শুনে বিনু বিস্মিত হয়। কিন্তু তার জন্যে অপেক্ষা করছিল আরো বিস্ময়কর একটি পদ—

"প্রেমেব ডোরে আছেন বাঁধা
মহম্মদ আর আপনে খোদা।"

বাকিটুকু মনে নেই। বাকে সাহেব গানটি তাঁর যন্ত্রে বাজিয়ে শোনান। মনসুরউদ্দীন সাহেব লিপিবদ্ধ করেন। বিনু বুঝতে পারে হিন্দু মুসলমানের মিলনের শ্রীক্ষেত্র বাংলার লোকগীতি। পরে শুনতে পায় চণ্ডীদাস আর রজকিনীর প্রেম নিয়ে ওই একই পদ অন্য এক জেলায় এক বৈষ্ণবীর কণ্ঠে। প্রায় পাঁচশো বছর ধরে সেই প্রেমের কাহিনী বাংলার হিন্দু মুসলমানকে এক ডোরে বেঁধে রেখেছে।

এক অশীতিপর বয়সী চাষি মুসলমান একদিন বিনুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসে। তার হাতে এক বাণ্ডিল কাগজপত্র। পাঁচবছর ধরে সরকারের বিভিন্ন অফিসারকে লেখা চিঠিপত্র। আত্রাই নদী থেকে খাল কেটে জল নিয়ে যায় গাঁয়ের কতক লোক, তাদের জমিতে সেচের

জন্যে। বর্ষাকালে নদীর প্লাবনের সময় সেই খাল দিয়ে ঢোকে কচুরিপানা। গ্রামকে গ্রাম ছেয়ে যায় কচুরিপানায়। ফসল নষ্ট করে সর্বসাধারণের। প্রতিকারের একমাত্র উপায় খালের মুখ বন্ধ করা ও তারপরে কচুরিপানা উচ্ছেদ করা। ষাটখানা গ্রামের লোক শ্রমদান করতে রাজি, কিন্তু খালের মুখ বন্ধ করতে গেলে সরকারের অনুমতি না নিলে নয়। সরকার শুনছেন না।

বিনু খবর নিয়ে জানতে পারে সরকারি নীতি হচ্ছে নদীনালার জলকে অবাধে বহতা রাখা। বাঁধ দেওয়া বারণ। বিনু জেলাশাসকের সঙ্গে দেখা করে। সবাই মিলে পরামর্শ করে এই স্থির হয় যে, বেসরকারি ভাবে বাঁধ বাঁধার সময় লোহার কপাট বসাতে হবে। সেটা মাঝে মাঝে খুলে দেওয়া হবে। তারপর বন্ধ করে দেওয়া হবে। দায়িত্ব সরকারের নয়—গ্রামবাসীদের। জেলাশাসক তাঁর দাতব্য তহবিল থেকে কিছু টাকা দেন। স্লুইস গেট কেনা হয়। এইবার আস্তান মোল্লা দেখিয়ে দেয় তার কেরামত। ষাটখানা গাঁয়ের হাজার হাজার মরদ এসে শ্রমদান করে বাঁধ বাঁধে। স্লুইস গেট বসানো হয়। এরপরে সবাই মিলে কচুরিপানা উচ্ছেদ করে। স্থানীয় নেতৃত্বে পল্লীর জনগণ কীই না সাধন করতে পারে! তবে সরকারকেও দরদী হতে হয়।

এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে বিনুর প্রত্যয় দৃঢ় হল যে সদাশয় রাজপ্রতিনিধিরা উপর থেকে তাঁদের আদর্শ চাপিয়ে দিতে গেলে সাড়া পান না। কিন্তু উদ্যোগটা যদি তলা থেকে আসে আর লোকে শ্রমদানে অগ্রসর হয় তবে সরকারের সামান্য অনুদানেও আশ্চর্য সাড়া পাওয়া যায়। সেন্ট্রাল হাইস্কুলের আইডিয়াটা জেলাশাসকের। কালচার আর এগ্রিকালচারের সংযোজনটা মহকুমাশাসকের। দুটোই উপর থেকে চাপানো। ওঁরা যেই বদলি হয়ে গেলেন ওঁদের স্থাপিত প্রতিষ্ঠান কায়েমী-স্বার্থের প্রতিরোধে অকর্মক হয়।

তবে আশ্চর্যের ব্যাপার, বদলি হতে হতে বিনু যখন অন্য এক জেলার শাসক তখন তার লঞ্চের সহযাত্রী বাংলার গভর্নরের শাসন পরিষদের সদস্য খাজা সার নাজিমউদ্দীন খানা টেবিলে বসে অযাচিতভাবে তাকে বলেন, সরকার তার সেই স্কুলের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। ততদিনে বিনুর মন উঠে গেছে। সে নির্বিকার।

এর চেয়েও আশ্চর্য ঘটনা ঘটে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরে মুজিব সরকারের নিমন্ত্রণে বিনু যখন ভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলের সদস্য হয়ে ঢাকায় যায়। খানা টেবিলে বসে শিক্ষাসচিব তাকে বলেন তার সেই কৃষিশিক্ষাসংযুক্ত উচ্চ বিদ্যালয়ের আইডিয়া নতুন সরকার গ্রহণ করেছেন। বিনু অভিভূত হয়। সময়ের ব্যবধান ১৯৩২ থেকে ১৯৫৫। তেতাল্লিশ বছর। ব্যক্তির জীবনে খুব বেশি, জাতির জীবনে খুব বেশি নয়।

স্রষ্টা বিনুর সঙ্গে ছিল দ্রষ্টা বিনু। তার কাজ জীবনের বিভিন্ন ও বিচিত্র দিক নিরীক্ষণ করা। আই সি এস তাকে যত বেশি সুযোগ দিয়েছিল তত বেশি বোধহয় আর কোনো জীবিকা দিত না। তবু তার মনে একটা অতৃপ্তি ছিল। সে আরো কত কী দেখতে চায়, দেখতে পাচ্ছে না। আরো কত কী করতে চায়, করতে পারছে না। ইউরোপের সেই দু'বছর তো আর ফিরে আসবে না। তার প্রভাব বিনুকে আচ্ছন্ন করেছিল। সে যেখানেই বদলি হোক না কেন, তার ইউরোপীয় স্মৃতি তার সঙ্গে সঙ্গে যায়, তার উপন্যাসকে রস ও রসদ যোগায়। ঠিক সেই রকম অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের মফস্বলে হবার নয়, বিনু তাই অতৃপ্ত। অথচ যা দেখছে, যা শিখছে তাও তো তাকে ভরিয়ে তুলছে। কে জানে হয়তো সাহিত্যের

পাথেয় হবে। সে কী লিখবে তা বেছে নিতে পারে, কিন্তু কোথায় বদলি হবে, কী দেখবে, কী করবে তা বেছে নিতে অপারগ।

দিনমান মামলা মোকদ্দমা করা পছন্দ নয়, মনে হয় সময়ের অপচয়, জীবনের ক্ষতি। কিন্তু সেই সূত্রে কতরকম চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। যারা খারাপ তাদের মধ্যেও কিছু সদ্‌গুণ আছে। যেমন দস্যু রত্নাকরের মধ্যে বাল্মীকির কবিপ্রতিভা। বিনুকে জেলখানা পরিদর্শনেও যেতে হত। কষ্ট হত কয়েদীদের দেখে। দণ্ড ভোগ করে যারা মুক্তি পেত তারা কাজ না পেয়ে আবার ফিরে যেত। কী দুর্ভাগ্য!

বিনুর জ্বলন

দেশে ফিরে আসার পরেও বিনুর অন্তরে বিশেষ একপ্রকার জ্বলন, যা সে বয়ে নিয়ে এসেছিল প্রবাস থেকে। পারিবারিক জীবনে সে যতদূর সুখী হতে পারা যায় ততদূর সুখী। চাকরিতে কেউ কোনোদিন সুখী হয়নি, সেও নয়, কিন্তু মোটের উপর ভালোই লাগছিল তার। সামান্য হলেও লোকের কিঞ্চিৎ হিতসাধন করতে পারছিল। আর তার সাহিত্যের কাজ ব্যাহত হলেও বন্ধ ছিল না। বই প্রতি বছরই বার হচ্ছিল।

যে আগুন সূর্য তারকায় জ্বলছে সে আগুন বিনুর অন্তরেও জ্বলছিল, নইলে তার সৃষ্টিকর্ম থেমে যেত। কিন্তু এ জ্বলন সে সৃজনের জ্বালা নয়। এটা একজন স্রষ্টার নয়, একজন চিন্তাশীল মানুষের। সে ভারতে বাস করলেও তার নিঃশ্বাস বায়ু আসছে দিগ্‌দিগন্ত থেকে। তার চক্ষের আলোও সারা আকাশ থেকে।

আধুনিক যুগের সমস্যাগুলো এক দেশে নিবদ্ধ নয়। কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। বিলেত থেকে আসার আগেই সে জানতে পেরেছিল ডিপ্রেশন বা মন্দা শুরু হয়ে গেছে। তার বান্ধবী একদিন বলেন, খরচ না কমালে নয়, তাই সাপ্তাহিক 'স্পেক্‌টেটর' পত্রিকার চাঁদা বন্ধ করতে হচ্ছে। মন্দা ক্রমে ক্রমে ভারতের বাজারে এসে হাজির হয়। পাটের দাম পড়ে যায়। প্রজারা জমিদারদের খাজনা দিতে গাফিলতি করে। জমিদাররা সরকারের রেভিনিউ দিতে কসুর করেন। একদিন সরকার থেকে নির্দেশ আসে কর্মচারীদের মাইনের শতকরা দশভাগ কাটা যাবে। জেলাশাসকেরও। বিনুরও।

জেলাশাসক বিনুকে বলেন, 'আমাকে দেখছি পাইপ টানা ছাড়তে হবে। তামাক কেনার টাকা ছাড়া আর কিছু ছাঁটাই করতে পারছিনে।"

তিনিও বিবাহিত ও সসন্তান। একজন ইংরেজেরই এই দশা। বিনুও বিবাহিত, তবে তখনো পিতা হয়নি। এমনিতেই টান পড়ছে ভাইকে বিদেশে সাহায্য করতে গিয়ে। মীরা নিজেই রাঁধে। তাকে জোগান দেয় গাঁজা সোসাইটির দেওয়া একটি পিয়ন। নাম সুখলাল। ধুতি পরে, চেহারাও হিন্দুর মতো। দাড়ি নেই। কে বলবে সে মুসলমান? এ তথ্য জানতে বিনুর দেড় বছর লাগল। অন্য এক মহকুমার চাপরাশি বাদলের বেলাও তাই। এসব নাম হিন্দু মুসলমান উভয়েরই।

মন্দার দ্বারা আক্রান্ত জার্মানিতে দেখতে দেখতে ষাট লক্ষ শ্রমিক বেকার হয়। সোশিয়াল ডেমক্রাট সরকারের পতন ঘটে। ঘটায় ডানদিক থেকে নাৎসীরা, বামদিক থেকে কমিউনিস্টরা একযোগে। কিন্তু ক্ষমতায় আসে কেবল নাৎসীরাই। কমিউনিস্টরা পালিয়ে

বাঁচে। বিনু এ খবর পেয়ে বিচলিত হয়।

ডেমোক্রেসি জার্মানিতে ধোপে টিকল না। সোশিয়ালিজম এখন ন্যাশনাল সোশিয়ালিজম মূর্তি ধরে এল। রাশিয়ার মতো জার্মানিতেও ডিক্টেটরশিপ। অথচ প্রোলিটারিয়ান নয়। তবে তাদেরও সায় আছে। সৈন্যসংখ্যা বহুত বাড়িয়ে দেওয়ায় বেকার সংখ্যা কমেছে। যুদ্ধোপকরণ নির্মাণের জন্যে কলকারখানা দিনরাত ব্যাপৃত, তাই শ্রমিকদেরও অনেকের বেকার দশা ঘুচেছে। রাস্তা তৈরি হচ্ছে বিরাট আকারে। তাতেও বিস্তর শ্রমিকের কর্মসংস্থান হচ্ছে। হিটলারি দাওয়াইয়ে মন্দার চিকিৎসা সেটা মন্দ হলেও মন্দের ভালো। বুদ্ধিজীবীদের অনেকের ধারণা।

বিনু তো বিকল্প সমাধান বাতলাতে পারছে না। তাই মনে মনে জ্বলছে। ওদিকে স্পেনের গণতান্ত্রিক সরকারকে গদিচ্যুত করার জন্যেও দেশের ফ্যাসিস্টরা সংগ্রামরত। ইংলন্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ থেকে গণতন্ত্রের পক্ষপাতীরা সেদেশে লড়তে যাচ্ছেন। গিয়ে দেখছেন কমিউনিস্টরাও নানা দেশ থেকে সমাগত। বিশেষ করে রাশিয়া থেকে। মিলে মিশে লড়লে ফাসিস্টদের হারিয়ে দিতে পারা যেত। কিন্তু গণতন্ত্রীদের সঙ্গে কমিউনিস্টদের বিরোধ বাধে। মাঝখান থেকে ফাসিস্টদেরই জিৎ। আরো এক ডিক্টেটরশিপ। বিনুর আরো কষ্ট হয়।

মুসোলিনির দম্ভের সীমা নেই। তিনি আবিসিনিয়া জয় করে তাঁর ফাসিস্ট শক্তি বর্ধন করবেন। বিনু ভেবেছিল ইংরেজ ফরাসিরা বাধা দেবে। কেউ যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে চান না। মিউনিকে হিটলারের পায়ে চেকদের বলি দিলেন চেম্বারলেন ও দালাদিয়ের। বিনু চেকদের জন্যে বিষাদ বোধ করে। ইংরেজ ও ফরাসিদের ধিক্কার দেয়।

জার্মানরা এক-এক ধাপ করে যুদ্ধের দিকে এগোচ্ছে এটা তো বেশ স্পষ্ট। কিন্তু তারা যদি সোভিয়েট ইউনিয়নের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার মিত্র হবে কারা? মিউনিকের ভীত ইংরেজ ফরাসি নেতারা? সোভিয়েটকে সাহায্য করা মানে তো কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের জিতিয়ে দেওয়া। কে তেমন সিদ্ধান্ত নেবে?

অপরপক্ষে নাৎসীদের জিততে দেওয়াও বিপজ্জনক। পূর্বে নিষ্কণ্টক হয়ে ওরা পশ্চিমের উপর চড়াও হবে। কে তেমন ঝুঁকি নেবে? ইংরেজ ফরাসিরা শঙ্কিত। রম্যাঁ রলাঁ গত মহাযুদ্ধে শান্তিবাদী ছিলেন। এবার তিনি নাৎসীদের আক্রমণ থেকে শ্রমিকদের রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্যে অস্ত্রধারণের পক্ষপাতী। কমিউনিস্টরা মানবের মঙ্গলের জন্যে অনেক কিছু করেছে ও করবে। নাৎসীরা দানব।

বিনু এই ধাঁধার জবাব খুঁজে পায় না। সে ডিক্টেটরশিপমাত্রের বিরোধী। তবে ফাসিস্ট ও কমিউনিস্ট এই দুই মতবাদের মধ্যে দ্বিতীয়টাই ভালো। সে রলাঁর সঙ্গে একমত। কিন্তু স্টালিন যেভাবে বিচারের প্রহসন করে তাঁর নিজের দলের অন্যান্য নেতাদের নিধন ঘটালেন তা বিনু সমর্থন করেনি। সেটাও তার অন্তরের জ্বলনে ইন্ধন জুগিয়েছে। কমিউনিজমের উপরে তার শ্রদ্ধা আর আগের মতো নয়। এ রকম চলতে থাকলে কমিউনিস্টদেরও পতন হবে।

অদ্ভুত ব্যাপার, জ্বলনের সঙ্গে সঙ্গে ছিল একপ্রকার অ-সুখ। ইংরেজিতে যাকে বলে malaise। ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে বলেন তার কিছুই হয়নি। সে সম্পূর্ণ সুস্থ। সরকারি কাজকর্ম ঠিকমতো করে। সাহিত্যের কাজও। অতএব মানসিক অসুখ নয়। নিয়মিত টেনিস

খেলে। অতএব কায়িক অসুখ নয়। কিন্তু বিনু জানে ওটা অ-সুখ। ওর মূলে আবার এক মহাযুদ্ধের আশঙ্কা আর সভ্যতার বিলোপ। বর্বরতার দিকে উভয় পক্ষেরই গতি। যারা জিতবে তারাও হিংস্রতার শরণ নেবে।

ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার রোগই হল অনিয়ন্ত্রিত উৎপাদন ও বন্টন। তার ফলে সমাজের একটা বৃহৎ অংশের দুর্ভোগ। এরা হয় বেকার, নয় বঞ্চিত, নয় মজুরি-দাস। সমাজতন্ত্র এদের জন্যে আশার বাণী বহন করে এনেছে, কিন্তু তার অর্থ কি এই যে সেই বৃহৎ অংশটা সর্বেসর্বা হয়ে সমাজের উপর চিরকাল কর্তৃত্ব করবে? অন্যেরা তা মাথা পেতে নেবে? বিদ্রোহ করবে না? গৃহযুদ্ধ বাধবে না? কিন্তু মুশকিল হচ্ছে তারাও হতে চায় সর্বেসর্বা, অপরের উপর ডিক্টেটর। ধনতন্ত্র বনাম সমাজতন্ত্রের হুংকারে গণতন্ত্রের কণ্ঠস্বর শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। অনেকেরই ধারণা গণতন্ত্র সকলের সবার্থসাধক নয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধির জন্যে কল্পিত।

বিনুকে সত্যের খাতিরে স্বীকার করতে হচ্ছে যে আধুনিক যুগে সকলে ভোট দেবার অধিকারী হলেও সব প্রতিনিধিই সরকার গঠন করেন না। যাঁরা অধিকাংশের আস্থাভাজন তাঁরাই সরকার গঠন করেন। অন্যেরা হন বিরোধী পক্ষ। সরকার পক্ষ আস্থা হারালে বিরোধী পক্ষ তাঁদের স্থান নেন। নির্বাচনের সূত্রে ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটে। সাধারণত চার-পাঁচ বছর অন্তর। কিন্তু ডিক্টেটরশিপের বেলা তেমন কোনো সময়সীমা বা দ্বিপাক্ষিকতা নেই। নির্বাচন সূত্রে আস্থানির্ণয়ও নেই। জোর যার মুলুক তার। সরকারের পেছনে দেশের অধিকাংশ লোক আছে কি না তার প্রমাণ নেই। জোর সেক্ষেত্রে ভোটের জোর নয়, জোটের জোর। কিংবা গায়ের জোর।

গণতন্ত্র বিভিন্ন দলকে শাসনের সুযোগ দেয়। কিন্তু দল যদি শ্রেণীর বা সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে গঠিত হয় তা হলে বিপক্ষের বিপত্তি। সেই বিপত্তির আখ্যা ওদেশে কমিউনিজম, এদেশে কমিউনালিজম। দলপতিরা ক্ষমতা হাতে পেলে নিজেদের শ্রেণীর বা সম্প্রদায়ের স্বার্থকেই দেশের বা জাতির স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দেবেন। গণতন্ত্রের কাঠামোর ভিতরে থেকেও দলতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

ভারতের মাটিতে পঞ্চায়েতী গণতন্ত্রের শিকড় ছিল, কিন্তু পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের ঐতিহ্য ছিল না। সেটা ব্রিটিশ শাসনের প্রবর্তন। বিনুর বিশ্বাস স্বাধীনতাব পর সংবিধান প্রণয়নের সময় যখন আসবে তখন দু'রকম গণতন্ত্রের সমাহার করতে পারা যাবে। কিন্তু শ্রেণীর বা সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে নয়। তা না হলে ভারত ভাগ হয়ে যেতে পারে। বহু শতাব্দী পরে ভারত এক শাসনাধীন হয়েছে। সেটা পরাধীনতা। তার অবসান হোক। কিন্তু তার সুফল যেন অটুট থেকে যায়। দেশ যেন বল্‌কান না হয়। তুরস্কের অধীনতার শেষে ইউরোপে যা হয়েছে।

বিনুর উপরওয়ালা ইউরোপীয় জেলা জজ তাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, "প্রাদেশিকতার থেকে সাবধান। খ্রিস্টেনডমকে ভেঙে যেতে দিয়ে আমাদের কী পরিণাম হয়েছে দেখছেন তো। একরাশ নেশন স্টেট, নিত্য কলহ, বার বার যুদ্ধ।' তাঁর বক্তব্য সমর্থন করেন ইংরেজ কমিশনার। এঁরা ভারতের হিতৈষী। সম্প্রতি প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হয়েছে, প্রাদেশিকতার বিষময় ফল মধ্যপ্রদেশে দেখা যাচ্ছে। সেখানে মরাঠীভাষী ও হিন্দিভাষী কংগ্রেস মন্ত্রীদের অন্তর্দ্বন্দ্ব। হাইকমান্ডের হস্তক্ষেপ।

ছুটি নিয়ে বিনু সপরিবারে বোম্বাই যায়, সেখান থেকে আরো কয়েকটি জায়গা ঘুরে মাদ্রাজ, সেখান থেকে জাহাজে সিংহল, রেলপথে আবার মাদ্রাজ হয়ে কোচিন। বোম্বাইতে দেখে মরাঠী ও গুজরাটীর বিরোধ। মাদ্রাজে তামিল তেলুগুর বিবাদ। সর্বত্র ভাষাভিত্তিক প্রাদেশিকতার কলহ। ভারতীয়রা একটা নেশন—এ বোধ দুর্বল। এক সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই। এ ছাড়া তো মুসলমান খ্রিস্টান আছে।

সুদীর্ঘকাল অহিংস সংগ্রাম চালাবার পর কংগ্রেস যখন নির্বাচনে জিতে বেশিরভাগ প্রদেশে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে তখন আইনের অক্ষর মেনে নিয়ে একজন বা দুজন করে মুসলিম মন্ত্রী করা হয় কংগ্রেস থেকেই। অথবা নির্দলীয় একজনকে। আইনের স্পিরিট মানলে মুসলিম লীগ থেকে মন্ত্রী নিতে হত। কারণ আইনসভাগুলির অধিকাংশ মুসলিম সদস্যই লীগপন্থী। ব্যতিক্রম উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। এতে জিন্না সাহেব ক্ষেপে যান। তাঁর দলটিও রুষ্ট। লীগই নাকি গোটা মুসলিম সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেস এটা স্বীকার করে না। দুই দলের মধ্যে সন্ধি অসাধ্য হয়। বিগ্রহই সুনিশ্চিত।

কংগ্রেসের ভিতরেই দেখা গেল দক্ষিণপন্থী বনাম বামপন্থী নামক দুই উপদলের দ্বন্দ্ব। কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনে বামপন্থীরা সুভাষচন্দ্রকে অধিকাংশ ভোটে জিতিয়ে দেয়।

আসলে তা কংগ্রেস হাইকমান্ডের উপর অনাস্থাজ্ঞাপন। কংগ্রেস সভাপতি হলেও সুভাষচন্দ্র হাইকমান্ডের একজন ছিলেন না। হাইকমান্ড তাঁর সঙ্গে পরামর্শ না করেই প্রাদেশিক মন্ত্রীদের পরিচালনা করতেন। দ্বিতীয়বার সভাপতি হয়ে সুভাষচন্দ্র ওয়ার্কিং কমিটিকে ঢেলে সাজাতেন, হাইকমান্ডেরও অধিনায়ক হতেন। দক্ষিণপন্থীদেরও ওয়ার্কিং কমিটিতে নিতেন, হাইকমান্ডেও রাখতেন। কিন্তু তাঁদের পরাজয়ের গ্লানি মুছত না। তাঁরা সদলবলে ফিরে না এলে সহযোগিতা করতে অসম্মত হন। শুধুমাত্র বামপন্থীদের নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি গড়তে সুভাষচন্দ্রও অনিচ্ছুক। তিনি গদিত্যাগ করেন। রাজেন্দ্রপ্রসাদকে সভাপতি করা হয়। তাঁর নির্দেশ অমান্য করেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র। গান্ধীজী কংগ্রেসের ঐক্য বজায় রাখার জন্য সুভাষচন্দ্রকে ছয় বছরের জন্যে বহিষ্কার করার পরামর্শ দেন। সুভাষচন্দ্র নিজের দল গড়েন।

এরপরে যুদ্ধের ইসুতে কংগ্রেস মন্ত্রীরা ইস্তফা দেন। হাইকমান্ডের পরিচালনের ক্ষমতা যায়। গোটা যুদ্ধকালটা কংগ্রেস শাসনক্ষমতাহীনভাবে কাটায়। মুসলিম লীগ দেখে কংগ্রেস শাসনের শূন্যতা পূরণ করল গভর্নরের শাসন। কেন্দ্রেও একদিন কংগ্রেস মন্ত্রীরা পদত্যাগ করলে তাঁদের শূন্যতা পূরণ করবেন রাজপুরুষগণ। কংগ্রেসরাজের বিকল্প ব্রিটিশরাজ। ব্রিটিশরাজের বিকল্প কংগ্রেসরাজ। তা হলে মুসলিম লীগের ভবিষ্যৎ কী? এর উত্তর পাকিস্তান অর্জন। সন্ধিসূত্রে না হলে বিগ্রহসূত্রে।

বিনু উপলব্ধি করে মহাযুদ্ধের পরে বাধবে গৃহযুদ্ধ। তার থেকে পরিত্রাণের উপায় কি ব্রিটিশ শাসনের চিরস্থায়িত্ব? না। অন্তঃপরিবর্তন। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের। সর্বস্তরে ও সর্বত্র উভয়ের কোয়ালিশন। কংগ্রেসই সর্ব ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান নয়। মুসলিম লীগ সর্ব মুসলমানের একমাত্র প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান নয়। ব্রিটিশরাজের শূন্যতা পূরণ কোনো একটি দলের একান্ত সাধ্য নয়। না কেন্দ্রের, না প্রদেশের। কিন্তু পরস্পরের মধ্যে সমঝোতা হলে কোয়ালিশনের সাধ্য।

কোয়ালিশন গভর্নমেন্টের অপর নাম ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট। ওদেশে সেইরকম একটি

গভর্নমেন্ট গঠিত হয়ে থাকে যুদ্ধকালে। এদেশেও হতে পারে। তা হলে ধরে নিতে হয় যে ভারতীয়রাও একটি নেশন। অথচ এ বিষয়ে তীব্র মতভেদ লক্ষ করা যাচ্ছে। হিন্দু মহাসভার মতে হিন্দুরাই নেশন। মুসলমানরা বহিরাগত বিদেশী অধিবাসী। রেসিডেন্ট এলিয়েন। মুসলিম লীগ বলছে মুসলমানরা আলাদা একটা নেশন। হিন্দু ও মুসলমান দুই নেশন। দুই নেশনের জন্যে চাই দুই কেন্দ্রীয় সরকার। এসব কথা শুনলে বিনুর বুক জ্বলে যায়। এসব সত্য হলে ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট কী করে সম্ভব!

যুদ্ধে যোগদান নিয়েও তীব্র মতভেদ। গান্ধীজী যুদ্ধে বিশ্বাস করেন না। তিনি স্বয়ং যুদ্ধে যোগ দেবেন না, কিন্তু কংগ্রেস যদি দিতে চায় তিনি বাধা দেবেন না। কংগ্রেস নেতারা যুদ্ধে যোগদানে রাজি হবেন যদি ব্রিটেন প্রতিশ্রুতি দেয় যে যুদ্ধের পরে ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটবে ও আপাতত একটা অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হবে। সুভাষচন্দ্র চান আগে স্বাধীনতা, তার পরে যুদ্ধে যোগ দেওয়া না দেওয়ার সিদ্ধান্ত। মুসলিম লীগ যেখানে ক্ষমতাসীন সেখানে সহযোগিতা করবে, অন্যত্র অসহযোগ, যদি না স্বতন্ত্র বাসভূমির আশ্বাস পায়। এসব কথা শুনে বিনু অস্বস্তি বোধ করে। তা হলে কি যুদ্ধের প্রশ্নে একমত হওয়া একেবারেই অসম্ভব? ওদিকে ইংরেজরা তাদের নিজেদের দেশেই বিপন্ন। এসব দাবিদাওয়া সময়োচিত নয়।

তার আপনার মধ্যেও একটা মন্থন চলছিল। গত মহাযুদ্ধে ভারত ধন জন ও উপকরণ মুক্তহস্তে জোগায়। লক্ষ লক্ষ জোয়ান প্রাণ দেয়। খেতে না পেয়ে কত লোক মারা যায়। বিনুকেও আধপেটা খেতে হয়। পরিবর্তে ভারত যা লাভ করে তা ব্রিটিশ কর্তাদের কথার খেলাপ। তাই অসহযোগ আন্দোলনে নামতে হয়। এবারেও কি কথার খেলাপ হবে না? ব্রিটিশ কর্তাদের বিশ্বাস কী? অথচ ওদিকে যুদ্ধবাজ জার্মানদের রুখবে কে? ভারত থেকে সিপাহী না গেলে একা ইংরেজ সেনার সাধ্য নয়। নাৎসীদের রুখতে না পারলে ওরা তো ইউরোপ জয় করবেই, এশিয়ার দিকে অগ্রসর হবে। ভারতও বিপন্ন হতে পারে। গান্ধীজী অবশ্য অকুতোভয়। হিংসা যত বলবান হোক না কেন অহিংসা তার চেয়েও বলবান। বল পরীক্ষার জন্যে তিনি প্রস্তুত। কিন্তু সেকথা কি দেশবাসীদের বলা সাজে! হিটলার আকাশ থেকে নামলে ওরা কি লড়বে না পায়ে পড়বে?

আচমকা জার্মান-সোভিয়েট চুক্তির খবর শুনে বিনু ঘাবড়ে যায়। তার মানে কি এই যে জার্মানরা পশ্চিম ফ্রন্টে যুদ্ধ করুক, পূর্ব ফ্রন্টে নয়? এদেশের হিটলার বিরোধীরা এতদিন স্টালিনের উপর ভরসা রেখেছিলেন। আর কেউ না রুখুন স্টালিন রুখবেন। বিনুও তাঁদের একজন কিন্তু এমনও হতে পারে যে, যা শত্রু পরে পরে। যুদ্ধে মরুক ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান। অক্ষত থাকুক সোভিয়েট জনগণ। কিন্তু পরে দেখা গেল জার্মানরা ফরাসীদের হারিয়ে দেবার পর রাশিয়ানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাদের মতলবের খবর স্টালিনকে জানিয়েছেন চার্চিল। চার্চিল ও স্টালিন একদিল। আগের বারের মতো আমেরিকাও জার্মানদের বিপরীত শিবিরে, অথচ ইটালী ও জাপান আগেরবারের মতো নয়, এবার তারা শিবির পরিবর্তন করেছে। তুরস্ক হয়েছে নিরপেক্ষ। জার্মানরা ইংলন্ড আক্রমণ করে শুধু বিমান থেকে বোমা ফেলে ক্ষতি যা করবার তা করেছে। যাঁরা বলতেন ইংলন্ডের দুর্যোগই ভারতের সুযোগ, তাঁদের থিসিস ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হয়। আর ভারতের কমিউনিস্টরা সোভিয়েট ইউনিয়নের মিত্রদের ভারতের মিত্র বলে তাদেরই পক্ষ অবলম্বন করে। বামপন্থীরা

পরস্পরের বৈরী হয়। আর দক্ষিণপন্থীরা তো সত্যাগ্রহে নেমে কারাগারে।

বিনু যখন দেশে ফিরে এসে চাকরিতে নিযুক্ত হয় তখনি তার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাকে কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, "আমরা চলে গেলে জাপান এসে ভারত দখল করবে। তখন তাকে রুখবে কারা? ভারতের সৈন্যবল থাকলে তো? সুতরাং এখন থেকেই স্বাধীনতা চাওয়া উচিত নয়।" বিনুর তখন বিশ্বাস হয়নি যে জাপান সত্যি সত্যি এতদূর আসবে, এত শক্তিশালী হবে। কিন্তু তেরো বছর যেতে-না-যেতেই জাপান এসে বর্মা দখল করে ফেলেছে। বর্মা তো ভারতেরই অঙ্গ ছিল। এখন স্বতন্ত্র হলেও ভারতের পূর্ব দুয়ার। বর্মার পরে পূর্ববঙ্গ ও আসাম।

সেসময় পূর্ববঙ্গে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের পদে বহাল থাকলে বিনুকে জাপানীদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হত, যদি তারা ঢুকত। ভাগ্যক্রমে সে পশ্চিমবঙ্গে জেলা জজ। তাকে একটি গোপন সার্কুলারে জানানো হয় যে জাপানীরা যদি আসে তবে সে প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত করে বিহারে চলে যেতে পারে। বিহারে তার এক বন্ধু কর্মরত ছিলেন। তিনি পরে তাকে বলেন গোটা বেঙ্গল গভর্নমেন্টটাই বিহারে আশ্রয় নিত। টেলিগ্রাম যেত—বেঙ্গল কামিং। দুজন ইউরোপীয় মিলিটারি অফিসারের সঙ্গে বিনুর আলাপ হয়েছিল। তাঁরাও বলেছিলেন যে তাঁরা পিছু হটতে হটতে রাঁচী পর্যন্ত যাবেন ও সেইখানে লাইন টানবেন।

কলকাতায় ব্ল্যাক আউট। বোমার ভয়। বহু লোক মফস্বলে নিরাপত্তার জন্যে সমাগত। কিন্তু মফস্বলটাও যদি জাপানীদের দখলে চলে যায় তবে নিরাপত্তা কোথায়! অধীনতা বরণ করে? সেই অগ্নিপরীক্ষার সময় কংগ্রেসী বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়। ক্রিপস উড়ে আসেন যে প্রস্তাব নিয়ে তা স্বাধীনতার খুব কাছাকাছি। কিন্তু জাপান যদি সত্যি সত্যি এগিয়ে আসত তা হলে ইংরেজরা পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন করে রেল লাইন, নদীর পুল, কলকারখানা, লোহার খনি প্রভৃতি ধ্বংস করে দিয়ে পিছু হটত। ইতিমধ্যেই নৌকা আটক করায় খাদ্য চলাচল বাধা পেয়েছিল। ইংরেজ সেনাপতিরা বলতেন এটা মিলিটারি নেসেসিটি। কিন্তু এর জন্যে দেশের লোক নতুন কেন্দ্রীয় সরকারকেই দোষী করত। হয়তো জাপানীরা ভারতে ঢুকত না, ঢুকলেও বেশি দুর এগোতে পারত না। তবু বলা তো যায় না। কংগ্রেস নেতারা ইংরেজ সেনাপতিদের নিরস্ত করার অধিকার চান। ক্রিপস বলেন ব্রিটেনের মিলিটারি হাইকমান্ড ভারতেও যুদ্ধ পরিচালনার জন্যে দায়ী। তাঁদের ক্ষমতা খর্ব করা চলবে না। আলোচনা ব্যর্থ হয়।

যুদ্ধকালে ক্ষমতা হস্তান্তরের কোনো আশা নেই দেখে কংগ্রেস গান্ধী-নেতৃত্বে আবার সংগ্রামে নামে। এর নাম কুইট ইন্ডিয়া আন্দোলন। গান্ধীজীকে জেলের বাইরে থাকতে দিলে তিনি হয়তো জনগণকে হিংসা থেকে নিবৃত্ত করতে পারতেন, কিন্তু সরকার সে ঝুঁকি নেন না। হিংসা চরমে ওঠে। প্রতিহিংসাও চরমে। সিপাহী বিদ্রোহের পর এমন ঘাত-প্রতিঘাত ভারতের ইতিহাসে ঘটেনি। সরকার কংগ্রেসকে হিংসার জন্যে দায়ী করেন। গান্ধীজী সরকারকে আরো বড়ো হিংসার জন্যে দায়ী করেন। মুসলিম লীগ আন্দোলনে অংশ নেয়নি। জিন্না মুসলমানদের তফাতে রাখেন। ওটা নাকি হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রাম। ইংরেজরা ভারত ছাড়লে যা হবে তা নাকি মুসলমানদের মনিব বদল। তাই গান্ধীজী যখন বলেন, কুইট ইন্ডিয়া, জিন্না সাহেব জুড়ে দেন ডিভাইড অ্যান্ড কুইট। ভাগ করো আর ত্যাগ করো। ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসির পরিণাম।

বিনু মনে মনে গান্ধীজীর পক্ষে, কিন্তু তিনি যখন বলেন, কুইট ইন্ডিয়া টু গড অর অ্যানার্কি, বিনু সায় দিতে নারাজ হয়। ভগবানই বা শূন্যতা পূরণ করবেন কোন্ উপায়ে? যদি রাজনৈতিক দলগুলি একজোট না হয়। আর অরাজকতার হাতে দেশকে সঁপে দিলে জজ ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশকে মানবে কে? সৈন্যরাই বা কার হুকুমে গুলি চালাবে? বাপু আশা করেন পনেরো দিনের মধ্যেই একটা নতুন সরকার গড়ে উঠবে। সম্ভবত কংগ্রেস-লীগ কোয়ালিশন সরকার। বিনুর বিশ্বাস হয় না যে প্রত্যেকটি প্রদেশে কোয়ালিশন না হলে কেবলমাত্র কেন্দ্রেই কোয়ালিশন হবে। না, অরাজকতা একদিনের জন্যেও নয়। চোর ডাকাত ধর্ষক ঘাতক জেল থেকে ছাড়া পেলে কী সর্বনাশ ঘটায় বর্মা থেকে চলে আসা এক বাঙালি অফিসার বিনুকে তার বিবরণ শোনান। ইংরেজরা জাপানীদের আসার আগে তাঁর হাতে ক্ষমতা সঁপে শহর ছাড়েন। তিনিও জাপানী অধিকর্তার হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে বিদায় নেন তিনদিন বাদে। মাঝখানের সেই তিনটি দিন তাঁর আয়ত্তের বাইরে। জেলখানা থেকে বেরিয়ে পড়ে দীর্ঘমেয়াদী কয়েদীরা। হাতে রকমারি হাতিয়ার, লুঠতরাজ, খুনজখম, ধর্ষণ ইত্যাদির অবাধ মওকা। পুলিশ বেপাত্তা। লোকে বলে এর চেয়ে জাপানী রাজত্ব ভালো। জাপানী সেনা পায় গণ-সম্বর্ধনা।

ত্রিশের দশকের ইউরোপীয় ঘটনাবলী রবীন্দ্রনাথকে হতাশ করেছিল। ইউরোপীয় সভ্যতা সম্বন্ধে তাঁর মোহভঙ্গ হয়েছিল। বিনুও উপলব্ধি করেছিল যে ইউরোপের কাছ থেকে চিন্তাজগতের নেতৃত্ব আশা করা বৃথা। প্রতীচ্য সভ্যতার দেউলিয়াপনা প্রকট। তা হলে কি প্রাচ্য সভ্যতার দিকে মুখ ফেরাতে হবে? প্রাচী বলতে জাপানও বোঝায়, চীনও। ওদের কাণ্ডকারখানা থেকে শেখবার কী আছে? জাপানীরা কী শেখাতে আসছে বর্মীদের, ভারতীয়দের?

বিনুর একমাত্র ভরসা এখন ভারত। ভারত বলতে গান্ধীজীর আদর্শ। তাঁর নৈতিক নেতৃত্ব। সারা বিশ্বের চোখে তিনি অহিংসার প্রতিমূর্তি। কিন্তু তাঁর কুইট ইন্ডিয়া আন্দোলনে হিংসার প্রাদুর্ভাব বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে তাঁর ভাবমূর্তিকে ম্লান করেছে। ইংরেজরা প্রচার করছে তিনি হিংসার সমর্থক। এটা খণ্ডন করা দরকার। কিন্তু আগা খানের প্রাসাদে বন্দী অবস্থায় কী করে তা সম্ভব? তাই তিনি একুশ দিন অনশনের সংকল্প নিয়েছেন। সরকার তাঁকে ছেড়ে দিতে চাইলে তিনি বলেন বাইরে গেলে তিনি অনশন নাও করতে পারেন। তার মানে মুক্তকণ্ঠে তাঁর বক্তব্য পেশ করবেন। তা শুনে সরকার তাঁকে ছাড় দেন না। তিনিও নাছোড়বান্দা। অনশনে ব্রতী হন।

বিনু ও মীরা কাউকে না জানিয়ে অনশন করে কিন্তু তিনদিনের বেশি চালাতে পারে না। আদালতে না বসার জন্যে বিনুকে জবাবদিহি করতে বলা হলে সে জানায় সে তার এক প্রিয়জনের জন্যে অনশন করেছিল। প্রিয়জনের নাম উল্লেখ করে না বলে তাকে সেই তিনদিনের জন্যে ছুটি নিতে বাধ্য করা হয়। সরকার তখন গান্ধীজীর সম্ভবপর সৎকারের জন্যে সচেষ্ট। তার সহযোগী জেলাশাসক একজন মুসলমান। তিনি তাকে জানান যে গান্ধীজীর মৃত্যু হলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হবে তা সামাল দিতে তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিনু তখন জেলা জজ। সেও যেন প্রস্তুত থাকে।

গান্ধীজী সে যাত্রা বেঁচে যান। চার্চিল ব্যাখ্যা করেন তিনি নাকি জল খাবার সময় পুষ্টিকর পদার্থ খেয়েছেন। আসলে যা খেয়েছেন তা লেবুরস। যাতে বমন রোধ হয়। তিনি

যে একুশদিন অনশন করেও বেঁচে রইলেন এতে প্রমাণ হল তাঁর নির্দোষিতা। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে লিকুইডেশনে না দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ চার্চিলের বিচারে নয়। বিনুর এক বন্ধুকে বাংলার লাটসাহেব হার্বার্ট বলেন, "মিস্টার চার্চিল ইজ নট ইংলন্ড"।

স্রোতের মাঝখানে ঘোড়াবদল করতে নেই। ইংরেজদের বক্তব্য আগে তো যুদ্ধ শেষ হোক, তারপর ভারতের সঙ্গে মীমাংসা হবে। আর ভারত বলতে শুধু হিন্দু নয় বা শুধু কংগ্রেস নয়। তার মানে মুসলমানদের সঙ্গে বা মুসলিম লীগের সঙ্গেও মীমাংসা করতে হবে। ইংরেজরা আশা করে এমন একটা মীমাংসা সূত্র মিলে যাবে যেটা ইংরেজ, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের গ্রহণযোগ্য হবে। শান্তিপূর্ণভাবেই ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটবে। বিনু ইংরেজদের মনোভাবে একটা পরিবর্তন লক্ষ করছিল। জাপানীদের হাতে বর্মায় ও মালয়ে বন্দী হওয়ার ফলে তাদের প্রেস্টিজ হানি হয়েছিল। পরে অবশ্য জাপানীরা হটে যায় ও ইংরেজরা ফিরে পায়। তবে তারা ভারতীয়দের চোখে অপরাজেয় থাকে না।

তাদের বরাত ভালো। রাশিয়া দেয় জার্মানিকে হারিয়ে আর আমেরিকা জাপানকে। রুজভেল্ট আর স্টালিনের সমকক্ষ হন কিনা চার্চিল। তিনজনে মিলে ইউরোপ ভাগাভাগি করেন। জার্মানি দুভাগ হয়ে যায়। বিনু জার্মানদের ভালোবাসত, যদিও নাৎসীদের নয়। জার্মানদের দশা দেখে তার মনে দুঃখ হয়। ওদিকে জাপানীদের উপর পারমাণবিক বোমা পড়েছে। হিরোশিমা ও নাগাসাকি ধ্বংস হয়েছে। নিরীহ বালবৃদ্ধবনিতা মরেছে বা মারাত্মক জখম হয়েছে। যদিও সেটা পার্ল হারবারের জন্যে শাস্তি তবু অমানবিক তো বটে। সভ্য মানবিক তো নয়ই। নৈতিকও নয়।

গান্ধীজী ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন এই যুদ্ধ শেষ হবে একটা মরাল ইস্যুতে। পারমাণবিক বোমার ব্যবহারই সেই মরাল ইস্যু। যুদ্ধ শেষ হল ঠিকই কিন্তু গ্লানি থেকে গেল যুদ্ধকালে অমানবিকতার। যে মূল্য দিয়ে জয় কেনা গেল সে মূল্য কি অত্যধিক নয়?

অথচ যুদ্ধ চলতে থাকুক এটাই বা কে চেয়েছিল? সবাই শান্তির জন্যে অধীর। লোকক্ষয় তো বড়ো কম হয়নি। একটু একটু করে জানাজানি হয় হিটলারের আদেশে জার্মানরা ষাট লক্ষ ইহুদীকে গ্যাস চেম্বারে পুরে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরেছে। এমন কাজ যারা করে তারা কি মানব না দানব না শয়তান? বিনু ভেবে পায় না। শত্রুতা কোন্ স্তরে নামলে মানুষ এমন কর্ম করতে পারে। তবে এর জন্যে গোটা জার্মান জাতিকে দায়ী করা যায় না। হাজার হোক ওরা গ্যেটে শিলার বাখ বেঠোফেন কান্ট হেগেলের জাতি।

যুদ্ধ শেষ হয়ে আসছে তার আভাস পেয়ে গান্ধীজী যান জিন্না সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। উদ্দেশ্য ভাইয়ে ভাইয়ে একটা ঘরোয়া মীমাংসা। কিন্তু সতেরো দিন একতরফা সাক্ষাতের পরও জিন্না সাহেবের সঙ্গে মত মেলে না। দুই ভাই নয়, দুই জাতি। যেমন জার্মান আর ফরাসী। মুসলমানদের দিতে হবে পাকিস্তান। নিজেরা রাখবে হিন্দুস্থান। ভারত একটা দেশ নয়, একটা উপমহাদেশ। উপমহাদেশে একাধিক নেশন থাকতে পারে। গান্ধীজী ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন। কংগ্রেসের হয়ে তিনি কথা দিতে পারেন না। সিদ্ধান্ত যা নেবার তা কংগ্রেস নেতারাই নেবেন। তিনি পরামর্শ দেবেন। তিনি বিশ্বাস করেন না যে মুসলমানরা ভারত ভাগের পক্ষে। তবে তিনি একথাও মানেন যে মুসলমানরা যদি একবাক্যে পাকিস্তান দাবি করে তা হলে তাদের বাধা দেবার শক্তি তাঁর নেই।

বিনু তার মুসলমান বন্ধুবান্ধব ও আলাপীদের মুখে দুরকম কথা শোনে। একজন

বলেন, "পাকিস্তান না গোরস্থান! মুসলমানের তাতে চূড়ান্ত ক্ষতি হবে।" আরেকজন বলেন, "ব্রিটিশরাজের পর কংগ্রেসরাজ মানে হিন্দুরাজ। মুসলমান কখনো হিন্দু রাজত্বে বাস করতে রাজি হবে না।" অন্যরা বলেন, "কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ মিলে-মিশে রাজত্ব করলে তো ল্যাটা চুকে যায়। ফিফটি ফিফটি।"

বিনুর ইচ্ছা করে একখানা বই লিখতে। ইংরেজিতে তার নাম হবে 'আনরিয়ালিস্টস'। অর্থাৎ অবাস্তববাদীরা। সব মুসলমান পাকিস্তানে গিয়ে বসবাস করতে পারে না। সেটা অবাস্তব। সব হিন্দু পাকিস্তান থেকে চলে আসতে পারে না। সেটাও অবাস্তব। শতকরা সত্তর আর শতকরা বাইশ কখনো ফিফটি ফিফটি হয়ে সরকার চালাতে পারে না। সৈন্যদল গড়তে পারে না। সিভিল সার্ভিসও না। নেতারা যদি রাজি হন নেতৃত্ব হারাবেন। ওয়েটেজ মেনে নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু প্যারিটি কখনো নয়।

তা হলে কি ব্রিটিশ রাজত্ব অনন্তকাল? না, তাও চলতে পারে না। যুদ্ধে ইংরেজরা জিতলেও নির্বাচনে চার্চিল হেরেছেন, সদলবলে। লেবার পার্টির প্রধান মন্ত্রী অ্যাটলি ভারতবন্ধু। তিনি ব্রিটিশ রাজত্ব গুটিয়ে নিতে চান। বিনু যতদূর বুঝতে পারে সেটাই ব্রিটেনের অধিকাংশ মানুষের মত। ইংরেজদের যেটা প্রয়োজন সেটা বাণিজ্য। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী। যুদ্ধে তাদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। পূরণ করতে হলে বাণিজ্য বিস্তার চাই। চাই সাম্রাজ্য সংকোচন। শুধু ভারত থেকে নয়, বর্মা থেকে সিংহল থেকে, আরো অনেক দেশ থেকে সৈন্য অপসারণই ব্রিটিশ পলিসি। সৈন্যদের মোতায়েন করতে হবে পশ্চিম জার্মানিতে। সোভিয়েট ইউনিয়নের সৈন্যদের মুখোমুখি। তারা এখন পূর্ব জার্মানিতে জাঁকিয়ে বসেছে। যে-কোনো দিন লাইন পার হতে পারে। ব্রিটেনের এত বেশি সৈন্য নেই যে একদিকে সোভিয়েটকে সামলাবে, আরেকদিকে সাম্রাজ্যকে। অ্যাটলি শুধু একজন আদর্শবাদী নন, তিনি একজন বাস্তববাদীও।

বিনু একদিন শুনতে পায় তার ইউরোপীয় সিভিলিয়ান সহযোগীরা ক্ষতিপূরণ পেলে ভারত ছাড়বার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। মিশর থেকে ইংরেজরা যখন চলে যান তখন যে হারে ক্ষতিপূরণ পান সে হার নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছেন। ক্ষতিপূরণ কি শুধু ইংরেজরাই পাবেন। ভারতীয়রা নয়? বিনুও কি পেতে পারে না? তা হলে তো তার চাকরিতে থাকার দরকার হয় না। ইংরেজদের ভারত ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেও চাকরি ছাড়বে। ক্ষতিপূরণ না পেলেও আনুপাতিক পেনশন তো এখন ভারতীয়রাও পেতে পারবে।

প্রতি তিন বছর অন্তর লম্বা ছুটি নিয়ে দেশে ঘুরে আসাই ব্রিটিশ অফিসারদের নিয়ম। কিন্তু যুদ্ধকালে এই নিয়ম কার্যকর হয় না। ফলে সবাই ছ'বছর ভারতে আটক থাকেন। কেউ কেউ সাত-আট বছর। এখন সবাই চান একই সময়ে ছুটি নিতে। তা তো সম্ভব নয়। অনেকেই চান ছুটির পর অবসর নিতে। যুদ্ধোত্তর ব্রিটেনে চাকরির বাজারে বহু জায়গা খালি ছিল। অবসর নিয়ে যাঁরা যাবেন তাঁরা ইচ্ছা করলে সহজেই চাকরি পেয়ে নতুন জীবন আরম্ভ করবেন। দেরি করলে সেসব পদ শূন্য থাকবে না। তাই ইউরোপীয় অফিসারদের মধ্যে একটা অধীরতা দেখা দিয়েছিল। তাঁরা ব্যগ্র হয়ে অপেক্ষা করছিলেন কবে তাঁদের ক্ষতিপূরণের দায় ব্রিটিশ তথা ভারত সরকার উভয়েই স্বীকার করবেন। ভারত সরকার মানে ভারতীয় রাজনীতিকদের সরকার। যার সদস্যদের মধ্যে থাকবেন কংগ্রেস, লীগ ও অন্যান্য দলের প্রতিনিধিরা। তেমন একটি সরকারের নাম ইন্টারিম গভর্নমেন্ট।

ইন্টারিম গভর্নমেন্টের সঙ্গে সঙ্গে গঠিত হবে কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি। তার কাজ হবে নতুন সংবিধান রচনা। যে সংবিধান রচিত হবে তা ব্রিটিশ সরকার মেনে নেবেন। সেই অনুসারে ক্ষমতার হস্তান্তর হবে। ভারত যদি ইচ্ছা করে কমনওয়েলথের ভিতরে থাকবে। নয়তো বাইরে যাবে।

কিন্তু সমস্ত নির্ভর করছে কংগ্রেস-লীগ ঐকমত্যের উপরে। মুসলিম লীগ যদি কংগ্রেসের প্রস্তাব নাকচ করে বা কংগ্রেস মুসলিম লীগের প্রস্তাব তা হলে ব্রিটিশ সরকার কার হাতে ক্ষমতার হস্তান্তর করবেন? ভগবানের বা অরাজকতার হাতে! তা হলে ক্ষতিপূরণ দেবে কে? পেনশনই বা কার কাছ থেকে পাওয়া যাবে?

জিন্না সাহেবের দাবি হিন্দু মুসলিম প্যারিটি। কংগ্রেস তাতে নারাজ। বড়োলাট লর্ড ওয়েভেলও কংগ্রেসকে বাধ্য করেন না। স্থির হয় হিন্দু প্রতিনিধিদের সংখ্যা হবে ছয়, মুসলিম প্রতিনধিদের পাঁচ। জিন্না এর পরে দাবি করেন মুসলিম লীগই খ্রিস্টান ও পার্শী প্রতিনিধি মনোনয়ন করবে। আর কংগ্রেস করবে শিখ প্রতিনিধি মনোনয়ন। বড়োলাট সেটা খারিজ করেন।

এর পর কংগ্রেস তার প্রাপ্য ছয়টি আসনের একটি একজন সংগ্রামী মুসলমানকে দিতে চায়। লীগের তাতে ঘোর আপত্তি। লীগই নাকি তামাম মুসলিম সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিনিধিমূলক দল। বড়োলাট কংগ্রেস নেতাদের বিনীতভাবে অনুরোধ করেন তাঁদের জন্যে নির্দিষ্ট আসনের মধ্যে একজন মুসলমানকে না নিতে। তিনি স্বীকার করেন যে কংগ্রেসের সে অধিকার আছে। বড়োলাটের অনুরোধে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সম্মত হন। মওলানা আবুল কালাম আজাদ সরে দাঁড়ান। এমন সময় প্রবেশ করেন গান্ধীজী। বুঝতে পারেন যে এটা জিন্নার জেদের কাছে নতিস্বীকার। কংগ্রেসী মুসলমানরা স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়ে প্রচুর দুর্ভোগ সহ্য করেছেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে তো তাঁরাই সরকার গঠন করেছেন। তাঁদের একজনকে নেওয়া কর্তব্য। নইলে কর্তব্যহানি। কংগ্রেস নেতারা গান্ধীজীর কথায় বড়োলাটের অনুরোধ অগ্রাহ্য করেন।

বড়োলাটের তখন উভয়সংকট। কংগ্রেস যদি যোগ না দেয় তবে শাসন পরিষদের পুনর্গঠন বৃথা। অপরপক্ষে মুসলিম লীগ যদি যোগ না দেয় তা হলেও পুনর্গঠন বৃথা। দুই প্রধান দলকে দিয়ে মানিয়ে নিতে হবে তাঁরা স্বাধীন হলে ব্রিটিশ অফিসারদের পেনসন ও ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি কি না। ব্রিটেনে সঙ্গে সম্পর্কটাই বা কী প্রকার হবে। কানাডা, অস্ট্রেলিয়ার মতো না ফ্রান্স ইটালির মতো।

এমন অচল অবস্থায় অ্যাটলি নির্দেশ দেন, কংগ্রেসকে সরকার গঠনের ভার দেওয়া হোক। কংগ্রেস লীগকে রাজি করাবে। জিন্না এই পলিসির আঁচ পেয়ে লীগ ওয়ার্কিং কমিটিকে দিয়ে ডাইরেক্ট অ্যাকশনের প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেন। লীগ সদস্যরা বড়োলাটের শাসন পরিষদে যোগ দেবে না। সংবিধানসভাও বয়কট করবেন। দেশময় চালিয়ে যাবেন প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। সংগ্রামটা শুরু হয় কলকাতায়। বড়োলাট ওয়েভেল গান্ধী ও নেহরুকে অনুরোধ করেন লীগকে কিছু কনসেশন দিতে। তাঁরা নাছোড়বান্দা। ওদিকে জিন্নাও নাছোড়বান্দা। অ্যাটলি আবার নির্দেশ দেন কংগ্রেসকে সরকার গঠনের অগ্রাধিকার দিতে। সেটাই পার্লামেন্টারি কেতা। কেন্দ্রীয় আইনসভায় নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে কংগ্রেসীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ।

জবাহরলাল, বল্লভভাই প্রমুখ নেতারা শাসন পরিষদ পুনর্গঠন করেন। সঙ্গে আসফ আলী। দিল্লিতে যৌথ নির্বাচন প্রথা ছিল। তিনি উভয় সম্প্রদায়ের ভোটে নির্বাচিত। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও পাঁচজন গ্রহণযোগ্য মুসলমান পাওয়া গেল না। সুতরাং মুসলিম জনসাধারণ হল পুনর্গঠিত শাসন পরিষদের প্রতি আস্থাহীন। তারপর এটাও দেখা গেল যে সমগ্র ভারতের শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্যে দায়ী হলেও বাংলাদেশ, পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশের পরিস্থিতি সামাল দেওয়া স্বরাষ্ট্র দফতরের ভারপ্রাপ্ত সদস্য বল্লভভাইয়ের ক্ষমতার পরিধির বাইরে। ব্রিটিশ শাসকরা থাকতেই এই, তাঁরা চলে গেলে এসব প্রদেশ তো বিদ্রোহী হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করবে। সময় থাকতে দুটি প্রদেশ ভাগ করাই সঙ্গত। ইতিমধ্যে জিন্না যোগ না দিলেও লিয়াকত আলী প্রমুখ লীগপন্থীরা সরকারের ভিতরে ঢুকে ভিতর থেকেই লড়ছিলেন। কংগ্রেস না পারে গিলতে, না পারে ওগরাতে। নতুন বড়োলাট মাউন্টব্যাটেন কংগ্রেসকে ছেড়ে দিয়ে লীগকে সরকারের ভার অর্পণ করতে নারাজ।

কংগ্রেসপন্থীরাই ভিতরে ভিতের চেয়েছিল যে পাঞ্জাব ও বাংলাদেশ বিভক্ত হোক। তা হলে তারা আরো দুটো প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করতে পারবে। নইলে তাদের চিরকাল শাসনক্ষমতা থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে। বিদ্রোহী হয়ে তারা কংগ্রেস সংগঠনের ভিতরে থেকে দল পাকিয়ে তাদের মনোনীত একজনকে কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন করতে সাহায্য করবে। তিনি হাইকমান্ড পুনর্গঠন করবেন। বল্লভভাইরা অপদস্থ হবেন। যেমন হতে হয়েছিল সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেস সভাপতি পদে নির্বাচনের সময়। কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ সংকট ক্রমশ ঘনিয়ে আসতই। সময় থাকতে প্রতিকারের একমাত্র উপায় বাঙালি ও পাঞ্জাবী কংগ্রেসপন্থীদের জন্যে দুটো খণ্ডিত প্রদেশ গঠন।

ওদিকে পাকিস্তানের নেপথ্য রহস্যও একই প্রকার। পাকিস্তানের প্রয়োজন হয় যুক্তপ্রদেশ, বিহার, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশের লীগপন্থী রাজনীতিদের অন্য কোথাও ক্ষমতার আসনে বসানোর জন্যে। বিহারী মুসলিম লীগ নেতারা যেতেন পূর্ব পাকিস্তানে। যুক্তপ্রদেশের মুসলিম লীগ নেতারা পশ্চিম পাকিস্তানে। এইভাবে মুসলিম লীগের সংহতি রক্ষা করতে পারা যেত। ধরে নেওয়া হয়েছিল যে সমগ্র বঙ্গ ও সমগ্র পাঞ্জাব তথা সমগ্র আসাম পড়বে মুসলিম লীগের ভাগে। কংগ্রেসের আপত্তি সত্ত্বেও চার্চিলের দাক্ষিণ্যে। চার্চিল নিজেই ক্ষমতাহীন হবেন এটা কেউ স্বপ্নেও ভাবেননি।

নোয়াখালির ঘটনার অতিরঞ্জিত বিবরণ পড়ে বাংলার হিন্দুরাও তিক্তবিরক্ত। যাঁরা সেকালের পার্টিশন-বিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপ দিয়ে সন্ত্রাসবাদী হয়েছিলেন ও আন্দামানে গিয়েছিলেন তাঁরাও নতুন করে পার্টিশনের পক্ষপাতী হয়ে ওঠেন। বিনুকে তার এক সহযোগী হিন্দু অফিসার বলেন, "দেশের সেই সোনারচাঁদ ছেলেরা গেল কোথায়? গান্ধীকে গুলি করে হত্যা করতে পারে না?" বিনু জানতে চায় গান্ধীর কী অপরাধ। তিনি বলেন, "পার্টিশন না হলে বাঙালি হিন্দু বাঁচবে না। গান্ধী পার্টিশন হতে দিচ্ছেন না।" পার্টিশনের পরিণাম দর্শনের পর উল্টোটি শোনা গেল। গান্ধী কেন পার্টিশন হতে দিলেন? অতএব তাঁর মরা উচিত। একজন আন্দামান ফেরত বিপ্লবীর এই উক্তি বিনুর নিজের কানে শোনা।

গান্ধীজীর আগস্ট ১৯৪২ সালের 'কুইট ইন্ডিয়া' প্রস্তাব ইংরেজরা মান্য করল ১৯৪৭ সালে আগস্ট মাসে। জিন্না সাহেবের 'ডিভাইড অ্যান্ড কুইট' অনুপ্রস্তাবও মেনে নেওয়া হল একই কালে। দুই শতকের ব্রিটিশ শাসন তিনমাসের নোটিসে হাওয়া হয়ে গেল। বিনু তাজ্জব

ও হতভম্ব। আদালতের এক কেরানি তাকে হুঁশিয়ার করে দেন, 'চোদ্দদিনের বিল তৈরি করে এক্ষুণি জমা দিন। এ গভর্নমেন্টের দায় অন্য গভর্নমেন্ট বহন করবে কি না সন্দেহ। করলেও কবে বিল মঞ্জুর করবে কে জানে?'

পনেরোই আগস্টের সকালে হাওড়ার নেতারা বিনুকে ধরে নিয়ে যান হাওড়া ময়দানে। সে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে। সেদিন সন্ধ্যায় তাকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয় কলকাতায় অতুল্য ঘোষের ঘরোয়া সভায়। শ্রোতারা সবাই উঠানে। সে একা বারান্দায়। তার ভাষণ শেষ হলে পাঁচজন মন্ত্রীকে তার সামনে হাজির করা হয়। সে অভিনন্দন জানায়। বিনু এক্ষেত্রে সাহিত্যিক বিনু।

বিনুর অপসরণ

স্বাধীনতা দিবসটি নিছক আনন্দের দিন ছিল না। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান সেনাপতি মহাত্মা গান্ধী সেদিন কলকাতায় অনশনরত। তাঁর ধারণা তাঁর জীবনের মিশন ব্যর্থ হয়েছে। হিন্দু মুসলমান এক হয়নি, হিংসায় উন্মত্ত দেশ। ইংরেজরা চলে গেছে, এইটুকুই যা লাভ। কিন্তু তারা চলে গেছে বলেই কি দেশের হিন্দুপ্রধান অংশ থেকে মুসলমানরাও চলে যাবে, মুসলিমপ্রধান অংশ থেকে হিন্দু ও শিখরাও চলে আসবে?

একক ভাবে একটা দল সারা দেশকে স্বাধীন করতে পারে। কিন্তু একক ভাবে একটা দল সারা দেশকে শাসন করতে পারে না, যদি না অন্যান্য দলদের যুদ্ধক্ষেত্রে পরাস্ত করতে সমর্থ হয়। কংগ্রেসের তেমন কোনো অভিপ্রায় ছিল না। যুদ্ধে নামলে সে দেখত ভারতীয় সেনা দ্বিধাবিভক্ত ও পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধরত। অনশনে দেহত্যাগ করেও মহাত্মা তাদের নিবৃত্ত করতে পারতেন না। একই কালে দাঙ্গা হাঙ্গামাও লেগে থাকত।

একক ভাবে রাজ্য চালানো যায় না, অপরকে ক্ষমতার ভাগ দিতে হয়। তা যদি কার্যকর না হয় তবে রাজ্যের ভাগ দিতে হয়। আর কোনো বিকল্প যদি থাকে সেটা ইংরেজকেই হাত জোড় করে বলা, তোমরাই থেকে যাও অনির্দিষ্টকাল। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, ইংরেজরা ১৯৪৮ সালের জুন মাসের পর নিজেরাই বিনা শর্তে একতরফা অপসরণে উন্মুখ। কারো কোনো আর্জি শুনবে না। বিনু ব্রিটিশ সরকারের ভিতরে ছিল। শাসকদের মনোভাব জানত। বাংলার লাটসাহেব তাকে বলেছিলেন, "হিন্দু মুসলমান যদি পরস্পরের সঙ্গে লড়তে চায় তবে লড়ুক। আমরা কেন রিং ধরে থাকব। আমরা যাচ্ছি।" রিং মানে বক্সিং-এর রিং।

ভিতরে থেকে মুসলিম অফিসারদের মনোভাবও তার অজানা ছিল না। "আমরা পাকিস্তান চাইনে" যিনি বলেছিলেন তিনিই বলেন, "আমরা এখন পাকিস্তান চাই।" মাস তিনেকের মধ্যে মত পরিবর্তনের অর্থ ইংরেজরাজের শূন্যতা কংগ্রেসরাজ যদি পূরণ করে তো মুসলিম অফিসারদের শ্রেণী স্বার্থ নিরাপদ নয়। একই উক্তির রকমফের হিন্দু অফিসারদের মুখে। "পার্টিশন না হলে বাংলার হিন্দু বাঁচবে না।"

একদা যাঁদের পূর্বপুরুষরা ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়েছিলেন ইংরেজ বিদায়ের সময় দেখা গেল তাঁরা দেশান্তরিত হয়ে পাকিস্তানী বনেছেন। তাই তাঁরাও ইংরেজেদের সঙ্গে সঙ্গে ইন্ডিয়া কুইট করলেন। বিনু আন্তরিক দুঃখিত। সে চেয়েছিল তাঁরা থেকে যান। তেমনি

এটাও সে কামনা করেছিল যে হিন্দু অফিসাররাও পাকিস্তানে থেকে যান। বিশেষত যাঁদের শিকড় পূর্ববঙ্গে। ছিন্নমূল হয়ে কে কবে রস সংগ্রহ করতে পেরেছে? অফিসার শ্রেণী তো চলে এলেনেই, তাঁদের অনুসরণে কেরানি ও পিয়ন, পুলিশ ও ডাক্তার, উকিল ও মোক্তার, জমিদার ও মহাজন, পাচক, পুরোহিত, গোয়ালা, মুচি, ধোপা, নাপিত, চাষি, মজুর। তবু ভালো যে পাঞ্জাবের মতো হিন্দু মুসলমান পাইকারি হারে মরেনি, মারেনি, শুধুমাত্র পালিয়েছে। যঃ পলায়তি সঃ জীবতি।

এরকম যে হতে পারে তা আন্দাজ করে বিনু ময়মনসিং থেকে বদলি হয়ে আসার সময় বিদায় সভায় বলেছিল, "পশ্চিমবঙ্গ একটি ছোট নৌকা। তাতে যাত্রীর সংখ্যা সীমা ছাড়িয়ে গেলে নৌকাডুবি ঘটবে। যেমন ঘটে গেল সেদিন আমাদের চোখের সামনে ব্রহ্মপুত্রের জলে। পূর্ববঙ্গের সওয়া কোটি হিন্দুর জন্যে সেখানে ঠাঁই নেই। তারা সবাই গেলে পশ্চিমবঙ্গ ডুববে।"

সেই নৌকার বাড়তি যাত্রীরা মাঝিদের হুঁশিয়ারি শোনেনি। ফলে নৌকা ডোবে, মানুষও ডোবে, যারা সাঁতার জানে তেমন কয়েকজন বেঁচে যায়। মাঝিরা পালায়।

ভারতও একটি বড় মাপের নৌকা। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বেবাক হিন্দু ও শিখ তিন সপ্তাহের মধ্যে উধাও। এমনি বেবাক মুসলমান পূর্ব পাঞ্জাব ছেড়ে গেছে। কিন্তু দিল্লির মুসলমানরা তাদের ঘরবাড়ি, জায়গাজমি, মসজিদ বেদখল দেখে সরকারের শরণাপন্ন। সরকার হিমসিম খাচ্ছেন। বিনুর বন্ধু এক হিন্দু আই সি এস অফিসার মুসলমানদের বাঁচাতে গিয়ে তাঁর অধীনস্থ হিন্দু সিপাহীর দ্বারা নিহত। এখন ভরসা গান্ধীজীর নৈতিক প্রভাব। তিনি ব্যর্থ হলে সরকারের দেউলেপনা প্রমাণ হবে। সেকুলার স্টেট হবে ভাঁওতা। কাশ্মীরী মুসলমান ভবী ভুলবে না। মহাত্মাকে শেষ পর্যন্ত অনশনের সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

ইতিমধ্যে মুর্শিদাবাদে গণ্ডগোল বেধেছিল। মুসলিম প্রধান মুর্শিদাবাদ জেলা সাত দিন পাকিস্তানের সামিল থেকে র‍্যাডক্লিফের রোয়েদাদে ভারতের সামিল হয়। সেই সাত দিনে সেখানকার মুসলমানরা উৎসব করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে, পরে আকাশ থেকে পড়ে। বিশ্বাসই করতে চায় না যে এটাই তাদের ভাগ্য। হিন্দুরা সাত দিন মনমরা হয়ে কাটিয়েছে। এখন তারাও উৎসব করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করছে। মারামারি থামাতে সেখানকার নেতারা চেয়ে পাঠান একজন আই সি এস অফিসার।

আঠারো বছর চাকরির পর বিনু এই প্রথম কলকাতায় বদলি হয়েছে। চারটে মাস যেতে না যেতেই তার উপর হুকুম, মুর্শিদাবাদ চলো। বিনু প্রতিবাদ করতে পারত। তার ছেলের ম্যাট্রিক পরীক্ষা সামনে। ময়মনসিং থেকে এসে কলকাতার স্কুলে ভর্তি হয়েছে। আবার স্থানান্তর। তা সত্ত্বেও বিনু সহজেই রাজি হয়ে যায়। শাসন বিভাগের প্রতি তার বরাবরই পক্ষপাত। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে বিচার বিভাগে পদস্থ করা হয়েছিল। প্রায় দশ বছর বাদে সে আবার জেলাশাসক হবে। সেই পদটার প্রতি তার একটা টান ছিল। সেই পদের সঙ্গে জড়িত ছিল ক্ষমতা। জজ তো ঠুঁটো জগন্নাথ। তা ছাড়া মীরার সঙ্গে তার প্রথম দেখা তো বহরমপুরেই। বিয়ের পরে মধুমাস যাপনও সেখানে।

মীরার কিন্তু একেবারেই সায় ছিল না আবার এক বদলিতে। আবার মালপত্র প্যাক করতে হবে। মালপত্রের মধ্যে পড়ে স্টাইনওয়ে বেবি গ্র্যান্ড পিয়ানো। ভারতে দুর্লভ। বিয়ের পর আমেরিকা থেকে আনা।

মুর্শিদাবাদ যাবার আদেশ পেয়ে বিনু ঘোষ মন্ত্রীমহলের সদস্য এক পুরাতন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করে, "পূর্ববঙ্গের হিন্দু শরণার্থীদের সম্বন্ধে আপনাদের পলিসি কী?" তিনি উত্তর দেন, 'আমরা ওদের উৎসাহ দিতে চাইনে। দিলে সবাই এসে হাজির হবে। আমরা অভিভূত হব।' কিন্তু দ্বিজাতিতত্ত্বে যদি বিন্দুমাত্র সত্য থাকে তবে পাকিস্তানে কেবলমাত্র মুসলিমরাই সিটিজেন হতে পারে, কিন্তু এরা রেসিডেন্ট এলিয়েন, সমান স্বত্ত্ববান নন। তারা তো সিটিজেনশিপের জন্যে ভারতে চলে আসতে চাইবেনই। সাধ করে কেউ এলিয়েন হতে রাজি হয়?

না, হয় না। তবে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে কথাবার্তার সময় জিন্না সাহেব বলেছিলেন বাংলাদেশকে দু'ভাগ করা উচিত নয়, যেহেতু বাঙালি হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে এক জাতীয়তার লক্ষণ বিদ্যমান। মাউন্টব্যাটেন তাঁর প্ল্যানে একটি ধারা জুড়ে দেন। বাংলার হিন্দু মুসলমান যদি একমত হয় তবে বাংলাদেশ অবিভক্ত থাকবে। তার মানে দাঁড়ায় অবিভক্ত বাংলাদেশ একাই একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হবে। জবাহরলাল প্রতিবাদ করেন। বাংলাদেশ যদি স্বাধীন হয় তো আরো অনেক প্রদেশ বা রাজ্য স্বাধীন হতে চাইবে। ভারত হবে বলকান। কংগ্রেস বলকানীকরণ মেনে নেবে না। মাউন্টব্যাটেন সে ধারাটি প্রত্যাহার করেন। বাংলাদেশ দুই ভাগ হল, কিন্তু দ্বিজাতিতত্ত্ব মেনে নেওয়া হল না। তা হলে তো উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে রেফারেন্ডামের আবশ্যক হত না। সীলেট জেলাতেও না। রেফারেন্ডামের ফল পাকিস্তানের পথে নাও যেতে পারত।

পার্টিশন হল একপ্রকার সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ, যেমন র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের রোয়েদাদ। সেটা প্রাদেশিক স্তরে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়, এটা কেন্দ্রীয় স্তরে ক্ষমতা হস্তান্তরের বেলা। হিন্দু, মুসলমান, শিখ প্রভৃতিকে সম্প্রদায় হিসাবেই গণ্য করা হয়, নেশন হিসাবে নয়। জিন্নাসাহেব পাকিস্তানের পতাকার এক তৃতীয়াংশ সফেদ রাখেন। বাকি দুই-তৃতীয়াংশ সবুজ। তাৎপর্য, পাকিস্তানে হিন্দু ও শিখরাও সমান অধিকারী। তাদের সংখ্যানুপাতও প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। তিনি একটি বিবৃতিতে বলেন, পাকিস্তানে যে যার ধর্ম অনুসরণ করতে পারবে, রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে সব নাগরিকই পাকিস্তানী। সেকুলার স্টেট বলে পাকিস্তানকে চিহ্নিত না করলেও তাঁর বিবৃতির মর্ম পাকিস্তান হবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। তিনি ভালো করেই জানতেন যে পাকিস্তানে হিন্দু ও শিখ এলিয়েন হলে ভারতেও মুসলমানরা হবে এলিয়েন। তার মানে চার কোটি মুসলমান ভারত ছেড়ে পাকিস্তানে হাজির হবে। তারা যদি ভারতে থাকে তবে সেটা হবে কংগ্রেসের সেকুলার পলিসির গুণে।

বিনু মুর্শিদাবাদের শাসনভার নেবার আগেই ঘোষ মন্ত্রী-মণ্ডলীর পরিবর্তে রায় মন্ত্রী-মণ্ডলী অধিষ্ঠিত হয়। এটাও তো কংগ্রেস পার্টির মন্ত্রী-মণ্ডলী। বিনু ধরে নেয় এঁরাও শরণার্থীদের উৎসাহ দিতে অনিচ্ছুক। মুর্শিদাবাদে তখনো লক্ষ করার মতো শরণার্থী সমাগম হয়নি। সেখানকার গণ্ডগোলটা অন্য কারণে। মুর্শিদাবাদ মুসলিম প্রধান জেলা। তাই মাউন্টব্যাটেন তাকে পাকিস্তানের সামিল করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দিন মুর্শিদাবাদে পাকিস্তানের পতাকা ওড়ে। মুসলমানরা আনন্দ উৎসব করে। তাদের আনুগত্য পাকিস্তানের প্রতি। কিন্তু দিন সাতেক পরে দেখা গেল মুর্শিদাবাদ পড়েছে ভারতের ভাগে। তার ভিতর দিয়ে যেহেতু গঙ্গা ভাগীরথী প্রবহমান সেহেতু তাকে ভারতের ভিতরে রাখাই সমীচীন। তার বিনিময়ে পাকিস্তানকে দেওয়া হল খুলনা জেলা। সেটা হিন্দুপ্রধান। এই দুটি জেলার ক্ষেত্রে

সাম্প্রদায়িক গণনাকে অগ্রাহ্য করেন সার সীরিল র‍্যাডক্লিফ। এতে মুর্শিদাবাদের মুসলমানরা স্তম্ভিত। সাতদিন পরে পতাকা পরিবর্তন, আনুগত্য পরিবর্তন, ভাগ্য পরিবর্তন। সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও সংখ্যালঘিষ্ঠের অধম! এ কী রকম অন্যায়!

ওদিকে হিন্দুরাও সেই সাতদিন মুসলমান প্রতিবেশীদের চেহারা দেখে স্তম্ভিত হয়েছে। প্রজারা দলবদ্ধ হয়ে জমিদারের ভবন আক্রমণ করেছে। পুলিশ নিষ্ক্রিয়। জমিদার সপরিবার কলকাতা পলাতক। বলা বাহুল্য প্রজারা মুসলমান। জমিদার হিন্দু। দৃশ্যত হিন্দু মুসলমানের বিবাদ। প্রকৃতপক্ষে জমিদার ও প্রজার বিবাদ। ইংরেজদের অভাবে জমিদাররা নির্বান্ধব। তবে পূর্ববঙ্গের লীগ মন্ত্রী-মণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয়রাও জমিদার। জমিদারি প্রথার বিলোপ যদিও তাঁদের দলের পলিসি তবু অর্থনৈতিক ওলটপালট তাঁদেরও এই মুহূর্তে অভিপ্রেত নয়। মুর্শিদাবাদের হিন্দুরা তটস্থ থাকে। কিন্তু ভারতের সামিল হয়ে তারাও উগ্র মূর্তি ধারণ করে।

বিনু বুঝতে পারে মুর্শিদাবাদের সমস্যাটা আসলে আইন ও শৃঙ্খলার নয়। আইন আছে, পুলিশ আছে, আদালত আছে, জেল আছে। এসবের সাহায্যে দুষ্কৃতীদের দমন করা কঠিন নয়, সময়সাপেক্ষও নয়। পরিস্থিতি আয়ত্তে আসে। কিন্তু বিবাদের বীজ যদি থেকে যায় গণ্ডগোল আবার বাধবে। যেটা গোড়ায় আবশ্যক সেটা মুসলমানদের আনুগত্য অর্জন। দ্বিজাতিতত্ত্বানুসারে তাদের তো পাকিস্তানে পা চালিয়ে দেবার কথা। কিন্তু দ্বিজাতিতত্ত্ব দুই রাষ্ট্রই বাতিল করেছে। মুসলমানমাত্রেই পাকিস্তানী নাগরিক নয়, হিন্দুমাত্রেই ভারতীয় নাগরিক নয়। গান্ধীজীর পলিসি, যে যেখানে আছে সে সেইখানেই থাকবে, জোর করে কাউকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করা চলবে না। যার ইচ্ছা সে বিনিময় করতে পারে। সেটা কিন্তু সম্পত্তি বিনিময়। লোক বিনিময় নয়। মুসলিমবর্জিত মুর্শিদাবাদ বা হিন্দুশূন্য রাজশাহী কল্পনা করা যায় না। তাতে সাম্প্রদায়িক বিবাদ চিরকালের মতো দূর হবে, কিন্তু ইতিহাসের ধারাভঙ্গ ঘটবে। সে ধারা গঙ্গা যমুনার মিশ্র ধারা। তাকে অবিমিশ্র করতে গেলে এপার ওপার দুই পারের বাঙালি জাতীয়তা ধ্বংস হবে। দিল্লিকে মুসলিমশূন্য হতে দেবেন না বলে মহাত্মা গান্ধী প্রাণ দেন। বিনু অবশ্য প্রাণ দেবে না, কিন্তু তারও পণ সে গান্ধীনীতি অনুসরণ করবে ও তা করতে গিয়ে যথাসম্ভব ত্যাগ করবে। দেশ বিভক্ত, প্রদেশ বিভক্ত, তাই বলে লোক বিভক্ত হবে না। বিনু বিশ্বাস করে যে অবিভক্ত ভারতের জনগণ সমস্ত প্রতিকূল প্রমাণ সত্ত্বেও এক ও অবিভাজ্য। সমস্ত প্রতিকূল প্রমাণ সত্ত্বেও অহিংস।

মুর্শিদাবাদ ও রাজশাহীর লোকজন চিরকাল পদ্মা নদীর এপার ওপার করে এসেছে। এখন ও দুটো জেলা দুই আলাদা ডোমিনিয়নের প্রত্যন্ত জেলা। কোনো হিন্দু এলে সেটা খবর নয়, কিন্তু কোনো মুসলমান এলেই পুলিশ থেকে রিপোর্ট আসে অমুক ব্যক্তি অমুক গ্রামে এসেছে। গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। দুই জেলার মধ্যে মাল চলাচল চিরকাল অবাধ ছিল। এখন ওটার নাম মাল পাচার। ইতিমধ্যে বাজার থেকে কাপড় উধাও। কারণ অবাধে মাল পাচার।

বিনু একদিন তাঁবু নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। পদ্মার ধারে রাত কাটায়। স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে মাল পাচারের কলাকৌশল। ওপারে আলো জ্বলে ওঠে। যেমন রেলের সিগন্যাল। অমনি এপার থেকে নৌকা ছেড়ে দেয়। পাচার যারা করে তারা হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে দুই সম্প্রদায়ের লোক। ওটাকে তারা অপকর্ম মনে করে না। চাহিদা আছে, জোগান দিচ্ছে।

মুশকিলটা এইখানে যে মুর্শিদাবাদের চাহিদা মিটছে না, কাপড়ের অভাবে মানুষ কী পরবে? কমিশনার তা শুনে বলেন, কড়া হাতে নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে উল্টো বিপত্তি। ওপারে হিন্দুর মেয়েরা শাড়ি পাবে কোথায়? বিনু বলে না, বলতে পারত, শুধু কি হিন্দুর মেয়েরা?

চালের দামের উপর থেকে সীলিং উঠে যাওয়ায় হঠাৎ দেখা দিল চালের আকাল। ভাগ্যিস, কিছু চাল মজুত ছিল সরকারি আড়তে। কড়া হাতে নিয়ন্ত্রণ করে চালের অভাব কতকটা মেটানো গেল। বিনুকে এইসব নিয়ে দিনরাত ব্যস্ত থাকতে হয়। সাহিত্য শিকেয় তোলা থাকে। সামাজিকতারও সময় মেলে না।

একদিন কলকাতার সেক্রেটারিয়েটে ডাক পড়ে। বিভিন্ন জেলা থেকে সমাগত প্রশাসকদের নিয়ে দরবার করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য ওপার থেকে যেসব শরণার্থী আসছে তাদের সমষ্টিগতভাবে বসাতে হবে সীমান্তের এক একটি গ্রামে। একই গ্রামে চাষি, তাঁতী, কামার, কুমোর, কলু, ছুতোর, ধোপা, নাপিত, মুদি ইত্যাদির স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজ তাঁর স্বপ্ন।

"অবাস্তব।" বিনু বলে ওঠে, "সীমান্তে কোথাও এক কাঠা জমি খালি নেই। সর্বত্র ঘন বসতি।"

মুখ্যমন্ত্রী তাকে ধমক দেন। সে বলে, "আমি ছুটি নেব।" তিনি বলেন, "আমি দিলে তো।"

রাজশাহী ও মুর্শিদাবাদের মাঝখানে গঙ্গা ও পদ্মা নদী। যেখান থেকে ভাগীরথী বেরিয়েছে সেখান পর্যন্ত গঙ্গা, তার পরে পদ্মা। নদীর মুখ্যস্রোত যেটাকে বলা হয় সেটা কখনো রাজশাহীর পাড় দিয়ে বইত, কখনো মুর্শিদাবাদের পাড় দিয়ে। পার্টিশনের পূর্বে এ নিয়ে কেউ কোনো দিন তর্ক করেনি। সম্প্রতি মুখ্যস্রোত বহমান মুর্শিদাবাদের পাড় ঘেঁসে। রাজশাহী থেকে এক লঞ্চ এসে সারা দিন টহল দিচ্ছে।

নদীর মাঝখানের তিনটে চর এখন মুখ্যস্রোতের ওপারে। কিন্তু মুর্শিদাবাদের মানচিত্রে চিহ্নিত। লঞ্চের উর্দুভাষী বিহারী কাপ্তেন দাবি করছেন যে মুখ্যস্রোতের আধখানা পার্টিশনসূত্রে পাকিস্তানের, সুতরাং চরগুলো রাজশাহীর সামিল। মুর্শিদাবাদের মুসলমান চাষিরা এতকাল ওইসব চরে ফসল ফলিয়ে এসেছে, এ বছরও ফলিয়েছে, কিন্তু কাপ্তেন তাদের চরে যেতে দিচ্ছেন না, নৌকা আটক করছেন। মগের মুলুক আর কী! লোকগুলি বিনুর কাছে নালিশ করে।

বিনু তার পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টকে বলে, 'কাপ্তেন অনধিকার প্রবেশ করেছে। গোটা মুখ্যস্রোতটাই মুর্শিদাবাদের। অন্তত আধখানা তো মুর্শিদাবাদের বটেই। সেখান দিয়ে তো লঞ্চ চলাচল বেআইনি। পুলিশকে পাঠান লঞ্চ আটক করতে।"

তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে বলেন, "ওরে বাপ রে! পাকিস্তানী লঞ্চকে আটক? ওরা গুলি করবে না? পুলিশের একটি সিপাহীও যদি মারা যায় গোটা পুলিশ ফোর্স বি—বি—বিদ্রোহ করবে।"

ব্রিটিশ আমলে জেলা শাসকদের গোপন পুস্তিকায় নির্দেশ ছিল তাঁরা যেন পারতপক্ষে মিলিটারিকে না ডাকেন। ডাকলে পরিস্থিতি মিলিটারি অফিসাররাই নিয়ন্ত্রণ করবেন। তাঁদের হুকুম অনুসারে কাজ হবে। জেলাশাসকের পক্ষে সেটা অসম্মানকর। মিলিটারিকে নিতান্তই যদি ডাকতে হয় তবে তার আগে সরকারের অনুমতি নিতে হবে।

বিনু অগত্যা সরকারের অনুমিত নিয়ে মিলিটারিকে ডেকে পাঠায়। এক ব্রিগেডিয়ার

এসে তার অতিথি হন। মহারাষ্ট্রীয়। বলেন, 'আমি তিন তিনটে যুদ্ধে লড়েছি। আমি এখন সারা দেশের সবচেয়ে নন-ভায়োলেন্ট ম্যান। আমার পরামর্শ শুনুন। এ ব্যাপারে মিলিটারিকে জড়াবেন না।'

এরপর আসেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল। শিখ। বলেন, "পাকিস্তানী হানাদারদের হাতে আমাদের একটিও জওয়ান যদি মারা যায় তা হলে সেটা হবে ভারতের প্রেস্টিজের ইস্যু। তা নিয়ে যুদ্ধ বেধে যেতে পারে। আমার পরামর্শ শুনুন। পশ্চিমবঙ্গের সশস্ত্র পুলিশকে এ ভার দিন।"

ব্যাপারটা যে কতদূর বিপজ্জনক তা উপলব্ধি করে বিনু রাজশাহীর জেলাশাসকের সঙ্গে কথাবার্তা চালায়। তিনি তাকে নিমন্ত্রণ করেন। একদা তারই অধীনস্থ বাঙালি মুসলিম অফিসার। অতিশয় সজ্জন। বিনুর সঙ্গে এমন ব্যবহার করেন যেন বিনু এখনো তাঁর উপরওয়ালা। বিনুর পুরানো কেরানি ও পিয়নদের সাদর আপ্যায়নের অতিশয্যে তার প্রাণ যায় আর কী! স্থির হয় দুই শাসক চরে গিয়ে সরেজমিনে তদন্ত করবেন। কিন্তু তার আগেই তাঁকে বদলি করে এক উর্দুভাষী মুসলিম অফিসারকে জেলাশাসক করা হয়। পাকিস্তানের লাইন হল আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে চরগুলো পাকিস্তানের অন্তর্গত। নদীর মুখ্যস্রোত এখন সীমানা নির্দেশ করছে। তার আধখানা পাকিস্তানে।

দুই সরকার একমত হতে পারেন না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিনুকে সশস্ত্র পুলিশ পাঠান। তাদের সঙ্গে আসে ভয়ানক সব অস্ত্রশস্ত্র। স্টেনগান, ব্রেনগান। এসব অবশ্য ব্যবহার করার জন্যে নয়। ক্ষমতা জাহির করার জন্যে। সিপাহীরা নদী পার হয়ে চরে যাবে কী করে? লঞ্চের দরকার হয়। অবিভক্ত বঙ্গের লঞ্চগুলো ছিল খুলনায়। একটি বাদে খুলনার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানে চলে গেছে। তাই ভারতের নৌবহর থেকে লঞ্চ আনাতে হয়। সেসব লঞ্চ সমুদ্রের জন্যে, নদীর জন্যে নয়। লোহা দিয়ে মোড়া। কণ্টকময়। লস্কররা একধার থেকে মুসলমান। অবিশ্বাসী হলে ওরা লঞ্চগুলো নিয়ে ভাগীরথী থেকে পদ্মায় পড়বে ও সরাসরি রাজশাহী চলে যাবে। ওদের দেশ নোয়াখালি, চাটগাঁয়। ওরা পাকিস্তানী নাগরিক। বিনুকে পরামর্শ দেওয়া হয় দক্ষিণী লস্কর আনাতে। বিনু বলে, 'এরা বাঙালি লস্কর, এদের সঙ্গে বনিবনা সহজ। মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ। এরা পেশাদার মানুষ, রাজনীতি বোঝে না। যার নিমক খায় তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকে।'

সশস্ত্র বাহিনী ও লঞ্চের লস্করদের উপরে কর্তৃত্ব করার জন্যে পাঁচজন প্রাক্তন মিলিটারি অফিসারকে বিনুর অধীনে অ্যাসিস্টান্ট ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত করা হয়। এঁরা সবাই এখন আই এ এস। একজন উইং কমান্ডার ছিলেন, বাঙালি খ্রিস্টান। একজন ছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল, আর্মেনিয়ান খ্রিস্টান। দু'জন মেজর, বাঙালি ব্রাহ্মণ। একজন ক্যাপ্টেন, অবাঙালি কায়স্থ। উইং কমান্ডারকে সদরে রেখে বাকি চারজনকে গঙ্গা পদ্মার তীরে মোতায়েন করা হয়। সশস্ত্র বাহিনীর হেফাজতে। লঞ্চেরও।

এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয় বেতার দিয়ে। পুলিশ ওয়াইয়ারলেস। তার জন্যে নিজস্ব একটা কোড বানায় বিনু। যারা জানে তারা ছাড়া আর কেউ ডিকোড করতে পারে না। একদিন রাত দুটোর সময় সে ওয়াইয়ারলেস মেসেজ পায়। "দু'শো রাউন্ড গুলি চলেছে। জলদি আসুন।" অমনি বিনু রওনা হয়ে যায়। ওয়েপন ক্যারিয়ার সব সময় তৈয়ারি থাকে। যদিও তাতে ওয়েপন থাকে না। বিনু যখন গঙ্গা তীরে পৌঁছয় তখন ভোর হয়ে

এসেছে। লেফটেন্যান্ট কর্নেল বলেন, কেউ মারা যায়নি, সবাই নিরাপদ। রাতের অন্ধকারে শত্রুর পায়ের শব্দ পেয়েছে মনে করে লঞ্চের সিপাহীরা গুলি চালিয়েছে চরের দিকে, দিক ভুল করে সে গুলি ছুটেছে তীরের সিপাহীদের অভিমুখে। এরাও পালটা গুলি চালিয়েছে লঞ্চের সিপাহীদের শত্রু মনে করে। ভাগ্যি সব ক'টা সিপাহীই আনাড়ি। নইলে একটা ম্যাসাকার ঘটে যেত। ভোরের আলোয় আবিষ্কার করা গেল একটি বাছুর মরে পড়ে রয়েছে চরের উপর। কাদের বাছুর, কোথা থেকে এল, কেউ বলতে পারে না। পরে গোয়ালারা এসে হাজির। সঙ্গে এক পাল গোরু। চরে তারা গোরু চরাতে এসেছিল। বাছুরটি কেমন করে দলছুট হয়। তা বলে তাদের বাছুরকে মেরে ফেলবে! এতবড় অন্যায়! তারা ক্ষতিপূরণ দাবি করে। সামলাও ঠেলা।

চর অপারেশন উপলক্ষে বিনুকে মাঝে মাঝে কলকাতা গিয়ে দেখা করতে হত কমিশনারের সঙ্গে, তারপর মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে। তিনি বলতেন, "এই যে প্রিন্স অব ডেনমার্ক। এবার কী খবর!" তাঁর টেলিফোন পেয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজের ঘর থেকে আসেন। বিনুর সঙ্গে তাঁর অনেক দিনের পরিচয়। তিনি একদা সাহিত্যিক ছিলেন। পার্টিশনের পূর্বাহ্নে ময়মনসিং-এ তিনি বিনুর নিমন্ত্রণে নৈশভোজন করেন।

বিনুর সঙ্গে দু'জনেই ভদ্র ব্যবহার করেন। সে যখন যা চাইবে তাঁরা তা মঞ্জুর করবেন। সীমান্তে শরণার্থী বসতির কথা আর উল্লেখ করা হয় না। শরণার্থী যাঁরা মুর্শিদাবাদে এসেছিলেন তারা সীমান্ত থেকে দূরে থাকাই পছন্দ করতেন। শহরের আশে-পাশেই তাদের বসত। স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজের কোনো প্রয়াস ছিল না। কার যে কী জাত, কী পেশা তা প্রকাশ না করায় বিনু তা জানত না। তাঁরা সরকারি সাহায্য চান। সম্ভব হলে চাকরি। কিংবা লাইসেন্স।

একদিন কলকাতা থেকে ডাক পড়ল মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। শিয়ালদহ স্টেশনে নেমে বিনু একখানা পত্রিকা কিনে দেখে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার মুসলমানদের তাড়াতে যাচ্ছেন এটা আদৌ সত্য নয়। যত সব বাজে গুজব। বিনু সরাসরি সেক্রেটারিয়াটে গিয়ে হাজিরা দেয়। তাকে নিয়ে যাওয়া হয় মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে। সেখানে ছিলেন স্বরাষ্ট্রসচিব। রুদ্ধদ্বার কক্ষে মুখ্যমন্ত্রী যা বলেন তার মর্ম অমুক তারিখের মধ্যে সীমান্তের মুসলমানদের ওপারে খেদিয়ে দিতে হবে। বিনু তো অবাক। অপর জেলাশাসক সময়টা একটু বাড়িয়ে দিতে অনুরোধ করেন। কর্তা বাড়িয়ে দেন। তাঁর মুখখানা গম্ভীর। বিনুর মনে হয় তিনি যা বলছেন তা তাঁর নিজের কথা নয়, অন্য কারো কথা। তাঁকে দিয়ে বলানো হচ্ছে। ইতিমধ্যেই বিনু তাঁর পক্ষপাতী হতে শুরু করেছিল। তিনি আর যাই হোন, কমিউনাল নন। সে মুখ বুজে শুনে যায়। বিনা বাক্যে ঘর থেকে বেরয়। কথা দেয় না যে অমন কাজ করবে। বাইরে গিয়ে তার সহযোগীকে বলে, "রক্তপাত অনিবার্য। লিখিত আদেশ চাই। আপনি ভিতরে গিয়ে লিখিত আদেশ চান।" তিনি ভিতরে গিয়ে লিখিত আদেশ চাইলে স্বরাষ্ট্রসচিব বলেন, "লিখিত আদেশ মিলবে না। মৌখিক আদেশই যথেষ্ট।"

বিনু ভারত সরকারের সারকুলার পেয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল জেলাশাসকরা দেখবেন যাতে মুসলমানদের উপর জুলুম না হয়। জুলুম হলে জেলাশাসকদের জবাবদিহি করতে হবে। বিনু কার নির্দেশ মান্য করবে, কেন্দ্রীয় সরকারের, না প্রাদেশিক সরকারের? সে একজন আই সি এস অফিসার। কেন্দ্রের প্রতি তার প্রথম অনুগত্য। সে মুখ্যমন্ত্রীর আদেশ

উপেক্ষা করে। তার বিশ্বাস বিধানচন্দ্র সেকুলারমনস্ক ব্যক্তি। তিনি ওরকম আদেশ দিতেই পারেন না। হয়তো ভুলেই যাবেন।

টলস্টয় ও গান্ধীর দ্বারা প্রভাবিত বিনু কলেজ জীবনে স্টেট ভায়োলেন্সে বিশ্বাস করত না। কিন্তু কর্মজীবনে তাকে স্বীকার করতে হয়েছে যে আইনের শাসন না হলে দেশ অরাজক হবে। জেলাশাসক তথা জেলা জজের প্রথম কর্তব্যই হল আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা। রক্ষক না হয়ে তাঁরা যদি ভক্ষক হন তবে তো নিরীহ নাগরিকের ধন প্রাণ বিপন্ন। তেমন কাজ বিনুর দ্বারা হতে পারে না। তাকে মুর্শিদাবাদে পাঠানো হয়েছে গণ্ডগোল থামানোর জন্যে, নতুন করে বাধানোর জন্যে নয়। হাজার হাজার নিরীহ মুসলমানকে উৎখাত করতে গেলে স্টেট ভায়োলেন্স ব্যবহার করতে হবেই। সেটা অপব্যবহার। রক্তপাত ঘটলে রাজনীতিকরা বলবেন তাঁরা অমন আদেশ দেননি, লিখিত প্রমাণ কই? বিনুকেই দোষ দেবেন।

অবশেষে বর্ষাকালের প্লাবনের পর চরগুলো জেগে ওঠে। এক নম্বর চরটা মেজর বি. অনায়াসে দখল করেন। খোশ খবরটা বিনু তৎক্ষণাৎ টেলিফোন করে কলকাতার কর্তাদের জানায়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অভিনন্দন জানাতে পদ্মাতীরে আসেন। সঙ্গে কমিশনার। তাঁদের অভ্যর্থনা করে সরকারি টুরিং লঞ্চের উপরে মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন করা হয়। তাঁদের সঙ্গে মন্ত্রী মহোদয়ের রাজনীতিক পরিকর। এঁরাও ভোজনসঙ্গী। অনাহূত অতিথি।

ভোজনের পর মন্ত্রী ও কমিশনার বিশ্রাম করতে যান। বিনু পরিকরদের সঙ্গে আলাপচারি করে। তার কানে আসে পেছনে বসে থাকা একজন আরেকজনকে বলছেন, "দিল্লি থেকে কলকাতায় টেলিফোন এসেছে। ও তো এখন এ দেশে নেই। যা করবার এইবেলা করে নাও।"

বিনু ঠাহর করে, জবাহরলাল এখন বিদেশে। তাঁর ফেরার আগে যা করবার তা করে নিতে হবে। অমুক তারিখটা তাঁর ফেরার তারিখ। মন্ত্রী এসেছেন তার আগেই বিনুকে দিয়ে যা করবার তা করাতে।

মন্ত্রীর ক্যাবিন থেকে অনুরোধ আসে। বিনুকে তিনি নিভৃতে কিছু বলতে চান। সে ক্যাবিনে গিয়ে দেখে কমিশনারও উপস্থিত। তিনজনের গোপন বৈঠক।

প্রথমে গৌরচন্দ্রিকা। বিনুর সুখ্যাতি। দেশের এই সংকটের ক্ষণে বিনুর মতো করিৎকর্মা অফিসাররাই তো ভরসা। বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হওয়া গেছে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ আসন্ন। ইন্ডিয়ান আর্মি রাজশাহী অধিকার করলে বিনুকেই করা হবে রাজশাহীর জেলাশাসক।

বিনু মনে মনে হাসে। রাজশাহীর জেলাশাসক সে ছিল এগারো বছর আগে। তার চেয়ে জুনিয়ার অফিসারকে হালে সেক্রেটারি করা হয়েছে।

মন্ত্রী বলে যান, "যুদ্ধের আগে সন্দেহভাজন হলে জনগোষ্ঠীকে বহিষ্কার করা আবশ্যক। সীমান্তের মুসলমান গোষ্ঠীকে বিশ্বাস কী? ওরা তলে তলে রাজশাহীর মুসলমানদের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করে চলেছে। ওরা প্রচ্ছন্ন পাকিস্তানী। আপনি কি অবিলম্বে ওদের সদলবলে বহিষ্কার করতে পারবেন?"

"আমি বরং ইস্তফা দেব, তবু অমন কাজ করব না।" বিনু ঘাড় নাড়ে। "করতে গেলে রক্তপাত হবে।"

"হোক না। হোক না।" মন্ত্রী বলে ওঠেন।

"রক্তপাত হলে এমন হৈ চৈ পড়ে যাবে যে বাধ্য হয়ে ও পলিসি প্রত্যাহার করতে হবে। ইতিমধ্যে যে অনর্থ ঘটে যাবে তাকে অঘটিত করতে পারা যাবে না।" বিনু নিবেদন করে।

এরপর ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে আসে। মন্ত্রী বলেন, "দেখুন, ওপার থেকে হাজার হাজার হিন্দু পালিয়ে আসছে সরকারের পোষণে। এখন ওদের আমরা কোথায় রাখি? আমাদের পলিসি কী হবে আপনিই বলুন।"

"ওদের আর যেখানেই রাখুন সীমান্তে নয়। সীমান্তে একটুকরো খালি জমি নেই।" বিনু উত্তর দেয়।

"পলিসি স্থির করতে আপনাকে কে বলেছে? পলিসি আমরাই ঠিক করব। এই যদি আমাদের পলিসি হয় যে সীমান্তের মুসলমানদের বহিষ্কার করতে হবে তবে আপনি কি সেই পলিসি ক্যারি আউট করবেন?" মন্ত্রী জানতে চান।

বিনু ঘাড় নাড়ে। "আমি দরকার হলে যুদ্ধ করতে পারি, কিন্তু এমনতর কাজ করতে পারিনে।"

কমিশনারও ক্ষুণ্ণ হন। বলেন, "হিন্দুদের ওপার থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে বহিষ্কার করা হচ্ছে। ওরা কোথায় যাবে?"

মন্ত্রী যোগ করেন, "আপনিই বলুন।"

"ওরা যেখানেই জায়গা খালি পাবে সেখানেই যাবে। পশ্চিমবঙ্গের ভিতরে না হোক বিহারে, ওড়িশায়, মধ্যপ্রদেশে। ওখানকার নেতারাও তো পার্টিশনের জন্যে দায়ী।" বিনু মনে করিয়ে দেয়।

"কিন্তু ওসব জায়গায় শরণার্থীরা যদি না যায়?" মন্ত্রী তর্ক করেন।

"তা হলে আমি কী করতে পারি?" বিনু চুপ করে রইল।

"আচ্ছা, এবার আপনি আসতে পারেন।" মন্ত্রী তাকে বিদায় দেন। মুখে বিরক্তির ভাব।

সেদিন চায়ের টেবিলে তিনি এলেন না। কমিশনার এলেন। গম্ভীর ও নীরব। বিনু বুঝতে পারল তিনি তার পক্ষে নন। চায়ের পর সে লঞ্চ থেকে নেমে তাঁকে শুনিয়ে শুনিয়ে বাইরে অপেক্ষমান মুসলমানদের বলে, "আপনারা নির্ভয়ে থাকুন। আমি থাকতে আপনাদের গায়ে কেউ হাত দেবে না।" ওদের মুখে দুর্ভাবনার ছাপ।

হ্যাঁ, মধ্যাহ্ন ভোজনের এলাহি আয়োজন হয়েছিল ওইসব সীমান্তের মুসলমানদেরই চাঁদায়। তুলেছিলেন মহকুমা হাকিম।

রাতে কলকাতার ট্রেনে মন্ত্রী ও কমিশনারকে বিদায় সম্ভাষণ জানায় বিনু। সঙ্গে মহকুমা হাকিম ও উভয়পক্ষের পরিকরগণ। কিন্তু মন্ত্রীর মুখ বেজার। তিনি ব্যঙ্গ করে বলেন, "আশা করি আপনি আরো একটা চর জয় করবেন।"

"যদি বিনা রক্তপাতে সম্ভব হয়।" বিনু আশা করে।

বিনুর কাছে মুর্শিদাবাদ ছিল একটা চ্যালেঞ্জ। যেমন নেহরুর কাছে কাশ্মীর ছিল একটা চ্যালেঞ্জ। গান্ধীজীকে একজন ইংরেজ বন্ধু প্রশ্ন করেন, "হিন্দু-প্রধান ভারতে মুসলিম-প্রধান কাশ্মীর থাকে কোন্ যুক্তিতে?" মহাত্মা উত্তর দেন, "হিন্দু-প্রধান পশ্চিমবঙ্গে যদি মুসলিম-

প্রধান মুর্শিদাবাদ থাকতে পারে তবে হিন্দু-প্রধান ভারতে মুসলিম-প্রধান কাশ্মীরও থাকতে পারে। আমাদের এটা সেকুলার স্টেট। এ রাষ্ট্রে যে যার ধর্ম পালন করতে পারে, কিন্তু নাগরিক হিসাবে কেউ হিন্দু বা কেউ মুসলিম নয়, সকলেই ভারতীয়।”

তাই যদি হয় তবে মুসলিম বাছাই করে সীমান্ত উজাড় করা কেন? আসল কারণটা কি সেখানে বেছে বেছে হিন্দু বসানো? তার মানে লোকবিনিময়। লোকবিনিময় ভারত ও পাকিস্তান ব্যাপী হলে একটা হবে অবিমিশ্র হিন্দু নেশন, অন্যটা অবিমিশ্র মুসলিম নেশন। পার্টিশন যদি ইভিল হয়ে থাকে এটা গ্রেটার ইভিল। মহাত্মা সেটা হতে দেননি, তাই নিহত হয়েছেন। সেই মর্মান্তিক ট্রাজেডির পরও যাঁরা সেই খেলা খেলছেন বিনু তাঁদের নির্দেশে সেই খেলা খেলবে না। শাস্তির জন্যে সে প্রস্তুত।

দিন দুই পরে স্থানীয় বিধায়ক বিনুকে খবর দেন। তিনি শুনেছেন খোদ ঘোড়ার মুখে “আপনার জায়গায় আরেকজন আই সি এস আসছেন।” বিনু এইরকমই প্রত্যাশা করছিল। তবে এমন তড়িঘড়ি নয়। হয়তো অমুক তারিখের মধ্যে কার্যোদ্ধার করার তাগিদ ছিল। কিন্তু সে যেদিন চার্জ দেবে তার একদিন কি দুদিন আগে সেই গোপন আদেশটি প্রত্যাহৃত হয়। ততদিনে নেহরু দেশে ফিরে এসেছিলেন। ব্যাপারটা কি কাকতালীয়?

বহরমপুর কোর্ট স্টেশনে বিনুকে বিদায় দিতে একজনকেও দেখা গেল না। কিন্তু বেলডাঙা স্টেশনে কে এক অজানা অচেনা প্রৌঢ় মুসলমান এসে তার কামরায় এক হাঁড়ি রসগোল্লা রেখে যান। বিনু প্রশ্ন করার আগেই ট্রেন ছেড়ে দেয়। তখন সপরিবারে মিষ্টিমুখ। মধুরেণ সমাপয়েৎ।

কলকাতায় হোমরা চোমরাদের হাঁড়িমুখ। কেউ কথা বলেন না। সে যেন কী একটা গুরুতর অপরাধ করে এসেছে। যিনি ভিতরের খবর জানতেন তেমন এক বন্ধু তাকে বলেন, মন্ত্রী মহোদয়ের মুখে মুর্শিদাবাদের কাহিনী শুনে গোটা ক্যাবিনেট মিটিং একবাক্যে গর্জে ওঠে, “এক্ষুণি তাড়ান।”

বিনুর অপসারণে দুঃখিত হন তার পুরাতন বন্ধু এক প্রাক্তন মন্ত্রী। বলেন, “দিল্লি থেকে যিনি টেলিফোন করেছিলেন তাঁর পলিসি হচ্ছে তাঁর ভাষায় ভীতসে প্রীত হোতা হ্যায়। ভীতি থেকে প্রীতি উৎপন্ন হয়। ভীত করেই তিনি পাকিস্তানকে প্রীত করবেন। ভীতি দেখিয়েই তিনি সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়কেও প্রীত করবেন। ওপার থেকে যদি শরণার্থীরা আসে এপার থেকে মুসলিম শরণার্থীরা যাবে। টু ওয়ে ট্রাফিক। রক্তপাত হলে মুসলমানেরই দোষে হবে।”

বিনু ব্যথিত হয়ে বলে, “প্রাচীন গ্রীকদের মতে দেবতারা যাদের বিনাশ করতে চান তাদের পাগল করে দেন। এসব পলিসি পাগলের মতো পলিসি। এসব কাজ পাগলের মতো কাজ। বাধা না দিলে বাঙালি জাতিটাই উচ্ছন্ন যাবে। গান্ধী নেই, এখন নেহরু ভরসা।”

অল্পদিনের অসুখে কিরণশঙ্কর রায় মারা যান। বিনু তাঁর শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হয়ে যোগ দেয়। তাঁর পুত্রকে সমবেদনা জানায়। ব্যক্তিগত সম্পর্ক তো রাজনৈতিক কিংবা প্রশাসনিক সম্পর্ক নয়। তাতে চিড় ধরে না।

চীফ সেক্রেটারি সুকুমার সেন বিনুকে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে উচ্চতর পদের জন্যে সুপারিশ করেন। জবাহরলালকেও বলেন বিনুর উপর অবিচার হয়েছে। সে কিন্তু ইতিমধ্যে মনঃস্থির করেছিল যে, আর নয়। সব রকম অভিজ্ঞতাই হয়েছে। মায় অর্ধসামরিক

অপারেশন। আজে বাজে মামলার বিচার করা আয়ুর অপচয়। সাহিত্যের সাধনা অখণ্ড মনোযোগ দাবি করে। সেটা বহুদিন অবহেলিত রয়েছে। সে বলে, সে আর চাকরি করবে না। জবাহরলালকেও বলা নিরর্থক। সময় অর্থের চেয়ে মূল্যবান। সে চায় সাহিত্যের জন্যে সময়।

একদিন তার অসুখ করে। মাথার ভিতরে যেন আগুন জ্বলছে। কথা বলতে গেলে জিব জড়িয়ে যাচ্ছে। একটা কথা বলতে আরেকটা কথা বেরিয়ে আসছে। মুখ বেঁকে গেছে। বিনু বুঝতে পারে এটা প্রকৃতির ওয়ার্নিং। মোমবাতি দু'দিক থেকে পোড়ানোর পরিণাম। বড় অফিসার ও বড় সাহিত্যিক এক সঙ্গে দুই হতে চাইলে অকাল মৃত্যু।

সে মীরাকে একটা আধুলি ধরিয়ে দেয়। রাজার মাথা উঠলে পদত্যাগ। নইলে নয়। রাজার মাথা ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগপত্র লেখা হয়। বলা হয় তার শরীরের মোমবাতি দু'দিক থেকে পুঁড়ছে, তাকে সাহিত্যের জন্যে চাকরি ছাড়তে হবে। মীরা বলে, "তোমার উচ্চতা বাড়বে।"

পদত্যাগপত্র গভর্নর জেনারেল মঞ্জুর করেন। কিন্তু তার পরেও চিফ সেক্রেটারি তাকে পুনর্বিবেচনা করতে বলে পাঠান। শান্তিনিকেতনে বাসা মিলছিল না বলে সে আরো কয়েক মাস সময় চায়। মুখ্যমন্ত্রী সে অনুরোধ মঞ্জুর করেন। শান্তিনিকেতনে বাসা মেলে। বিনু যাবার জন্যে তৈরি, এমন সময় নতুন চিফ সেক্রেটারি সত্যেন্দ্রনাথ রায় একমাসের জন্যে জুডিসিয়াল সেক্রেটারি পদে কাজ চালাতে আহ্বান করেন। একমাসের জায়গায় আরো দু'মাস, তার পরে আরো তিনমাস এমনি করে ছ'মাস কাজ করে বিনু অবশেষে নিষ্কৃতি পায়। সেক্রেটারিয়াটের অভিজ্ঞতাটা বাকি ছিল, সেটাও হল। সেই সঙ্গে লিগাল রিমেমব্রান্সার পদে হাইকোর্টের অভিজ্ঞতাও। ততদিনে তার পুরো পেনসন পাওয়া হয়েছে। একুশ বছরের চেয়ে কয়েক মাস বেশি কার্যকাল। সাতচল্লিশ বছর বয়স। ইচ্ছা করলে আরো তেরো বছর থাকতে পারত। যদি বাঁচত। অথবা যদি সাহিত্য সেবা থেকে বিরত হত।

সেই বাড়তি ছ মাসের সবচেয়ে বড়ো লাভ বিধানচন্দ্রের সঙ্গে সদ্ভাব। বেলাশেষে তিনি বিনুকে ডেকে পাঠাতেন, দুটো একটা সরকারি বিষয়ে কথার পর আপনার থেকে বলতেন তাঁর জীবনদর্শনের অপ্রাসঙ্গিক কথা। বোধহয় সাহিত্যিক বিনুকে। ঘরে আর কেউ থাকত না। দু'জনে মুখোমুখি।

তাকে বিদায় সম্বর্ধনা দেন সেক্রেটারিয়াটের বিচারবিভাগীয় কর্মীরা ও স্বয়ং মন্ত্রী মহোদয়। সব ভালো যার শেষ ভালো।

বিনুর নিভৃতবাস

রুশো টলস্টয় তথা গান্ধীজীর প্রভাবে বিনু তার প্রথম যৌবনে ভেবে রেখেছিল যে তাকে একদিন প্রকৃতির আরো কাছাকাছি যেতে হবে। হতে হবে সুদূর গ্রামবাসী, জনগণের জীবনের শরিক। তখনি সে লিখতে পারবে টলস্টয়ের 'তেইশটি উপকথা'র মতো বই। ইতিমধ্যে মিটিয়ে নিতে হবে 'সমর ও শান্তি' আর 'আনা কারেনিনা'র মতো বৃহৎ উপন্যাস রচনার সাধ। এক্ষেত্রে তাঁর অন্যতম পূর্বসূরী ছিলেন রম্যাঁ রলাঁ। লিখেছিলেন 'জাঁ ক্রিস্তফ'।

এখন অবসর তো নেওয়া গেল। আপাতত শান্তিনিকেতনই তার নিভৃতবাসের

মনোমত স্কুল। এটা পূর্বপরিকল্পিত। পুত্রকন্যার পড়াশুনার খাতিরে। তারা যেখানেই যাক স্কুল-কলেজে পড়তে চাইবে। তাদের সমবয়সী মধ্যবিত্ত সন্তানদের মতোই তাদের ধ্যানধারণা। মহাত্মা গান্ধী তাঁর পুত্রদের নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় যেসব পরীক্ষানিরীক্ষা করেছিলেন, গান্ধীভক্ত বিনু ও মীরা পুত্রকন্যাদের নিয়ে তেমন কিছু করতে ভরসা পায় না। তারা বরং রবীন্দ্রভক্তদের মতো গুরুদেবের অনুসরণ করবে। সুতরাং শান্তিনিকেতনে সপরিবারে নিভৃতবাসই শ্রেয়।

বিনু শান্তিনিকেনে যাচ্ছে শুনে তার এক শুভানুধ্যায়ী বয়োজ্যেষ্ঠ অফিসার বলেন, "শান্তিনিকেতন কি সেই শান্তিনিকেতন আছে? এখন ওটা কলকাতার একটা শহরতলি। তেমনি সব বড়ো বড়ো বাড়ি।"

তার অপর এক শুভানুধ্যায়ী কাজীসাহেব বলেন, "ওইখানেই থামবেন না। গভীরভাবে যাবেন আরো অভ্যন্তরে।"

কবিগুরু সেটা ভাবতেন। সেইজন্যেই শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠা। শ্রীনিকেতনের কার্যকলাপ গ্রামবাসী কৃষি ও কারুজীবীদের নিয়ে। ছাত্র অবস্থায় বিনু প্রথমবার শান্তিনিকেতনে যায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। সে শ্রীনিকেতন দেখতে গিয়ে কর্মীদের সঙ্গে আলাপ করে। নজরে পড়ে একজন কর্মীকে গুরুদেবের উপদেশ—"গড়ার কাজে ষোল আনা শক্তি নিয়োগ কর। ভাঙার কাজে সিকি পয়সা শক্তি বাজে খরচ কোরো না।" ভাষাটা ঠিক মনে নেই। কতকটা এইরূপ। রবীন্দ্রনাথ অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী কি অসহযোগীদের গঠনের কাজ করতে নির্দেশ দেননি? চরকা কাটতে তারা বাধ্য। সারা ভারতে অসংখ্য স্বরাজ আশ্রম ছিল। প্রত্যেকটিতে হাতেকাটা সুতো উৎপন্ন হত। খাদি বলে একটা শিল্পই নতুন করে প্রাণ পায়। দেশের লোক একটু বেশি দাম দিয়েই কেনে। বহু দরিদ্রের অন্নসংস্থান হয়।

বিনুর এক ভাই জাপানে শিক্ষার্থী হয়ে যায়। গান্ধীজী অসুস্থ শুনে জাপানীরা রোজ তাদের কাছে এসে জানতে চায় তিনি কেমন আছেন। সে জিজ্ঞাসা করে, "আপনাদের এত উৎকণ্ঠা কেন?" তারা বলে, "উৎকণ্ঠা হবে না? গান্ধী যে গরিবের মা বাপ।" ভাই জিজ্ঞাসা করে,"আচ্ছা, কে বড়ো? মিকাডো না গান্ধী?" তারা বলে, "গান্ধী। মিকাডোকে জাপানীরাই মানে। গান্ধীকে সব দেশের লোক।"

চরকায় সুতো কাটা ছিল একদা ব্রিটেনের কন্যা ও বধূদের মনোপলি। সেই সূত্রেই তাঁরা কিছু উপার্জন করতে পারতেন। সুতো কাটার কল উদ্ভাবনের পর থেকে তাঁরা তাঁদের আয়ের সূত্র থেকে বঞ্চিত। এদেশেও বামুনের মেয়েরা চরকায় পৈতের সুতো কাটতেন। কিন্তু সবাইকে চরকায় সুতো কাটতে হবে, দিনে অন্তত আধ ঘণ্টার জন্যে, এটা গান্ধীজীর নতুন এক ফরমান। পুরুষরা কোনো কালেই বা কোনো দেশেই চরকায় সুতো কাটেনি। বিনু কিছুদিন কেটে মীরার উপর ছেড়ে দেয়। মীরা যেখানেই যায় স্থানীয় মেয়েদের নিয়ে চরকার ক্লাস করে। তাতে তাদের কিছু রোজগার হয়। সেটা তুচ্ছ নয়।

শান্তিনিকেতনে এগারো বছর আগে গুরুদেব মীরাকে বলেছিলেন, "শুনেছি তুমি কর্মিষ্ঠা মেয়ে। এখানে এত রকমের বহু বিভাগ। একটা না একটাতে তোমার ঠাঁই হবে।" এখন সে কোনো বিভাগে যোগ দিতে চায় না। আশ্রমে মেয়েদের নিয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করে। একটা শিশু পাঠশালার প্রতিষ্ঠা হয়। বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের দেখাশুনাও তার একটা

স্বেচ্ছাবৃত কর্ম। তারা আসে যায়, গানবাজনা করে। প্রতি সপ্তাহে একটা নির্দিষ্ট দিনে।

ছেলেমেয়েরা কলকাতার খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসে শান্তিনিকেতনের আকাশে ডানা মেলে উড়ছে। পড়াশুনা গাছতলায়, খেলাধূলা খেলার মাঠে, সন্ধ্যাবেলা নৃত্যগীতের আসরে বা সভাসমিতিতে, তারপরে নীড়ে ফিরে আসে। রথীবাবুকে বলে রথীদা, ইন্দিরাদেবীকে বিবিদি, প্রতিমাদেবীকে বৌঠান, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দাদা ও দিদি। বেশ একটা ঘরোয়া পরিবেশ। এমনটি কলকাতায় ছিল না। ওদের আনন্দে ওদের বাপমায়ের আনন্দ।

শান্তিনিকেতনে আসার মুখে বিনুকে জানানো হয় বিশ্বভারতীর নাম হতে যাচ্ছে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এটিও হবে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, চ্যান্সেলর হবেন জবাহরলাল নেহরু, ভাইস-চ্যান্সেলর রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিনুকে অনুরোধ করা হয় রেজিস্ট্রার হতে। যাতে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়টা দাঁড়িয়ে যায়। বিনু বছর দুয়েকের জন্যে রাজি হয়। কিন্তু শান্তিনিকেতনে এসে রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ও পার্লামেন্টের বিশ্বভারতী ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট পড়ে তার মত বদলে যায়। এ পদের দায়িত্ব বহন করলে তার সাহিত্যের কাজ ব্যাহত হবে। সে সাহিত্য নিয়ে থাকবে বলে সরকারি চাকরি ছেড়েছে, এখন বিশ্বভারতী নিয়ে থাকতে হলে সাহিত্যের কাজ ছাড়তে হবে। বিনুর পরামর্শে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেজিস্ট্রার নিশিকান্ত সেনকে উক্ত পদ দেওয়া হয়। তাঁর শর্ত বিনু যেন তাঁকে সাহায্য করে।

নিশিকান্তবাবু নাছোড়বান্দা। বিনুকে প্রয়োজনমতো সাহায্যও করতে হয়। কর্মসমিতির সদস্যরূপেও তার উপস্থিতি আবশ্যক। কিন্তু রথীবাবুর পদত্যাগে তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচন নিয়ে দলাদলি বেধে যায়। বিনুও তাতে জড়িয়ে পড়ে। বিনু পরে সদস্যপদ ত্যাগ করে সাহিত্যে মন দেয়।

দ্বিতীয় যৌবনের জন্যে বিনু অস্থির হয়ে উঠেছিল। দ্বিতীয় যৌবন না পেলে প্রথম যৌবনের উপাখ্যান লেখা স্বচ্ছন্দ হয় না। যে লিখবে সে তখনকার দিনের তরুণ। যাদের কথা লেখা হবে তারাও তাই। লিখতে হবে প্রেমের আলাপ প্রেমের ভাষায়। তার জন্যে রাজকর্ম থেকে অবসরের আবশ্যকতা ছিল। সেটাও তার অপসরণের অন্যতম কারণ।

রায় লিখতে লিখতে রিপোর্ট লিখতে লিখতে বিনুর লেখার হাত খারাপ হয়ে গেছল। অর্থাৎ সাহিত্যের বিচারে খারাপ। বেশ কিছুকাল লেগে যায় লেখার হাত ভালো করতে। অর্থাৎ সাহিত্যের বিচারে ভালো। ছোট ছোট উপন্যাস লেখে। ছোট গল্প লেখে। প্রবন্ধ তো লেখেই। সাহিত্যিক তথা সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রবন্ধ। ছড়াতেই তার হাত খোলে। ছেলেদের জন্যে ছড়া। বড়োদের জন্যে ছড়া।

কিন্তু ব্যাঘাত থেকে নিষ্কৃতি কোথায়? ভারত সরকার তাকে নবগঠিত সাহিত্য অকাদেমির সংসদের সদস্য মনোনয়ন করেন। সংসদের সদস্যরা তাকে কর্মসমিতির সদস্য নির্বাচন করেন। এই সুবাদে তাকে বার বার দিল্লি যেতে হয়। সম্মান বড়ো কম নয়। নেহরু সভাপতি, রাধাকৃষ্ণন্ সহ-সভাপতি, মওলানা আজাদ, সর্দার পানিক্কর প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিরা সদস্য। এঁদের সঙ্গে এক টেবিলে বসার সৌভাগ্য। কিন্তু কিছুদিন পরে বিনু উপলব্ধি করে যে অকাদেমির স্বীকৃত বারোটা সাহিত্যের বিবর্তন একভাবে হয়নি, বিকাশ এক মানের নয়, সমস্যা এক এক সাহিত্যের এক এক প্রকার। অতএব বিভিন্ন ভাষার জন্যে বিভিন্ন শাখা অকাদেমি আবশ্যক। তার কথা শুনে নেহরু চমকে ওঠেন। বলেন অমন করলে ভাষাভিত্তিক

রাজ্য গঠনের দাবি উঠবে, ভারত টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। রাধাকৃষ্ণন্ নেহরুর প্রতিধ্বনি করেন। আর সবাই নীরব। কিন্তু শ্রীরামুলুর অনশনে প্রাণত্যাগের পর নেহরু চটপট অন্ধ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। একে একে অনেকগুলি ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠিত হয় নেহরু জীবিত থাকতেই। পরে ভাষার ভিত্তিতে পাঞ্জাব তথা অসমের পুনর্বিন্যাস ঘটে।

এসব রাজ্যের অনেকগুলিতেই ভাষাভিত্তিক অকাদেমি স্থাপিত হয়। তখন দিল্লির সাহিত্য অকাদেমিরও চারটি আঞ্চলিক শাখা স্থাপন না করে উপায় থাকে না। ততদিনে বিনু পদত্যাগ করে নিজের কাজে মন দিয়েছে। অকাদেমির কাজ বিনু ছাড়া আরো অনেকে করতে পারেন। যেটা সে ছাড়া আর কারো দ্বারা হবার নয় সেই কাজটি তার করণীয় কাজ। যেমন তার পরিকল্পিত পাঁচ খণ্ডের—পরে ছয় খণ্ডের উপন্যাস। তেমনি তার পরিকল্পিত চার খণ্ডের প্রেমের উপাখ্যান। তার এক সাহিত্যিক বন্ধুর মতে সে বিষয়টাকে বেছে নেয়নি, বিষয়টাই তাকে বেছে নিয়েছে।

বিষয় তো সেই ইটারনাল ফেমিনিন যার উল্লেখ সে পেয়েছিল প্রমথ চৌধুরীর 'চার ইয়ারি কথা' উপাখ্যানের তৃতীয় উপাখ্যানে। সোমনাথের জবানীতে। ভাস্কর্যে তার দৃষ্টান্ত ভিনাস ডি মাইলো। কাব্য ও নাটকে কোথাও সে হেলেন, কোথাও দ্রৌপদী, কোথাও বিয়াত্রিস, কোথাও রাধা, কোথাও শকুন্তলা, কোথাও বসন্তসেনা, কোথাও গ্রেটচেন, যার সম্বন্ধে গ্যেটে লিখেছেন চিরন্তনী নারী আমাদের উর্ধ্বে নিয়ে যায়।

এই যে চিরন্তনী নারী একে একালেও দেখা যায়। এদেশেও। ওদেশেও। বিনুর ধারণা সে এক ঝলক দেখেছে। তাই সেটুকু অবলম্বন করেই উপন্যাস লিখতে মনঃস্থ করেছে।

বিষয়টি বিনুকে আবিষ্ট করে রাখে আযৌবন। সে যখন সময় পায় তখন সে পঞ্চাশোর্ধ্বে। ধ্যান করে দ্বিতীয় যৌবনের। কাহিনী লেখে প্রথম যৌবনের। প্রথম দুই ভাগ লিখতে বাধা পায় না। কিন্তু তৃতীয় ভাগ আরম্ভ করতে হাত ওঠে না। গোড়াতেই লিখতে হত এমন দুটি বাক্য যা না লিখলে নয়। তাতেই নিহিত ছিল কাহিনীর বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সে দুটি বাক্য লিখলে অনিষ্ট হত একজন নারীর ও তার সন্তানের। লেখা হয়তো রূপোত্তীর্ণ, রসোত্তীর্ণ তথা কালোত্তীর্ণ হবে, লেখক হয়তো অমর হবে, কিন্তু অপরের জীবনে যে প্রতিক্রিয়া সম্ভবপর সেটা কি বিবেকসম্মত না বিবেকবিরুদ্ধ? এই উভয়সঙ্কট থেকে উদ্ধারের উপায় কি সেই দুটি বাক্যের পরিবর্তন? না, সেটাও সততা নয়।

বিনুর মনে পড়ে আলমোড়ায় এক পর্বতারোহী ইংরেজ ভদ্রলোকের উক্তি। তিনি বলেন আরোহী যখন দেখতে পায় যে আর এক কদম এগোলেই নিশ্চিত মরণ তখন সে আর এগোয় না। সে বোঝে পর্বতের কাছে সে পরাস্ত হয়েছে। সে পরাজয় মেনে নেয়। বিনু ঘোষণা করে সে আর লিখবে না। বই সেইখানেই সমাপ্ত। কিন্তু প্রকাশক তা শুনবেন কেন? পাঠকই বা তা মেনে নেবেন কেন? বিনুর মনে পড়ে মহাত্মা গান্ধী তাঁর এক অনুগামীকে বলেছিলেন, যেটা আরম্ভ করবে সেটা শেষ করবে। মহাত্মার উপদেশ শিরোধার্য করলে বিনুকে আরো লিখতে হয়। কিন্তু সেই দুটি বাক্য বাদ দেয় কী করে? লেখেই বা কী করে? বছর দশেক লেগে যায় আভ্যন্তরিক সংগ্রামে। ছেলে পরামর্শ দেয় বইখানা লিখে পাণ্ডুলিপি সিন্দুকে বন্ধ করে রাখতে। মৃত্যুর পরে প্রকাশ করা হবে। মন্দ পরামর্শ নয়। কিন্তু প্রকাশক টের পেলে নিশ্চয়ই দাবি করবেন ও অর্থের টানাটানি থাকলে কোনো এক দুর্বল মুহূর্তে বিনু সে পাণ্ডুলিপি ছাপতে দিতে পারে। তাই বিনু সে পরামর্শ খারিজ করে।

শেষপর্যন্ত যেটা স্থির হয় সেটা সেই দুটি বাক্যের পরিবর্তন। সত্যং ব্রুয়াৎ প্রিয়ং ব্রুয়াৎ মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্। সত্য বলবে, প্রিয় বলবে, অপ্রিয় সত্য বলবে না। এটা হল ঋষিবাক্য। তারপর লেখা তর তর করে চলে। বই সারা হয়। কিন্তু চার খণ্ডে নয়, বর্ধিত তৃতীয় খণ্ডে। যথেষ্ট দেরি হয়েছে, আর দেরি নয়।

বিনুর পরিকল্পনা ছিল একই নায়কের তিনবার প্রেমের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব অবলম্বন করে তিন পর্যায়ের উপন্যাস রচনার। প্রথম পর্যায়ের মাঝখানে থেমে যেতে বাধ্য হওয়ার পর সে ভয় পায় যে আবার হয়তো সেইরকম সঙ্কটে পড়বে। আদালতের সাক্ষীরা শপথ পাঠ করার সময় উচ্চারণ করে, সত্য বলিব, সম্পূর্ণ সত্য বলিব, সত্য ব্যতীত অন্য কিছু বলিব না। লেখকরূপে বিনুও উচ্চারণ করে, সত্য বলিব, সত্য ব্যতীত অন্য কিছু বলিব না, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য বলার শপথ নিতে সাহস পায় না। সম্পূর্ণ সত্য বলতে গেলে আর পাঁচজনকে জড়াতে হয়, সেটা তাদের দিক থেকে আপত্তিকর হতে পারে, তাদের আপত্তি উপেক্ষা করার স্বাধীনতা কি তার আছে?

আর্ট জীবনের থেকে নেয়। জীবনকে অনুসরণ করেই অতিক্রম করে। তখন জীবন আর্টের অনুসরণ করে। এটাই বিনুর মৌল ধারণা। কল্পনার খাদ মেশাতে হয়, তা বলে কল্পনাই সোনা নয়। সোনা হচ্ছে সত্য উপলব্ধি। যার জীবনে যতটুকু বা যত বেশি। সে প্রকাশ করার মতো কিছু পেয়ে থাকলে তবেই তো দেবে কিন্তু প্রকাশ করতে গিয়ে সবটা ব্যক্ত করা যায় কি? বিনুর ধারণা ছিল. হ্যাঁ, যায়। ক্রমে প্রত্যয় হল, না, যায় না। সঙ্কট বার বার আসবে। পার হওয়া শক্ত। বিশেষত তৃতীয় পর্যায়ের বেলা। বৈষ্ণব কবিরা রাধাকৃষ্ণের লীলা বলে চালাতেন। সে যুগ কি আর আছে!

বিনু সম্পূর্ণ সত্যের প্রতিশ্রুতি না দিয়ে যতদূর সম্ভব ততদূর অগ্রসর হয়। তাতে তার মন ভরে না। উপন্যাস তার কাছে একটুখানি সোনা, বাকিটা খাদ নয়। তাই যদি হত তবে সে বিস্তর উপন্যাস লিখত। ভারতচন্দ্রের মতে, সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর। বিস্তর মিছার বেসাতি তার নয়। সম্পূর্ণ সত্য বলতে পারলে সে ভারমুক্ত হত। সে কি ভারমুক্ত হয়ে অপ্রকাশিত রেখে যেতে পারত না? না, সেই পরিমাণ মনের জোর তার ছিল না।

উপন্যাস রচনায় তার আদর্শ ছিল রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস নয়, টলস্টয়ের। যেমন 'সমর ও শান্তি' ও 'আনা কারেনিনা' কিন্তু 'ক্রয়টৎসার সোনাটা' নয়। ততদিনে তিনি নীতি-নিপুণ হয়ে উঠেছিলেন। আর্ট বিনুর মতে মরালিটির বাহন নয়। তাকে নীতির শাসনে আনলে সে বহুবর্ণ থাকে না, একরঙা হয়ে ওঠে। তাতে সমাজের হয়তো কিছু লাভ হয়। কিন্তু মানুষ কি কেবল সামাজিক জীব? মানুষ হচ্ছে প্রকৃতির মতো ভালোয় মন্দে, সাদায় কালোয়, জ্ঞানে অজ্ঞানে, সুন্দরে কুৎসিতে মেশা, তা সত্ত্বেও পশুর চেয়ে উর্ধ্ব স্তরে, কিন্তু অতিমানব বা দেবপ্রতিম নয়। বিনু নিজেকে একজন আর্টিস্ট মনে করে। মরালিস্ট নয়।

তবে এটাও সে মানে যে জগতে মরালিটির স্থান আছে। এ জগৎ কেবল প্রকৃতির নিয়মে নয়, নীতির নিয়মেও শাসিত। আর্টে তার প্রতিফলন পড়তে পারে, কিন্তু আর্টকে তার প্রচারমাধ্যম না করলেই হল। একই কথা রাজনীতি সম্বন্ধেও বলা যায়। জীবনে যদি রাজনীতি থাকে আর্টেও থাকবে। কিন্তু আর্টকে করবে না তার প্রচারমাধ্যম। ফরাসী বিপ্লব নিয়ে কত না উপন্যাস লেখা হয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়েও হবে। তাতে রাজনীতির প্রতিফলন থাকবেই। না থাকলে তা আলুনি লাগবে।

বিনু কি কেবল জীবনশিল্পী? সে কি একজন নাগরিক নয়? নাগরিক হিসাবে কি তার কোনো বক্তব্য নেই? থাকলে তাকে সে বক্তব্য পেশ করতে হয়। কখনো কখনো সেটা অবশ্য কর্তব্য। যেমন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়। কিংবা অসমের বঙ্গাল খেদার। কিংবা চীন-ভারত সংঘর্ষ। কিংবা কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ ও শেখ আবদুল্লার সঙ্গে বিরোধ।

যার ভোট দেবার অধিকার আছে তার মুখ খোলারও অধিকার আছে। সে তার লেখনীর মুখ খুলতে পারে। লেখা হয়তো রসোত্তীর্ণ তথা রূপোত্তীর্ণ হবে, কিন্তু কালোত্তীর্ণ হবে কী করে? বিষয়টা যে নিতান্তই সাময়িক। তার স্থায়িত্ব কতক্ষণ?

রম্যাঁ রলাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় বিনু তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল, সাহিত্যিক কি সমসাময়িক সমস্যা নিয়ে লেখনী চালনা করতে পারে? রলাঁ বলেন, নিশ্চয়। বিনু জানতে চায়, শেক্সপীয়ারও কি করতেন? রলাঁ বলেন, হ্যাঁ। সম্ভবত তাঁর নাটকের ভিতরে তা প্রচ্ছন্ন আকারে ছিল। বিনু সেটা লক্ষ্য করেনি। তবে রলাঁ যে সমসাময়িকের প্রতি কর্তব্য করেছেন ও করতেন এটা বিনুর কাছে স্পষ্ট। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় লেখা তাঁর 'যুদ্ধের উর্ধ্বে' একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেও তার মূল্য শেষ হয়ে যায়নি। তিনি ফরাসী জার্মান বিরোধের উর্ধ্বে ছিলেন। তিনিই বোধহয় সেদিন একমাত্র ফরাসী যিনি জার্মানদের শত্রু ভাবতেন না। ফরাসী জনমত তাঁকে সেদিন ক্ষমা করেনি। যুদ্ধের পরে তাঁকে ফ্রান্সের বাইরে সুইটজারল্যান্ডে স্বেচ্ছানির্বাসিত হতে হয়েছিল। লেখক তার মানবপ্রেমের জন্যে বনবাস বরণ করবে এটি তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তবে তাঁর পাঠকরা তাঁকে ছাড়েননি। নানা দেশের পাঠক।

সমসাময়িক সমস্যা নিয়ে লিখবে না বিনু আর এই সংকল্পে দৃঢ় থাকতে পারেনি। ধর্মান্ধ দেশকে দৃষ্টিদান করা চক্ষুষ্মানের অবশ্য কর্তব্য। ফল যে বিশেষ কিছু হল তা নয়। ধর্মের ইস্যুতে দেশ ও প্রদেশ দ্বিধাবিভক্ত হল। তা বলে কি সেসব লেখা মূল্যহীন? না, তাদের ঐতিহাসিক মূল্য আছে!

ধর্মের ইস্যুতে আয়ারল্যান্ড ভাগ হয়ে গেল। অথচ তার স্বাধীনতার সংগ্রাম ভারতের চেয়েও পুরাতন। তাতে ক্যাথলিক প্রটেস্টান্ট উভয় সম্প্রদায়ের রক্ত মিশেছিল। ইয়েটস, বার্নার্ড শ, জর্জ রাসেল এঁরা সবাই প্রটেস্টান্ট। কিন্তু দেশভাগের সময় দেখা গেল এঁরা নিরুপায়। সিদ্ধান্তটা যাঁরা নিলেন তাঁরা ক্যাথলিক প্রটেস্টান্টের গৃহযুদ্ধ নিবারণের জন্যেই নিলেন। দেশভাগ খারাপ, কিন্তু গৃহযুদ্ধ আরো খারাপ। বিশেষত ধর্মের ইস্যুতে। লিঙ্কনের সামনে তেমন কোনো সাম্প্রদায়িক ইস্যু ছিল না।

বিনুর ধারণা ছিল আধুনিক যুগের মানুষ ধর্ম নিয়ে লড়তে চায় না, সেটা মধ্যযুগের মানুষের কাছে জীবনমরণের ব্যাপার। কিন্তু তাই যদি হত তবে আয়ারল্যান্ডের মানুষ আধুনিক যুগের বিংশ শতাব্দীতে নিঃশ্বাস নিয়েও ধর্মের প্রভাবে দ্বিধাবিভক্ত হত না। স্বদেশে ক্যাথলিক প্রটেস্টান্টের মধ্যে যতটা ব্যবধান এদেশে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে তার চেয়ে আরো বেশি। পুরাণসর্বস্ব হিন্দুধর্মের সঙ্গে কোরানসর্বস্ব মুসলিমধর্মের সমন্বয় যেন বৃত্তের সঙ্গে চতুষ্কোণের সমন্বয়। সেটা সমন্বয় নয়, সহনশীলতা। মিলন যেটুকু হয়েছে সেটুকু সুফী ও বৈষ্ণবদের মতো পুরাণনিরপেক্ষ তথা কোরাননিরপেক্ষ সাধকদের জীবনেই হয়েছে। আর হয়েছে তাঁদের ভক্তদের মধ্যে। পীরদের মাজারে বা উরসে যাঁরা জমায়েত হন তাঁদের সবাই যে মুসলমান তা নয়, বিপুল সংখ্যক হিন্দু। অথচ এঁরাই আবার গোহত্যা নিয়ে বা মসজিদের

সামনে বাজনা নিয়ে রক্তারক্তি করতে পেছপাও হন না। শান্তির পথে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ আবশ্যক হয়।

তৃতীয় পক্ষ বিদায় হলে দুই পক্ষের মধ্যে হানাহানি বেধে যাবে এ ভয় বিনুর মধ্যে ছিল। তাই দেশভাগের সময় সে আইরিশ কবি ও নাট্যকারের মতোই নিরুপায়। তার ভরসা ছিল মহাত্মা গান্ধীর উপরে। সেতুবন্ধ যদি মহাত্মা গান্ধী ও সীমান্ত গান্ধীর জীবনে সম্ভব হয়ে থাকে, সীমান্ত প্রদেশে যদি কংগ্রেস শাসন সম্ভব হয়ে থাকে তবে কী এক অলৌকিক উপায়ে সর্বত্র সম্ভব হবে! ভারত আয়ার্ল্যান্ড নয়। মাভৈঃ। কিন্তু তৃতীয় পক্ষের বিদায়ের সময় যে দৃশ্য দেখা গেল তা তার কল্পনাতীত। পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবে লক্ষ লক্ষ হিন্দু মুসলমান শিখ পরস্পরের হাতে নিহত। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রায় নব্বই লক্ষ হিন্দু শিখ শরণার্থী সমাগত। এদিক থেকেও লক্ষ মুসলমান বিতাড়িত। এর অনুরূপ ব্যাপার দুই বাংলার হিন্দু মুসলমানের ক্ষেত্রেও ঘটতে পারত, যদি না মহাত্মা গান্ধী অহিংস উপায়ে সফল হতেন। তা সত্ত্বেও বিস্তর হিন্দু ওপার থেকে এপারে চলে আসে, বহু মুসলমান এপার থেকে ওপারে চলে যায়। কতকটা নিরাপত্তার খাতিরে, কতকটা চাকরিবাকরির আশায়, কতকটা ক্ষমতার প্রলোভনে।

শান্তিনিকেতনে গিয়ে বিনু সেখানকার ছাত্র ও অধ্যাপকদের মধ্যে কয়েকজন সহকর্মী পায়। তাঁদেরই উৎসাহে পূর্ব ও পশ্চিমবাংলায় সমমনস্ক কয়েকজন সাহিত্যিককে নিয়ে সাহিত্যমেলা অনুষ্ঠিত হয় বিনুর তত্ত্বাবধানে। তারিখটা, ঐতিহাসিক একুশে ফেব্রুয়ারির কাছাকাছি। প্রকারান্তরে জানিয়ে দেওয়া হল যে দেশভাগ সত্ত্বেও বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য এক ও অবিভাজ্য। রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন তার দৃষ্টান্ত। রথীবাবু ও তাঁর সহযোগীরা সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেন। লোকে না চাইতেই চাঁদা দিয়ে যায়।

শান্তিনিকেতনকে বলা যেতে পারে সংস্কৃতির শ্রীক্ষেত্র। এখানে সব দেশের, সব ধর্মের, সব ভাষার সাহিত্য সংগীত ললিতকলা রসিকরা স্বাগত। এটা জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারেরও ঐতিহ্য। বলা যেতে পারে শান্তিনিকেতনের এই বৈশিষ্ট্য ঠাকুর পরিবারের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেরই সম্প্রসারণ।

তবে শান্তিনিকেতনের সূচনা হয়েছিল সেই নামে একটি অতিথিশালারূপে। সেখানে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অর্থানুকূল্যে সপ্তাহকাল বাস করতে আসতেন বাইরে থেকে ব্রাহ্মসমাজের সদস্য বা সমভাবাপন্ন ব্যক্তিরা। লোকালয় থেকে দূরে খোলামেলা জায়গায় তাঁরা নিরিবিলিতে ধ্যানধারণা করতেন। সেকালের ঋষিদের আদর্শ অনুসরণই ছিল তাঁদের অন্বিষ্ট। ঋষিরা অনুসরণ করেন বলেই দেবেন্দ্রনাথকে বলা হত মহর্ষি। ডাঙা জমিতে একটি কি দুটি ছাতিমগাছ ছিল। ছাতিমতলায় বিশ্রাম করতে আসন পেতে মহর্ষি শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার প্রেরণা লাভ করেন। প্রত্যেক বছর সাতই পৌষ ছাতিমতলায় সেই উপলক্ষে উৎসব হয়। যোগ দেন স্থানীয় ও বহিরাগত ব্রাহ্ম অব্রাহ্ম সর্বসাধারণ। আশ্রমের বাইরে মেলা বসে। সেখানে যাত্রা, কীর্তন, বাউল প্রভৃতি বিচিত্র অনুষ্ঠান হয়। সবচেয়ে জনপ্রিয় অত্যাশ্চর্য আতসবাজি।

'শান্তিনিকেতন' আবাস প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পরে ব্রাহ্মমতে উপাসনার জন্যে একটি উপাসনাগার নির্মিত হয়। বলা হয় মন্দির। যেখানে বিগ্রহ নেই সেখানে মন্দির শব্দের প্রয়োগ বিনুর কাছে নতুন ঠেকে। এই মন্দিরে রবীন্দ্রনাথ যেসব ভাষণ দিতেন সেসব বিনুর

বাল্যকালে 'শান্তিনিকেতন' নামে ছোট ছোট খণ্ডে প্রকাশিত হত। সে যে স্কুলে পড়ত সেখানকার লাইব্রেরিতে কয়েক খণ্ড ছিল। বিনু নাড়াচাড়া করে দেখত।

মহর্ষির আধ্যাত্মিক আদর্শকে সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি দেন কবি রবীন্দ্রনাথ। আশ্রমের নাম হয় ব্রহ্মচর্যাশ্রম, বালক ব্রহ্মচারীদের শিক্ষার জন্যে গুরুকুল আদর্শের আবাসিক বিদ্যালয়, তাতে প্রাচীন বিদ্যার সঙ্গে সংযুক্ত করেন আধুনিক বিদ্যা, তাছাড়া গানবাজনা, ছবি আঁকা, নাট্যাভিনয়, খেলাধূলা, শরীরচর্চা, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ।

ব্রহ্মচর্যাশ্রম আখ্যাটি পরে অপ্রচলিত হয়। ছাত্ররা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দেয়, উত্তীর্ণ হলে কলেজে পড়তে যায়। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ও তাঁর সতীর্থ সন্তোষচন্দ্র মজুমদার কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য আমেরিকা যাত্রা করেন। কবির ইংরেজ ভক্ত পিয়ার্সন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বিদ্যালয়ের কাজে যোগ দেন। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর গুরুদেব বিশ্বের নানা দেশে সম্বর্ধনা পান। পরিবর্তে বিশ্বের বিদ্যার্থী ও বিদ্বানদের আহ্বান করেন শান্তিনিকেতনে এসে কিছুদিন থেকে শিখতে ও শেখাতে। বিদ্যালয়ের চেয়ে উন্নত একটি প্রতিষ্ঠানের নাম রাখেন বিশ্বভারতী। শান্তিনিকেতনে আর একটি মাত্রা যুক্ত হয়।

শান্তিনিকেতনের দীর্ঘকালের জলকষ্ট পরে দূর হয়েছে। গভীর নলকূপ থেকে জল তুলে ঘরে ঘরে সরবরাহ করা হচ্ছে। এত গাছপালা, এত ফুল, এত সবুজ ঘাস এর আগে দেখা যায়নি, কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদে। বলা যেতে পারে এটা একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন। শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠাকালে যদুনাথ সরকার জানিয়েছিলেন যে জল যেখানে দুর্লভ সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় চালাতে যাওয়া বৃথা। কিন্তু গুরুদেব তো বিশ্বভারতীকে বিশ্ববিদ্যালয়রূপে কল্পনা করেননি। তিনি উপাচার্য বলে কোনো পদ সৃষ্টি করেননি, পরীক্ষায় বিশ্বাস করতেন না, ডিগ্রির প্রয়োজন দেখতেন না। বিদ্যার্থীরা নিজেদের পছন্দমতো বই পড়তেন, গবেষণা করতেন, অধ্যাপকদের কাছে পাঠ নিতেন। অধ্যাপকরা অধীত বিদ্যার অংশ দিতেন। যে যার সাধ্যমতো গ্রহণ করত।

গুরুদেবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইন্টারমিডিয়েট কলেজ স্থাপন করা হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য অনুসরণ করা হয়। যথাকালে পরীক্ষা দেওয়া হয়। পাস করলে অন্যত্র বি এ পড়তে যাওয়া হয়। পরে শান্তিনিকেতনেই বি এ পড়ার ব্যবস্থা হয়। কলকাতার পাঠ্যক্রম অনুসরণ করা হয়। যথাকালে পরীক্ষা দেওয়া হয়। এতদূর অগ্রসর হওয়ার পর বাকিটুকুতে আপত্তি কিসের? এমন সময় দেশ স্বাধীন হয়, নতুন সরকার বিশ্বভারতীকে অর্থাভাব থেকে উদ্ধার করতে রাজি হন, উভয় পক্ষের ইচ্ছায় বিশ্বভারতী হয় কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয় হলে নিজস্ব পাঠ্যক্রম, নিজস্ব পরীক্ষা, নিজস্ব ডিগ্রি এসব একে একে প্রবর্তিত হয়। তবে বিশ্বভারতী কোর্স বলে একটা সমান্তরাল পাঠ্যক্রম প্রচলিত ছিল। চার-পাঁচজন ছাত্রছাত্রী অনুসরণ করত। সেটা উঠে যায়। সেটাতে নাকি গুরুদেবের নির্বাচিত পাঠ্য ছিল।

অবসর নিয়ে বিনু যখন সপরিবারে বসবাস করতে যায় তখন সবে বিশ্ববিদ্যালয় পর্ব শুরু হচ্ছে। দেশের আর দশটা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ডিগ্রির সমতা রক্ষা না করলে বিশ্বভারতীর ডিগ্রির মর্যাদা থাকে না, সুতরাং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো করে বিশ্বভারতীকে ঢেলে সাজতে হয়। এটা কারো একার সিদ্ধান্ত নয়। রথীন্দ্রনাথকে দায়ী করা অন্যায়। স্থানীয় অধ্যাপকরা এসব পরিবর্তন সাগ্রহে স্বীকার করেন। তাতে তাঁদেরও আর্থিক

নিরাপত্তা সুদৃঢ় হয়। লাগে টাকা দেবে গৌরীসেন। ততদিনে বেসরকারি চাঁদা বন্ধ হয়ে গেছে। কেউ চাঁদা দেয় না। বিভাগ সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। কলাভবন, সংগীতভবন, চীনভবন ইত্যাদি গড়ে উঠেছে।

গুরুদেবের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎকারের সময় ঘরে প্রবেশ করেন এক চৈনিক আশ্রমিক। কবি পরিচয় করিয়ে দেন। নাম তান ইয়ুনশান। ভদ্রলোক দুটি কথা বলে বিদায় নিলে কবি বলেন, "জাপানী বিদ্বানরাও অত্যন্ত কুশলী, কিন্তু চীনা বিদ্বানদের মধ্যে দেখি প্রাচীনতর এক প্রজ্ঞা। যেটা জাপানীদের মধ্যে পাইনে।" পরে তান সাহেবের সঙ্গে বিনুর পরিচয় প্রগাঢ় হয়। তাঁর চরিত্রে ছিল এক পরিশীলিত বৌদ্ধ স্থিতপ্রজ্ঞতা।

বছর পাঁচেক পরে শান্তিনিকেতন বেড়াতে গিয়ে বিনু চীনভবন দেখতে যায়। সেখানে এক চীনা অধ্যাপক দম্পতির সঙ্গে আলাপ। ভদ্রমহিলা নিবিষ্টমনে কী একখানা বই অনুবাদ করছিলেন। বিনু অবাক হয়ে লক্ষ্য করে ওখানা তার ও মীরার ইংরেজি বই। কিছুদিন পরে তাঁরা চীনদেশে ফিরে যান। কমিউনিস্টরা ক্ষমতা দখল করে। যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। তান সাহেব কমিউনিস্ট নন। তিরিশ বছর পরে বিনু ও মীরা শান্তিনিকেতনে আবার সেই দম্পতির সাক্ষাৎ পায়। বইখানার কী হল জানতে চাইলে ভদ্রমহিলা বলেন সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় তাঁদের দুজনকে ধরে পাড়াগাঁয় চালান করা হয়। সেখানে তাঁর স্বামীকে করতে হত মাঠে গিয়ে চাষ আবাদ আর তাঁকে ঘরে বসে রান্নাবান্না, বাসনমাজা, কাপড়কাচা, ঝাঁট দেওয়া। বইপত্র কোথায় হারিয়ে যায়। অনুবাদটি নিখোঁজ। বিনু দুঃখিত হয়। তবে আনন্দের বিষয় মাও জে-দুং-এর মৃত্যুর পরে নয়া সরকার তাঁদের রাজধানীতে ফিরিয়ে আনেন, চাকরি ফিরিয়ে দেন। বাড়ি সমেত। বকেয়া মাইনে সমেত। স্বামী সংস্কৃতের অধ্যাপক। তিনি নিমন্ত্রিত হয়ে আবার এসেছেন শান্তিনিকেতনে। তাঁকে দেশিকোত্তম উপাধি দিয়ে সম্মান জানানো হয়।

একান্ন সালে বসবাস করতে গিয়ে বিনুর আলাপ হয় দু'জন ইন্দোনেশিয়ানের সঙ্গে। একজন অধ্যাপক, সংস্কৃত পণ্ডিত। এমন একটি ছন্দ আবৃত্তি করেন যেটি ভারতে বিলুপ্ত, জাভায় রক্ষিত। তাঁর নাম বীর্যসুপার্থ শুনে বিনু বিস্মিত হয়। তিনি বলেন, বীর্য মানে বীর, সুপার্থ মানে অর্জুন। ওঁরা সংস্কৃত নামের পূর্বে একটা সু বসিয়ে দেন। যেমন সুকর্ণ। বিনু চমৎকৃত হয় যখন শোনে তিনি ধর্মে মুসলমান। শেষে ফিরে গিয়ে তিনি চিঠে লেখেন, তাঁর একটি পুত্রসন্তান হয়েছে। নাম রেখেছেন আর্যাবর্তপুত্র জয়বিষ্ণুবর্ধন। জন্ম নয়, সূচনা হয়েছিল আর্যাবর্তে অর্থাৎ ভারতে।

অপরজন বালিদ্বীপের হিন্দু, ব্রাহ্মণ। নাম ইদা বাগুস মন্ত্র। তিনি ছাত্র। মীরার আমন্ত্রণে মন্ত্র একদিন সন্ধ্যাবেলা নর্তকের সাজ পরে বালিদ্বীপের নৃত্য প্রদর্শন করেন। বালিদ্বীপ নৃত্যের জন্যে প্রসিদ্ধ। মন্ত্র দেশে ফিরে গিয়ে ক্রমে উচ্চপদস্থ হন। পরে ভারতে ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রদূত।

বিনু রথীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করে, বিশ্বভারতী কি ইন্দোনেশিয়ান অধ্যাপক ও ছাত্রদের জন্যে একটি ভবন স্থাপন করতে পারে না? তিনি উত্তর দেন, বিস্তর ছাত্র আসতে চায়, তাদের জন্যে ব্যবস্থা করার বাসনাও ছিল, কিন্তু কোথায় এত অর্থ? বিনু জানত না যে চীনভবনের জন্যে অর্থ চিয়াং কাইশেক দান করেছিলেন। নইলে বিশ্বভারতীর সামর্থ্যে কুলোত না। সুকর্ণ কি ইন্দোনেশিয়া ভবনের জন্যে অর্থ দান করতে পারতেন না? হয়তো

পারতেন, কিন্তু নানা কারণে নেহরুর সঙ্গে সম্পর্ক তিতিয়ে যায়। ইন্দোনেশিয়া কোনো কালেই ভারতের অংশ বা উপনিবেশ ছিল না। 'দ্বীপময় ভারত' ধারণাটা ভ্রমাত্মক। ওয়েস্ট ইন্ডিয়া দ্বীপপুঞ্জের বিপরীত দিকে অবস্থান, সেই জন্যে ইস্ট ইন্ডিয়া দ্বীপপুঞ্জ নামকরণ করেছিলেন ইউরোপীয় আবিষ্কর্তারা। কোনো ভারতীয় নয়। নামকরণ ভ্রমাত্মক।

ইন্দোনেশিয়ানরা আর আসে না। তিব্বতীরা আসে। তাঁদের সঙ্গে বিনুদের আলাপ জমে। একদিন বিনুদের তাঁরা নিমন্ত্রণ করে চা খাওয়ান। ইয়াক নামক প্রাণীর দুধের সঙ্গে আরো কী কী মিশিয়ে যা তৈরি করা হয় তা এক অপূর্ব পানীয়। একপ্রকার পায়েস বললেও চলে, যদিও মিষ্টি নয়। বলাবাহুল্য তিব্বতীরা কমিউনিস্ট চীনের দাপটে দেশত্যাগী। তাদের সংস্কৃতি চৈনিকের চেয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির নিকটতর। তা লিপিতেই প্রমাণ।

এই শতাব্দীতে তিব্বত থেকে শরণার্থীরা ভারতে এসেছে। সকলেই বৌদ্ধ। বহু শতাব্দী পূর্বে যাঁরা তিব্বতে যান তাঁরাও সকলেই বৌদ্ধ। সেই সূত্রে বিপুলসংখ্যক বৌদ্ধ পুঁথি তিব্বতে স্থানান্তরিত হয়। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। ভারতের বৌদ্ধবিহারগুলি পরিত্যক্ত হওয়ায় অন্যত্র সেসব পুঁথির আশ্রয় মিলত না। তিব্বতে সেসব গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ প্রচলিত হয়। চীনে চীনা অনুবাদ। জাপানে জাপানী অনুবাদ। মূল গ্রন্থগুলি ক্রমশ লোপ পায়। কিছুকাল থেকে চেষ্টা চলেছে অনুবাদ থেকে মূল গ্রন্থ উদ্ধারের। যাঁরা করেছেন তাঁদের মধ্যে বিশ্বভারতীর চীনভবনের অধ্যাপক বেঙ্কটরমণন অন্যতম। তিনি ইংরেজিতেও অনুবাদ করেন। বিনুকে দেখতে দেন প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রের ইংরেজি অনুবাদ। বিনুর কাছে তার মর্মভেদ সহজ হয় না। সেটাও একপ্রকার উচ্চতর গণিত। বিনু তো নিম্নতর গণিতও জানে না। বৌদ্ধদের পদে পদে যুক্তি। যুক্তির সাহায্যেই তাঁরা সত্যে উপনীত হতেন। আদিতে অবশ্য ছিল বোধি। এখানে বলে রাখি, প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র মহাযান সম্প্রদায়ের গ্রন্থ। তিব্বত, চীন, জাপান, কোরিয়া ও মঙ্গোলিয়ায় মহাযান সম্প্রদায়েরই অধিষ্ঠান। অপরপক্ষে শ্রীলঙ্কা, বর্মা, থাইল্যান্ড প্রভৃতিতে তথাকথিত হীনযান সম্প্রদায়ের অবস্থান। হীনযানটা পরের দেওয়া নাম। তাঁদের মতে তাঁদের তত্ত্বের নাম থেরবাদ। স্থবিরবাদ।

উপাচার্য প্রবোধচন্দ্র বাগচী ছিলেন বৌদ্ধসংস্কৃতির বিশেষজ্ঞ। তাঁর আহ্বানে শান্তিনিকেতনে আসেন জাপান থেকে অধ্যাপক কাসুগাই সস্ত্রীক। জাপানে প্রচলিত বৌদ্ধধর্মে বহু উপসম্প্রদায়। তাদের একটি দেশজ, আর সব ভারতগত। কাসুগাই দম্পতির সঙ্গে বিনু ও মীরা মেলামেশা করে ততটা ঘনিষ্ঠ হতে পারে না, যতটা তান দম্পতির সঙ্গে। তবে জাপান যাত্রার সময় বিনু কাসুগাইয়ের কাছ থেকে উৎসাহভরা সাহায্য পায়। সে সাহিত্যিকরূপে জাপানে গেলেও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হিসাবে আদরলাভ করে। চীন জাপান যুদ্ধের সময় দুই দেশের বৌদ্ধ পণ্ডিতদের মধ্যে ভেদবুদ্ধি ছিল। সেটা শান্তিনিকেতনেও প্রতিফলিত। কাসুগাই বলেন তিনি চীনের সঙ্গে যুদ্ধে যেতে চাননি, তাঁকে কনসক্রিপ্ট করা হয়েছিল। তাঁর শরীরে বুলেট বিদ্ধ হয়। সেটার জন্যে তাঁর ব্যথাবোধ বিদ্যমান। ধর্ম এক হলেও জাতীয়তাবোধ বিভিন্ন। তার থেকে যুদ্ধবিগ্রহ।

ডক্টর বাগচীর উদ্যোগে চীনতত্ত্বের বিশেষজ্ঞ ডক্টর লিবেনথল আসেন সস্ত্রীক। এঁরা জার্মান ইহুদী। স্ত্রী পুরোপুরি, স্বামী আংশিক। বর্ণবিদ্বেষের শিকার হয়ে চীনদেশে আশ্রয় নেন। কমিউনিস্ট বিপ্লবের পর শ্রেণীবিদ্বেষের শিকার হয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন। লিবেনথলের মতো একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চীনতত্ত্ববিদকে বিশ্বভারতী নামমাত্র মাসোহারায়

অধ্যাপকরূপে লাভ করেন। এর আগে নাৎসী জার্মানি থেকে পলাতক অধ্যাপক আরনসনকে পেয়েছিল। তিনিও ইহুদী। কী জানি কেন ইহুদীদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের ও রবীন্দ্রনাথের প্রতি ইহুদীদের একটা টান ছিল। রোটেনস্টাইন ইহুদী, সিলভাঁ লেভি ইহুদী, ভিন্টারনিৎস ইহুদী।

বিশ্বভারতী হচ্ছে সেই স্থান বিশ্ব যেখানে একনীড় হয়। এই যে আদর্শ কবির আমলে কাগজে কলমে নিবদ্ধ থাকেনি। নানা দেশ থেকে পণ্ডিত পক্ষী ও পক্ষিণীরা উড়ে এসে শান্তিনিকেতনে একনীড় হত। রতন টাটার অর্থানুকূল্যে রতনকুঠি বা টাটা বিল্ডিং নির্মিত হয় নানা দেশের অভ্যাগতদের জন্যে। ভারতীয়রাও স্বাগত। বিনু ও মীরা এর আগে কয়েকবার সেখানে ঘর পেয়েছে। একবার তো গুরুদেব স্বয়ং তাদের জন্যে একটি পাকা পেঁপে পাঠিয়ে দেন।

শান্তিনিকেতনের এই কসমোপলিটান আদর্শ রথীন্দ্রনাথের আমলেও ছিল। ইউরোপ আমেরিকা এশিয়া আফ্রিকা থেকে বহু ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপক এসেছিলেন। সেই স্রোতটা কেন যে ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হয়ে গেল তার একাধিক কারণ। একটা কারণ ভারতীয়রা ওদের দেশে গেলে ওদের ভাষা শেখে। ওরা কেন এদেশে এসে এদেশের ভাষা শিখবে না? কেন এই দেশের ভাষার মাধ্যমে পড়াশুনা করবে না? ওরা কেন ভারতীয়দের চেয়ে ভালো খাবে, ভালো পরবে, বেশি খরচ করবে, পাশ্চাত্য সংগীতের গ্রামোফোন রেকর্ড বাজাবে? বিদেশী বিদেশিনীরা অনেকেই বিদেশী আচার ছেড়ে এদেশী আচার বরণ করেছিলেন। কেউ তাঁদের বারণ করেনি, অনুরোধও করেনি। কিন্তু অন্যান্যদের রুচি অন্যরূপ ছিল। তাঁরাও রবীন্দ্রভক্ত। তাঁরাও ভারতপ্রেমিক। রবীন্দ্রভক্তির বা ভারতপ্রেমের কষ্টিপাথরে ভারতীয়রা সবাই কি নিখাদ সোনা? আসলে বিশ্বভারতীকে তাঁরা ভারতভারতীতে রূপান্তরিত দেখতে চেয়েছিলেন। কেউ কেউ বঙ্গভারতীতে।

বীরভূম জেলার একটি নির্জন প্রান্তরে মহর্ষির শান্তিনিকেতন আশ্রমভবন একটি পটভূমিকাহীন উৎক্ষেপ। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীও তাই। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকূল্যে এদের টিকিয়ে রাখা যায়, কিন্তু কেন্দ্রে যদি বড়োরকম পালাবদল হয় তবে এদের অস্তিত্ব হয়তো বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভর করবে। নয়তো এটি হবে আর একটি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। তখন বিশ্ব একনীড় হবে না, শান্তিনিকেতন কসমোপলিটান চরিত্র রক্ষা করবে না। বিশ্ব একটি মুখের কথায় পরিণত হবে। জনাকয়েক বিদেশী টুরিস্ট নিয়ে তো বিশ্ব হয় না। বিশ্বভারতীর ক্রাইসিসটা আইডেনটিটির ক্রাইসিস। শান্তিনিকেতনের ক্রাইসিসও তাই। আত্মশক্তি ফিরিয়ে আনতে হবে।

বিনুর নগরবাস

বিনুর পরিকল্পনা ছিল শান্তিনিকেতনের পর্ব শেষ হলে সে প্রকৃতির আরো কাছাকাছি, জনগণের আরো কাছাকাছি দেশের আরো অভ্যন্তরে কোনো এক অপরিচিত গ্রামে গিয়ে বসবাস করবে। গান্ধীজী যেমন সেবাগ্রামে। তবে শান্তিনিকেতনের পাট একেবারে গুটিয়ে নেবে না। সেখানে তার লাইব্রেরী থাকবে। যখন যেটা খুশি তখন সেটা পড়বে। একজন লেখকের যখন যেমন প্রয়োজন। লেখক হিসাবে সে তার সমকালের মানুষ। তাকে তার

যুগের সঙ্গে তাল রাখতে হবে।

শান্তিনিকেতনে ষোল বছর কাটানোর একটু আগে সে ও মীরা একদিন কলকাতায় আসে পারিবারিক কারণে। তিন রাত্রির পর ফিরে যেত। কতবার এ রকম হয়েছে, এটা আজব কিছু নয়। কিন্তু এবার ঘটে গেল অঘটন। একুশে ফেব্রুয়ারি আসন্ন। বিনুকে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হবে। সেটাও আজব কিছু নয়। কিন্তু পাকিস্তানের ডেপুটি হাই কমিশনার হাসান ইমাম সাহেব নাকি এবার প্রধান অতিথি হতে রাজি, শুধু বিনুকে একবার তাঁর বাসভবনে গিয়ে সাক্ষাৎ করতে হবে। বিনু মীরা সবে ঘুম থেকে উঠে চা খেতে বসেছে, এমন সময় বন্ধুপুত্র এসে বিনুকে আধঘণ্টার জন্যে পার্কসার্কাসে টেনে নিয়ে যায়। তারই উৎসাহ সবচেয়ে বেশি। সে দুই বাংলার মিলন পিয়াসী। একুশে ফেব্রুয়ারি মিলনের উপলক্ষ।

ডেপুটি হাই কমিশনার রবীন্দ্রভক্ত। শোকে দুখে সান্ত্বনা লাভ করেন রবীন্দ্রকাব্য পড়ে। ইকবালের কাব্য পড়েন না। তাঁর পাকিস্তানী সহযোগীরা এটা পছন্দ করেন না। কলকাতায় নিয়োগের পূর্বে তিনি নিউ ইয়র্কে ছিলেন। বাংলার সঙ্গে যোগসূত্র ছিল না। এখন তিনি খুশি। কিন্তু সেইসঙ্গে অখুশি। তাঁকে মিশতে দেওয়া হচ্ছে না। অনুষ্ঠানে যেতে মন চায়, কিন্তু অনুমতি মেলেনি। তিনি বিষণ্ণ মুখে জানান।

তাহলে বিনুকে ছেড়ে দিলেই পারতেন। না, বিনুর লেখা তিনি পড়েছেন। বিনুর সঙ্গে তিনি একমত যে হিন্দু মুসলমানের মামলা তত্ত্বের মামলা নয়, স্বত্বের মামলা। মিলন হবে কী করে এই বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতে করতে একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট সারা হয়। ভদ্রলোক না খাইয়ে বিদায় দেবেন না। পড়েছে মোগলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে। কেটে গেল প্রায় দুটি ঘণ্টা।

ওদিকে মীরা অভুক্ত থেকে অপেক্ষা করছিল। কে একজন দরজায় টোকা দিচ্ছে শুনে সে বিনু মনে করে শশব্যস্ত হয়ে স্নানের ঘর থেকে ছুটে আসার সময় পা পিছলে পড়ে জখম হয়। সে লোকটি বিনু নয়। বিনু ফিরে আসার আগেই তার ডাক্তার বন্ধু এসেছিলেন। তিনি বলেন, কেসটা সার্জিকাল, তাই সার্জেনকে খবর দেওয়া হয়েছে।

সার্জেন এসে বলেন, হাসপাতালে গিয়ে অপারেশন করাতে হবে। তাই হয়। যিনি অপারেশন করেন তিনি নির্দেশ দেন দু'বছর কলকাতায় বাস করতে হবে। তারপরে তাঁকে আবার দেখাতে হবে।

দু'বছর বাদে মীরাকে দেখে সার্জেন ছাড় দিলেন। কিন্তু তিন ছেলেমেয়ে তখন সপরিবারে কলকাতায়। তারা ছাড় দিতে নারাজ। নাতি-নাতনির টান এড়ানো যায় না। মীরা ও বিনু কলকাতায় থেকে যায় আরো দু'বছরের জন্যে। তারপরে আরো দু'বছরের জন্যে। এমনি করে পঁচিশ বছর। ইতিমধ্যে ওরা দু'জনেই জড়িয়ে পড়ে নানা প্রতিষ্ঠানের কাজে। একটি তো মীরারই সৃষ্টি। সে নিজে অনুবাদ করে। আর পাঁচজনকে অনুবাদ করতে শেখায়।

বিনুর ডাক পড়ে নানা প্রয়োজনে। কোনোটা সরকারের, কোনোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের। সিলেকশন কমিটি, প্রাইজ কমিটি ইত্যাদিতে তার যোগদান একান্ত আবশ্যক। কিন্তু এহো বাহ্য। এসব কাজ তাকে না হলেও অচল হত না, কিন্তু ইতিহাস বোধহয় চেয়েছিল কলকাতায় বিনুর উপস্থিতি, যাতে পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগ তার মধ্যস্থতায় সম্পন্ন হয়। ওপার থেকে কেউ এলে বিনুর সঙ্গে দেখা করেন। এপার থেকে কেউ গেলে বিনুর সঙ্গে দেখা করে যান। ওপারে প্রকাশিত বই এপারে আসতে দেওয়া হয় না। অতি কষ্টে

আনাতে হয়। ওপারের সীমান্তরক্ষীরা আটক করে। অন্যেরাও কেড়ে নেয়।

মুক্তিযুদ্ধের বছর খানেক আগে ঢাকার এক বিশিষ্ট অধ্যাপক কলকাতায় এসে বিনুকে বলেন, "আমরা আপাতত স্বাধিকার চাইছি বটে কিন্তু আমাদের আসল লক্ষ্য স্বাধীনতা।"

বিনু তাঁকে হুঁশিয়ার করে দেয় যে পাকিস্তানী সেনা ক্ষমা করবে না। তাহলে যুদ্ধের ভিতর দিয়ে যেতে হবে। তিনি তাতে রাজি।

সত্যি সত্যিই যুদ্ধ বেধে যায়। তখন দলে দলে বুদ্ধিজীবী হিন্দু মুসলমান পালিয়ে আসেন। এঁরা চান ভারত যেন ওপারে সৈন্য পাঠাক। বিনু বলে, আমরা অর্থ দিতে পারি, অস্ত্র দিতে পারি, কিন্তু সৈন্য নয়। তা যদি করি পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে, তার মিতাদের সঙ্গেও। আমরা কেন আন্তর্জাতিক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ব?

তার এক বন্ধুও ওপারে সৈন্য প্রেরণের পক্ষে। তিনি বলেন, ভারতীয় সৈন্য দশদিনের মধ্যে পশ্চিমাদের হারিয়ে দিতে পারে। তা হলে বহু লক্ষ মানুষ শরণার্থী হয় না। বহু সহস্র মানুষ প্রাণে বেঁচে যায়। বিনু তাঁকে বোঝায় যে তারপরে পাকিস্তানের সঙ্গে লড়তে হবে। সে যুদ্ধ দশ দিনে জেতা যাবে না। আন্তর্জাতিক আকার ধারণ করতে পারে। সুতরাং ভারতের উচিত নয় সৈন্য প্রেরণ।

যেটা সে মুখ ফুটে বলে না, কলমের মুখেও আনে না, সেটা হল ওপারে কি শুধু মুক্তিযোদ্ধারাই আছেন? না, মোল্লারাও আছে। তারা পরে বলবে, দেখলে তো, ওপার থেকে হিন্দু সৈন্যেরা এসে এপারে মুসলমানদের মেরে চলে গেল। ব্যাপারটা সাম্প্রদায়িক রূপ নেবে। রাগ পড়বে ওপারের হিন্দুদের উপরে।

বিনুর যুদ্ধবিরোধী লেখা একটি পত্রিকায় বেরয়, সম্পাদিকা তাঁর সঙ্গে একমত হন না। তাঁর মতে ওটা কুরুক্ষেত্রের মতো ধর্মযুদ্ধ।

বোম্বাইয়ের এক বিশিষ্ট অধ্যাপক প্যারিসের একটি সংস্থার কাছ থেকে কিছু অর্থ এনে কলকাতার একটা বেসরকারি কমিটির হাতে দেন। কমিটি ওপারের শরণার্থী বুদ্ধিজীবীদের একটি তালিকা তৈরি করে। বিনুর বাসভবনে বৈঠক বসে। এর নাম পরের ধনে পোদ্দারি। সেই সূত্রে বিনু জানতে পায় ওপারের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ছিলেন কয়েকজন হিন্দু, তাঁদের স্ত্রীরা মুসলমান। আর কয়েকজন মুসলমান, তাঁদের স্ত্রীরা হিন্দু। সমাজ তা হলে একটু একটু করে বদলে যাচ্ছে। কলকাতার বহু হিন্দু পরিবারে ওপারের মুসলমান শরণার্থীরা আশ্রয় পান। হিন্দুদের মেসেও মুসলমানরা অতিথি হন। এটাও একপ্রকার বিপ্লব। বিনু যখন সদ্যমুক্ত বাংলাদেশে যায় ঢাকায় দেখে মুসলমানদের বাড়িতে হিন্দু অতিথি। বলা যেতে পারে, বাঙালির বাড়িতে বাঙালি অতিথি, দুই পারেই।

ইন্দিরা গান্ধী সৈন্য পাঠানোর পূর্বে ইংলন্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে গিয়ে ভারতের অবস্থাটা বুঝিয়েছিলেন। পশ্চিমাদের অত্যাচারে ওপার থেকে এপারে প্রায় এক কোটি মানুষ শরণার্থী হয়ে অনন্তকাল এদেশে থাকত, যদি না ভারত সৈন্য পাঠিয়ে পশ্চিমাদের হটাত। কোথাও সাড়া না পেয়ে তিনি সোভিয়েট ইউনিয়নে যান ও মৈত্রী-চুক্তি সম্পাদন করেন। ভারতের বিপদে সোভিয়েট সাহায্য করবে। সোভিয়েটের বিপদে ভারত। বিনু ভয় পায়। তা হলে কি ভবিষ্যতে বিশ্বযুদ্ধ বাধলে ভারত সোভিয়েট ইউনিয়নকে সাহায্য করবে!

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে চব্বিশ বছর ধরে যারা অবাধ মেলামেশার সুযোগ পায়নি তারা মুক্তিযুদ্ধের আটমাসের মধ্যে আপনজনের মতো অন্তরঙ্গ ব্যবহার করে। এপার

থেকে এক কালচারাল ডেলিগেশনের নেতা হয়ে বিনু বার বার তিন বার স্বাধীন বাংলাদেশে যায়। আদর-আপ্যায়নের মধুর আস্বাদন পায়। কিন্তু এটাও লক্ষ করে যে বাঙালি হিন্দুর বিরুদ্ধে নয়, ভারতীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠছে। ইন্ডিয়া চায় না যে দুই পারের বাঙালিরা মেলামেশা করতে করতে আবার এক হয়ে যায়। কিন্তু বাংলাদেশও কি সেটা চায়? শেখ মুজিবুর রহমানের নিধনের পর কালচারাল ডেলিগেশনের আমন্ত্রণ আসে না। বিনু যতবার উদ্যোগী হয় ওপার থেকে সাহিত্যিকদের এপারে আহ্বান করতে, ততবার ব্যর্থ হয়। বাংলাদেশ চায় না যে দুই পারের বাঙালিরা অবাধে মেলামেশা করতে করতে আবার এক হয়ে যায়।

মুক্তিযুদ্ধের সেই বছরটি ও তার পরের তিন বছর ছিল একটি সুবর্ণ যুগ। তেমনটি চব্বিশ বছর পূর্বেও ছিল না, আঠারো উনিশ বছর পরেও ফিরে আসেনি। বেসরকারি স্তরে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান চলেছে কিন্তু সরকারী স্তরে কালচারাল ডেলিগেশন এপার থেকেও যায় না, ওপার থেকেও আসে না।

বাংলাদেশের চেয়ে ভারতের কথাই বিনু বেশি করে ভাবে। নকশাল আন্দোলন তাকে বিশেষ করে ভাবায়। কয়েক বছর তো প্রতিরাত্রেই নকশালদের সঙ্গে পুলিশের গুলিবিনিময় হয়। বিনু আর মীরা কান পেতে শোনে। একদিন তাদের এক প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে বন্দুক লুট করতে এসে মালিককেই গুলি করে বন্দুক নিয়ে চলে যায় কয়েকটি ছেলে। সকলের চোখের সামনে নকশালরা গ্রামে গিয়ে লোকের সেবা করত, বিনুর গান্ধীপন্থী বন্ধু তাদের প্রশংসা করতেন। কিন্তু সেই তারাই খুন জখম লুটপাট বাধিয়ে দিয়ে গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় এসে হামলা বাধায়। বিনু বুঝতে পারে না এটা কোন্ অর্থে মার্কসিজম লেনিনিজম। এদের দ্বারা পুলিশ বধের পরিণাম পুলিশের দ্বারা নকশাল বধ। বুদ্ধিজীবীরা কাউকেই নিরস্ত্র করতে পারেন না। যার অস্ত্রে জোর বেশি সেই তো জিতবে। বিনু হিংসার বিরোধী। সামাজিক পরিবর্তনের নয়।

না, এভাবে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা যায় না। কী ভাবে করা যায় তা নিয়ে বিনুকে গভীরভাবে চিন্তা করতে হয়। রেভোলিউশন কথাটির বিপরীত কাউন্টার রেভোলিউশন। একটি হলে আরেকটি হবেই। সেটা এড়াতে হলে অন্য একটি শব্দ ব্যবহার করতে হয়। বিনুর মতে সেই শব্দটি রিনিউয়াল। পুনর্নবীকরণ। দেশকে, রাষ্ট্রকে, সমাজকে, সংস্কৃতিকে, সভ্যতাকে পুনর্নবীকরণের কথা বিনুর মাথায় ঘোরে। রাজনীতি, অর্থনীতিই সব নয়। ন্যায়নীতির দাবি উপেক্ষা করে বেশি দূর অগ্রসর হওয়া যায় না। সোভিয়েট ইউনিয়ন তো কালচারের দিক থেকে বন্ধ্যা। বলশয় ব্যালে ছাড়া আর কী আছে তার দেবার? তাও তো পুরনো আমলের। তবে, হ্যাঁ, বিজ্ঞানে অগ্রগামী হয়ে ওখানকার লোকে মহাকাশে পাড়ি দিচ্ছে। কিন্তু একজন আমেরিকানও তো চন্দ্রে অবতরণ করতে পেরেছেন।

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্যে বিশ্বময় দুই 'বিশ্বের' মধ্যে যে অস্ত্র-প্রতিযোগিতা চলেছিল তা বিনুকে বীতশ্রদ্ধ করেছিল। সে আশা করেছিল তৃতীয় বিশ্ব এর বাইরে থাকবে। কিন্তু তৃতীয় 'বিশ্বের' দেশগুলিও তো অস্ত্র প্রতিযোগিতায় বাইরের নয়। এরা বিশ্বযুদ্ধ বাধাবে না, কিন্তু ছোটমাপের যুদ্ধ বাধাবে, যদি না ইউনাইটেড নেশনস বাধা দেয়। এই নবজাত প্রতিষ্ঠানটির উপরে বিনুর কিছুটা ভরসা ছিল। পুরোপুরি নয়, কারণ সেখানেও দলাদলি।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধে আদর্শবাদীর বড়ো অভাব। কার দিকে বিনু তাকাবে!

যেদিকেই তাকায় হিংসার উপরে বিশ্বাস। ধনতন্ত্রীদেরও, সমাজতন্ত্রীদেরও, মধ্যপন্থীদেরও। যাঁরা গান্ধীজীর শিষ্য ছিলেন তাঁরাও অহিংসার উপর আস্থা হারিয়েছেন। ভারত পরমাণু বোমা না বানালেও পারমাণবিক শক্তির সাধনায় নিযুক্ত। অবশ্য শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য। কিন্তু কেন্দ্রে পালাবদল হলে সেই শক্তিই যুদ্ধবিগ্রহের ব্যবহারে লাগবে কি না কে বলতে পারে? যার শেষটা তুমি দেখতে পাচ্ছ না তার আরম্ভটা তুমি করে যাচ্ছ, এটাও কি একপ্রকার দায়িত্বহীনতা নয়? গান্ধীপন্থীদের মধ্যে কেউ কেউ এই প্রশ্ন তুলেছেন, তাঁরা এককভাবে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছেন।

পৃথিবী থেকে যুদ্ধের সম্ভাবনা যদি সম্পূর্ণ নির্মূল হত তা হলে যে যত ইচ্ছা পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন করলে শঙ্কার কারণ থাকত না। কিন্তু যেখানে যুদ্ধের জন্যে প্রত্যেকটি দেশ প্রস্তুত হচ্ছে সেখানে কয়েকটি দেশ পারমাণবিক শক্তি শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য উৎপাদন করলেও যুদ্ধকালে ব্যবহারের শঙ্কা থেকে যাবে, আর সকলে করলে তো মহাবিপদের বিভীষিকা মানুষের মন থেকে শান্তি কেড়ে নেবে। বিনুর মতে শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্যে পারমাণবিক শক্তির উৎপাদন যদি সব দেশের পলিসি হয় তবে কোথাও তার অপব্যবহার হবেই। মানব-চরিত্র এত উচ্চ স্তরে উপনীত হয়নি যে কোথাও কেউ তার অপব্যবহার করবে না। গণতান্ত্রিক দেশ হলেই সাধু হয় না। সমাজতান্ত্রিক দেশ হলেও না। ফাসিস্ট হলে তো কথাই নেই।

তাছাড়া ইদানীং মৌলবাদী বলে আরো এক বিপদ দেখা যাচ্ছে। স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বে যারা মৌলবাদী ছিল না পরে কিন্তু তাদের মধ্যে মৌলবাদ জাগছে। ভারতও এর থেকে মুক্ত নয়। কোনো ক্ষেত্রে নবীকরণই মৌলবাদীরা সহ্য করবে না অস্ত্রশস্ত্র বাদে। এদের হাতে যদি পারমাণবিক অস্ত্র পড়ে তবে সমূহ সর্বনাশ। এখনো পড়েনি বলে কখনো পড়বে না এমন কি নিশ্চয়তা আছে? সর্বত্র এটা একটা নতুন আতঙ্ক। হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, ইহুদী সব রকমের মৌলবাদী সক্রিয়।

যে কোনো ধর্মের মৌলবাদীদের মতে ধর্মই নিয়ন্ত্রণ করবে জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগ—দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, নৃত্য, নাট্য, সংগীত, অর্থনীতি, রাজনীতি, ন্যায়নীতি, দণ্ডবিধি। এক হাজার বছর আগে এটাই ছিল প্রায় সব দেশের নিয়ম। কিন্তু কালক্রমে ধর্মের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছে রাষ্ট্র আর রাষ্ট্রের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে পার্লামেন্ট বা কংগ্রেস বা কমিউনিস্ট পার্টি। সে দিনকাল আর নেই যখন ধর্মগুরুদের নির্দেশে দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, রাজনীতিক, ব্যাঙ্কার প্রভৃতি ভাবনাচিন্তা, পরীক্ষানিরীক্ষা, শিক্ষা, শাসন, বিচার, সওদাগরি, মহাজনি ইত্যাদি করবেন। মৌলবাদ হচ্ছে অতীতে প্রত্যাবর্তনের মতবাদ। মানুষের অতীতই হবে তার ভবিষ্যৎ।

অতীতের পূর্বেও অতীত ছিল। সুদূর অতীতে গুণকর্ম অনুসারে ব্রাহ্মণ হতে পারা যেত। পরে তারাই কেবল ব্রাহ্মণ হয় যাদের জন্ম ব্রাহ্মণ কুলে। ব্রাহ্মণত্বের দুয়ারটা বন্ধ রয়ে গেলে আরেকটা দুয়ার খুলে যায়। সেটা সন্ন্যাসের দুয়ার। যে কোনো বর্ণের পুরুষ সন্ন্যাসী হতে পারে, যদি কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করে ও গুরুর কাছে দীক্ষা নেয়। মধ্যযুগে সন্ন্যাসীদের সম্মান ব্রাহ্মণদের চেয়ে কম ছিল না। হয়তো বেশি। কারণ তাঁরা নাকি হিমালয় থেকে দুষ্প্রাপ্য ঔষধ নিয়ে আসতেন ও মরণাপন্নকে বাঁচিয়ে দিতে পারতেন। তা ছাড়া অনেক রকম অলৌকিক ঘটনাও নাকি তাঁরা ঘটাতেন। বৌদ্ধ, জৈন ও রোমান ক্যাথলিক সঙ্ঘ

সন্ন্যাসীদের যে পার্থিব ক্ষমতা দেয় তা অভূতপূর্ব। রোমান ক্যাথলিক চার্চের তো আলাদা আদালত ছিল। সে আদালত প্রাণদণ্ডও দিতে পারত।

ব্রাহ্মণকে প্রতিপালন করত ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়কে নৈতিক সমর্থন যোগাত ব্রাহ্মণ। যেখানে সন্ন্যাসী ছিল সেখানে মঠবাড়ির পৃষ্ঠপোষক ছিল ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য, তাকে নৈতিক সমর্থন যোগাত সন্ন্যাসী। শূদ্রের স্থান ছিল এঁদের সেবকের। নারীর স্থান ছিল পুরুষের সেবিকার। এটাই ছিল মোটামুটি ভাবে বিভিন্ন নামে পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজের প্যাটার্ন। এক কথায় বলা যেতে পারে ওল্ড অর্ডার বা পুরাতন শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলের সঙ্গে যার সম্পর্ক।

পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের সময় থেকে শৃঙ্খলা ভঙ্গ তথা শৃঙ্খলভঙ্গ শুরু। কিন্তু মানুষ তো বিশৃঙ্খলা সইতে পারে না। তাই একটা নতুন শৃঙ্খলা বা নিউ অর্ডারের কথাও ভাবা হচ্ছে গত দুই শতাব্দী ধরে। আগে এতরকম মতবাদের নাম কখনো শোনা যায়নি। কনসারভেটিজম, লিবারলিজম, ক্যাপিটালিজম, সোশিয়ালিজম, কমিউনিজম, ন্যাশনাল সোশিয়ালিজম, রেভোলিউশনারি সোশিয়ালিজম, রেভোলিউশনারি কমিউনিজম, ডেমোক্রাটিক সোশিয়ালিজম, সোশিয়ালিস্ট ডেমোক্রাসি, সিন্ডিকালিজম, পপুলিজম, হিউমানিজম, ফেমিনিজম, এমন কি অ্যানার্কিজম ও নিহিলিজম। কোনো কোনোটার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রণেতার নাম। মার্কসিজম, লেনিনিজম, স্টালিনিজম, মাওইজম, গান্ধীইজম।

এর প্রত্যেকটির ভিতরে কিছু না কিছু সত্য আছে, এমন কি ফাসিজমের ভিতরেও। ভোটের উপর ছেড়ে দিলেই তো প্রতিপন্ন হয় কোনটা অধিকাংশের পছন্দ। ফাসিস্টরা ভোটারদের সে অধিকার দেয় না। কমিউনিস্টরাও না। ভোটারদের কিনে নেওয়া তো বহু দেশের গণতন্ত্রের রীতি। যাদের টাকা নেই তারা সাম্প্রদায়িক নেশা ধরায়। ধনতন্ত্রের সঙ্গে গণতন্ত্রের সমাহার নানা দেশেই লক্ষিত হয়। সংবাদ-মাধ্যমগুলো ধনিকদের হাতে। ইংলন্ডের লেবার পার্টির পত্রিকা শ্রমিকরাই কেনে না। তার চেয়ে অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক একই মূল্যের ধনিকদের পত্রিকা। ওরা প্রচুর বিজ্ঞাপন পায় বলে প্রচুর খরচ করতে পারে। চটকদার বিষয় ছাপে। সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক প্রচার চালায়।

ভারতের পক্ষে কেমনতর সমাজব্যবস্থা যুগোচিত অথচ নীতিসম্মত এই নিয়ে বিনু নিরন্তর চিন্তিত ও ধ্যানস্থ। নেতি নেতি করে একটার পর একটা মতবাদ খারিজ করে। মৌলবাদ তো যুগোচিতও নয়। সামাজিক ন্যায়সম্মতও নয়। তাতে না আছে ব্যক্তিস্বাধীনতা, না স্ত্রী-স্বাধীনতা, না চিন্তার ও বাক্যের স্বাধীনতা। অথচ এসব যেখানে আছে সেখানে রয়েছে প্রদীপের নিচে অন্ধকার। মহানগরে দীন দরিদ্র গৃহহীন বা বস্তিবাসী লক্ষ লক্ষ মানুষ। যাদের নাম কেউ মুখে আনতে চায় না সেই সব দেহপসারিণী। দেহ কেনাবেচার বিরাট ব্যবসা। হোয়াইট স্লেভ ট্রাফিক। আনন্দের কথা, ব্ল্যাক স্লেভ ট্রাফিক আর নেই। বহু সহস্র বর্ষ পরে।

যে গাছের যে ফল। আম গাছে জাম ফলে না। তেমনি ভারতের ইতিহাসে অবিকল ইংলন্ড, আমেরিকা বা রাশিয়ার মতো সমাজব্যবস্থা বিবর্তিত হয় না। তাকে প্রবর্তন করতে হয়। তার জন্য চাই গণ-সমর্থন, গণ-পরিশ্রম, গণ-ত্যাগেচ্ছা। বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা। বিনা ত্যাগসে না মিলে নয়া সমাজ। আইন করে, জোরজুলুম করে যা হয় তাতে অসন্তোষ চাপা পড়ে যায়। পরে ফেটে পড়ে। অথচ আমরা সকলেই অল্প সময়ের মধ্যে চারাগাছ থেকে বনস্পতি পেতে চাই। আমাদের বিবর্তন যে বিলম্বিত হয়েছে এটা ঠিক। কিন্তু বিপ্লব এর প্রতিকার নয়। তাও যদি সে বিপ্লব অহিংস বিপ্লব হত। কিন্তু হিংসার

সম্মোহন থেকে সে মুক্ত নয়। বিপ্লব যদি কোনোদিন হয় তবে গৃহযুদ্ধের আকার নেবে। বুর্জোয়ারা বিনা রক্তপাতে মঞ্চ থেকে বিদায় নেবে না।

তাহলে কি বিনু চায় রেভোলিউশন বাই কনসেন্ট? না একাদিক্রমে রিফর্মস। বিনু ভেবে পায় না। দু'পক্ষেই বলবার আছে। দেশের লোককেই এর উত্তর দিতে হবে। তাদেরকেই তো পোহাতে হবে রেভোলিউশন বা রিফর্মসের ঝক্কি।

একদিন বিশিষ্ট গান্ধীপন্থী নেতা প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ বিনুকে বলেন, আপনি রুশো ভলতেয়ারের মতো লিখে যান। যাতে ফরাসী বিপ্লবের মতো বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। বোঝা গেল গান্ধীপন্থীরাও স্বাধীনতার পরবর্তী লক্ষ্য নিয়ে দিগ্ভ্রান্ত। একদিন জয়প্রকাশ নারায়ণও তাকে ডেকে পাঠান। ইন্দিরা গান্ধী দেশের লোকের সিভিল লিবার্টি হরণ করেছেন। সিভিল লিবার্টি উদ্ধার করতে হবে। পরে দেখা গেল তিনি ইন্দিরা গান্ধীকেই গদি থেকে হটাতে চান। ভোটের জোরে নয়, বিদ্রোহ করে। সৈনিকদেরও ডাক দেন। এর নাম সিভিল লিবার্টি উদ্ধার নয়। শাসক পরিবর্তন।

এমারজেন্সি জারি করে ইন্দিরাজী বিনুর মতো লেখকদের স্বাধীনতা খর্ব করলেন। প্রত্যেকটি লেখাই সেনসরের কাছে পেশ করে প্রকাশের অনুমতি নিতে হবে। শেখ মুজিবুর রহমানের সপরিবারে নিধন বিনুকে স্তম্ভিত ও শোকার্ত করে। তাঁকে সে চিনত। কিন্তু তার লেখা শোকনিবন্ধ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় পত্রিকায় প্রকাশ করতে দেন না। বলেন, 'আপনার লেখা বেরোলে ওপার থেকে এক কোটি লোক শরণার্থী হয়ে আসবে। আমরা মারা যাব।' ওটি তিনি ইন্দিরাজীকে পাঠান। প্রধানমন্ত্রী সেটি ইংরেজিতে তর্জমা করিয়ে পড়েন। বিনুকে লেখেন, "আপনি যা লিখেছেন তা ঠিক, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়ার কথাও চিন্তা করতে হবে। আপনার এ লেখা প্রকাশিত হলে সরকার বিব্রত হবেন।" লেখাটা পত্রিকায় প্রকাশ করা গেল না। কড়া সেনসরশিপ জারি হয়েছিল। বিনু একটি সভায় এর প্রতিবাদ করে। তার বক্তৃতা কেউ প্রকাশ করে না।

মাস কয়েক পরে একদিন বিনুর ফ্ল্যাটে দু'জন পুলিশ-কর্মীর প্রবেশ। তাঁদের হাতে একখানি নিষিদ্ধ পত্রিকা। পত্রিকাটি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ পরিবারের। তাতে ছিল বিনুর সেই বক্তৃতার অনুলিখন। বিনু তো তাজ্জব! গোয়েন্দারা জানতে চান ওসব কথা বিনু কি বলেছে? বিনু বলে, 'হ্যাঁ, কিন্তু ভুল-চুক্ আছে।' সে কলম নিয়ে শুধরে দেয়। তাঁরা ফিরে যান।

এরপর বিনু একটি কমিটি গঠনে অগ্রণী হয়। তাতে ছিলেন দু'জন প্রাক্তন হাইকোর্ট চিফ জাস্টিস, দু'জন অ্যাডভোকেট, দুজন প্রাক্তন জেলা ও দায়রা জজ। কমিটির তরফ থেকে সে ইন্দিরাজীকে একটি প্রস্তাব পাঠিয়ে দিয়ে লেখে এমারজেন্সি তুলে নিয়ে অবিলম্বে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে। তিনি জবাব দেন না। তিনি যদি কমিটির পরামর্শ অনুসারে কাজ করতেন তা হলে সেই বছর নির্বাচনে জয়ী হয়ে আরো পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকতেন।

একবছর দেরি করার ফলে তিনি হেরে গেলেন সদলবলে। যাঁরা জিতলেন তাঁরা সকলেই ইন্দিরাবিরোধী, সেইসঙ্গে পরস্পরবিরোধী। মোরারজী দেশাই যোগ্য ব্যক্তি, বোধহয় যোগ্যতর ব্যক্তি। কিন্তু সরকার তো ব্যক্তিকে নিয়ে নয়, সমষ্টিকে নিয়ে। কয়েক বছরের মধ্যেই সরকার চৌচির। মোরারজীর পরে চরণ সিংহ, তারপর আবার সেই ইন্দিরা গান্ধী। এবার তাঁর শিক্ষা হয়েছিল। এমারজেন্সি আর নয়। কিন্তু শিখদের স্বর্ণমন্দির বিদ্রোহের ঘাঁটি

হলেও সেখানে সৈন্য প্রেরণ ভুল হয়েছিল। বিনুও এর পূর্বে সংবাদপত্রের সাক্ষাৎকারে বলেছিল, পাঞ্জাবের কোনো সামরিক সমাধান নেই, রাজনৈতিক সমাধান চাই।

ভিন্দ্রানওয়ালের নিধনে বিনু 'শক' পায়। মনে মনে বলে, এর জন্যে আরো দাম দিতে হবে। সেই দাম যে ইন্দিরাজীর নিজের নিধন তা বিনুর কল্পনায় ছিল না। সে আবার 'শক' পায়।

ইন্দিরা নিধনে উত্তেজিত হিন্দুরা দিল্লিতে ও অন্যত্র শিখ সম্প্রদায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। একমাত্র দিল্লিতেই হাজার তিনেক শিখ বাল বৃদ্ধ বনিতা নিহত হয়। তাদের একমাত্র অপরাধ তারা শিখ। অতএব ইন্দিরাহত্যার জন্যে দায়ী। এর নাম জাতিবৈর। যেন হিন্দু শিখ এক জাতি নয়, দুই জাতি।

বিনুর ছেলেবেলায় তার জন্মস্থানে এক ফরেস্ট অফিসার ছিলেন, তাঁর নাম পৃথ্বীচাঁদ, তিনি হিন্দু। তাঁর পুত্র বলদেও সিং কিন্তু শিখ। তার মাথায় পাগড়ির নিচে ঝুঁটি। হাতে লোহার বালা। শিখরা যাকে বলে কঙ্কণ। অথবা কড়া। দাড়ি গজানোর বয়স হয়নি। তার বাবার দাড়ি ছিল না। বলদেও ছিল স্কুলের সহপাঠী ও খেলার সাথী। খলিস্তান হলে বলদেও সিং হবে তার সিটিজেন আর পৃথ্বীচাঁদ হবেন এলিয়েন, যদি বেঁচে থাকেন। এ রকম পরিবার শত শত। ওরা দুই জাতি নয়, কিন্তু দুই সম্প্রদায়। শিখরা বেদ, ব্রাহ্মণ, দেবদেবী, অবতার, সাকার পূজা মানে না।

এ সমস্যার সামরিক সমাধান নেই, ইন্দিরাজীর পলিসি পরিত্যক্ত। যা করবার তা পুলিশই করছে। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা। সেটা রাজনৈতিক সমাধান নয়। রাজীব গান্ধী সন্ত লঙ্গোয়ালের সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন। সে চুক্তি কার্যকর হয়নি। কার্যকর হলেও শিখ জঙ্গীরা চণ্ডীগড় নিয়ে সন্তুষ্ট হত না। তারা চায় স্বতন্ত্র ও সার্বভৌম ধর্মভিত্তিক শিখ রাষ্ট্র। ভাষাভিত্তিক পাঞ্জাবী রাষ্ট্র নয়। আর একটি পাকিস্তান। আর একটি বাংলাদেশ নয়। হিন্দুরা কেউ এতে রাজি হবে না, শিখদের মধ্যে যাঁরা ধর্মনিরপেক্ষ তাঁরাও নারাজ। শিখ সম্প্রদায়েরও বেশ কয়েকটি শাখা আছে। যেমন নির্মলী, নিরঙ্কারি। গুরু গোবিন্দ সিংহের পূর্বে শিখদের সিংহ পদবি ছিল না। তাঁরা কৃপাণ ধারণ করতেন না। তেমন শিখও বিনু দেখেছে। বাবা পুরুষোত্তমলাল বেদী গুরু নানকের বংশধর। একবার তাঁর পত্নী ফ্রীডা ও পুত্র কবিরকে নিয়ে তিনি দার্জিলিং-এর ঘুম পাহাড়ে বিনু ও মীরার সঙ্গে এক বাড়িতে ছিলেন। তিনিও শিখ। কিন্তু তাঁর না ছিল পাগড়ি, না ছিল ঝুঁটি, না দাড়ি, না কড়া।

কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক নিয়ে যে কমিশন গঠিত হয়েছিল তার চেয়ারম্যান জাস্টিস সরকারিয়া শিখ। পাগড়ি ইত্যাদি সমেত। কলকাতায় এসে তিনি ও তাঁর সহযোগীরা যাঁদের সাক্ষ্য নেন তাঁদের প্রথম জনই ছিল বিনু। রাজ্যগুলিকে আরো অটোনমি দিতে হবে বিনুর এই অভিমতে তিনি সায় দেন না। বলেন, কেন্দ্র দুর্বল হবে সেটা উচিত নয়। শক্তিশালী কেন্দ্র না হলে দেশ ভেঙে পড়বে। পাঞ্জাবে তা হলে রাজনৈতিক সমাধানের কতটুকু সম্ভাবনা?

কেন্দ্রকে দুর্বল করা চলবে না, বিনুও এটা মেনে নেয়। কেন্দ্রকে দুর্বল না করে রাজ্যগুলিকে কী কী ছেড়ে দিতে পারা যায় তা বাছাই করতে হবে। নইলে মণিপুর, নাগাল্যান্ডের মতো দিল্লি থেকে সুদূর রাজ্যগুলির জনসাধারণ অবহেলিত বোধ করবে। ফলে বিদ্রোহী হবে।

রিনিউয়ালের বা পুননবীকরণের থিম নিয়ে একটি বৃহৎ উপন্যাস লেখার ভাবনা বিনুকে স্বস্তি দেয় না। লিখতে আরম্ভ করে সে দেখে বিষয়টা অতীত থেকে বর্তমানে ও বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে পরম্পরা ক্রমে বিবর্তিত হওয়া চাই। নইলে সেটা হবে একপ্রকার ইউটোপিয়া।

তাকে শুরু করতে হল ব্রিটিশ আমলের পটভূমিকায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ভারতীয় মুক্তি সংগ্রাম, হিংসা অহিংসা, হিন্দু মুসলিম সংঘর্ষ, দেশ ভাগ, প্রদেশ ভাগ, স্বাধীনতার অমৃত, লোকবিভাজনের গরল, বিষপান করে নীলকণ্ঠ গান্ধীর নিপাত, ব্রিটেনের অন্তঃপরিবর্তন, রাজন্যদের ক্ষমতালোপ, নতুন ভারতের অভ্যুদয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় কংগ্রেস নেতাদের বিশ্বাস ছিল যুদ্ধে সহযোগিতা করলে তার বিনিময়ে স্বরাজ লাভ হবে। কিন্তু তা তো হল না। বিশ বছর ধরে সংগ্রামের পর তাঁদের ধারণা উলটে গেল। যুদ্ধে সহযোগিতার বিনিময়ে স্বাধীনতা নয়, স্বাধীনতার বিনিময়ে যুদ্ধে সহযোগিতা। মহাত্মা গান্ধী কিন্তু কোনো কিছুর বিনিময়ে যুদ্ধে সহযোগিতা করবেন না। তিনি অহিংসার সাধক। তাঁর কাছে স্বাধীনতার অর্থে যুদ্ধে সহযোগিতা না করার স্বাধীনতা। কংগ্রেস যদি তাঁর সঙ্গে না চলে তবে তিনি একলা চলবেন। সময় যখন আসবে তখন যুদ্ধে জড়ানোর বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করবেন।

ভারতের ইতিহাসে—শুধু ভারতের ইতিহাসে কেন বিশ্বের ইতিহাসে—অমন একটি দশক দেখা যায়নি। চূড়ান্ত হিংসার সাধনা করছেন হিটলার। তাঁর উপরে টেক্কা দেবার জন্যে আইনস্টাইনের পরামর্শে পারমাণবিক বোমা বানাচ্ছে আমেরিকা। তা দিয়ে ইহুদি রক্ষা করার অভিপ্রায়। কিন্তু সেটা জার্মানিতে পড়ে না। পড়ে হিরোসিমায় জাপানীদের ওপর। তার আগেই ষাট লাখ ইহুদী জার্মানদের গ্যাস চেম্বারে পুড়ে মারা গেল। এমন যে যুদ্ধ এতে সহযোগিতা গান্ধী নেতৃত্বে হত না। কংগ্রেস যে তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিয়ে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ, কারাবরণ, কুইট ইন্ডিয়া আন্দোলন ইত্যাদি চালিয়ে গেল এটা ইতিহাসে অপূর্ব। তবে জনগণের দ্বারা অহিংসার মান রাখা হয়নি। গান্ধীজী অনশনের দ্বারা এর জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করেন।

"দেশকে স্বাধীন যে কেউ করতে পারে, আমি চাই জনগণকে জাগাতে", বলেছিলেন গান্ধীজী। বিয়াল্লিশ সালের মতো গণজাগরণ ভারতের ইতিহাসে আর কখনো ঘটেনি। কিন্তু পরিতাপের বিষয় তাতে মুসলমানদের অংশ যৎসামান্য। ব্যতিক্রম একমাত্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফফর খানের ব্যক্তিগত প্রভাবে মুসলমানদের যোগদান। ব্যক্তি হিসাবে মুসলমানরা কংগ্রেস পরিচালিত প্রত্যেকটি আন্দোলনেই ছিলেন। যেমন মওলানা আবুল কালাম আজাদ। কিন্তু সমষ্টিগতভাবে অংশগ্রহণ কেবল অসহযোগ আন্দোলনের সময়েই দেখা গিয়েছিল। সেটাও খেলাফতের ইস্যুতে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে ভারতীয় মুসলমানদের বোঝানো হয়েছিল যে ইংরেজ গেলে কংগ্রেস রাজা হবে, তখন মুসলমান হবে হিন্দুর প্রজা। আরো একবার গণ আন্দোলন করলে সেটাতে কি মুসলমানরা সমষ্টিগতভাবে অংশগ্রহণ করত? আর সেটা কি সম্পূর্ণ অহিংস হত? কংগ্রেস নেতারা তা বিশ্বাস করেন না। তাঁদের সামনে দুটিমাত্র বিকল্প ছিল। মুসলিম লীগকে সঙ্গে নিয়ে কোয়ালিশন সরকার গঠন। মুসলিম লীগকে বাদ দিয়ে একক সরকার গঠন। দ্বিতীয়টি করতে গেলে মুসলিম লীগকে দেশের একভাগ দিতে হবে। সেই

সূত্রে বঙ্গের একভাগ, পাঞ্জাবের একভাগ।

প্রথম বিকল্পটিকে ট্রায়াল দেওয়া হয়েছিল। সেটি ব্যর্থ হয়। সুতরাং দ্বিতীয়টি ছাড়া আর কোনো কার্যকর পন্থা ছিল না। বিনুকে স্বীকার করতেই হল যে পার্টিশনই গৃহযুদ্ধের থেকে ভালো। নইলে ইংরেজকেই বরাবরের জন্যে থেকে যেতে হয়। ইংরেজরা নিজেরাই থাকতে চায় না। জুন ১৯৪৮ পর্যন্ত ছিল তাদের রাজত্বের মেয়াদ। তার আগেই অনেকে ছুটি নিয়েছিলেন বা ইস্তফা দিয়েছিলেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্যে নেহরু ও প্যাটেল যতখানি ব্যগ্র, মাউন্টব্যাটেন তার চেয়েও বেশি। কে জানে গান্ধী বুড়ো হয়তো সব ভেস্তে দেবেন। গান্ধীজীই যে স্বাধীনতা দিবসে বিষণ্ণতম পুরুষ তা নয়, জিন্নাও ছিলেন তাঁর দোসর। ও রকম পাকিস্তান তিনি চাননি। পাকিস্তানই তিনি চাননি। তিনি চেয়েছিলেন কংগ্রেস লীগ দ্বৈরাজ্য। এক রাজ্যে দুই রাজা।

আশ্চর্যের ব্যাপার, ক্ষমতা হস্তান্তরের পর দেখা গেল সবচেয়ে জনপ্রিয় মানুষ একজন ইংরেজ। লর্ড মাউন্টব্যাটেন। ইংরেজদের সঙ্গে বিবাদ চক্ষের নিমেষে মিটে যায়। ভেলকি না ভোজবাজি? ইংরেজদের গায়ে কেউ হাত দেয় না। হাত দেয় মুসলমানদের গায়ে, হিন্দুর গায়ে, শিখের গায়ে। পরস্পরকে মেরে তাড়ানোর ধূম পড়ে যায়। তখন সেই গান্ধীই ভরসা। তিনি যা একাই তাঁর নৈতিক শক্তিতে করেন তা একপ্রকার অসাধ্যসাধন। অহিংসা কত উচ্চে উঠতে পারে তার দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া গেল পৃথিবীতে বহু শতাব্দী পরে। তাঁর তিরোধানও অহিংসার উচ্চতম আদর্শ। বিনুর তৃতীয় বৃহৎ উপন্যাসের এইখানেই সমাপ্তি।

এ গ্রন্থ লিখতে পারাটাও তার জীবনে এক পরম লাভ। সে অভিজ্ঞতা তাকে সিদ্ধি না দিক শুদ্ধি দেয়। তত দিনে তার বয়স হয়েছে বিরাশি। এত দিন তো বাঁচবার কথা নয়। চার খণ্ডের এক এক খণ্ড লেখে আর ভাবে এই বোধহয় শেষ। না, চার খণ্ডের বেশি লিখতে পারা যেত না। প্রথম যৌবনে দুই বছরের ঘটনা নিয়ে বারো বছরে ছয়খণ্ডের উপন্যাস লিখেছিল। দ্বিতীয় যৌবনে তিন বছরের ঘটনা নিয়ে তিন খণ্ড লিখতেই তার পনেরো বছর লেগে যায়। পঁচাত্তরের উর্ধ্বে সে কোনো অর্থেই যুবক নয়। ওই চার খণ্ডই তার পক্ষে দুঃসাধ্য। কিন্তু সাড়ে আট বছরের ঘটনাকে চার খণ্ডের ফ্রেমে আঁটা হচ্ছে সংক্ষেপে সারা। বিনুকে সময়ের বিরুদ্ধে দৌড় দিতে হচ্ছিল। যাকে বলে রেসিং এগেন্সট টাইম। তাই প্রাকৃতিক বর্ণনা একদম বাদ।

এর পরে সে শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন। দম যা ছিল ফুরিয়ে গেছে। উপন্যাস লেখা হচ্ছে দমের কাজ। একখানা ছোট উপন্যাস লেখার স্বপন এখনো রয়েছে। কিন্তু তার জন্যে দম নেই। আপাতত প্রবন্ধ বা নিবন্ধ, ছড়া বা কবিতা লিখেই সে ক্ষান্ত। তাতে তেমন বেদনা নেই, তেমনি আনন্দও নেই। তার প্রত্যেকটা বড়ো উপন্যাসের অন্তরে নিহিত আছে যেমন বড়ো বেদনা তেমনি বড়ো আনন্দ। সৃষ্টিমাত্রেরই বেলা একথা খাটে। বিনু একজন স্রষ্টা হতে চেয়েছে।

মীরা ও বিনু কলকাতায় বাস করলেও শান্তিনিকেতনেই তাদের হোম। তারাও আশ্রমিক সমাজের অঙ্গ। কলকাতায় থাকলেও মীরা মাসে মাসে শান্তিনিকেতনে যায়, নিজের বাড়িতে কিছু দিন কাটায়। বাগান দেখাশুনা করে। ফিরে আসে তরিতরকারি ফলমূল নিয়ে। বিনু মাঝে মাঝে যায়। না যাওয়ার একটা কারণ সে টাইপরাইটারে লেখে। পুরনো মডেলের রেমিংটন। বয়ে নিয়ে যাওয়া শক্ত। টাইপরাইটারে লেখালেখি ছাড়া বাঁচতে পারে

না। এটা ষাট বছরের অভ্যাস।

বিনু যখনি শান্তিনিকেতনে যায়, মূল আশ্রম চত্বরে ঘুরে বেড়ায়। তাতে সে একপ্রকার আধ্যাত্মিক সুরভি পায়। সেখানে তিন মহাপুরুষ সাধনা করেছেন। দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ। গান্ধীজীও তো সেখানে কিছুদিন কাটিয়েছিলেন। সেই সূত্রে স্থানটির একটি মাহাত্ম্য আছে। আদি শান্তিনিকেতন ভবনে উৎকীর্ণ রয়েছে আনন্দরূপম্ অমৃতং যদ্ বিভাতি। উপনিষদের মর্মবাণী। বিনুকে মনে করিয়ে দেয় প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মবাদীদের উপলব্ধি। তাঁদের সঙ্গে তার আত্মিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি। যদিও সে আধুনিক যুগের সন্তান।

কলকাতায় তেমন কোনো আধ্যাত্মিক কেন্দ্রস্থল নেই। তবে বিনুদের কাছে এটা সংস্কৃতির পীঠস্থান। বাংলার, ভারতের, বিশ্বের। এখানে গ্রীক চার্চ আর্মেনিয়ান চার্চও আছে। আছে ইহুদীদের সিনাগগ। নিচিরেন সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ বিহার। জৈন মন্দির তো আছেই। আছে মুসলমানদের নাখোদা মসজিদ। ভারতীয় যাদুঘর। এশিয়াটিক সোসাইটি প্রভৃতি মহামূল্য সংগ্রহশালা।

বিনু কলকাতা ছাড়তে পারে না, কারণ কলকাতা তাকে ছাড়তে চায় না। কমলী নেহি ছোড়তি। কিন্তু সে বহুদিন ধরে ভেবে এসেছে যে আবার মীরাকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে ফিরে যাবে ও বাকি জীবনটা কাটাবে। সম্ভব হলে আরো ভিতরে যাবে। মীরার কঠিন অসুখ। চিকিৎসায় আরোগ্য হয় না। শান্তিনিকেতনে গিয়ে প্রকৃতির কোলে আশ্রয় নিলে যদি কিছুটা আরাম পায়। যে সময় রেলযাত্রার কথা সে সময় সে শয্যা নেয়। কয়েকদিনের মধ্যেই তার মহাযাত্রা।

ওরা বাষট্টি বছর একসঙ্গে ছিল। পরম সৌভাগ্য। বিরহ বেশিদিন ভোগ করতে হয়নি। এখন তো আজীবন বিচ্ছেদ। চিরবিচ্ছেদ মন মানতে চায় না। মনকে মানা না মানার স্বাধীনতা দেওয়া ভালো। কেই বা নিশ্চিত জেনেছে যে এই শেষ, এর পরে শূন্য। বিনুর দৃঢ় বিশ্বাস পূর্ণ থেকে পূর্ণ আসে, পূর্ণ থেকে পূর্ণ বিয়োগ করলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে। তা হলে তো পুনর্মিলনেরও সম্ভাবনা থাকে। কে জানে কোথায় ও কবে! ওসব প্রশ্ন তুলে রেখে যে কাজ করতে আসা সে কাজ সারা করে যাওয়াই কর্তব্য। মীরা এ জগতে ছিল বিরাশি বছর। বিনুর চেয়ে ছয় বছরের ছোট। হঠাৎ ক্যান্সার না হলে সে আরো দীর্ঘকাল বাঁচত। শক্তির সীমা ছিল না তার। কত কাজ করে গেছে ভেবে অবাক হতে হয়। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিনুর জীবনদর্শন

প্রতিযোগিতায় সাফল্যের শীর্ষে উঠে বিনুর তো আনন্দে আত্মহারা হওয়ার কথা কিন্তু তাকে দেখে মনে হল যে সে সংকটে পড়েছে। হ্যামলেটের মতো সে দোদুল্যমান। আই সি এস হবে কি হবে না? যদি হয় কেন হবে? কার জন্যে হবে? সুশীলা তো আপাতত স্বামী পুত্র নিয়ে ঘর সংসার করতে ব্যস্ত। মুক্তির জন্যে তার তাড়া নেই। বিনুর এখন মনে হচ্ছে সুশীলা মুক্তি বলতে যা বুঝত তা বিবাহবন্ধন থেকে মুক্তি নয়, অন্দরমহল থেকে মুক্তি। সেটার জন্যে বিনুর মতো একজনের সাহিত্যসৃষ্টি ছেড়ে শাসনকর্ম করার দরকার কী? তবে, হ্যাঁ, সেইসূত্রে বিলেত যাওয়ার সাধ মিটিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন বিনুর নিজের দিক থেকে ছিল।

বিশ্বস্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির ক্ষমতার এক একটি কণা এক একজন কবিকে বা শিল্পীকে দেন। বিনুও তেমনি একজন। সে যদি তার সৃষ্টিক্ষমতার সদ্‌ব্যবহার করে তবেই তার জীবন সার্থক হবে। সেটাই তার স্বধর্ম। তার জীবনের কাজ। অথচ জীবিকার জন্যেও কোনো একটা বৃত্তি বেছে নিতে হয়। সতেরো বছর বয়সে বিনুর মতে সেটা ছিল সাংবাদিক বৃত্তি। সত্যিই সে তার সেইটুকু বিদ্যা নিয়ে ইংরেজি বাংলা সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখতে পারত না। গ্রাজুয়েট হওয়ার পরামর্শ দিয়ে এক প্রুফরিডার তার পরম উপকার করেছিলেন। কলেজে না গেলে সে ইউরোপীয় সাহিত্য ও ইতিহাসের এত বই আর কোথাও পেত না। তাছাড়া লজিক, ইকনমিক্স ইত্যাদি বিষয়ে লেকচার শোনা ও পরীক্ষা দেওয়ারও আবশ্যকতা ছিল। কলেজের আরো বড় লাভ সমমনস্ক বন্ধুদের সঙ্গ। সবুজ গোষ্ঠী গঠন। তাছাড়া প্রখ্যাত অধ্যাপকের সান্নিধ্য। কলেজে গিয়ে বিনু বার বার প্রথম হয় ও জলপানি পায়। তার থেকে আসে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। সমান্তরালভাবে চলছিল গান্ধীজীর সম্পাদিত 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পড়া ও তাঁর চিন্তা ও কর্মের সঙ্গে যোগ রাখা। বিনু খদ্দর পরত, কেবল কলেজে নয়, বিলেতে তথা চাকরি জীবনে। সংগ্রামে ঝাঁপ দেয়নি, তবে বার বার ভেবেছে তার যোগ দেওয়া উচিত। আসলে সেদিক থেকে সে রবীন্দ্রপন্থী।

তা বলে একেবারে ব্রিটিশ শিবিরে যোগদান? দেশের লোক তো ভাববেই সে দেশদ্রোহী। কখনো যে কোনো সত্যাগ্রহীকে জেলে দিতে হবে না তা কি সম্ভব? বিনু কী করে তার গান্ধীপন্থী বন্ধুদের কাছে মুখ দেখাবে? এই তার আদর্শবাদ! শেষ পর্যন্ত বিনু তার বন্ধুদের সম্মতি পায়। এই স্থির হয় যে সে চাকরিতে বেশি দিন থাকবে না। অথচ সংগ্রামেও লিপ্ত হবে না। সাংবাদিক তথা সাহিত্যিক হবে।

আর কোনো পরীক্ষার জন্যে বিনু এমন প্রাণপাত পরিশ্রম করেনি। তার সেই তপস্যার মূলে ছিল এক নারীর প্রেরণা। এক নাইটের বলপরীক্ষার মূলে যেমন এক লেডি। এর থেকে তার এই প্রত্যয় জন্মায় যে নারীই পুরুষের শক্তি। যেমন কৃষ্ণের শক্তি রাধা। বৈষ্ণব পরিবারে তার কৈশোর কেটেছে। সে শুনেছে "সুখ বলে, আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল। সারী বলে, আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল। নইলে পারবে কেন?"

বিনু মনে মনে স্বীকার করে সুশীলা শক্তি সঞ্চার না করলে সেও আই সি এস নামক বলপরীক্ষায় প্রথম হতে পারত না। যতদিন না সে আই সি এস ত্যাগ করছে ততদিন এ নিয়ে তার মনে একটা অধর্মবোধ থাকবে। তা বলে সে সুশীলার প্রতীক্ষা করবে না। তার কামনা এক নূতনা রাধা। তার নতুন শক্তি।

দু'বছর বাদে বিনু বিলেতে তার শিক্ষানবিশী সাঙ্গ করে ভারতে ফিরে এল। বাংলা ভাষার লেখক হিসাবে তার প্রয়োজন ছিল বাংলাদেশে নিযুক্তি। সেটা সে চাইতেই পেয়ে গেল। ইতিমধ্যে সে এক ভ্রমণকাহিনী লিখে বাংলাদেশের পাঠকমহলে সুপরিচিত হয়েছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী তার পাঠক। তার প্রথম কর্মস্থল বহরমপুর। সেখানে গিয়ে সে বিভিন্ন বিভাগে হাতে কলমে তালিম পায়। কিন্তু তার হাতের কলম তো একটা নয় দুটো। একটা রাজকর্মের, আর একটা সাহিত্যসৃষ্টির। কলমের সঙ্গে কলমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

কিছুদিন পরে মহাত্মা গান্ধী তাঁর লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করেন। বিনুও জেলে যায়, কিন্তু কয়েদী হিসাবে নয়। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সাগরেদ হিসাবে। তার সহানুভূতি রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি। একদিন হল কী? না তার নামে এক চিঠি এসে হাজির। এসেছে

দক্ষিণ ভারতের ভেলোর জেল থেকে। লিখেছেন কে? না সুশীলা দেবী।

আন্দোলনে যোগ দিয়ে অসংখ্য অন্তঃপুরিকা রাজবন্দিনী হন। তাঁদের সেই বন্দীদশাই তাঁদের মুক্তি অভিজ্ঞতা। অবরোধ প্রথা থেকে মুক্তি। আজকের দিনে কেউ কল্পনা করতে পারবেন না সেটা কত বড়ো বিপ্লব। পর্দানশীল কুলবধূ সমুদ্রের ধারে গিয়ে নুন তৈরি করছে আর পুলিশের দ্বারা গ্রেফতার হচ্ছে, হাকিমের দ্বারা সে দণ্ডিত হচ্ছে, জেলখানায় আবদ্ধ হচ্ছে। তবু কী আনন্দ! তা বলে হাজার মাইল দূরে ভেলোরে চালান!

সুশীলার সাথী ছিলেন এক দক্ষিণী মহিলা। তিনিও বিনুকে চিঠি লিখেছিলেন। জীবনে কতরকম অঘটন ঘটে। পঁয়ত্রিশ বছর পরে বিনু যখন দিল্লিতে এক সম্মেলন উপলক্ষে উপস্থিত তখন তাঁর চাক্ষুষ পরিচয় পেয়ে অবাক হয়। তিনি এক ভারতবিখ্যাত পুরুষের পত্নী, স্বয়ং পার্লামেন্টের মেম্বর। তিনিও ভারতবিখ্যাত হৈমবতী দেবী। তিনি সেদিন ভেলোরের দুর্গতির কাহিনী বলেন। তাঁদের সেলের পাশেই ছিল ফাঁসির আসামীদের সেল। কী নিষ্ঠুরতা।

জেলখানা থেকে যে চিঠি আসে তাতে নিষ্ঠুরতার উল্লেখ থাকে না। তা সত্ত্বেও সুশীলা তার নতুন জীবন সানন্দে মেনে নিয়েছে। বিনু একদা অজস্র চিঠি লিখেছে। আর লিখতে চায় না। যে যার পথ বেছে নিয়েছে। একজন রাজবন্দিনীর, অপরজন রাজপুরুষের। কারো সঙ্গে কারো সাযুজ্য নেই। এমনও হতে পারত যে সুশীলাকে একদিন আদালতে হাজির করা হত আর বিনু তাকে কারাদণ্ড দিত। এ চাকরির এই হল দোষ। আদালতে দাঁড়িয়ে গান্ধীজী বলেছিলেন, হয় আপনি আমাকে দণ্ড দিন, নয় পদত্যাগ করুন। সুশীলাও হয়তো সেই কথাই বলত।

বিনু একটা উপন্যাস লিখতে শুরু করেছিল। তাই নিয়ে ধ্যানস্থ ছিল। এমন সময় আরো এক চিঠি। লিখেছেন এক মার্কিন মহিলা। এসেছেন ভারত দর্শনে। লন্ডনে বিনুর এক বন্ধুর সঙ্গে আকস্মিক আলাপ। বন্ধু পরামর্শ দিয়েছেন বিনুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে। তিনি জানতে চান কী কী দেখবেন। কোথায় কোথায় যাবেন। বিনু উত্তর দেয়, এখানেই আসুন, মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারি দেখাব।

তিনি সত্যি সত্যি আসেন। দেখেন। বিদায় নেন। বিনু ধরে নেয় আর কখনো দেখা হবে না। কী মনে করে দু'তিনটি বাংলা কথা শিখিয়ে দেয়। কে জানত যে একদিন তাদের বিয়ে হবে। তিনি আবার আসবেন। এবার বধূরূপে। জীবনে কত কী অঘটন ঘটে। কে জানত বিনু একদিন সেই জেলার শাসক হয়ে আসবে, সঙ্গে মীরা। এবার ফার্স্ট লেডি।

এতদিন বিনুর জীবন ছিল তার একার জীবন। সে একজনের মতো পরিকল্পনা করেছিল। এখন করতে হল দু'জনের মতো। পরে আরো একজনের মতো। কিন্তু বিনু বা মীরা কোনো জনই সংসারী বিজ্ঞজন নয়। যাকে ইংরেজিতে বলে ওয়ার্ডলি ওয়াইজ ম্যান বা ওম্যান। স্কুল থেকে বিনু একবার পুরস্কার পেয়েছিল Bunyan রচিত 'Pilgrim's Progress'. তাতে সংসারী বিজ্ঞজনের প্রতি কটাক্ষ ছিল। বিনু স্থির করেছিল সে বড়ো হয়ে সংসারী বিজ্ঞজন হবে না। সংসারীই হবে না, যদি না তার নিজের মতো একজন আদর্শবাদিনীকে প্রেমসূত্রে জায়া রূপে পায়। মীরাই ছিল বিনুর নূতনা রাধা। 'সমাপিবে চির বাঁশরি সাধা।' বিনু ভাবতেই পারেনি যে মীরা তার জন্যে পিতৃকুল ত্যাগ করবে, মাতৃভূমি ত্যাগ করবে, স্বমনোনীত পিআনো বাদনের বৃত্তি ত্যাগ করবে, ভিখারী শিবের অন্নপূর্ণা হবে। বিয়ের

আগেই বিনু জানিয়েছিল আসলে সে একজন আই সি এস নয়, একজন সাহিত্যিক, সাহিত্যের খাতিরে তাকে আই সি এস ত্যাগ করতে হবে বছর কয়েক বাদে। মীরা সায় দিয়েছিল। বিয়ের পর থেকেই তাদের কৃচ্ছ্রসাধন আরম্ভ হয়ে যায়। যাতে পদত্যাগে হঠাৎ কষ্ট না পেতে হয়। মীরা ছিল ছায়ার মতো অনুগতা। বিনু যখনি যেখানে বদলি হয়েছে বিনুর কর্মস্থলে মীরা তার সাথী হয়েছে। গরমের কালে বিনুকে ছেড়ে সে পাহাড়ে যেতে চায়নি। কোনো কোনো জায়গায় বিদ্যুৎ ছিল না। টানা পাখার হাওয়া খেতে হত। মীরা সহ্য করত। বিনুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ত সফরে। রাত কাটাত তাঁবুতে। দিনের বেলা পায়ে হেঁটে বেড়াত। কোলে ছ'মাসের শিশু।

আই সি এস-দের কাজ শুধু মামলার বিচার নয়। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত একশো রকমের কাজ। এসব করতে করতে তারা চৌকষ হয়। যে কোনো পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারে। মন্ত্রীরা না থাকলে ওরাই সরকার চালায়। সিভিল অথরিটি আর্মিও মেনে নেয়। পুলিশ তো মেনে নেয়ই। সফরে গেলে বিনুর অন্যতম কাজ হয় থানা ইনস্পেকশন। বিনু একজন ম্যান অভ অ্যাকশন হয়ে ওঠে। অফিস, আদালত, ট্রেজারি, জেল, থানা, ইউনিয়ন বোর্ড, স্কুল কমিটি, ডিসপেনসারি কমিটি, কো-অপারেটিভ সোসাইটি, ল্যান্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক, কোথায় না তার স্থিতি বা গতি! মহকুমার ভার দিয়ে তাকে তৈরি করা হচ্ছে জেলার ভারের জন্যে। জেলাশাসক হলে উচ্চতর পদের জন্যে। জেলা জজ হলে হাইকোর্টের জন্যে।

এটা ঠিক চাকরি নয়, আমলাতন্ত্র। বুরোক্রাসি। বিনু এই ব্যূহের ভিতরে ঢুকে বেরোবার ফাঁক পায় না। সে ভেবেছিল তাকে ডার্টি ওয়ার্ক করতে বলা হবে। তখন সে অস্বীকার করে ইস্তফা দেবে। তাকে তার বিবেচনা মতো কাজ করতে বলা হয়। যেমন সাবালক ছেলেকে। সাহিত্যের জন্যে যাচ্ছে এটা যদিও ঠিক তবু এটার চেয়ে জুতসই দেশের জন্যে যাচ্ছে বা গুরুতর মতভেদের জন্যে যাচ্ছে। বিনু দোনোমনো করে। সবচেয়ে বড় কারণ মীরা ও ছেলেমেয়ে আর্থিক সংকটে পড়বে। ওদের বোঝাতে পারা যাবে না যে বিনুর পক্ষে ওটা এক আত্মিক সংকট।

জেলাশাসক হয়ে অবধি সে আড়াই বছর সাহিত্যের কলম ধরেনি। এমন অবস্থায় একটি শিশুপুত্রের প্রয়াণ তাকে বিহ্বল করে। বিনু সরস্বতীর কাছে অপরাধী বোধ করে। চাকরি ছেড়ে দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে উদ্যত হয়। কিন্তু কোথায় বিকল্প? টাকার জন্যে লিখতে রলাঁ বারণ করেছেন। টাকার জন্যে অন্য কিছু। সেটা কি সংবাদপত্রের চাকরি? সেখানেও তো কর্তার ইচ্ছায় কর্ম।

তাকে জজ করে দেওয়া হয়। তখন যথেষ্ট অবসর পায়। উপন্যাস সমাপ্ত হয়। হাত যখন খালি তখন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। বিনু তাঁর সাহিত্যকর্মের প্রশংসা করলে তিনি তাকে এক চমক দেন। "আমি সারাজীবন যা লিখেছি তা সাহিত্য হয়নি। তাই আমি সাহিত্যিক নই। সাহিত্যে আমার স্থান নেই। আপনার রচনা থেকে আমার নাম বাদ দিন।"

চাকরি সত্ত্বেও সাহিত্যিক মহলে বিনুর একটা স্থান আছে। সাংবাদিক হলে সেটা কি আর থাকবে? সে হবে না ঘরকা না ঘাটকা। চাকরি যদি অপথ হয়ে থাকে সাংবাদিকতাও অপথ। সে একটা ভুল সংশোধন করতে গিয়ে আরেকটা ভুল করবে। তারচেয়ে পেনশনের

জন্যে পায়চারি করা শ্রেয়। মীরাও তার এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করে। যদিও সে বিনুর পদত্যাগের জন্যে প্রস্তুত। আসবাবপত্রের বেশির ভাগ জলের দরে বিক্রি। সে আর ছেলেমেয়ে পালঙ্ক ছেড়ে তক্তপোশে শোবে। বিনু তো ক্যাম্প কটে। সবাই মেজেতে বসে খাবে। টেবিলচেয়ার বাতিল।

বিনুর মনে হল জনগণের জন্যে কিছু একটা করা উচিত। ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে সে গ্রামে গ্রামে ঘুরে তাদের সঙ্গে মিশত ও তাদের জন্যে যথাসাধ্য করত, যেমন একটা স্কুল বা মেটার্নিটি হোম। কিন্তু এখন সে সুযোগ নেই। সে স্থানু। তাছাড়া জজকে লোকের সঙ্গে মিশতে মানা। পাছে সে প্রভাবিত হয়। বিনু ছড়া লিখতে শুরু করে দেয়। ছড়া হয়তো গ্রামে গঞ্জে লোকের মুখে মুখে ঘুরবে। তার জন্যে ছাপা বই পড়তে হবে না। ওটা হচ্ছে এদেশের ওরাল ট্রাডিশন। চর্চার অভাবে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

যারা কায়িক পরিশ্রম করে ফসল ফলায়, কাপড় বোনে, বিনুর মতো মননশীলদের খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখে তাদের কাছে বিনু প্রাণধারণের জন্যে ঋণী। ঋণশোধের জন্যেই তার এইসব ছড়া লেখা। নিছক আনন্দের জন্যে নয়। কিন্তু এই কি যথেষ্ট। ঝড়ের দাপটে সমুদ্রের ঢেউ এসে কাঁথির উপকূলবর্তী বিশ মাইল পর্যন্ত এলাকা ছারখার করে দিয়ে গেছে। বিপন্ন মানুষকে সাহায্য পাঠানো জরুরি। কিন্তু সরকার বাধা দিচ্ছে। কারণ গ্রামবাসীরা গান্ধীজীর ডাকে বিদ্রোহী। মীরা একটি মেডিক্যাল টিম পাঠাতে চায়, ছাত্ররা তৈরি। মেদিনীপুরের জেলাশাসক ঘোর কংগ্রেসবিরোধী মুসলমান। তিনিও একজন আই সি এস। বিনু তাঁকে চিঠি লিখে আশ্বাস দেয় যে মেডিক্যাল টিম যাচ্ছে নিছক মানবিক উদ্দেশে। মানুষকে মানুষ না বাঁচালে কে বাঁচাবে। তাতে ফল হয়। বিনু শুনে অবাক হয় যে কংগ্রেস থেকে রিলিফ পাঠাতে কারো সাহস হয়নি। বহু কর্মী নিরাপদে কলকাতায় বসে আছেন। কুইট ইন্ডিয়া আন্দোলন তেমন সাড়া জাগায়নি মেদিনীপুর জেলার বাইরে।

বিনু রাজনীতির লোক নয়। কিন্তু মূল নীতি নিয়ে চিন্তিত। হিংসার প্রয়োজন যুদ্ধকালেই সবচেয়ে বেশি। যুদ্ধরত বিশ্বকে দৃষ্টান্ত দেখাতে পারে একমাত্র ভারতের জনগণ। গান্ধীজীর নেতৃত্বে। কিন্তু তাঁর এই আন্দোলন অহিংস হয়নি।

নিদ্রিত জনগণকে জাগানোই যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে তা সিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু সেই জাগ্রত জনগণ অহিংসার ধার ধারেনি। তবে তাদের পক্ষে বলবার একটি প্রশংসনীয় কথা তারা একজনও ইংরেজের গায়ে হাত দেয়নি। মীরা বিনুকে একথা মনে রাখতে বলে। অর্থাৎ জাতি হিসাবে ইংরেজদের কোনো অনিষ্ট ঘটেনি। ইংরেজ সরকার আর ইংরেজ জাতি সমার্থক নয়। গান্ধীজীর শিক্ষা ব্যর্থ হয়নি।

বিনু ক্রমশ তার বিচারক বৃত্তিতে মনোযোগী হয়। দেশের লোক যে কেবল সুশাসন চায় তাই নয়, সুবিচারও চায়। জজের মর্যাদা ম্যাজিস্ট্রেটের চেয়ে কম তো নয়ই, বরং বেশি। ইহুদীদের ওল্ড টেস্টামেন্টে রাজাদের পরেই জজদের স্থান। যীশুর অনুজ্ঞা, ন্যায়পরায়ণতার জন্যে ক্ষুধিত ও তৃষিত হও। বিচারকের আসনে বসে বিনুর মনে হয় তাকেই বিচার করা হচ্ছে, আসামীকে নয়। সে প্রার্থনা করে সে যেন কারো প্রতি অন্যায় না করে। আসামীও তো মানুষ। একজন মানুষ আরেকজন মানুষের বিচার করার কে? ভগবানই প্রকৃত বিচারক। বিনু তাঁর হাতের যন্ত্র। নিমিত্তমাত্রো ভব সব্যসাচী। যথেষ্ট বিবেচনার সঙ্গেই সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তবে একটি ক্ষেত্রে তার বিবেক তার হাত চেপে ধরে। না প্রাণদণ্ড নয়।

যে মামলার সাক্ষ্য প্রমাণ সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য তার প্রাণদণ্ডই একমাত্র বিহিত দণ্ড। সে মামলায় প্রাণদণ্ড না দেওয়াটাই সমাজের প্রতি অকর্তব্য। বিনু মানে এটাই ঠিক। তবু তার মন মানে না। প্রাণদণ্ড নামক দণ্ডটাই অন্যায়। টলস্টয়ের মতে। গান্ধীজীর মতেও। বিনু কী করবে? চাকরি ছেড়ে দেবে? না চাকরি রাখার জন্যে প্রাণদণ্ড দেবে? তার বরাত ভালো জুররা প্রাণদণ্ডের ভয়ে দণ্ডবিধি আইনের ধারাটাকে নামিয়ে আনেন। তখন জজ দ্বীপান্তর দণ্ড দিয়ে অপরাধীকে বাঁচান। সেই সঙ্গে আপনাকেও।

সে নিকটবর্তী একটি জেলায় বদলি হয়েছে শুনে তার এক সাহিত্যিক বন্ধু তাকে লেখেন, "যুবকটি বেকার। দয়া করে তাকে জুরর করবেন।" বিনুর মনে খটকা বাধে। তবে কি জুররা অনাহারী নন? উৎকোচ আহারী। খোঁজ খবর নিয়ে যা জানতে পায় তা রোমহর্ষক। আসামী পক্ষের উকিলদের সঙ্গে জুররদের চোরা সম্পর্ক। তাই পাকা মামলাও কেঁচে যায়। জুরিপ্রথা ইংরেজদের দ্বারা এদেশে পরিবর্তিত। এক ইংরেজ জজ রবীন্দ্রনাথকে বলেন ভারতীয়রা এই প্রথার উপযুক্ত নয়। তিনি তা শুনে মর্মাহত হন। বিনুও ছিল তাঁর মতো ভারতে জুরিপ্রথার পক্ষে। কিন্তু পরিশেষে সেও সেই জজের মতের সঙ্গে মত মেলায়। হাইকোর্টকে চিঠি লিখে জানায় এ জুরিপ্রথার সঙ্গে উৎকোচ জড়িত। বছর তিনেকের জন্যে জুরিপ্রথা রহিত করা হোক।

এটা পার্টিশনের অব্যবহিত পূর্বের সুপারিশ। ব্রিটিশ বিদায়ের পর দেখা গেল জুরিপ্রথাও বিদায় হয়েছে। শুধু একটি জেলা থেকে নয়, পশ্চিমবঙ্গ থেকে, সারা ভারত থেকে। তবে হাইকোর্টে দশ বারো বছর বহাল ছিল। পরে সেখান থেকেও উঠে যায়। তাহলে কি জুরিপ্রথা ভারতে অনুপযোগী? অথবা ভারত কি জুরিপ্রথার অনুপযুক্ত? বিনু দুঃখিত তার সুপারিশের পরিণাম দেখে।

পার্টিশনের পূর্বেই বিনুর কাছে সরকার থেকে হিন্দু কোডের একটি খসড়া আসে। তখনকার দিনে কেন্দ্রীয় সরকারে কংগ্রেস ছিল না। সুতরাং হিন্দু কোডের প্রস্তাবটা কংগ্রেসের বা জবাহরের নয়। বোধহয় বড়লাটের শাসন পরিষদের আইন বিষয়ক সদস্যের। তিনি হিন্দু। তবে যতদূর মনে পড়ে তাতে প্রাক্তন বিচারপতি বেনেগল নরসিংহ রাওয়ের হাত ছিল। খসড়ার একটি ধারায় ছিল স্বামী যদি হিন্দু হয় তবে স্ত্রী হিন্দু না হলেও সন্তান হিন্দু বলে গণ্য হবে। এই তো বিনু চায়। তার বিয়ের সময় তার বাবা প্রশ্ন করেছিলেন, "তোদের ছেলেমেয়ের বিয়ে হবে কোন সমাজে?" বিনু উত্তর দিয়েছিল, "ততদিনে হিন্দুসমাজ আরও উদার হয়ে থাকবে।" ভগবান কতবার তার মুখ রক্ষা করেছেন। এবারেও করলেন। বেনেগল নরসিংহ রাওয়ের পত্নীও ছিলেন মীরার মতো একজন। এখন তো স্থির হয়ে গেছে বাপ হিন্দু না হলেও মা যদি হিন্দু হয় তো সন্তানও হবে হিন্দু। যেমন ইন্দিরা গান্ধীর পুত্র রাজীব ও সঞ্জয়।

জজের পদে থেকে বিনু আবিষ্কার করেছিল যে ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভায় একটি অ্যাক্ট পাশ হয়েছিল। তার সূচনায় ছিল, "The term 'Hindu' includes an Ismalia Khoja." যতদূর মনে পড়ে সেটা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন। তাই যদি হয় তবে জিন্না সাহেবও উত্তরাধিকার সূত্রে হিন্দু। কারণ তিনি একজন ইসমাইলিয়া খোজা। দ্বিজাতিতত্ত্ব কি তাঁর মুখে মানায়?

বিনুকে পার্টিশনের পর শ্রমিক ক্ষতিপূরণ কমিশনার করা হয়। সেই সঙ্গে কৃষি

আয়কর ট্রাইবুনালের প্রেসিডেন্ট। উপরন্তু গুণ্ডা আইনের জজ। গুণ্ডার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে বেশ্যাও আসে। শ্রমিক, কৃষক, গুণ্ডা, বেশ্যা এদের সকলের সঙ্গে ঘটে প্রকাশ্য পরিচয়। কিন্তু পরে একসময় তার ও তার এক সহযোগীর উপরে ভার পড়ে গোপনে বিবেচনা করে দেখতে রাজবন্দী কমিউনিস্টদের কাকে কাকে আটক করে রাখা অনাবশ্যক। আশ্চর্যের ব্যাপার আটকদের মধ্যে ছিল কয়েকটি স্কুলের ছাত্রী। বিনু ও তার সহযোগী জানতে চান কী তাদের অপরাধ। পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন ওরাই সবচেয়ে বিপজ্জনক। স্কুলের ছোট ছোট মেয়েদের মগজ ধোলাই করছে। তারা পরে একদিন দুর্ধর্ষ বিপ্লবী বনবে। ভদ্রলোক বিনুদের হাসালেন। তাঁরা ঐ বালিকাদের মুক্তির সুপারিশ করেন। কিন্তু সত্যই তিনি ছিলেন ভবিষ্যদ্‌ বক্তা।

বিনুর জীবনদেবতা তাকে মহাকরণে কিছুদিন সেক্রেটারি পদে রাখেন। এমনি করে তার কর্মজীবনের বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়। সে ক্যাবিনেট বৈঠকে হাজির হয়ে মন্ত্রীদের মন্ত্রণা শোনে। একজন মন্ত্রী তাকে বলেন, "আপনি ভাবছেন চাকরি ছেড়ে দিলে আরো ভালো লিখবেন। দেখবেন এই সময়টাই ছিল আপনার সাহিত্য কর্মের দিক থেকে সবচেয়ে অনুকূল সময়।"

যামিনী রায়ও তাকে বলেন, "সৃষ্টির কাজের জন্যে প্রতিকূলতাও চাই। বিরোধ না থাকলে সৃষ্টি এলিয়ে পড়ে। আপনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে ভুল করছেন।" অবসর নেবার পর বিনু দশটা থেকে পাঁচটা বাড়িতে কাটায়। অফিস বা আদালতের অভাব বোধ করে। চারদিক জমজমাট থাকত। সকলের মধ্যমণি বিনু। শূন্য ঘরে লেখালেখি করে কি জীবনের স্বাদ মেলে? কোথায় সেই জীবন দর্শন? জীবনের সঙ্গে মুখোমুখি। জীবনদর্শন বলতে জীবনকে দর্শনও বোঝায়। শান্তিনিকেতনে থেকে জীবনের কতটুকু দেখতে পাওয়া যায়? মাঝে মাঝে কলকাতা আসতে হয়। দিল্লি যেতে হয়। দর্শন যা করে তা একজন বাইরের লোকের মতো। একজন ভিতরের লোকের মতো নয়। সে একদা ছিল ইনসাইডার। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ইনসাইডার। এখন সে একজন আউটসাইডার। সরকারি মহলে সে একজন আউটসাইডার। ভিতরের খবর রাখে না। রাজনীতি ক্ষেত্রেও তাই। ব্যবসায় ক্ষেত্রেও তাই। তবে সে প্রচুর সময় পায় ভাববার ও লেখবার। সদর দরজা বন্ধ। অন্দরের দরজা খোলা। জগতেরও তো একটা ইনসাইড আছে। বিনু সেই অন্তর্জীবনের ইনসাইডার হতে আকাঙ্ক্ষা করে। অন্তর্জীবনও জীবন। তার দর্শনও জীবন দর্শন।

বহির্জীবনে যে রিক্ত অন্তর্জীবনে সে ধনী হতে পারে, বহির্জীবনে যে দুর্বল অন্তর্জীবনে সে বলবান হতে পারে, বহির্জীবনে যে নরম অন্তর্জীবনে সে শক্ত হতে পারে, বহির্জীবনে যে কুশ্রী অন্তর্জীবনে সে রূপবান হতে পারে, বহির্জীবনে যে শুষ্ক অন্তর্জীবনে সে সরস হতে পারে, বহির্জীবনে যে বৃদ্ধ অন্তর্জীবনে সে যুবক হতে পারে, বহির্জীবনে যে বদ্ধ অন্তর্জীবনে সে মুক্ত হতে পারে। বহির্জীবনের শূন্যতা অন্তর্জীবনের পূর্ণতা একই মানুষের বেলা সত্য হতে পারে।

মানুষকে লেবেল দিয়ে সনাক্ত করা যায় না। হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্মণ, হরিজন, বাঙালি, ওড়িয়া, ভারতীয়, ইংরেজ, শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ, প্রাচ্য, পাশ্চাত্য, প্রাচীন, আধুনিক, সভ্য, অসভ্য, আর্য, অনার্য ইত্যাদি লেবেল দিয়ে তাদের চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু তারা পুরোপুরি পৃথক নয়। অমিল যত মিল তারচেয়ে বেশি। তাদের অন্তর্জীবন হয়তো একই রকম। এসব লেবেলের মূল্য নেই তা নয়। কিন্তু অন্তর্জীবনের এসব লেবেল নিতান্তই বাহ্য।

মানুষকে ভালোবাসলে তার স্বরূপ জানতে পারা যায়।

মানুষ নিজেই একটা লেবেল। মানুষ বলতে যা বোঝায় তারচেয়েও মানুষ বড়ো। সূর্য তারার সঙ্গে তার সাযুজ্য। তার ভিতরেও জ্বলছে একই আগুন। তার বাইরেও সেই আলোর আভা সেইজন্যে তাকে বলা হয়েছে অমৃতের সন্তান। সে এসেছে অমৃতলোক থেকে, যাবেও অমৃতলোকে। তার পরমায়ু যত হ্রস্ব হোক না কেন তা অমৃত।

বিনু বরাবরই চিন্তা করেছে এ জীবন নিয়ে সে কী করবে। এ জীবনে সে কী হবে। এসব অবশ্য তার একার উপর নির্ভর করে না। পরিবার, সমাজ, দেশ, কাল, অবস্থা, পরিবেশ, দৈব, সবকিছুই তাকে সাহায্য করে বা তার অন্তরায় হয়। মানুষ করতে চায় এক। ঘটে আরেক। হতে চায় একটা কিছু। হয়ে ওঠে আরেকটা কিছু। একে বলা যেতে পারে নিয়তি। নিয়তি কেন বাধ্যতে? কিংবা জীবনদেবতার ইচ্ছা। তাঁকেই বা কে বাধ্য করবে?

তা সত্ত্বেও বিনু পদে পদে প্রশ্ন করে, কী কী লিখবে? কেমন করে লিখবে? কাদের জন্যে লিখবে? কেন লিখবে? তেমনি, মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে, কেমন করে বাঁচবে? কেন বাঁচবে? কাদের জন্যে বাঁচবে? কাদের বাঁচাবে?

লেখক হিসাবে সে মোটামুটি স্বাধীন। পরের ফরমাসে সে লেখে না। টাকার জন্যে লেখে না। তবে লিখলে টাকা নেয়। এটা বার্নার্ড শ'র নীতি। মোটামুটি স্বাধীন। পুরোপুরি নয়। একটা কথা আছে, Thus far and no further, এই পর্যন্ত যেতে পার। তারপরে একটি পাও না। লেখকের বিবেক তাকে নিবৃত্ত করে। কিংবা রাজভয়। কিংবা লোকভয়। সব কথা লেখা যায় না। লেখক স্বাধীন হলেও নিরঙ্কুশ নয়।

মানুষ বিনু লেখক বিনুর চেয়েও সাবধান। লোকে কী মনে করবে? স্ত্রী কী মনে করবে? ছেলেমেয়ে কী মনে করবে? পারিবারিক শান্তি কার না কাম্য? তবে তাদের কাছ থেকেও সবুজ সংকেত পাওয়া যায়। অন্যদের কাছ থেকে অত সহজে নয়। সকলের জীবনেই এইরূপ অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে।

বিনু যেমন করে বাঁচতে চেয়েছে তেমন করে বাঁচতে পারেনি। বাঁচতে গেলে বিপাকে পড়ত। নিজের খেয়ালখুশিমতো না হলেও যেভাবে বেঁচেছে সেটা মোটের উপর ভালোই হয়েছে।

বিনুর ধারণা ছিল জীবনও একটা শিল্প হতে পারে। সে হতে পারে জীবনশিল্পী। কিন্তু জীবনের একটা বড়ো অংশ হত জীবিকা। জীবিকার অনুরোধে আইনকানুন মেনে কাজ করতে হয়, কখনো কখনো ওপরওয়ালার সঙ্গে আপসও করতে হয়। পাবলিকের কাছেও জবাবদিহির দায় আছে। সে জীবনশিল্পী হবার সাধ ত্যাগ করে। শুধু শিল্পী হওয়ার সাধনাই বজায় থাকে। সে সাধনার সঙ্গে প্রেমিক হওয়ার সাধনাও ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। যেমন রস আর রূপ তেমনি প্রেম আর আর্ট।

এছাড়া ছিল সত্যের অন্বেষণ। জীবনের প্রত্যেক পর্বেই সে সত্যের অন্বেষণ করেছে। পরীক্ষা না করে কিছুই অমনি সত্য বলে মেনে নেয়নি। গুরুবাক্য হলেও তা স্বতঃসিদ্ধ নয়।

তার ভাগ্য ভালো যে তাকে ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে গুলি চালাবার হুকুম দিতে হয়নি, জজ হিসাবেও ফাঁসির হুকুম দিতে হয়নি। তেমন এক পরীক্ষায় পাশ করাও খারাপ, ফেল হওয়াও খারাপ। তবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থামাতে হলে যদি গুলি চালাবার হুকুম দেওয়া একান্ত আবশ্যক হত তাহলে সে পেছপাও হত না। সে দাঙ্গার সময় গুলি চালাত নিরীহ মানুষদের

বাঁচাতে। বাঁচানোই তার উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য সাধনের অহিংস উপায় হয়তো অনশন, কিন্তু সেটা একজন ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে বেমানান। অনশন করতে চাইলে পদত্যাগই কর্তব্য।

এখন সে নব্বইতে পড়েছে। তার জীবনসঙ্গিনী বিগত। এখন নতুন করে তার চাইবার কী আছে? পাবারই বা আছে কী? আছে। আছে। শৈশবের ও প্রথম যৌবনে দুবার তার দৃষ্টি খুলে গিয়েছিল। এক মুহূর্তের জন্যে তার ধ্যানদৃষ্টিতে এ বিশ্বের সব কিছু পরিষ্কার দেখা দিয়েছিল। সে আরো একবার ফিরে পেতে চায় সেই দিব্যদৃষ্টি।

বিনুর নিশ্চিতি

বিনুদের বাড়িতে কেবল মানুষজন ছিল না, ছিল পোষা পশু, পোষা পাখি। আর ছিলেন এক দেবতা। ঠাকুরঘরে তাঁর অধিষ্ঠান। ঠাকুমা তাঁর নিত্য সেবা পূজা করেন। বিনুরা তাঁর প্রসাদ পায়। সেই বিগ্রহের নাম বিনুরা শুনত পূর্ণমাসী। বোধহয় পৌর্ণমাসী। শ্রীরাধার এক সখী। শাক্ত পরিবারে ইনি কেমন করে এলেন তা অজ্ঞাত।

দেবতার উপস্থিতি কেবল বিনুদের বাড়িতেই নয়। অদূরে বলরাম মন্দির, সেখানে জগন্নাথ ও সুভদ্রাও উপস্থিত। মাঝে মাঝে মা ঠাকুমার সঙ্গে বিনুও সন্ধ্যাবেলা পায়ে হেঁটে মন্দিরে যায়। দিনের বেলা যাঁরা অসূর্যম্পশ্যা সন্ধ্যাবেলা তাঁরা মন্দিরে এসে আসর জমান। ক্ষুদে বিনুকে পুরুষ বলে গণ্য করেন না।

শহরে আরো মন্দির ও মঠবাড়ি আছে। বিনু তার বন্ধুদের সঙ্গে যায়। ঠাকুর দেখে। হনুমানজীও দেবতার মতো পুজো পান। তবে তাঁর সেটা মন্দির নয়, খোলা জায়গার উপর একটা আস্তরণ। বছরের পর বছর পাড়ায় আগুন লাগে, ঘর পুড়ে যায়। এর জন্যে পুজো করতে হয় হিঙ্গুলেই দেবীকে। যারা গুড়ের পানা দেয় তাদের ঘর পোড়ে না।

বিনু এ সমস্ত বিশ্বাস করে। তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর সেও একজন ভক্ত। তবে তার প্রধান আরাধ্য মা দুর্গা ও মা সরস্বতী। বাড়িতে যখন দুর্গাপূজা হয় তখন একট জলচৌকিতে রাখা হয় মূর্তি বা পট নয়, একটি তলোয়ার, বংশের পুরাতন উত্তরাধিকার। সেই সঙ্গে কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশিদাসী মহাভারত, কবিকঙ্কণ চণ্ডী প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ আর কে জানে কেন শেক্সপীয়ারের ইংরেজি গ্রন্থাবলী। সরস্বতী পূজার সময় তলোয়ার থাকে না, তার বদলে থাকে কলম ও দোয়াত। আর সব একই রকম, বাদ কবিকঙ্কণ চণ্ডী। শেক্সপীয়ার যথাস্থানে সমাসীন।

ছোটকাকা পরীক্ষা পাশ করে ইংরেজি বাইবেল উপহার পান। সে গ্রন্থও এ পরিবারে সমাদৃত। তবে পূজিত নয়। বোখারি সাহেব বলে এক ফকির মাঝে মাঝে সত্যপীরের সিন্নি দিয়ে যান। বিনুরা মুসলমানের হাতে জল খায় না, কিন্তু সিন্নি খেতে হালুয়া খেতে তাদের সংস্কারে বাধে না।

এ যে সংসার এতে এক পটপরিবর্তন ঘটে যায়, যখন বিনুর ঠাকুমা দেহত্যাগ করেন। বাবা মা রামদাস বাবাজির কাছে বৈষ্ণব দীক্ষা গ্রহণ করে বাড়িতে গোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। ঠাকুমা তাঁর বিগ্রহকে নিয়ে বড়ো ছেলের বাড়ি ছেড়ে মেজ ছেলের বাড়ি যান। পরে মেজ ছেলের বাড়ি। শাক্ত মতে পূজাআর্চা বন্ধ হয়ে যায়। কীর্তনীয়ারা বাইরে থেকে এসে খোল করতাল বাজিয়ে গান করেন। বিনুকেও খোল বাজাতে শেখানো হয়, কিন্তু সে অপটু।

প্রতিদিন মা জয়দেব থেকে একা গান করেন, বাবা বিদ্যাপতি থেকে একা আবৃত্তি করেন। সেসব বিনু বুঝতে পারে না, কিন্তু শুনতে শুনতে তার ছন্দের ও মিলের কান তৈরি হয়ে যায়। বাবা ও মা গোপাল ছাড়া আর কোনো দেবদেবীর ভক্ত নন। সেটাও একপ্রকার একেশ্বরবাদ।

বিনু কদাচ কখনো বলরাম মন্দিরে যায়, জগন্নাথকে সে ভক্তি করে। তিনিও তো কৃষ্ণ। যাঁর কথা বাবার মুখে। বিনু তাঁকে প্রণাম করলে তিনি বলেন, "কৃষ্ণে মতি হোক।" কিছুদিনের জন্যে বিনু পুরীতে সেজ কাকার বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করতে যায়। প্রায়ই ঠাকুমাকে জগন্নাথ দর্শনে নিয়ে যেতে হত। গর্ভগৃহে প্রবেশ করে সে জগন্নাথের গাত্র স্পর্শ করে। কত বড়ো পুণ্য। গুরুচরণবাবু বলে এক প্রতিবেশীও যেতেন। তিনি করতেন কী, না নিজের দুই হাতে নিজের দুই গালে চড় কষাতেন আর দুই কান মলতেন। বলতেন,"প্রতিদিন কত পাপ করছি। এইভাবে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে।"

তবে গুরুচরণের চরণ দুটি ছিল গোদের দরুন গুরুভার। বোধহয় তার ধারণা ছিল গোদের মূল কারণ হচ্ছে পাপ। পাপ থেকে যেমন কুষ্ঠ হয় তেমনি যতরকম রোগ হয়। মন্দিরে যারা যায় তারা একটা না একটা প্রার্থনা নিয়ে যায়। পাপমুক্তির বা রোগমুক্তির বা ধনসম্পদের বা সাংসারিক সাফল্যের বা পরকালে সদ্‌গতির বা সন্তান লাভের। বিনুর তেমন কোন প্রার্থনা ছিল না। সে যায় শুধু দর্শন করতে। কেবল দেবতাকে নয়, সমবেত মানুষজনকে। কত দূর থেকে, কত দেশ থেকে কত স্ত্রী-পুরুষ এসে হাজির হয়েছে। এদের সঙ্গে ঠেলাঠেলি করে গায়ে গা ঠেকিয়ে যে সুখ পাওয়া যায় সেও তো একপ্রকার সুখ। বিশেষ করে মেয়েদের সঙ্গে। ছেলেবেলা থেকেই মেয়েদের প্রতি ওর একটা টান ছিল। মেয়েদেরও বোধহয় ওর প্রতি।

বিনুর ছোটকাকার খ্রিস্টধর্মে অনুরাগ ছিল। তিনি তাকে একদিন খ্রিস্টানদের এক গির্জায় নিয়ে যান। সেও বসে যায় সকলের সঙ্গে উপাসনায়। সবাই যখন চোখ বোজে সেও চোখ বোজে। সবাই যখন চোখ মেলে সেও তখন চোখ মেলে। সেও পবিত্র রুটি ও বারি মুখে ছোঁওয়ায়। না, মদ নয়। গির্জাটা ব্যাপটিস্ট সম্প্রদায়ের।

বিনুর সতেরো বছর বয়সে তার মাতৃবিয়োগ হয়। শোকে সান্ত্বনার জন্যে সে যেসব বই পড়ে তাদের মধ্যে ছিল রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ। কতকটা তাঁর প্রভাবে, কতকটা ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে সে ক্রমে ক্রমে দেবদেবীতে ও সাকার আরাধনায় বিশ্বাস হারায়। রক্তমাংসের কোন মানুষই ঈশ্বর হতে পারেন না, ঈশ্বরের অবতার হতে পারেন না, ঈশ্বরের পুত্র হতে পারেন না, কৃষ্ণও না যীশুও না। একবার এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর পর বিনু আর ঠাকুর দর্শন করতে মন্দিরে যায় না, যায় শিল্প দর্শনের জন্যে। সেদিক থেকে মন্দিরগুলো মহামূল্য।

ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার সময় তাকে একটি ফর্ম পূরণ করতে দিলে সে তার ধর্মমত এই বলে ব্যক্ত করে যে তার ধর্ম একেশ্বরবাদী অন্য ধর্ম হতে সারসংগ্রহকারী হিন্দুধর্ম। ইংরেজিতে "Monotheistic eclectic Hinduism."

একেশ্বরবাদী হলেই যে তাকে অদ্বৈতবাদী হতে হবে এমন কোন কথা নেই। মুসলমানরা একেশ্বরবাদী, কিন্তু অদ্বৈতবাদী নয়। অদ্বৈতবাদীদের মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক ও অভিন্ন। সেটা সত্য, কিন্তু মানুষ তো আপনি আপনাকে প্রার্থনা জানাতে পারে না, উপাসনা করতে পারে না। এসবের প্রয়োজন কি নেই? ছেলে বাপের কাছে প্রার্থনা করে,

মাকে ভক্তি করে।

তেমনি ঈশ্বরকে পিতা রূপে, মাতা রূপে, প্রভু রূপে, প্রেমিক রূপে, সখা রূপে, পুত্র রূপে, এমন কি কান্তা রূপে কল্পনা করেছে মানুষ। যার যাতে ভক্তি বা প্রীতি বা স্নেহ। অদ্বৈতবাদী বা জ্ঞানমার্গী দ্বৈতবাদীরাও কার্যত ভক্তিমার্গী। বিনু যখন উপনিষদ্ পড়ে তখন সে জ্ঞানমার্গের রস পায়। যখন বৈষ্ণব পদাবলী পড়ে তখন ভক্তিমার্গের রস।

তেইশ চব্বিশ বছর বয়সের বিনু একই সঙ্গে হয়ে ওঠে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মতো লীলাবাদী আর ব্রাহ্মদের মতো একমেবাদ্বিতীয়ম্ বিশ্বাসী। যিনি একা তিনি লীলা করতে পারেন না। নিত্য লীলার জন্যে চান লীলাসঙ্গিনী। পরমাত্মার তেমনি জীবাত্মা, পুরুষের যেমন প্রকৃতি, কৃষ্ণের যেমন রাধা।

ভারতে শত শত মন্দির আছে যেখানে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি পূজিত। তাঁরা দুই অথচ অবিচ্ছিন্ন, দ্বৈত অথচ অদ্বৈত। উভয়ই সমান। তাঁদের একজন হচ্ছেন ভগবান, অপরজন মানুষ। ভগবান আর মানুষ উভয়েই সমান। অন্য অর্থে পুরুষ আর প্রকৃতি উভয়েই সমান। আধুনিকরা বলবেন পুরুষ ও নারী উভয়েই সমান।

ভগবান ও মানুষ কি সমান শক্তিশালী বা সমান ঐশ্বর্যশালী হতে পারে? না কখনও নয়। লক্ষ বর্ষ পরেও না। কিন্তু মানুষের প্রেম তাকে প্রেমের নিরিখে সমান করতে পারে।

খ্রিস্টানরা বলেন ভগবান প্রেমস্বরূপ। যীশু তাঁর শিষ্যদের উপদেশ দিয়েছেন, ভগবানকে সমস্ত মন দিয়ে, সমস্ত হৃদয় দিয়ে, সমস্ত আত্মা দিয়ে ভালোবাসবে। আর প্রতিবেশীদের আপনার মতো ভালোবাসবে। খ্রিস্টিয় সন্তদের জীবন এই আদর্শে পরিচালিত হয়েছে। সুফী সাধকদের জীবনেও এর অনুরূপ লক্ষিত হয়। নানক, কবীর চৈতন্যের জীবনেও। বৌদ্ধরা ভগবান সম্বন্ধে নীরব। তাঁদের মৈত্রীর ও করুণার আদর্শ কেবলমাত্র মানুষে সীমাবদ্ধ নয়, সর্বজীবে প্রসারিত। জৈনদের আদর্শও অনুরূপ।

প্রেম, মৈত্রী, অহিংসা দুর্বলতার সূচক নয়। শিবি রাজা তো একটি কপোতকে আশ্রয় দিতে গিয়ে নিজের শরীরের মাংস কেটে দেন বাজপাখিকে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে পরের জন্যে জীবনদানের দৃষ্টান্ত আছে। জীবনটা দিয়ে ফেলা অত সহজ নয়, কিন্তু কিছু না কিছু নিঃস্বার্থভাবে দান করা অসম্ভব নয়। বিনুর সাহিত্যসৃষ্টিও নিঃস্বার্থ দান। তবু তাই যথেষ্ট নয়। পরের জন্যে নিঃস্বার্থভাবে কিছু করতে পারলে সে আপনাকে কৃতার্থ মনে করে। পর যাকে বলা হয় সেও তলিয়ে দেখলে আত্মীয়। আত্মার আত্মীয়। দেহের থেকে দেহ আলাদা, এটা স্পষ্ট। কিন্তু মনের সঙ্গে মনের ও হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের অস্পষ্ট যোগ আছে। তাই পরের কল্যাণ করলে নিজেরও কল্যাণ হয়।

বিনু ইংলন্ডে গিয়ে দেখে সেখানকার নারী ও পুরুষ কত রকম কল্যাণকর্মে সময়, শক্তি ও অর্থ ব্যয় করছেন। এঁদের মানবপ্রেম ও প্রাণীপ্রেমকে বলা হয় খ্রিস্টীয় প্রেম। এ প্রেম নরনারীপ্রেম নয়। এঁদের অনেকেই চিরকুমার বা চিরকুমারী। নরনারীপ্রেমের সাধনা এঁদের জীবনে দৃশ্যমান নয়। কিন্তু প্রেম বা করুণা বা মৈত্রী যে এঁদের নিঃস্বার্থভাবে খাটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এটা তো সত্য। কয়েকজন মহিলা অন্ধদের জন্যে একটি শিল্পশালা চালাচ্ছেন। কয়েকজন একপ্রকার খাদি তৈরি করেন ও পরেন। লন্ডনের ইস্ট এন্ডে কিংসলি হলের মতো কয়েকটি হল ছিল। কলেজ থেকে বেরিয়ে কল্যাণব্রতী যুবক যুবতীরা সেসব হলে বছর কয়েক লোকের সঙ্গে মিলেমিশে নানা হিতকর কাজ করতেন। প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি তাঁদের

একজন। রাসকিন লিখে গেছেন 'আনটু দি লাস্ট'। গান্ধীজী তার অনুবাদ করেছেন 'সর্বোদয়'। কথাটা যীশুখ্রিস্টের। কিন্তু রাসকিন প্রবর্তিত কল্যাণকর্মের প্রেরণা ধর্মীয় প্রেরণা নয়। কর্মীরা খ্রিস্টীয় তত্ত্বে বিশ্বাস না-ও করতে পারেন। ধর্মবিশ্বাস যাই হোক না কেন দীনহীনদের দুঃখদৈন্যের শরিক হয়ে দুঃখ মোচন করতে হবে।

মুরিয়েল লেস্টারের ভাই কিংসলি প্রথম মহাযুদ্ধে নিহত হন। তাঁর মতো হাজার হাজার যুবক যুদ্ধে গিয়ে ফিরে আসেন না। তাঁদের জন্যে যাঁরা অপেক্ষা করছিলেন সেইসব কুমারীদের বিয়ে হয় না। হবেও না। তেমনি আরো কয়েকজনের সঙ্গেও বিনুর আলাপ হয়। এঁরা যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। লীগ অভ নেশনসের উপর তাঁদের ভরসা। অথচ লীগের মেম্বরদের মধ্যে আমেরিকাও নেই, জার্মানিও নেই। কেই বা আর একটা মহাযুদ্ধের জন্যে অধীর? বিনুর বিশ্বাস হয় না যে জার্মানরা আরো এক হাত লড়বে। জার্মানি ঘুরে দ্বিতীয় বার যুদ্ধের লেশমাত্র আভাস পায় না। তার নজরে পড়ে তরুণ-তরুণীরা উড়ো পাখির মতো দলে দলে ঘরছাড়া হয়ে খোলা হাওয়ায় খোলা আকাশের তলে জমায়েত হচ্ছে। রাজনীতির নামগন্ধ নেই। অর্থোপার্জনেরও না। এইসব তরুণ যে একদিন নাৎসী বনবে ও যুদ্ধে নামবে তা ভাবা যায় না। এরা সত্যি খারাপ ছিল না। দেখা গেল ভালো মানুষও খারাপ হতে পারে। খারাপ কাজ করতে পারে।

ফাউস্টকে খারাপ করেছিল মেফিস্টোফেলিস। অর্থাৎ শয়তান। জার্মানদের খারাপ করল হিটলার। এটা একটা সরলীকরণ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে দু'কোটি জার্মান মরে ও যাদের মারে তারাও দু'কোটি রাশিয়ান। ব্যক্তিগত শত্রুতা কারো সঙ্গে কারো ছিল না। উপরন্তু মরে ষাট লক্ষ ইহুদী। কাউকেই এরা মারেনি। এক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিল না। যুগ যুগ ধরে জমছিল ইহুদীদের প্রতি বিরাগ। তেমনি রুশদের প্রতি।

যীশুর শিক্ষা কি তবে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত জীবনের জন্যে? সমষ্টিগত জীবনের জন্যে নয়? তাই যদি হয় তবে গান্ধীজীর শিক্ষাও ব্যক্তিগত জীবনের জন্যে। ভারতের জনসমূহ অহিংসা মেনে চলবে না। যীশুর শিক্ষার দু'হাজার বছর পরে যদি এই হয় খ্রিস্টান ইউরোপের হাল তবে গান্ধীর দু'হাজার বছর পরে সত্যাগ্রহী ভারতের হাল কি মহত্তর হবে বলে ভবিষ্যদ্‌বাণী করা যায়?

তবে মানবজাতির ইতিহাসে দু'হাজার বছর এমন কিছু বেশি সময় নয়। মানুষ তো একদা নরখাদক ছিল। এখন কি তার কোন চিহ্ন আছে? রাক্ষস যাদের বলা হত আজ তারা কোথায়? মানুষের জ্ঞান ছিল না, বুদ্ধি ছিল না, বিবেক ছিল না, চেতনা ছিল না, প্রেম ছিল না, কলাবিদ্যা ছিল না, কৃষিবিদ্যা ছিল না। এসব তো হয়েছে। আরো কত কী হতে পারে।

মানুষ জাতিটা যদি ডাইনোসরের মতো বিলুপ্ত না হয়ে যায় তবে হিংসার অবসান একদিন না একদিন হবে। মানুষ মানুষকে মেরে গর্ব বোধ করবে না। সেটা বীরত্ব বলে বন্দিত করবে না। মানুষের প্রাণরক্ষার জন্যে মানুষের প্রাণত্যাগই কীর্তিত হবে। তাছাড়া অহিংসার মতো সত্যেরও মর্যাদা সমধিক। সত্যনিষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে মহাভারতকার সশরীরে স্বর্গে নিয়ে যান। মহাবীর ভীম ও অর্জুনকে নয়। সেই যুধিষ্ঠিরেরও একদিনের জন্যে নরকবাস হয়েছিল। কারণ তিনি একটি অর্ধসত্য উচ্চারণ করে দ্রোণের প্রাণহানি ঘটিয়েছিলেন।

বিনু স্বর্গে ও নরকে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। ভগবান সম্বন্ধে সে নিঃসংশয়, কিন্তু

স্বর্গ নরক সম্বন্ধে অতটা নিশ্চিত নয়। আত্মা থাকলে পরমাত্মাও থাকে। বিন্দু থাকলে সিন্ধুও থাকে। অংশ থাকলে সমগ্রও থাকে। নামকরণটা ভগবান না হয়ে আর কিছু হতে পারে। নিজের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে বলেই বিনু ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। তবে তাঁর সংজ্ঞা নির্ণয় করতে পারে না। তিনি কি একজন ব্যক্তি না একটি শক্তি না একটা বিধান, যাঁর দ্বারা বিশ্বজগৎ পরিচালিত? উপনিষদে ব্রহ্মকে তৎ বলা হয়েছে। তৎ ক্লীবলিঙ্গ। মানুষ তাঁরই মতো একজনকে ভক্তি করতে চায়, ভালোবাসতে চায়, তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাতে চায়। কিন্তু সত্যিই কি তিনি একজন ব্যক্তি? একালের বৈজ্ঞানিকরা তা মানবেন না। তাঁরা বলবেন একটি শক্তি বা একটা বিধান। বিনু মনঃস্থির করতে অক্ষম।

সে প্রতিদিন প্রার্থনা করে, অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়। যিনি তাকে নিয়ে যাবেন তিনি কি একজন ব্যক্তি নন যিনি সর্বশক্তিমান, সর্ববিধাতা? বিনুর বিশ্বাস তিনি তার অন্তরেও বিদ্যমান, বাইরেও বিরাজমান। বিনুও তাঁর অন্তরে বর্তমান, কিন্তু সে তাঁর বাইরে নয়। তাঁর সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক আছে, সেটা আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সম্পর্ক। অনাদি ও অনন্ত।

মৃত্যুর পরে অমৃত আছে। এই পর্যন্ত সে নিশ্চিত। পরলোক, পরকাল ও পরজন্ম সম্বন্ধে সে নিশ্চয় করে কিছু বলতে পারে না। এসব থাকতেও পারে। না থাকতেও পারে। আপাতত ইহকাল ও ইহলোকই সারসত্য।

বিনুর এক অগ্রজপ্রতিম বন্ধু ছিলেন নিরীশ্বরবাদী গান্ধীপন্থী রবীন্দ্রভক্ত নেতা। তাঁর সহধর্মিণীও তাঁর সঙ্গে একমত। কথাপ্রসঙ্গে বন্ধুজায়া বিনুকে বলেন, "ঈশ্বর নেই। তা বলে কি ধর্ম নেই? ধর্ম তো আছে।"

ধর্ম মানে এক্ষেত্রে হিন্দুধর্ম বা মুসলিমধর্ম নয়। বিশ্বজগৎকে যা ধারণ করে আছে সেই শাশ্বত বিধান। তার এক প্রিয় বন্ধু তাকে একদিন বলেছিল, "হ্যাঁরে, এই অত্যাচার কি চিরকাল চলবে? ধর্ম সইবে?" সে ঈশ্বরের নাম করে না, যদিও সে ঈশ্বর মানে।

ভারতের সাধারণ মানুষ কথায় কথায় ঈশ্বরের নাম ধরে না। ধর্মের উপর ছেড়ে দেয় অন্যায়ের প্রতিকার। কোন্‌টা ধর্ম আর কোন্‌টা অধর্ম এ বিষয়ে তাদের একটা সহজাত প্রত্যয় আছে। এর মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি নেই। এক ইসলাম প্রচারক মৌলানা সাহেব বিনুর সঙ্গে দেখা করতে এসে বলেন, "এটা ধর্মের দেশ।" তার মানে হিন্দু কিংবা ইসলাম নামক ধর্মের দেশ নয়, ধর্মবিশ্বাস নির্বিশেষে ধর্মপ্রাণতার দেশ। তিনি যেমন হিন্দুদের ধর্মপ্রাণতাকে শ্রদ্ধা করেন তেমনি হিন্দুদের অনেকে মুসলমানদের ধর্মপ্রাণতাকে শ্রদ্ধা করেন। বিনুদের বাড়ির বেড়ার ওপারে এক মুসলমান পরিবার বাস করতেন। বৃদ্ধ গৃহকর্তাকে বিনু বিশেষ শ্রদ্ধা করত। বিনুর বাবা তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি বসে তত্ত্বালোচনা করতেন। কেউ কাউকে ভজাবার চেষ্টা করতেন না। পরস্পরকে বোঝবার চেষ্টা করতেন।

ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে ধর্মবিশ্বাসের অমিল আছে এটা সত্য। কিন্তু পূর্ণ সত্য নয়। মিল আছে অনেক বেশি। বিনু মসজিদে গিয়েও আনন্দ পায়। বাল্যকালে মহরমের উৎসবে যোগ দিয়ে সমান আনন্দ পেয়েছে।

একালে যেমন হিন্দু মুসলমানের বিরোধ সেকালে তেমনি বৈদিক ও বৌদ্ধের বিরোধ ছিল। সে বিরোধ এখনো মেটেনি। একবার কালিম্পং শহরে এক বৌদ্ধসভায় বিনুকে করা হয় সভাপতি। হঠাৎ এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর সঙ্গে এক বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর বচসা বেধে যায়।

হিন্দু স্বামীজী বুদ্ধ সম্বন্ধে অনেক কটূক্তি করেন। সভার সমাপ্তির পর স্বামীজী বিনুর কাছে এসে কৈফিয়ত দেন। তাঁর আপত্তির কারণ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী পাহাড়িয়াদের বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করছেন। ফলে বৌদ্ধদের সংখ্যাই বেড়ে যাচ্ছে। নয়তো ওরা হিন্দুদের সংখ্যা বৃদ্ধি করত। বিনুর মনে হল ধর্মীয় বিরোধের একটা বড় কারণ ধর্মের সঙ্গে ধর্মের অমিল নয়, দীক্ষিতদের সংখ্যা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। হিন্দুরাও দীক্ষা দান করে। আসামের অহমরা গোড়ায় ছিল বৌদ্ধ। পরে হয় শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত। শাক্ত আর বৈষ্ণবের বিবাদ এখনো মেটেনি। বৈষ্ণবরা কামাখ্যা মন্দিরে যান না। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের প্রবেশদ্বারে লেখা আছে খ্রিস্টান মুসলমান ও বৌদ্ধদের প্রবেশ নিষেধ। যদিও বুদ্ধকে বলা হয় বিষ্ণুর নবম অবতার।

সর্বধর্মসমন্বয়ের কোন লক্ষণ নেই। আপাতত সর্বধর্মের সশ্রদ্ধ সহাবস্থানই যথেষ্ট প্রগতি। প্রত্যেক ধর্মকে অপরাপর ধর্মের ভিতর থেকে সার আহরণ পূর্বক শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। গান্ধীজীর প্রার্থনাসভা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সেখানে গীতা, কোরান, বাইবেল ও বৌদ্ধশাস্ত্র থেকে পাঠ করা হত।

বাউলরা কিন্তু ধর্মগ্রন্থ বা ধর্মস্থানের ধার ধারে না। তারা প্রার্থনাও করে না, উপাসনাও করে না, পুজোও করে না। চণ্ডীদাস বলে গেছেন সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই। বাউলরা বলে এই মানুষে আছে সেই মানুষ। সেই মানুষ এই মানুষের মতো জরা ব্যাধি ও মরণের অধীন নয়। তবে তাঁকে মানুষ বলা কেন? কারণ মানুষই সকলের উপর। বৌদ্ধদের বিশ্বাস বুদ্ধ মানুষ হয়েও সব দেবতার উপরে। মানুষের এই শ্রেষ্ঠত্ব বৈদিক হিন্দু ঐতিহ্য নয়। অথচ ভারতীয়।

আধুনিককালে বৈজ্ঞানিকরা অতিপ্রাকৃতকে বিশ্বাস করেন না। ভগবান তাঁদের মতে অতিপ্রাকৃত। অতএব বিশ্বাসের অযোগ্য। মানুষের উপরেই তাঁদের বিশ্বাস। এই মানুষ বিবর্তনসূত্রে আরো উন্নত হবে। জরা ব্যাধি জয় করবে। কিন্তু মরণকে নয়। সেইখানেই মানবিকবাদের সীমাবদ্ধতা।

একবার কয়েকজন সোভিয়েট বুদ্ধিজীবী কলকাতা এসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে বিনুর দেখা হয়। তাঁদের একজন বলেন তাঁরা আধ্যাত্মিকতার অভাব অনুভব করছেন। তিনি যে শব্দটি ব্যবহার করেন সেটি রিলিজন নয় স্পিরিচুয়ালিটি। তার বিপরীত শব্দ মেটিরিয়ালিজম। জৈনরা নিরীশ্বরবাদী, তাহলেও তারা আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী। তারা মেটিরিয়ালিস্ট নয়। অথচ কমিউনিস্টরা নিরীশ্বরবাদী আর সেই সঙ্গে মেটিরিয়ালিস্ট। তারা একদিন না একদিন আধ্যাত্মিকতার অভাব বোধ করবেই। তার মানে কিন্তু রিলিজনের বা ধর্মবিশ্বাসের অভাব নয়।

যাঁরা নিঃস্বার্থভাবে সত্যের অন্বেষণে জীবন উৎসর্গ করেন তাঁরাও আধ্যাত্মিকতা সম্পন্ন। মহাত্মা গান্ধীর শিষ্য গোরা ভগবানে বিশ্বাস করতেন না। সত্যে বিশ্বাস করতেন। গান্ধীজী তাঁকে বলেন, "সত্যই ভগবান"। তেমনি প্রেমই ভগবান। সৌন্দর্যই ভগবান। যাঁরা প্রেমের সাধনা বা সৌন্দর্যের সাধনা করেন তাঁরাও ভগবানেরই আরাধনা করেন। ভগবানে বিশ্বাস অনাবশ্যক।

বিনু যদি ইদানিং বিদেশে যেত তবে সেও কি দুঃখ করে বলত না যে তার নিজের দেশেও সত্যের অভাব, প্রেমের অভাব ও সৌন্দর্যের অভাব লক্ষিত হচ্ছে? একই কারণ মেটিরিয়ালিজমের প্রভাব। আজকাল সব দেশেই সবাই কম বেশি মেটিরিয়ালিস্ট। ধর্মবিশ্বাস

এই জলতরঙ্গ রোধ করতে পারছে না। তার পালটা প্রভাব আনুষ্ঠানিকতায় নিবদ্ধ হয়ে বীর্যহীন। ধর্মের সারবস্তু ছেড়ে তার খোলসটাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মৌলবাদ। যেমন মুসলিম আরবে, ইরানে, পাকিস্তানে তেমনি হিন্দু ভারতে। অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধ জনতা গভীর কর্দমে পতিত হচ্ছে। তবে চিরকালের জন্য নয়।

মানুষের স্বয়ংসংশোধিকা শক্তিতে বিনুর বিশ্বাস অটল। একটা প্রজন্মের ভুল আর একটা প্রজন্ম সংশোধন করবে। একটা শতকের ভুল আর একটা শতক। তবে কতক মানুষকে সদা সজাগ থাকতে হবে। তারা অতন্দ্র প্রহরী।

—

জীবন যৌবন

ভূমিকা

প্রথমেই বলে রাখি এই গ্রন্থ আমার আত্মচরিত নয়, জীবনস্মৃতি। অটোবায়োগ্রাফি নয়, মেমোয়ার্স।

গান্ধীজি বলতেন, 'আমার জীবনই আমার বাণী।' আমি বলি, আমার বাণীই আমার জীবন। আমার বাণীর মধ্যেই আমার জীবন নিহিত।

সাতচল্লিশ বছর বয়সে এই জীবনস্মৃতির দাঁড়ি টেনেছি। গান্ধীজিও দাঁড়ি টেনেছিলেন সেই রকম বয়সে। রবীন্দ্রনাথ আরও পূর্বে।

এইটুকুও যে লিখতে পারলুম এটা আমার পরিকল্পনায় নয়, রমাপদ চৌধুরীর বিশেষ অনুরোধে ও সুরজিৎ দাশগুপ্তের লেখনী সহযোগে। এঁদের দুজনের কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য।

অন্নদাশঙ্কর রায়

সূচিপত্র

প্রথম জীবন / প্রথম যৌবন / যৌবন মধ্যাহ্ন / যৌবন সায়াহ্ন

আমরা ছিলুম একটি অতি পুরাতন শাক্ত পরিবার। আকবর বাদশাহের আমলে আমাদের পূর্বপুরুষ রামচন্দ্র ঘোষ সুবে ওড়িশা জরিপ করতে যান টোডরমলের সঙ্গে। জাহাঙ্গির বাদশাহের কাছ থেকে লাখেরাজ তালুক ও খান পদবি পেয়ে ওড়িশাতেই বসবাস শুরু করেন। তার আগে আমাদের বাস ছিল ভাগীরথী তীরে কোতরং গ্রামে। রামচন্দ্রের বংশকে বলা হয় মহাশয় বংশ। কালক্রমে সেটি ছ-টি শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। তার একটির নাম রামেশ্বরপুর।

প্রত্যেক শাখার জ্যেষ্ঠপুত্রকে মহাশয় বলে অভিহিত করা হত। খান পদবির সঙ্গে কবে রায় পদবি যুক্ত হল তার ইতিবৃত্ত আমার অজানা। তবে সেটা মোগল আমলেই হয়। লাখেরাজদার হিসেবে আমরা কখনও কাউকে খাজনা দিইনি। ইংরেজকেও না। দুঃখের বিষয়, শরিকদের মধ্যে তালুক এমনভাবে বিভক্ত হয়ে যায় যে ক্রমবর্ধমান উত্তর পুরুষদের ভাগে পরিবার পিছু একখানা বা দুখানা গ্রামের বেশি কিছু পড়ে না। তাই নিয়ে শরিক বিবাদ চরমে ওঠে। আমার পিতামহ শ্রীনাথ রায় স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে দেশান্তরি হন।

তারপরে আমার পিতা নিমাইচরণ রায় ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েন ঢেঙ্কানাল দেশীয় রাজ্যে। সেখানে তিনি রাজ্য সরকারে চাকরি পান ও বাড়ি তৈরি করে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তাঁর বিয়ে হয় কটকের সুবিখ্যাত পালিত পরিবারে। পালিতরা ঘাটাল অঞ্চল থেকে কটকে আসেন ওকালতি ও চাকরি উপলক্ষে। দীনবন্ধু পালিত উকিল হিসেবে খুব নামকরা। যে পাড়ায় থাকতেন সে পাড়ার নাম হয়ে যায় পালিতপাড়া। কলকাতার সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাঁদের বাড়ির আবহাওয়াটা ছিল সমসাময়িক কলকাতার। ভাষা ও গয়না, পোশাক ও কেশবিন্যাস তাঁদেরকে এমন ভাবে আলাদা করেছিল যে ঠাকুমা দুর্গামণিতে আর মা হেমনলিনীতে দুটি যুগের ব্যবধান ছিল। ঠাকুমা আমার মাতৃকুলকে বলতেন বাংলাবালা অর্থাৎ আধুনিক বাঙালি।

আমার ঠাকুরদাদা শ্রীনাথ রায় সন্ধ্যাবেলা আমাকে মুখে মুখে সংস্কৃত চাণক্য শ্লোক শেখাতেন। 'স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে' ইত্যাদি একটু একটু মনে পড়ে। ঠাকুরদাদা অনেক রকম টোটকা জানতেন। অসুখ-বিসুখে টোটকা দিয়ে সারাতেন।

আমার প্রথম শিক্ষা ওড়িয়া পাঠশালায়। গুরুমশাই শেখাতেন, 'কমললোচন শ্রীহরি, করেণ শঙ্খচক্রধারী' ও 'কোইলি লো কেশব যে মথুরাকে গলে, বাহুড়ি ন আইলে লো কোইলি।' কোইলি মানে কোকিল।

ঠাকুমা একবার দুর্গাপুজোর সময় আমাকে বালেশ্বর জেলার রামেশ্বরপুরে নিয়ে গেছলেন। রামেশ্বরপুরের বাড়িতে বাংলাদেশের মতোই সিংহবাহিনী মহিষাসুরমর্দিনী দশভুজা দুর্গার শারদীয় পুজো হত। সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক গণেশ। বলিদানও হত। বলিদানের সময় আমাকে ঘরে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। ছাগকণ্ঠের আর্তস্বর শুনতে পেয়েছিলুম। বেরিয়ে এসে দেখি ছাগলের রক্তে ভেসে যাচ্ছে। ছাগমুণ্ড পড়ে আছে এক প্রান্তে। তখন থেকে বলিদানে আমার বিরাগ। বাবার বন্দুক নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে একদিন এক

চাকর হঠাৎ একটা দাঁড়কাককে গুলি করে মারে। বেচারা দাঁড়কাক চালে এসে বসেছিল। আমি তা দেখে মর্মাহত।

কিন্তু আমাদের ঢেঙ্কানালের বাড়িতে শুধু একটি জলচৌকির উপরে মা দুর্গার পট বা প্রতিমার পরিবর্তে একটি তরবারি স্থাপন করা হত। বলিদানের বালাই ছিল না। সঙ্গে থাকত সংস্কৃত বাংলা ধর্মগ্রন্থ। আর—অবাক কাণ্ড—ইংরেজি শেকসপিয়ার গ্রন্থাবলি।

সরস্বতী পুজো হত একই রকম ভাবে। শুধু তরবারির স্থান নিত দোয়াত-কলম।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, শেকসপিয়র এখানে কেমন করে এলেন? তাঁর নাটকগুলি তো ধর্মীয় নাটক নয়। এর উত্তর বোধহয় নিহিত ছিল ছোট কাকার শেকসপিয়র প্রীতিতে। আমাদের বাড়ির সামনের উঠোনে শেকসপিয়র অভিনীত হত। অভিনেতারা ছোটকাকা ও তাঁর বন্ধুবান্ধবরা। সবাই আমাদের হাইস্কুলের প্রাক্তন ছাত্র, ততদিনে কলেজ পড়ুয়া।

একদিন দেখলুম, তাঁরা সব একটি মৃতদেহ বহন করে নিয়ে এলেন। মৃতটির নাম জুলিয়াস সিজর। যাঁর নাম ব্রুটাস অর্থাৎ বাঙ্কনিধি পট্টনায়ক তিনি ওজস্বিনী বক্তৃতা দেন, Romans, countrymen, and lovers! hear me for my cause; and be silent, that you may hear শ্রোতারা আমরা কজন ছেলে ছিলুম। আমরাই রোমান। ইংরেজি বক্তৃতার কোনও মানেই বুঝতে পারলুম না। এর পরে এলেন মার্ক অ্যান্টনি অর্থাৎ ছোটকাকা হরিশচন্দ্র রায়। তিনি মৃদুস্বরে শোকার্তভাবে আমাদের সম্বোধন করলেন, Friends, Romans, Countrymen, lend me your ears. I come to bury Caesar, not to praise him. তারপর সেই মৃতদেহ তুলে নেওয়া হল।

আর একদিন সেখানেই তক্তপোশের উপর একটা চেয়ার রাখা হল। তার উপর বসলেন যিনি তিনি ভেনিস নগরের ডিউক। তাঁর সামনে হাজির হল শাইলক নামে এক সুদখোর। সে চায় ছোরা দিয়ে কেটে নিতে এক পাউন্ড মাংস। যাঁর শরীর থেকে কাটা হবে তাঁর নাম অ্যান্টোনিয়ো। তিনি এক সওদাগর। তিনি আর কেউ নন, আমার ছোটকাকা। শাইলকের ছোরার আস্ফালন দেখে আমরা ভয়ে কাঁপি! সত্যি সত্যি মাংস কেটে নেবে নাকি! এমন সময় কোথা থেকে এলেন পোর্সিয়া। পরনে উকিলের পোশাক। বললেন, 'তুমি মাংস কেটে নিতে পারো, কিন্তু এক ফোঁটা রক্ত ফেলবে না।' শাইলক ছোরা তুলে রাখে। ছোটকাকা বেঁচে যান। আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। শাইলকের পার্ট করেছিলেন বাঙ্কনিধি পট্টনায়ক। তাঁর একটি উক্তি আমার এখনও মনে আছে : I will feed fat the ancient grudge I bear him. পোর্সিয়া যে কে সেজেছিলেন তা একেবারে মনে পড়ছে না।

এই যে শেকসপিয়র-প্রীতি এটাই হল দুর্গা ও সরস্বতী পুজোয় শেকসপিয়রের উপস্থিতির কারণ।

আমার ঠাকুরদার মৃত্যুর পর বাবা ও মা বৈষ্ণব দীক্ষা নেন। বাড়িতে গৌরগোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। দুর্গাপুজো বন্ধ। মাছ মাংস বারণ। তরবারি অদৃশ্য। কিন্তু শেকসপিয়র অদৃশ্য হননি।

শেকসপিয়র-প্রীতির মতো আর একটি প্রীতি ছিল। টেনিসন-প্রীতি। ছোটকাকা একদিন আমাকে বলেন, তোমাকে টেনিসনের কবিতা Charge of the Light Brigade স্কুলের পুরস্কার সভায় আবৃত্তি করতে হবে। আমার বয়স তখন বছর নয়েক। ইংরেজি অতি সামান্যই বুঝি। আমাকে সৈনিক সাজিয়ে দেওয়া হয়। শার্ট আর হাফ প্যান্ট পরে আমি মার্চ

করে এগিয়ে যাই সভাপতির আসনে দিকে। সভাপতি ছিলেন স্বয়ং রাজাসাহেব সুরপ্রকাশ মহীন্দ্র বাহাদুর। আমি একবার বাঁ হাত ছুঁড়ে একবার ডান হাত ছুঁড়ে একবার ডান পা ফেলে একবার বাঁ পা ফেলে চিৎকার করে চলেছি।

Cannon to the right of them,
Cannon to the left of them,
Cannon in front of them
Volley'd and thunder'd

এমন সময় পরের লাইনটা গেলাম ভুলে। ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে রাজাসাহেবের দিকে পেছন ফিরে গুটি গুটি হেঁটে ফিরলুম। তিনি একটু মুচকি হাসলেন। ভেবেছিলুম যে আমাকে পুরস্কার দেওয়া হবে না। কিন্তু পুরস্কার পেলুম রাজাসাহেবের হাত থেকে একখানা ইংরেজি বই। মোটা মোটা হরফ। ছ পেনি দাম। প্রকাশক ব্ল্যাকি অ্যান্ড সন্স।

এরপরে বহুদিন আমি কোনও পুরস্কার পাইনি। উপরের দিকের চারটে ক্লাস ছিল ইংরেজি মাধ্যম। প্রত্যেক বছরই পুরস্কার পাই ইংরেজি বই। পড়ে বুঝতে চেষ্টা করি। বানিয়ানের 'পিলগ্রিমস প্রগ্রেস' ছিল আমার জীবনের নিয়ামক। আমি worldly wiseman হতে চাইনি, এখনও হইনি। অ্যাবটের নেপোলিয়নও পেয়েছিলাম। সে বিরাট গ্রন্থ। কেন যে এত কঠিন বই দেওয়া হত আমি জানি না।

বাংলা শিক্ষার জন্য পাঠশালা ছিল না। স্কুলেও তার ব্যবস্থা ছিল না। বাংলা পড়তে শিখি বাড়িতেই। বটতলার 'শিশু বোধক', তাতে উডকাটের ছবি, বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়', যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'হাসিখুশি' দিয়ে শুরু। সেজকাকা কলকাতা থেকে চাঁদা দিয়ে 'শিশু' পত্রিকার গ্রাহক করে দেন। 'শিশু' পড়তে পড়তে লেখার সাধ জাগে। 'প্রভা' নামে ওড়িয়াতে একটি ছোটদের মাসিকপত্র নিজের হাতে লিখি। আমিই তার একমাত্র পাঠক।

দুই

বাবা-মা বৈষ্ণব দীক্ষা নেওয়ার পরে বাড়িতে সব অন্য রকম হয়ে গেল। এটা আর একপ্রকার গভীর পার্থক্য। প্রায়ই কীর্তন হত। মাঝে মাঝে মহোৎসব। যোগ দিতেন ওড়িয়ারা। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় মা গাইতেন গীতগোবিন্দ থেকে একটি-না-একটি গীত। আর বাবা আবৃত্তি করতেন বিদ্যাপতি থেকে কয়েকটি পদ। এখনও কিছু কিছু মনে আছে। 'মাধব নাহি তব আদি অবসানা তোহে জনমি পুন তোহে সমওতি সাগর লহরীসমানা।' হয়তো একটু-আধটু ভুল হল। তবে আমি আমার ছন্দ-মিলের প্রেরণা পেয়েছি জয়দেবের গীতগোবিন্দ ও বিদ্যাপতির পদাবলী থেকে।

একবার নবদ্বীপ থেকে একদল কীর্তনিয়াকে নিয়ে এসেছিলেন রায় দ্বারকানাথ সরকার বাহাদুর। সরকারি চাকরি থেকে অবসর নিয়ে ঢেঙ্কানাল রাজ্যের ইঞ্জিনিয়র হয়েছিলেন। একটা পুশ পুশ গাড়িতে চড়ে সফর করতেন। তিনি ছিলেন বাংলা কীর্তনের পৃষ্ঠপোষক।

আমার বাবার দীক্ষাগুরু রামদাস বাবাজির কীর্তন আমার মনে আছে। খুবই মধুর কীর্তন। আমাদের বাড়িতেও নিয়মিত বাংলা ভাষায় পদাবলী কীর্তন হত। খোল বাজাতেন গান করতেন স্থানীয় ওড়িয়ারা। গোপালদাস বাবাজি বলে একজন আসেন বৃন্দাবন থেকে।

পরিষ্কার বাংলা বলতেন। আমরা তাঁকে বাঙালি ভেবেছিলুম। পরে জানা গেল, তিনি ওড়িয়া। তিনি গৌরচন্দ্রিকা করে লীলা কীর্তন আরম্ভ করতেন। আমাদের খোল বাজাতে শিখিয়েছিলেন। আমাদের নিয়ে নগর কীর্তনে বেরোতেন। আমিও দুই বাহু তুলে 'হরি বোল হরি বোল' বলে রাস্তার উপর নাচতুম।

চৈতন্য মহাপ্রভু জাতপাত তুলে দিতে পারেননি, কিন্তু ইতরভদ্র সব জাতের ভক্তদের অবাধ মেলামেশার নির্দেশ ও সুযোগ দিয়েছেন। নানা জাতের নর-নারী মিলে বোষ্টুম বলে একটা জাতই সৃষ্টি হয়েছে। সমাজে এদের যথেষ্ট সম্মান।

একদিন বাড়িতে কীর্তনের আসর বসেছে। বাইরে একজন ওড়িয়া এসে হাজির। বলে, 'আমি প্রফুল্ল বাবুর বাসা থেকে ছুটে এসেছি কীর্তন শুনতে।' সে সময় প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয়ের বাসা ছিল আধ মাইল দূরে। পরে তিনি চলে আসেন আমাদের পাড়ায়। রায়বাহাদুরের বাড়ির পাশে। রায়বাহাদুরের জামাই ছিলেন রাখালদাস রায়। তাঁর মেজ ছেলে মনোরঞ্জন আমার সতীর্থ ও বন্ধু। একটু দূরে ছিল পার্বতীচরণ দাসের বাড়ি। তিনি ছিলেন রাজ্যের অ্যাসিস্ট্যান্ট দেওয়ান।

প্রত্যেকদিন পার্বতীচরণের বাড়িতে চার জন বৈষ্ণবের সমাবেশ হত। তাঁদের একজন আমার বাবা নিমাইচরণ রায়, মনোরঞ্জনের বাবা রাখালদাস রায়, আমার ছোটভাই অজয়াশঙ্করের সতীর্থ অশোককুমার ওরফে বাবুয়ার বাবা প্রফুল্লকুমার সরকার এবং প্রিয়রঞ্জন সেনের দাদা কুমুদবন্ধু সেন। ইনি একজন কন্‌ট্র্যাক্টর। কটকে আস্তানা। মধ্যে মধ্যে ঢেঙ্কানালে আসতেন। তা এই পাঁচ জন বৈষ্ণবের আলোচ্য বিষয় ছিল গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম, যার প্রাণপুরুষ ছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ। আমার বাবার প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের নামও গৌরগোপাল।

আমরা আচারনিষ্ঠ হিন্দু। অথচ আমাদের বাড়িতে আসতেন মুসলমান, খ্রিস্টান, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সবাই স্বাগত। স্কুলের একজন মাস্টার ছিলেন বাঙালি মুসলমান। আমরা বলতুম পাঠান মাস্টার। তিনি রোজ চা খেতে আসতেন। একটি ফোটো তোলা হয়েছিল, তাতে তিনি আমার কচিবোনকে কোলে নিয়ে চেয়ারে বসেছিলেন, আমি পাশের চেয়ারে। তাঁর নাম আবদুল ওয়াহিদ খোন্দকার। ছোটকাকা তাঁকে আজীবন মনে রেখেছিলেন।

পার্বতীবাবু পরে ঢেঙ্কানালরাজের চাকরি থেকে অবসর নিয়ে বাবাজি পদ্মচরণ দাস বলে পরিচিত হন। তিনি আমাদের বাড়িতে আসতেন। বাবা ও তিনি দুজন মিলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ওড়িয়ায় অনুবাদ করতেন। এই ভাবে বাংলা ও ওড়িয়া ভাষার মধ্যে একটি সেতুবন্ধন ঘটেছিল।

আমার যতদূর মনে পড়ছে অনুবাদিত গ্রন্থটিতে মূল বাংলা বাক্য ওড়িয়া লিপিতে অনুবাদের পাশে পাশে মুদ্রিত হত। সেই সূত্রে ওড়িয়া ভক্তরা দুই ভাষাই পড়তেন ও জানতেন। তা ছাড়া রাজ পরিবারেও বাংলার খুব চল ছিল। রাজাসাহেব তাঁর প্রাসাদের রংমহলে বাংলা ও ওড়িয়া দুই ভাষায় নাটক দেখতেন। অভিনেতারা তাঁর বাঙালি ও ওড়িয়া কর্মচারী। বাবা ছিলেন সেই অ্যামেচার থিয়েটারের অবৈতনিক ম্যানেজার।

আমরাও রাজবাড়িতে গিয়ে রংমহলে থিয়েটার দেখতুম। শিশিরকুমার ঘোষের 'নিমাইসন্ন্যাস', গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'বিল্বমঙ্গল' ও 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'মেবারপতন' ও 'দুর্গাদাস' ইত্যাদি বাংলা নাটক। তখনকার দিনে ভাল ওড়িয়া নাটক ছিল না। রাজশ্যালক সেরাইকেল্লার যুবরাজ নিজেই একটি ওড়িয়া নাটক লিখেছিলেন। সেটি

মঞ্চস্থ করা হয়। নাটকের ঘটনাস্থল কলকাতা শহর। নাটকগুলির পাত্রপাত্রীরা সকলেই পুরুষ। মেয়েদের পার্ট করত পুরুষরাই। একবার বাবাকে 'দুর্গাদাস' নাটকে সত্যবতী সাজতে হয়েছিল। সম্পূর্ণ বেমানান। 'নিমাইসন্ন্যাস' নাটকে তিনি হয়েছিলেন ছাত্রের পিতা আর মনোরঞ্জনের বাবা রাখালবাবু নিমাই পণ্ডিত। একটা দৃশ্যে লাঠি হাতে নিয়ে বাবা মনোরঞ্জনের বাবাকে বলেন, 'ওহে নিমাইপণ্ডিত, বালক চোর।' এই বলে তিনি নিমাই পণ্ডিতকে মারতে উদ্যত। আমরা আঁতকে উঠলুম। যে বালককে ঘিরে নিমাইপণ্ডিতের বিরুদ্ধে অভিযোগ সে আর কেউ নয়, আমার বন্ধু দুর্গাচরণ পট্টনায়ক। রাখালবাবুর সামনে বসে দুর্গা ভয়ে কম্পমান।

একদিন মনোরঞ্জন বলে, 'এসো, আমরা নিজেরাই অভিনয় করি।' নাটকের নাম 'মুকুট', নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সবে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। আমাকে দেওয়া হয় ধুরন্ধরের পার্ট। সেই আমার প্রথম ও শেষ অভিনয়। দর্শকদের মধ্যে ছিলেন স্বয়ং রায়বাহাদুর। 'মুকুট' নাটকে কোনও গান ছিল না, গানের সঙ্গে কোনও বাজনাও ছিল না।

কিন্তু রাজবাড়ির অভিনয়ে গানও থাকত, বাজনাও থাকত। বাজনার ভার নিয়েছিলেন ব্যান্ডমাস্টার শরৎচন্দ্র মিত্র। হরেক রকম বাজনা দেখতুম। কর্নেট ক্ল্যারিয়োনেট, ড্রাম ইত্যাদি। শরৎবাবু তালিম করে দিয়েছিলেন স্থানীয় যুবকদের। তাঁরা বাজাতেন বিলেতি বাদ্য। শরৎবাবু স্বয়ং বাজাতেন ক্ল্যারিয়োনেট। তিনি কলকাতার লোক। তাঁর দুই ছেলে খগেন ও সুধীর ছিল আমার স্কুলের বন্ধু।

স্বাধীনতার পরে আমি যখন কলকাতায় কাজ করতুম তখন সুধীর আসে আমার অফিসে। বলে, 'খগেন মারা গেছে জাপানিদের সঙ্গে যুদ্ধে বার্মার রণাঙ্গনে।'

বাবা আমাকে একদিন একটা চাবি দিয়ে বলেন, 'এটা আলমারির চাবি। আলমারিটা এখন থেকে তোর। এখানে থাকবে বাড়ির সব বই।' আমি সব বই জড়ো করে একটি লাইব্রেরি গড়ে তুলি। হঠাৎ এক বড়দিনের রাতে ঘরের চালে আগুন লাগে। আমাদের তিনখানা ঘর দেখতে দেখতে পুড়ে যায়। আমরা এক বস্ত্রে বেড়িয়ে আসি। আমার সাধের লাইব্রেরি পুড়ে ছাই। বেশির ভাগ ছিল 'বসুমতী গ্রন্থাবলী'। 'বসুমতী' আমি নিয়মিত পড়তুম। খাবারের চেয়ে খবর ছিল আমার কাছে বেশি লোভনীয়।

আমাদের আমবাগান পাহারা দিত পাণ নামে এক অস্পৃশ্য জাতি। বাবা তাদের অর্থসাহায্য করে একটি যাত্রার দল তৈরি করান। একদিন তারা মহাভারতের একটি পালা দেখায়। কে বলবে অস্পৃশ্য জাতি! খুব সপ্রতিভ অভিনয়। সবাই খুশি।

তিন

আমার মামাবাড়ি কটকে। দাদামশাই চন্দ্রনাথ পালিত বিগত। দিদিমা রাধামণি নিজেই মহালে গিয়ে প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতেন। তিন মামা। তাঁরা কেউ বাঘের ভয়ে ঢেঙ্কানালে আসতেন না। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে গোরুর গাড়িতে করে যাতায়াত। একসঙ্গে অনেকগুলো গাড়ি চালাতে হত। দূর থেকে বাঘমামার ডাক শোনা যেত। মহানদী পার হতে হত খেয়া নৌকায়।

তখনকার দিনে ভদ্রমহিলারা থাকতেন অন্তঃপুরে। নিজের পরিবারের বাইরে তাঁদের দেখতে পাওয়া যেত না। হেডমাস্টারের স্ত্রী, প্রফুল্লবাবুর স্ত্রী, রাখালবাবুর স্ত্রী, নিতাইবাবুর

স্ত্রী—এঁরা সকলেই ছিলেন পর্দানশীন। আমি এঁদের কাউকেই চাক্ষুষ করিনি যদিও অনেকবারই এঁদের বাড়ি গেছি।

সন্ধ্যার পরে মা-ঠাকুমার সঙ্গে বলরাম মন্দিরে গেলে সেখানে দেখতুম শহরের মহিলাদের সমাবেশ। তখন তাঁরা খুব স্বাধীনভাবে কথাবার্তা বলতেন। কারণ পুরুষ বলতে কেউ ছিল না, আমার মতো দুটি-একটি বালক ছাড়া। একই দৃশ্য দেখা যেত রথযাত্রার সময় রথ তিনটের আশেপাশে। সুবেশা মহিলারা দেব দর্শনে আসতেন রাতের অন্ধকারে। সে সময় পুরুষের ভিড় থাকত না। সেই মহিলারা তখন মন্দিরের মতোই পর্দামুক্ত। দর্শনার্থী পুরুষরা দিনের বেলাতেই দেবতাদের দেখে গেছেন।

জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রার রথযাত্রা ছিল সেখানকার সর্বপ্রধান উৎসব। পুরীর অনুকরণে। রথ বানানো হত মন্দির থেকে খানিকটা দূরে একটা ফাঁকা জায়গায়। তাকে বলা হত রথগড়া। আমাদের বাড়ি থেকে রথগড়া আধ মাইলটাক দূরে। মন্দির থেকে তিনটি মূর্তিকে নিয়ে আসা হত লোকের মাথায় বা যানবাহনের সাহায্যে নয়। জগন্নাথের তো পা নেই। তাই তাঁকে বসিয়ে দেওয়া হত একটি বালিশের উপরে। সেই বালিশটি বহন করে নিয়ে কয়েক গজ পরে আর একটি বালিশে জগন্নাথকে চাপিয়ে দেওয়া হয়। আবার সেই বালিশটি বহন করে কয়েক গজ দূরে আর একটি বালিশে তাঁকে চাপিয়ে দেওয়া হত। বলা যেতে পারে জগন্নাথ বালিশের উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে এগোতেন। আর লাফিয়ে রথে উঠতেন। একে বলা হত পহণ্ডি বিজয়। একইভাবে বলরাম আর সুভদ্রাও পহণ্ডি বিজয় করতেন।

দূর-দূরান্তর থেকেও গ্রামের মেয়েরা আসতেন তাঁদের বাড়ির পুরুষদের সঙ্গে। পুরুষরা রথ টানতেন, মেয়েরা পথের দুধারে দাঁড়িয়ে রথ টানা দেখতেন। তখন তাঁদের কারও পর্দা থাকত না। জগন্নাথের রথ সকলের আগে। রথ টানা শুরু হত সারথির হুকুমে। সে লোকটি প্রৌঢ়। তার পরনে থাকত কালো বা নীল রঙের পোশাক আর হাতে থাকত একটা বন্দুক। সে হাঁক দিত, 'ভাই রে রথ চালে ঘুঁ। যা মুণ্ডরে সিন্দুর্অ টিপা তা ঘইতা মু।' এই বলে বন্দুক ফায়ার করত। তখন প্রবল কোলাহল আর হাস্যরোলের মধ্যে রথ টানা আরম্ভ করে দিত হাজার হাজার জোয়ান। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখত আর খিল খিল করে হাসত যাদের মাথায় সিন্দুরের টিপ সেইসব নারী। এখানে বলে রাখি 'ঘইতা' কথাটার অর্থ স্বামী।

জগন্নাথ ও বলরামের রথ দুটো বেশ উঁচু। আর সুভদ্রার রথটি বেশ নিচু। আমার মতো কয়েকটি বাঁদর লাফ দিয়ে সুভদ্রার রথের পেছনের দিকটিতে উঠে বসত। প্রত্যেকটি রথের পাটাতনের চারদিকে কাঠের বেড়া থাকত। দেবদেবীর মূর্তির প্যানেল দিয়ে গড়া কাঠের শক্ত বেড়া। সুতরাং আমাদের পড়ে যাওয়ার ভয় ছিল না। আমরা রথ টানতুম না। আমাদেরকেই ঠাকুরের সঙ্গে টেনে নিয়ে যাওয়া হত। যেন আমরাও এক-একটি ঠাকুর। সেই সুভদ্রার রথের বেলাও সারথি রথ চালাত। সেই রথটানা শুরু করার আগে কী একটা সরস বাক্য বলত আমার মনে পড়ে না। তবে সুভদ্রার রথ টানার জন্য তত বেশি সংখ্যায় লোকের প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং আমাদের দর্শনার্থীর সংখ্যাও ছিল কম।

পড়াশুনোর চেয়ে খেলাধুলোয় আমার মন ছিল বেশি। ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস, ব্যাডমিন্টন খেলায় যোগ দিয়েছি। কোনওটাতে সফল হইনি। একবার একটা গোল দিতে

পেরেছিলুম। হাডুডু খেলেছি। দোলায় চড়ে 'কাত' মেরেছি। দোলা উঠেছে উঁচুতে। আবার নেমেছে। সাঁতার কেটেছি পুকুরে, নদীতে, সমুদ্রে। কাঁকড়ার গর্তে হাত ঢুকিয়ে কাঁকড়া ধরতুম। কাঁকড়ার দাঁড়ায় জখম হয়েছি। ঘুড়ি ওড়ানো ছিল আমার শখ। দোলের দিন রং খেলেছি পিচকিরি দিয়ে। আর দাবা ছিল আমার আর একটা নেশা।

চার

আমার সহপাঠীরা কয়েকজন বাদে সকলেই ছিলেন ওড়িয়া। বাঙালিদের মতো তাঁদের মধ্যেও জাতিভেদ ছিল। কিন্তু হিন্দু রাজার ক্ষমতা ছিল নতুন জাত সৃষ্টি করার, এক জাতকে অপর জাতের চেয়ে উন্নত বা অবনত করার, পদবি পাল্টে দেওয়ার। কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। আমার সহপাঠী বাঞ্ছানিধি পণ্ডা ছিল একটি অনাথ ব্রাহ্মণ বালক ও রাজাসাহেবের আশ্রিত। প্রত্যেকবার সে ক্লাসে প্রমোশন পেত আর সঙ্গে সঙ্গে রাজাসাহেবের অনুগ্রহে তার পদবিরও প্রমোশন হত। তার নাম তখন আর বাঞ্ছানিধি পণ্ডা নয়, বাঞ্ছানিধি পাণিগ্রাহী। পরের বছর বাঞ্ছানিধি ষড়ঙ্গী। তার পরের বছর বাঞ্ছানিধি শতপথী। তার পরের বছর বাঞ্ছানিধি ত্রিপাঠী। তার পরের বছর বাঞ্ছানিধি নন্দ। তার পরের বছর বাঞ্ছানিধি রথ। তার পরের বছর বাঞ্ছানিধি মিশ্র। আমার স্মৃতিশক্তি দুর্বল। তাই হয়তো পদবির ক্রমবিন্যাসে ভুল থাকতে পারে। বড় হয়ে দেখেছি, বাবার সহকর্মী রঘুনাথ শতপথী হয়ে গেলেন রঘুনাথ মিশ্র। রাজার অনুগ্রহে। নিগ্রহের নমুনাও দুটো-একটা দেখেছিলুম, কিন্তু ঠিক মনে পড়ছে না।

আমার আর এক সহপাঠী ছিল গ্রামের কোনও সম্পন্ন পরিবারের ছেলে। ব্রাহ্মণ বা করণ নয়, বোধহয় খণ্ডায়েৎ বা রাজপুতও নয়। সম্ভবত চাষা। তার দুই আঙুলে ছিল দুটি সোনার আংটি। একটি ছিল তার নিজের বিয়ের আংটি আর একটি সে পেয়েছিল তার বিধবা বউদিদির 'দ্বিতীয়' হওয়ার সময়। অর্থাৎ দ্বিতীয় বিবাহের সময়। এটা একটি সুপ্রচলিত প্রথা। আমার শবরবংশীয়া ধাত্রীর বিধবা পুত্রবধূকে 'দ্বিতীয়' হতে দেখেছি। আমাদের বাড়ির নাপিত বধূ গিরিয়ার মা দেওরকে 'দ্বিতীয়' করে শিরিয়ার মা হয়। এর জন্য কেউ তাঁকে কম সমীহ করত না। তার ছিল প্রবল ব্যক্তিত্ব। সে প্রতিদিন আমার মাকে আলতা পরিয়ে দিতে আসত। তার সিঁথিতে জ্বলজ্বল করত সিঁদুর। তার স্বামী বুরুন্দা অর্থাৎ বৃন্দাবন ছিল একটি গোবেচারি পুরুষ কিন্তু বেশ আমুদে।

ওড়িয়াতে বৃন্দাবনের উচ্চারণ ব্রুন্দাবন, কৃষ্ণের উচ্চারণ ক্রুষ্ণ, ঋষির উচ্চারণ রুষি, অমৃতর উচ্চারণ অম্রুত। কেউ যদি বাংলায় ঋ-ফলা ব্যবহার করে খৃস্ট লেখে তবে ওড়িয়ারা উচ্চারণ করবে খ্রুস্ট। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ রি-র জায়গায় ঋ ব্যবহার করেছিলেন। অথচ সেই তিনিই আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে অমৃত শব্দটির উচ্চারণ অম্‌রিত নয়।

দেশীয় রাজ্যে হিন্দু রাজার ক্ষমতা ব্রিটিশ ভারতের বড়লাটের চেয়েও বেশি ছিল। বরঞ্চ ছিল ব্রিটিশ রাজের অনুরূপ। ব্রিটিশ রাজা যেমন একজন প্রজাকে নাইটের পরে ব্যারনেট, তার পরে ব্যারন, তার পরে ভাইকাউন্টি, তার পরে আর্ল, তার পরে মার্কুইস, শেষে ডিউক করতে পারতেন, ইচ্ছে করলে নামিয়েও দিতে পারতেন, দেশীয় রাজ্যের রাজারাও তেমনই ইচ্ছে করলে ওঠাতে আবার নামিয়ে দিতেও পারতেন।

আমাদের হাইস্কুলে কেবল যে ঢেঙ্কানাল রাজ্যের ছাত্ররা পড়াশুনা করত তা নয়,

নিকটবর্তী বড়াম্বা, নরসিংপুর, হিন্দোল প্রভৃতি রাজ্যের ছাত্ররাও পড়তে আসত। আমার কবিবন্ধু বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়েক ছিলেন বড়াম্বার প্রজা। তাঁর মুখে শুনেছি, তাঁর বাবা ছিলেন করণ আর মা ছিলেন ক্ষত্রিয়। তখনকার দিনে চাষারা উন্নতি করলে করণ হয়ে যেত আর করণরা উন্নতি করলে ক্ষত্রিয়। তেমনই ক্ষত্রিয় অবনত হলে করণ হত আর করণরা অবনত হলে চাষা। প্রবাদ ছিল, চাষা বাড়তে বাড়তে করণ, করণ বাড়তে বাড়তে ক্ষত্রিয় আর ক্ষত্রিয় ছিঁড়তে ছিঁড়তে অর্থাৎ নামতে নামতে করণ আর করণ ছিঁড়তে ছিঁড়তে অর্থাৎ নামতে নামতে চাষা। এটা কিন্তু রাজার অনুগ্রহে বা নিগ্রহে নয়, সমাজের প্রচলিত অর্থনৈতিক তারতম্য অনুসারে।

ওড়িশায় বহু জাতির বহু লোক। কিন্তু কখনও কারও মুখে শুনিনি, ওরা ছোট জাত বা ওরা ছোটলোক। ছোটর প্রতিশব্দ ওড়িয়াতে সান্‌অ। আমি সান্‌অ ভাই শুনেছি, মানঅ্‌ পুয়ো শুনেছি, মান্‌অ ঝিয়ো শুনেছি, কিন্তু সান্‌অ জাতি বা সান্‌অ লোক শুনিনি। তবে ছুঁয়া জাতি, অছুঁয়া জাতি শুনেছি। মা হাড়ি, বাবা বাঙালি বাবু, বিয়ে না করে ত্যাগ করেছেন। বড় মায়া হত ছেলেটিকে দেখে, সাত-আট বছর বয়সেও উলঙ্গ, কাপড় কেনার সামর্থ্য নেই। সে কি আমার স্বজাতি নয়? তার মা তো মিসেস বোস হতে পারত। কেন পায়খানা খাটে?

পুরীর জগন্নাথের মন্দিরে অস্পৃশ্য ছাড়া আর সব জাতের অবাধ প্রবেশ, সকলেই সমান। ঠাকুমার সঙ্গে আমি পুরীর মন্দিরে অনেকবার গিয়েছি। একবার আমাদের হাত থেকে মহাপ্রসাদ চেয়ে নিয়ে খান এক ব্রাহ্মণ। বলা যেতে পারে হাত থেকে নয়, মুখ থেকে। মহাপ্রসাদ কখনও উচ্ছিষ্ট হয় না। তবে এই প্রথা বিধর্মীদের বেলায় প্রযোজ্য ছিল না। মন্দিরের সিংহদ্বারের পাশের একটি ফলকে লেখা ছিল যাঁদের প্রবেশ নিষিদ্ধ সেই সব সম্প্রদায়ের নাম। মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, আর্য সমাজী, ব্রাহ্ম।

পাঁচ

ঢেঙ্কানাল শহরে অনেকগুলি পুকুর ছিল। যে পুকুরে পাঁক ছিল সে পুকুরে পদ্মফুল ছিল। যে পুকুরে পাঁক ছিল না সে পুকুরে পদ্মফুল ছিল না। এর তাৎপর্য তখন বুঝতে পারিনি, এখন বুঝি।

ঢেঙ্কানালের রানিসাহেবা ছিলেন সেরাইকেলার রাজকন্যা। সেটিও ছিল আর একটি দেশীয় রাজ্য, কিন্তু ছোটনাগপুরের অন্তর্গত। রানিসাহেবা ঢেঙ্কানালে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। রাধাকৃষ্ণের সুন্দর মূর্তি দুটি নির্মাণের জন্য কারিগর আসেন বাংলাদেশ থেকে। একজনের নাম এখনও মনে আছে। নৃত্যগোপাল। থিয়েটারের সিন যাঁরা পেইন্ট করেছিলেন তাঁরাও বাংলা থেকে এসেছিলেন। এইভাবে অনেক বাঙালি আসতেন।

আর একজনের কথা মনে আছে। সদানন্দ সরস্বতী নামে এক দীর্ঘাঙ্গী সন্ন্যাসিনী। পরতেন আলখাল্লা, পায়ে দিতেন খড়ম। নামটা হচ্ছে শঙ্করাচার্যের প্রবর্তিত দশনামী সন্ন্যাসীদের মতো। মহিলাকে তাঁরা দীক্ষা দিতেন না বলে জানতুম। অব্রাহ্মণকেও না। ইনি ব্যতিক্রম। পূর্বাশ্রমে ইনি ছিলেন কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের ভগিনী। এঁর পুরো নাম আমরা জানতুম না। আমার বাবার সঙ্গে তাঁর খুব হৃদ্যতা ছিল। আমরাও যেতুম তাঁর বক্তৃতা শুনতে। বাংলা ইংরেজি দু ভাষাতেই বক্তৃতা দিতেন। তাঁর মস্তক কিন্তু সন্ন্যাসিনীর মতো মুণ্ডিত ছিল না। যত দূর মনে পড়ে, কেশ তাঁর বাববির মতো। আমরা তাঁর বাসভবন রোজ

ভিলায়ও যেতুম। সেখানে তাঁর নির্দেশে ঘুরে ঘুরে গান করতুম : 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা।' ওই একটি গানই আমি গাইতে শিখেছিলাম। আর কোনও গান নয়। খোল করতাল ছাড়া অন্য কোনও বাদ্যযন্ত্র আমাদের বাড়িতে ছিল না। কিছুদিন খোল বাজাতে শিখে ছেড়ে দিই। ছবি আঁকার শখ ছিল। সেটাও ছেড়ে দিই। তবে মানচিত্র খুব আঁকি। আমার একটা অ্যাটলাস ছিল। সেটা ছিল আমার দিবারাত্র সাথী। এমনকী শৌচাগারেও। সব দেশ আমার চেনা। কোন দেশের কোনটা রাজধানী। একবার হেডমাস্টার মশাই ক্লাস নিতে এসে ছেলেদের বলেন, 'জানতে চাও তো অন্নদাশঙ্করকে জিজ্ঞাসা করো।' স্কুলের মানচিত্রগুলো ছিল আমার এক্তারে। 'পথেপ্রবাসে'র জন্য প্রস্তুতি বাল্যকালেই আরম্ভ হয়েছিল।

আমাদের হাই স্কুলটার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম হেডমাস্টার ছিলেন একজন বাঙালি ব্রাহ্ম। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ঢেঙ্কানালে বেশ কজন ব্রাহ্ম অফিসার ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন তো বিখ্যাত ওড়িয়া সাহিত্যিক ফকিরমোহন সেনাপতি। ফকিরমোহন যে বাংলোয় বাস করতেন কালক্রমে সেটি হয় তাঁর উত্তরসূরি দ্বিজেন্দ্রনাথ বসুর বাংলো। আমার ছোটবেলায় ঢেঙ্কানালে ব্রাহ্ম বলতে একমাত্র তিনিই ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের বাড়িটি ততদিনে সংস্কৃত টোলে রূপান্তরিত।

আমাদের স্কুলের লাইব্রেরিতে ছিল এন্তার ইংরেজি বই যার অধিকাংশই ছাত্রদের পক্ষে দুর্বোধ্য। তার মধ্যে ছিল প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের বই। আমাদের হেডমাস্টাররা ছিলেন পরম্পরাক্রমে বাঙালি। তবে ব্রাহ্ম নয়। অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টারও বাঙালি। এঁদের দৌলতে প্রচুর বাংলা বই লাইব্রেরিতে আনা হয়। আর কমনরুমে অনেক বাংলা পত্রিকা। কী জানি কেন হেডমাস্টার রাজেন্দ্রলাল দত্ত আমার উপর দেন কমনরুমের পত্রিকাগুলির দেখাশুনার ভার। ক্লাস থেকে পালিয়ে কমনরুমে গিয়ে সেইসব মাসিকপত্র দেখতুম। সেইখানেই করি 'সবুজপত্র' আবিষ্কার।

আমারও সাধ ছিল, আমিও একটি পত্রিকা সম্পাদনা করব। বারো-তেরো বছর বয়সের সেই সাধ মিটল পঁচাশি বছর বয়সে যখন পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি করা হল আমাকে। আমার আরও একটি সাধ ছিল। একটি খালি বাঁধানো খাতার উপরে আমি লিখেছিলুম 'অন্নদাশঙ্কর রায়ের গ্রন্থাবলী'। সেই সাধও পূর্ণ হল তিরাশি কি চুরাশি বছর বয়সে যখন আমার রচনাবলী খণ্ডে খণ্ডে বেরোতে আরম্ভ করে।

একদিন আমাদের ক্লাস টিচার আসেননি। তাঁর ক্লাস নিতে এলেন হেডমাস্টারমশায়। ঘরে ঢুকেই আমার দিকে এগিয়ে এসে বলেন, 'এই, তুমি নাকি বলে বেড়াচ্ছ, রবি ঠাকুর বাংলাভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি? কেন, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস কেন নয়? তবে মানছি যে রবি ঠাকুর আমাদের ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ গদ্যলেখক।' আমি চুপ করে থাকি। আমি কিন্তু কাউকে কোনওদিন বলিনি, রবি ঠাকুর আমাদের ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তর্কটা হয়েছিল, কে বড়? রবি ঠাকুর না ডি.এল. রায়? আমি বলেছিলুম, রবি ঠাকুরই বড়। আর মনোরঞ্জনের মতে, ডি. এল. রায়। রবীন্দ্রনাথের অনেক গদ্যগ্রন্থ আমাদের স্কুল লাইব্রেরিতে ছিল। শান্তিনিকেতনের মন্দিরে তিনি যেসব ভাষণ দিতেন, 'শান্তিনিকেতন' নামে ছোট ছোট পুস্তিকায় সেগুলি সংগৃহীত হত। তেমনি পুস্তিকা কয়েকখানি আমাদের লাইব্রেরিতে দেখেছিলুম।

একদিন হেডমাস্টারমশায়ের বাড়িতে গিয়ে দেখতে পাই 'প্রবাসী' পুরাতন ভাঙা সেট। তাতে 'গোরা' উপন্যাসটি ভাঙা ভাঙা টুকরো জুড়ে জুড়ে কাহিনীটা বুঝতে চেষ্টা করি। লাইব্রেরিতে তাঁর কোনও উপন্যাস বা গল্পসংগ্রহ ছিল না। তবে 'সবুজপত্রে' তাঁর গল্প পড়েছিলুম। এমনি করে রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমার একটা পক্ষপাত জন্মায়। তারপরে অন্যান্য জায়গা থেকে 'প্রবাসী'র চলতি সংখ্যাগুলি পড়তে পারি। পরে নিজেই 'প্রবাসী'র গ্রাহক হই।

'সবুজপত্রে' প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের লেখা 'চার ইয়ারি কথা' আমার খুব ভাল লেগেছিল। আর বীরবল নামে কে একজন লিখতেন, তাঁর লেখাও আমার খুব পছন্দ হয়। জানতুম না যে বীরবলই প্রমথ চৌধুরীর ছদ্মনাম। বীরবলী ভাষাতেই আমি বাংলা লিখতে চেষ্টা করি। টলস্টয়ের 'তেইশটি উপকথা'-র ইংরেজি অনুবাদ যখন পুরস্কার রূপে পাই তখন তার একটি কাহিনী বীরবলী ভাষাতে তর্জমা করে 'প্রবাসী'তে পাঠাই। সেটি সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হয়। সেটিই আমার প্রথম মুদ্রিত রচনা। ক্রমে টলস্টয় হয়ে ওঠেন আমার অন্যতম সাহিত্যগুরু। পরে কলেজে গিয়ে 'আনা কারেনিনা' পড়ি। তখন টলস্টয়ের উপন্যাস হয় আমার উপন্যাসের আদর্শ, 'গোরা' বা 'ঘরে-বাইরে' নয়।

হেডমাস্টারমশায় বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের উল্লেখ করেছিলেন। বৈষ্ণব পদাবলী আমি আরও আগে পড়েছিলুম বাড়ির লাইব্রেরিতে। সেখানে ছিল কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতির পদাবলী, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ গ্রন্থাবলী, বঙ্কিমচন্দ্র ও মধুসূদনের গ্রন্থাবলী। মাইকেল ছাড়া আর সবকটি আমি নাড়াচাড়া করেছিলুম।

খুব ভাল করে পড়া ছিল কবিকঙ্কণ চণ্ডী। আমাকেই পড়ে শোনাতে হত। পরিবারের লোকরা শুনতেন। আমি যখন সুর করে পড়তাম, 'ঈশানে উরিল মেঘ করি দূর দূর রে' তখন তাঁরা সবাই মিলে ভয়ার্ত কণ্ঠে গেয়ে উঠতেন, 'হায় রে নাই রে নাই রে।' পরে যখন আর একটি অংশ পাঠ করতুম তখন তাঁরা বলে উঠতেন, 'কেমন দুর্গার নাম' কিংবা 'মায়ের মহিমা'। শ্রীমন্ত সওদাগর যখন দারুণ বিপন্ন তখন তাঁরা কাঁদো কাঁদো সুরে বলতেন, 'তুমি না রক্ষিলে, কে বা রক্ষিবে তারিণী।' শেষ পর্যন্ত শ্রীমন্ত বেঁচে যেত। রক্ষা করতেন স্বয়ং মা চণ্ডী। চণ্ডীর কৃপা কালকেতু নামে ব্যাধের উপরেও বর্ষিত হয়েছিল। সে চণ্ডীর কৃপায় যে সোনা পেয়েছিল তা নিয়ে স্যাকরার কাছে যায়। 'বেনে অতি দুঃশীল নামেতে মুরারি শীল'। সে বলে, 'সোনা রূপা নয় বাবা এ বেঙ্গা পিতল।' কালকেতুকে সে ঠকাতে চায়। পরে দেখা গেল, চণ্ডীর কৃপায় ব্যাধ সেই ধন দিয়ে একটা রাজ্য স্থাপন করল। সেই রাজ্যে গিয়ে হাজির হল ভাঁড়ু দত্ত নামে এক কায়স্থ। সেও কম ধূর্ত নয়। মুকুন্দরাম অনেকগুলি চিত্র এঁকেছেন সেকালের বাঙালিদের। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর দুটি উপাখ্যানকে দুটি উপন্যাসও বলতে পারা যায়।

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' আমি পড়েছিলুম। 'যশোর নগর ধাম প্রতাপ আদিত্য নাম মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ'। সেটা পড়ে কায়স্থদের প্রতি একটু শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। 'অন্নদামঙ্গল'-এর মধ্যে 'বিদ্যাসুন্দর'ও ছিল। 'বিদ্যাসুন্দর'-এর অনেকগুলি পদ আমার এখনও মুখস্থ রয়েছে। 'বড়ুর পীরিতি বালির বাঁধ ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেক চাঁদ।' 'সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর।' 'নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে।' ভারতচন্দ্র এক জায়গায় লিখেছিলেন 'না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল তেঁহি রচিলাম ভাষা যাবনী মিশাল।' ভারতচন্দ্রের ভাষায় অনেক আরবি পার্সি শব্দ ছিল। তাই তাঁর ভাষা অত রসালো হয়েছিল।

প্রমথ চৌধুরী ছিলেন ভারতচন্দ্রের ভক্ত। আমিও তাই। বাংলা ছন্দ ও মিলকে তিনি যে স্তরে উন্নীত করে দিয়েছিলেন তার একমাত্র নজির বিদ্যাপতির মৈথিলি যাকে আমরা বাংলা বলে ভুল করতুম। না, আরও নজির ছিল। সেটা তখন কেউ জানত না। তার নাম চর্যাপদ। নিখুঁত ছন্দ নিখুঁত মিল। হাজার বছর আগে কী করে সম্ভব হল তা আমি জানি না।

আমাকে আধুনিক বাংলা লেখার পথে নিয়ে আসে 'শিশু' বলে একটি ক্ষুদ্র মাসিকপত্র। গ্রাহক করে দিয়েছিলেন সেজকাকা। একটা নতুন জগতের আভাস আছে। আমাকে দুনিয়ার খবরাখবর দেয়।

ছয়

আমাদের স্কুলের লাইব্রেরিতে অনেক কঠিন ইংরেজি বই ছিল। তার থেকে বেছে বেছে ইতিহাসের বইগুলো আমি পড়তুম। কলেজে সে বইগুলো আমার কাজে লেগেছিল। তা ছাড়া স্কট ও ডিকেন্সের উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। আর একটা ইংরিজি সিরিজের খান চারেক বই ছিল। What Every Boy Ought to Know, What Every Youngman Ought to Know ইত্যাদি।

প্রথম বইখানার পাতা কাটা হলেও পরের বইগুলোর পাতা কাটা হয়নি। দ্বিতীয় বইখানার পাতা আমিই প্রথমে কাটি।

তখন বুঝতে পারিনি, পরে বুঝতে পেরেছি, সেগুলো ছিল সেক্স এডুকেশনের বই। দ্বিতীয় বইখানাতে লেখা ছিল, নারী ও পুরুষের একসঙ্গে শোয়া উচিত নয়। আমি বাবাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'বইতে লিখেছে, নারীর সঙ্গে পুরুষের শোয়া উচিত নয়। কেন, বাবা?'

বাবা তখন বাবাজি পদ্মচরণ দাসের সঙ্গে চৈতন্যচরিতামৃত অনুবাদ করতে ব্যস্ত ছিলেন। জানতে চাইলেন, 'কোথায় একথা লিখেছে?' আমি তখন বইটির নাম করলুম।

তিনি হেসে উঠলেন। বললেন, 'ওরা একসঙ্গে না শুলে সৃষ্টি লোপ পাবে যে।'

পদ্মচরণ বাবাজিও হেসে বললেন একই কথা, 'সৃষ্টি লোপ পাবে যে।'

আমি ইংরেজি বিদ্যা জাহির করার জন্যে তেরো কি চৌদ্দ বছর বয়সে 'Epiphany' পত্রিকার পাতায় লিখি, 'Christians are fools of the first water.' সম্পাদক তার উপর একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখে বলেন, 'Mr. Annada Sankar Ray pays himself a poor compliment.' আসলে কিন্তু আমি খ্রিস্টের ভক্ত ছিলুম। বাড়িতে বাইবেল ছিল, যিশুর জীবনীও ছিল। পনেরো বছর বয়সে ছোটকাকা নিয়ে যান কটকের Baptist Church -এ। সেখানে পবিত্র রুটি ও পবিত্র বারি সেবন করি। সেখানে নিখিল ভারত খ্রিস্টান নেতাদের ইংরেজি ভাষণ শুনি। মধুসূদন দাস বলেন, 'I am every inch an Indian.' অনেক খ্রিস্টান ক্রমে ক্রমে বিদেশি নাম পরিত্যাগ করে স্বদেশি নাম গ্রহণ করেছিলেন। নাম শুনে বোঝার জো ছিল না কে খ্রিস্টান কে নন।

সাত

আজকাল যাকে ওড়িশি নৃত্য বলা হয় দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে দর্শক ছিলেন মাত্র তিনজন দেবতা ও দুইজন মানুষ। দেবতাদের নাম জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা। আর মানুষদের নাম

পুরীর রাজা ও রাজ পুরোহিত। নৃত্য প্রদর্শন করত একটি নর্তকী যে বংশানুক্রমে দেবদাসী। সেই নৃত্য পরিবেশিত হত মধ্যরাত্রে। জগন্নাথ মন্দিরের গর্ভগৃহে। প্রদীপের অস্পষ্ট আলোতে। বাইরের লোকের প্রবেশ ছিল না। যদি না তাঁরা হতেন রাজ অতিথি। এই নৃত্য চিরকালই ধর্মীয় নৃত্য। এর সঙ্গে পরিবেশিত হত জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-এর দশ অবতার স্তোত্র বা আরও কিছু গীত। যার শ্রোতা সেই কজন দেবতা ও মানুষ।

স্বাধীনতার পরে মন্দিরের গর্ভগৃহের নৃত্যগীত ইতিহাসে প্রথমবার বাইরের দর্শক ও শ্রোতাদের সম্মুখে নিয়ে আসেন পঙ্কজচরণ দাস, কেলুচরণ মহাপাত্র প্রভৃতি কয়েকজন গুরু। এঁদের মধ্যে পঙ্কজচরণ হলেন মাহারি বংশের সন্তান। এই নৃত্য মাহারি বংশেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু কেলুচরণ মহাপাত্র শুনেছি পটুয়া বংশের সন্তান। যাঁরা এখন নৃত্য করছেন তাঁরা কেউ মাহারি নন। প্রিয়ম্বদা মহান্তি, সংযুক্তা পাণিগ্রাহী, কুমকুম মহান্তি, সোনাল মানসিং, ইন্দ্রাণী রহমান, অলকা কানুনগো—এঁরা কেউ পরম্পরাগত দেবদাসী নৃত্যের নর্তকী নন।

নৃত্যটার নাম যে ওড়িশি নৃত্য এটা ওড়িশার লোকরাই আগে জানত না। এই নৃত্য দেখার সৌভাগ্য আমার কলকাতায় হয়েছে সম্প্রতি কালে। সংযুক্তা ও কুমকুমকে দেখলুম। এঁদের সঙ্গে একটি গানবাজনার দল ছিল। দশাবতার স্তোত্র যিনি শোনালেন তাঁর নাম রঘুনাথ পাণিগ্রাহী। তিনি সংযুক্তার স্বামী। এই অনুষ্ঠান প্রদর্শিত হয়, যত দূর মনে পড়ছে, রবীন্দ্রসদনে। হল-ভর্তি নরনারী। সকলেই টিকিট কেটেছেন, আমার মতো কয়েকজন বাদে। আমরা আমন্ত্রিত অতিথি।

এমনই এক আমন্ত্রিত অতিথি হয়ে গিয়েছিলুম বেহালার এক ধনী গৃহস্থের বাড়িতে। সেই আসরে সকলেই ছিলেন নিমন্ত্রিত প্রতিবেশী। কেলুচরণ মহাপাত্র নৃত্যাভিনয় করলেন। সঙ্গে ছিল ক্যাসেটে 'গীতগোবিন্দ'-এর গান : 'ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী।' তাঁর শিষ্যা ছিলেন সেই গৃহস্থের কন্যা ডোনা রায়। তিনিও একটু নাচলেন।

এখন ওড়িশি নাচ হয়ে গেছে জনসাধারণের উপভোগ্য। তাঁদের মধ্যে আছেন বহু বিদেশি ও বিদেশিনী। এ নৃত্য এখন বিদেশেও দেখানো হচ্ছে। ইলিয়ানা নামে এক ইটালিয়ান কন্যাও ওড়িশায় দশ বছর থেকে এই নৃত্য আয়ত্ত করে নাম করেছেন। উপরে একটা ধর্মের মোড়ক থাকলেও এটা এখন আর শুধু জগন্নাথদেবের দর্শনীয় নয়, জগৎসুদ্ধু মানুষের দর্শনীয়।

আমার ছেলেবেলায় আমি যা দেখেছি তার নাম গোটিপুঅ নৃত্য। গোটিপুঅ মানে একটি ছেলে। ছেলেটিকে সাজিয়ে আনা হত ঠিক মেয়ের মতো করে। সে মুখ খুলত না। অঙ্গভঙ্গি দিয়ে যা কিছু বলবার তা বলত। যাঁরা সমঝদার তাঁরা জানতেন, সেই অঙ্গভঙ্গি হচ্ছে এক-একটি মুদ্রা। মুদ্রা দিয়ে ব্যক্ত করা হত বিভিন্ন ভাব।

এই নৃত্য আমি কয়েকবার দেখতে পাই ঢেঙ্কানালের একটি মঠে। সেই মঠের মোহন্ত একজন রামায়েৎ বৈষ্ণব। কিন্তু তিনি ঝুলনের সন্ধ্যায় একটি গোটিপুঅ নাচের আসর বসাতেন ও বাইরের লোকজনদের আমন্ত্রণ করতেন। আমার মতো কৌতূহলীরা অনাহূত হয়ে সেই আসরে গিয়ে বসত। আমাদের প্রত্যেকের ভাগ্যে জুটে যেত একটি করে জুঁই ফুলের মালা। বোধহয় আমাদের কপালকেও চন্দনচর্চিত করা হত। বোধহয় বলছি এ জন্য যে ছিয়াত্তর কি সাতাত্তর বছর পরে কেই বা ঠিক মনে রাখতে পারে! যাক, আমার মতো বালকদের সঙ্গেও ব্যবহার করা হত মোহন্ত মহারাজের সভাসদদের মতো।

মোহন্ত মহারাজ একটি সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকতেন। তাঁর পোশাক-আশাকও ঠিক সন্ন্যাসীর মতো নয়। তাঁর লম্বা চুল তিনি মেয়েদের এলো খোঁপার মতো বাঁধতেন। তাতে বোধহয় ফুলের মালাও জড়ানো থাকত। যা হোক, তিনি রসিক পুরুষ। গান করে শোনাতেন একজন বেহালাবাদক। প্রৌঢ় পুরুষ। তিনি গোটিপুঅ নর্তকের বা নর্তকীর শিক্ষাগুরু তথা অভিভাবক। ওড়িয়া গানগুলির সঙ্গে হঠাৎ একদিন শুনতে পেলুম একটি বাংলা গান : 'তুমি কাদের কুলের বউ গো তুমি কাদের কুলের বউ? যমুনায় জল আনতে গেছ, সঙ্গে নাই ক কেউ!'

তেরো-চোদ্দো বছর বয়সে শোনা এই গানটি আমি দ্বিতীয়বার শুনতে পাই কলকাতায়। সুবিখ্যাত রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে। চুরাশি কি পঁচাশি বছর বয়সে। স্পষ্টই বোঝা যায় যে এটি একটি পুরনো বাংলা গান। কী করে যে ওড়িশায় গেল, আমি জানি না। তবে ওড়িশায় বাংলা গানের চর্চাও ছিল। বিশেষ করে বাংলা কীর্তনের। সে কথা অন্যত্র বলেছি।

এখনও দুটি ওড়িয়া গানের প্রথম কলি আমার মনে আছে। একটি হল, 'সার সাক্ষী নীল কুন্তলা রে।' 'নীল কুন্তলা' কী বুঝলুম, কিন্তু 'সার সাক্ষী' বলতে কী বোঝায় তা জানতুম না। পরে বোঝা গেল, দুটি শব্দ জুড়ে দিলে হয় 'সারসাক্ষী'। অর্থাৎ সারস পাখির মতো আঁখি। দ্বিতীয় গানের প্রথম কলি হচ্ছে, 'কাঞ্চন্অ গোরী বঞ্চনা।' 'কাঞ্চন্অ গোরী' হচ্ছে যে নারী কাঞ্চনের মতো গৌরবর্ণ। সেই নারী যে কাকে বঞ্চনা করেছিল জানি না। সম্ভবত রাধাকে মনে করে গানটি রচনা করা হয়েছিল। কারণ রাধার বর্ণনায় আছে, 'তপ্তকাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধা বৃন্দাবনেশ্বরী।' তবে দ্বিতীয় কলিটি একটু একটু আমার আবছা মনে পড়ছে। তাতে বোধহয় বলা হয়েছিল, প্রেমিককে বঞ্চনা না করতে। তা সেই বয়সে আমি কী করে এর তাৎপর্য অনুধাবন করব! পরবর্তী বয়সে কাঞ্চন্অ গোরীদের বঞ্চনা লক্ষ করেছি।

গোটিপুঅ নৃত্য এখনও কোনওমতে তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। সেই বয়সের বালকদের বদলে বালিকারাও আজকাল ওড়িশি নৃত্যের আসরে নেমেছে। লোকে তাদেরই পছন্দ করে বেশি। আমার ধারণা, গোটিপুঅ নাচ ছিল ওড়িশি নৃত্যের বিকল্প। এখন লোকে আসলটাই দেখতে পাচ্ছে। বিকল্পের কী দরকার?

ওড়িশি নৃত্য লোকনৃত্য নয়। লোকনৃত্য একবার কি দুবার আমি প্রত্যক্ষ করেছিলুম। তাকে বলা হত ঘটপটুয়া নৃত্য। একটি বয়স্ক পুরুষ মাথায় একটি ঘট নিয়ে নাচত। হাত দিয়ে সে ঘটকে ছুঁত না। অথচ ঘট নাচের হুল্লোড়ে টাল সামলাতে না পেরে পড়েও যেত না। সেইখানেই বাহাদুরি। সেটা বোধহয় ছিল একটি ধর্মীয় আচার। নর্তকের উদ্দেশ্য ছিল ব্রত পালনের দ্বারা পুণ্যলাভ। অর্থোপার্জন বা বিনোদন নয়। তবে হয়তো কিছু দক্ষিণা জুটত।

ঢেঙ্কানালের রানিসাহেবা সেরাইকেলার রাজকন্যা। সেই সুবাদে সেরাইকেলার যুবরাজ একবার ঢেঙ্কানালে আসেন। সঙ্গে ছৌ নাচের দল। সেই ছৌ নাচের অনুষ্ঠান হয় রাজপ্রাসাদের বাইরের প্রাঙ্গণে। সকলের অবাধ প্রবেশ। আমরা বালকরাও দর্শকমণ্ডলীর শামিল।

ছৌ নাচ পুরুষদের নাচ। বীররসের উপাখ্যান নিয়ে নৃত্য আর অভিনয়। পালাটার নাম কী ছিল আমার একেবারে মনে পড়ছে না। শুধু এইটুকু আমার মনে আছে, একজন

দলছুট আমাদের সামনে এসে একটু নেচে একরাশ তুলো উড়িয়ে দিয়ে গেল। সে-সব তার পোশাকের তুলো। সে বোধহয় হনুমান সেজেছিল। তা হলে কি বিষয়টা রামায়ণের অঙ্গ? কিন্তু এটাও আবছা মনে পড়ছে যে ছৌ নাচ বোধহয় দু দিন হয়েছিল। আর এক দিনের বিষয় ছিল বিদ্যাসুন্দর। কিন্তু নারীবেশ ধারণ করতে কাউকে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। নাচের সঙ্গে গান হয়েছিল কিনা তার কোনও স্মৃতি নেই। শুধু এটুকু জানি যে সেরাইকেলার ছৌ নাচ তখনকার দিনে বিখ্যাত ছিল। পরে ময়ূরভঞ্জ অনুকরণ করে। সে সূত্রে সেটাও হয়ে যায় ওড়িশার নাচ। পুরুলিয়ার ছৌ নাচের বার্তা ছেলেবেলায় শুনিনি।

পরে পুরুলিয়ার ছৌ নাচ কলকাতায় দেখেছি। ওরা তাকে ছৌ না বলে ছো বলে। সে নাচে মুখোশের ব্যবহার করা হয়। তুলনা করে বলতে পারব না কোনটা কোনটার চেয়ে প্রাচীন। তবে এইটুকু বলতে পারা যায়, সেরাইকেলা ময়ূরভঞ্জের ছৌ নাচের পৃষ্ঠপোষক রাজারাজড়া, পুরুলিয়ার ছৌ নাচের পৃষ্ঠপোষক গ্রামের লোক। নাচের সঙ্গে অভিনয় এই নাচের বৈশিষ্ট্য। গানবাজনার কথা মনে পড়ছে না। সেদিকে খেয়াল ছিল না।

এ কথা বলা সম্পূর্ণ অন্যায় যে মুখোশ পরার উদ্দেশ্য ছিল কুৎসিত মুখ ঢাকা। ভারতীয় নৃত্যে মুখোশের ব্যবহার অতি প্রাচীন কাল থেকে। ইউরোপেও masquerade ছিল। কেউ বলরাম সাজলে বলরামের মতো দেখতে হবে, কৃষ্ণ সাজলে কৃষ্ণের মতো দেখতে হবে, হনুমান সাজলে হনুমানের মতো দেখতে হবে, এজন্যই পেইন্ট ব্যবহার না করে মুখোশ ব্যবহার করা হয়। সেই একই লোক হয়তো হনুমানের ভূমিকা ছেড়ে রাবণের ভূমিকা নেয়। পেইন্ট বদল করার চেয়ে মুখোশ বদল করা সহজ।

বিদ্যাসুন্দরের কথায় মনে পড়ল বাদী পালার কথা। বাদী পালায় দুই পক্ষ থাকে কবিগানের মতো। আমি যাদের দেখেছিলাম তাদের এক জনের নাম মণি নাথ আর এক জনের নাম বংশী মিশ্র। মণি নাথ পীর বা ফকিরের মতো মুসলমান সাজ পরতেন। মাথায় টুপি, গায়ে আলখাল্লা, হাতে প্রকাণ্ড এক চামর। সেই চামর দুলিয়ে তিনি সত্যপীরের গান করতেন। আমার মনে পড়ছে না যে পালাটা ঠিক কী ছিল—সত্যপীর এসে কী মুশকিল আসান করলেন। এটাও আবছা মনে পড়ছে যে সেইদিন কি আর-একদিন সেই পালার আসরেই শুনতে পেলুম বিদ্যাসুন্দরের গান : 'শুন্ শুন্ রে মালিয়ানী, বাত্ কহি তোরে।' সুন্দর মালিয়ানী মারফত বিদ্যাকে কী বাত পাঠাল তা মনে নেই, তা বোঝবার বয়সও তখন আমার হয়নি। এটা ঠিক মনে আছে যে বাংলা ভাষা আর ওড়িয়া ভাষা দুটো ভাষাতেই পালাগান হত। মণি নাথ আর বংশী মিশ্র দু জনেই ওড়িয়া, তাদের দলের লোকরাও সকলে ওড়িয়া, দর্শকরাও ওড়িয়া। আর এটাও জানা গেল যে 'বাত্' শব্দটি ওড়িয়াও নয়, বাংলাও নয়, হিন্দি বা উর্দু। তবে কীর্তনের কথা ছিল বিশুদ্ধ বাংলা। অথচ গায়করা বেশির ভাগই ওড়িয়া।

আট

ঢেঙ্কানালে অনেকগুলি সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে এসেছিলুম। পিছনে ছিলেন এক ঘর পশ্চিমা মুসলমান। রাজার কোচম্যান। বাবা তাঁকে সামনের চেয়ারে বসিয়ে ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করতেন। সামনের মাঠ পেরিয়ে থাকতেন এক জন ব্রাহ্ম অফিসার দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু। এঁর দিদি ছিলেন প্রথম বাঙালি লেডি ডাক্তার কাদম্বিনী গাঙ্গুলি। আমাদের সদর রাস্তার কয়েক

বাড়ি পরে থাকতেন জন চৌধুরী। তিনি খ্রিস্টান। দ্বিজেন্দ্রনাথবাবু বাড়ির পিছনের বাড়িতে থাকতেন এক জন শিখ ফরেস্ট অফিসার, নাম বিষেণ সিং। পরে তাঁর জায়গায় আসেন পৃথ্বীচাঁদ। তিনি হিন্দু, কিন্তু তাঁর স্ত্রী ও পুত্র শিখ। পুত্রটির নাম বলদেও সিং। আমার ফুটবল খেলার সাথী। মাথায় পাগড়ি। কেশ আর কঙ্কণ শিখদের মতোই।

দ্বিজেন্দ্রনাথ বসুর বাড়ি থেকে একদিন কুড়িয়ে পাই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক বিবরণী। তাতে পড়ি, ঈশ্বর নিরাকার। তাঁর কোনও বিগ্রহ বা অবতার নেই। কোনও শাস্ত্রই অভ্রান্তও নয়। কোনও ব্যক্তিই অভ্রান্ত নন। সভ্যদের তালিকায় দেখি বিখ্যাত বাঙালিদের নাম। জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ প্রমুখ। স্কুল লাইব্রেরিতে রবীন্দ্রনাথের বই ছিল। প্রথম হেডমাস্টার অক্ষয়চন্দ্র রায়ই ব্রাহ্ম।

আমাদের রাজপরিবারের লেডি ডাক্তার ছিলেন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। নাম মিসেস অ্যান্ডারসন। আমাদের ক' ভাইবোনের জন্ম তাঁরই হাতে। বাড়ির সামনে দিয়ে ঘোড়ার গাড়ি করে রাজবাড়িতে যেতেন, তখন আমাদের খোঁজখবর নিতেন। পরবর্তী কালে বিলেত যাওয়ার সময় আমি তাঁর আশীর্বাদ চাইতে যাই। তিনি আমাকে ওড়িয়াতে বলেন, 'খোকা, ওদেশের মেয়েরা কেন অত ফর্সা হয় জানিস? ওরা অ্যাপল খায়। তুইও অ্যাপল খাস।' আমার মনে পড়ল, অ্যাডামকেও এই পরামর্শ দিয়েছিলেন ইভ।

আমাদের বাড়িতে নানা ধর্মের লোক কথা বলতে আসতেন। আমার খেলার সাথীরাও নানা ধর্মে বিশ্বাসী। বোখারি সাহেব বলে এক মুসলমান ফকির আসতেন। উনি সিন্নি খেতে দিতেন। আতাহার মিঞা দিয়ে যেতেন হালুয়া। সিন্নি আর হালুয়া দুটোই ছিল অতিশয় সুস্বাদু। তবে আমরা সাধারণ খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে বাছবিচার করতুম। মতামতের বেলায় যতটা উদার খাওয়া-ছোঁওয়ার বেলায় ততটা নয়। অর্থাৎ আমরা ছিলুম আচারনিষ্ঠ হিন্দু। কিন্তু পরমতসহিষ্ণু।

ঠাকুমা মানত করেছিলেন যে আমাকে মহরমে লাঠি খেলতে হবে। আমাকে তিনি যে শুধু রামায়ণ মহাভারতের গল্প শোনাতেন তা-ই নয়, পরীর গল্পও শোনাতেন। একটি পরীকে আমি বিশেষ ভালবাসতুম। পরে দেখেছি বাড়িতে একখানি 'গোলে বকাউলি' বইও ছিল। বটতলায় ছাপা। ধর্মপ্রাণ হিন্দুর বাড়িতে 'গোলে বকাউলি' আসে কোথা থেকে? বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ধর্ম আর সংস্কৃতি এক জিনিস নয়। আমরা ইসলাম গ্রহণ করিনি, কিন্তু পারসিক সংস্কৃতি একদা গ্রহণ করেছিলুম। তার সাক্ষী সেই 'গোলে বকাউলি'। পরে তো ইয়োরোপীয় সংস্কৃতিও গ্রহণ করলুম। তার সাক্ষী সেই শেক্সপিয়র গ্রন্থাবলী।

মুসলমানদের মহরমে বাঘ সাজত শিরিয়া নাপিত। তার হলুদমাখা গায়ে কালো কালো ডোরা। আমি মুগ্ধ হয়ে দেখতুম। তার চোখে কালো চশমা। শিরিয়া বলে চেনা যেত না।

মহরমের লাঠি খেলা ও বাঘ সাজা পারসিক সংস্কৃতির অঙ্গ। বাঘের নাচ এখনও মনে আছে। আমিও নাচতে চেয়েছিলুম। সেই একটা নাচই আমি এ জীবনে শিখেছি ও আমি এখনও মনে মনে নাচি। মহরম না হলে অথবা মহরমে যোগ না দিলে এ নাচ আমি শিখতুম কোথায়। একদা মহরম হোলি ইত্যাদি ছিল হিন্দু মুসলমানের যৌথ উৎসব। মুসলমানদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা সেই মোগল আমলের। জাহাঙ্গির বাদশাহের দেওয়া তালুকের ও

খানদানের সুবাদে। সে সম্পর্ক ছিল প্রীতির সম্পর্ক।

পেছনের বাড়ির যে মুসলমান পরিবার তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক গভীর সহানুভূতির। কিন্তু খাওয়া-ছোঁওয়ার বেড়া বাঁশের বেড়ার চাইতেও দুর্ভেদ্য। এই হচ্ছে হিন্দু মুসলিম সম্পর্কের সারমর্ম। আমরা খুবই আপন, অথচ খুবই পর।

মোগল আমলের আগে আমাদের চিনত কে? অথচ সেই আমলের বাবরি মসজিদ কিনা আমার চক্ষের সামনেই ধূলিসাৎ হল, প্রত্যক্ষ করলুম বিবিসি টেলিভিশনে !

নয়

চৌদ্দ বছর বয়সে আমি প্রথমবার পুরী যাই। সন্ধেবেলা সেখানে পৌঁছেই আমার প্রথম কাজ হয় সমুদ্রদর্শন। তার পর থেকে সকালবেলা সমুদ্রস্নান ও সন্তরণ। সন্ধেবেলা মন্দিরে গমন।

আমার কাকাদের অনুরোধে আমার বাবা আমাদের ক'ভাইকে পুরীতে পড়াশুনো করার অনুমতি দেন। পুরীর জেলা স্কুলে ভর্তি হয়ে আমি তো একরকম মানিয়ে নিয়েছিলুম। ছমাস পরে মা কান্নাকাটি করলে বাবা বললেন, 'ফিরে এসো।' গেলুম ঢেঙ্কানালে ফিরে।

সেই যে ছ মাস পুরীতে ছিলুম সেই ছ মাসের মধ্যে আমি ইংরেজিতে বক্তৃতা দিয়ে নাম করে ফেলি। ক্লাসেও ইংরেজিতে ফার্স্ট হই। পুরীতে অনেক বাঙালি ছাত্র ছিল। বেশির ভাগই পর্যটক পরিবারের। তাদের অনেকের গুরুজন স্বাস্থ্যের কারণে পুরীতে বসবাস করতেন। কেউ কেউ ধর্মীয় কারণে। সমুদ্রতীর আর জগন্নাথের মন্দির—এই দুটোই ছিল তাঁদের আকর্ষণের দুটি মেরু। আমিও প্রতিদিন সমুদ্রতীরে বেড়াতে যেতুম। আর দু-তিন দিন অন্তর অন্তর জগন্নাথ মন্দির। জগন্নাথদেবের অঙ্গ স্পর্শও করেছি। সেই ভক্ত সমাগমও ছিল একটা দর্শনীয় ব্যাপার। নানা প্রদেশ থেকে শত শত নরনারী আসতেন তীর্থ করতে।

ভক্তিভাবের ছিটেফোঁটাও আমার মধ্যে ছিল না। আমি যেতুম অন্য আকর্ষণে। একসঙ্গে এত নারী কখনও দেখিনি। নারী ছিল আমার কাছে এক রহস্য। নারী বলতে সাধারণত বোঝাত অবরোধবাসিনী। এঁদের অবরোধ মুক্ত করে দিতেন জগন্নাথদেব। সুতরাং আমার দেবদর্শন দেবীদর্শনের ছলও বটে। সমুদ্রতীরে ঘুরে বেড়ানোর যে আকুলতা অনুভব করতুম সেটা কি শুধু সমুদ্র দর্শনের জন্য? আধুনিক শিক্ষিতা পর্দাবিমুক্ত মহিলাদেরও সেখানে পায়ে হেঁটে বেড়াতে দেখতুম। যেন খাঁচা থেকে মুক্তি পাওয়া পাখি।

পুরীতে কী জানি কেন কেমন করে কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়ে যায়। আমরা দুজনে একই ক্লাসের ছাত্র, কিন্তু একই সেকশনের নয়। তা হলে কোন সূত্রে আমাদের পরিচয় হল কী করে বলব। বিকেলবেলা দু জনে মিলে সমুদ্রের ধারে রাখা নৌকোর আড়ালে বসে গালগল্প করি। কালিন্দী আমাকে একটি ওড়িয়া গান গেয়ে শোনায়। চমৎকার গলা। আমি তখন জানতুম না যে কালিন্দী এক জন কবি। আর কালিন্দীও কি জানত যে আমিও এক জন সাহিত্যরসিক! আমাদের কারও লেখা তখনও কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

দু বছর বাদে আমি যখন কটক কলেজে পড়তে যাই তখন দেখি, কালিন্দীও আছে সেখানে। আর গেছে বৈকুণ্ঠ। আমাদের সঙ্গে যোগ দেয় শরৎ মুখোপাধ্যায় ও হরিহর মহাপাত্র। আমরা সবাই প্রথম বার্ষিকের ছাত্র। আমরা একটি গোষ্ঠী গঠন করি। পরে সেটির নাম হয় 'সবুজ দল'। 'সবুজপত্র' পড়ার আদর্শকে আর সকলের মধ্যে আমি সঞ্চার করি।

পুরী থেকে ফিরে আসতে যে খুব উৎসুক ছিলুম তা নয়। আসতেই হল মায়ের আহ্বান। তিনি আর মাত্র দু বছরই ছিলেন। আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার জন্য তাঁকে ছেড়ে কটকে যাই। পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরছিলুম। তখন পথের মাঝখানে এক বাংলোয় থাকতে হয় রাত কাটাবার জন্যে। কটক থেকে সেই বাংলো পর্যন্ত চলে এসেছি। সেইখানে এক জন আমাকে বাবার লেখা একখানি চিঠি দেন। পড়ে দেখি, আমার মা নেই।

পুরীর ওই ছটি মাস আমার জীবনে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। আমি পেয়ে গেলুম এক জন schoolmate-কে যে ছিল আমার soulmate. আমাদের বন্ধুত্ব জীবনব্যাপী হয়েছিল। পুরী থেকে ঢেঙ্কানালে ফিরে এসে টলস্টয়ের 'তেইশটি গল্প' বইখানি পুরস্কার পাই। তার থেকে একটি গল্প বাংলায় অনুবাদ করি।

আমরা জাহাঙ্গির বাদশাহর আমল থেকে ওড়িশাবাসী। ওড়িয়া আমাদের মাতৃভাষা না হলেও স্কুলের ভাষা। আমার পক্ষে স্বাভাবিক হত রাধানাথ রায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ছিল বাংলা। পরে তিনি ওড়িয়ার অগ্রগণ্য আধুনিক কবি হন। কিন্তু আমার জীবনের গতি নির্ধারণ করেছিল রবীন্দ্রনাথ ও 'সবুজ পত্রে'র প্রভাব। অথচ আমাদের পরিবারে এঁদের কোনও প্রভাব ছিল না। ওই বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত প্রভাবের সীমা। বড়জোর দ্বিজেন্দ্রলাল অবধি। আমি একটি ব্যতিক্রম। বাড়িতেও, স্কুলেও।

আমার মা রোজ গৃহদেবতা গোপালের সন্ধ্যারতির সময় গান করতেন জয়দেব থেকে আর বাবা আবৃত্তি করতেন বিদ্যাপতি থেকে। এই সূত্রে আমি পাই আমার ছন্দ ও মিলের কান ও জ্ঞান।

স্কুলে আমার ভার্নাকুলার ছিল ওড়িয়া। সুতরাং ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময় আমার তো ওড়িয়াতে উত্তর দেওয়ার কথা। কিন্তু পরীক্ষার হল-এ আমার সামনে যখন ওড়িয়া ও বাংলা দুই ভাষার প্রশ্নপত্রের একটিকে বেছে নিতে বলা হয় তখন আমি বাংলা প্রশ্নপত্রই বেছে নিই আর তার উত্তর লিখি।

হল থেকে বেরিয়ে আসছি তখন মনোমোহন ঘোষ—যাঁর অভিভাবকত্বে আমরা ঢেঙ্কানালের ছাত্ররা কটকে গিয়েছিলুম—আমাকে পাকড়াও করে জিজ্ঞাসা করেন, 'ব্যাপার কী বলো তো? বাংলা উত্তরপত্র একটা বেশি পড়েছে কেন? ল্যামবার্ট সাহেব জানতে চান। কোন ভাষায় তুমি লিখেছ বলো তো?'

আমি বলি, 'বাংলায়।'

তখন তিনি বলেন, 'তোমার না ওড়িয়া ভার্নাকুলার? তোমার বাংলা উত্তরপত্র নাকচ হয়ে যাবে। কী সর্বনাশ!'

আমার মাথায় তখন বাজ। তিনি আমাকে টেনে নিয়ে যান লামবার্ট সাহেবের সামনে। তাঁকে বলেন, 'এই ছেলেটি ভুল করে ওড়িয়া প্রশ্নপত্রের বদলে বাংলা প্রশ্নপত্রের উত্তর দিয়েছে। একে যেন দয়া করে মাফ করা হয়।'

ল্যামবার্ট সাহেব একটু আশ্চর্য হন।

স্কুল থেকে পুরস্কার পেয়েছিলুম Bunyan-এর 'Pilgrim's Progress'. সে বই আমার জীবনে স্থায়ী প্রভাব রেখে গেছে। আমি Mr. Worldly Wiseman হতে চাইনি, হইনি। Mr. Pliable হতেও নারাজ।

পরীক্ষায় পাশ করি ঠিকই। তবে ফল তেমন ভাল হয় না। তার অন্য কারণও ছিল।

তখন অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। আমি পরীক্ষা দিতে চাইনি। মাস্টারমশায়দের অনুরোধে পরীক্ষায় বসি। পরীক্ষার দিন সকালেও 'Modern Review' পত্রিকা পাঠ করছিলুম।

অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার মনোমোহন ঘোষ আমাকে বিশেষ স্নেহ করতেন। তিনি পড়াতেন ইংরেজি ও ইতিহাস। তাঁর সঙ্গে আমার উচ্চাঙ্গের আলোচনা হত। উনি বি.এল. পাশ করেছিলেন, কিন্তু ওকালতি না করে মাস্টারি করেন। তিনি একদিন আমাকে বলেছিলেন, কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টারদের মধ্যে এন.গুপ্ত—নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের ছিল অসাধারণ আইন জ্ঞান। কিন্তু বলতে কইতে অপারগ ছিলেন। আর এস. পি. সিনহা ছিলেন তাঁর চেয়ে কম জ্ঞানী। কিন্তু অসাধারণ বাকপটু। আইন ব্যবসায়ে সেজন্য সিনহা এত সফল আর গুপ্ত বিফল। আর একদিন তিনি আমাকে বলেন, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ছিলেন রাধাস্বামী সম্প্রদায়ের সভ্য। আমি তার থেকে ধরে নিই যে রাধাকৃষ্ণের ভক্ত। পরবর্তী কালে জানতে পারি, রাধাস্বামী সম্প্রদায়ের সদস্যরা বৈষ্ণব নন, শিখদের মতোই একেশ্বরবাদী ও নিরাকার সাধক। তাঁদের শীর্ষস্থানীয় গুরুদের মধ্যে কেউ কেউ নারী। নারীকে তাঁরা অতি উচ্চ পদে স্থান দেন। একজনের নাম বিবিরানি সাহেবা। তিনি বোধহয় বাঙালি ছিলেন। রাধাস্বামী নামটা আসলে রাধা সোয়ামি। বৈষ্ণবদের রাধার সঙ্গে এই নামটির কোনও সম্পর্ক নেই।

মনোমোহন ঘোষ ছিলেন উদার হিন্দু। প্রায় ব্রাহ্ম বললেই চলে। আর রাজেন্দ্রলাল দত্ত ছিলেন থিয়োসফিস্ট। তিনিও হিন্দু ধর্মের এক উদার ব্যাখ্যা দিতেন। বলতেন, ভগবান দাসের বই পড়তে। আমি স্কুলজীবন শেষ করার পূর্বেই ব্রাহ্ম ভাবাপন্ন হয়েছিলুম। কতকটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের প্রভাবে। আমার নিজস্ব কিছু মিস্টিক উপলব্ধি হয়েছিল। মোট কথা, আমি ধার্মিক ছিলুম, কিন্তু যাকে ইংরেজিতে বলে non-conformist. কলেজে গিয়ে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার সময় আমি একটা ফর্মে লিখি, আমার ধর্ম Monotheistic Eclectic Hinduism. সর্ব ধর্ম হতে সার সংগ্রহকারী একেশ্বরবাদী হিন্দু। এখনও আমি তাই।

আমাদের বাড়িতে বিলিতি কাপড় কেনা হত না, হত মিলের কাপড়। বাবা একদিন একটি লোককে দেখিয়ে বলেন, 'এর বাড়ি সিমনই গ্রামে। এ তাঁত বুনে খায়। আমরা যদি দু টাকার উপর চার আনা বেশি দিয়ে তাঁতের কাপড় কিনি তা হলে এই লোকটি বেঁচে যায়।' তখন থেকে আমরা তাঁতের কাপড় পরি। অসহযোগের পর থেকে খদ্দর।

দশ

আমার তো আমেরিকায় গিয়ে জার্নালিস্ট হওয়ার কথা ছিল। স্কুলের সহপাঠী গোলোকবিহারী দাসের কাকা সারঙ্গধর দাস আমেরিকায় গিয়ে কায়িক পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করতে করতে সুগার এক্সপার্ট হয়েছিলেন। সেই যে earn করতে করতে learn করা কিংবা learn করতে করতে earn করা সেটা কেবলমাত্র আমেরিকাতেই সম্ভব ছিল, আমার স্বদেশে নয়। আমি বাপ-কাকার সাহায্য নিয়ে কলেজে পড়তে চাইনি, সেটা একটা কারণ। দ্বিতীয় কারণ, আমেরিকার প্রতি আমার একটা টান ছিল। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস আমি কিছু পড়েছিলুম। আর বাবা একদিন আমাকে বলেছিলেন, 'তুই হবি জর্জ ওয়াশিংটন আর তোর ভাই হবে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট।'

আমেরিকাতে যে-সব ভারতীয় ছিলেন তাঁদের লেখা আমি 'প্রবাসী'তে আর 'Modern Review' -তে পড়তুম। ইচ্ছে করত St. Nihal Singh-এর মতো স্বাধীনভাবে লিখতে।

আশ্চর্যের ব্যাপার আমাদের স্কুলে আমেরিকায় প্রকাশিত চার খণ্ডে Self-Educator ছিল। কেউ পড়ত না, আমি পড়তুম। তাতে ছিল জার্নালিজমের উপর কোর্স। চার খণ্ডে চারটি নিবন্ধ। যত দূর মনে পড়ে, একটিতে ছিল রিপোর্টারের শিক্ষণীয়, আর একটিতে সাব-এডিটরের, আর একটিতে এডিটরের, আর একটিতে ফ্রীল্যান্সের। আমি মনে মনে স্থির করি যে এডিটর কিংবা ফ্রীল্যান্স হব। ভারতের নানা স্থান থেকে আমি ইংরেজি পত্রিকার নমুনা আনিয়ে পড়তুম। কলকাতায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক টেলিগ্রাফেরও গ্রাহক হয়েছিলুম।

আমার অন্বিষ্ট ছিল বিলিতি লোককথার রাজা আর্থারের মতো তরবারি, বিকল্পে লেখনী। মনেপ্রাণে আমি একজন নাইট। আমার কাজ বিপন্নের উদ্ধার। ইংরেজিতে যাকে বলে শিভালরি।

পাটনার 'সার্চলাইট' পত্রিকা থেকে আমি পেয়েছিলুম 'Eternal vigilance is the price of Liberty' (John Curran). এটা আমারও মূলমন্ত্র।

স্কুলের পড়া শেষ করে চলে আসি কলকাতায়। আমেরিকায় যাওয়া হয় না, সংবাদপত্রে শিক্ষানবিশি হয় না। ছোটকাকার চিঠি পেয়ে চলে যাই কটকে এবং Ravenshaw College-এ ভর্তি হই। উদ্দেশ্য, বি.এ. পাশ করে কলকাতায় ফিরে আসা এবং সাংবাদিক হওয়া। সম্ভব হলে আমেরিকায় যাওয়া ও ভারতের স্বাধীনতার জন্য কলম ধরা। আমার কলমই আমার তরোয়াল।

প্রথম যৌবন

'আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই,
বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে।
এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর।
জীবন ভ'রে।'

রবীন্দ্রনাথের এই অভিজ্ঞতা আমার জীবনেও বার বার সত্য। স্কুলে পড়া শেষ করার আগেই আমি স্থির করে রেখেছিলুম সাংবাদিকতা হবে আমার পেশা। প্রথমে কলকাতায় শিক্ষানবিশি করে পরে সুযোগ পেলেই আমেরিকায় চলে যাব ও সন্ত নিহাল সিং-এর মতো ফ্রীল্যান্স হব। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়েও পড়ব। এবং সম্ভব হলে আমেরিকান কন্যাও বিবাহ করব। তারপর দেশে ফিরে এসে স্বাধীনতা সংগ্রামেও যোগ দেব। এরকম স্বপ্ন আরব্য উপন্যাসে আল নস্করেরও ছিল।

আমি কলকাতায় এসে 'বসুমতী' ও 'সার্ভেন্ট' পত্রিকার সম্পাদকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলুম। 'বসুমতী' সম্পাদক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ আমাকে উপদেশ দিলেন শর্টহ্যান্ড ও টাইপরাইটিং শিখতে। যেখানে এ-সব বিদ্যা শেখানো হয় সেখানে ভর্তি হয়ে দেখলুম, অন্য শিক্ষার্থীরা কেউ সাংবাদিক হতে চান না, তাঁদের লক্ষ্য সওদাগরি অফিসের চাকরি। আমার

লক্ষ্য তা নয়। আর 'সার্ভেন্ট' সম্পাদক শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী বললেন, 'তোমাকে আগে প্রুফ রিডিং শিখতে হবে।' পাঠালেন এক প্রৌঢ় কর্মচারীর কাছে। পোশাক-আশাক দেখে মনে হল, খুবই দুঃস্থ। ছাপোষা মানুষ। তিনি বললেন, 'আপনাকে যদি প্রুফ রিডিং শিখিয়ে দিই তা হলে আমার দানাপানি যাবে।' আমি বললুম, 'আমি চাই সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখতে। সেই সূত্রে প্রুফ রিডিং শেখা।' সতেরো বছরের একটি ছেলে ইংরেজিতে সম্পাদকীয় লিখবে এ কথা তাঁর বিশ্বাস হল না। তিনি বললেন, 'তা হলে তো তার আগে আপনাকে গ্র্যাজুয়েট হতে হবে। চার বছর বাদে আসবেন।'

কী করি? গোলামখানায় যেতে আমার একেবারেই ইচ্ছে ছিল না। অসহযোগ আন্দোলন চলছে। মাথা হেঁট করে কলেজে ঢুকতে হল। চার বছর বাদে দেখা গেল, আমি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে অদ্বিতীয় হয়েছি। ত্রিশ টাকা ছাত্রবৃত্তি পাব। কলকাতায় সাংবাদিকতা করতে গেলে একজন গ্র্যাজুয়েটের বাজারদর ছিল চল্লিশ টাকা। কলকাতার খরচের কথা চিন্তা করলে তার চেয়ে ভাল পাটনা কলেজে এম.এ. পড়া। সাংবাদিকতা তখনকার মতো মুলতুবি রইল। আমেরিকা যাত্রাও।

কটক র‍্যাভেনশ কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হই ১৯২১ সালের জুলাই মাসে। পরের বছর জানুয়ারি মাসে কলেজ ম্যাগাজিন Ravenshavian প্রকাশ করে আমার Stray Thoughts. তার প্রথম অংশ Punishment is Futile. দ্বিতীয় অংশ Dogmatic Religion, Selfish Nationalism and Organised Law আর The Three Clogs on The Wheel of Progress. এর পর প্রত্যেক সংখ্যায় আমার লেখা প্রকাশিত হয়। পাটনা গেলে সেখানকার কলেজ ম্যাগাজিনেও।

কলেজে গিয়ে আমি ইংরেজি ও বাংলা দুটো ভাষাতেই প্রথম স্থান অধিকার করি। ওড়িয়া আর আমার ভার্নাকুলার নয়। সংস্কৃত ছিল আমার অন্যতম সাবজেক্ট। যারা ভাল বাংলা লিখতে চায় তাদের সংস্কৃত জানা অত্যাবশ্যক। আর ইংরেজি শেখা চাই প্রাচীনের সঙ্গে আধুনিকতার সমন্বয় ঘটাতে।

দু বছর বাদে আই এ পরীক্ষায় পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করি। পঁচিশ টাকা স্কলারশিপ পাই। চলে যাই শরৎ মুখার্জির সঙ্গে পাটনা কলেজে পড়তে। আর্ট সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাই ১৯২৪ সালের জানুয়ারি মাসে। সেই বছরই পাটনায় মহাত্মা গান্ধীকে প্রথম দর্শন করি।

ইতিমধ্যে আমার মনে স্থান পেয়েছিল আমেরিকার বদলে ইউরোপ। ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রচুর বই পড়েছি। ইউরোপীয় ইতিহাস ছিল আমার প্রিয় পাঠ্য। পূর্বজন্মে ফরাসি বিপ্লবের দিনে বোধহয় আমি প্যারিসে ছিলুম। এই জন্মে কি প্যারিস দেখা হবে না?

লুভর মিউজিয়ামে ভিনাস ডি মাইলোর মূর্তি ছিল তা আমি জানতুম। বারো বছর বয়সে 'সবুজপত্র'-এ পড়েছিলুম 'চারইয়ারি কথা'। তার এক জায়গায় সোমনাথ উল্লেখ করেছিলেন ভিনাস ডি মাইলোর। সঙ্গে সঙ্গে ইটারনাল ফেমিনিনের। চিরন্তনী নারী সম্বন্ধে আমার তখন থেকেই কৌতূহল। আমি দেখলুম যে, আমার আমেরিকা যাওয়ার চেয়ে ইউরোপ যাওয়া আরও বেশি সম্ভবপর, যদি আই.সি. এস. প্রতিযোগিতায় নামি।

কলেজের সহপাঠীদের মধ্যেও কয়েকজন প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তাঁদের কাছে পুরাতন প্রশ্নপত্র দেখে আমার মনে হল অমন প্রশ্নের উত্তর আমিও দিতে

পারি। এলাহাবাদে গিয়ে পরীক্ষা দিলুম। ফল যখন বের হল তখন দেখলুম, আমার স্থান সর্ব ভারতে পঞ্চম। দুঃখের বিষয় সে বার মাত্র তিনজনকে পরীক্ষার ফল দেখে গ্রহণ করা হয়। আমার হাতে আরও একটা বছর ছিল। ধনুর্ভঙ্গ পণ করলুম যে পরের বার আমি প্রথম হব। ভগবান আমার মুখরক্ষা করলেন। শিক্ষানবিশির জন্য গৃহীত হলুম। বিলেতে দু বছর থাকলুম। ইউরোপ বেড়িয়ে 'পথে প্রবাসে' লিখলুম। দেশে ফিরে এসে আমি একাধারে সাহিত্যিক তথা ম্যাজিস্ট্রেট। সাংবাদিকতা আবার মুলতবি রাখা হল।

ভেবেছিলুম চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে সাংবাদিক হব। কিন্তু 'প্রবাসী' সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় আমাকে যা বললেন তা শুনে আমার মনে হল, সাংবাদিকতাও আমার পক্ষে পরধর্ম। আমি তাঁর সম্বন্ধে লিখেছিলুম যে, তিনি আধুনিক বাংলার একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক। তিনি বললেন, 'আমি সাহিত্যিকই নই, কারণ আমি যা লিখেছি তা সাহিত্য হয়নি। আমার নামটা বাদ দিন।' রামানন্দবাবুকে যদি বাদ দেওয়া হয় তবে আর কোন সাংবাদিককে সাহিত্যিক বলে গণ্য করা হবে?

তা হলে কি আই.সি.এস. থেকে ইস্তফা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে সাহিত্য থেকেও ইস্তফা দিতে হবে? আমি সাংবাদিক হবার বাসনা বরাবরের জন্য ত্যাগ করলুম। তখন স্থির করলুম যে, আমি আই.সি.এস. ছাড়ার পর পেনশনের উপর নির্ভর করব। আর কোনও পেশা বরণ করব না। পেনশন প্রাপ্য হবার সঙ্গে সঙ্গে আই.সি.এস. ত্যাগ করলুম। সাতচল্লিশ বছর বয়স থেকে আমি সব সময়ের জন্য সাহিত্যিক।

দুই

এখন সতেরো বছরের জীবনে ফিরে যাই।

কটক কলেজে ভর্তি হয়ে দেখি, আমার সহপাঠীদের মধ্যে আছে ঢেঙ্কানাল হাই স্কুলের বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়ক আর পুরী জেলা স্কুলের কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী। আমাদের অপর দুই সহপাঠী শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও হরিহর মহাপাত্র। আমরা পাঁচ জনে মিলে একটি গোষ্ঠী গঠন করি। বৈকুণ্ঠ তার নাম দেন ননসেন্স ক্লাব। আমাদের হাতে লেখা পত্রিকায় ইংরেজি বাংলা ওড়িয়া তিন ভাষায় লেখা থাকত। যিনি যে ভাষায় পারেন লিখতেন। আমি লিখতুম তিনটি ভাষাতেই। আমার প্রথম বাংলা রচনার বিষয় ছিল ওমর খৈয়াম।

আমার প্রথম প্রকাশিত ওড়িয়া কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তি ছিল : 'উৎকলভূমি সন্তানকুল সুপ্ত কি আজি সরবে?' কবিতাটির নাম মনে নেই, কবির নাম 'বঙ্গোৎকল'।

আমরা ক্রমে ক্রমে যে যার নামে ইংরেজি ওড়িয়া বাংলা বিভিন্ন পত্রিকায় লেখা আরম্ভ করি। আমার ইংরেজি লেখা বেরোত রেভনশ কলেজ ম্যাগাজিনে। বাংলা রচনা 'ভারতী'-তে ও 'প্রবাসী'-তে। ওড়িয়া রচনা 'উৎকল সাহিত্য'-এ ও 'সহকার'-এ। এইসব লেখার জন্য উপকরণ সংগ্রহ করা হত কলেজের বৃহৎ লাইব্রেরি থেকে। সেখানে গিয়ে আমি পড়তুম বা পড়তে নিয়ে আসতুম ইংরেজি তথা ইংরেজিতে অনূদিত ফরাসি জার্মান রুশ সুইডিশ নরওয়েজিয়ান প্রভৃতি ভাষার কাব্য উপন্যাস নাটক ও প্রবন্ধ গ্রন্থ। আমি সাত টাকার একটা বৃত্তি পেতুম। তার থেকে পাঁচ টাকা যেত কলেজ ফী। দু টাকা জমিয়ে রাখতুম ও খরচ করতুম 'প্রবাসী' 'মর্ডান রিভিউ'-র চাঁদা বাবদ। তা ছাড়া দৈনিক 'সার্ভেন্ট' পত্রিকাও

মাঝে মাঝে কিনতুম। বিস্তর না পড়লে বিস্তর লেখা যায় না। আমার পড়ার অভ্যেস সাত-আট বছর বয়স থেকেই ছিল। লেখার অভ্যেস বারো-তেরো বছর বয়সে শুরু হয়। আমার আদর্শ ছিল 'সবুজপত্র'। আমার সেই আদর্শ আমি আমার গোষ্ঠীকেও দিই। তাই আমাদের গোষ্ঠীর প্রকাশ্য নামকরণ হয় পরবর্তীকালে 'সবুজ দল'। যেটা আমরা কল্পনা করতে পারিনি আমাদের সেই অপরিণত বয়সের রচনাকেও ওড়িয়া সাহিত্যে চিহ্নিত করা হয়েছে 'সবুজ যুগের সাহিত্য' নামে। সেই যুগ ছিল ওই শতাব্দীর তৃতীয় দশক বা তার দু-এক বছর কম-বেশি।

আমার ওড়িয়া লেখা উনিশশো একুশ সালে আরম্ভ হয়ে উনিশশো ছাব্বিশেই শেষ হয়ে যায়। আমি হৃদয়ঙ্গম করি যে তিনটে ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করে আমি কোনও ভাষাতেই বেশি দূর অগ্রসর হতে পারব না। সুতরাং একটি ভাষাকেই বেছে নেওয়া উচিত। আমি বেছে নিই বাংলা। এর ফলে আমার শক্তি বহু পরিমাণে সংহত হয়। পুরোপুরি হয় না। কারণ পরীক্ষার সময় ইংরেজি ছিল আমার সাফল্যের একমাত্র সোপান। আমি প্রতিদিন কিছু না কিছু ইংরেজিতে লিখতুম।

আগেই বলেছি ইন্টারমিডিয়েট আর্টস পরীক্ষায় পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে পঁচিশ টাকা ছাত্রবৃত্তি পাই। সেই টাকা পেয়ে পাটনা কলেজে পড়তে যাই। উদ্দেশ্য ছিল যদুনাথ সরকারের অধীনে ইতিহাসে অনার্স পড়া। কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের বহর দেখে ভয় হয়, আমার প্রথম শ্রেণীর অনার্স পাওয়া হবে না। তাই ইংরেজি অনার্স নিই। সেই সূত্রে নিকট সংস্রবে আসি ইংরেজির অধ্যাপক আর্মার, অর্থনীতির অধ্যাপক হ্যামিলটন ও ইতিহাসের অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের। ছুটিতে দেশ ভ্রমণে গিয়ে দিল্লির হোটেলে যদুনাথের সঙ্গে এক বিছানায় শুই ও এক বালিশে মাথা রাখি। মহাত্মা গান্ধী যখন পাটনায় আসেন তখন সাংবাদিক সেজে তাঁর সভায় গিয়ে তাঁকে দর্শন করি।

পাটনা থেকে শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করি, আর্ট কি প্রতিদিনের খোরাক হতে পারে! তিনি বলেন, উচ্চতর গণিত কি সবাই বুঝতে পারে? টলস্টয়ের উত্তর বিপরীত। 'সবুজপত্র' আমার মাথায় আর্ট শব্দটি ঢুকিয়ে দেয়। প্রমথ চৌধুরীই এর জন্য দায়ী।

তিন

একটা গোপন কথা খুলে বলতে হচ্ছে।

পাঁচ বছর বয়স থেকেই আমি প্রেমে পড়ে এসেছি। সমবয়সিনীদের প্রত্যেকেরই বিয়ে হয়ে গেছে অতি অল্প বয়সে অধিকবয়সী পুরুষদের সঙ্গে। আমি ক্রমে উপলব্ধি করি যে প্রেম মানেই হতাশ প্রেম। আগে তো বড় হই, বড় হয়ে একটা কিছু করি। পরে প্রেম ও বিবাহ।

আমার সাহিত্যিক বান্ধবী সরলাদেবীকেও আমি প্রায় তিন বছর ধরে প্রতিদিন প্রথমে ওড়িয়ায় ও পরে বাংলায় চিঠি দিয়েছি। সে সব চিঠি প্রায়ই প্রবন্ধের আকার নিত। যেদিন যা পড়তুম তার সার অংশ তাঁর জ্ঞানের জন্য লিখতুম। চিঠি লিখতে লিখতে আমার হাত পাকে। এমনি করে 'পথে প্রবাসে'র ভাষা ও শৈলীর রেওয়াজ হয়।

আই. সি. এস. প্রতিযোগিতায় সফল হয়ে বিলেত না গেলে 'পথে প্রবাসে' লেখা হত

না। আমাকে বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করেছে যে-বই তার মূলে ছিল সরলাকে লেখা চিঠিপত্র। আর আই.সি.এস. পরীক্ষার জন্য পড়াশোনা। বিশেষত, ইতিহাস ও সাহিত্য। ইউরোপীয় সাহিত্য ও ইউরোপের ইতিহাস সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়ে তবেই আমি ইউরোপে যাই, তবেই আমি ইউরোপ ভ্রমণ করি ও তবেই আমি 'পথে প্রবাসে' লিখি। বইখানি উৎসর্গ করি সরলাদেবীর নামে।

আমরা 'সবুজ দল'-এর লেখকরা যখন 'বাসন্তী' নামে একটি বারোয়ারি উপন্যাস রচনার সঙ্কল্প নিই তখন বারো মাসের জন্য বারো জন অংশগ্রহণকারীর প্রয়োজন হয়। আমরা তো মাত্র পাঁচ জন। তার মধ্যে বৈকুন্ঠ কবিতা ছাড়া আর কিছু লিখবেন না। কালিন্দী 'উৎকল সাহিত্য'-এর পৃষ্ঠায় আমন্ত্রণ জানান আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে ইচ্ছুক লেখকদের। লেখিকাদের কথা আমাদের মাথায় আসেনি। তখনকার দিনে উপন্যাস লিখনক্ষম লেখিকাদের নামও আমরা জানতুম না। কালিন্দী যে-বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন তাতে তিনি আমার নাম করে বলেছিলেন যে যাঁরা লিখতে চান তাঁরা যেন আমার পাটনার ঠিকানায় যোগাযোগ করেন।

একদিন একটা চিঠি পাই ওড়িশার একটি অজ্ঞাত গ্রামের এক অচেনা মহিলার কাছ থেকে। সরলাদেবী জানতে চান আমরা কি তাঁকে আমাদের উপন্যাসের একজন লেখিকারূপে গ্রহণ করতে পারি? তাঁর চিঠির বয়ান পড়ে মনে হল, তিনি ভালই লিখতে পারেন, কিন্তু উপন্যাস লিখতে পারেন কি না সেটা অন্য কথা। আমি তাঁকে পরামর্শ দিই কালিন্দীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে। কালিন্দী তখন কাছেই কটকে। ফলে তিনি 'বাসন্তী'র জন্য লেখিকা হিসেবে মনোনীত হন। সেই সূত্রে চলতে থাকে আমার সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ। সেটা 'বাসন্তী' শেষ হওয়ার পরেও থামে না।

এবার না বলে পারছি না যে, আমি শৈশব থেকে প্রেমে পড়তে অভ্যস্ত হলেও আমার প্রেমের পাত্রীরা কেউ এর আগে আমাকে উৎসাহ দেয়নি। আমিও কারও জন্য একটির বেশি পদ্য লিখিনি। সরলার মন পাবার জন্য আমি যে-সব ওড়িয়া কবিতা লিখি 'উৎকল সাহিত্য'-এর বিখ্যাত সম্পাদক বিশ্বনাথ কর তাঁর পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় সে-সব প্রকাশ করতেন। সেই সূত্রে আমিও বিখ্যাত হয়ে যাই।

আমি যে ওড়িয়া কবিতা লেখা ছেড়ে দিই তার জন্য আজ পর্যন্ত ওড়িয়ারা দুঃখ প্রকাশ করেন। সে-সব কবিতা প্রকাশের সত্তর বছর পরেও সেদিন ওড়িয়া সাহিত্যের একজন স্বনামধন্য লেখিকা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে আমার 'সৃজনস্বপ্ন' আবৃত্তি করে শোনালেন। মনে হল নেহাত মন্দ লিখিনি। আরও লিখতে পারতুম। কিন্তু ১৯২৬ সালে সেই যে একটা ছেদ পড়ে যায় তারপর আর স্বতঃস্ফূর্তভাবে লিখতে পারিনে। মুখ্যমন্ত্রী জানকীবল্লভ পট্টনায়ক বছর কয়েক আগে শান্তিনিকেতনে এসে আমাকে ওড়িয়াতে আরও দুটি কবিতা লিখতে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিলেন। বার বার বলেছিলেন, 'আরও দুটি'। কী করি? আমার কি আর সেই ক্ষমতা আছে? সেই প্রেরণাও নেই। সে-সব বন্ধু আর নেই। সেই গোষ্ঠী আর নেই। সে-সব পাঠকও আর নেই।

সরলার সঙ্গে আমার সম্পর্ক নিয়ে আরও কিছু বলা দরকার। সাহিত্যিক সম্পর্কটার আরও একটু গভীরে চলে যাই। তাঁর মধ্যে আমি দেখতে পাই, এখন যাঁদের বলা হয়, অ্যাংরি ইয়ং উম্যান তাঁদের একজনকে। তখনকার ওড়িশায় এক জন অ্যাংরি ইয়ং উম্যান

একটি আবিষ্কার। আবিষ্কারটা প্রথমে আমিই করি। তারপরে আমাদের দলের আর সকলে। কী জানি কেন, আমাকেই তিনি প্রাত্যহিক পত্রলেখকরূপে বেছে নেন। পরীক্ষার দিনেও আমি তাঁকে চিঠি লিখেছি। আর তাঁর চিঠি পেয়েছি। এর থেকে যদি কেউ মনে করেন আমরা লেখক-লেখিকার চেয়ে কিছু বেশি তা হলে খুব ভুল হবে না।

কিন্তু এই কারণে এক সঙ্কট আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। পাটনায় আমি বি.এ. পরীক্ষা দেওয়ার পর যখন কটকে গিয়ে বৈকুণ্ঠের সঙ্গে দেখা করি তখন সে বলে সরলা আমাদের দুজনকে ডেকে পাঠিয়েছে। যাই দেখা করতে। ওর স্বামীকেও দেখলুম। আমাদের চেয়ে বয়সে অনেক বড়। কংগ্রেস নেতা ও জমিদার। সুভদ্র পুরুষ। বৈকুণ্ঠ ওঁকে একটু আড়ালে নিয়ে যায়। তখন সরলা আমাকে চুপিচুপি বলেন, 'আমি মা হতে যাচ্ছি।' বিষাদভরা তাঁর মুখ। বোধহয় একটু আগে কাঁদছিলেন। অস্ফুট স্বরে বলেন, 'উনি ধর্ষণ করেছেন।' আমি চমকে উঠি। তিনি আমাকে আরও বেশি চমকে দিয়ে বলেন, 'আমি মেনে নেব না। আমি অ্যাবরশন করতে চাই। উনি রাজি হচ্ছেন না। তুমি কী বলো? করব কি করব না?' আমি দৃঢ়স্বরে বলি, 'না।' তখন তিনি অনেকটা শান্ত হন। একটু ভেবে বলেন, 'ওঁর কথাতে নয়, তোমার কথাতেই আমি এ সঙ্কল্প ত্যাগ করছি।'

বৈকুণ্ঠ আর আমি সেইদিনই কটকে ফিরে আসি। বোঝা গেল, সরলা এইজন্যে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আমার মতের উপর নির্ভর করছিল তাঁর জীবনের একটি কঠিন সিদ্ধান্ত। যাক, আমার আর কিছু করবার ছিল না।

আমার পরীক্ষার ফল বেরোনোর আগে আমি কপিলাস পাহাড়ে এক মাস কাটাব স্থির করেছিলুম। কিন্তু কটক ছাড়বার আগেই বৈকুণ্ঠের ওখানেই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন প্রখ্যাত গান্ধীপন্থী কর্মী নবকৃষ্ণ চৌধুরী। পরনে খাটো খদ্দরের ধুতি, গায়ে একটা খদ্দরের চাদর, একমুখ দাড়ি গোঁফ, বোধহয় জেলখানায় এ-সব গজিয়েছে। দেখে শ্রদ্ধা হয়। কলেজে পড়তে পড়তে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। অপেক্ষায় আছেন, গান্ধীজি ডাকলেই আবার ঝাঁপিয়ে পড়বেন।

জানতুম না তিনি কেন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। বৈকুণ্ঠের সঙ্গে ওঁর খুব অন্তরঙ্গতা ছিল। সরলার সঙ্গে দূর সম্পর্কের আত্মীয়তা। তিনি বললেন,'সব শুনেছি। এখন পরবর্তী পদক্ষেপটা কী হবে তা নিয়ে আপনার সঙ্গে বৈঠকে বসতে চাই। সময় লাগবে।' তখন আমি বললুম, 'তা হলে চলুন আমার সঙ্গে কপিলাসে।' তিনি রাজি হয়ে যান। তিনি ইতিমধ্যে বৈকুণ্ঠের নবভাই হয়েছিলেন। এর পর হয়ে গেলেন আমার নবদা।

কপিলাসে আমরা দুজনে বিশ্ব ও ভারতের নানান সমস্যা নিয়ে ভাব-বিনিময় করি। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার চাইতে আরও জরুরি হল সরলার মুক্তি। 'মুক্তি' কথাটা সরলা পত্রালাপের আদি থেকেই উচ্চারণ করে আসছিলেন। তাঁর বন্দিনী দশা থেকে মুক্তি। জমিদার বাড়ি একটা সোনার খাঁচা। সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অভাব ছিল না। কিন্তু একজন 'রাগী যুবতী' যা চান তা সুখস্বাচ্ছন্দ্য নয়, বন্ধনমুক্তি। তাঁর বিয়ে দেওয়া হয় তেরো-চোদ্দো বছর বয়সে তাঁর অমতে। সহবাসেও তাঁর অমত ছিল। মা হতে তাঁর অনিচ্ছা ছিল। মা হলে তাঁকে আরও অনেককাল বন্দিনী হয়ে থাকতে হবে। তা হলে 'মুক্তি' পাবেন কবে? বন্দিনী দশা থেকে মুক্তি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে তিনি নবদাকে দ্বিধায় ফেলেছিলেন।

নবদা আগেই সরলাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তিনি যদি বন্ধনমুক্ত হতে চান তবে

তিনি তাঁর জন্য কোথাও কোনও আশ্রমে থাকার ব্যবস্থা করতে পারবেন। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে তিনি দিশা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তিনি আমার সাহায্য চান। তিনি চান যে তিনি ও আমি দুজনে মিলে ওঁর জন্য একটা কিনারা করি। দুজনের আলোচনার ফলে যেটা স্থির হল সেটাও একটা আল নস্করের স্বপ্ন।

আমরা দুজনে চাকরির খোঁজে বেরোব। দুজনে এক জায়গায় চাকরি করব। দুজনে এক জায়গায় বাসা বাঁধব। তারপর সরলা এসে একদিন আমাদের সাথী হবেন। ওঁর সন্তান হলে সন্তানটিও থাকবে আমাদের কাছে। সরলাকে একটি স্বাধীন জীবিকার জন্যে তৈরি করে দেওয়া যাবে। তিনি ভাল লিখতে পারেন। লেখিকা হিসেবে কিছু কি উপার্জন করতে পারবেন না? সরলার চিঠি পেয়ে বুঝতে পেরেছিলুম, তিনি ভাল বাংলাও লিখতে পারেন। চেষ্টা করলে বাংলাতেও উপন্যাস লিখতে পারবেন। আর আমি তো গ্র্যাজুয়েট হবার সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিক হতে যাচ্ছি। সম্পাদক ও প্রকাশক মহলে আমারও তো মেলামেশা হবে। তাঁরা কি ওঁকেও একটা সুযোগ দেবেন না? কে জানে তিনি হয়তো একদিন George Sand (জর্জ সাঁ) অথবা George Eliot (জর্জ এলিয়ট) হবেন। নবদারও একটা ভূমিকা থাকবে। ওঁকেও কিছু উপার্জন করতে হবে। অসহযোগে যোগ দিতে গিয়ে ওঁর বি.এ. পড়া শেষ হয়নি। প্রাইভেটে পরীক্ষা দিয়ে উনিও নিশ্চয়ই বি.এ. পাশ করতে পারবেন। কলেজ ত্যাগ করলেও উনি প্রচুর পড়াশোনা করেছেন এবং করেন। আপাতত তিনি কলকাতায় যা হোক একটা কাজ জোগাড় করে নেবেন।

নবদা কপিলাসে এক মাস না থেকে পনেরো দিন পরে কটকে ফিরে যান। আর আমি পুরো এক মাস থেকে লেখালিখি করি। কপিলাস শিবরাত্রির সময় জমজমাট। তারপর জনশূন্য। ঢেঙ্কানালের রাজাসাহেবের একটা বাংলো ছিল। অধিকাংশ সময় খালি পড়ে থাকত। চন্দ্রশেখর শিবের মন্দিরই প্রধান দ্রষ্টব্য। মন্দির থেকে দুবেলা আমাদের জন্যে প্রসাদ আসত। পূজারীদেরকে আমরা টাকা দিতুম। কপিলাসে ঝর্নার জল। সেজন্য জায়গাটি খুবই স্বাস্থ্যকর। কপিলাসে বসে আমি 'উৎকল সাহিত্য'-এর জন্য প্রবন্ধ লিখেছিলুম।

আমার একটি প্রবন্ধে মহিলা কবি কুন্তলাকুমারী সাবতের একটি কবিতার উপর কটাক্ষ ছিল। আমি যৌবনের প্রশংসা করেছিলুম, উনি যৌবনের নিন্দে করেছিলেন। আমি লিখেছিলুম, কুন্তলাকুমারী নবতর মায়াবাদ প্রচার করেছেন।

আমার এক ভগ্নীপতির নাম ছিল অন্নদাপ্রসাদ রায়। কয়েক মাস পরে তিনি আমাকে বলেন, 'তুমি কী লিখেছিলে বলো দেখি। লেডি ডাক্তার কুন্তলাকুমারী সাবত বাড়ি চড়াও হয়ে আমাকে শাসান, আপনি কেন আমার বিরুদ্ধে ও-সব কথা লিখলেন?' আমি ভয় পেয়ে বলি, 'আমি তো কিছু লিখিনি। আমি লেখকই নই। আপনি ভুল করছেন। আপনি বোধহয় আমার শ্যালকের লেখা পড়েছেন। তার নামও অন্নদা। পাটনায় থাকে।' যাক, ভগ্নীপতির মুখে এই কথা শুনে ধড়ে প্রাণ ফিরে আসে। কী বিপদ থেকেই না বেঁচে গেছি। কুন্তলাকুমারী ভালই লিখতেন। আমি তো সত্যিই তাঁর নিন্দে করতে চাইনি। একটু মশকরা করেছিলুম। খ্রিস্টান পরিবারে তাঁর জন্ম। কিন্তু হিন্দু ভাবধারায় লালিত।

কপিলাস থেকে ফিরে এসে খবর পাই যে আমি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হয়েছি। সুতরাং মাসে ত্রিশ টাকা বৃত্তি পাব। পাটনা ছেড়ে যদি কলকাতায় যাই তা হলে বৃত্তিটা হারাব। অথচ সাংবাদিকতা করে যা পাব তাতে

একজনের কোনও রকমে চলতে পারে। কিন্তু তার উপরে নির্ভর করে সরলার ভার নেওয়া যায় না। নবদাকেও কিছু উপার্জন করতে হবে।

এমন সময় নবদা লিখলেন, তিনি তাঁর দাদার নির্দেশে শান্তিনিকেতনে যাচ্ছেন। সেখানে বিশ্বভারতীতে অধ্যয়ন করবেন। তাঁর পক্ষে আমাদের সঙ্গে থাকা সম্ভব নয়। এ চিঠি পাওয়ার পর আমি কলকাতার বদলে আবার পাটনাতেই যাই।

আর সরলাকেও তার মা নিয়ে যান নিজের হেফাজতে রাখতে। সেইখানেই সরলার পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। খবরটা যখন পাই তখন আমি আই.সি.এস. দিতে যাচ্ছি।

ইতিমধ্যে নবদা একদিন আমাকে শান্তিনিকেতনে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আমাকে চমকে দিয়ে বলেছিলেন যে তিনি বিবাহের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পাত্রী বিশ্বভারতীর ছাত্রী মালতী সেনগুপ্ত। জাস্টিস বিহারীলাল গুপ্তের দৌহিত্রী। আমি শুনে সুখীও হলুম, সঙ্গে সঙ্গে অসহায়ও বোধ করলুম। নবদা আমার সঙ্গে না থাকলে আমি একা সরলা ও তার সন্তানের ভার বহন করতে পারব কেন? এক যদি আই.সি.এস. প্রতিযোগিতায় নিশ্চিত ভাবে সফল হই এবং একাই যথেষ্ট উপার্জন করি। আর যদি সরলার সন্তানের পিতা সন্তানকে দাবি না করেন। সেটাও ছিল আল নস্করের স্বপ্ন।

ষোলো সতেরো বছর বয়স থেকেই আমি স্থির করেছিলুম যে কখনও সম্পত্তি করব না। বাবার সম্পত্তি নেব না। বহতা নদী রমতা সাধু। শুধু রমণী সম্পর্কে খোলা মন।

চার

আগেই বলেছি যে সে বার আই.সি.এস.-এ পঞ্চম হয়েও গৃহীত হইনি। আমাকে এক বছর পরে আবার প্রতিযোগিতায় বসতে হয়। পরের বারে প্রথম হই। বিলেত যাই। সেখানে আমি যা পাই তাতে সরলাকে নিয়ে থাকতে পারা যায়, কিন্তু তার সন্তানকে নিয়ে নয়। তা হলে কথা হচ্ছে, তিনি কি তাঁর সন্তানকে ছেড়ে যেতে পারবেন? সরলার স্পষ্ট উত্তর, 'না'।

ইতিমধ্যে তাঁর স্বামীর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হয়েছিল। পুত্র সন্তান পেয়ে তাঁর স্বামী অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন। সরলাকে অনেকটা স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। বিবাহের বন্ধনের মধ্যে থেকে তিনি মুক্তির স্বাদ খানিকটা পেতে পারতেন।

তিন বছরের পত্রালাপে এটুকু বুঝতে পেরেছিলুম যে সরলা রাগী যুবতী হলেও পাশ্চাত্যের রাগী যুবতী নয়। কবির কথা একটু ঘুরিয়ে বললে যা দাঁড়ায় সেটা এই, বিবাহ বিচ্ছেদে মুক্তি সে আমার নয়, বিবাহ বন্ধন মাঝে লভিব মুক্তির স্বাদ।

এখন বিবাহ-বিচ্ছেদ না হলে পুনর্বিবাহ কী করে সম্ভব? সেটাও ছিল আল নস্করের স্বপ্ন। আমার ধারণা ছিল সরলা আমার সঙ্গে বিলেত গেলে সে দেশের আইন অনুসারে বিবাহ-বিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহ সম্ভব হত। একবার মা হবার পরে সন্তানকে ছেড়ে যাওয়াও যায় না, নিয়ে যাওয়াও যায় না। সন্তানের পিতারও একটা দাবি আছে। বলতে গেলে ওঁর নিয়তি নির্দিষ্ট হয়ে যায় গর্ভরক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। আমি তো তাঁকে সেই পরামর্শই দিয়েছিলুম।

বিলেত যাওয়ার আগে আমি তাঁর কাছ থেকে মুক্তি নিয়ে গেছলুম। মুক্তির অর্থ অন্য কোনও নারীকে ভালবাসতে ও সম্ভব হলে বিয়ে করতে। যার সঙ্গে আমার মিলন কোনওদিন হবার নয় তার জন্য আমি চিরকুমার হতে যাব কেন? আমার কোনও কোনও

বন্ধু আমাকে ভুল বুঝেছেন। কৃষ্ণের মতো আমি রাধাকে ত্যাগ করে বৃন্দাবন থেকে মথুরায় চলে গেলুম। আমরা সকলেই তখন আদর্শবাদী ছিলুম। কাজেই এটা আদর্শবাদীর মতো কাজ হয়নি। বলা যেতে পারে বাস্তববাদীর মতো কাজ। আমরা তিন সতীর্থ—দ্বিজেন্দ্রলাল মজুমদার, হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমি—১৯২৭ সালের আগস্ট মাসে বোম্বাই থেকে কাইজার-এ-হিন্দ জাহাজে যাত্রা করি।

বিলেতে গিয়ে আমি আবার প্রেমে পড়ি। কিন্তু বিবাহ সম্ভব হত না। সঙ্গতও হত না। কারণ জয়স ছিলেন বয়সে অনেক বড় তথা চিত্রশিল্পী। ভারতে এসে আমার সঙ্গে ঘর করলে অসুখী হতেন। সবাই তো আর অ্যালিস ভার্জিনিয়া নন।

অ্যালিস আমার ভারতে ফিরে আসার এক বছরের মধ্যে আমাকে দেখেন, ভালবাসেন ও বিয়ে করেন। লীলা রায় নাম নিয়ে তিনি বাঙালি বধূ হয়ে বাষট্টি বছর আমার ঘর করেন। পাঁচটি ছেলেমেয়ের মা। সরলা বা জয়স কেউই আমার জন্য এত ত্যাগ স্বীকার করতেন না। এর জন্য তাঁকে ত্যাজ্যকন্যা হতে হয়েছিল। আমি বিয়ের সময়ই তাঁকে বলেছিলুম, 'তুমি যাকে বিয়ে করছ সে একজন আই.সি.এস. অফিসার নয়, সে একজন সাহিত্যিক।' এ কথাও বলেছিলুম, 'আমাদের ছেলেমেয়েরা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান হবে না, বাঙালি হবে।' তিনি সব জেনেশুনেই আমাকে বরণ করেছিলেন।

বিলেত যাওয়ার পাথেয় সরকার বহন করবে, কিন্তু প্রথম তিন মাসের খরচ আগাম দেবে না। ভাবনায় পড়ে গেলুম, দু হাজার টাকা নিয়ে যেতে হবে। কোথায় পাব অত টাকা! বাবা, কাকা কেউ দিতে পারবেন না। সেজকাকা বলেন, 'বিয়ে করো, টাকা পাবে।' আমি বলি, 'না।' পুরীর সমুদ্রতীরে বেড়াতে বেড়াতে আলাপ হল লক্ষ্মীনারায়ণ পট্টনায়কের সঙ্গে। তিনি 'উৎকল সাহিত্যে' লিখতেন, আমিও লিখতুম। সেই সূত্রে তিনি আমাকে জানতেন। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাকে দু হাজার টাকা ধার দিতে রাজি হলেন। তার জন্য তিন হাজার টাকার ইনশিওরেন্সের পলিসি করতে হবে ও তাঁকে নমিনি করতে হবে। তাঁর চার পুত্রকন্যার ডাকঘরে সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে তিনি বাড়তি সুদে টাকা ধার দেন। পুত্রদের একজন বিজয়ানন্দ ওরফে বিজু। আর তিনি নিজে ছিলেন মুনসেফ এবং ব্রাহ্ম সংস্কারক। তাঁর স্ত্রী ছিলেন বাঙালি। পরে আমার বাবা সে টাকা রাজ্য সরকার থেকে বিনা সুদে ধার নিয়ে শোধ করে দেন। আমি বাবাকে টাকা পাঠাই বিলেত থেকে।

ইউরোপে দু বছর কাটিয়ে আমি যখন কলকাতায় আসি তখন প্রমথ চৌধুরী মশায় আমাকে ডেকে পাঠান ও আমার লেখার প্রশংসা করেন। পরে আমি শান্তিনিকেতনে যাই। সেখানেও আমাকে বলেন, আকবর বাদশার দরবারে একবার এক গুণী এসেছিলেন। দরবারে উপস্থিত ওস্তাদরা তাঁর গান শুনে এমনই খুশি হন যে নিজের নিজের মাথা থেকে পাগড়ি খুলে সামনে রাখেন এবং বলেন, এখন থেকে ইনিই গান করবেন, আমরা শুনব। চৌধুরী মশায় আমার দিকে চেয়ে বলেন, এখন থেকে তুমিই লিখবে, আমরা পড়ব।

রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'তুমি 'পথে প্রবাসে' ইংরেজিতে অনুবাদ কর না কেন?' তিনি আমার 'রাখী' সংশোধন করে দেন।

আমার জীবনে সবচেয়ে আনন্দের ঘটনা হল দুটি। একটি তো চৌধুরী মশায়ের এই স্বীকৃতি। আর একটি অ্যালিস ভার্জিনিয়ার আমাকে বিয়ে করতে সম্মতি।

আমার দেশে ফেরার কিছুদিন পরে, লীলার সঙ্গে প্রথম দর্শনের কিছুদিন পূর্বে, মাদ্রাসের ভেলোর জেল থেকে আমি একটি চিঠি পেলুম। লিখেছেন সরলাদেবী। লবণ সত্যাগ্রহে যোগ দিয়ে তিনি রাজবন্দিনী। ওড়িশায় তাঁর জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় তাঁকে মাদ্রাসে পাঠানো হয়। ভেলোর জেলে তাঁর একমাত্র সঙ্গিনী ছিলেন দুর্গাবাঈ নামে আর এক রাজবন্দিনী। আমার মনে নেই, সরলার চিঠির সঙ্গে দুর্গাবাঈ-এর চিঠি ছিল কি না। পরে ইনি হন দুর্গাবাঈ দেশমুখ। বলেন, চিঠি ছিল।

আর সরলা জেল থেকে বেরিয়ে কলকাতার ওড়িয়া শ্রমিকদের নেত্রী হন, পরে ওড়িশার আইনসভার সদস্যা। সাহিত্য ছেড়ে একেবারে চলে যান রাজনীতি মার্গে। সরকারের সঙ্গে অহিনকুল সম্পর্ক। আমি এক শিবিরে, তিনি এক শিবিরে। একজন জেলাশাসক হয়ে আমি কেমন করে তাঁকে জেলে পাঠাতুম? না তাঁর জন্য চাকরি খোয়াতুম? অথবা এমনও হতে পারত যে তিনি কংগ্রেস-মন্ত্রী হয়ে আমার উপর হুকুম জারি করতেন। আর আমি বলতুম, 'নো, মিনিস্টার।' তাঁর সঙ্গে আমার জীবনের যোগ ভগবানের ইচ্ছা নয়।

কিন্তু তাঁর সঙ্গে যোগের ফলে সম্ভব হয়েছিল কয়েকটি মনে রাখবার মতো ওড়িয়া ভাষার কবিতা, বাংলা ভাষায় 'পথে প্রবাসে' আর পরবর্তীকালে 'রত্ন ও শ্রীমতী'। বলতে পারতুম আই.সি.এস., কিন্তু বলতে পারলুম না এইজন্যে যে ইউরোপের আকর্ষণ সরলার চেয়েও বেশি ছিল। আর সে আকর্ষণ হল ইটারনাল ফেমিনিনের আকর্ষণ। ইউরোপে না গেলে আমার মনে হত, জীবন ব্যর্থ। কিন্তু আমেরিকায় যাইনি বলে আমার জীবন ব্যর্থ মনে হয় না, কারণ আমেরিকাই এসেছে আমার ঘরে ঘরণী রূপে।

সেই সতেরো বছর বয়সে যদি আমেরিকায় যাওয়া সম্ভব হত তা হলে এগারো বছর বয়সের অ্যালিস ভার্জিনিয়ার সঙ্গে আমার প্রেমও হত না, বিবাহও হত না। হয়তো আর কারও সঙ্গে প্রেম হত ও বিবাহ হত। কিন্তু লীলার মতো তিনি বাঙালি হতেন না, আমাকেই আমেরিকান করে ছাড়তেন। সেইজন্য বলি, 'বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে'।

বিয়ের পর লীলা বলে আমি তাঁর নামকরণ করি। আমার ছদ্মনাম ছিল লীলাময় রায়। আমার বাবা এই বিবাহে আপত্তি জানিয়েছিলেন। কিন্তু লীলা নামটি শুনে, লীলা মানুষটিকে দেখে, তাঁর মুখে বাংলা ভাষায় 'বাবা' ডাকটি শুনে, তাঁর কপালে সিঁদুর দেখে, পরনে শাড়ি দেখে তাঁকে আপনার মেয়ে বলে সানন্দে গ্রহণ করেন। বড় ছেলের পুণ্যশ্লোক নামটি তাঁরই দেওয়া। তিনি তার মুখে ভাত দিয়েছিলেন।

ধর্ম ভিন্ন, বর্ণ ভিন্ন, দেশ ভিন্ন, তা সত্ত্বেও লীলা আমাদের বড় বউ বলে আমাদের সকলের সমাদর পান। আমার বাবা কাকা কাকিমারা যে এত উদার হবেন তা আমি ভাবতে পারিনি। আমাদের ছেলেমেয়েরাও সকলের স্নেহের পাত্রপাত্রী। লীলা কখনও মেমসাহেবের মতো আচরণ করেননি। আই.সি.এস. অফিসারের স্ত্রী হিসেবেও না।

আগেই বলেছি, বিলেতে গিয়ে আমি আবার প্রেমে পড়ি। জয়স-এর সঙ্গে আমি ইউরোপ ভ্রমণ করেছিলুম। তিনি যখন মার্সেলেসে আমাকে জাহাজে তুলে দেন আমি তখন ভেবেছিলুম আর কখনও ইউরোপে ফেরা হবে না। কোথায় এত টাকা পাব? কিন্তু পশ্চিম জার্মান সরকারের আমন্ত্রণে ১৯৬৩ সালে যখন আমি জার্মানি যাই তখন ব্রিটিশ সরকারও আমাকে আমন্ত্রণ করেন। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে জয়স-এর সঙ্গে আবার দেখা হয়।

তেত্রিশ বছর পরে দেখা। মনে হল আমরা যেন উনিশশো-উনত্রিশ সালের সেই সুন্দর দিনগুলিতে ফিরে গেছি। সেটা কেবল দেশ-এ ফিরে যাওয়া নয়, কাল-এও ফিরে যাওয়া।

জয়স-এর সঙ্গে আমার স্বল্পকালীন প্রেম থেকে এসেছে কয়েকটি স্মরণীয় বাংলা কবিতা, একটি বাংলা গল্প ও 'বিশল্যকরণী' উপন্যাস। আমার দু বছরের ইউরোপ প্রবাস আমাকে ছয় খণ্ডে 'সত্যাসত্য' উপন্যাস লেখার উপাদান জুগিয়েছে। বইটি লেখার সময় লীলা এসে আমার জীবনসঙ্গিনী হওয়ায় আমি অনেক বিষয়ে পাশ্চাত্য সমাজ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করি। তিনি ছিলেন পাশ্চাত্য সংগীতের ছাত্রী। আমার পাল্লায় পড়ে তাঁকে তাঁর সংগীতের জীবন ত্যাগ করতে হয়েছিল। যদিও তিনি সঙ্গে করে একটি বেবি গ্রান্ড পিয়ানো নিয়ে এসেছিলেন।

'আগুন নিয়ে খেলা' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিয়ে হয়ে যায়। এর থেকে অনেকের ধারণা জন্মায় ওই কাহিনীর নায়িকা পেগীই আমার ভাবী পত্নী। বিয়ের কথাবার্তা নাকি বিলেতেই হয়েছিল। শুভকর্মটা বাকি ছিল। সেটা ঘটল আমার চাকরিতে থিতু হওয়ার পর ভারতের মাটিতে।

ইংরেজিতে বলে, 'Truth is stranger than fiction'. আমার জীবনে এটা বারবার প্রমাণিত হয়েছে। এবারেও হল।

অ্যালিস ভার্জিনিয়া ছিলেন পাশ্চাত্য সংগীতের ছাত্রী। তাঁর বাসনা ছিল পিয়ানো বাজিয়ে স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহের। তিনি উনিশশো ত্রিশ সালে গ্রীষ্মের অবকাশে নিউইয়র্ক থেকে জার্মানিতে আসেন সুপ্রসিদ্ধ Bayreuth Festival দেখতে। পথে লন্ডনে ভবানী ভট্টাচার্যের সঙ্গে আলাপ। কেন জানিনে তাঁর ইচ্ছা হল ভারতে কিছু দিন থেকে ভারতীয় রাগরাগিণী সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করতে। তিনি বোম্বাইতে এসে সুবিখ্যাত পণ্ডিত ভাতখণ্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। উনি তাঁকে পরামর্শ দেন লখনৌ যেতে। লখনৌ যাওয়ার আগে তিনি চলে আসেন কলকাতায় এবং সেখান থেকে আমাকে চিঠি লেখেন ভবানীর পরামর্শে। চিঠিখানি আমি পাই অগস্ট মাসের মাঝামাঝি। বহরমপুরে। তাঁকে আমন্ত্রণ করি আমার অতিথি হয়ে হাজারদুয়ারি পরিদর্শন করতে।

আমার ধারণা ছিল, তিনি একজন বয়স্কা মহিলা। বোধহয় বছর চল্লিশেকের। তাঁর সঙ্গে প্রথম দর্শন, যত দূর মনে পড়ে আটাশে অগস্ট। দেখলাম তিনি তার অর্ধেক বয়সী। তিন দিন পরে তিনি বিদায় নেন। তখন মনে হয়েছিল, সেটা চিরবিদায়।

অক্টোবরের গোড়ায় পুজোর ছুটিতে যখন আমি কলকাতা আসি তখন আশ্চর্য হয়ে শুনি তিনি তখনও কলকাতায়। তাঁরই অনুরোধে তাঁর সঙ্গে YMCA-তে চা খাই। বাড়ি থেকে সময়মতো টাকা না আসায় তিনি লখনৌ যেতে পারছেন না। তখন আমি তাঁকে বলি, 'আপনি কলকাতায় সময় নষ্ট করছেন কেন? আমি রাঁচি যাচ্ছি। আমার বন্ধুর বাড়িতে উঠব। আপনিও সেখানে কিছুদিন কাটাতে পারেন। রাঁচি বড় চমৎকার জায়গা।'

ভাবতেই পারিনি যে তিনি সত্যি সত্যি রাঁচিতে গিয়ে হাজির হবেন ও শরৎ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে অতিথি হবেন। সন্ধেবেলাটা কেটে গেল চাঁদের আলোয় তিন জনে একসঙ্গে বেড়িয়ে। পরের দিন ছয়ই অক্টোবর প্রত্যূষে আমরা দুজনে আবিষ্কার করি যে আমরা প্রেমে পড়েছি। আমরা কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারব না। সন্ধেবেলা শরৎ আমাদের নিয়ে যায় নদীর ধারে। সেখানে আমি সহসা ঘোষণা করি যে আমরা বিয়ে করতে

যাচ্ছি। এ কথা বলার আগে আমি ওঁর সঙ্গে পরামর্শ করিনি। বিয়ের প্রস্তাবই করিনি। সুতরাং আমার আশঙ্কা ছিল যে তিনি হয়তো প্রতিবাদ করে বলবেন, 'সে কী! গুরুজনের মত না নিয়ে কী করে বিবাহ করি? এখনও তো চব্বিশ ঘণ্টাও কাটেনি।' আমার আশঙ্কা অমূলক। ভগবান আমার মুখরক্ষা করলেন। ভার্জিনিয়া মৌন সম্মতি জানালেন। তার পরে শরৎ ও তাঁর স্ত্রী শান্তি আমাদের দুজনকেই দুটো পিঁড়িতে বসিয়ে দিয়ে বললেন, 'তোমরা বর আর কনে।' রাত্রে আমাদের ফুলশয্যার আয়োজন হল। পরের দিন স্থির হল যে আমরা ব্রাহ্মরা যে আইনে রেজিস্ট্রি করে সেই আইনে রেজিস্ট্রি করব। সময় লাগবে এক মাস। আমি আমার কর্মস্থলে ফিরে যাই। ভার্জিনিয়া থেকে যান রাঁচিতে। তাঁর আর লখনৌ যাওয়া হয় না।

বহরমপুরে ফেরার দু সপ্তাহ পরে শরতের টেলিগ্রাম : 'শিগগির এসো।' আমি বুঝতে পারিনি কেন এই টেলিগ্রাম। রাঁচি গিয়ে শুনি, ব্রাহ্ম রেজিস্ট্রার এখন ছুটিতে। তাঁর জন্য অপেক্ষা করলে বিয়ের আরও দেরি হবে। ইতিমধ্যে আমেরিকান কনসাল জেনারেল জেনে গেছেন যে ভার্জিনিয়া একজন ভারতীয়কে বিয়ে করতে যাচ্ছেন। তাঁর অনুরোধে কলকাতার পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেব ভার্জিনিয়াকে ডিপোর্ট করার জন্য তাঁকে পাকড়াও করার সুযোগ খুঁজছেন। আমি যদি ভার্জিনিয়াকে বিয়ে করতে চাই, তিন দিনের মধ্যে করতে হবে। সেটা সম্ভব খ্রিস্টান বিবাহ আইনে। আমি আঁতকে উঠি। তা হলে কি আমায় খ্রিস্টান হতে হবে? শরৎ বলে, 'না, দুজনের একজন খ্রিস্টান হলেই চলবে।'

খ্রিস্টান বিবাহের রেজিস্ট্রার ছিলেন একজন জার্মান পাদ্রি। তিনি কিছুতেই একজন হিন্দুর সঙ্গে ক্রিস্টানের বিয়ে দিতে রাজি হন না। শরৎ তখন তাঁকে শাসায় যে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারের কাছে রিপোর্ট করবে। শরৎ উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। আমিও তাই। অবশেষে পাদ্রি সাহেব রাজি হয়ে যান। রাঁচির গণ্যমান্য নাগরিকদের বিবাহসভায় আমন্ত্রণ করা হয়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী। শাড়ি ও সিঁদুর পরে ভার্জিনিয়া বাঙালির বউ হয়ে যান। তখন তাঁর নাম রাখা হয় লীলা।

যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সেটা এই যে তৎকালীন আইন অনুসারে বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্রিটিশ সাবজেক্ট বনে যান। তখন আমেরিকানরা তাঁকে ডিপোর্ট করার জন্য ইংরেজদের আর বলতে পারেন না। তবে তাঁর আমেরিকান পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করেন। মাসখানেক পরে লীলা যখন বাপ-মা সঙ্গে দেখা করার জন্য আমেরিকায় যান তখন আমি তাঁর একটা নতুন পাসপোর্ট করিয়ে দিই। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান পাসপোর্ট। সেটা পরে তাঁর খুব কাজে লেগেছিল। নতুবা তিনি আমেরিকা থেকে ফিরতেই পারতেন না। কারণ তাঁর গুরুজন এ বিবাহ সমর্থন করেন না।

মাঝখান থেকে অপূর্ণ রইল তাঁর পাশ্চাত্য সংগীত সাধনা। তাঁর নিজস্ব পিয়ানো তিনি অনেকদিন পর্যন্ত তাঁর বিবাহিত জীবনে বাজিয়েছিলেন। কিন্তু আমার সঙ্গে সঙ্গে মহকুমায় মহকুমায় জেলায় জেলায় বদলি হতে হতে রেওয়াজ করার অভ্যাসে ছেদ পড়ে যায়। পিয়ানো টিউনারও সব জায়গায় পাওয়া যায় না। তিনি ভারতীয় সংগীত চর্চাও কিছুদিন করেছিলেন—তার জন্য তাঁকে যেতে হত কলকাতায়। সেটাও সুদূর মফস্বল থেকে বেশিদিন সম্ভব হয় না। সংগীত থেকে তিনি সাহিত্যে চলে আসেন। ইন্ডিয়ান পি ই এন পত্রিকায় তাঁর রচনা মাসে মাসে প্রকাশিত হয়, সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের বিবরণ। নিজেকে তিনি

সর্বতোভাবে বাঙালি করে তুলেছিলেন।

আমারও একটা সাধ অপূর্ণ থেকে গেছে। আমি ভেবেছিলুম দেশে ফিরে এসে গ্যেটের মতো বিজ্ঞান চর্চা করব। আধুনিক মানুষ হতে হলে শুধু মানবপ্রকৃতিকে নয়, বিশ্বপ্রকৃতিকেও জানতে হবে। রবীন্দ্রনাথকেও দেখেছি দুপুরবেলা বসে 'Scientific America' পড়তে। দুপুরবেলায় আমি কিন্তু আদালতে।

পাঁচ

অসহযোগ আন্দোলনের সময় সরকারি কলেজকে বলা হত 'গোলামখানা'। কিন্তু কলেজে ভর্তি হয়ে জানতে পেলুম যে কলেজের ছাত্র মানেই জেন্টলম্যান। অধ্যাপক শ্যামচন্দ্র ত্রিপাঠী ছিলেন বিলেতফেরত। তাঁর ছাত্ররা তাঁর সঙ্গে তাঁর আবাসে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি নাকি তাদের সিগারেট অফার করতেন। কারণ তারা এক-একটি জেন্টলম্যান। হুইটলক সাহেব একদিন ক্লাস নিতে এসে ইংরেজি পাঠ্যপুস্তক না পড়িয়ে ছাত্রদের সঙ্গে হাস্যকৌতুক করতে লাগলেন। বলা যেতে পারে, ইয়ার্কি দিতে লাগলেন। আমরা সকলেই স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করতুম। অধ্যাপকদের সঙ্গে স্বাধীনভাবে কথা বলতুম।

আমাদের সংস্কৃত অধ্যাপক ছিলেন মহামহোপাধ্যায় জগন্নাথ মিশ্র। একদিন কালিদাসের 'রঘুবংশ' পড়ানোর সময় নারীজাতি সম্বন্ধে তিনি কী একটা অবজ্ঞাসূচক উক্তি করলেন। সে সময় কো-এডুকেশন ছিল না। আমি উঠে দাঁড়িয়ে নারীদের পক্ষ নিয়ে তাঁকে আমার আপত্তি জানালুম। কী বলেছিলুম ঠিক মনে নেই। তবে কথাটা এ রকম হবে, লোকে বলে সীতারাম, তার মানে সীতাই আগে রাম পরে, সীতাই বড় রাম ছোট। লোকে বলে রাধাকৃষ্ণ, তার মানে রাধা সুপিরিয়র কৃষ্ণ ইনফিরিয়র। মহামহোপাধ্যায় গম্ভীরভাবে বললেন, 'তোমার সঙ্গে কথা আছে। ক্লাসের বাইরে গিয়ে বলব।'

আমি যখন ক্লাস শেষ হওয়ার পর তাঁর পিছু পিছু ক্লাসের বাইরে গেলুম তখন তিনি আমাকে একটু আড়ালে নিয়ে গেলেন, আমার কানে কানে বললেন, 'তুমি কি জানো না, রমণের সময় পুরুষ উপরে নারী নীচে?' আমি তো বোকা ও বোবা বনে যাই। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর আমার পড়া ছিল। তাঁদের বিহার ছিল ঠিক বিপরীত। কিন্তু তিনি তো বাংলা জানতেন না। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'র খানিকটা আমার পড়া ছিল। শেষ পর্যন্ত তখনও পড়িনি। তাই তাঁকে মুখের মতো জবাব দিতে পারলুম না।

তবে লেখনীর মুখের মতো জবাব দিয়েছিলুম অধ্যাপক শচীন্দ্রলাল দাসবর্মাকে। আমাদের কলেজ ম্যাগাজিনে তিনি একটি ইংরেজি কবিতা লিখেছিলেন, 'An Anti Feminist Cry'. পরের সংখ্যায় বেরোল ইংরেজিতেই আর একটি কবিতা, 'An Anti Feminist Counter Cry'. সেটি আমার প্রথম ও শেষ ইংরেজি কবিতা। আঠারো বছর বয়সে লেখা। অধ্যাপক মশায় একেবারে চুপ।

সে বয়সে আমি ছিলুম একজন কট্টর ফেমিনিস্ট। আমার প্রথম বাংলা মুদ্রিত মৌলিক রচনাটি ছিল 'পারিবারিক নারী সমস্যা।'। কিছুদিন পরে সেটি 'ভারতী'তে ছাপা হয়। 'ভারতী'তে পরের সংখ্যায় বঙ্গনারী ছদ্মনামে অনিন্দিতাদেবী লিখলেন, আমি একজন প্রবীণ লেখক হয়ে কেমন করে ওরকম দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রবন্ধ লিখলুম। তাতে ছিল বিবাহ বিচ্ছেদের সমর্থন ও লিভিং টুগেদারের অনুমোদন। তিনি নিজেও একজন নারী প্রগতির

অগ্রদূত ছিলেন। কিন্তু মোটের উপর নরমপন্থী। আর আমি চরমপন্থী। এখন মজা হচ্ছে, পুরী গেলে আমি রোজ সমুদ্রতীরে বেড়াতে বেরিয়ে দেখতুম, তিনি হনহন করে হেঁটে যাচ্ছেন। আর আমি তাঁকে ছায়ার মতো অনুসরণ করছি। তিনি যখন এক চক্কর শেষ করে ফিরতি পথে হাঁটতেন তখন আমার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে যেতেম। আমি তাঁর ছেলে অমিয় চক্রবর্তীর চেয়ে তিন বছরের জুনিয়র। সেটা তখন জানতুম না।

কটক থেকে পাটনা কলেজে বি.এ. পড়তে গিয়ে শুনলুম যে অমিয় চক্রবর্তী হাজারিবাগ সেন্ট কলাম্বাস কলেজ থেকে ইংরেজি অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে পাশ করে এক বছর আগে বেরিয়ে গেছেন। দেশ-বিদেশের তাবড় তাবড় মনীষীদের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ। অমিয় চক্রবর্তীকে আমি পরবর্তী কালে শান্তিনিকেতনে প্রথম দেখি ও আরও পরে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হয়। তার থেকে আসে আমাদের আজীবন বন্ধুতা। অথচ তাঁর মা আমাকে চিনতেন না। কিন্তু আমার কাকিমাকে চিনতেন। স্বাস্থ্যের কারণে তিনি পুরীতেই বাড়ি ভাড়া করে সারা বছর কাটাতেন। আর তাঁর স্বামী থাকতেন অসমের গৌরীপুরে। বিশের দশকের গোড়ার দিকে আর কোনও মহিলাকে আমি জুতো পায়ে মাথায় ঘোমটা না দিয়ে চলাফেরা করতে দেখিনি। সেকালের পক্ষে হিন্দু সমাজের নারী হয়ে তিনি অনেক বেশি স্বাধীন ছিলেন। আমি তাঁর সুদীর্ঘ সমালোচনার একটা প্রত্যুত্তর লিখেছিলুম। 'ভারতী' সেটা প্রকাশ করেননি।

যতদূর মনে পড়ছে আমার প্রথম ওড়িয়া প্রবন্ধটি ছিল 'নরচক্ষুরে নারী'। 'উৎকল সাহিত্য' সেটি সাদরে গ্রহণ করে। ইবসেনের নাটক প্রসঙ্গে 'খেলাঘর' নামে আর একটি প্রবন্ধ লিখি। সেটাও 'উৎকল সাহিত্য'-এর সম্পাদক পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করেন। সম্পাদক বিশ্বনাথ কর মহাশয় ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম নেতা, তাঁর দুই কন্যা গ্র্যাজুয়েট, তৃতীয় কন্যাও সুশিক্ষিতা। নর্মদা কর টলস্টয়ের উপকথার ওড়িয়া অনুবাদ 'উৎকল সাহিত্য'-এ মাঝে মাঝে প্রকাশ করতেন। 'সবুজ দল'-এর পাল্লায় পড়ে সুপ্রভা কর ও প্রতিভা করও 'বাসন্তী' উপন্যাসে অংশগ্রহণ করেন। এই পরিবারটির সঙ্গে আমার পরবর্তীকালে অন্তরঙ্গ পরিচয় হয়েছিল। আমি যখন বিলেত থেকে ফিরে এসে 'সত্যাসত্য' উপন্যাসটি লিখতে আরম্ভ করি সেই সময় বিশ্বনাথবাবুর শিশু দৌহিত্র দিলীপকুমার বিশ্বাসকে প্রথম দেখি। তাঁর ডাকনাম ছিল বাদল। নামটি আমার এত ভাল লেগে যায় যে 'সত্যাসত্যে'র যুগ্ম নায়কের একজনের নাম রাখি বাদল।

ছয়

অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিতে পারিনি বলে আমার মনে খেদ ছিল। আমার সহপাঠী বন্ধু শরতেরও। কটক শহরের স্বরাজ আশ্রমে মাঝে মাঝে যেতুম। খদ্দর কিনতুম ও পরতুম। ডাকঘরে হানা দিয়ে 'সার্ভেন্ট' পত্রিকা আসার সঙ্গে সঙ্গে হকারের কাছ থেকে এক আনা পয়সা দিয়ে কিনতুম। সে এক মারামারি কাণ্ড। সবাই কিনতে চায়। কিন্তু কপি খুব বেশি আসে না।

একদিন স্বরাজ আশ্রমে গিয়ে দেখি বাইরে থেকে পাঁচ জন সর্বভারতীয় নেতা এসেছেন। মোতিলাল নেহরু ও রাজগোপালাচারী তাঁদের মধ্যে ছিলেন। অন্যান্যদের নাম মনে পড়ছে না। তাঁদের মধ্যে এক জন মুসলমান। তাঁরা অনুসন্ধান করতে বেরিয়েছেন, দেশ

গণ সত্যাগ্রহের জন্য প্রস্তুত কি না। লোকে খুব চায়, গণ সত্যাগ্রহ আরম্ভ হোক। তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু নেতারা বলেন, আগে তো অনুসন্ধান শেষ হোক। তাঁরা রিপোর্ট দেবেন যে দেশ তৈরি কি না।

আমরা অধীর হয়ে অপেক্ষা করি।

এমন সময় চৌরিচৌরাতে একটা নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটে যায়। গান্ধীজি ঘোষণা করলেন, তিনি গণ সত্যাগ্রহ আপাতত আরম্ভ করবেন না।

আমি চেয়েছিলুম, ছোটকাকার ভার লাঘব করার জন্য আই.এ. পরীক্ষায় ওড়িশা বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করতে এবং কুড়ি টাকা স্কলারশিপ পেতে। কিন্তু হয়ে গেলুম বিহার-ওড়িশা প্রদেশে প্রথম ও পেলুম পঁচিশ টাকা স্কলারশিপ। সেবার দু জন দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। শরৎ তাদের মধ্যে এক জন। আমরা দুজনে স্থির করলুম যে, পাটনা কলেজে গিয়ে বি.এ. পড়ব। শরৎ নেবে ইকনমিকসে অনার্স আর আমি ইতিহাসে। যদুনাথ সরকারের সাক্ষাৎ শিষ্য হব।

পাটনায় গিয়ে ইতিহাসের কোর্স দেখে মনে হল, প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেতে হলে অসম্ভব খাটতে হবে। তার চেয়ে কম খেটে ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণী পেতে পারি। ইংরেজি অনার্সে আমার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী কৃপানাথ মিশ্র। তার সঙ্গে আলাপ করে বুঝতে পারি, সে কোনওমতেই আমাকে হারাতে পারবে না। সে-ও সেটা মেনে নেয়। ফলে আমরা হয়ে উঠি পরস্পরের বন্ধু। কৃপানাথ ছিল মৈথিল ব্রাহ্মণ। বাড়ি ভাগলপুর। খুব ভাল বাংলা বলত। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে বেশ পরিচিতি ছিল। আমরা বাংলাতেই কথাবার্তা বলতুম। বি.এ.-তে আমি প্রথম শ্রেণীর অনার্স পাই, কৃপানাথ পায় দ্বিতীয় শ্রেণীর। তখন আমরা দুজনে এম.এ. পড়ি।

সে সময় আমার জীবনে ছিল দুটি প্রধান আনন্দ : ইউরোপের ইতিহাস পাঠ ও গঙ্গায় নিত্য সন্তরণ। দুই অর্থে আমি মানস সরোবরের হংস।

সে সময় আমি জীবনে দুটি বড় বড় সিদ্ধান্ত নিই। একমাত্র বাংলা ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টি ও জীবিকার জন্য ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস প্রতিযোগিতায় যোগদান। দ্বিতীয়টির জন্য আমার অন্তরে বরাবরই একটা বাধা ছিল, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নবদা মিনুদির মতো যারা ঝাঁপ দেবে আমি কিনা তাদেরই জেলে পুরব? দু বছর বাদে সফল হয়ে যখন বিলেত যাই, সংকল্প নিই যে চাকরিতে আমি পাঁচ বছরের বেশি থাকব না। সরকার হুকুম দিলে কোনও dirty work করব না। তৎক্ষণাৎ পদত্যাগ করব।

আমি যখন আই.সি.এস. পরীক্ষায় প্রথম হয়ে বিলেত যাওযার জন্য তৈরি হচ্ছি তখন এই কৃপানাথই আমাকে লিখে জানায় যে কলকাতা থেকে 'বিচিত্রা' নামে একটি নতুন পত্রিকা বার হচ্ছে। সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ভাগলপুরের অধিবাসী ও কৃপানাথের প্রতিবেশী। যদি আমি তাঁকে একটি লেখা পাঠাই তবে তিনি প্রকাশ করতে পারেন। তখন আমি 'রক্তকরবী'র প্রধান তিন চরিত্র নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখি। সেটি 'বিচিত্রা'র দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। কৃপানাথ লেখে, সম্পাদক আরও লেখা চান। তখন আমি লিখি, বিলেত থেকে আমি ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনী পাঠাব, যদি তিনি রাজি হন। কৃপানাথ লেখে, তিনি রাজি। এইভাবে আরম্ভ হয় 'পথে প্রবাসে'। মাসে মাসে কিস্তিতে কিস্তিতে প্রকাশিত হয়।

জানি না আমার লেখা সুইটজারল্যান্ডে আমার প্রিয় লেখক মণীন্দ্রলাল বসুর কাছে পৌঁছেছিল কি না। বিলেত থেকে তাঁকে একটা চিঠি লিখে আমার পরিচয় দিতেই তিনি আমাকে সুইটজারল্যান্ডে ছুটি কাটাতে বলেন। সেইখানেই মণিদার সঙ্গে প্রথম পরিচয় ও চিরস্থায়ী বন্ধুতা।

ইতিমধ্যে পাটনা কলেজে আমার দু বছরের জুনিয়র ভবানী ভট্টাচার্যের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। পরিচয় থেকে বন্ধুতা। আই.সি.এস. প্রার্থীদের জন্য একটা মেডিক্যাল এগজামিনেশন হত রাঁচিতে। দ্বিতীয়বার সেখানে গিয়ে আমি ভবানীর বাবার বাড়ি উঠি। তিনি ছিলেন সেখানকার মুনসেফ। কৃপানাথ আর ভবানী এরাও ছিল পরস্পরের বন্ধু। আমাদের আর এক বন্ধু ছিল ফজলুর রহমান। ভবানীর মতো সেও ইংরেজি সাহিত্যে ওয়াকিবহাল। আমার বিলেতের দ্বিতীয় বৎসরে কৃপানাথ, ভবানী আর ফজলুর রহমান তিনজনেই গিয়ে বিলেতে উপস্থিত। ভবানীর সঙ্গেও আমার সম্পর্ক আরও নিবিড় হয় যখন আমরা দুজনে বাসে চড়ে অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়ে পড়ি। আগে থেকে জানতুম না কোথায় যাচ্ছি, কোথায় রাত কাটাব, কতদূর যাব। বাস বদল করতে করতে নানান জায়গায় রাত কাটাতে কাটাতে আমরা গিয়ে পৌঁছলুম ওয়েলসের পশ্চিম প্রান্তে। আমাদের এই ভ্রমণকে অবলম্বন করে আমি পরে লিখি 'আগুন নিয়ে খেলা'। সেই কাহিনীর নায়িকা পেগী আর কেউ নয়, আমার স্নেহের পাত্র ভবানী।

ভবানী আমার জন্য পরে যা করেছিল তা আর কেউ করেনি। আমার বিলেত থেকে চলে আসার পর সে থেকে যায়। আরও পড়াশোনা করে। এক দিন ব্রিটিশ মিউজিয়াম রিডিং রুমে তার সঙ্গে আলাপ হয়ে যায় এক মার্কিন তরুণীর। তিনি জানতে চান ভারতবর্ষে গিয়ে কার কার সঙ্গে আলাপ করবেন। ভবানী তাকে আমার নাম-ঠিকানা দেয়। তত দিনে আমি বহরমপুরে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট। সদ্য পরিচিত গোপালদাস মজুমদারের অনুরোধে 'আগুন নিয়ে খেলা' লিখছি।

এমন সময় কলকাতা থেকে সেই মার্কিন কন্যার চিঠি পাই। তিনি লিখলেন, ভবানীর কাছে আমার নাম-ঠিকানা পেয়েছেন। দেখা যাচ্ছে, আমাদের দু জনের অজান্তে ভবানীই হয়েছিল আমাদের বিয়ের ঘটক।

গোপালদাসবাবুরও এতে একটা ভূমিকা আছে। তিনি বরাত না দিলে 'আগুন নিয়ে খেলা' লেখা হত না। বইখানি তিনি রাতারাতি বের করে দেন। আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি শুনে তিনি আমাকে সংস্করণ বাবদ আড়াইশো টাকা দেন। তাই দিয়ে বিয়ের জন্য দু জনের দুখানি আংটি ও কনের জন্য একখানি শাড়ি কেনা হয়। আমার আংটি এখনও আমার আঙুলে আছে।

আমার আর্থিক অবস্থা তখন অত্যন্ত করুণ ছিল। সাড়ে চারশো টাকার থেকে দেড়শো টাকা পাঠাতুম ছোট ভাইকে জার্মানিতে। আর দেড়শো টাকা কাটিয়ে দিতুম সরকারের কাছে নেওয়া ঋণ হিসেবে। ঋণ করেছিলুম জয়স-এর সঙ্গে ইউরোপ ভ্রমণের সময় ভারতে প্রত্যাবর্তনের মুখে। দেশে ফিরে আসার পর 'বিচিত্রা' সম্পাদকের সঙ্গে যখন দেখা করতে যাই তখন তিনি বলেন, 'এবার তুমি উপন্যাস লেখো।' তাঁর এই আগ্রহ দেখে 'সত্যাসত্য' শুরু করে দিই। কিন্তু পাঁচ খণ্ডে সমাপ্য সেই উপন্যাস পুস্তক আকারে প্রকাশ করবে কে? তখনকার দিনে দুই খণ্ডের উপন্যাসও কোনও প্রকাশক গ্রহণ করতে রাজি হতেন না। আর

আমার এটা তো সাধারণ লঘুপাঠ্য উপন্যাস নয়। মননশীল গুরুপাক উপন্যাস। আশ্চর্যের বিষয় গোপালদাসবাবু প্রস্তাবমাত্র রাজি হয়ে যান। আমি তাঁকে ভয় দেখাই যে, আপনার লোকসান হবে। কিন্তু আমার উপর তাঁর ছিল অগাধ বিশ্বাস। একদিন না একদিন আমার বইয়ের আদর হবে ও তাঁর টাকা উঠে আসবে। বারো বছর ধরে তিনি আমাকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। এটা যে সম্ভব হল এর মূলেও ছিল 'আগুন নিয়ে খেলা'র সাফল্য। আর তার মূলে ছিল ভবানীর সাহচর্য। ভবানীকে আমি 'সত্যাসত্য'-এর প্রথম খণ্ড 'যার যেথা দেশ' উৎসর্গ করি। তার আগে মণীন্দ্রলাল বসুকে 'আগুন নিয়ে খেলা'।

সাত

আগেই বলেছি আমার প্রিয় লেখক মণীন্দ্রলাল বসুকে আমি বিলেতে গিয়ে চিঠি লিখেছিলুম। আমার চিঠির উত্তরে তিনি আমাকে বড়দিনের সময় সুইটজারল্যান্ডে যেতে লিখেছিলেন। রম্যা রলাঁ ছিলেন কাছেই একটা গ্রামে। একদিন আমরা দুজনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে চা খাই। ফিরতি পথে আমি প্যারিসে কিছুদিন থেকে লুভর মিউজিয়ামে যাই। ভিনাস ডি মাইলো মূর্তি দেখে জীবন সার্থক করি। শেষের দিকটা অবশ্য মণিদার সঙ্গে নয়। একাকী। প্যারিসে কয়েকজন বন্ধু জুটে যায়। একটা রুশ রেস্টোর‍্যান্টে আমরা খেতুম। সেই রুশরা কমিউনিস্ট শাসন থেকে শরণার্থী। প্যারিস ইউরোপের সাংস্কৃতিক রাজধানী। সেখানে বেশি দিন থাকতে হলে ফরাসি ভাষাটা ভাল করে জানা দরকার। ফরাসি শিক্ষার সুযোগ আমার ছাত্রজীবনে হয়নি, পরবর্তী কালেও সময় পাইনি।

রম্যা রলাঁকে আমি মণিদার মুখ দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, আর্ট কি মানুষের প্রতিদিনের খোরাক হওয়ার পক্ষে খুব বেশি ভাল? তিনি যে উত্তর দেন তার মর্ম, অতি সাধারণ কারিগরও নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রী বানাত সুন্দর রূপে রেনেসাঁসের যুগে। সেটাই একালের আর্টিস্টদের আদর্শ হওয়া উচিত।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর উত্তর মেলাতে না পেরে আমি নিজের জন্য মধ্য পথ বার করি। আমি পাঠকদের দিকে অর্ধেক পথ যাব, পাঠকরা আমার দিকে অর্ধেক পথ আসবে।

রম্যা রলাঁ ফরাসিতেই লিখতেন। তাঁর সঙ্গে আমার যোগ কটক কলেজে পড়ার সময় তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'জাঁ ক্রিস্তফ' বা 'জন ক্রিস্টোফার' ইংরেজিতে পাঠ করে। পরে পাটনায় গিয়ে প্রবন্ধ লিখে সে বই পুরস্কার পাই। নায়ক জন ক্রিস্টোফারের মতো আমিও আপসহীন হতে চাই। জীবনে হতে পারিনি, সাহিত্যে হয়েছি। আমি যে বৃহৎ উপন্যাস লেখায় হাত দিই এটার মূলেও রম্যা রলাঁর অনুসরণ। রবীন্দ্রনাথ টলস্টয় ও গান্ধীর পরেই আমার জীবনে রলাঁর প্রভাব।

তবে সাহিত্যের উপর প্রভাব আরও একজনের। তিনি প্রমথ চৌধুরী। আমি যদি 'সবুজপত্র' না পড়তুম তবে কলেজে গিয়ে 'সবুজ দল' গঠন করতে পারতুম না, ওড়িয়া সাহিত্যেও 'সবুজ যুগ' বলে একটি অধ্যায় চিহ্নিত হত না, 'বাসন্তী' উপন্যাস লেখা হত না, সরলার সঙ্গে পরিচয় হত না। এইখানে বলে রাখি যে, সেই উপন্যাসে উনত্রিশটি পরিচ্ছেদ ছিল, তার মধ্যে নটিই একা সরলার। চারটির বেশি আর কেউ লিখতে পারেননি। আমি তো মাত্র তিনটি।

গ্রীষ্ম অবকাশে মণিদা ও আমি ইউরোপ ঘুরে বেড়াই। আমি ভেবেছিলুম যে, পনেরো

দিনের সফরে জাহাজে চড়ে আমেরিকায় যাব ও রেলপথে শিকাগো পর্যন্ত। একটা ট্র্যাভেল এজেন্সি থেকে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। কিন্তু মণিদা লেখেন, ওই টাকায় ইউরোপের অনেকখানি দেখা যায়। এবং সেটা আরও চিত্তাকর্ষক। শুধু তো দৃশ্য দেখব না, দেখব থিয়েটার অপেরা মিউজিয়াম ক্যাথিড্রাল রাজপ্রাসাদ ইত্যাদি।

আমাদের যাত্রা শুরু হল কোলোন ক্যাথিড্রাল দর্শন করে রাইন নদীর উপর দিয়ে স্টিমারে চড়ে দক্ষিণ মুখে। মনে পড়ছিল বায়রন-এর 'চাইল্ড হ্যারল্ড'স পিলগ্রিমেজ'। তারপর আবার চললুম পুব মুখে। পথে আমি হাইডেলবার্গ-এ সেই বিখ্যাত গানের অনুসরণে হৃদয় হারালুম। তারপরে আমরা গেলুম মিউনিকে। সেখানে দেখা হল বিয়ার হল। জার্মানরা এক-একটা বিরাট মগ নিয়ে বিয়ার পান করছেন। এই সেই বিয়ার হল যা পরে নাৎসিদের আস্তানা হয়। তখনও তাদের নামডাক হয়নি। ভাল কথা, পথে আমরা দেখি Wandervogel (ভানডেরফোগেল) বা উড়ো পাখির ঝাঁক—যে-সব তরুণ-তরুণী পথে বেরিয়ে পড়েছে রুকস্যাক কাঁধে নিয়ে মুক্তির নেশায়। মিউনিকে আমরা কয়েকদিন থাকি। তারপরে যাই ভিয়েনায়। মধ্য ইউরোপের সবচেয়ে বনেদি নগর। তখন সোশ্যালিস্টদের শাসনে। চারদিকে আংটির মতো রাস্তা রিং ঘুরে দেখা গেল ড্যানিয়ুব নদী আর রোম্যান্টিক 'ব্লু ড্যানিউব' নয়। তারপরে গেলুম বুডাপেস্টে। হাঙ্গেরিয়ান গুলাশ খেয়ে তৃপ্ত হই। গুলাশ রান্নাটা প্রাচ্যদেশীয় মনে হল। ভিয়েনার শ্নিৎজারের মতো পাশ্চাত্য নয়। বলা যেতে পারে ভিয়েনার পরেই প্রাচ্যদেশ আরম্ভ হয়ে গেল।

বুডাপেস্ট থেকে আমরা পেছন ফিরি। ফিরতি পথে অস্ট্রিয়ার টিরোল। আমাকে সবচেয়ে মুগ্ধ করেছিল এই অঞ্চল। যার কেন্দ্রস্থল ইনসব্রুক। মণিদা সুইটজারল্যান্ডে নেমে যান। আমি জার্মানি ও বেলজিয়াম হয়ে ইংলন্ডে ফিরি।

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমি তখন থাকতুম লন্ডনের বেলসাইজ পার্ক পাড়ায়। অধ্যাপক সরোজকুমার দাস ও শ্রীমতী তটিনী দাসের সঙ্গে একান্নে। কিন্তু আলাদা ফ্ল্যাটে। খাবার ঘরে হিরণ্ময়কে বলি, 'জার্মানরা এখন আর যিশুখ্রিস্টকে মানে না।' একাধারে বসে ছিলেন কুমারী নীরজবাসিনী সোম। খেয়াল ছিল না যে তিনি খ্রিস্টান। তিনি আমার কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, 'আপনি ভুল করছেন। জার্মানরা এখনও যিশুখ্রিস্টকে খুব মানে।' পাঁচ বছর বাদে হিটলারের দাপট দেখে তিনি কী বলতেন জানিনে। কারণ হিটলার সম্পূর্ণভাবে খ্রিস্টপূর্ব যুগের নর্ডিক ঐতিহ্য ফিরিয়ে এনেছিলেন। সিগফ্রিড ছিলেন নর্ডিকদের আদর্শ বীর। ভাগনার তাঁকে নায়ক করে অপেরা রচনা করেছিলেন। জার্মানদের মধ্যে একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছিল। তাদের মতে তাদের গৌরবময় যুগ ছিল খ্রিস্টপূর্ব আর্যযুগ। তারা আগে আর্য পরে খ্রিস্টান।

অথচ জার্মানরাই বলত যে তাদের সাম্রাজ্য ছিল হোলি রোমান এমপায়ার। যার মূল প্রেরণা ছিল খ্রিস্টধর্ম। আধুনিক জার্মান এমপায়ারকেও তারা সেইরকমের একটা এমপায়ারে পরিণত করতে চাইত। কিন্তু খ্রিস্টীয় প্রেরণাকে বাদ দিয়ে। খ্রিস্টধর্ম নাকি দুর্বলের ধর্ম। নীৎসে ছিলেন সে ধারণার প্রবক্তা। তিনিও হিটলারের পরম গুরু। খ্রিস্টকে বাদ দেওয়ার আরও একটা কারণ ছিল। যিশুখ্রিস্ট ছিলেন ইহুদি বংশীয়। আর ইহুদিরা নাকি আর্যদের জাতশত্রু।

লন্ডনে যেদিন প্রথমবার পদার্পণ করি সেদিন উঠি ক্রমওয়েল রোডের ভারতীয়

ছাত্রাবাসে। অধ্যক্ষের নাম এ. ডি. ব্যানার্জি। খ্রিস্টান। তিনি আমাকে বলেন, 'দেখবে, ইংরেজরা একটি সদাশয় জাতি।' আমার অভিলাষ ছিল কোনও ইংরেজ পরিবারে পেয়িংগেস্ট হবার। কিন্তু আমার পাটনার বন্ধু দিলীপকুমার গুপ্ত আমাকে ও আমার সতীর্থ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাকড়াও করে নিয়ে যায় তার দিদি তটিনী দাসের আস্তানায়। আমি ইংরেজ পরিবারে না থেকে বাঙালি পরিবারে থাকি। পেয়িং গেস্ট হিসাবে না, শরিক হিসাবে। ল্যান্ডলেডি ইংরেজ মহিলা। চিরকুমারী। Lord Milner তাঁর আত্মীয়। তাঁর নামের মধ্যপদ Milner.

প্রথম বছরটা আমি হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দাসেদের ওখানেই ছিলুম। বাঙালি মতে রান্না করতেন তটিনীদি। তাঁদের ওখানে অতিথি হতেন যিনিই দেশ থেকে আসতেন। বিশেষত ব্রাহ্ম পুরুষ ও মহিলারা। আমরা বাংলাদেশকে পেতুম, ব্রাহ্মসমাজকেও। অতুলপ্রসাদ সেনের বোন কিরণ বোস অতুলপ্রসাদের গান গেয়ে শোনাতেন। কিরণদি ও তটিনিদের সঙ্গে আমার ও পরে লীলার সম্পর্ক চিরস্থায়ী হয়েছিল। তটিনীদিকে আমি দিদিবউদি বলতুম কারণ তাঁর স্বামীকে বলতুম সরোজদা। একবার সরোজদা আমাকে তাঁর কার্ড দিয়ে বললেন, 'তোমার বউদিকে নিয়ে তুমি সরোজিনী নাইডুর সংবর্ধনায় যাও। আমার সময় নেই।' পিনোলি রেস্টোর‍্যান্টের ভোজের টেবলে আমার পরিচিত ছিল মিস্টার দাস। আমার পাশে বসেছিলেন স্টেটসম্যানের প্রাক্তন সম্পাদক মিস্টার র‍্যাটক্লিফ। তিনি একবার আমার দিকে তাকান, একবার মিসেস দাসের। প্রায় দশ বৎসরের তফাত।

সরোজদার পরামর্শে আমি ব্রিটিশ মিউজিয়ামের রিডিংরুমের কার্ড সংগ্রহ করেছিলুম। মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে একসঙ্গে আট-দশ খানা বই আনিয়ে নিয়ে নাড়াচাড়া করতুম। বসার জন্য আলাদা টেবল-চেয়ার ছিল। টেবলের উপর ছিল টেবল ল্যাম্প। লন্ডনে দিনের বেলায়ও আলো জ্বালতে হত। সেই রিডিংরুমে একদা আমার পূর্বসূরি ছিলেন মার্কস ও লেনিন। রিডিংরুমের সংলগ্ন একটি গুপ্তকক্ষ ছিল। সেখানে থাকত যাবতীয় নিষিদ্ধ গ্রন্থ। যেমন অশ্লীল বই বা বৈপ্লবিক সন্দর্ভ। একবার আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সেই গুপ্তকক্ষে। সেখানে পড়ি রোজা লুকসেমবুর্গের লেখা একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ যাকে নিষিদ্ধ করা ছিল হাস্যকর। তাতে এমন কিছু ছিল না যে টেমস নদীতে আগুন ধরিয়ে দিতে পারত। না, আমি সুযোগ পেয়েও 'লজ্জৎউন্নেসা' পড়িনি।

আট

লন্ডনে আমার পরিচয় ছিল একজন ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস শিক্ষানবিশ। বিভিন্ন বিষয়ে লেকচার শোনার জন্য আমাকে যেতে হত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে। ইউনিভার্সিটি কলেজ, কিংস কলেজ, লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স, লন্ডন স্কুল ফর ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ। তার সঙ্গে যেতে হত মামলা শুনতে নিম্ন আদালতে, পরে উচ্চ আদালতে। ঘোড়ায় চড়ায় পরীক্ষা ছিল আবশ্যিক। সেজন্য আমাকে যেতে হত লন্ডনের বাইরে উলউইচে ঘোড়ায় চড়া শিখতে। এক-একটা ঘোড়ার পিঠ আমার মাথা-উঁচু। রেকাবে পা রেখে জিনে উঠে বসা আর লাগাম হাতে নিয়ে ট্রট করা বা গ্যালপ করা বা ক্যান্টার করা ছিল এমনিতেই কষ্টকর। লাগাম ছেড়ে দিয়ে ও-সব করা হত আরও বিপজ্জনক। কিন্তু ওটা আই সি এসদের পক্ষে অপরিহার্য।

অক্সফোর্ডেও আমার জন্য ক্রাইস্ট চার্চ কলেজে জায়গা সংরক্ষিত ছিল। কিন্তু আমি

লন্ডনই বেছে নিয়েছিলুম। কারণ লন্ডন ছিল একজন সাহিত্যিকের পক্ষে অনেক বেশি অভিজ্ঞতার আকর।

লন্ডনে পৌঁছেই খবর পাই, আনা পাভলোভা আসছেন রাশিয়ান ব্যালে দেখাতে। ভাগ্যক্রমে একটি খবরের কাগজের স্টলে একটি টিকিট পাওয়া গেল। আমিই বোধহয় শেষ খরিদ্দার। পাভলোভার ব্যালে দেখে আমি মুগ্ধ। ইচ্ছে করল দ্বিতীয় বার দেখতে। কিন্তু আর টিকিট পাওয়া যায় না। এর কিছুদিন পরে এলেন বিশ্ববিখ্যাত পিয়ানোবাদক পাডোরেভস্কি। তিনি স্বাধীন পোল্যান্ডের প্রথম রাষ্ট্রপতি ছিলেন। তাঁর পিয়ানো-বাদন শুনে আমি অভিভূত। পরে এক সময় এলেন ক্রাইজলার। তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ বেহালাবাদক। সে এক স্বর্গীয় অনুভূতি। তারপর এক সময় এলেন রুশ দেশের স্বনামধন্য গায়ক শালিয়াপিন। সে কী দরাজ কণ্ঠস্বর। ছাদ ফাটিয়ে গান করলেন রুশ ভাষায় লোকসংগীত ভলগা বোটম্যান। তেমন গান আমি জীবনে শুনিনি। দেশে ফিরে আসার সময় সেই গানের রেকর্ড কিনে এনেছিলুম। সেটা আর নেই। পরে এক সময় এল রাশিয়ান থিয়েটার গ্রুপ। নাটকটার নাম ঠিক মনে পড়ছে না। ওই গ্রুপটির মধ্যে ছিলেন এক বিখ্যাত অভিনেত্রী। তাঁরও নাম আমার মনে নেই। বোধহয় নাজিমোভা। পরে এক সময় আসেন ফরাসি নাটক নিয়ে প্রসিদ্ধ অভিনেতা সাশা গিত্রি ও তাঁর সম্প্রদায়। এ ছাড়া ইংরেজি থিয়েটার তো মাঝে মাঝেই দেখেছি। কনসার্ট হলেও সুযোগ পেলেই যেতুম। আর্ট গ্যালারিতেও। অক্সফোর্ডে থাকলে এই সব বিচিত্র অভিজ্ঞতা হত না। সুতরাং 'পথে প্রবাসে'ও হত না।

তখনকার দিনে ইংরেজি থিয়েটারের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী ছিলেন দু জন। ইডিথ ইভান্স ও সিবিল থর্নডাইক। ইডিথ ইভান্সকে দেখি 'লেডি অব দ্য ল্যাম্প' নাটকে। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের ভূমিকায়। আর সিবিল থর্নডাইক যে নাটকে অভিনয় করেছিলেন সেটা রঙ্গমঞ্চে আমি দেখতে পাইনি, দেখেছি সিনেমার রুপালি পর্দায়। নাটকটির নাম কিছুতে মনে পড়ছে না। ছবিটার নায়িকার নাম নার্স ক্যাভেল। সিবিল থর্নডাইক নেমেছিলেন সেই ভূমিকায়। বেলজিয়ামের যুদ্ধক্ষেত্রের হাসপাতাল থেকে নার্স ক্যাভেল দয়াপরবশ হয়ে কয়েকজন ব্রিটিশ বন্দিকে হাসপাতাল থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলেন। সেই অপরাধে জার্মান সেনা তাঁকে গুলি করে হত্যা করে। তিনি খুব শান্তমনে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুকালীন উক্তি : 'প্যাট্রিয়টিজম ইজ নট এনাফ।' তখন থেকে তিনি হয়ে গিয়েছিলেন কিংবদন্তীর চরিত্র।

ইডিথ ইভান্স ও সিবিল থর্নডাইক দু জনে দুটি মহিমাময়ী নারীর ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করেন দেখে এই দুই অভিনেত্রীর উপরে বিশেষ শ্রদ্ধা হয়। সিবিল থর্নডাইককে আমি পরে কলকাতায় দেখেছি। সঙ্গে তাঁর স্বামী স্যার লুইস ক্যাশন। সিবিল থর্নডাইক কী যেন আবৃত্তি করে শোনালেন। অতি উৎকৃষ্ট তাঁর ইংরেজি উচ্চারণ। মনে হল উচ্চশ্রেণীর মহিলা। সাধারণ ব্যক্তি নন।

এখানে বলে রাখি জয়স-এর ইংরিজি উচ্চারণও ছিল তেমনই উৎকৃষ্ট।

লন্ডনে থাকতে জয়স একদিন আমাকে মিস ক্যাথারিন মার্শালের কাছে নিয়ে যান। তিনি যেমন প্রভাবশালী তেমনই ভারতপ্রেমী। বলেন, 'ভারতের স্বরাজ তো হয়েই রয়েছে। শুধু দুটি প্রশ্নের উত্তর তার আগে জানাতে হবে। এক, মুসলমানদের পোজিশন কী হবে? দুই, দেশীয় রাজন্যদের ভাগ্যে কী আছে।' আমি বললুম, 'মুসলমানরা সংখ্যায় এক

চতুর্থাংশ। আমরা ওদের এক তৃতীয়াংশ দেব। কিন্তু রাজন্যরা যদি ক্ষমতা ছেড়ে না দেন তা হলে তাঁদের বিদায় দেব।' তিনি ত্রস্ত হয়ে বলেন, 'না, না, ওঁদের এমন মিষ্টি করে বোঝাতে হবে যে ওঁরা আপনা থেকে প্রজাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবেন।'

নয়

সরোজদা তাঁর দার্শনিক গবেষণা সমাপ্ত করে এক বছর বাদে সপরিবারে দেশে ফিরে যান। তখন আমরা দুই বন্ধু ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র যাই। ভাগ্যক্রমে আমি পেয়ে গেলুম বেলসাইজ পার্কেই একটি বোর্ডিং হাউসে একখানি ঘর। মালিক একজন ইংরেজ মহিলা। সেখানে আমার কোনও অসুবিধা ছিল না। ইউরোপীয় খাদ্য আমি আর সকলের সঙ্গে মিলেমিশে খেতুম। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন ইউরোপীয় মহিলা ও পুরুষ। স্টালিনের স্বদেশবাসী একজন জর্জিয়ানকেও সেখানে পেলুম। তিনি ছিলেন ঘোর কমিউনিস্ট বিদ্বেষী।

কিন্তু বোর্ডিং হাউসের খরচ আমার পক্ষে একটু বেশি ছিল। তা ছাড়া আমি চেয়েছিলুম একটু নিরালা। ইতিমধ্যে আমার আলাপ হয়েছিল লেডি টারিঙ-এর কন্যা জয়স-এর সঙ্গে। তিনি ছিলেন ফ্রেন্ডস অব লিগ অব নেশন্সের স্থানীয় শাখার সঙ্গে যুক্ত। সেই শাখার প্রীতি সম্মেলন উপলক্ষে ভারতীয় ছাত্রদের কয়েকজনকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। আমিও তাঁদের একজন। সেই সূত্রে জয়স-এর সঙ্গে প্রথম দেখা। তাঁর অনুরোধে আমি আবার তাঁর বাড়ি যাই। ভারত সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও কৌতূহল ছিল। বর্ণবিদ্বেষের নামগন্ধ ছিল না। অভিজাত পরিবার। বিধবা মায়ের সঙ্গে বাস করতেন। ছবি আঁকতেন। পিয়ানো বাজাতেন। বহু লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাঁদের ওখানে গেলে অনেক ইংরেজ জার্মান অস্ট্রিয়ান প্রভৃতির সঙ্গে সাক্ষাৎ হত।

জয়স চেষ্টা করছিলেন প্রথম মহাযুদ্ধকালে যাঁরা শত্রু ছিলেন সেই জার্মান অস্ট্রিয়ান প্রভৃতির সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করতে। তাঁর বান্ধবীরা 'নো মোর ওয়ার মুভমেন্ট'-এর সক্রিয় কর্মী ছিলেন। আর একটা মহাযুদ্ধ যাতে না বাধে তার জন্য সকলেই তৎপর। লিগ অব নেশন্সের উপর সকলের নির্ভরতা। তাঁরা সকলেই ছিলেন প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পোড়খাওয়া পরিবারের মানুষ। যে-সব যুবক যুদ্ধে নিহত হন তাঁদেরই আত্মীয়-আত্মীয়া। এঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে আমি জানতে পেলুম যে এঁরা কেউ সাম্রাজ্যবাদী নন। তবে কেউ বিপ্লববাদীও নন। আমাকে এক জন ইংরেজ ভদ্রলোক YMCA-তে বলেছিলেন, 'আমরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ইংরেজরা ধনিক ও শ্রমিক দুই শ্রেণীর ইংরেজের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সংঘর্ষ নিবারণ করছি। ইংলন্ডের মধ্যবিত্ত শ্রেণী খুবই শক্তিশালী। তাই এ দেশে বিপ্লব কোনওদিনও হবে না।'

বোর্ডিং হাউসে আমার অসুবিধে হচ্ছে জেনে জয়স আমাকে গোল্ডেন গ্রিনের অন্তর্গত হ্যাম্পস্টেড গার্ডে সাবার্বে তাঁর বাড়ির কাছাকাছি একটা ইংরেজ পরিবারে পেয়িং গেস্ট হিসেবে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। সেখানে আমিই একমাত্র অতিথি। গৃহকর্ত্রী মিসেস ডাউসেট মায়ের মতো যত্ন করেন। জয়স-এর সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়। ক্রমশই আমরা পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হই। মাঝে মাঝে লন্ডনের বাইরে বেড়াতে যাই।

একবার আমরা যাই ইস্ট এন্ড-এ মুরিয়েল লেস্টার-এর যুদ্ধে নিহত ভ্রাতার নামে প্রতিষ্ঠিত সমাজসেবা কেন্দ্র ও শান্তিকামী মানুষদের মিলন তীর্থ। কিংসলি হল-এ। সেটা

শ্রমিক শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের সেবা ও আমোদ-প্রমোদের কেন্দ্র। দু বছর বাদে মহাত্মা গান্ধী যখন দ্বিতীয় রাউন্ডটেবল কনফারেন্সে যান তখন তিনি সদলবলে কিংসলি হল-এ অবস্থান করেন। তার দু বছর আগেই জয়স ও আমি সেখানে এক রাতের অতিথি। মুরিয়েল ছিলেন তখন থেকেই গান্ধীভক্ত। জয়সও খাদির মতো মোটা কাপড়ের পোশাক পরতেন। তিনিও বিশ্বাস করতেন যে যন্ত্রশিল্পের চেয়ে ক্ষুদ্রশিল্পই ভাল। তিনি খুব হাঁটতে ভালবাসতেন। তাঁর সঙ্গে আমাকে জোরে জোরে পা মিলিয়ে হাঁটতে হত। তিনি ছিলেন কোয়েকার সম্প্রদায়ের মতবিশ্বাসের পক্ষপাতী। কোয়েকাররা গির্জায় যান না। ব্রাহ্মসমাজের মতো উপাসনা ঘরে সমবেত হন। থিয়োসফিস্টদের মতো অ্যানথ্রপোসফিস্ট বলে একটি সম্প্রদায় ছিল। রুডলফ স্টাইনার ছিলেন তার প্রতিষ্ঠাতা। জয়স তাঁর শিক্ষা অনুসরণ করার চেষ্টা করতেন। স্টাইনার-এর এক প্রকার নেচার-কিয়োর ছিল। জয়স সেটাতে বিশ্বাস করতেন। তাঁর মা আমাদের দেশের মায়ের মতোই স্নেহপরায়ণা ছিলেন। তাঁদের ওখানে গেলে তাঁর স্নেহের আস্বাদন পেতুম। বিদেশে সেটা একান্ত দুর্লভ।

লন্ডন থেকে আমি একা মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়তুম ছোট ছোট শহরে। যেমন ইস্টবোর্নে ব্রাইটনে টর্কিতে প্লিম্যাথে। টর্কিতে নেমে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে একটা বোর্ডিংহাউস দেখে ঢুকে পড়লুম। মালিক একজন মধ্যবয়সী অবিবাহিত ইংরেজ মহিলা। ঘর খালি ছিল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে জায়গা দিলেন। তিন দিন কি চার দিন ছিলুম। ইতিমধ্যে তিনি আমাকে তাঁর জীবনের অনেক কথা বললেন। আমিও তাঁকে আমার জীবনের অনেক কথা বললুম। তিনি হয়ে গেলেন, আমার সেকেন্ড মাদার। নাম মিস কুক্‌সলি। মায়ের মতোই আদরযত্ন করলেন। বোর্ডিং হাউসে সাধারণত যা মেলে না। আমাদের দেশে ফেরার পরও তিনি আমাকে মাঝে মাঝে চিঠি লিখতেন। নীচে লেখা থাকত সেকেন্ড মাদার। একবার একটি ল্যাভেন্ডারের পাতাও পাঠিয়েছিলেন মনে রাখার জন্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আমাদের সম্পর্কে ছেদ পড়ে যায়।

তেমনই ছেদ পড়ে যায় আমার পাতানো বোনের সঙ্গে। তার নাম মড আর্নল্ড। মিসেস ডাউসেটের বোনঝি। ওর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তাঁর ওখানেই। মাত্র এক দিনের আলাপ। বয়স অল্প। কিন্তু পড়াশোনা গভীর। লিখতেও পারে ভাল। আমার ফিরে আসার পর মাঝে মাঝে চিঠি পেতুম ওর। দশ-এগারো বছর পর্যন্ত। মিসেস ডাউসেটও আমাকে চিঠি লিখতেন। সবচেয়ে বেশি চিঠি পেয়েছি জয়স-এর কাছ থেকে। পঞ্চাশ বছরের উপর।

এ-সব সম্পর্ক ভোলা যায় না। এঁরা আমার স্বদেশবাসীদের চেয়ে কম কীসে? এঁরাই আসল ইংলন্ড। এঁদের মধ্যে বর্ণবিদ্বেষ জাতিবিদ্বেষ দেখিনি। তাই আমি কোনওদিন ইংরেজবিদ্বেষী হতে পারলুম না। স্বদেশবাসীর ইংরেজবিদ্বেষ দেখে আমি মর্মাহত বোধ করতুম। বিশেষত সন্ত্রাসবাদী আমলে।

দশ

লন্ডনে পৌঁছবার কিছুদিন পর শুনলুম যে বার্নার্ড শ, বার্ট্রান্ড রাসেল প্রমুখ কয়েকজন পরপর পাবলিক লেকচার দেবেন। তার জন্য টিকিট কাটতে হবে। তা আমি টিকিট কেটে একটি হল-এ গিয়ে প্রথমে শুনলুম বার্নার্ড শ-র বক্তৃতা, তারপর রাসেল-এর। শ সারাক্ষণ হাস্যকৌতুক করলেন। যদিও বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ। বৈজ্ঞানিকদের ল্যাবরেটরিকে বললেন

'ল্যাভেটরি'। আর বার্ট্রান্ড রাসেল অত্যন্ত গোমড়ামুখে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে তাঁর ভাষণ দিলেন। শ-র মতো চাঞ্চল্য দেখালেন না। এর পর যাঁর বক্তৃতা শুনলুম তাঁর আসল নাম কেউ জানে না, ছদ্মনাম রেবেকা ওয়েস্ট। নামটি তিনি গ্রহণ করেছিলেন ইবসেন-এর নাটক থেকে। কারও অজানা ছিল না যে তরুণ বয়সে বিদ্রোহিণী ছিলেন, বিবাহব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে কুমারী-জননী হয়েছিলেন। পুত্রের পিতা এইচ. জি. ওয়েলস। বিবাহিত পুরুষ। তারপরে তিনি ক্রমে-ক্রমে সাহিত্য জগতে সুপ্রতিষ্ঠ হয়েছেন। এখন তো তিনি শ-রাসেল-এর সঙ্গে একসারিতে স্থান পাওয়ার যোগ্য। তাঁকে দেখে কেউ ভ্রূ কুঞ্চন করেনি। কিন্তু তাঁর মধ্যে সেই আগুন আর নেই। আমি যখন তাঁকে দেখলুম তখন তাঁর বয়স বোধহয় পঁয়ত্রিশ। দেখতে খুবই সংযত ও নম্র। পরবর্তী কালে তিনি নাকি স্বদেশের এক ধনপতিকে গির্জায় গিয়ে যথারীতি বিবাহ করেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি হয়ে ওঠেন ঘোর রক্ষণশীল। রক্ষণশীল সরকার তাঁকে 'ডেম' উপাধি দেয়। আরও পরবর্তী কালে মহিলাদের নিজগুণের জন্য 'লেডি' উপাধির প্রবর্তন হয়েছে। শ্রমিক শ্রেণীর মহিলাও এই উপাধি লাভ করেছেন।

প্রথম মহাযুদ্ধে বিবাহযোগ্য লক্ষ লক্ষ যুবক নিহত হওয়াতে লক্ষ লক্ষ বিবাহযোগ্য যুবতীর বিবাহ হয় না। আমি যখন রেবেকা ওয়েস্ট-এর ভাষণ শুনি তখন চারদিকে শোনা যাচ্ছিল যে বিবাহযোগ্যা কন্যাদের যখন বিবাহের আশা নেই তখন তাদের মা হওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা কি উচিত?

আমি যে বোর্ডিং হাউসে উঠেছিলুম সেখানে আমার প্রতিবেশিনী ছিলেন মিসেস নরম্যান নামে এক মধ্যবয়সী মহিলা। তিনি একদিন আমাকে প্রশ্ন করেন, 'যে নারীর বিবাহের কোনও আশা নেই সে কেন মা হতে পারবে না?' আমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত ছিলুম না। বলি, তেমন সন্তানের মা হতে কেউ রাজি হলেও বাপ হতে রাজি হবে কে? সে যদি বিবাহিত পুরুষ হয়ে থাকে তা হলে তার বিবাহ ভেঙে যাবে। আপনি কি আপনার স্বামীকে অনুমতি দেবেন তেমন কাজ করতে?' আমার এই পালটা প্রশ্ন শুনে তিনি একেবারে চুপ। যে সমাজে একাধিক বিবাহের রীতি নেই সে সমাজে লক্ষ লক্ষ নারীকে মাতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হতেই হবে।

তবে বলে রাখি যে ইংলন্ডের আইনে বিগ্যামি অর্থাৎ এক স্ত্রী থাকতে আর এক নারীকে বিবাহ একটা দণ্ডনীয় অপরাধ। এই অপরাধী পুরুষদের আমার সামনেই মেরিলবোন কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশের সাক্ষী নেওয়ার পর জিজ্ঞাসা করতেন, 'তুমি দোষী না নির্দোষ?' প্রায় সব কটা কেসেই আসামিরা দোষ কবুল করত। ম্যাজিস্ট্রেট সঙ্গে সঙ্গে বছর দুই কারাবাসের আদেশ দিতেন। সেই একই আদালতে হাজির করা হত পূর্ণবয়স্কা যুবতীদের। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে পথিক পুরুষদের সলিসিট অর্থাৎ পাপকর্মে প্রলুব্ধ করেছে। তারা এক বাক্যে দোষ কবুল করত। সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যেত মাথাপিছু দু পাউন্ড জরিমানা। তারা হাসিমুখে দু পাউন্ড গুনে দিয়ে বিদায় নিত। এই তামাশা আমি যত বার সেই আদালতে শিক্ষানবিশি হিসেবে গেছি তত বার দেখেছি। ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন খুবই কড়া মেজাজের বৃদ্ধ। সেটা ছিল পুলিশ কোর্ট। পুলিশ যাকেই ধরে নিয়ে আসত তারই সাজা হয়ে যেত। বুঝলুম যে আমাকেও দেশে ফিরে কড়া হাকিম হতে হবে। আর পুলিশ যাকে ধরে নিয়ে আসবে তাকে বিচারের পর দিতে হবে কড়া সাজা।

দেশে থাকতে আমার ছিল রোজ সাঁতার কাটার অভ্যেস। কখনও ঢেঙ্কানালের

পুকুরে, কখনও পাটনার গঙ্গায়, কখনও পুরীর সমুদ্রে। লন্ডনে আমি সেখানকার সেন্ট্রাল YMCA-এর সভ্য হই ও সপ্তাহে এক বার সুইমিং পুল-এ গিয়ে সাঁতার কাটি। একজন কেয়ারটেকার ছিলেন। তিনি আমাকে বলতেন কাপড়-জামা খুলে দিগম্বর হতে। সাঁতারের পোশাকও বারণ। জলে ঝাঁপ দিয়ে দেখি আমার মতো আরও কয়েকজন দিগম্বর সাঁতার কাটছেন। লজ্জাবোধ কি শুধু আমারই? কিছুদিন বাদে সেটা গা-সওয়া হয়ে যায়। যস্মিন দেশে যদাচার। রোমে গেলে রোমানদের মতো কাজ করতে হয়।

গ্রীষ্মকালে সুইমিং পুল-এ সাঁতার কাটা অস্বস্তিকর। তাই একদিন গেলুম লন্ডনের এক লেকে সাঁতার কাটতে। সেখানেও দেখি বিশ-ত্রিশ জন নানা বয়সের দিগম্বর লেকের পাড়ে রোদ পোহাচ্ছেন। যাকে বলে রৌদ্রস্নান। আমি কারও দিকের দৃক্‌পাত না করে দিগম্বর হয়ে জলে ঝাঁপ দিই। বাপ রে, সে কী ঠাণ্ডা! YMCA-র জলের মতো নাতিশীতোষ্ণ নয়। কাজেই এক বার ডুব দিয়েই উঠে পড়ি ও লেকের পাড়ে বসে দিগম্বর হয়ে ইংলন্ডের রোমানদের অনুসরণ করি। কাপড়-চোপড় পড়ে থাকে একধারে। বৃন্দাবনের গোপীদের মতো। তবে কেউ কারও বস্ত্রহরণ করে না। লক্ষ করি সকলেই নির্বাক ও গম্ভীর। ওটা হয়তো ইংরেজদের চরিত্র। স্থানটি পুরুষদের জন্যই সংরক্ষিত। YMCA-র সুইমিং পুল-ও তা-ই।

এগারো

আমি যে সময় ইংলন্ডে ছিলুম অর্থাৎ ১৯২৭-২৯ সে সময় বিলেতের স্কুল-কলেজে কো-এডুকেশন ছিল না। একমাত্র ব্যতিক্রম লন্ডন স্কুল অব ইনকমিক্স। সেখানে ডক্টর ডালটনের ক্লাসে শতখানেক ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে আমাকে বসতে হয়। সহপাঠিনীর সংখ্যা বড় কম নয়। অধ্যাপকমণ্ডলীতে ছিলেন এক জন মধ্যবয়সী মহিলা। নাম যতদূর মনে পড়ছে ভেরা অ্যানস্টে। তাঁর ক্লাসেও আমি পড়েছি। কিন্তু ক্লাসটা খুব ছোট। সেখানেও এক জন সহপাঠিনী ছিলেন।

লন্ডনে কয়েকটি মহিলা কলেজ ছিল। সে-সব কলেজে বাঙালি ছাত্রীরাও পড়তেন। তাদের মধ্যে দু জন ছিলেন ব্রাহ্মকন্যা। তাঁরাও তটিনীদির সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। তাঁদের সঙ্গে মেশার সুযোগ পেতুম। লন্ডনে বাঙালিদের মেলামেশার আরও একটা জায়গা ছিল বিপিনচন্দ্র পালের পুত্র নিরঞ্জন পালের বাড়ি। তাঁর স্ত্রী ছিলেন আইরিশ মহিলা। খুবই স্নেহশীলা। হুমায়ুন কবীরকে আমি প্রথম দেখি নিরঞ্জন পালদের বাড়িতেই। একবার তাঁরা কী একটা উপলক্ষে প্রবাসী বাঙালিদের একটা ভোজ দেন। আমরা দিশি পোশাক পরে সেখানে খেতে যাই। সেই আমার লন্ডনের রাস্তায় প্রথম ধুতি পাঞ্জাবি চাদর পরে বেরিয়ে পড়া। ভোজের সময় আমরা সকলে মেঝেয় বসে পাতা পেতে খাই। আমার সামনের সারিতে বসেছিলেন সুবিখ্যাত মৃণালিনী সেন। তাঁর স্বামী কেশবচন্দ্র সেনের পুত্র নির্মলচন্দ্র সেন। আর তাঁর তিন কন্যা ভায়োলেট, প্যানসি ও রোজি। তাঁদের এক প্রস্থ বাঙালি নামও ছিল। যেমন ভায়োলেটের নাম শ্রীলতা।

দেশে ফিরে এসে বহরমপুরে দেখি, লর্ড সিনহার পুত্র সুশীলকুমার সিনহা আমাদের জেলা জজ। তাঁর স্ত্রী রমলা সিনহা একবার রাত্রে আমার বন্ধু দ্বিজেন্দ্রলাল মজুমদার ও আমাকে ডিনারে ডাকেন। উপস্থিত ছিলেন সেই তিন কন্যা ও তাঁদের মা। পরে আমি ভায়োলেটের সঙ্গে টেনিসও খেলেছি।

আমাদের সেই লন্ডনের ভোজপার্টির রান্নাবান্না ছিল সম্পূর্ণ ভারতীয়। যত দূর জানি, মিসেস পালের স্বহস্তে প্রস্তুত। অপরপক্ষে বহরমপুরের ডিনার ছিল প্রধানত পাশ্চাত্য। বাবুর্চির রান্না। বলাবাহুল্য ডিনারের সময় আমাদের পোশাকও ছিল সাহেবি। তখনও আমার সঙ্গে আমার ভাবী পত্নীর সাক্ষাৎ হয়নি। দ্বিজেন ও আমি থাকতুম অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেটদের কোয়ার্টার্সে। আমাদের জন্য রান্না করত আমাদের বাবুর্চি আবু মিয়া। উর্দুভাষী মুসলমান। প্রথম বছরটা আমি আবুর রান্নাই খেয়েছি। অ্যালিস ভার্জিনিয়া যখন প্রথম বহরমপুরে এলেন তখন তিনিও আমাদের সঙ্গে আবুর রান্না আস্বাদন করেন। আমার সঙ্গে তাঁর বিয়ের পরেও কিছুদিন। আবুকে অমর করে দিয়েছি আমার একটি ছড়ায়।

বিলেত যাওয়ার সময় জাহাজেই আমি লিখতে শুরু করে দিয়েছিলুম 'পথে প্রবাসে'। তারপর বিলেতে গিয়ে লিখি। ধারাবাহিকভাবে 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত হয়। সমান্তরালভাবে 'মৌচাক'-এ প্রকাশিত হয় আমার 'ইউরোপের চিঠি'। প্রথম বছরের ইস্টারের ছুটিতে আমি আইল অব ওয়াইট-এ থাকি YMCA-র আবাসে। সেইখানে লিখতে বসি 'তারুণ্য'। শেষ করি লন্ডনে ফিরে এসে ও পাঠিয়ে দিই এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স-এর সুধীরচন্দ্র সরকারকে। সেটি তিনি সেই বছরেই প্রকাশ করেন। দিলীপকুমার রায় তার দীর্ঘ সমালোচনা করেন 'কালিকলম' পত্রিকায়। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে চিঠি লিখে প্রশংসা জানান। এঁদের দু জনের সঙ্গে এইভাবে বন্ধুতার সূত্রপাত।

আমি ক্রমশ বুঝতে পারি আই. সি. এস. আমার জন্য নয়, আমিও আই.সি.এস-এর জন্য নই। তখন থেকে ভাবতে শুরু করি আমার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে সাহিত্যে আমি কী দিয়ে যাব তার উপরে। বিলেতের দ্বিতীয় বছরে ঠিক হয়ে যায় যে আমি লিখব একখানি তিন খণ্ডের উপন্যাস। তাতে থাকবে ইউরোপ ও ভারতের বিরোধ ও মিলন। তিনটে মূল চরিত্র থাকবে, আর অনেকগুলি পার্শ্বচরিত্র। কাহিনীর একটা দার্শনিক ভিত্তি থাকবে। আলো আঁধারের দ্বন্দ্ব থাকবে। তা ছাড়া থাকবে গুরুজনের দ্বারা আয়োজিত বিবাহের প্রতিবাদ ও প্রেমের স্বাধীনতা।

বিলেতে দ্বিতীয় বছরের শেষের দিকে আমি জয়স-এর সঙ্গে জার্মানি, চেকোস্লোভাকিয়া ও ইটালি ভ্রমণ করি। জার্মানির বার্লিন, ড্রেসডেন, আইসেনাখ, নিউর্‌নবার্গ ও ভাইমর, চেকোস্লোভাকিয়ার প্রাগ এবং ইটালির মিলান, ভেনিস, ফ্লোরেন্স ও রোম ছিল আমাদের ভ্রমণসূচির অঙ্গ। আমার পরিকল্পিত উপন্যাসের কথা ছিল আমার মনে। তখনই মনে হয়েছিল, ফ্লোরেন্স যদি ইউরোপীয় নারীর নাম হতে পারে তা হলে ভারতীয় নারীর নাম উজ্জয়িনী হতে পারে না কেন? সেই তিন খণ্ডে উপন্যাস লেখার পরিকল্পনা ক্রমে পাঁচ খণ্ডে ও পরে ছয় খণ্ডে প্রসারিত হয়।

আই. সি. এস. শিক্ষানবিশদের জিজ্ঞাসা করা হত, কে কোন প্রদেশে নিযুক্ত হতে চাও। তবে তাঁদের ইচ্ছাই চূড়ান্ত ছিল না, সরকার ইচ্ছে করলে যে কোনও প্রদেশে নিযুক্ত করতে পারতেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বম্বে প্রেসিডেন্সিতে ও আলবিয়ান রাজকুমার বনার্জিকে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে নিযুক্ত করা হয়। আমরা তিন বন্ধু দ্বিজেন্দ্রলাল, হিরন্ময় ও আমি তিনজনেই অবিভক্ত বাংলাদেশে কাজ করার সুযোগ পাই। সাহিত্যেই যখন আমার ভবিষ্যৎ তখন আমি ষাট বৎসর বয়স পর্যন্ত চাকরি করতে যাব কেন?

আমার ধারণা ছিল যে আমার পরমায়ু আমার মায়ের মতো মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর।

সুতরাং আমি ভেবে রেখেছিলুম যে পাঁচ বছর চাকরি করে বাংলাদেশের পাঁচটা বিভাগ দেখব। তারপর চাকরি ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় এসে সাহিত্যে মনোনিবেশ করব।

আশ্চর্যের ব্যাপার! পাঁচ বছরের মধ্যে বদলি হতে হতে বাংলার পাঁচটা বিভাগই দেখা হয়ে গেল। কিন্তু চাকরি ছাড়া হল না। চাকরি বজায় রেখে সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য সাধনা চলল। এর মূলে আমার আকস্মিক বিবাহ। তবে অন্য একটা কারণও ছিল। আমার পরিকল্পিত উপন্যাস শেষ করতে লেগে গেল বারো বছর। কাজেই শেলী কীটস বায়রন-এর মতো পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যেই রোমান্টিক মৃত্যু হল না। আমি এখনও চুরানব্বই বছর বয়সে বেঁচে আছি।

এটা লীলা রায়ের হাতযশ। তিনি আমাকে অষ্টাশি বছর বয়স পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিলেন। আমাদের বিয়ের পর আমরা মধুমাস কাটাই বহরমপুরে। ইংরেজিতে যাকে হনিমুন বলা হয়, তার অর্থ মধুচন্দ্র নয়, মধুমাস। মুন কথাটির মানে কখনও হয় চন্দ্র, কখনও হয় মাস। হঠাৎ তাঁর বাবার ডাক পেয়ে তাঁকে চলে যেতে হয় আমেরিকায়। সেখান থেকে একদিন একটা টেলিগ্রাম পাই। তাঁর বাবা জানতে চান, আমি বিবাহবিচ্ছেদ করব কি না। আমি উত্তর দিই, বিবাহ অবিচ্ছেদ্য। তখন তিনি তাঁর মেয়েকে বলেন, তুমি বিবাহবিচ্ছেদ করো। তখন তিনিও একই উত্তর দেন, বিবাহ অবিচ্ছেদ্য। তখন তাঁকে আলটিমেটাম দেওয়া হল, হয় বর ছাড়ো নয় ঘর ছাড়ো। তিনি বর ছাড়লেন না, ঘরই ছাড়লেন। আমার কাছে ফিরে এসে তিনি বললেন, 'সব চুকিয়ে দিয়ে এসেছি। এখন থেকে তুমি যেখানে আমি সেখানে।'

প্রথম জীবন থেকেই আমার অন্যতম আদর্শ পুরুষ ছিলেন রুশো। তাঁরই মতো আমিও প্রকৃতির সন্তান। প্রকৃতির স্রোতে গা ভাসিয়ে দিই। ভাল মন্দ বিচার করিনে। প্রকৃতির সঙ্গে নীতির বিরোধ বাধলে প্রকৃতির পক্ষ নিই।

কিন্তু মহাত্মার পাল্লায় পড়ে ক্রমশ নীতির পাল্লা ভারী হয়। সত্য, অহিংসা, অস্তেয়, অপরিগ্রহ একে একে মেনে নিই। বাদ শুধু ব্রহ্মচর্য। ওটা বার্ধক্যের জন্যে তুলে রাখি।

প্রথম যৌবন থেকেই আমার ধনুর্ভঙ্গ পণ, আমি টলস্টয়ের মতো মধ্যবয়সে আর্টিস্ট না হয়ে মরালিস্ট হব না। ততদিন বাঁচব কিনা জানিনে। যদি বাঁচি তবে মরালিস্ট হিসাবে নয়, আর্টিস্ট হিসাবে।

যৌবন মধ্যাহ্ন

মৈত্রেয়ীর প্রশ্ন ছিল আমাকে যা অমৃত করবে না তা নিয়ে আমি কী করব? তেমনই আমার প্রশ্ন ছিল যা আমাকে অমর করবে না তা নিয়ে আমি কী করব? ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস আমাকে স্যার বসন্তকুমার মল্লিকের মতো হাইকোর্ট জজ করতে পারে কিংবা স্যার অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো ইংল্যান্ডে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার। কিন্তু আমার মৃত্যুর পর কেউ আমাকে মনে রাখবে না। অপর পক্ষে আমি যদি শেলী কীটসের মতো রোমান্টিক কবিতা লিখে যেতে পারি কিংবা বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের মতো রাধাকৃষ্ণ পদাবলি যার নায়ক-

নায়িকা আমি এবং আমার প্রিয়া তবে আমাকে সহজে কেউ ভুলতে পারবে? আমার ধারণা ছিল আমিও শেলী কীটসের মতো স্বল্পায়ু। কারণ আমার মা বেঁচেছিলেন মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর। আমিও তাঁর মতো দুর্বল ও কৃশকায়। আমাকে আমার স্বল্পায়ুষ্কালের মধ্যেই আমার জীবনের কাজ শেষ করতে হবে।

ইতিমধ্যে আমি 'পথে প্রবাসে' লিখে বুঝতে পেরেছি যে চেষ্টা করলে আমি একজন গদ্যশিল্পী হতে পারি। আমার বিশ্বাস আমি ছোট একখানা উপন্যাস লিখতে পারব। সেটা হবে রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' ও 'ঘরে-বাইরে'র অন্তর্নিহিত তত্ত্বের খণ্ডন। হিন্দু নারী ভালবাসে স্বামী নামক একটি আইডিয়াকে, সুতরাং অনায়াসেই কমলা রমেশকে ছেড়ে নলিনাক্ষকে ভালবাসে, যেহেতু নলিনাক্ষ তার প্রকৃত স্বামী। রবীন্দ্রনাথের এ বিশ্বাস একেবারেই অবাস্তব। পরকীয়া প্রেমের দৃষ্টান্ত আমি একাধিক জানি। কোনও কোনওটি অত্যন্ত সুন্দর ও সাহিত্যের বিষয়বস্তু হওয়ার যোগ্য। সন্দীপকে একজন মেকি বিপ্লবী না করে খাঁটি বিপ্লবী করলে বিমলা কি তাকে নিখিলেশের চেয়ে ভালবাসত না? পরিণাম হত ট্র্যাজেডি। তবু সে-ও ভাল।

সেই ছোট উপন্যাসের কথা ভাবতে ভাবতে আমি পৌঁছে যাই এক পাঁচ খণ্ডে সমাপ্য উপন্যাসের পরিকল্পনায়। তাতে থাকবে সমসাময়িক ইউরোপের বিভিন্ন ভাবধারা তথা ভারতের চিরন্তন অন্বেষা। আমার মনে হল 'সত্যাসত্য' নামে এই এপিক উপন্যাসই হবে আমার জীবনের কাজ। এটি সাঙ্গ হলেই আমার জীবনের কাজ ফুরোবে। যদি অমর হই তো এই কীর্তির জন্য অমর হব।

চাকরির প্রথম দিন থেকেই আমার বুকে বিঁধে রয়েছে একটা কাঁটা। যাঁর মুক্তির জন্য আমি আই সি এস প্রতিযোগিতায় নেমেছিলুম তাঁর সঙ্গে আমার প্রেমের সম্পর্ক চুকে গেছে। আই সি এস-এর প্রতিযোগিতায় সফল না হলে আমি বিলেত যেতে পারতুম না। সেটাও ছিল আমার প্রগাঢ়তম কামনা। প্রায় নারীর প্রেমের মতোই। দু বছর ইউরোপে বাস করে সে সাধও মিটেছে। তা হলে আমি চাকরিতে পড়ে থাকব কেন? কী তার সার্থকতা? একজনের সংসারে কতই বা খরচ?

কিন্তু কিছুদিন পরে আমার জীবনে ঘটল লীলার আবির্ভাব। তখন দু জনের সংসারের কথা ভাবতে হল। তারপর যথাকালে তিনজনের সংসারের কথা। কাঁটা বিঁধে রইল ঠিকই। কারণ আমার মতে চাকরি করে যাওয়াটা ভুল পথে চলা। যদিও বুঝতে পারছিলুম না চাকরি ছেড়ে দিলে সংসার কেমন করে চলবে। এই যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, এর থেকে আমি একটা দিনও রেহাই পাইনে। তবে যখন 'সত্যাসত্য' লিখতে বসি তখন মনটা উড়ে যায় ইউরোপে। স্মৃতির সাহায্যে আবার সেখানে বাঁচি ও সেখানকার জীবন অবলম্বন করে কাহিনীর জাল বুনি। দেহ থাকে বাংলাদেশের মাটিতে আর মন ইউরোপের কল্পলোকে। সরকারি কাজকর্ম প্রতিদিনই প্রতিবন্ধ সৃষ্টি করে। একজন ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ তো দশটা-পাঁচটার কাজ নয়। সকালবেলা বহু লোক আসে সাক্ষাৎ করতে, সন্ধেবেলা ডাক পড়ে সভাসমিতিতে, যে কোনও মুহূর্তে টেলিগ্রাম আসতে পারে অমুক জায়গায় দাঙ্গার সম্ভাবনা, পুলিশের লোক আসামিকে ধরে নিয়ে আসে রাত্রিবেলা—সে কনফেশন করবে।

আমার সরকারি কাজে এত রকম বৈচিত্র্য ছিল যে কখনও একঘেয়ে মনে হত না। যখন মহকুমার ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট ছিলুম তখন প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে সফরে বেরিয়ে

পড়তুম। কখনও রেলপথে, কখনও জলপথে, কখনও পায়ে হেঁটে। রাত কাটত কখনও ডাকবাংলোয়, কখনও তাঁবুতে, কখনও হাউসবোটে। লীলাকে সঙ্গে নিয়ে যেতুম যখনই সম্ভব। কিন্তু হাতির পিঠে নয়। সেটা অসম্ভব। শিলাইদহে তার জন্য পালকির ব্যবস্থা হয়েছিল। পুত্র জন্মের পর তাকেও নিয়ে যেতুম সঙ্গে। নিয়ামতপুর পরিদর্শনে যখন যাই তখন সে অঞ্চলে পায়ে চলার পথে লীলা পুণ্যকে কোলে করে আমার সঙ্গে হাঁটতেন। প্রত্যেক দিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত। তারপর তাঁবুতে বিশ্রাম। একবার আমরা পদ্মার চরে বাস করি। মাথার উপর উন্মুক্ত আকাশ। রাত কেটে যায় তারার দিকে তাকিয়ে। পতিসরে আমরা হাউসবোটে রাত কাটিয়েছিলুম। সেটা গুরুদেবের হাউসবোট। শিলাইদহে আমরা কুঠিবাড়িতে রাত কাটিয়েছিলুম। সেটাও গুরুদেবের প্রিয় আস্তানা।

দুই

বিলেত থেকে ফিরে আমি অচিন্ত্যকুমারকে সঙ্গে নিয়ে শান্তিনিকেতনে যাই রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করতে। আমি আই সি এস হয়েছি শুনে তিনি খুশি হয়ে বলেন, 'তুমি বেঙ্গল চেয়ে নিলে কেন? আমি হলে ইউ পি চেয়ে নিতুম।' আমি তাঁকে কেমন করে বোঝাব যে আমার পঁচিশ বছর বয়সের সমস্তটাই কেটেছে বাংলার বাইরে। আমার যেটা দরকার সেটা হল বাঙালি জীবনের সঙ্গে জীবন মেলানো। তার জন্য বাংলাদেশে পাঁচটি বিভাগে পাঁচটি বছর বাস করা ও মানুষ চেনা। শিকড়ের সন্ধানে আমি আমার পূর্বপুরুষের বাসভূমিতে এসেছি। এখন থেকে আমি প্রবাসী বাঙালি সাহিত্যিক নই, নিছক বাঙালি সাহিত্যিক।

সেই সময় আমি সত্যিই ভাবতুম যে সরকারি চাকরিতে আমি পাঁচ বছরের বেশি থাকব না। চাকরি থেকে বেরিয়ে আমার সাহিত্যের কাজ শেষ করতে চাই। সাহিত্যে পূর্ণ মনোযোগ না দিলে আমি উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারব না। পঁয়ত্রিশ বছর আয়ুষ্কালের মধ্যেই সেটা সম্পূর্ণ করতে হবে।

তবে বাংলাদেশে চাকরিতে বহাল হয়ে কিছুদিনের মধ্যেই আমি টের পাই যে আমি এক রণক্ষেত্রে এসে পড়েছি। একদিকে লড়ছে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান, আর একদিকে লড়ছে ইংরেজের সঙ্গে বাঙালি। হিন্দু-মুসলমানের লড়াইয়ের পদ্ধতি হল দাঙ্গাহাঙ্গামা আর ইংরেজ-বাঙালির লড়াইয়ের পদ্ধতি হল ইংরেজের প্রাণহানি ও বাঙালির ফাঁসি বা দ্বীপান্তর।

বহরমপুরের একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় মুসলিম উকিল ছিলেন আবদুল সামাদ। একদিন একটি সভায় তিনি আমার দিকেই তাকিয়ে বলেন, 'হিন্দু মুসলমান সমস্যাটা হচ্ছে এককথায় এই—হিন্দুরা ধর্মে উদার কিন্তু সমাজে উদার নয় আর মুসলমানরা সমাজে উদার কিন্তু ধর্মে অনুদার।' আমি বুঝতে পারলুম হিন্দুকে সমাজে উদার হতে হবে, মুসলমানদের ধর্মে উদার। তা না হলে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ চলতেই থাকবে। ইংরেজ থাক আর না থাক।

লীলা যেদিন আমেরিকা থেকে ফিরে আসেন সেদিন তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য আমি বাঁকুড়া থেকে খড়্গপুরে যাই। বোম্বাই মেল-এর অপেক্ষায় প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় উপস্থিত হন আমার বন্ধু করুণাকুমার হাজরা ও সন্তোষকুমার চ্যাটার্জি। মেদিনীপুর জেলার দুই মহকুমার দুই মহকুমাশাসক। দু জনের মুখ গম্ভীর। জিজ্ঞেস করি, 'কোথায় যাচ্ছ তোমরা? কী ব্যাপার?' হাজরা বলেন বিষণ্ণ সুরে, 'কাল সন্ধেবেলা পেডি খুন হয়েছেন। আমরা সদরে যাচ্ছি তাঁর ফিউনারালে যোগ দিতে।' আমি তো হাঁ। কে করেছে

এমন দুষ্কর্ম, কেনই বা করেছে তা স্পষ্ট নয়। আমাদের সন্দেহ এটা বিপ্লবীদের কাজ।

পেডি ছিলেন মেদিনীপুরের জেলাশাসক। লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে মেদিনীপুর জেলায় দমননীতি প্রয়োগ করতে গিয়ে পুলিশ নাকি দারুণ অত্যাচার করে। সম্ভবত এই ঘটনা তার প্রতিশোধ। মেদিনীপুরে পরপর আরও দুজন জেলাশাসক নিহত হন। অন্যান্য জেলাতেও অনুরূপ ঘটনা ঘটতে থাকে। বহরমপুরে লোম্যান ও সিমসনকে আমি দেখেছি। লোম্যান এত লম্বা ছিলেন যে তাঁকে হাইম্যান বলতে পারা যেত। তিনি আমাদের ক্লাবে এসেছিলেন। লোকটি মিশুক নন। সিমসন আমাদের সঙ্গে টেনিস খেলেছিলেন। জানিনে কী এদের অপরাধ। অত্যাচার করে থাকলে কী সে অত্যাচার। কিন্তু এই ধরনের হত্যাকাণ্ড ইংরেজদেরকে যত না সন্ত্রস্ত করে তার চেয়ে প্রতিশোধপরায়ণ করে। অবশ্যম্ভাবী প্রতিফল ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ। শুনেছি ম্যাকডোনাল্ড বাঙালি বর্ণহিন্দুদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। কিন্তু বিলেতে যে সব অবসরপ্রাপ্ত আই সি এস ছিলেন তাঁদের প্রধানরা প্রধানমন্ত্রীকে বলেন, 'আপনি কি চান যে আমরা বেঙ্গলকে হারাই? তা যদি না চান তবে বাঙালি বর্ণহিন্দুদের জব্দ করতে হবে।' ম্যাকডোনাল্ড তাঁর তৈরি রোয়েদাদ কাটছাঁট করে বাঙালি বর্ণহিন্দুদেরও ঠুঁটো জগন্নাথ বানালেন।

খড়গপুর থেকে লীলাকে বাঁকুড়ায় নিয়ে যাই। কিছুদিন পরে পৌছয় তাঁর স্টাইনওয়ে বেবি গ্র্যান্ড পিয়ানো। আর একরাশ পাশ্চাত্য সংগীত গ্রন্থ। নিউইয়র্কে তিনি পিয়ানো বাজাতে অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু বাঁকুড়ায় তিনি সে অভ্যাস রাখতে যথেষ্ট অবকাশ পান না। কেবল বাঁকুড়ায় কেন, যেখানেই বদলি হয়েছি সেখানেই। বাঁকুড়ায় তিনি রান্নাঘরের ভার নেন। হিন্দুরা তাঁকে সাহায্য করবে না, তাই সাহায্য করতে আসে সাবধানবিবি ও তার স্বামী সুলতান। এদের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই তিনি বাংলা বলতে শেখেন। তবে তাঁকে অক্ষর পরিচয় করান শৈলবালা চক্রবর্তী, আমাদের প্রতিবেশিনী, অজিতকুমার চক্রবর্তীর কী যেন হন।

তিন

বাঁকুড়া থেকে আমি বদলি হয়ে যাই রাজশাহি জেলার নওগা মহকুমায়। সেখানে আমি মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট। উপরন্তু গাঁজা চাষিদের সমবায় সমিতির ভাইস-চেয়ারম্যান। ওটি একটি বর্ধিষ্ণু প্রতিষ্ঠান। ওরা আমাকে একটি পিয়ন দেয়। তার নাম সুখলাল। লীলাকে সে রান্নার কাজে সাহায্য করে। তার নাম, তার চেহারা, তার কথাবার্তা, তার ধুতি যে কোনও হিন্দুর মতো। দেড় বছর পরে জানা গেল সে হিন্দু নয়, সে মুসলমান।

সেই সময় শিক্ষিত ভদ্র মুসলমানরাও ধুতি পরতেন। সাধারণ মুসলমানদের তো কথাই নেই। আমার চাপরাশি আসমত ফকির দাড়ি রাখত, তাই তাকে মুসলমান বলে চেনা যেত। সুখলালের দাড়ি ছিল না। আমার সহকর্মী মুসলমান অফিসর ও কেরানিদেরও দাড়ি দেখিনি। টুপিও পরতেন না তাঁরা। হিন্দু মুসলিম ভেদ কেবল নামে। তাঁদের সম্বোধন করার সময়ে নামের সঙ্গে 'মিয়াঁ' ব্যবহার করতে হত। যেমন মানিক মিয়াঁ। পরে যখন বিষ্ণুপুরে যাই তখন মুসলমান কেরানিদের নামের সঙ্গে শুনি 'বাবু'। যেমন রাজেক বাবু। দেখে বুঝতেই পারা যায় না হিন্দু না মুসলমান। কথাবার্তা পোশাক-আশাক চাল-চলন সমস্তই এক হিন্দু কেরানির মতো।

তবে তখনকার দিনে হিন্দুরা বলত, 'আমরা বাঙালি, ওরা মুসলমান।' আর মুসলমানরা বলত, 'আমরা মুসলমান, ওরা বাঙালি।' অথচ উভয়পক্ষই বাংলায় কথা বলত। বাঁকুড়ায় একটি মেয়ে লীলার সঙ্গে দেখা করতে আসত, কলেজের ছাত্রী, নাম সুলতানা। বলত, 'আমার অনেক বাঙালি বন্ধু আছে।' তার মানে ও নিজে বাঙালি নয়, মুসলমান। পাকিস্তান সৃষ্টির পর সুলতানার পরিবার চলে যায় ঢাকায়। মুক্তিযুদ্ধের পর আমরা যখন ঢাকায় যাই তখন সুলতানা আসে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। তখন সে বাঙালি। শুধু সুলতানা কেন, বাংলাদেশের সব মুসলমানই তখন বাঙালি। এর জন্য দরকার ছিল উর্দুভাষী মুসলমানদের সঙ্গে বৈসাদৃশ্য ও বাংলাভাষী হিন্দুদের সঙ্গে সাদৃশ্য উপলব্ধি। বাংলাদেশে আজকাল বাঙালি জাতি কথাটাই শুনতে পাওয়া যায়, মুসলিম জাতি নয়। তবে তার সঙ্গে যুক্ত হয় মুসলিম ধর্ম বা হিন্দু ধর্ম। এই জ্ঞানটা আগে হলে হয়তো দেশ ভাগটাই হত না।

এখানে উল্লেখ করে রাখি, সাবধানবিবি ও তার স্বামী সুলতানকে পার্টিশনের পরে হঠাৎ একদিন আমার কলকাতার বাসায় হাজির হতে দেখি। সঙ্গে আরও দশ-বারোজন মুসলমান। বাঁকুড়ার জেলাশাসক তাদের পরামর্শ দিয়েছেন কিছুদিনের জন্য পাকিস্তানে চলে যেতে, যেহেতু বাঁকুড়ায় তারা নিরাপদ নয়। ওরা পাকিস্তানে যেতে চায় না। আমাকে অনুরোধ করে তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে। এটা গভর্নমেন্টের কাজ। কিন্তু গভর্নমেন্ট যাঁদের হাতে পড়েছে তাঁরা আমাকেই শাসন বিভাগ থেকে সরিয়েছেন। কারণ আমি মুসলমান খেদাতে নারাজ। আমি তখন persona non grata, তাঁদের পলিসিই হচ্ছে ওপার থেকে হিন্দুরা এলে এপার থেকে মুসলমানরা যাবে, না গেলে তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝিয়ে মিষ্ট ভাষায় পরামর্শ দেওয়া হবে। যেমন সাবধানবিবি ও তার স্বামীকে দেওয়া হয়েছে। ওরা দুজনে এলে আমি কোনওরকমে ওদের জন্য ব্যবস্থা করতে পারতুম। কিন্তু এতগুলো লোককে আমি রাখি কোথায়? অগত্যা বলতে হল, 'বাঁকুড়ার জেলাশাসকের পরামর্শ মেনে তোমরা পাকিস্তানেই যাও।' ওটা আমার পক্ষে পরাজয়। নেহরু সরকারের পক্ষেও।

কলেজে পড়ার সময় আমি যখন আই এ পরীক্ষা দিই তখন জানতে চাওয়া হয়েছিল আমার ধর্ম কী। আমি লিখেছিলুম Monotheistic-Eclectic Hinduism পরে যখন আই সি এস পরীক্ষা দিই তখন কিন্তু জানতে চাওয়া হয়নি আমার ধর্ম কী। শুধু জানতে চাওয়া হয়েছিল আমার ন্যাশনালিটি কী। ব্রিটিশ ভারতের বালেশ্বর জেলায় আমাদের বংশের নিবাস। তাই ওড়িশার বিভাগীয় কমিশনার আমাকে এই মর্মে সার্টিফিকেট দেন যে আমি একজন ব্রিটিশ সাবজেক্ট। কিন্তু কর্তৃপক্ষ সেই সার্টিফিকেট গ্রাহ্য করলেন না। তাঁদের মতে আমার জন্ম একটা দেশীয় রাজ্যে, সুতরাং পলিটিক্যাল এজেন্টের সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে। পলিটিক্যাল এজেন্টের কাছ থেকে যে-সার্টিফিকেট পাওয়া গেল তাতে লেখা ছিল আমি একজন ব্রিটিশ প্রোটেকটেড পার্সন। সেই সার্টিফিকেট কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেন। বিলেত থেকে ফিরে এসে দেখি যে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। কতক হলেন ইউরোপিয়ান মেম্বার্স অব দি আই সি এস আর কতক নন-ইউরোপিয়ান মেম্বার্স অব দি আই সি এস। আমাকে বলা হল যে নন-ইউরোপিয়ান মেম্বার্স প্রভিডেন্ট ফান্ডে টাকা জমা দিতে। এর পরে আমি অবগত হলুম যে আইনসভা নির্বাচনের সময় আমি নন-মহামেডান ইলেকটোরেটের ভোটার। তাতেও ধর্ম সম্বন্ধে কোনও মীমাংসা হল না।

কারণ আমি খ্রিস্টান হতে পারি। হঠাৎ একদিন একটা টেলিগ্রাম পেলুম। সরকার জানতে চান ধর্মের দিক থেকে আমি কী। বাধ্য হয়ে উত্তর দিতে হল যে আমি হিন্দু। বোঝা গেল যে আই সি এসদের আরও দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে—হিন্দু ও মুসলমান। চাকরিতে নিয়োগের সময় আমাকে হিন্দু বলে চিহ্নিত করা হয়নি। ব্রিটিশ রাজত্বের শেষ দিন পর্যন্ত সিভিল লিস্টেও আমি হিন্দু বলে গণ্য হইনি। কিন্তু আমরা সকলেই বুঝতে পেরেছিলুম যে ভেতরে-ভেতরে একটা হিসাবনিকাশ চলেছে। আর সেটা ধর্ম অনুসারে। সত্যিকার সেকুলারিজম হল ধর্মনির্বিশেষ বা ধর্মনিরপেক্ষ। ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস সত্যিকার সেকুলারই ছিল ১৯৩০ সাল পর্যন্ত। অর্থাৎ যেদিন আমি হিন্দু বলে চিহ্নিত হই সেদিন পর্যন্ত। তবে মুসলমানদের নমিনেশন আরও আগেই স্থির হয়েছিল। শিখদেরও। আদিবাসী খ্রিস্টানদেরও। তার কারণ তারা মাইনোরিটি। সুতরাং ব্যতিক্রম।

চার

খুব খারাপ লাগত যখন দেখতুম আমার ইউরোপিয়ান সতীর্থরা ওভারসিজ পে বাবদ অতিরিক্ত মাইনে পেতেন। আমার মাইনে যখন সাড়ে চারশো তখন তাঁদের মাইনে আরও দেড়শো টাকা বেশি। আরও উঁচুতে উঠলে এভাবে তাঁরা আরও বেশি পান। এটা সমর্থনের পক্ষে যুক্তি হল এই যে তাঁদের ছেলেমেয়েদেরকে বিলেতে পাঠানো হয় সেখানকার স্কুলে পড়াশুনা করতে এবং সে দেশে আরও একটা এস্টাব্লিশমেন্ট রাখতে হয়। এই তফাতটা কিন্তু ১৯২৪ সালের আগে ছিল ন। তার আগে যাঁরা আই সি এস-এ নিযুক্ত হতেন তাঁরা সমান হারে বেতন পেতেন এবং সেটাও ছিল বর্ধিত হার। তা ছাড়া আরও অনেক সুযোগসুবিধে ছিল। সেগুলি ভারতীয়রা ভোগ করত। যেমন তিন বছর অন্তর লম্বা ছুটি। সে রকম লম্বা ছুটি নিয়ে বিলেতে কাটানো। সরকারি খরচে সমুদ্রযাত্রা। তখন কে ভারতীয় কে ইউরোপীয় এই নিয়ে বাছবিচার ছিল না।

তবে উচ্চতর পদগুলিতে যাঁরা মনোনীত হতেন তাঁদের বেলায় একটা অদৃশ্য বিভাজন রেখা ছিল। আসলে ওই চাকরিটার সৃষ্টি হয়েছিল ইউরোপিয়ানদের জন্য। কিন্তু ভারতীয়দের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছিল বলে শেষের দিকে দেখা গেল ইউরোপিয়ানদের সংখ্যা শতকরা পঞ্চাশের নীচে নামতে যাচ্ছে। আর পদোন্নতির সূত্রে ভারতীয়রা উচ্চতম পদের দাবিদারও হচ্ছেন। ইংরেজরা যে অত সহজে ভারত ছেড়ে চলে গেল তার একটা কারণ তারা ভারতীয়দের অধীনে চাকরি করতে চায় না, অথচ না করে উপায় নেই।

বহরমপুরে আমি যখন চাকরিতে যোগ দিই তখন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার ফ্রেঞ্চ আমাকে যথেষ্ট সম্মান দেখান। ইউরোপীয় আর্ট নিয়ে কথাবার্তায় তিনি আমার প্রতি এতটাই আকৃষ্ট হন যে লাটসাহেবের দরবার হল-এর দেওয়াল কোন রঙে রাঙানো হবে সে বিষয়ে আমার মত জানতে চান। তিনি নিজেও পাল যুগের শিল্পকলা সম্বন্ধে একখানি বই লিখেছিলেন। সেটি আমাকে পড়তে দেন। রাজনীতি নিয়েও আমার সঙ্গে আলোচনা করেন। বলেন, 'ওই যে তরুণ নেহরু ভারতের জন্য স্বাধীনতা চান, তিনি বুঝতে পারছেন না আমরা চলে গেলে জাপান এসে ভারত গ্রাস করবে। প্রথম কাজ হচ্ছে সৈন্যদল গঠন যা দিয়ে ভারতীয়রা স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারবে।'

লাটসাহেব এলেন দরবার করতে। সেই হল-এ দরবার হল যার শিল্পনির্দেশকদের

মধ্যে আমিও ছিলুম। দরবার শেষ হলে ফ্রেঞ্চসাহেব আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন, 'এ কী কাণ্ড করেছেন আপনি? এই পোশাক পরে কেউ দরবারে আসে? তার জন্য চাই মর্নিং কোট আর স্ট্রাইপড ট্রাউজার্স।' আমি বললুম, 'আমি তো মাত্র সাত দিন হল এসেছি। এ সব পাব কোথায়?' তিনি বললেন, 'আপনি এক্ষুনি কলকাতায় চলে যান। আমি ছুটি দিচ্ছি। কলকাতার দর্জিরা তিন দিনের মধ্যে বানিয়ে দেবে।' আমি বললুম, 'আমি সবে জয়েন করেছি। মাইনে পাইনি। টাকা পাব কোথায়?' তিনি বললেন, 'আই সি এস জানলে দর্জিরা ক্রেডিট দেবে। দাম পরে শোধ করলে চলবে।' তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিলেন মর্নিং কোট আর স্ট্রাইপড ট্রাউজার্স হচ্ছে আই সি এস অফিসরদের ইউনিফর্ম। সেটা রোজ পরতে হয় না, কিন্তু সময়বিশেষে পরতে হয়। আমি চমৎকৃত হলুম। কিন্তু তাঁর কথা রাখিনি। কবে আমার দরকার হবে তার জন্য এত আগে থেকে দরবারি পোশাক বানাতে দেব কেন ধার-কর্জ করে? আমার সামনে এমনিতেই কত খরচ।

চাকরির প্রথম দিন থেকেই একজন আই সি এস অফিসরের চাই একটি বেয়ারা ও একটি বাবুর্চি। বেয়ারাটি হিন্দু, বাবুর্চিটি মুসলমান। করুণাকুমার হাজরা ছিলেন আমার আগে সেই পদে। তিনি আমার জন্য রেখে যান বেয়ারা নারায়ণ গুরু ও বাবুর্চি আবু মিয়াঁ। নায়ারণ গুরু আগে একজন ইউরোপীয় অফিসরের বেয়ারা ছিল। তিনি যখন অবসর নিয়ে চলে যান তখন নারায়ণকে হাজার টাকা ইনাম দিয়ে যান। নারায়ণেরও বয়স হয়েছিল। তার আর চাকরি করার ইচ্ছে ছিল না। সে জাজপুরের লোক। সেই হাজার টাকা সে দেশে গিয়ে ঘরের চালে গুঁজে রেখেছিল যাতে কেউ চুরি না করে। একদিন বৈতরণী নদীর বান এসে সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তখন আবার তাকে চাকরির খোঁজে বেরোতে হয়। জাজপুরে আমার বাবার মামাবাড়ি। ছেলেবেলায় সেখানে গেছি। এক হিসেবে নারায়ণ আমার দেশের লোক। তার সঙ্গে আমি ওড়িয়াতেই কথা বলি। সে খুব খুশি হয়ে আমার কাজ করে। একজন ব্যাচেলরের গৃহস্থালিতে একজন বেয়ারাই সব দেখাশুনো করে। আমার বিয়ের পরেও আমার স্ত্রী তার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করতেন। আমাদের যখন ছেলেমেয়ে হয় তখন তারাও তাকে ভালবাসত আর সেও তাদের আদর করত। আমাদের সংসারে সে চোদ্দো বছর ছিল। হঠাৎ একদিন মারা যায়। আগে থেকেই তার ভাইপো ছিল দ্বিতীয় বেয়ারা।

আবু মিয়াঁ গোড়ায় আমার একার হলেও পরে আমার বন্ধু দ্বিজেন্দ্রলাল মজুমদার ও আমার দু জনের বাবুর্চি হয়ে যায়। কাজেই তাকে রাখার খরচ দু ভাগ হয়ে যায়। নইলে আমার একার সাধ্যে কুলোত না। বদলির পরে আমি আর বাবুর্চি রাখতে সমর্থ হইনে। লীলাই রান্নাঘরের ভার নেন। বিয়ের আগে থেকে তিনি নিরামিষভোজী। কিন্তু আমার খাতিরে তাঁকে আমিষ রাঁধতে হল। তিনি সর্বতোভাবে বাঙালি হতে চেয়েছিলেন। তাই বাঙালি মতেই রাঁধতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু পাশ্চাত্য রুচি একেবারে ত্যাগ করতে পারতেন না। দেশি-বিদেশি মিলিয়ে আমার উপর হরেকরকম পরীক্ষা চালাতেন। কতকটা বই পড়ে আর কতকটা শৈলবালা চক্রবর্তীর শিক্ষায়। বাঁকুড়া থেকে বদলি হয়ে যখন নওগাঁয় যাই তখন সেখানেও তিনিই রাঁধুনি। তখনও আমার ভাই ইউরোপে, তাকে টাকা পাঠাতে হয়। তবে ইতালি ভ্রমণের জন্য যে-দেনা করেছিলুম সেটা তত দিনে শোধ হয়ে গেছে। নারায়ণ নিজের রান্না নিজে করত। সে আচারনিষ্ঠ হিন্দু।

আচ্ছা, এখানে বলে রাখি আমি সমস্তক্ষণ চাকরি ছাড়ার কথাই ভেবেছি। চাকরি ছাড়ার পরে আমাকে আবার ফিরে যেতে হবে সেই অবস্থায় যে অবস্থায় আমি মানুষ হয়েছি। তাই সকালবেলায় আমাদের ব্রেকফাস্ট ছিল চিঁড়েমুড়ি বা সেই রকম কিছু স্বদেশি খাবার, যা সুলভ অথচ পুষ্টিকর। লীলাকেও আমি ভুলিয়ে দিই তাঁর পিত্রালয়ের বিলাসবহুল জীবনযাত্রা। বিয়ের আগে থেকেই তিনি ছিলেন গান্ধী, রম্যা রলাঁ ও রবীন্দ্রনাথের ভক্ত। জীবনযাত্রাকে সরল করে আনাই ছিল তাঁরও আদর্শ। আমরা সাধারণত খদ্দর পরতুম। বলা বাহুল্য লীলা পরতেন শাড়ি, সিঁথিতে সিঁদুর, কপালে টিপ, হাতে শাঁখা। তিনি মেমসাহেব হতে চাননি আর পাঁচজন আই সি এস-এর স্ত্রীদের মতো।

বাঁকুড়া থেকে নওগাঁ যাওয়ার আগে আমি লীলাকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে যাই রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন উপলক্ষে। কবির সঙ্গে পরিচয় হয়। তিনি লীলাকে দেখে খুশি হন। লীলাকে কী বলেন আমার ঠিক মনে নেই, কিন্তু বিমল ঘোষ 'মৌমাছি' লীলাকে দেখে আমাকে বলেন, 'ঠিক যেন একটি পল্লিবধূ।' লীলা পারতপক্ষে ইংরেজিতে কথা বলতেন না, ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও বাংলায় কথা বলতেন। উচ্চারণেও ত্রুটি থাকত।

নওগাঁয় একদিন সন্ধ্যাবেলায় ল্যান্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্কের সভায় সভাপতিত্ব করছি। বাড়ি থেকে খবর গেল, 'শিগগির আসুন, ডাক্তার এসেছেন।' বাড়ি গিয়ে দেখি একটা খাটের পায়ার সঙ্গে লীলার দুই হাত ও দুই পা বাঁধা রয়েছে আর লীলা তারস্বরে চেঁচাচ্ছেন, 'আমি বইতে পারছি না।' তার মানে তিনি সইতে পারছেন না। ইংরেজি bear কথাটার দু রকম অর্থ হয়—বওয়া এবং সওয়া। মোট কথা তিনি আর সহ্য করতে পারছিলেন না। সুকুমার চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী এসে পড়েছিলেন। তিনি ভার নিয়েছিলেন লীলাকে সাহায্য করার। ডাক্তার অন্নদামঙ্গল চক্রবর্তী তো ছিলেনই আর ছিল মিডওয়াইফ রাজলক্ষ্মী সরকার। ঘরে বিজলি বাতি ছিল না, ছিল পেট্রোম্যাক্স। আমাকে ঘর থেকে বার করে দেওয়া হল। কিছুক্ষণ পরে আমি শুনতে পেলুম সদ্যোজাত শিশুর প্রথম কান্না। রাজলক্ষ্মী এসে বলে গেল, 'ছেলে হয়েছে।'

আমার নিজের জন্মের সময় শাঁখ বাজানো হয়েছিল। আমার ছেলের জন্মের সময় কেউ শাঁখ বাজায়নি। বাড়িতে শাঁখই ছিল না। আমাদের কারও খেয়ালই হয়নি।

মনের আনন্দে আমি স্থির করলুম যে একটা ভোজ দেব। হেডক্লার্ক হেমচন্দ্র চক্রবর্তীকে বললুম, 'আমি একশো টাকা খরচ করতে রাজি। আপনি একটা ভোজের আয়োজন করুন।' তিনি বললেন, 'একশো টাকার ভোজে কজন খাবে? তার চেয়ে একটা যাত্রা দিন। হাজার হাজার লোক দেখবে।' যাত্রাই দেওয়া হল। হাজার হাজার লোক দেখল। পরে একদিন আমি বিশ মাইল দূরে থানা পরিদর্শনে গিয়েছি। সঙ্গে লীলা ও লীলার কোলে ছেলে। শুনলুম একজন আর একজনকে বলছে, 'এই সেই ছেলে যার জন্য যাত্রা দেখতে গিয়েছিলুম।'

অন্নপ্রাশনের সময় বাবা এসেছিলেন ঢেঙ্কানাল থেকে নাতির মুখে ভাত দিতে। জানতে চাইলেন নাম কী রাখা হবে। আমি বললুম, 'পুণ্য।' উনি বললেন, 'শুধু পুণ্য কেন? নাম রাখো পুণ্যশ্লোক।' তারপর তিনি একটি শ্লোক আবৃত্তি করলেন। 'পুণ্যশ্লোকঃ নলরাজা পুণ্যশ্লোকঃ যুধিষ্ঠিরঃ—।' পরের লাইনটি বোধহয় 'পুণ্যশ্লোকা বৈদেহী চ পুণ্যশ্লোকঃ জনার্দনঃ।' বলা যেতে পারে ইনি চতুর্থ পুণ্যশ্লোক। পুণ্যকে আমাদের বাড়ির সকলেই

ভালবাসতেন। সেও বংশের বড় ছেলে। বাবার মতো, আমার মতো। বড় ছেলে একটু আদুরে হয়।

পাঁচ

পুণ্যকে দেখতে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মণিদা আর গোপালদাস মজুমদার। বিলেত থেকে যখন ফিরে আসি তখন মণিদা আমার জন্য ক্যালকাটা হোটেল নামক বাঙালিদের হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। সে সময় আমার সঙ্গে দেখা করতে যাঁরা আসেন তাঁদের মধ্যে আমার পত্রবন্ধু অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তো ছিলেনই আর ছিলেন বিষ্ণু দে, শিবরাম চক্রবর্তী প্রমুখ নবীন সাহিত্যিক। হোটেল ম্যানেজার নরেন্দ্রকুমার বসু নিজেও একজন সাহিত্যিক ছিলেন। অচিন্ত্য হয় আমার গাইড। ওকে নিয়ে আমি নানা জায়গায় যাই।

প্রমথ চৌধুরী মশায়ের কথা আগেই বলেছি। এবার বলি সুধীরচন্দ্র সরকারের কথা। বিলেতে থাকতে তাঁর সম্পাদিত 'মৌচাক'-এর জন্য মাসে মাসে 'ইউরোপের চিঠি' লিখতুম। আমার প্রথম দুটি বই—'তারুণ্য' ও 'রাখী'—এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স থেকে তিনিই প্রকাশ করেন। সে সময় তিনি আমাকে অচিন্ত্যর লেখা 'বেদে' এবং প্রবোধকুমার সান্যালের লেখা 'কাজললতা' উপহার দেন। পরে যত বার কলকাতায় এসেছি, তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে। কোনও এক সময়ে তিনি আমার কাছে একখানি উপন্যাস চান। তারই জন্য আমি লিখি 'অসমাপিকা'। তিনি সেটি প্রকাশ করেন বেশ কিছু দেরিতে। কারণ সেটি ছিল পরকীয়া প্রেমের উপন্যাস। তখনকার দিনে সে রকম বই প্রকাশ করা সাহসের কাজ। বইটি উৎসর্গ করি অচিন্ত্যকে। অচিন্ত্যও আমাকে উৎসর্গ করে তার বই 'আকস্মিক'। ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছিলুম 'বিচিত্রা'র জন্য 'সত্যাসত্য' উপন্যাস সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের আগ্রহে। কিন্তু বড় ভাবনা ছিল পাঁচ খণ্ডে সে উপন্যাস যখন শেষ হবে তখন তার প্রকাশক পাব কোথায়!

একবার কলকাতায় আসতে হয়েছিল কী একটা কাজে। শুনলুম অচিন্ত্যর বিয়েতে আমাকে বরযাত্রী হতে হবে। আমি অচিন্ত্যর বাড়ি গিয়ে দেখি সেখানে রয়েছেন কাজী নজরুল ইসলাম ও গোপালদাস মজুমদার। এঁদের দু জনের সঙ্গে আমার আলাপ হল। গোপালবাবু বললেন, 'আপনি আমাকে একটা ছোট উপন্যাস দিতে পারেন?' আমি তখন 'সত্যাসত্য' নিয়ে মগ্ন ছিলুম। বললুম, 'সম্ভব নয়।' রাতের ট্রেনে বহরমপুরে ফিরে যাবার সময় হঠাৎ খেয়াল হল আমার একটা ভ্রমণকাহিনীকে উপন্যাসে রূপান্তর করলে কেমন হয়! নাম রাখব 'আগুন নিয়ে খেলা'। গোপালবাবুকে লিখলুম সে কথা। তিনি খুশি হয়ে সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করতে রাজি হলেন। কথা রইল আমি যখন যেটুকু লিখব তখন সেটুকু তাঁকে পাঠিয়ে দেব। তিনি সেটুকুর প্রুফ পাঠাবেন। আমি প্রুফ পাঠাবার সময় তাঁকে নতুন কপি পাঠাব। তিনি তার প্রুফ পাঠাবেন। এমন করেই বই শেষ হয়ে যায় ও সঙ্গে সঙ্গে ছাপা হয়ে যায় মাস দুয়েকের মধ্যে। সেটি উৎসর্গ করি মণিদার নামে। সে বই যখন লেখা হচ্ছে সেই সময় আমার জীবনে লীলার আবির্ভাব। অনেকের ধারণা লীলাই হচ্ছে 'আগুন নিয়ে খেলা'র নায়িকা। কিন্তু সেটা কাকতালীয়।

আমি বিয়ে করছি শুনে গোপালদাসবাবু উপন্যাসের প্রথম সংস্করণ বাবদ আমাকে

আড়াইশো টাকা দিলেন। সেটা দিয়ে কেনা হল বিয়ের আংটি—লীলার ও আমার। আর লীলার জন্য শাড়ি। সেই আংটি এখনও আমার আঙুলে আছে। বিয়েতে যোগ দিতে গোপালবাবু ও অচিন্ত্য রাঁচিতে দিয়েছিলেন।

সবচেয়ে বড় কথা গোপালবাবু বললেন, 'এবার আপনি আমায় আর একখানি উপন্যাস দিন।' আমি বললুম, 'আমি দিতে রাজি, কিন্তু আপনি কি ছাপতে রাজি হবেন? 'সত্যাসত্য' অত্যন্ত গুরুপাক উপন্যাস হবে। কজন বুঝবে? কজন কিনবে? ওটা পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত হবে। তত দিন কার ধৈর্য থাকবে? আপনি যদি প্রকাশ করেন তো আপনার লোকসান হবে।' তিনি বললেন, 'সে ভাবনা আমার, আপনার নয়। আপনি লিখবেন, লেখার সঙ্গে সঙ্গে আমায় নতুন কপি পাঠাবেন, আমি তার প্রুফ পাঠাব।' ইতিমধ্যে 'সত্যাসত্য'-এর অনেকখানি 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত হয়েছিল। সেই অংশের নাম রাখা হল 'যার যেথা দেশ'। তারই বাকি অংশের সঙ্গে নতুন অংশ জুড়ে দ্বিতীয় খণ্ডের নাম হয় 'অজ্ঞাতবাস'। এর মধ্যে 'বিচিত্রা'য় লেখা বন্ধ হয়ে যায়। সরাসরি লিখি ও গোপালবাবুকে পাঠাই। অন্যান্য খণ্ডের কথা পরে বলব। শেষ পর্যন্ত লিখতে হয় পাঁচটির উপরে আরও একটি খণ্ড। তত দিনে আমার বয়স আটত্রিশ বছর। গোপালদাসবাবু যদি সহায় না হতেন তা হলে 'সত্যাসত্য' কেউ প্রকাশ করতে রাজি হতেন কি না সন্দেহ। আর আমারও এত সামর্থ্য ছিল না যে নিজের টাকায় 'সত্যাসত্য' বের করতে পারব আর করলেও নিজেই বিক্রি করতে পারব।

সুধীরবাবু আমার 'পথে প্রবাসে' পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। সেটাই আমার সবচেয়ে জনপ্রিয় বই। তিনি আমার আরও অনেক বই প্রকাশ করেন। 'পাহাড়ী' তাঁরই অনুরোধে লেখা। সেটি আমি উৎসর্গ করি তাঁরই পুত্রবধূকে। তাঁর দোকানে রোজ বিকেলে একটি আড্ডা বসত। কলকাতায় এলে আমিও সেখানে যেতুম। বহু সাহিত্যিকের সঙ্গে আলাপ হত।

সেই 'সবুজপত্র'-এর সময় থেকে দেখা গেছে আড্ডা ছাড়া সাহিত্য হয় না। 'ভারতী'র আড্ডা, 'কল্লোল'-এর আড্ডা, 'শনিবারের চিঠি'র আড্ডা, 'পরিচয়'-এর আড্ডা, 'রবিবাসর'-এর আড্ডা এমনই কত আড্ডা। আমি কলকাতায় থাকিনে। কোনও আড্ডার সঙ্গে যুক্ত নই, কোনও গোষ্ঠীর সঙ্গেও না। সম্পাদকের অনুরোধে 'কল্লোল'-এ ও 'কালিকলম'-এ লিখেছি, কিন্তু গোষ্ঠীভুক্ত হইনি। তবে 'পরিচয়'-এর সূচনা থেকে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের আমন্ত্রণে আমি 'পরিচয়'-এ অনেকগুলি লেখা দিই। একবার কি দুবার সুধীন্দ্রনাথের বাসভবনে শুক্রবারের আড্ডায় যোগ দেওয়ার সৌভাগ্য হয়। এমন একটি মননশীল লেখকদের সমাবেশ তখনকার দিনে আর কোথাও দেখা যেত না। তাঁরা সকলেই ছিলেন বিশ্বমনস্ক। বিশ্বসাহিত্য নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন।

সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন বহুবিদ্য পুরুষ, সুদর্শন ও সুভদ্র। তাঁর সঙ্গে আমার খানিকটা অন্তরঙ্গতা হয়েছিল। একদিন আমাকে লেখেন তিনি আর 'পরিচয়' চালাতে পারছেন না, সেটি কমিউনিস্টদের দিয়ে দিচ্ছেন। তাঁর অর্থাভাব ছিল না। লোকসান দিয়েও তিনি 'পরিচয়' চালিয়ে যেতে পারতেন। 'পরিচয়' তো ছাড়লেনই। কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের বাড়িটাও ছাড়লেন। শেষে বাংলা সাহিত্য ও বাঙালি স্ত্রীও ছাড়লেন। স্বাধীনতার পরে তাঁকে দেখি রাসেল স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে। সাহেবি পোশাক পরে ডিনার খেতে যাচ্ছেন কয়েকজন অবাঙালির

সঙ্গে। তখন তিনি 'স্টেটসম্যানে' কাজ করছেন। লিখতেন ইংরেজিতে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও তরু দত্তের পরে তিনি আরও এক দত্ত যিনি দুই সংস্কৃতির মধ্যে সেতুবন্ধন করেছিলেন। যেমন বাঙালি পোশাকে তেমনই সাহেবি পোশাকে তাঁকে বেশ মানাত।

'কালিকলম'-এ দিলীপকুমার রায় লেখেন 'তারুণ্য'র সুদীর্ঘ সমালোচনা। তখন আমি বিলেতে। প্রশংসা করার পরে জানতে চাইলেন আমি এত একদেশদর্শী কেন? সন্ন্যাসের বিপক্ষে কেন? তার কিছুদিন পরে তিনি পণ্ডিচেরি চলে যান। সন্ন্যাস না নিলেও সন্ন্যাসীদের মতো থাকেন। আর আপন মনে গান বাঁধেন আর গান করেন। দেশে ফেরার পরে আমি যখন বহরমপুরে তখন হঠাৎ একদিন সরলার চিঠি পাই। ভেলোর জেল থেকে লিখেছেন তাঁকে ওড়িশায় গ্রেপ্তার করে মাদ্রাজে ভেলোর জেলে বন্দি করে রাখা হয়েছে। তিনি লবণ সত্যাগ্রহে যোগ দিয়েছিলেন এই তাঁর অপরাধ। আমি তার কী করতে পারি। পণ্ডিচেরিতে আমি দিলীপকুমারকে চিঠি লিখি। সেই আমার প্রথম চিঠি। সরলার সঙ্গে যদি দেখা করতে পারেন তো করবেন। সরলা ছিলেন দিলীপকুমারের গানের ভক্ত। দিলীপকুমার আমার চিঠির উত্তরে লেখেন যে সেটা তাঁর সাধ্য নয়। এই সূত্রে আমাদের পত্রালাপ আরম্ভ হয়। তিনি তাঁর 'দু ধারা' উপন্যাস আমাকে পাঠান। আমি তার সমালোচনা লিখে 'মুক্তধারা' পত্রিকায় পাঠিয়ে দিই। সেটি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বারা সম্পাদিত হবে বলে ঘোষিত হয়েছিল। কিন্তু আদৌ প্রকাশিত হয় না। আমার লেখাও ফেরত আসে না। এর পরে দিলীপকুমারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক গভীরতর হয়। আমি তাঁকে দাদা বলে ডাকি। আমার বিয়ের পর লীলারও তিনি দাদা হন। আমি যখন রাজশাহির জেলাশাসক তখন তিনি আমাদের বাড়িতে অতিথি হন। আমাদের সম্পর্ক চিরস্থায়ী হয়েছিল।

তিন জনকে আমি দাদা বলতুম। নবদা, মণিদা ও দিলীপদা। তিন জনের সঙ্গেই আমার চিরস্থায়ী সম্পর্ক। নবদা মানে নবকৃষ্ণ চৌধুরী। তিনি ও তাঁর স্ত্রী মিনুদি (মালতী) লবণ সত্যাগ্রহ করে দু জনেই জেলে গিয়েছিলেন। দিদির কোলে একটি শিশু। যত বার গান্ধীজি ডাক দিয়েছেন তত বার তাঁরা জেলে গিয়েছেন। স্বাধীনতার পরে নবদা ওড়িশার দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী হন। পরে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী ভূদান আন্দোলনে যোগ দেন।

এ ছাড়া আরও একজনকে আমি দাদার মতো শ্রদ্ধা করতুম। তিনি 'জাপানে' ও 'চিত্রবহা'র লেখক সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। 'তারুণ্য' পড়ে তিনি আমায় একটি চিঠি দিয়েছিলেন স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসা জানিয়ে। আমার 'আমরা' গ্রন্থটি তাঁকে উৎসর্গ করেছি। তাতে বলেছি তিনি 'আমার সমানধর্মা'—ভবভূতির ভাষায়। তিনি ছিলেন ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের বন্ধু। জাপানে দু জনেই যান। সেখান থেকে ধনগোপাল যাত্রা করেন আমেরিকায়। সাহিত্যিক হিসেবে সেখানে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। ইংরেজি ভাষায়, কিন্তু ভারতীয় বিষয়ে। তাঁর আত্মহত্যার পরে সুরেশচন্দ্র ও আমি কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় পদচারণ করে বেড়াই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

বহরমপুরে থাকতেই আমি রাধারাণী দত্তের 'লীলাকমল' নামক কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা করি। একদা 'বিজলী'-তে রাধারাণী দত্ত নামে এক বিদ্রোহিণী মহিলা জ্বালাময়ী ভাষায় নারীর অধিকার দাবি করতেন। কলেজ জীবনে আমি তাঁর রচনা পাঠ করে মনে মনে প্রশংসা করতুম। বিলেত থেকে ফিরে একদিন তাঁর নতুন পরিচয় পাই একজন মধুর রসের কবি হিসাবে। কী করে তা সম্ভব হল তা বোঝা গেল কিছুদিন পরে তাঁর বিয়ের খবর পেয়ে।

কে যেন আমাকে নিয়ে গেল লিলুয়ায় যেখানে তিনি হনিমুন যাপন করছিলেন। হনিমুন কথাটার অর্থ মধুচন্দ্র নয়, মধুমাস। মুন শব্দটার দুই অর্থ—চন্দ্র এবং মাস। মধুচন্দ্রিমা লেখাটা ভুল। রাধারাণী নরেন্দ্র দেবের পত্নী, তাই দেবী। তাঁর সঙ্গে প্রথম আলাপের দিন সলজ্জ ভাবে হেসে আমাকে বলেন, 'বিয়ে করেছি বটে, কিন্তু এক শয্যায় শোব না।' তার মানে তিনি ব্রহ্মচর্য পালন করবেন। আমি হেসে বলি, 'কদ্দিন?' আমি তাঁকে দিদি বলে ডাকা শুরু করি। একটু একটু করে তিনি আর পাঁচজন স্ত্রীর মতো স্বামী সন্তান নিয়ে ঘর করেন। তাঁর স্বামী তাঁকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। নিজেও ছিলেন পত্নীগতপ্রাণ। তিনিও ছিলেন আমার আর একজন দাদা। রাধারাণীদি আমাকে দারুণ এক চমক দেন। অচেনা লেখিকা অপরাজিতা দেবীর কাব্যগ্রন্থ ডাকযোগে পেয়ে আমি বুঝতেই পারিনি উনিই পাঠিয়েছিলেন 'লীলাকমল'। একেবারে অন্য হাতের অন্য ধাঁচের লেখা। নাম থেকে বোঝা উচিত ছিল তিনি পরাজিতা হননি বলেই অপরাজিতা এক বিদ্রোহিণী। কিন্তু আমার ধারণা তিনি বোধহয় কমবয়সী এক কবি। বিশ বছর পরে তাঁর ছদ্মনাম তিনি নিজেই কবুল করলেন। তার ভেতরে যে আগুন ছিল সেটা কোনওদিন নিবে যায়নি, যদিও বাইরে প্রকাশ পেত না। আমার সঙ্গে নিভৃত আলাপের সময় 'বিজলী'র সেই রাধারাণী দত্তকে আমি বিদ্যুতের ঝলকের মতো দেখতে পেতুম।

বিলেতে যখন ছিলুম তখন অধ্যাপক সরোজকুমার দাস এবং তাঁর পত্নী তটিনী দাস ছিলেন আমার সঙ্গে ও আমার বন্ধু হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক বাসায় ও এক অন্নে। এক বছর কাল। দেশে ফিরে আসার পরেও তাঁদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক চিরস্থায়ী হয়েছিল। তটিনী দাসকে আমি বলতুম দিদিবউদি। তিনি যেমন বিদুষী তেমনই সুগৃহিণী ও তেমনই সুরাঁধুনি। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন লন্ডনের বহু বাঙালি পর্যটক। তাঁদের মধ্যে ছিলেন অতুলপ্রসাদ সেনের বোন কিরণ বোস। আমার কিরণদি। পরে লীলারও। তাঁর সঙ্গেও আমার সম্পর্ক চিরস্থায়ী হয়েছিল।

ছয়

বহরমপুরে আমরা ছিলুম চার জন আই সি এস অফিসর। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জে সি ফ্রেঞ্চ, জেলা জজ অনারেবল সুশীলকুমার সিনহা, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট দ্বিজেন্দ্রলাল মজুমদার আর আমি। ইংল্যান্ডের ব্যারনদের পুত্রদের নামের পূর্বে মিস্টার না বলে অনারেবল বলা হয়। আমাদের জেলা জজ ছিলেন লর্ড সিনহার পুত্র। লর্ড সিনহা ছিলেন ব্যারন সিনহা অব রায়পুর। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র অরুণ পরে লর্ড হন। সুশীল ছিলেন তৃতীয় পুত্র। আমরা চারজনেই ছিলুম বহরমপুর ক্লাবের মেম্বার। আমাদের সমান মর্যাদার আরও কয়েকজন অফিসর ছিলেন। তাঁরা সিভিল সার্জন, পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট ও অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিস সুপারিনটেন্ডেন্ট। ফ্রেঞ্চ সাহেব ছিলেন ব্যাচেলর। সুতরাং মিসেস রমলা সিনহা ছিলেন আমাদের স্টেশনের ফার্স্ট লেডি। বহরমপুর ক্লাবে তিনি টেনিস খেলতে আসতেন। আমি হতুম একজন পার্টনার।

একবার মহিলাদের সমেত একটা ফ্যান্সি ড্রেস পার্টি হয়েছিল। তাতে আমি কারও নাচের পার্টনার হইনি। আশ্চর্যের ব্যাপার। অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট মিস্টার শামসোদদোহার স্ত্রী মিসেস দোহা পরদা তো মানতেনই না, তাসও খেলতেন, পুরুষমানুষের

সঙ্গে নাচতেনও। কিন্তু অপর অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট মিস্টার ইসমাইলের স্ত্রী ছিলেন ঘোর পরদানশিন। সবচেয়ে তাজ্জব ব্যাপার হল সেই গোঁড়া ইসমাইল সাহেবই পরবর্তীকালে আবুল হাসনাত নামে বিখ্যাত হলেন যৌন বিজ্ঞানের উপর প্রামাণ্য পুস্তক লিখে। আমি যত দূর জানি, তিনি ছিলেন আসাম্প্রদায়িক ও গান্ধীভক্ত। দোহাকে আমি প্রথম জীবনে অসাম্প্রদায়িকই দেখেছিলুম। পরে তাঁর পরিবর্তন হয়।

বহরমপুর ক্লাবে একটি চমৎকার লাইব্রেরি ছিল। তাতে সমকালীন ইউরোপীয় সাহিত্যের বেশ কিছু বাছা বাছা বই পড়তে পাওয়া যেত। বোধহয় আমিই একমাত্র পাঠক। তা ছাড়া কয়েকটি সাময়িকপত্র আসত ইংল্যান্ড থেকে। আমিও কয়েকটি আনাতুম ইংল্যান্ড ও আমেরিকা থেকে। ইউরোপ ছিল আমার কাছে মানস সরোবর আর আমি ছিলুম তার হংস। বহরমপুরের সেই পরিবেশেই 'সত্যাসত্য' আরম্ভ করা সম্ভব হয়। পরে আর তেমন পরিবেশ পাইনে। তবে লীলার মধ্যে আমি পাশ্চাত্য মানসের সান্নিধ্য পাই। তাঁকে আমার সাথী না পেলে 'সত্যাসত্য' লেখা আরও শক্ত হত। সেদিক থেকে তিনি যেন ঈশ্বরের দ্বারা প্রেরিত। সেটা যে কত বড় একটা দান তা আমার সাহিত্যিক সত্তাই জানেন। পরে জানতে পেলুম যে তিনি নিজেও একজন লেখিকা। তাঁর নিজের সংগ্রহের মধ্যে ছিল রম্যাঁ রলাঁ-র বেঠোফেন জীবনী প্রভৃতি পুস্তক। আর ছিল খালিল জিব্রনের লেখা 'প্রফেট'। একটি অসাধারণ গ্রন্থ। জিব্রন ছিলেন লেবাননের আরব খ্রিস্টান। তাঁর সেই বই পড়ে মনে হল তিনি পুনর্জন্মে বিশ্বাস করতেন।

লীলার কাছে ভগবদ্গীতার ইংরেজি পদ্যানুবাদও ছিল। একজন আমেরিকান কবির লেখা। লীলা ভারতীয় সংগীত সম্বন্ধে পণ্ডিত ভাতখণ্ডের সঙ্গে আলাপ করে এসেছিলেন। নওগাঁ থেকে তিনি কলকাতায় যেতেন সেতার শিখতে। উঠতেন আমার বাল্যবন্ধু মনোরঞ্জন রায়ের ওখানে। ওর মা ওকে মেয়ের মতো ভালবাসতেন। তাঁর ছয় ছেলে। একটিও মেয়ে হয়নি। তাই লীলাকেই তিনি মেয়ে করে নেন।

বহরমপুরে থাকতে আমি রোজ বিকেলে টেনিস খেলতুম ও সন্ধেবেলায় বিলিয়ার্ডস। অমন একটি বিলিয়ার্ড টেবল আমি আর কোথাও পাইনি। অমন একজন মার্কারও না। মার্কারের নাম ভুলে গেছি। সে ছিল উর্দুভাষী মুসলমান। ধুতিটাকে মালকোঁচার মতো পরত। দাড়ি ছিল না, গোঁফ ছিল বলে মনে পড়ছে না। মাথায় পাগড়ি। পাগড়ি তো আমার বেয়ারা নারায়ণের মাথাতেও ছিল। তখনকার দিনে ওটা ছিল টুপির বিকল্প। আমার বাবুর্চি আবুর মাথায় ছিল সাদা টুপি। অফিসর শ্রেণীর বাঙালি মুসলমানরা মাথা খালিই রাখতেন এবং পাশ্চাত্য পোশাক পরতেন। কদাচিৎ এক-আধজন আচকান পায়জামা পরতেন। তেমন পোশাক হিন্দুদেরও পরতে দেখা যেত। সেটা ছিল পাশ্চাত্য পোশাকের বিকল্প।

বহরমপুরে চাকরির গোড়ার দিকে আমাকে ফৌজদারি মামলার বিচার পদ্ধতি শিখতে হয়েছিল সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হেদায়ত আলি সাহেবের এজলাসে। মামলাটা বোধহয় ছিল গোরু চুরির মামলা। আসামিদের তিনি দণ্ডবিধি আইনের নির্দিষ্ট ধারায় দু বছর কারাদণ্ড দেন। আমি একটু অস্বস্তি বোধ করলে তিনি আমাকে বোঝান, 'গরিবের আর আছে কী? গোরু আর জরু। সেই গোরুই যদি চুরি করে তবে কম সাজা দেওয়া যায়?' একদিন তিনি আমাকে বলেন, 'মামলা মোকদ্দমা বিচার করা ছাড়া আপনার আরও গুরুতর কাজ হবে দাঙ্গা বাধার উপক্রম হলে ঘটনাস্থলে ছুটে যাওয়া। আমাকে একবার যেতে

হয়েছিল। সঙ্গে চারটি বন্দুকধারী সেপাই। গিয়ে দেখি এক বিরাট জনতা চিৎকার করছে, তাদের দাবি মানতে হবে। আমি বলি, হ্যাঁ, তোমাদের দাবি বিবেচনা করে দেখব, কিন্তু আগে তো চলে যাও দেখি। তারা আমার হুকুম অমান্য করে। তখন আমার কর্তব্য হচ্ছে লাঠি চার্জ করা। তাতেও যদি ছত্রভঙ্গ না হয়, গুলি চালানো। লাঠি নিয়ে যাইনি। কিন্তু গুলি চালানোর হুকুম দিতে আমার সাহস হয় না। তাতে হয়তো চারটে মানুষ মরবে, কিন্তু আমারও চারটে সেপাই প্রাণে বাঁচবে না। তখন আমি একটা টেবলের উপর দাঁড়িয়ে নাচতে শুরু করে দিলুম। এটা ওরা প্রত্যাশা করেনি। হতভম্ব হয়ে হেসে উঠল। গোলমালটা আপনিই মিটে গেল।'

হেদায়ত আলি সাহেবের দাঙ্গা নিবারণের এই বিচিত্র উপায় তাঁর উপরওয়ালারা সমর্থন করবেন কিনা জানিনে। এতে ম্যাজিস্ট্রেটদের প্রেস্টিজহানি হয়। অন্তত আমার তো প্রেস্টিজহানি হতই। প্রেস্টিজ সম্বন্ধে আমার টনটনে জ্ঞান ছিল। আমাকে মিস্টার না বলে বাবু বললে আমি চটে যেতুম। বিলেতফেরতরা সবাই চটে যেতেন। সরকার থেকে যে সব চিঠি আসত সে সব চিঠিতে মিস্টার বলে সম্বোধন তো থাকতই, চিঠির তলায় লেখা থাকত অন্নদাশঙ্কর রায় এসকোয়্যার আই সি এস। যে সব চিঠি পুরোপুরি সরকারি সে সব চিঠিতে স্যার বলে সম্বোধন করা হত আর তলায় থাকত I have the honour to be, sir, your most obedient servant. অথচ তিনি হয়তো আমার উপরওয়ালা। স্বাধীনতার পরে সে পাট উঠে গেছে। এখন লেখা হয় yours faithfully.

অপরপক্ষে আমাদেরকে পাবলিকের জন্য পাঁচ রকম লোকহিতকর কাজ করতে হত যেটা আমাদের সরকারি কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। তার দ্বারা প্রমাণ হত যে আমরা প্রজাদের মা-বাপ। আমি যখন শিক্ষানবিশির জন্য বিলেত যাই তখন পাটনা কলেজে প্রিন্সিপ্যাল হর্ন সাহেব আমাকে লেখেন, 'তোমার সঙ্গে এক জাহাজেই যাচ্ছেন স্যার বসন্তকুমার মল্লিক আই সি এস। পাটনা হাইকোর্টের জাস্টিস। তাঁকে আমি তোমার কথা বলেছি। তাঁর সঙ্গে দেখা কোরো।' স্যার বসন্তকুমার তখন জেনেভায় যাচ্ছিলেন লিগ অব নেশনসে ভারতের প্রতিনিধি হয়ে। লেডি মল্লিক ছিলেন ইউরোপীয় মহিলা। জাহাজে ইনিই আমাকে নিয়ে যান তাঁর স্বামীর ক্যাবিনে। স্যার বসন্তকুমার ছিলেন অসুস্থ। প্রায় ষাট বছর বয়সেও দেখতে সুপুরুষ। বিছানার থেকে উঠে বসে তিনি আমাকে বললেন, 'সে সব দিন কি আর আছে যখন আমরা জুনিয়র অফিসররা যেখানেই যেতুম সেখানেই একটা কিছু চিহ্ন রেখে আসতুম। কোথাও একটা রাস্তা, কোথাও একটা ব্রিজ, কোথাও একটা পুষ্করিণী, কোথাও একটা স্কুল, কোথাও এটা ডিসপেনসারি, কোথাও একটা লাইব্রেরি, কোথাও একটা প্লে গ্রাউন্ড। আজকাল ও সব করেন পলিটিসিয়ানরা। যেমন একজন মন্ত্রী বা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান।' তাঁর সে সব কথা শুনে আমি তো ভেবেছিলুম, শুধু সরকারি কাজ ছাড়া আমার কিছু করণীয় থাকবে না।

কিন্তু নওগাঁ মহকুমার ভার পেয়ে দেখি যে কোথাও মহকুমা হাকিম হিসেবে, কোথাও গাঁজা সোসাইটির ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে, কত রকম করণীয় কাজ ছিল যার জন্য আমি মাইনে পাইনে বা যার উপর আমার প্রমোশন নির্ভর করে না। এ সব কাজে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার পিনেল আমাকে উৎসাহ দিতেন। সে সময় মন্দা চলছিল! মহকুমা হাকিমদের ট্র্যাভিলিং অ্যালাউন্স ছাঁটাই করা হচ্ছিল। তাদের সফরে যাওয়া কমাতে হয়েছিল।

কিন্তু পিনেল সাহেব আমাকে বলেন তিনি সরকারকে লিখে আমার ট্র্যাভেলিং অ্যালাউন্স ছাঁটাই করতে দেবেন না। আমি যত দিন খুশি গ্রামে গিয়ে তাঁবুতে বাস করতে পারব ও স্থানীয় লোকদের সঙ্গে মিলেমিশে তাদের অভাব-অভিযোগ দূর করব। মহকুমা হাকিমরাই সরকারের চোখ-কান। সরকারকে জানাতে হবে জনসাধারণ কী চায়। তিনি নিজেও খুব সফর করতেন। হাতির পিঠে চড়ে আমরা একসঙ্গে বেড়িয়েছি। তারপর এলেন মিস্টার মার্টিন। তাঁর সঙ্গে সমানে পা ফেলে হেঁটেছি। পাহাড়পুর স্তূপ থেকে বদরগাছি ডাকবাংলা পর্যন্ত।

পাহাড়পুর স্তূপটা বৌদ্ধদের হলেও তাতে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তিও ছিল। ডাকবাংলায় গিয়ে আমরা রাত কাটাই দু জনায় দুটো ঘরে। কান পেতে শুনতে পাই মার্টিন সাহেব কী যেন পড়ছেন দুর্বোধ্য ভাষায় তন্ময় হয়ে। সকালবেলা আমি জানতে চাই তিনি কী পড়ছিলেন? সেটা কোন ভাষা? তিনি বলেন, ওটা Gaelic ভাষায় লেখা স্কটল্যান্ডের পুরাতন কাব্য। এখানে বলে রাখি, ব্রিটিশ বললে কেবল ইংরেজ বোঝায় না, স্কটল্যান্ডের লোক, ওয়েলসের লোক, আয়াল্যান্ডের লোক, তারাও ব্রিটিশ। তাঁদের কারও কারও মধ্যে ভারতের প্রতি সহানুভূতি লক্ষ করেছি। তাঁরা সবাই সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন বা ভারতবিদ্বেষী ছিলেন এটা একটা ভুল ধারণা। তাঁরা প্রচুর লোকহিতকর কাজ করে গেছেন। যে কোনও জেলায় যে কোনও মহকুমায় তার সাক্ষ্য দেখা যেত। তবে ঘন ঘন সাহেব হত্যার পরে তাঁদের মন ভেঙে যায়। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের পরে তাঁদের মন উঠে যায়। ঔপনিবেশিক যুগ বলে যেটাকে চিহ্নিত করা হচ্ছে সেটার প্রকৃত নাম হওয়া উচিত ইন্ডো-ব্রিটিশ যুগ।

ইউরোপিয়ানরা এ দেশে বাণিজ্য ও শাসন করতে এসেছিল, উপনিবেশ স্থাপন করতে আসেনি। স্থায়ীভাবে বসবাস করেছিল এমন ইউরোপিয়ান পরিবারের দৃষ্টান্ত হাজারটিও হবে না। রামমোহন চেয়েছিলেন কিছু কিছু ইউরোপিয়ান স্থায়ীভাবে ভারতে বসবাস করুন যেমন করেছেন মুসলমানরা। তা হলে ইউরোপিয়ানরা এ দেশের স্বার্থে কাজ করবেন। কিন্তু ইউরোপিয়ানরা তাঁর পরামর্শ নেননি। এ দেশের জলবায়ু তাঁদের উপযুক্ত নয়। তা ছাড়া এটাও তাঁরা জানতেন যে একদিন তাঁদের ভারত ছাড়তে হবে। ইউরোপিয়ানরা শুধু সেই সব অঞ্চলেই বসবাস করেন যেখানকার জলবায়ু তাঁদের স্বদেশের অনুরূপ। যেমন শিলং, যেমন দার্জিলিং, যেমন সিমলা। সারা দেশটাকে তাঁদের উপনিবেশ বলতে পারা যেত না কিংবা গোটা যুগটাকে ঔপনিবেশিক যুগ।

সাত

নওগাঁ মহকুমার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল। একটি হল তার পুরাকীর্তি। নিয়ামতপুর থানায় যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিল পালযুগের প্রস্তরমূর্তি। কোনওটি বৌদ্ধ কোনওটি হিন্দু। বৌদ্ধকেও হিন্দু বলে পুজো করা হচ্ছে। এক-একটা দিঘি ছিল যার পার আধ মাইল বা আরও বেশি লম্বা। তবে সেখানে জল ছিল না, ধানচাষ হচ্ছিল। ছোট ছোট ইট পাওয়া যাচ্ছিল যা দিয়ে এককালে বাড়ি তৈরি হত। তারপর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথের জমিদারি। তিনি একটি তহবিল স্থাপন করেছিলেন। তার নাম কল্যাণবৃত্তি তহবিল। খাজনা দেওয়ার সময় প্রজারা টাকা পিছু এক আনা চাঁদা দিত আর জমিদার দিতেন এক আনা অনুদান। সেই তহবিল

থেকে তিনটি কেন্দ্রে তিনটি ডাক্তারখানা পরিচালনা করা হত, দুটি কেন্দ্রে মিডল স্কুল ও একটি কেন্দ্রে একটি হাইস্কুল। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য সারা ভারতের গাঁজা চাষ হত নওগাঁ মহকুমার দুটি মাত্র থানায়। লাইসেন্সপ্রাপ্ত চাষিরা গাঁজা চাষ করে সরকারের হাতে তুলে দিত একটি সমবায় সমিতির মারফত। সমিতির তহবিল থেকে চাষিদের ছেলেদের জন্য তিনটি হাইস্কুলের আংশিক খরচ বহন করা হত। স্কুলগুলির উপরের দিকে ছাত্রসংখ্যা কম ছিল। তাই গাঁজা সমিতির চেয়ারম্যান জেলাশাসক পিনেল সাহেব প্রস্তাব করেন যে তিনটি হাইস্কুলের উপরের চারটি ক্লাসকে এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত করে একটি কেন্দ্রীয় হাইস্কুল স্থাপন করা হোক। তিনটে স্কুলকে যে টাকা দেওয়া হয় সে টাকা একত্র করে একটি কেন্দ্রীয় হাইস্কুলের পেছনে খরচ করলে পরীক্ষায় পাশের হার আরও ভাল হবে। কারণ আরও ভাল শিক্ষক নিয়োগ করতে পারা যাবে। তিনি আমার উপর ভার দেন এই পরিকল্পনাটি রূপায়িত করার জন্য। আমি তার সঙ্গে জুড়ে দিই আমার নিজস্ব পরিকল্পনা। উচ্চতম দুটি ক্লাসে অতিরিক্ত শিক্ষণীয় বিষয় হবে কৃষি। যার ইচ্ছে সে শিখবে যার ইচ্ছে সে শিখবে না। ছাত্ররা সকলেই বর্ধিষ্ণু কৃষক পরিবারের। গাঁজা ছিল খুব লাভজনক চাষ। আমি চেয়েছিলুম একদল ভদ্রলোক চাষি তৈরি হোক। তারা চাকরির জন্য কোথাও ছুটবে না। নিজেরাই নিজেদের ফার্মে উন্নত ধরনের ফসল ফলাবে। কিন্তু ওই তিনটি হাইস্কুল কর্তৃপক্ষ কিছুতেই তাঁদের স্কুলের উপরের চারটি ক্লাস স্থানান্তরিত করবেন না। বরঞ্চ গাঁজা সোসাইটির অনুদান না নিয়েও যেমন করে হোক স্কুলগুলি চালাবেন। তা ছাড়া চাষির ছেলের চাষ শিখতে আগ্রহ ছিল না। তারাও চায় চাকরি। একটিমাত্র ছেলে চাষের কাজে যোগ দিল। সে আমার হেডক্লার্ক হেমচন্দ্র চক্রবর্তীর ছেলে। তার লক্ষ্য ডেমনস্ট্রেটরের চাকরি।

ব্যর্থ হয়ে আমি নওগাঁ থেকে বিদায় নিই। চার বছর বাদে আমি যখন নদিয়ার জেলাশাসক তখন লঞ্চে করে বন্যাপীড়িত অঞ্চল পরিদর্শন করতে যাওয়ার সময় আমার সহযাত্রী খ্বাজা স্যার নাজিমউদ্দিন আমাকে বলেন যে সরকার আমার নওগাঁর কেন্দ্রীয় স্কুলের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

নওগাঁর আর একটি বৈশিষ্ট্য আত্রাই নদীর ঘাটে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত সংকটত্রাণ আশ্রম। উত্তরবঙ্গ বন্যার সময় ত্রাণকার্য করার জন্য আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর যে সব প্রিয় ছাত্রদের পাঠিয়েছিলেন তাঁদের কয়েকজন সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং বহুপ্রকার গঠনমূলক কাজ করেন। সঙ্গে সঙ্গে রোগীদের চিকিৎসা। আশ্রমের পরিচালক ছিলেন নীরদচন্দ্র দত্ত। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের কৃতী ছাত্র। কিন্তু শেষ পরীক্ষা দেওয়ার আগেই গান্ধীজির আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপ দেন। তারপর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের নির্দেশে বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলে ত্রাণকর্মে যোগদান। ত্রাণকর্ম শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও কিছু উদ্বৃত্ত অর্থ ছিল। তাই নিয়ে গঠনমূলক কাজে স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে আশ্রম পরিচালনা শুরু করেন। তাঁর সঙ্গে যোগ দেন ডাক্তার যশোদারঞ্জন চক্রবর্তী। আমি এই আশ্রমে মাঝে মাঝে যাই, আলাপ-আলোচনা করি।

একবার খুব মুশকিলে পড়ি। আশ্রমিকরা ছাব্বিশে জানুয়ারি কংগ্রেসের নির্দেশমতো ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলন করেন। জন বুলের কাছে সেটা একটা রেড র‍্যাগ। জেলাশাসক পিনেল সাহেব আমাকে বলেন আশ্রমিকদেব জানাতে যে ওই ত্রিবর্ণ পতাকা যদি তাঁরা নামিয়ে না নেন তা হলে আশ্রমটিকে বেআইনি ঘোষণা করা হবে। আমি আশ্রমিকদের সঙ্গে

দেখা করে বলি, 'আপনারা সেবাকর্মী, কিন্তু ওই ত্রিবর্ণ পতাকা রাজনীতি সূচক। সরকার এটা সহ্য করবে না। আপনারা এটা নামিয়ে নিন।' ওঁরা ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, 'নামিয়ে যদি নিতেই হয়, আপনিই নামিয়ে নিন। আমরা পারব না।' অগত্যা আমাকেই নামিয়ে নিতে হল। কিন্তু সেই পতাকা আমি সরকারে জমা দিলুম না। সেই পতাকা চলল আমার সঙ্গে বাক্সবন্দি হয়ে নানান মহকুমায় নানান জেলায়, যত দিন আমি চাকরিতে ছিলুম। দেশ যেদিন সত্যিসত্যিই স্বাধীন হল, সেদিন হাওড়ার বিশিষ্ট নাগরিকরা আমাকে পাকড়াও করে নিয়ে এলেন হাওড়া সার্কিট হাউস থেকে হাওড়া ময়দানে। তাঁদের উপরোধে পড়ে আমাকেই স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলন করতে হল মহাসমারোহে। জেলা জজ হিসাবে নয়, দেশপ্রেমিক সাহিত্যিক হিসাবে।

এখন নওগাঁর আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলি। সেটা অত্যন্ত অপ্রীতিকর। আমার প্রধান কাজ তো ফৌজদারি মামলার বিচার। বেশ কয়েকটি মামলা ছিল নারীহরণের ও ধর্ষণের। একটি কি দুটি বাদে সবকটি মামলাতেই পুরুষ ও নারী উভয়ই মুসলমান। এই হতভাগিনীদের করুণ বিবরণ শুনে আমার এত কষ্ট হত যে আমি এ সব অপরাধ দমন করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতুম। আমার দৃঢ় ধারণা দাঁড়িয়ে যায় যে এটা একটা র‍্যাকেট। এই সব মেয়েদেরকে পঞ্জাবে পাচার করা হয় হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে। একবার আমি লক্ষ করলুম একটা মামলার অসামিকে পুলিশ কিছুতেই ধরতে পারছে না, সে গা-ঢাকা দিচ্ছে। তখন আমি হঠাৎ একদিন আদালত থেকে উঠে স্ত্রীকে কোনও খবর না দিয়ে চাপরাশিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। টমটমে চড়ে সান্তাহার স্টেশনে। সেখান থেকে রেলপথে আত্রাই ঘাটে। সেখান থেকে নৌকোযোগে একটা গ্রামে। গ্রামটির নাম এখন মনে পড়ছে না। নৌকো থেকে নেমে আমরা দু জনে চললুম পায়ে হেঁটে মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে আসামির বাড়িতে। খোঁজ নিয়ে শুনলুম পাখি উড়ে গেছে। বাখের আলি খোন্দকার বাড়িতে নেই। আমার বিশ্বাস হল না। ভাবলুম বাড়িতে ঢুকে তল্লাশ করব। সে অধিকার আমার ছিল। কিন্তু তার জন্য দরকার হয় দু জন স্থানীয় সাক্ষী। আশেপাশে আর কোনও বাড়ি ছিল না। সাক্ষী খুঁজতে অনেক দূর যেতে হত। হাতে সময় কম। ফিরতি ট্রেন ধরতে হবে। হুট করে যদি মুসলমানের অন্দরে ঢুকে পড়ি তবে আমাকে পরে জবাবদিহি করতে হবে কী মতলবে আমি মুসলমানের জেনানায় প্রবেশ করেছিলুম। আমি ম্যাজিস্ট্রেট হলেও আসামি বাখের আলি খোন্দকারের কাছে পরাজিত হই। আমার চাপরাশিটি মুসলমান। আমার পরম বিশ্বস্ত আসমত ফকির। সে শুধু আমার চাপরাশি নয়, আমার ফিলজফার এবং গাইড। আমাকে উচিত পরামর্শ দেয়। ওকে নিয়ে আমি চললুম ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেন্টের বাড়ি। ভদ্রলোকের নাম গোবিন্দবাবু, পদবি ভুলে যাচ্ছি। প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ। 'এদিকে কোথায় আসা হয়েছিল?' তাঁর প্রশ্নের উত্তরে বললুম, 'আপনার ইউনিয়ন বোর্ড পরিদর্শন করতে।' কাগজপত্র দেখলুম। ভদ্রলোক কিছুতেই না খাইয়ে ছাড়বেন না। তাঁর বাড়ির ভেতর থেকে এল থালাভরা লুচি-তরকারি।

ভাগ্যিস পেট ভরে খেয়েছিলুম। নৌকোয় করে আত্রাই ঘাট স্টেশনে ফিরছি। এমন সময় দেখি সান্তাহারগামী ট্রেন ব্রিজের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। স্টেশনে পৌঁছে শুনতে পাই সে রাত্রে আর ট্রেন নেই। তখন সন্ধে হয়ে গেছে। নওগাঁয় ফেরার আশা নেই। স্টেশনেও শোওয়ার ঠাঁই নেই। তখন আসমত বলে, 'হুজুর, চলুন আমরা পায়ে হেঁটে রেললাইনের

উপর দিয়ে যাই।' বৃষ্টির দিন। বৃষ্টি পড়ছে। ভাগ্যিস ছাতা ছিল আসমতের সঙ্গে। অন্ধকার রাত্রে চলেছি আমরা দুজনে। কখনও লাইনের ধারে কাদার উপর দিয়ে কখনও স্লিপারের উপর দিয়ে কখনও দুই স্লিপারের মাঝখানের ফাঁকে পা না দিয়ে। ফাঁক দিয়ে গলে পড়লে সাঁকোর তলায় জলস্রোতে পড়ব। সে এক রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা। আত্রাই ঘাট থেকে সান্তাহার ঠিক ক'মাইল আমার মনে পড়ছে না। তবে সান্তাহারে যখন পৌঁছই তখন রাত একটা বেজে গেছে। উত্তর দিক থেকে দার্জিলিং মেল হাজির হয়েছে। আর একটু দেরি করলে চলন্ত ট্রেনের মুখোমুখি হতুম। রেললাইনের দু ধারে খাদ। ঝাঁপ দিয়ে বাঁচতুম তার আশা কম। সান্তাহার থেকে নওগাঁয় যাওয়ার জন্য টমটম খুঁজে পাওয়া গেল না। আমি এত ক্লান্ত যে পা সরতে চায় না। এমন সময় দেখি আমার পেশকার মানিক মিয়াঁ তাঁর টমটম থেকে নামছেন। আমাকে তাঁর টমটম ছেড়ে দিলেন। আমি যখন বাড়ি ফিরি তখন রাত দুটো। বেচারা লীলা তখন আমার জন্য অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। তখনও তিনি মা হননি। একেবারেই নিঃসঙ্গ।

আট

আমি যখন নওগাঁয় যাই তখন লবণ সত্যাগ্রহ অন্দোলন শেষ হয়ে এসেছিল। একদিন একটি তেরো-চোদ্দো বছর বয়সের ছেলেকে নিয়ে আসা হল, তার নাম কার্তিক। তার অপরাধ সে প্রথম বা দ্বিতীয় মুনসেফের কোর্টের ছাদে উঠে ত্রিবর্ণ পতাকা উড়িয়েছিল। আমি ওকে একটু ধমক দিয়ে ছেড়ে দিই। এত কমবয়সী ছেলেকে জেলে পাঠানো আমার মতে অন্যায়ের প্রতিকার নয়, বরঞ্চ অধিকতর অন্যায়। কিন্তু আমাদের রাজশাহি জেলার ইংরেজ পুলিশ সাহেব আমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করলেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এত বড় অপমান এই ম্যাজিস্ট্রেটের চক্ষে একটা অপরাধই নয়। যাই হোক সরকার থেকে আমার বিরুদ্ধে কোনও অ্যাকশনই নেওয়া হল না। কিছুকাল পরে মিস্টার মার্টিন এলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে। তিনি আমাকে বললেন পুলিশ সাহেব যুদ্ধে গিয়ে শেল্ শক্ পেয়েছিলেন, তাই তাঁর মেজাজটা খিটখিটে হয়েছে। আমি যেন কিছু না মনে করি।

ইতিমধ্যে পিনেল সাহেব বদলি হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁর জায়গায় অস্থায়ী ভাবে কাজ করছিলেন যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর আমলে একজন বা একদল অজ্ঞাতপরিচয় বিপ্লবী যুবক রাজসাহি শহরে রাস্তায় জেল সুপারিনটেন্ডেন্ট লিউক সাহেবকে সন্ধ্যাবেলা গুলি করেন। চ্যাটার্জি সাহেব অবিলম্বে তাঁর প্রাণরক্ষার জন্য ট্রেজারি থেকে সেই রাত্রেই টাকা তুলে লোকজন সমেত কলকাতায় চিকিৎসার জন্য পাঠিয়ে দেন। লিউক বেঁচে যান। চ্যাটার্জি সাহেব তাঁকে প্রাণে বাঁচিয়ে দেন এ জন্য লিউক কৃতজ্ঞ ছিলেন। পরে তাঁর নিজমুখে শুনেছি।

বলতে ভুলে গেছি পিনেল সাহেব থাকতে আমি একদিন তাঁর রাজশাহির বাসভবনে দেখা করতে গিয়েছিলুম। তিনি ঘোড়ার থেকে পড়ে পা ভেঙে শুয়ে আছেন। শুয়ে শুয়ে একরাশ ফাইল পড়ছেন। একটা ফাইল আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'এই টেররিস্টকে নিয়ে আমি এখন ধাঁধায় পড়েছি। পুলিশ থেকে এর বিয়ের আয়োজন হচ্ছে। বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলে আর কোনও বন্ধনের আবশ্যক হবে না। ইনি আর কখনও সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম করবেন না। কিন্তু সে রকম কোনও অঙ্গীকার তিনি করেননি। করবেন

কী করে। তাঁকে তো জানানোই হয়নি যে তাঁর বিয়ের বন্দোবস্ত আসলে করছে পুলিশ, সরকারের টাকায়।' কথা শুনে আমি হেসে বাঁচিনে। সেই বিপ্লবীর নাম আমি শুনেছিলুম। কিন্তু তাঁকে নিবৃত্ত করার এই আজব উপায় আমার কল্পনার বাইরে। এইটুকুই বোঝা গেল পুলিশের হাতে হরেকরকম অস্ত্র থাকে। তার একটার নাম পঞ্চশর।

পিনেল সাহেব থাকতেই গান্ধীজি রাউন্ড টেবিল বৈঠক থেকে ফিরে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করার আগেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। লর্ড উইলিংডন এমন এক অর্ডিন্যান্স জারি করেন যা আন্দোলনটাকে অঙ্কুরে বিনাশ করার পক্ষে যথেষ্ট। ইচ্ছে করলেই আমি যাকে ইচ্ছে তাকে ধরে রাজসাহির বিভাগীয় জেলে চালান দিতে পারি। সেখানে সে আটক থাকবে। একদিন আমি একটি গ্রামে গিয়ে খবর পাই একজনের বাসায় আইন ভঙ্গের একটি গুপ্ত চক্রান্ত চলেছে। সেখানে গিয়ে হানা দিই। দেখি এক প্রৌঢ় হিন্দু ভদ্রলোক তক্তপোশের উপর বসে কথা বলছেন মেজের উপর বসে থাকা এক মুসলমান চাষির সঙ্গে। তাকে সম্বোধন করছেন 'ভাই' বলে। সে কিন্তু কথা বলছে হাত জোড় করে। কথাবার্তার মধ্যে এমন কিছু ছিল না যা দণ্ডনীয়। আমি কিন্তু চটে গেলুম হিন্দু মুসলমানের এই বৈষম্য দেখে। এটা শ্রেণীবৈষম্যও বটে। মুখে 'ভাই' বললে কী হবে বস্তুত বাংলাদেশের হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বৈষম্য শ্রেণীবৈষম্যের অপর নাম। কাজেই সেই হিন্দু ভদ্রলোককে শিক্ষা দিতে চাইলুম। জেলে মাটিতে বসে ভাত খেতে হবে চাষি মুসলমানের সঙ্গে, একসারিতে। তাতে সাম্প্রদায়িক সাম্য তথা শ্রেণীসাম্য জোরদার হবে। সুতরাং আমার সঙ্গের কনস্টেবলদের হুকুম দিলুম ওই দুই আদমিকে পাকড়াও করে রাজশাহি সদরে চালান দিতে। কিন্তু ফল হল ঠিক বিপরীত। পিনেল সাহেব মুসলমানটিকে বললেন, 'মুসলমানদের সঙ্গে ইংরেজের কোনও ঝগড়া নেই। তোমাকে আমি ছেড়ে দিচ্ছি। তুমি বাড়ি চলে যাও।' দিন সাতেক বাদে তিনি হিন্দুটিকেও ছেড়ে দিলেন, কিন্তু সতর্ক করে দিয়ে। আমি হৃদয়ঙ্গম করলুম মুসলমানদেরকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে সরিয়ে রাখাই ব্রিটিশ পলিসি। আর মুসলমানরাও সরে থেকে ইংরেজদের প্রীতিভাজন হয়।

এই আন্দোলন নওগাঁ মহকুমায় একটিমাত্র সত্যাগ্রহীর কারাবাসের হেতু হয়। আমার কাছে ধরে নিয়ে আসা হয় আত্রাই ঘাটের ডাক্তার যশোদারঞ্জন চক্রবর্তীকে। নিঃস্বার্থ সেবাকর্মী, কিন্তু সেইসঙ্গে নিবেদিতপ্রাণ গান্ধীপন্থী। তাঁকে জেলে না দিয়ে আমি পারিনে, কারণ আইনভঙ্গ তিনি স্বেচ্ছায় করেছিলেন। কিন্তু দণ্ড দিতে হাত ওঠে না। তিনি বালক নন যে তাঁকে ধমক দিয়ে ছেড়ে দেব। প্রায় চল্লিশ বছর বয়সী। ভেবেচিন্তে তাঁকে এক বছরের কারাদণ্ড দিলুম। তাতেই তিনি খুশি। পরে বলতে পারবেন তিনি দেশের জন্য কারাবরণ করেছেন। আমি যখন নওগাঁ থেকে বদলি হই কেউ আমাকে বিদায় সংবর্ধনা জানায় না। কিন্তু ট্রেন যখন আত্রাই ঘাট স্টেশনে দাঁড়ায় তখন কারামুক্ত যশোদাবাবু এসে দুঃখপ্রকাশ করেন যে আমি নওগাঁ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আমি ঠিক কুড়ি মাস নওগাঁয় ছিলুম।

ইতিমধ্যে আত্রাই ঘাটের আশ্রমে নীরেনবাবুর সঙ্গেও দেখা হয়েছিল। ওঁদের আশ্রম ছিল আমার একটি প্রিয় স্থান। নীরেনবাবু আফসোস করে বলেন, 'সাত বছর ধরে আমরা এই মুসলিম প্রধান অঞ্চলে প্রাণপাত করে ত্রাণ ও সেবাকর্ম করেছি। তবু একজনও মুসলমান গান্ধীজির আহ্বানে সাড়া দিল না।' তিনি আশা করেছিলেন যে অন্তত কয়েকজন কারাবরণ করবে।

আমার নিজের মনে হয় আন্দোলনটা যদি সরকার-বিরোধী না হয়ে জমিদার-বিরোধী হত তা হলে অন্তত হাজারজন মুসলমান কারাবরণ করত। এবং তার সঙ্গে হয়তো পাঁচশোজন হিন্দু। জমিদাররা যে কী রকম অত্যাচার করে তার এটা নমুনা দিচ্ছি। বহরমপুরে যখন ছিলুম তখন একদিন অস্থায়ী জেলাশাসক চ্যাটার্জি সাহেবের সঙ্গে টেনিস খেলছি এমন সময় নশিপুরের রাজাবাহাদুর এসে উপস্থিত হন। তিনি তিন মাসের জন্য মন্ত্রী হয়েছিলেন তাই তাঁর ভিজিটিং কার্ডে লেখা থাকত 'এক্স্-মিনিস্টার'। তিনি হা-হুতাশ করে বলেন, 'গাছগুলো প্রজারা পেল।' তখন বুঝতে পারিনি এর মর্ম কী। প্রজা যদি তার নিজের জমিতে গাছ লাগায় তবে সে নাকি সেই গাছের ফল পাড়তে পারবে না, সে গাছ জমিদারের সম্পত্তি। জমিও নাকি জমিদারের, প্রজার নয়। এই অদ্ভুত নিয়ম লর্ড কর্নওয়ালিসের আমল থেকে চলে আসছিল। ইদানীং বঙ্গীয় বিধানসভায় প্রজাস্বত্ব আইনে সংশোধনের ফলে রহিত হয়েছিল। এতেই জমিদার মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন। গেল, গেল, গাছগুলো গেল। এটা উনিশশো ত্রিশ সালের ঘটনা। যখন আমি তেত্রিশ সালে নওগাঁ ছাড়ি তখন কানে আসে যে কৃষক প্রজারা জোট বাঁধতে শুরু করেছে। দেখতে দেখতে কৃষক প্রজা আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। কৃষক প্রজা পার্টি গড়ে ওঠে। সেটা অসাম্প্রদায়িক।

তবে জমিদার ও প্রজার বিবাদ অনেক আগে থেকেই ছিল খাজনা বৃদ্ধি নিয়ে। খাজনা ছাড়া জমিদার ও তাঁদের কর্মচারীরা অনেক রকম আবওয়াব আদায় করতেন আইনে যার কোনও সমর্থন ছিল না। নওগাঁর আস্তান মোল্লা নামে এক বৃদ্ধ মুসলমান ত্রিশ বছর ধরে দুবলহাটির জমিদারদের সঙ্গে দেওয়ানি আদালতে লড়েছিল। কিন্তু কোনও দিন হিংসার আশ্রয় নেয়নি। ফলে তার অনেক অনুগামী ছিল। একদিন সে আমার কাছে এসে বলে, 'আমি পাঁচ বছর ধরে সরকারের কাছে দরবার করছি, কেউ কর্ণপাত করছেন না, এখন আপনার কাছে এসেছি প্রতিকার চাইতে। আত্রাই নদীর পাড় থেকে খাল কেটে জল নিয়ে যাচ্ছে কতক লোক তাদের জমিতে সেচ করার জন্য। তার ফলে বন্যার সময় গ্রামকে গ্রাম ভেসে যাচ্ছে। জলের সঙ্গে ঢুকছে কচুরিপানা। কচুরিপানায় গ্রাম ছেয়ে যাচ্ছে। খালের মুখে একটা বাঁধ দিতেই হবে। সরকারের এক পয়সা খরচ লাগবে না। ষাটখানা গ্রামের মানুষ বিনা মজুরিতে মাটি কোপাবে, বাঁধ বানাবে।' এই প্রসঙ্গে সে আমার কাছে একরাশ কাগজপত্র দাখিল করে। সে সব পড়ে আমি জানতে পারলুম যে সরকারের পলিসি হচ্ছে নদীর জলকে বহতা রাখা, কোথাও কোনও বাঁধ না দেওয়া। কাজেই আস্তান মোল্লার প্রস্তাব ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট এক কথায় নস্যাৎ করে দেয়। আমি এই নিয়ে কর্তাদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাই। বাঁধটা তো আত্রাই নদীর উপরে দেওয়া হবে না, দেওয়া হবে একটা কাটা খালের উপরে। সরকারের তাতে আপত্তি কেন? আপত্তিটা আসলে খাল কেটে যারা জল নিয়ে যায় তাদেরই। তারাই আস্তান মোল্লার আসল প্রতিপক্ষ। অনেক আলাপ আলোচনার পরে এই স্থির হল যে খালের উপরে একটা বাঁধ দেওয়া হবে। তবে সেই বাঁধের উপর একটা স্লুইস গেট লাগাতে হবে। সেটাকে মাঝে মাঝে খুলে দিতে হবে যাতে নদী থেকে কিছু জল সেচের জন্য যায়। আবার সেটাকেও বন্ধ করে দিতে হবে যাতে বন্যার জল না যায়। জেলাশাসক মিস্টার পিনেলকে আমি বোঝাই, আস্তান মোল্লার পক্ষেই সবচেয়ে বেশি লোক আছে, তাদের খাতিরে বাঁধ দিতে হবে। আর অপর পক্ষের খাতিরে স্লুইস গেট বানাতে হবে। তিনি জেলাশাসকের খাস তহবিল থেকে তিন হাজার টাকা সাহায্য করেন। স্লুইস গেট কেনা

হয়। আস্তান মোল্লা বাটখানা গ্রামের জোয়ানদের ডেকে এনে সামরিক শৃঙ্খলার সঙ্গে মাটি কাটায় ও বাঁধ বানায়। আশ্চর্য ক্ষমতা সেই লোকনায়কের। তার নেতৃত্ব গান্ধী নেতৃত্বের মতো সম্পূর্ণ নৈতিক। কারও উপর কোনও জুলুম করা হয়নি। স্বেচ্ছা-শ্রমের দ্বারা একটা মহৎ কর্ম সম্পাদন করা হল দেখে আমি বিশ্বাস করতে আরম্ভ করি যে স্বেচ্ছা-শ্রম দিয়ে আরও অনেক লোকহিতকর কাজ করতে পারা যায়। শুধু চাই আস্তান মোল্লার মতো নিঃস্বার্থ ব্যক্তিত্ব। কিন্তু এটাও ঠিক যে সেই ব্যক্তিত্বের পেছনে ছিল ত্রিশ বছরের অক্লান্ত সংগ্রাম জমিদারি বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে। বোধহয় সেই বাটখানা গ্রামের প্রজাদের স্বার্থে। সেই বৃদ্ধ মুসলমানের বয়স তখন আশির কাছাকাছি। পরনে এক দীর্ঘ সাদা আলখাল্লা। মাথায় সাদা টুপি, মুখে সাদা দাড়ি। কিছু দিন আগে নওগাঁ থেকে একখানা চিঠি পেয়েছি। আমার চেনা এক মুসলিম উকিলের পুত্র আমাকে জানিয়েছেন যে আস্তান মোল্লার নামে এক মহাবিদ্যালয় হয়েছে নওগাঁ শহরে।

তাঁবু নিয়ে সফর করা আমার অভ্যেস ছিল। সুইস কটেজ তাঁবু ছিল একটা বাড়ির মতো। তাতে সপরিবারে বাস করা যেত। কিন্তু সেটা বয়ে নিয়ে যেতে অনেক খরচ। তাই আমি শেষের দিকে কাবুলিপাল তাঁবু নিয়ে বেরোতুম। তাতে একজন মানুষের থাকা সম্ভব। বেড়াতে বেড়াতে এক-এক জায়গায় এক-এক রাত কাটাই। যেখানে থামি সেখানে সন্ধ্যাবেলা একটি গাছতলায় তাঁবু গাড়ি। একবার রাতের মাঝখানে হঠাৎ ঝড় ওঠে। তাঁবু উড়ে যায়। নিকটেই ছিল এক ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকের বাড়ি। নাচার হয়ে তাঁর ওখানে মাথা গুঁজতে যাই। তিনি আমায় নিয়ে গেলেন তাঁর শোবার ঘরে। সেখানে শুয়ে আছেন তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা। সমস্ত পরিবার। একটু ফাঁক ছিল। সেখানে আমার বিছানা পাতা হল। সেই ঝড়ের রাত্রে যিনি আমাকে আশ্রয় দিলেন তাঁর নাম ভুলে গেছি। ঠিকানাও মনে নেই। আর কখনও তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। তিনিও আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। এটি একটি নিঃস্বার্থ আতিথেয়তা। অনায়াসেই তিনি মহকুমা হাকিমের কাছে কোনও এক প্রকার অনুগ্রহ চাইতে পারতেন। তেমন কিছুই তিনি করেননি। সেই দুর্যোগের রাত্রের স্মৃতি আমি এখনও বহন করছি।

সরকারি বেসরকারি আধাসরকারি হরেক রকম কাজে আমি ব্যস্ত থাকতাম। সপ্তাহে তিন দিন জেল দেখতে যাওয়া হত। আমিই জেলার। মাসে একদিন ট্রেজারিতে গিয়ে টাকা গুনতে হত। আমিই ট্রেজারার। মাঝে মাঝে পরিদর্শনে বেরোতুম। পুলিশ স্টেশন অথবা ইউনিয়ন বোর্ড পরিদর্শনে। হাইস্কুলগুলোর অধিকাংশেরই আমি ছিলুম প্রেসিডেন্ট। তেমনই ডিসপেনসারি কমিটিগুলোরও। গাঁজা সোসাইটির সদস্যরা স্বল্পশিক্ষিত হলেও জাঁদরেল পার্লামেন্টারিয়ান। এই মানুষরা যে একদিন পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র চালাতে পারবে এ বিষয়ে আমি তখন থেকে আশাবাদী। তবে এঁদের কন্ট্রোল করার জন্য আমার মতো একজন অধ্যক্ষ চাই। ওঁদের মধ্যে দল বিভাজন ছিল। সেটা সাম্প্রদায়িক নয়। কারণ একজন ব্রাহ্মণ বাদে সবাই মুসলমান। অথচ কেউ গাঁজাখোর নয়। ভোট নেওয়া হত হাত তুলে। এখনও আমার কানে বাজছে 'আলিমুদ্দিন চৌধুরী, হাত তোলো, হাত তোলো।' আলিমুদ্দিনের দল ভোটে জিতল। মোমিন মণ্ডলের দল হার মেনে নিল। মোমিন মণ্ডলকে দেখে শ্রদ্ধা হয়। স্থির ধীর শান্ত প্রৌঢ়। গাঁজা সোসাইটির নওগাঁ শহরে একটি সুন্দর বাড়ি আর তার সংলগ্ন একটি বাগান ছিল। তা ছাড়া ছিল তিনটে দোতলা বাড়ি তকতকে নতুন। আমার ছোট্ট একতলা

পুরোনো বাংলোর তুলনায় রাজপ্রাসাদ। তার দুটি বাড়ি দুটি সরকারি ডিপার্টমেন্টকে দেওয়া হয়েছিল। ইচ্ছে করলে তাদের একটিকে অন্যত্র সরানো যেতে পারত। মিস্টার পিনেল আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমি তার থেকে একটি বাড়ি চাই কিনা। আমি বলি, না। আমার বাংলো যদিও অকিঞ্চিৎকর, তবু আমার নদীর ধারে বাস। মাঝখানে একটি লন। দু পা হাঁটলেই কাছারি। আমি মাঝে মাঝে সুইমিং কস্টিউম পরে জলে ঝাঁপ দিতুম। তার জন্য দু পা হাঁটলেই চলত।

এখন এই প্রসঙ্গে একটা মজার কথা বলি। লন্ডনে আমি ওয়াই এম সি এ-র সুইমিং পুলে প্রতি সপ্তাহে একদিন সাঁতার কাটতুম। সেখানে সুইমিং কস্টিউম পরে সুইমিং পুলে নামা বারণ। আর সকলের সঙ্গে আমিও দিগম্বর। প্রথম প্রথম অস্বস্তি বোধ হত। পরে দেখলুম কিছু না পরলেই সর্বাঙ্গ ধৌত হয়। আমি নওগাঁয় সেই সুযোগের সন্ধানে ছিলুম। একদিন বদলগাজি ডাকবাংলোয় অবস্থানকালে ভোরবেলায় গিয়ে নিকটবর্তী নদীতে ব্রজগোপীদের ধরনে স্নান করি। কূলে ফেলে রাখা বস্ত্র হরণ করতে পারত আমার সিকিউরিটি গার্ড। তাই আমি একটা অজুহাতে ওকে একটু দূরে পাঠিয়েছিলুম।

সাহিত্যের কাজ করে নিতে হত ফাঁকে-ফোকরে। একটানা না লেখার জন্য উপন্যাসের কাহিনীতে অনেক অসংগতি রয়ে যেত। রিভাইজ করার জন্য সময় পেতুম না। আর গোপালদাসবাবুও সময় দিতেন না। 'সত্যাসত্য' লেখা হতে থাকে নিছক মনের জোরে।

শান্তিনিকেতনে ড. বাকে এবং তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে লীলার ও আমার আলাপ হয়েছিল। একদিন বাকে সাহেব আগে থেকে না জানিয়ে হঠাৎ উপস্থিত হন আমাদের বাংলোয়। সঙ্গে গান রেকর্ড করার যন্ত্রপাতি। তিনি চান লোকসংগীত রেকর্ড করতে। মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন তখন নওগাঁয় নিযুক্ত। স্কুল সাব-ইন্সপেক্টর। 'হারামণি' নামে তাঁর একটি লোকসংগীত সংগ্রহ ছিল। নওগাঁর গ্রামে গ্রামেও তিনি লোকসংগীত সংগ্রহ করতেন। আমার অনুরোধে এক ফকিরণীকে নিয়ে আসেন। সঙ্গে এক ফকির। ফকিরণী কয়েকটি গান গেয়ে শোনান। তার কথাগুলি ছিল 'প্রেম করো মন প্রেমের মর্ম জেনে। প্রেম করা কি কথার কথা রে, গুরু লহ চিনে। চণ্ডীদাস আর রজকিনী তারাই প্রেমের শিরোমণি। এক মরণে দুজন মলো রে প্রেমপূর্ণ প্রাণে।' এই গানটিই আমি আবার শুনেছিলুম এক বৈষ্ণবীর মুখে, ছয় কি সাত বছর বাদে, চট্টগ্রামে কি কুমিল্লায়। চণ্ডীদাস ও রজকিনী বীরভূম জেলার মানুষ ছিলেন, মতান্তরে বাঁকুড়া জেলার। কিন্তু সে সব জেলায় এই গান আমি শুনিনি। আসলে তাঁরা সব দেশের ও সব যুগের মানুষ। আর সব সম্প্রদায়ের। বাকে সাহেব নিশ্চয়ই তাঁর স্বদেশ হল্যান্ড ও প্রতিবেশী ইংল্যান্ডে রেকর্ড শুনিয়ে থাকবেন।

নয়

নওগাঁ থেকে আমাকে বদলি করা হয় চট্টগ্রামে বিচার বিভাগে তালিম নিতে। সেখানে বাসা না পেয়ে সার্কিট হাউসেই দুখানা ঘরে মাথা গুঁজে থাকি। বিরাট সার্কিট হাউস তখন মিলিটারিদের দখলে। যার পাশে সেগুন গাছের বাগান ছিল। সময় পেলেই সেখানে গিয়ে আমি কবিতা লিখতুম। আমার কাজ তো মুনসেফি শেখা। কিন্তু কোনও মামলাই আমার কাছে পাঠানো হয় না। আমাকে বসবার জন্য কোনও কক্ষও দেওয়া হয় না। গভর্নমেন্ট

প্রিডারের কাছে হাজিরা দিই। যা শেখবার তা তিনি আমাকে শেখান। সকাল সকাল বাড়ি ফিরি। সন্ধ্যাবেলা বেরোতে ভরসা হয় না। যদি ফেরবার সময় মিলিটারি সেন্ট্রি চ্যালেঞ্জ করে। লীলা তো প্রায় অন্তঃপুরিকা হয়ে যান। তবে কমিশনার মিস্টার ড্যাশ একবার আমাদের ডিনারে ডেকেছিলেন।

চট্টগ্রামে একদিন বৌদ্ধ ধর্মগুরু অগ্‌গ মহাপণ্ডিত ধর্মপালের সঙ্গে দেখা করতে যাই। লোকে বলত অগ্‌গ মহাপণ্ডিত আসলে অগ্র মহাপণ্ডিত। তিনি আমাকে বলেন, 'অতি কষ্টে আমি সিংহল থেকে সংগ্রহ করেছি স্বয়ং বুদ্ধর এক টুকরো দাঁত। সেটি অতি যত্নে রেখেছি।' লুকোনো জায়গা থেকে এনে আমাকে দেখালেন। আড়াই হাজার বছর পরেও তা বিনষ্ট হয়নি। সিংহল থেকে আনতে হল ভারতের প্রাচীন সম্পদ। স্বদেশে যার মূল্য নেই। আমি অভিভূত।

তিন মাস পরে আমরা ঢাকায় বদলি হই। পরে আবার চট্টগ্রামে নিযুক্ত হয়েছি। তবে এবারকার সবচেয়ে উজ্জ্বল স্মৃতি বৌদ্ধ মঠের অধ্যক্ষ অগ্‌গ মহাপণ্ডিত ধর্মপালের সঙ্গে কয়েকবার সাক্ষাৎ। চট্টগ্রাম জেলায় তিনি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। গর্বের সঙ্গে তিনি বললেন, তিনি প্রভু বুদ্ধের একটুকরো অস্থি অতি কষ্টে সিংহল থেকে সংগ্রহ করে এনেছেন এবং সযত্নে রক্ষা করছেন। চার বছর বাদে আবার যখন চট্টগ্রাম যাই তখন আর তাঁকে দেখতে পাইনে।

ঢাকায় আমাদের জন্য বাসা পাওয়া গেল না। অগত্যা উঠতে হল অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জজের খালি বাড়িতে। ডিস্ট্রিক্ট জজ তখন ছিলেন অমরেন্দ্রনাথ সেন। পরে তিনি হাইকোর্ট জজ হন। কলকাতার ব্যারিস্টার মহলে সবাই তাঁকে চিনতেন বেবী সেন বলে। বেবী সেন কিন্তু ছ'ফুট লম্বা, বলিষ্ঠ পুরুষ। তাঁর স্ত্রী ছিলেন লর্ড সিনহার সহোদর এন পি সিনহার কন্যা। যত দূর মনে পড়ছে তিনি ছিলেন মেজর জেনারেল (ডাক্তার)। মিসেস সেন প্রায়ই নেমন্তন্ন করে আমাদের খাওয়াতেন। আর পুণ্যকে বলতেন 'গুণ্ডা'। তাঁর বাড়িতে এক পার্টিতে আলাপ হয় ব্যারিস্টার অমিয়নাথ অর্থাৎ এ. এন. চৌধুরীর সঙ্গে। কথা প্রসঙ্গে তিনি নিজের ছেলে জয়ন্তর কথা বলেন। পরে যিনি জেনারেল জয়ন্ত চৌধুরী হয়েছিলেন। জয়ন্ত তার ছেলেবেলায় এক রিভলভার নিয়ে তাঁর বাবার শোবার ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত বাবার দিকে তাক করেছিলেন। অমিয়নাথ জেগে উঠে ভয় পেয়ে যান। জয়ন্তর কাছে ওটা একটা কৌতুক বা fun, কিন্তু ওটা ছিল লোডেড রিভলভার। জয়ন্ত সেটা চুরি করেছিলেন। এই কাহিনী শোনার পরে আমি সিদ্ধান্ত নিই যে বাড়িতে কখনও রিভলভার রাখব না পাছে পুণ্য একদিন সেটা চুরি করে আমাকে ভয় দেখায়। তখন হয়তো গুলি ছুটে যাবে।

ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে আমি কত লোকের রিভলভার পরীক্ষা করেছি, কাউকে কাউকে রিভলভারের লাইসেন্স দিয়েছি, কিন্তু নিজে কখনও রিভলভার রাখিনি। চাইলেই রাখতে পারতুম। আরও একটা ভয় ছিল। বিপ্লবীরা টের পেলে আমার বাড়ি থেকে আমার রিভলভার চুরি করবে। তখন গভর্নমেন্ট আমাকেই দোষ দেবে, কেন আমি এত অসাবধান!

সাবজজ ও অ্যাসিস্ট্যান্ট সেশন জজের ক্ষমতা আমাকে দেওয়া হয়েছিল। একটা আদালত কক্ষ এবং একটা খাস কামরাও আমার জন্য মজুত ছিল। বেশ কয়েকটা মামলাও আমি শুনেছিলুম। তার মধ্যে একটা ছিল গণধর্ষণের মামলা। ধর্ষিতাটি একটি মধ্যবয়সিনী নমঃশূদ্র বনিতা। ধর্ষকরা আট-দশ জন নমঃশূদ্র আবালবৃদ্ধ। কী করে যে এমন দলবদ্ধ ঘটনা

ঘটতে পারে তা ভাবা যায় না। ঘটনার অনেকদিন পরেও মেয়েটি স্ত্রীঅঙ্গে ব্যথা বোধ করছিল। মেডিক্যাল রিপোর্ট তার পক্ষ সমর্থন করেছিল। আমার দণ্ড দেওয়ার ক্ষমতা ছিল সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড পর্যন্ত। ধাড়িদেরকে আমি পুরো সাত বছর কারাদণ্ড দিয়েছিলুম। বালকটিকেও অব্যাহতি দিইনি, তবে কম সাজা দিয়েছি।

একদিন খাস কামরায় দেখা করতে আসেন এক জন মধ্যবয়সী উকিল। নাম যত দূর মনে পড়ে মদনমোহন সাহা। আমাকে উপহার দেন একখানি বই, নাম 'বিন্দুসাধন'। আমাকে বুঝিয়ে দেন যে বিন্দুসাধন করলে আমি হব চিরযুবা আর আমার স্ত্রী চিরযুবতী। তাঁর গুরু নাকি এক মহিলা যিনি পঞ্চাশ বছর বয়সেও পঁচিশ বছরের তরুণী। ভদ্রলোকের মুখচ্ছবিও বেশ উজ্জ্বল। নিজেও একজন বিন্দুসাধক। ওটা চিরাচরিত সহজিয়া পদ্ধতি। ইটালিতে ওকে বলে carezza. বাউল ফকির ও বোস্টমদের মধ্যে সঙ্গিনীসহ এই সাধনার প্রচলন সুদীর্ঘকালের। ভদ্রলোক আশা করেছিলেন যে আমি ওই গ্রন্থ পড়ে সাহিত্যিক হিসাবে আমার অভিমত জানাব।

তত দিনে আমি সাহিত্যিক হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠ হয়েছি। একদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সতীশরঞ্জন খাস্তগীর আমার বাসভবনে এসে বলেন, 'আমরা বারো মাসে বারো জনের একটা বারোয়ারি বৈঠক বসাতে চাই। তাতে সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান ইত্যাদি নানা বিষয়ে আলোচনা হবে। এর নাম কী রাখা হবে আপনিই বলুন।' আমি বলি, 'বারোজনা'। যে বারো জনকে নিয়ে এই সংস্থা গঠিত হয় তাঁদের মধ্যে ছিলেন স্বনামধন্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু, চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও কয়েকজন বিশিষ্ট অধ্যাপক। তা ছাড়া দু জন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও দু জন আই সি এস অফিসর আর্থার হিউজ ও আমি। আর্থার হিউজ বাংলা খুব ভাল জানতেন, বাঙালিদের খুব ভালবাসতেন ও যত দূর জানি দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের অর্থসাহায্য করতেন। তখন তিনি ঢাকার অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি ছিলেন চিরকুমার। যে দু জন শিক্ষাব্রতীর কথা বললুম তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়। তাঁর জামাতা প্রথম লর্ড সিনহার পুত্র দ্বিতীয় লর্ড সিনহা অরুণকুমার, যাঁর স্ত্রীর নাম নিরুপমা, দ্বিতীয় লেডি সিনহা। সবাই এঁরা ব্রাহ্মসমাজের লোক। চারুবাবুকেই আমার সবচেয়ে ভাল লাগত। তাঁর সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করতুম। রবীন্দ্রনাথের জীবনের নানা কাহিনী শুনতুম। আমার ষোলো বছর বয়সে টলস্টয়ের একটি গল্প অনুবাদ করে আমি 'প্রবাসী'তে পাঠিয়েছিলুম। তার উত্তরে একটি পোস্টকার্ড পাই। চারু বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন যে গল্পটি ছাপা হবে। চারুবাবু বাংলা টাইপরাইটারে লিখতেন। আমাকেও একটি বাংলা টাইপরাইটার কিনিয়ে দেন। তখন থেকে আমি বাংলা টাইপরাইটারে লিখি।

অ্যাডিশনাল জজের বাড়ি থেকে আমাদের উঠে যেতে হয় এক দৈবাৎ বান্ধব শৈলেশ ঘোষের আস্তানায়। তিনি আমাদের একটি নতুন বাসা খুঁজে দেন। পাড়াটার নাম পুরনো পল্টন। একদিন সেই বাসার পথে এক সাইকেল-আরোহী আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'অন্নদাশঙ্কর রায়ের বাসা কোথায়?' আমি তখন তাঁকে আমার বাসায় নিয়ে যাই। তাঁর নাম আজিজুল হাকিম। তিনিও একজন কবি। তাঁর কাব্যগ্রন্থের নাম 'ভোরের সানাই'। তিনি একটি পত্রিকা বের করতে চান। জিজ্ঞাসা করেন. 'কী নাম রাখব?' আমি বলি, 'সবুজ বাংলা'। সত্যি সত্যি সেই নামে একটি পত্রিকা বের হয়। সম্পাদক নারায়ণগঞ্জের এক

মুসলিম ব্যবসায়ী। প্রথম সংখ্যায় আমার লেখা তো ছিলই আর ছিল সেই মিস্টার ইসমাইলের যিনি ছিলেন বহরমপুরের অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট ও পরে আবুল হাসনাত নামে 'যৌনবিজ্ঞান' লেখেন। কিছু দিন পরে আমি বিষ্ণুপুরে বদলি হয়ে যাই মহকুমা হাকিম রূপে। 'সবুজ বাংলা'-র কী হল জানিনে।

এই সময় আমি কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'বুলবুল' পত্রিকায় নিয়মিত লিখতুম। সম্পাদনা করতেন বেগম শামসুন নাহার ও হবীবুল্লাহ বাহার। এই সূত্রে পত্রালাপ বেগম সুফিয়া এন. হোসেনের সঙ্গে। পরে তাঁর নাম হয় সুফিয়া কামাল। আমার সুফিয়া বোন।

ঢাকায় আমি কাজী আবদুল ওদুদ ও কাজী মোতাহার হোসেন এই দুই অধ্যাপককে একইসঙ্গে দেখি ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে। এঁদের সঙ্গে পরিচয় চিরস্থায়ী বন্ধুত্বে পরিণত হয়। এঁরা দু জনেই ছিলেন 'শিখা' গোষ্ঠীর সদস্য ও 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের নায়ক। বাংলা সাহিত্যে প্রাবন্ধিক হিসাবে এঁদের দু জনের স্থান অতি উচ্চে। ঢাকায় আমি অধ্যাপক শহীদুল্লার সঙ্গে আমার পূর্বপরিচয় ঝালিয়ে নিই। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় প্যারিসে যখন তিনি ছিলেন ডক্টরেট-এর জন্য গবেষণারত। তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক চিরস্থায়ী হয়েছিল। দুঃখের বিষয় এঁদের কাউকে 'বারোজনা'-র সামিল করা হয়নি। যে দু জন মুসলমান অধ্যাপককে করা হয়েছিল সে দু জন উর্দুভাষী অবাঙালি, দু জনেই উদারমনা পুরুষ, একজন ইংরেজির অধ্যাপক, একজন ইতিহাসের। রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুশীলকুমার দে আর মোহিতলাল মজুমদারকে 'বারোজনা'-র সামিল না করায় তাঁরা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন শুনেছি। আমার ঢাকা থেকে বদলির পর 'বারোজনা'র ইতিহাস আমার অজানা।

দশ

আড়াই বছরের উপর উত্তর ও পূর্ববঙ্গে কাটিয়ে আমি ফিরে এলুম পশ্চিমবঙ্গে, বিষ্ণুপুর মহকুমার ভার নিয়ে। মল্ল রাজাদের নির্মিত পুরাতন মন্দির রাসমঞ্চ ইত্যাদি দেখে আমি মুগ্ধ হই। আমার অনুরোধে আনন্দবাজার পত্রিকার তখনকার সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার একজন ফটোগ্রাফার পাঠিয়ে দেন। তাঁর তোলা পুরাকীর্তির ফটোগুলি একটি পাতা জুড়ে প্রকাশিত হয়। উদ্দেশ্য পর্যটক আকর্ষণ করা। আমার ইচ্ছে ছিল পর্যটকদের জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা করব। কিন্তু আমি যাই বঙ্গে আমার কপাল যায় সঙ্গে। প্রথমে ঘটে গেল মুনসেফের সঙ্গে মনোমালিন্য, তারপর বেধে গেল পুলিশের সঙ্গে ঝগড়া। উভয় ক্ষেত্রেই আমি একজন ফেমিনিস্ট।

একদিন সকালবেলায় আমার বাংলোয় এসে হাজির হয় একটি তরুণী নার্স। সরকারি ডাক্তারখানায় কাজ করে ও কাছাকাছি বাস করে। সে বলে মুনসেফ কোর্টের একজন কেরানি রোজ রাত দশটায় তার বাসায় ঢুকে তাকে বিরক্ত করে। বাসায় তার বুড়িমা ও সে ছাড়া আর কেউ থাকে না। সে ভীত হয়ে আমার কাছে নিরাপত্তা চায়। আমি আমার চাপরাশি দিবাকরকে বলি মুনসেফ কোর্টের সেই কেরানিবাবুকে ডেকে নিয়ে আসতে। মধ্যবয়সী হৃষ্টপুষ্ট পুরুষ। আমি তাঁকে নার্সের অভিযোগের কথা বলি। তিনি অমনই তাঁর পকেট থেকে একটা ফর্দ বার করে গড়গড় করে পড়ে যান। এক টিন বার্লি—এর দাম এত, এক টিন বিস্কিট—এর দাম এত, এক বোতল নারকেল তেল—এর দাম এত, এক টিউব টুথপেস্ট—এর দাম এত ইত্যাদি। মোট শতখানেক টাকা। আমাকে বলেন, 'একে জিজ্ঞাসা

করুন ইনি এই সব জিনিস অর্ডার দিয়েছেন কিনা আর আমি সাপ্লাই করেছি কিনা।' আমি নার্সের দিকে তাকাই। সে নীরব থাকে। তখন কেরানিবাবু বলেন, 'আমি যাই আমার পাওনা আদায় করতে। আমার কী অপরাধ?' তখন আমি তাঁকে বোঝাই, 'পাওনা আদায় করার জন্য অন্য সময় আছে। বেছে বেছে রাত দশটার সময় কোনও তরুণীর বাসায় ঢুকলে ও তাকে বিরক্ত করলে সেটার অন্য অর্থ হয়। আপনি ঠিক সেই সময় যান কেন?' তখন তিনি বেপরোয়া ভাবে বলেন, 'তার আগে আমার সময় হয় না।' তখন আমি বলি, 'আবার যাবেন?' তিনি বলেন, 'হ্যাঁ। যাব না তো কী করব? পাওনা ছেড়ে দেব?' আমার দু জন পঞ্জাবি মুসলমান গার্ড ছিল। বেশ ষণ্ডাগুণ্ডা। সে সময় আমার কামরায় যে ছিল তাকে বলি, 'খোদাবক্স, রিভলভার নিকালো।' খোদাবক্স এমন ভাবে রিভলভার বাগিয়ে ধরে যে 'ফায়ার' বললেই গুলি চালিয়ে দেবে। ভেবেছিলুম কেরানিবাবু ভয় পেয়ে যাবেন। আমি তাঁকে বলি, 'রাতবিরেতে ভদ্রমহিলার বাড়িতে গিয়ে তাঁকে বিরক্ত করবেন না।' তিনি উদ্ধতভাবে বলেন, 'আমার পাওনাটা মিটিয়ে দিন আগে।' আমার হাতে তখনকার দিনে একটা বেত থাকত। সেই বেত দিয়ে আমি কষিয়ে দিলুম এক ঘা তাঁর পশ্চাদ্দেশে। 'আপনি আমাকে মারছেন কেন? আমি প্রতিবাদ করি।' তখন আমি বলি, 'আপনি টাকা চাইছেন কেন? এখন উনি কোত্থেকে টাকা দেবেন?' এই বলে আবার এক ঘা। আর একটু হলে আমি খোদাবক্সকে হুকুম দিতুম ফায়ার করতে, আমার মেজাজ এতই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ঠাণ্ডা হয়ে খোদাবক্সকে বললুম রিভলভার নামিয়ে নিতে আর কেরানিবাবুকে বললুম বেরিয়ে যেতে। এবং নার্সকে বললুম, 'ও সব যদি কিনে থাকেন তা হলে ভালয় ভালয় দাম মিটিয়ে দিন। তা হলে আর কেউ বিরক্ত করবে না।'

এর পর আমি যথাসময়ে এজলাসে গিয়ে বসলুম। সেদিনকার মোকদ্দমা শুনছি। এমন সময় মুনসেফ সাহেবের চিঠি। লিখেছেন, 'আমার কেরানিবাবু কান্নাকাটি করে বলছেন আপনি নাকি তাঁকে মেরেছেন। তিনি কাপড় খুলে দেখালেন তাঁর উরুর পেছন দিকে দুটো কাটা দাগ। রক্ত বেরোচ্ছে। আমার বিশ্বাস হয় না আপনি অমন কাজ করতে পারেন। আপনার সঙ্গে কি দেখা করতে পারি?' আমি উত্তর দিই, 'আমিই যাব আপনার সঙ্গে দেখা করতে, সন্ধের দিকে।' সে দিন তাঁর ওখানে গিয়ে আমি সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলি। 'আমি তো আদালতের বাইরেই নিষ্পত্তি করতে চেয়েছিলুম। কোর্টে ডেকে পাঠালে কেলেঙ্কারি হত। কিন্তু ওঁর উদ্ধত ভাব দেখে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। এখন ভেবে দেখছি ওকে দু ঘা বেত না দিয়ে হাজতে পোরাই উচিত ছিল।' তিনি বললেন, 'আমার কর্তব্য জেলা জজের কাছে রিপোর্ট করা। আমার রিপোর্ট নিয়ে কেরানিবাবু জজসাহেবের কাছে বাঁকুড়ায় যাবেন।' আমি এ কথা শুনে দিব্যি ভয় পেয়ে যাই। নম্রভাবে বলি, 'সমাজ রক্ষার জন্য কাজীর বিচার করতে হয়। এটাকে বলে রাফ জাস্টিস। নইলে সেই মেয়েটিকে আদালতে টেনে নিয়ে গিয়ে হেনস্থা করতে হত। জজসাহেব চাইলে আমি এই কৈফিয়ত দেব।' তখন তিনি বলেন, 'আমি আপনার সঙ্গে একমত। তবু মুনসেফের কেরানিকে এস ডি ও বেতাবেন এটা মুনসেফের পক্ষে মর্যাদাহানিকর।'

জজসাহেব কী করলেন জানিনে। অনেকদিন অপেক্ষা করেও তাঁর কাছ থেকে কোনও চিঠিপত্র এল না।

এই ঘটনার ন' বছর পরে আমি নিজেই যখন বাঁকুড়ার জেলা জজ তখন সেই

কেরানিবাবু আমার কুঠিতে এসে আমার পায়ে পড়ে বলেন, 'আপনি আমার বাবা। বাপ কি ছেলেকে মারে না? আপনি মেরেছিলেন বলেই আমার চরিত্রের সংশোধন হয়েছে। ঘটনার রিপোর্ট পড়ে তখনকার জজসাহেব আমাকে খাতড়ার চৌকিতে বদলি করে দেন। সেই জংলা পাড়াগাঁয়ে আমি পরিবারকে নিয়ে যেতে পারিনে। আমারও কষ্ট, ওদেরও কষ্ট। ন বছর এই শাস্তি বহন করেছি। এ বার আমায় মাপ করুন। দয়া করে আমায় বিষ্ণুপুরে বদলি করে দিন।' আমিও আমার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়েছিলুম। বেত মারলে যে রক্ত পড়বে এটা ছিল আমার কল্পনার বাইরে। আমি ওঁকে বিষ্ণুপুরে বদলির হুকুম দিলুম।

অন্য একদিন আমি সফরে গেছি। আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে একটি মধ্যবয়সী নিম্নবর্ণের নারী। তার অভিযোগ—ইন্দাস থানার অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টার অমুকবাবু তার কাছ থেকে পনেরো টাকা ঘুষ নিয়েছেন, কিন্তু ঘুষের বদলে কাজ করে দেননি। তিনি হয় কাজটা করে দিন নয় টাকাটা ফেরত দিন। কী সেই কাজ আমার ঠিক মনে পড়ছে না। আমি তার অভিযোগের ভিত্তিতে একটি কেস আরম্ভ করি। আসামিকে তলব করে সাক্ষীসাবুদ নিয়ে তার অপরাধের প্রমাণ পেয়ে তাকে আইন অনুসারে দণ্ড দিই। বোধহয় জরিমানা যাতে ওর চাকরিটা না যায়। সে দায়রা জজের কোর্টে আপিল করে। আপিলে খালাস হয়। জজসাহেবের মন্তব্য, আমার ওটা লিগ্যাল কনভিকশন নয়, মর‍্যাল কনভিকশন। আমি মাথা পেতে নিই। ও মা! কিছু দিন পরে দেখি আমার বিরুদ্ধে এক বিরাট দরখাস্ত। সই করেছেন বাঁকুড়ার পুলিশ বিভাগের তামাম কর্মচারী, উচ্চতম থেকে নিম্নতম। তাঁদের বক্তব্য, এই ম্যাজিস্ট্রেট থাকতে পুলিশের সোয়াস্তি নেই, ইনি পুলিশবিদ্বেষী। আমি তো হাঁ। দরখাস্ত যিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি আমার কাছে কোনও কৈফিয়ত চাননি, শুধু আমাকে খবরটা দিয়েছেন। তিনি আমার উপরওয়ালা বাঙালি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। পুলিশ সাহেব ইংরেজ।

আমি বুঝতে পারি যে জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ সাজে না। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে একটি ছুটির দরখাস্ত করি। তখন আমার ছোট ছেলে চিত্রকামের বয়স মাত্র তিন মাস। বিষ্ণুপুরেই তার জন্ম। লীলা আর আমি, পুণ্য ও চিত্র এই দুই শিশুকে নিয়ে যাত্রা করি দেরাদুনে। সেখানে কিছু দিন কাটিয়ে হরিদ্বারে যাই ও সেখান থেকে হৃষীকেশ ও লছমনঝোলায়। তারপর দিল্লি আগ্রা মথুরা হয়ে বৃন্দাবনে যাই। এমনই শখ করে কিনি নামাবলি। ধার্মিক বলে নয়।

হৃষীকেশে আমার কৈশোর জীবনের বন্ধু রামদাসের সঙ্গে মুখোমুখি। কোথায় ঢেঙ্কানাল আর কোথায় হৃষীকেশ। রামদাস আমার চেয়ে বয়সে বড়। থাকত একটি রামায়েত বৈষ্ণব মঠে। সেখানে থেকে সংস্কৃত শিখত। মাঝে মাঝে আমার পড়ার ঘরে হাজির হয়ে জানতে চাইত দুনিয়ার খবর। কে যে তাকে সন্ন্যাসের দীক্ষা দিয়েছিলেন জানিনে। আমি ওকে রাজনীতির দীক্ষা দিই। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে রামদাস বিলিতি কাপড় পোড়ায় ও জেলে যায়। তার পর নিরুদ্দেশ। হৃষীকেশে সে এক প্রকাণ্ড হনুমান মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে সেবায়েত হয়েছে। লীলাকে বলে, 'এ লড়কা আমাকে জেলখানায় পাঠিয়ে নিজে গোলামখানায় যায়। শুনছি এখন মস্ত হাকিম।' ওটা ওর আদরের অঙ্গ। হনুমানজীর কৃপায় ওর এখন কোনও অভাব নেই। জাগ্রত দেবতা।

ছুটি যখন ফুরিয়ে যায় তখন আমাকে বদলি করা হয় কুষ্টিয়া মহকুমায়। মহকুমা

হাকিমের বাংলোটি রেললাইনের খুব কাছে। ট্রেন থেকে দেখা যায় বাংলোর জানালা দরজাগুলিতে পরদা হিসেবে ঝুলছে বৃন্দাবনের নামাবলি। এটা লীলার আইডিয়া। তাঁর ধারণা ওটা খুব সুন্দর দেখায়। কিন্তু এর ফল হল এই সর্বত্র রটে গেল এই হাকিম একজন পরম বৈষ্ণব। একে একে আসতে লাগলেন বোষ্টুম বোষ্টুমি বাউল ও সঙ্গিনী। লীলারও অনেক প্রতিবেশিনী জুটলেন। এমনটি আর কোথাও দেখা যায়নি। আমরা কুষ্টিয়ায় যত সুখী ছিলুম আর কোথাও অত সুখী ছিলুম না। আমি তো ভেবেছিলুম অকালে অবসর নিয়ে কুষ্টিয়াতেই বসবাস করব। সেই মহকুমাতেই রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ আর লালন ফকিরের ছেঁউড়িয়া। আমার মতে রাজসাহি পাবনা ও কুষ্টিয়াই হচ্ছে সারা বাংলার হৃদয়ভূমি।

কুষ্টিয়া শহরটি গোরাই নদীর ধারে। সেটির একমাত্র বৈশিষ্ট্য মোহিনী মিল। কুষ্টিয়াবাসীর গর্ব করার বিষয়। গোরাই নদী পেরিয়ে শিলাইদহে যেতে হয়। পদ্মার তীরে সেই গ্রাম এখন রবীন্দ্রনাথের কল্যাণে তীর্থভূমি। কুমারখালি একটি পুরাতন বাণিজ্যকেন্দ্র। সেখানে বাস করতেন কাঙাল হরিনাথ মজুমদার। 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'র সম্পাদক। ফিকিরচাঁদ নামে তিনি বাউল কবিতা লিখতেন। ওই অঞ্চলে বাড়ি ছিল মীর মশাররফ হোসেনের। তিনি 'বিষাদসিন্ধু'র জন্য বিখ্যাত। কিন্তু তাঁর অন্য একটি পরিচয় ছিল 'হিতকরী' পত্রিকার সম্পাদক। তাতে প্রথম প্রকাশিত হয় লালন ফকিরের প্রয়াণ বিবরণ। কুষ্টিয়ায় এককালে নীলকর সাহেবরা ছিলেন। আমি যখন যাই তখন দেখি রেনউইক কোম্পানি তাদের আখমাড়াই কল চাষিদের ধার দেয়। তিনজন ইউরোপিয়ান সেখানে কাজ করতেন। আখমাড়াই কল থেকে যে রস হয় সেই রস জাল দিয়ে গুড় তৈরি করা হয়। কুষ্টিয়ার স্টেশন পাস করে যায় ঢাকা মেল ও চিটাগাং মেল এবং পোড়াদহ পাস করে যায় দার্জিলিং মেল আর আসাম মেল। নওগাঁর মতো আমি সুইস কটেজ তাঁবুতেও বাস করেছি, হাউসবোটেও বেড়িয়েছি, কিন্তু হাতির পিঠে চড়িনি কেননা হাতি রাখার মতো জমিদার কেউ ছিলেন না। একটা দর্শনীয় বিষয় ছিল গোরাই নদীর ব্রিজ।

একটি গ্রামে দেখতে পাই দুটি মসজিদ। জিজ্ঞাসা করি দুটি মসজিদ কেন? শুনতে পাই একটি মসজিদ চাষিদের জন্য আর একটি মসজিদ জোলাদের জন্য। মুসলমানদের মধ্যে জাতিভেদের আভাস পেয়েছিলুম নওগাঁতেও। সেখানে একটি ধাওয়া মুসলমান আমার কাছে এসেছিল চাকরির জন্য। ধাওয়ারা জেলে। কুষ্টিয়ায় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বেশ সদ্‌ভাব। দাঙ্গা কোনওদিন বাধেনি। দাঙ্গার কোনও আশঙ্কাও ছিল না। তবে কৃষক প্রজা আন্দোলন মাথা চাড়া দিচ্ছিল। স্বনামধন্য সামসুদ্দিন আহমদ সাহেব আমাকে আশ্বস্ত করেন যে তাঁর কৃষক প্রজা দলে হিন্দুরাও ছিলেন। তাই আন্দোলনটাও অসাম্প্রদায়িক। উদারতার একটা নিদর্শন দিচ্ছি। কুমারখালির হাই স্কুল পরিদর্শনকালে দেখি দুটি হিন্দু ছাত্র ফারসি পড়ছে। জানতে চাই, 'ফারসি পড়ছে কেন?' উত্তর পাই, 'তিলির ছেলেরা ফারসি পছন্দ করে।' কুমারখালি তিলি প্রধান শহর। একদা বন্দর ছিল। সমুদ্রের বন্দর নয়, নদীর বন্দর। গোরাই নদী দিয়ে স্টিমার যাতায়াত করত। একটি মেয়ে আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসত। আমার ছেলেরা তাকে বলত ইস্টিমারদিদি। সেও ভালবাসত আমার ছেলেদের। একদিন গোসাঁই সদরচাঁদ বলে এক বৈষ্ণব এসে আমাকে বলেন, 'বৈষ্ণবদের ব্রাহ্মণ গুরু হবে কেন? আপনি এর একটা মীমাংসা করুন। এ নিয়ে একটা বাহাস হবে। আপনি হবেন তার সভাপতি।' আমি বুঝতে পারলুম নামাবলির সুবাদেই আমার এই সৌভাগ্য। তাঁকে বুঝিয়ে

বললুম, 'আমি এসব ধর্মীয় প্রশ্নের মীমাংসা করতে অক্ষম।' তিনি নিরাশ হলেন। বৈষ্ণবকে বৈষ্ণব না জেতালে কে জেতাবে?

একজন জটাজুটধারী রক্তাম্বর পরিহিত প্রৌঢ় তান্ত্রিক মাঝে মাঝে আসতেন আমার বাসভবনে। হাতে এক ভাঁড় বিশুদ্ধ গব্যঘৃত। তাঁর নিজের গোশালায় তৈরি। আমি তাঁকে বলি, 'আমি কারও কাছ থেকে বিনামূল্যে কিছু নিই না। আপনার ঘি আপনি ফিরিয়ে নিয়ে যান আর নয় তো দাম নিন।' তিনি দাম নিতে রাজি হন। তারপর শুরু হয় আলাপ আলোচনা। সে সব দেহতত্ত্ব ঘটিত। আমি সাহিত্যিক মানুষ। মনস্তত্ত্বে আগ্রহী। তিনি কিন্তু দেহতত্ত্বে তন্ময়। মূলাধার চক্র, আজ্ঞা চক্র, ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না, কুলকুণ্ডলিনী ইত্যাদি কত কথাই না বলে যান যার মর্ম দেহতত্ত্বের সাধকরাই জানেন। আমি শুধু অবাক হয়ে শুনি কেবল শুনি।

এই তান্ত্রিক কেন আমার কাছে আসতেন সেটা বোঝা গেল বছরখানেক বাদে। ইউনিয়ন বোর্ড নির্বাচনের পরে মনোনয়নের পর্ব শুরু হয় যখন নয়জন সদস্যের মধ্যে তিনজনকে মনোনয়ন করেন সরকার। অবশ্য আমার সুপারিশে। সেই প্রথম জানতে পাই তান্ত্রিকের নামধাম। নামটি বাঙালির নয়। বিহারির বলেও মনে হয় না। বোধহয় কোনও পার্বত্য জাতির। সাধুজি আশ্রম স্থাপন করে এখানে জমিয়ে বসেছেন। জমিজেরাত করেছেন। সাধনসঙ্গিনীও পেয়েছেন। যাঁকে বৈষ্ণবেরা বলেন প্রকৃতি। আমি তাঁকে সুপারিশ করলুম। গেজেটেও তাঁর নাম ছাপা হয়ে গেল।

বাউল, ফকির ও বৈষ্ণব আগন্তুকদের সঙ্গেও তাঁদের প্রকৃতিরা আসেন। গান শুনিয়ে যান। গানের বিনিময়ে দক্ষিণা নেন। তাঁরা ভিক্ষাজীবী নন, দক্ষিণাজীবী। ভিক্ষাজীবী বলে তাঁদের খাটো করা উচিত নয়। যত দূর জানি তাঁরা দেহতত্ত্বেও বিশ্বাস করেন। সেই সঙ্গে মনের মানুষের কথা থাকে কিংবা রাধাকৃষ্ণের কথা। একটি পদ মনে পড়ছে। 'যার রাধা নামে নাই অধিকার তার কীসের ভজন তার কীসের পূজন রে।' রাধা নামটি আমার কাছে সব চেয়ে প্রিয় নাম। তাই এঁদের প্রতি আমার একটু দুর্বলতা।

বাউলদের পদবি শাহ্ হয়ে থাকে আর বৈষ্ণবদের দাস। হরিদাসী যার নাম সে ছিল বাউল এবং মুসলমান। তার সাথীরা ছিল শাহ্ পদবিধারী। নাম কালু শাহ্, ঈসব শাহ্। বয়সে ছোট। লালনশাহী কি না বলতে পারব না। বাউল, ফকির, বৈষ্ণব, তান্ত্রিক এ সব সাধনা বাংলার আধ্যাত্মিক মুখ্য স্রোত নয়। বলা যেতে পারে অন্তঃস্রোত। সমাজের ব্রাত্য স্তর থেকে প্রধানত এই সাধক-সাধিকাদের উদ্ভব। মরমিয়া রহস্যময় সাধনারও একটা গুহ্য দিক থাকে। পুঁথিপত্রে তার কোনও সন্ধান মেলে না। তার জন্য তাঁদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে মিশতে হয়। উচ্চ পদাধিকারী হয়ে আমি তাঁদের সঙ্গে সেভাবে মেলামেশা করি কী করে!

একদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ গুরুসদয় দত্ত মহাশয় আমার বাড়িতে এসে হাজির। আমার চেয়ে তিনি অনেক সিনিয়র, প্রায় পঁচিশ বছরের। পরনে মালকোঁচা মারা ধুতি ও পাঞ্জাবি। তিনি ধরে বসলেন যে আমাকে ব্রতচারী দীক্ষা নিতে হবে। এখন থেকে হবে 'কোঁচা দুলাইয়া চলিব না, খিচুড়ি ভাষায় বলিব না।' তাঁর সেই পণ আর মানা আমাকে বাধ্য হয়ে উচ্চারণ করতে হয়। অমন একজন উৎসাহী মানুষকে আমি নিরুৎসাহ করতে চাইনে। সরকার তাঁর প্রতি অবিচার করেছিলেন। তাঁর কমিশনার পদ কেড়ে নিয়েছিলেন। তবে তিনি সেক্রেটারির পদ নিয়েই সন্তুষ্ট। তাঁকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল ব্রতচারী আন্দোলন পরিচালনার।

তাঁর পাল্লায় পড়ে আমাকেও ব্রতচারী শিবিরে অংশ নিতে হয়। সেখানে তিনি রায়বেঁশে নাচ নেচে দেখান। স্থানীয় ছাত্ররাও তাঁর পাল্লায় পড়েছিল। তাঁর সঙ্গে সুর মিলিয়ে গান ধরত,'ওরে আয় কচুরি নাশি/ ওই রাক্ষসী যে বাংলাদেশের দিচ্ছে গলায় ফাঁসি।' ব্রতচারীদের দিয়ে তিনি কচুরিপানা ধ্বংস করান। নৃত্য ও কৃত্য একই সঙ্গে চলে। আব একটা গান ছিল, 'আয় কোদাল চালাই/ যাবে ব্যাধির বালাই/ পেটের খিদের জ্বালায় / খাব ক্ষীর আর মালাই।' আমি তাঁর শিক্ষা মেনেই আর কখনও কোঁচা দুলিয়ে চলিনি। তবে মালকোঁচা মারিনে, কোঁচা কোমরে গুঁজে রাখি। কিন্তু খিচুড়ি ভাষায় মাঝে মাঝে বলি। এই যেমন, সৌরভ সেঞ্চুরি করেছে। তিনি হয়তো বলতেন, সৌরভ শতাব্দী করেছে। এরূপ ক্ষেত্রে খিচুড়িই ভাল।

ইতিমধ্যে কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলন নিঃশেষ হয়েছিল। বিপ্লবীদের সন্ত্রাস হামলাও স্তিমিত হয়েছিল। মাঝখান থেকে মাথা চাড়া দিয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকলাপ। আমার কাছে একটা সার্কুলার এসেছিল। তাতে দেওয়া হয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টির বিভিন্ন বেনামি সংগঠনের নাম। একদিন এক ছোকরাকে পুলিশ আমার আদালতে হাজির করে। শুনলুম সে নাকি কমিউনিস্ট। ওর বাবা শহরের একজন গণ্যমান্য উকিল। পাক্কা বুর্জোয়া। আমি ওকে কৌতুক করে বলি, 'তুমি কি ডিক্লাস্‌ড হতে যাচ্ছ নাকি মুখেই কমিউনিস্ট?' সে হাসে। আমি সেই মামলায় অপরাধজনক কিছু দেখতে পাইনে। তাকে খালাসের হুকুম দিই। ওমা, কোথায় যাব! আমি যাই বঙ্গে তো কপাল যায় সঙ্গে। আমার বিরুদ্ধে পুলিসের রিপোর্ট খোদ চিফ সেক্রেটারির সকাশে। তিনি আমার রায় পড়ে লিখলেন, 'Perverse judgement.' আমি আমার প্রমোশনের আশা ছেড়ে দিলুম।

হঠাৎ শুনতে পেলুম যে আমার বাবা আর নেই। ছুটে গেলুম সপরিবারে ঢেঙ্কানালে। স্থানীয় ব্রাহ্মণরা আমার পিতৃশ্রাদ্ধে যোগ দিলেন না। কারণ আমার বাবা আমার স্ত্রীকে পুত্রবধূ বলে গ্রহণ করেছিলেন। আমার দুই ভাই রাগ করে স্থানীয় মুসলমানদের এনে আমাদের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে বসিয়ে দিল। সেই সময় শেষ রক্ষা করলেন কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন। তিনি মাঝে মাঝে ঢেঙ্কানালে আসতেন ভাগবত পাঠ করতে। আমার বাবা ছিলেন রামদাস বাবাজির শিষ্য। কুলদাবাবুর সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল। ব্যাপার শুনে কুলদাবাবু আমার পাশে এসে পঙ্‌ক্তি ভোজনে বসলেন। তিনিই সেদিনের একমাত্র ব্রাহ্মণ।

ঢেঙ্কানাল থেকে ফিরে আসার পরে খবর পাই আমাকে নদিয়ার অস্থায়ী জেলাশাসক করা হয়েছে। আমার বিরুদ্ধে আরও পুলিশ রিপোর্ট ছিল। সেটা গ্রাহ্য হয়নি। বুঝতে পারি যে আমি সরকারের অনাস্থাভাজন নই। কুষ্টিয়া থেকে আমার যাওয়ার আগে আমি চেয়েছিলুম একটি চিহ্ন রেখে যেতে। পঞ্চম জর্জের রজতজয়ন্তী উপলক্ষে যে চাঁদা তোলা হয়েছিল তার একাংশ দিয়ে একটি মেটারিনিটি হোম তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিই। যাঁর পরামর্শে নিই তিনি ডাক্তার জ্ঞানদানন্দ দাশগুপ্ত। সরকারি ডাক্তার। আমার প্রিয় বন্ধু। সৌভাগ্যক্রমে বাড়ি তৈরির কাজ শেষ হতে দেখে যেতে পারলুম।

যাবার সময় শুনলুম আমার চাপরাশি বাদল হিন্দু নয়, মুসলমান। সবাই ওকে ভালবাসত। কিন্তু এগারো বছর বাদে সে হয়ে গেল বিধর্মী ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে বিদেশি।

আমার প্রতিবেশী ফজলুল বারি চৌধুরী প্রায়ই আসতেন আলাপ করতে। তিনি

একদিন আমাকে বলেন, 'মুসলমানরা জানে না কোনটা তাদের দেশ।' অর্থাৎ হিন্দুদের দেশ যেমন হিন্দুস্থান, বাঙালিদের দেশ যেমন বাংলা দেশ, মুসলমানদের দেশ তেমন কী? এই জিজ্ঞাসার উত্তর পাওয়া গেল পাঁচ বছর বাদে মুসলিম লীগের নেতাদের মুখে। সাতশো বছর ধরে হিন্দুস্থানে বাস করার পরে তাঁরা কলম্বসের মতো আবিষ্কার করেন যে তাঁদের দেশ পাকিস্তান। বাংলাদেশও যার সামিল।

এতক্ষণ আমার সাহিত্যের কাজের কথা বলিনি। কুষ্টিয়ায় থাকতেই 'সত্যাসত্য'-এর চতুর্থ খণ্ড 'দুঃখমোচন' সারা হয়। তৃতীয় খণ্ড 'কলঙ্কবতী' লেখা হয়েছিল বিষ্ণুপুরে। দ্বিতীয় খণ্ড 'অজ্ঞাতবাস' অংশত ঢাকায় অংশত নওগাঁয়। 'দুঃখমোচন' লেখার সময় সারাদিন কাজকর্ম করে এসে রাত জেগে লিখতুম। শীতকাল। ঘর গরম রাখার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। শরীরের, বিশেষ করে গলার, বেশ ক্ষতি হয়। তার পরে উচ্চতর পদে কাজ করার সময় প্রায় তিন বছর 'সত্যাসত্য' লেখায় ছেদ পড়ে যায়। যে-বই পাঁচ বছরে শেষ করার কথা ছিল তার চার খণ্ড লিখতেই লেগে গেল ছ' বছর। পঞ্চম খণ্ডেও শেষ হল না। আরও এক খণ্ড লিখতে হল। সমাপ্ত করতে লাগল মোটামুটি বারো বছর। কবিতা লেখা কমতে কমতে বন্ধ হয়ে যায়। কাজের চাপে তো বটেই, তার উপর আমার মনে খটকা বেধেছিল 'মম', 'তব', 'গেনু', পেনু' ইত্যাদি ব্যবহার না করে স্রেফ চলতি ভাষায় ছন্দ ও মিল বজায় রাখি কী করে। অনেকদিন অপেক্ষা করার পরে এর উত্তর পাই ছড়া লিখতে গিয়ে।

বারো

কৃষ্ণনগরে গিয়ে নদিয়া জেলাশাসকের ভার বুঝে নেবার পর একদিন আমার Confidential Box খুলে দেখি তাতে একখানি পুস্তিকা গোপনে রাখা রয়েছে। জেলাশাসকদের প্রতি বেঙ্গল গভর্নমেন্টের হুঁশিয়ারি। তার মর্ম, পারতপক্ষে মিলিটারিকে ডেকো না। নিজেই পুলিশের সাহায্যে শান্তিরক্ষা কোরো। মিলিটারিকে ডাকলে সিদ্ধান্তগুলো মিলিটারিই দেবে। তোমাকে ওদের সিদ্ধান্তই মেনে চলতে হবে। অথচ শাসনের দায়িত্ব তো জেলাশাসকেরই। নেহাত নাচার হয়ে মিলিটারিকে ডাকতে চাইলে তার আগে গভর্নমেন্টের অনুমতি নিয়ো।

বস্তুত ব্রিটিশ আমলে জেলাশাসকরা কদাচিৎ মিলিটারিকে ডেকেছেন। তাঁরা মিলিটারির হাতে কন্ট্রোল ছেড়ে দিয়ে নিজেরা ক্ষমতায় খর্ব হতে চাননি। দায়িত্ব যার ক্ষমতা তার। এক্ষেত্রে একটা বিভাজন একান্ত অপরিহার্য না হলে অবাঞ্ছনীয়। হাল আমলে আমরা এর বিপরীত রূপই লক্ষ করছি। জেলাশাসকদের সেই প্রেস্টিজ আর নেই। এখন পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টও তাঁর কর্তৃত্ব মানতে চান না। আমরা জেলাশাসকরা ফৌজদারি মামলা আর আপিলের বিচারকও ছিলুম। এখন সে অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটরাও এখন সে অধিকার থেকে বঞ্চিত। তবে দাঙ্গা দমনের ক্ষমতা এখনও তাঁদের হাতে রয়েছে।

নদিয়া জেলাশাসক পদে ছিলুম তো মাত্র দু মাস। গোড়ার দিকে একদিন দেখি আমার সাক্ষাৎপ্রার্থী পিতৃবন্ধু কুলদাপ্রসাদ মল্লিক। আমাকে চুপি চুপি বলেন, 'তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।' আমি আমার বাসভবনের অফিসঘর খালি করে দিই। তিনি একটি মহিলার নাম করলেন। যত দূর মনে পড়ে, মহিলাটির নাম নলিনী দেবী। ব্রাহ্মণ পরিবারের বালবিধবা। প্রেমে পড়ে পালিয়ে যান ও পরিত্যক্ত হন। শিশুকন্যা নিয়ে তিনি শরণ প্রার্থনা

করেন কুলদাবাবুর। তিনি তাকে যথাসাধ্য সাহায্য করেন। মহিলাটি নিজেই নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য একটি নারী সেবাশ্রম খোলেন। তাঁর একান্ত অনুরোধ আমি যেন নবদ্বীপে গিয়ে তাঁর আশ্রম পরিদর্শন করি। এটা কুলদাবাবুরও অনুরোধ।

আমি তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে যাই। তারপর একদিন তাঁর সঙ্গেই নবদ্বীপ যাত্রা করি। বন্দোবস্ত ভালই, বাইরে থেকে কোনও খুঁত ধরতে পারিনে। কিন্তু আশ্রমবাসিনী দুর্গত মেয়েদের কাউকে দেখতে পাইনে। তখন শুনি সেখানে কেউ থাকতে আসে না। কুমারী মেয়েরা আসে গুরুজনের সঙ্গে। সন্তানের জন্ম দিয়ে স্বস্থানে ফিরে যায়। সেই সন্তানদের আদর করে নিয়ে যান খ্রিস্টান মিশনারি মহিলারা। কৃষ্ণনগরে ও অন্য দুই জায়গায় তাঁদের তিনটি মিশনগৃহ। আশাবাড়ি, দয়াবাড়ি, আর একটি কী যেন বাড়ি।

আমি তো অবাক। আরও শুনলুম এমন সদাব্রতেরও প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছে সেই নবদ্বীপেই আরও এক নতুন নারী সেবাশ্রম। আমি যেন নিবৃত্ত করি। কী আপদ! পরিদর্শনের বইতে দু-চার ছত্র লিখতে হয়। একজন দুঃস্থ নারী স্বাবলম্বনের জন্য একটা কিছু করছেন। খরচপত্র করে মেয়ের বিয়েও দিয়েছেন। প্রশংসাযোগ্য বিষয়। কিন্তু—কিন্তু—আমি তার বেশি লিখলুম না। কুলদাবাবু আমার পিতৃশ্রাদ্ধে যোগ দিয়ে আমার মুখরক্ষা করেছেন। তবু—

বাবা আমাকে একবার বলেছিলেন নবদ্বীপে গেলে যেন ললিতাদিদির সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। কুলদাবাবুকে সঙ্গে নিয়ে ললিতাদিদির আখড়ায় যাই। পিতার বয়সী এক বলিষ্ঠ পুরুষ। গোঁফ দাড়ি কামানো। মাথায় ঘোমটা। চুল দেখা যায় না। সম্ভবত মুণ্ডিত মস্তক। নাকে নথ। মেয়েলি সাজসজ্জা। হাবভাব মেয়েলি। বৃন্দাবনে একমাত্র পুরুষ তো কৃষ্ণ। আর সবাই নারী। তিনি এই তত্ত্বের সাধক বা সাধিকা। কিন্তু ধরা পড়ে যান যখন সেবকদের কড়া ধমক দেন বিষয় সম্পত্তির মালিকের মতো। তখন পুরুষ তিনি, নারী নন।

কী জানি কেন নদিয়ার মহারানি বাহাদুরা আমাকে একদিন তলব করলেন। মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র বহুদিন বিগত। তাঁর পুত্র তখন নাবালক। মহারানিই জমিদারি পরিচালনা করছেন। আমি তো শুধু জেলাশাসক নই, আমি জেলার কালেক্টর। জমিদারদের কাছ থেকে আমি রাজস্ব আদায় করি, পরিবর্তে তাঁদের ওজর আবদার শুনি। কেউ হয়তো সময়মতো খাজনা দিতে অপারগ। হুট করে আমি যেন তাঁর জমিদারি নিলাম না করি।

গেলুম মহারানির দরবারে। তিনি আমার মায়ের বয়সী। ভেবেছিলুম আমাকে দর্শন দেবেন। তা নয়। সমস্তক্ষণ রইলেন চিকের আড়ালে। আমাকে তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন কিনা জানিনে। আমার কাছে তিনি অদর্শনা। কথাবার্তাও একতরফা। খান বাহাদুর আজিজুল হক সাহেবের নিন্দাবাদ।

এর পর একদিন খান বাহাদুরের শুভাগমন। তিনি তখন বাংলা সরকারের শিক্ষামন্ত্রী। জাঁকালো চেহারা। আমি বন্যাপ্লাবিত অঞ্চল পরিদর্শনের জন্য আলিপুর থেকে লঞ্চ আনার জন্য রিকুইজিশন পাঠিয়েছি তিনি সেটা জানতে পেরেছেন। তিনি চান আমার সঙ্গী হতে। মন্ত্রীবরকে 'না' বলি কী করে? বলি,'সে তো আমার সৌভাগ্য।'

সৌভাগ্য বলে সৌভাগ্য! লঞ্চ এল কলকাতা থেকে। আরোহী কেবল খান বাহাদুর একা নন, উপরন্তু খাজা স্যার নাজিমউদ্দিন। তিনি লাটসাহেবের শাসন পরিষদের সদস্য। তিনিও যাবেন বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলে। স্বাগত, ডবল স্বাগত।

ডিনারটা ওঁরাই খাওয়ালেন। নাজিমউদ্দিন আমাকে চমকে দিয়ে জানালেন গভর্নমেন্ট আমার নওগাঁর সেন্ট্রাল হাই স্কুলের স্কিম গ্রহণ করেছেন। আমি কৃতার্থ। তারপর কথাবার্তা চলল আসন্ন সাধারণ নির্বাচন নিয়ে। আজিজুল হক অভয় দিলেও নাজিমউদ্দিন ভয় পাচ্ছেন আসন্ন নির্বাচনে তিনি হয়তো হেরে যাচ্ছেন। তাঁকে খুবই নার্ভাস দেখাচ্ছিল। মাথায় খাটো মানুষটি খুবই নম্র ও বিনয়ী।

পরের দিন সকালে চুয়াডাঙায় লঞ্চ থেকে নেমে দেখি বিরাট জনতা। আমার ধারণা দুই মুসলিম লীগের নেতাকে অভ্যর্থনা জানাতে জড়ো হয়েছে। তা নয়। তাঁদের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে জড়ো হয়েছে। বোঝা গেল ওরা কৃষকপ্রজা দলের মুসলমান। তখন মুসলমানদের হাত থেকে মুসলমানদের বাঁচাতে ভিড় ঠেলতে হল দুজন হিন্দুকে। আমাকে আর আমার পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট সুকুমার গুপ্তকে। তিনি রেলপথে এসেছিলেন চুয়াডাঙায়।

আমার উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে পতন শুরু হয়েছিল। আমি সিগারেট ধরেছিলুম। ময়দানের জনসভায় আমি স্যার নাজিমউদ্দিনের সিগারেট ধরিয়ে দিতে গেলে তিনি মুচকি হেসে বলেন, 'আপনি দেখছি একেবারে আনাড়ি। দিন, আমিই ধরিয়ে দিই আপনার সিগারেট।'

নির্বাচনে স্যার নাজিমউদ্দিন সত্যিই হেরে গেলেন। তখন তাঁকে আর প্রধানমন্ত্রী করা হল না। (তখনকার দিনে প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রী বলা হত।) স্যার জন অ্যান্ডারসনের সেটাই পরিকল্পনা ছিল। ততদিনে তিনি বিদায় নিয়েছেন। তাঁর জায়গায় লর্ড ব্র্যাবোর্ন এসেছেন। ফজলুল হক হন প্রধানমন্ত্রী। নির্বাচনের পর তিনি নিজের দুটি আসনের একটি ছেড়ে দিলে উপনির্বাচনে জয়ী হন স্যার নিজামউদ্দিন। তিনি হন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী।

তার আগেই আমি হয়েছি রাজশাহির জেলাশাসক। মাঝখানে কয়েক মাস ছুটিতে ছিলুম। বাংলাদেশে তখন মোগল আমল, কিন্তু রাজশাহিতে গুপ্ত যুগ। জজ শৈবালকুমার গুপ্ত, সিভিল সার্জন তাঁর দাদা মেজর অনিলকুমার গুপ্ত, পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট হীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত। চার প্রধানের মধ্যে কেবল একজন রায়। আমার অধীনে দুজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ আচার্য সুবিখ্যাত ব্রাহ্মনেতা ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্যের পুত্র। আর কিথ কটন রায় অনাবাসী বাঙালি পিতার পুত্র। তিনি ছিলেন ইংল্যান্ডের এক ডাক্তার। তাঁর স্ত্রী ইংরেজ। কিথ তাঁর বাবাকে নিয়ে গাড়ি চালাচ্ছিলেন, এমন সময় এক দুর্ঘটনায় বাবা মারা যান। ছেলেটি তার জন্য অনুতপ্ত। আমরা ওঁকে খুব ভালবাসতুম। উনিও আমাদের। কিন্তু রাজশাহি থেকে কোথায় যে গেলেন খবর রাখিনি। বিজয় আচার্য পরবর্তীকালে ভারতের রাষ্ট্রদূত হয়েছিলেন।

কিছুদিন পরে আমার কন্যা জয়া ভূমিষ্ঠ হয়। রাতের মাঝখানে মেজর গুপ্ত ছুটে এসে সাহায্য করেন। তেমনই আর এক রাতের মাঝখানে আমি তাঁর গাড়ি চেয়ে পাঠাই। কারণ আমার গাড়ির ড্রাইভারকে ছেড়ে দিয়েছি। আমাকে ছুটতে হল দাঙ্গা বাধার উপক্রম হয়েছে খবর পেয়ে। সঙ্গে বন্দুক আর রিভলভার ছিল না, সিকিউরিটি গার্ডও ছিল না। পথে একজন পাহারাওয়ালা পুলিশকে দেখতে পেয়ে তাকে তার বন্দুকসমেত গাড়িতে তুলে নিই। অকুস্থান কলেজ হস্টেল। পৌঁছে শুনি যারা হামলা করতে এসেছিল তারা আমি আসছি শুনে দলবল নিয়ে চলে গেছে। হিন্দুদের পাঁচটি আবাস ইতিমধ্যে শূন্যপ্রায়। একটি ছাত্র কান্নাকাটি

জুড়ে দিয়েছে, 'আমাকে এক্খুনি বাড়ি পাঠিয়ে দাও।' উপস্থিত পুলিশ অফিসররা তাকে অভয় দিচ্ছেন, কিন্তু সে শুনছে না। আমিও তাকে বোঝাই যে রাত পোহালেই তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেবে। সে কাঁদতেই থাকে। পাশেই মুসলিম হস্টেল। মাত্র একখানি বাড়ি। তাতে ছাত্রদের ভিড়। ঝগড়াটা বেধেছিল ছাত্রদের সঙ্গে ছাত্রদের। হিন্দুদের পাঁচটি বাড়ির মধ্যে একখানি সম্পূর্ণ খালি। ভূতের ভয়ে কেউ থাকে না। অন্যান্য বাড়িতেও হিন্দুদের অনেকগুলি আসন খালি। কারণ হিন্দু ছাত্রসংখ্যা কমে গেছে আর মুসলমান ছাত্রসংখ্যা বেড়ে গেছে। অথচ হিন্দুরা কিছুতেই মুসলমানদের সেই ভুতুড়ে বাড়িটাও ছাড়বে না। তাদের আশঙ্কা, সেখানে গো-কোরবানি হবে। আমি সে রাত্রে হিন্দু ছাত্রদের জন্য পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করে বাড়ি ফিরি।

পরের দিন সেখানে গিয়ে দেখি মুসলমান ছাত্ররা ভীষণ উত্তেজিত। পুলিশ হিন্দু ছাত্রকে গার্ড করার নামে মুসলিম ছাত্রদের ঘর থেকে বেরোতে দেয়নি। এখানে বলে রাখি যে পুলিশের তখনকার অফিসররা প্রায় সকলেই হিন্দু। এর মধ্যে ছাত্ররা হিন্দুদের অত্যাচার কল্পনা করছে। আমি তাদের আশ্বস্ত করি।

পাটনা কলজের মিন্টো মহামেডান হস্টেলের একটা খালি অংশে আমরা হিন্দু ছাত্ররা বাস করতুম। মুসলমান ছাত্ররা একদিনও আপত্তি করেনি। করতে পারত, কেননা শৌচাগার ছিল কমন। ওরা ছিল অত্যন্ত ভদ্র এবং উদার। আমি তো আশা করেছিলুম যে রাজশাহি কলেজের ছাত্ররাও মুসলমানদের স্থানাভাব দেখে নিজেদের অব্যবহৃত বাড়িটা ছেড়ে দেবে। কোরবানির অজুহাতটা মিথ্যা। কোথাও কোনও মুসলিম হস্টেলে কোরবানির নজির ছিল না।

তখনকার বাংলা প্রদেশ ছিল ইংরেজিতে যাকে বলে heart-break house. হিজলি জেল থেকে একটি মেয়ে আমাকে চিঠি লিখে আমার উপন্যাসের প্রশংসা জানায়। মেয়েটির নাম যতদূর মনে পড়ে বনলতা। আমার উত্তর নিশ্চয়ই সেনসর করা হবে। খুব সাবধানে লিখি। তাও ইংরেজিতে। এইসব রাজবন্দিনীর প্রতি আমার স্নেহ ও সহানুভূতি ছিল। কিন্তু সেটা কি প্রকাশ করতে পারি?

শান্তি ও সুনীতি নামে দুটি বালিকা কুমিল্লার জেলাশাসক Stevenasকে হত্যা করে। রবীন্দ্রনাথ তা শুনে বলেন, 'এত ভালো সাহেবটাকে মেরে ফেললে গো!' আমার সহানুভূতি নিহতের প্রতি।

বটমলী সাহেব তখন ডি. পি. আই। কলেজের গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমি তাঁকে পরামর্শ দিই হস্টেলের নামকরণ থেকে হিন্দু ও মুসলিম বাদ দিতে। নতুন নামকরণ হবে A B C D E F. তিনি তাই করেন। কিন্তু হিন্দু ছাত্ররা আর তাদের জায়গায় ফেরে না। স্থানীয় এম এল এ কিশোরীমোহন চৌধুরী সর্বজনশ্রদ্ধেয়। আমি তাঁকে বলি হিন্দু ছাত্রদের ফেরাতে। তিনি বলেন, না, ওরা ফিরবে না। গভর্নমেন্ট মুসলমানদের জন্য অন্য একটা বাড়ি তৈরি করতে পারতেন। হিন্দুদের জায়গায় মুসলিমদের বসানো আপত্তিকর। হিন্দু ছাত্ররা শহরে বাসা ভাড়া করে পড়বে। বোঝা গেল হিন্দুদের পক্ষে ওটা জয়-পরাজয়ের প্রশ্ন।

হিন্দু ছাত্রদের আমি বোঝাতে পারি না। মুসলিম ছাত্ররাও আমার নামে নালিশ জানাল যে আমি ওদের বিপক্ষে। ওরা চায় একজন মুসলিম বা ইংরেজ অফিসর। একদিন

পোস্টমাস্টার এলেন আমাকে গোপনে একটা টেলিগ্রাম দেখাতে। ফজলুল হক সাহেব তাঁর স্বধর্মী ছাত্রদের উদ্দেশে বার্তা পাঠিয়েছেন। টেলিগ্রামটা আমি আটক করব কি না পোস্টমাস্টার জানতে চাইলেন। সে ক্ষমতা আমার ছিল। কিন্তু প্রয়োগ করলুম না। শুধু জানলুম যে হকসাহেব মুসলমানদের জন্য উদ্বিগ্ন।

ব্রিটিশ সরকারের মতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হচ্ছেন Man on the spot. কোথাও কিছু ঘটলে জেলাশাসককে ডিঙিয়ে সরাসরি কারও সঙ্গে যোগাযোগ রীতি নয়। ঘটনাটি যদি প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পূর্বে ঘটত তবে আমাকে না জানিয়ে বা আমার মত না জেনে গভর্নমেন্ট কিছু করতেন না। কিন্তু মন্ত্রীদের হাতে ক্ষমতা যাওয়ার পর দেখা গেল সরাসরি ছাত্রদের সঙ্গে যোগ স্থাপন করা হচ্ছে। বোঝা গেল জমানা বদলে গেছে। কী করে এর সঙ্গে মানিয়ে চলতে হবে জেলাশাসকদের পক্ষে সেটা এক আমলাতান্ত্রিক সমস্যা।

এর সঙ্গে একটা রাজনৈতিক সমস্যা যুক্ত হয়েছিল। এই দুই দল তরুণবয়সী ছাত্রদের মধ্যে সামান্য একটা খালি বাড়ি নিয়ে—ইংরেজিতে যাকে বলে—estrangement দেখা দিল, তা চারিয়ে গেল কিশোরীমোহন চৌধুরী ও ফজলুল হক সাহেবের মতো প্রবীণ জননায়কদের মধ্যে। ওই তরুণদের বয়স যতই বাড়তে লাগল, ওই প্রবীণরা যতই বৃদ্ধ হতে লাগলেন, সেই এসট্রেঞ্জমেন্ট ততই গভীর ও ব্যাপক হতে লাগল। দশ বছর বাদে এমন একদিন এল যেদিন দুই সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষও বলতে আরম্ভ করল যে আর একসঙ্গে থাকতে পারা যাবে না। চাই আলাদা দেশ আর আলাদা প্রদেশ। এর নাম এসট্রেঞ্জমেন্টের চূড়ান্ত। আজকেও তার জের মেটেনি। যদিও ইংরেজ পঞ্চাশ বছর আগে চলে গেছে। এখন আর বলতে পারা যাবে না যত দোষ নন্দ ঘোষ অর্থাৎ ব্রিটিশ রাজ।

একই সময়ে দুই ফ্রন্টে লড়তে নেই। সেটা বিজ্ঞতা নয়। কিন্তু বাঙালি হিন্দুরা একই কালে লড়বে ইংরেজদের সঙ্গে এবং মুসলমানদের সঙ্গে। হিন্দুদের খবরের কাগজ খুললেই দেখা যেত যুগপৎ ইংরেজ বিরোধী ও মুসলমান বিরোধী লেখা। কিন্তু মুসলমানদের খবরের কাগজ খুললে কেবলমাত্র হিন্দু বিরোধী লেখা। দশ বছর ধরে এই স্নায়ুযুদ্ধ চলার পরে এর অনিবার্য পরিণাম চির বিচ্ছেদ।

তেরো

রাজশাহিতে আষাঢ়ে ক্লাব বলে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছিল। আষাঢ় মাসের প্রথম দিবসে সেখানে যাঁরা মিলিত হতেন তাঁরা আষাঢ়ে গল্প বলতেন ও শুনতেন। আমাকেও তাঁরা আমন্ত্রণ করেছিলেন আষাঢ়ে গল্প শোনাতে। আমি তার বদলে সাহিত্য প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য শুনিয়েছিলুম। এ ছাড়া তাঁদের অন্যান্য অনুষ্ঠানও ছিল। তাঁরা নিমন্ত্রণ করেছিলেন দিলীপকুমার রায়কে। তিনি রাজশাহিতে এসে আমাদের অতিথি হন। সেই প্রথম তিনি আমাদের দেখেন, আমরাও সেই প্রথম তাঁকে দেখি। তিনি আষাঢ়ে ক্লাবের আহূত সভায় একটি লিখিত ভাষণ দেন। তাঁর সঙ্গে আমার সাত বছর ধরে পত্রালাপ ছিল। আমি তাঁকে দাদা বলতুম। আমাদের মধ্যে তর্কবিতর্ক হত সাহিত্যিক বিষয় নিয়ে। তাঁকে আমি প্রায়ই লিখতুম, 'বিয়ে করছ না কেন? তুমি তো সন্ন্যাসী নও!' তিনি পাশ কাটিয়ে যেতেন। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তাঁর চিঠিপত্রের আদানপ্রদান ছিল। তার নকল তিনি আমাকে পাঠাতেন। সে সব ছিল আমার কাছে খুবই মূল্যবান।

তবে আমি ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছিলুম। জার্মানিতে নাৎসিরা আর ইতালিতে ফাসিস্তরা যে সব কাণ্ড করে চলছিল সেটা আমার মনের উপরে ছায়াপাত করছিল। আমিও অন্ধকার দেখছিলুম। সিডনি ও বিয়াট্রিস ওয়েবের গ্রন্থ পড়ে সোভিয়েত কমিউনিজমের উপর আমার শ্রদ্ধা জেগেছিল। কিন্তু মস্কোতে বিনা বিচারে বা নামমাত্র বিচারে স্তালিন তাঁর নিজের দলের মধ্যে ভিন্ন মতাবলম্বীদের যেভাবে ফায়ারিং স্কোয়াডের মুখে বিনাশ করেছিলেন সেটাও আমাকে পীড়িত করেছিল। তারপর স্পেনের গৃহযুদ্ধ তো বাইরের সব বুদ্ধিজীবীদের কাছে চ্যালেঞ্জ। আমারও ইচ্ছে করত সেখানে ছুটে যেতে ও লড়াই করতে। সেই সময় আমি 'নিউ স্টেটসম্যানে'র গ্রাহক হতে আরম্ভ করি। তার সম্পাদকীয় মতবাদের সঙ্গে আমার মতবাদও অনেকটা মেলে। অথচ আমি মহাত্মা গান্ধীর 'ইয়ং ইন্ডিয়া'রও পুরাতন পাঠক। পরে 'হরিজন' পত্রিকার। দু রকম মতবাদের মধ্যে আমি সামঞ্জস্যের সন্ধান করি।

রাজশাহিতে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহশালা ছিল সারা দেশের মধ্যে একটি মহামূল্য প্রত্নরত্নাগার। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রমুখ মনীষীরা উত্তরবঙ্গের নানা স্থান থেকে প্রাচীন মূর্তি, ভাঙা পাত্র, তাম্র ফলক, পুঁথিপত্র ইত্যাদি সংগ্রহ করে গবেষণায় সূত্রপাত করেছিলেন। তাঁদের এই উদযোগ ছিল সম্পূর্ণ বেসরকারি। সেজন্য আরও বিস্ময়কর। আমি একবার কি দুবার সেখানে গেছি। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহশালা দেখতে কলকাতা থেকে এসেছিলেন স্টেলা ক্র্যামরিশ, বিখ্যাত ভারতশিল্পানুরাগিণী। প্রথমেই আমাদের ওখানে এসে দেখা করলেন।

ইতিমধ্যে একদিন টেলিগ্রাম আসে আত্রাই ঘাটে যেতে হবে রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনায়। আমি তৎক্ষণাৎ মোটরে করে রওনা হয়ে যাই নাটোরে। সেখান থেকে রেলপথে আত্রাই ঘাটে। কবিগুরুকে তাঁর হাউসবোট থেকে নামতে সাহায্য করি। তারপর আমরা দুজনে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দুখানা চেয়ারে পাশাপাশি বসে কলকাতাগামী ট্রেনের প্রতীক্ষা করি।

শতখানেক দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ মুসলমান তাদের প্রিয় বাবুমশায়কে বিদায় জানাবার জন্য বোটের সঙ্গে সঙ্গে পায়ে হেঁটে এসেছিল। তাদের কারও কারও চোখে জল। গুরুদেব আমাকে একান্তে বলেন, 'ওরা কী বলছে, জানো? বলছে আমরা পয়গম্বরকে চোখে দেখিনি, আপনাকে দেখলুম।' তাঁর মুখে পীরের মতো দাড়ি, পরনে পীরের মতো আলখাল্লা, দেখলে পীর বলে ভ্রম হয়। পীরালি ব্রাহ্মণ বংশে তার জন্ম। মুসলমানরা যদি তাঁকে আপনার বলে মনে করে তা হলে আশ্চর্যের কী আছে! আমি বলি, 'ওরা যা বলছে সেটা ওদের আন্তরিক বিশ্বাস।'

ওঁর সঙ্গে আমি নাটোর পর্যন্ত ট্রেনের এক কামরায় আসি। আরোহী আমরাই দুজন। জানতে চান, ছবি আঁকি কিনা। তিনি ছবি আঁকেন। আমি ছড়া লিখি কিনা। তিনি ছড়া লেখেন। আমাকেও ছড়া লিখতে বলেন। আমি বলি, 'আমি ছড়া লিখতে পারিনে।' তখন তিনি আমাকে বলেন একটা নাটক লিখতে যে নাটক তিনি লিখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু লিখে উঠতে পারেননি।

নাটকের বিষয়বস্তু হল অর্জুন যখন কৃষ্ণের প্রয়াণের পর তাঁর রানিদের দ্বারকা থেকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন অরণ্যপথের মাঝখানে দস্যুরা এসে রানিদের অপহরণ করে নিয়ে যায়। তাঁদের কেউ কেউ আনন্দের সঙ্গে দস্যুদের সাথী হন। তা শুনে আমি

জানতে চাইলুম, 'গুরুদেব, এই তথ্য আপনি কোথায় পেলেন?' তিনি বললেন, 'কেন? মহাভারতেই আছে।' তারপর হেসে বললেন, 'ওরা কিন্তু আসলে দস্যু নয়, ছদ্মবেশী প্রেমিক। আগে থেকে কথা ছিল যে পথের মাঝখানে দস্যু সেজে অপহরণ করবে।' তখন আমি ভয় পেয়ে বলি, 'গুরুদেব, আপনি যা লিখতে সাহস পেলেন না আমি তা লিখতে সাহস পাব কেন?'

নাটোরে ট্রেন থেকে নামার পর দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা থেকে নামলেন সুধাকান্ত রায়চৌধুরী, গুরুদেবের সেক্রেটারি। বললেন, 'গুরুদেব আপনাকে কেন ডেকেছেন, জানেন? জমিদারির ম্যানেজার বীরেন সর্বাধিকারী প্রথম শ্রেণীর অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট পদের প্রার্থী। আপনি যদি এক লাইন সুপারিশ করেন তবে গুরুদেব খুশি হন।' পরে কলকাতা থেকে সুধাকান্তবাবু আমাকে রবীন্দ্রনাথের 'সে' বইখানি পাঠিয়ে দেন। তাতে ছিল গুরুদেবের গদ্যের সঙ্গে ছড়া।

সেদিন বাড়ি ফিরেই আমি কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত খুলে বসি। অবাক হয়ে দেখি দস্যুদের সঙ্গে রানিরা কেউ কেউ সানন্দে পলায়ন করেন। তবে সে দস্যুরা ছদ্মবেশী প্রেমিক কিনা তার কোনও উল্লেখ নেই। সেটা রবীন্দ্রভাষ্য। বিষয়টা যে নাটকের উপযোগী তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু লিখতে গেলে প্রাণ সংশয় হবে। তা ছাড়া সেটা মঞ্চে অভিনয় করতে দেবে কেন সরকার!

লিখতে ভুলে গেছি নদিয়ার জেলাশাসক পদে কৃষ্ণনগরে থাকতে একদিন আমার সঙ্গে নিভৃতে সাক্ষাৎ করেন এক পুলিশ অফিসর। শহরের একটি নাট্যগোষ্ঠী 'কেদার রায়' অভিনয় করতে চান। তখনকার নিয়ম অনুসারে পুলিশের অনুমতির প্রয়োজন হত। অনুমতি দেওয়ার পুলিশ, একবার নাটক কাটছাঁট করে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমোদন চাইত। কলকাতা হলে পুলিশ কমিশনারের। যে পুলিশ অফিসর আমাকে তাঁর কাটা অংশগুলি দেখান তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করি, 'এতে আপত্তির কী আছে? এ তো মোগল যুগের কাহিনী!' তিনি বলেন, 'না, স্যার, প্রচ্ছন্নভাবে এটা রাজদ্রোহমূলক। মোগল মানে এখানে ব্রিটিশ। ওদের মতলব, ইংরেজদের বিরুদ্ধে বাঙালিকে উত্তেজিত করা।' আমি হেসে মরি। এইসব পুলিশ অফিসর সবকিছুর মধ্যে রাজদ্রোহের গন্ধ পায়। কী করি! কিছু কিছু বাদসাদ দিয়ে বাকিটা অনুমোদন না করে পারিনে। নইলে নাটকের অভিনয় পুলিশ বন্ধ করে দিত। নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। আমি নিজে সেনসরশিপে বিশ্বাস করিনে। অথচ আমাকে দিয়েই এই অপকর্ম করানো হল।

কিছুদিন পর আমি অন্য একটি স্টেশনে নেমে হাতির পিঠে চড়ে পতিসর অভিমুখে যাত্রা করি। পথের মাঝখানে হাতি চাইল জল খেতে। পুকুরপাড়ে বসে আমি হাতিকে জল খেতে দিই। এমন সময় দেবনাথ মণ্ডল নামে একজন স্থানীয় ব্যক্তি ওখানে এসে আমার সঙ্গে গল্প জুড়ে দেন। লোকটিকে আমি দেখেছিলুম খাজনা দিতে অসমর্থ জমিদারদের জমিদারি নিলাম করার সময়। আমি তখন কালেক্টার হিসাবে একটি ছোট হাতুড়ি নিয়ে টেবলের উপর রাখি। নিলামের ডাক একটু একটু করে চড়তে থাকে। আর যখন চড়ে না তখন আমি হাতুড়ি ঠুকে সবচেয়ে চড়া দামে জমিদারি নিলাম সমাধা করি। দেবনাথ মণ্ডলও কোনও একটি ক্ষেত্রে নিলাম ডাকে অংশ নিয়েছিলেন।

দেবনাথ বলেন, মহর্ষির মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ পতিসরে আসেন। প্রথা অনুসারে

প্রজাকে জমিদারের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে যথাসাধ্য উপঢৌকন দিতে হবে। প্রজারা রবীন্দ্রনাথকে যে যা পারে উপহার দেয়। কেউ সোনাদানা, কেউ নগদ টাকা, কেউ বস্ত্র, কেউ গাছের ফল এমনই কত কী। সেদিন রবীন্দ্রনাথ কিছু বললেন না, কিন্তু পরের দিন পেয়াদা দিয়ে প্রজাদের ডেকে পাঠান। বলেন, 'কাল সারারাত আমার ঘুম হয়নি। আমার পিতার শ্রাদ্ধ। তার জন্য তোরা কেন ভেট দিবি? নিয়ে যা, নিয়ে যা। এসব আমি রাখতে পারব না।' প্রজারা ক্ষুব্ধ। তিনি কিছু ফলমূল রেখে বাকি সব ফিরিয়ে দেন। বলেন, 'আমারই তো তোদের ভোজ দেওয়া উচিত। শ্রাদ্ধের ভোজ।' এই বলে নিমন্ত্রণ জানান। আমি স্তব্ধ হয়ে শুনলুম। এই না হলে রবীন্দ্রনাথ! বোধহয় তিনিই একমাত্র বাঙালি জমিদার যিনি ভেট ফিরিয়ে দেন! উল্টে ভোজ দেন! ওরা তো বলবেই পয়গম্বরকে দেখেনি, ওঁকেই দেখেছে।

আর একদিন আমি আত্রাই ঘাটে যাই সংকটত্রাণ আশ্রমে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে শ্রদ্ধা জানাতে। কলকাতাগামী ট্রেনের প্রতীক্ষায় তাঁর সঙ্গে আমি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বসি। যেমন একবার বসেছিলুম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। তিনি আমার পিঠে দুম করে একটা কিল বসিয়ে দিয়ে বিটকেল হাসি হেসে বললেন, 'দেখলি রে কংগ্রেসের কাণ্ড! যারা জেল খাটল ত্যাগ স্বীকার করল তারা কেউ নির্বাচনের সময় টিকিট পেল না। পেল যারা জেলেও যায়নি ত্যাগ স্বীকারও করেনি।' আমি বললুম, 'আইনসভার কাজ অন্যরকম কাজ। যার কর্ম তারে সাজে।'

বহুদিন থেকে আমার মনে সাধ পদ্মার বুকে নৌকো চড়ে বেড়াব। শিলাইদহে সে সুযোগ আমি পাইনি। ঠাকুরবাবুদের বিখ্যাত হাউসবোট জমিদারি হস্তান্তরের পরে খড়দহে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। রাজশাহিতে আমি একটা লঞ্চ জোগাড় করি। কোনখান থেকে এটা ঠিক মনে পড়ছে না। পদ্মা তখন বর্ষাকালে উত্তাল। সপরিবারে লঞ্চে চড়ে যখন আমি পদ্মার বুকে লাঞ্চ খেতে বসেছি তখন জলের গেলাসে চুমুক দিয়ে চমকে উঠি। মুখ জ্বলে যায়। এ যে জল নয়, কেরোসিন। ব্যাপার এই খালি বোতলে জল ভরার সময় আমার খানসামা ভুল করে একই রকম একটি বোতলে কেরোসিন ভরেছিল। তার ফলে এই বিভ্রাট। লঞ্চে যেতে যেতে দেখি একটি পুলিশ স্টেশন। নামি পরিদর্শন করতে। কিন্তু কোথাও কেউ নেই একজন কনস্টেবল বাদে। সে-ই গিয়ে দারোগাসাহেবকে খবর দেয়। তিনি তখন পোশাক খুলে দিবানিদ্রা দিচ্ছিলেন। ধড়ফড় করে উঠে পড়ে ইউনিফর্ম পরতে পরতে আমার সামনে হাজির হন। তিনি বোধহয় কল্পনাই করতে পারেননি হঠাৎ আশমান থেকে নামবেন স্বয়ং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। পুলিশ স্টেশনের কাগজপত্র ও আলামত দেখে পরিদর্শন-মন্তব্য লিখে আমি লঞ্চে ফিরে যাই। এরই নাম হচ্ছে সরকারি কাজ ও ব্যক্তিগত সাধ উভয়ের সংমিশ্রণ।

এই রকম সংমিশ্রণ ঘটত যখন আমার পূর্বসূরি সাহেবরা বন্দুক দিয়ে কাদাখোঁচা পাখি শিকার করতেন। কিংবা শুয়োরের পিঠ বল্লম দিয়ে খুঁচিয়ে পিগস্টিকিং করতেন। আমার ওসব বদখেয়াল ছিল না। আমি শিকার ভালবাসতুম না। সুযোগ পেলে টেনিস খেলতুম। রাজশাহি ক্লাবে বিলিয়ার্ডসও ছিল। সেখানে গিয়ে বিলিয়ার্ডস খেলতুম। অস্পষ্ট ভাবে মনে পড়ছে কখনও কখনও আমার খেলার সাথী হতেন জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান দীঘাপতিয়ার জমিদার প্রতিভানাথ রায়। পরে তিনি 'রাজা' উপাধি পান।

মাঝে মাঝে আমাকে নাটোর ও নওগাঁ মহকুমা সফরে বেরোতে হত। নওগাঁয় আস্তান

মোল্লার সেই বাঁধ দেখতে গিয়ে হতাশ হই। কারা সব আবার বাঁধ কেটে নদীর জল নিজেদের ক্ষেতে নিয়ে গেছে। আমার সাধের স্লুইস গেট বেকার হয়ে ঝুলছে। সেই রামও নেই সেই অযোধ্যাও নেই। কিন্তু সমস্যা আছে। থাকবেও। খাল কেটে কুমির ডাকা হবে। অর্থাৎ কচুরিপানা।

জানতুম যে রাজশাহির জেলাশাসক পদ আমার মতো জুনিয়র অফিসরদের জন্য নয়। গ্রীষ্মকালে ইংরেজরা ছুটি নিয়ে স্বদেশে যান, তাই আমার মতো ভারতীয়দের ডাক পড়ে। গ্রীষ্মকালের পর যথারীতি একজন সিনিয়র আই সি এস এলেন। আমি বদলি হলুম চট্টগ্রামে অতিরিক্ত জেলাশাসকরূপে। রাজশাহিতে আমার কার্যকাল মাত্র আট মাস। সেই সময় আমার কিছু বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছিল। রাতওয়ালের জমিদার আকবর আলী আকন্দের বাসভবনের দেউড়িতে দুটো পাথরের তৈরি সিংহ ছিল। সেই সিংহদুটোকে দেখি ভূমিসাৎ। আমার প্রশ্নের উত্তরে আকবর আলী বলেন, 'মৌলবী সাহেবরা আপত্তি করেছেন। ওটা পৌত্তলিকতা।' নাটোরের ব্যারিস্টার আশরফ আলী খান চৌধুরী প্রথামতো ইউরোপীয় পোশাক পরতেন। এবার দেখি তিনি আচকান পায়জামা পরেছেন। মাথায় ফেজ। আমি যেই সম্বোধন করি, 'মিস্টার খান চৌধুরী', তিনি ত্রস্তভাবে বলেন, 'না, না, আমি শুধু আশরফ আলী। এই দেখুন আমার কার্ড।'

চোদ্দো

গোয়ালন্দ থেকে চাঁদপুর পর্যন্ত পদ্মাবক্ষে স্টিমার ভ্রমণ আমার জীবনে এই দ্বিতীয়বার। এ আনন্দের তুলনা জার্মানির রাইন নদের উপর স্টিমার ভ্রমণের আনন্দ। আমার মন তো ইউরোপেই পড়ে রয়েছিল। পদ্মাই আমার কাছে রাইন। তবে এ যাত্রা আমার সঙ্গিনী জয়স নন। লীলা। সঙ্গে পুত্রকন্যা।

চাঁদপুর থেকে রাতের ট্রেনে চট্টগ্রাম। এ বার আমার নিবাস উঁচু টিলার উপরে। যমজ টিলার উপরে আমার কাছারি। মাঝখানে ছোট একটি গেট। পায়ে হেঁটে যাওয়া আসা করি।

পুব দিকে তাকালে পর্বত। পশ্চিম দিকে তাকালে সমুদ্র। নীচের দিকে তাকালে কর্ণফুলী নদী। এমন সৌন্দর্য আর কোন নগরের আছে? এমন সৌভাগ্য আর কোন কবির ভাগ্যে? আমার তো বুঁদ হয়ে কবিতা লেখার কথা। কিন্তু আমার মাথায় এক ভূত চেপেছিল। আবার কবে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হব সেই ভাবনা। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সেই সম্মানও সেই ক্ষমতার অধিকারী নন। তবে আমি ইচ্ছামতো সফরে যেতে পারতুম। তার জন্য লঞ্চ আনিয়ে নিতুম। কর্ণফুলীর এপারে ওপারে আমার দর্শনীয় স্থান। সুবৃহৎ লঞ্চে চড়ে সমুদ্রেও ভেসেছি, কক্‌সবাজার দেখতে গেছি। লঞ্চ থেকে নেমে সাম্পানে চড়ে ঘাটে উঠেছি। সাম্পান সেই প্রথম দেখা।

আমার জীবনে উত্থান মানেই পতন। মর্নিং কোট ও স্ট্রাইপড ট্রাউজার্স পরে লর্ড ব্র্যাবোর্ন-এর দরবারে হাজির হই। লাঙ্গুল বিশিষ্ট ডিনার জ্যাকেট ও বাহারি ট্রাউজার্স পরে লীলাকে নিয়ে লর্ড ও লেডি ব্র্যাবোর্ন-এর সঙ্গে ডিনার খাই। এ সব ধড়াচূড়া না হলে মর্যাদা রক্ষা হয় না। অথচ দেশবাসীর চক্ষে ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাকের মতো দেখায়।

আই সি এস অফিসরদের বাড়িতে মদ রাখাটাই নিয়ম। এত দিন আমরা ছিলুম ব্যতিক্রম। এখন আমরাও রাখলুম খুব হালকা মদ। পরের জন্য রাখলে নিজেরাও একটু

আস্বাদন করতে হয়। মাঝে মাঝে করি। আমার পক্ষে এটা পতন। লীলা যে দেশের মেয়ে সে দেশে সেটাই তো প্রথা। কিন্তু লীলা বরাবর এ সবের বিরোধী। কখনও একফোঁটা স্পর্শ করেননি। কিন্তু সঙ্গ রাখার জন্য তাঁকেও মদিরা স্পর্শ করতে হয়।

সামাজিকতা করব যে সমাজ কোথায়? আমরা চারজন আই সি এস অফিসর। কমিশনার মিস্টার হজ্ অবকাশ পেলে পিয়ানো বাজান। তিনি বিবাহিত, কিন্তু তাঁর স্ত্রী বিলেতে। জেলাশাসক মিস্টার ওয়াকার চিরকুমার। তিনি অবকাশ পেলে একা একা গলফ খেলেন। জেলা জজ ডক্টর ওয়েট। বিবাহিত। তাঁর স্ত্রী স্থানীয় মহিলাদের নিয়ে একটি সমিতি স্থাপন করেছেন। নাম Helping Hand। দুঃস্থ নারীদের হাতের কাজ এঁরা সাধারণকে প্রদর্শন করেন একটি মেলার মাধ্যমে। মিসেস ওয়েট সত্যিই করুণাময়ী আর তাঁর স্বামীও সত্যি সদাশয়। শুনেছি স্বাধীনতার পর তিনি দেশে ফিরে ধর্মযাজক হন।

একদিন কমিশনার সাহেব ও জজ সাহেব অন্যান্য প্রদেশ কংগ্রেসের অন্তর্বিরোধ লক্ষ করে আমাকে বলেন, 'আপনারা কি বুঝতে পারছেন না প্রাদেশিকতাকে প্রশ্রয় দিলে দেশ খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে?' ডক্টর ওয়েট যোগ করেন, 'Christendomকে ভেঙে যেতে দিয়ে ইউরোপে যে ভুল আমরা করেছি তার জন্য এখন পস্তাচ্ছি। সেই ভুল আপনারা করবেন যদি ইন্ডিয়াকে ভেঙে যেতে দেন।' তখন প্রতিবাদ করে বলি, 'ভারতবর্ষকে আমরা কক্ষনও ভেঙে যেতে দেব না।' তখন আমার খেয়াল ছিল না যে সাম্প্রদায়িকতাও প্রাদেশিকতার মতো বা তার চেয়েও বেশি সর্বনেশে। আমরা তাকে প্রশ্রয় দিয়ে ভুল করেছি। ইংরেজরাও তাতে প্রশ্রয় দিয়ে নিজেদের কীর্তি নিজেরাই নাশ করেছেন। কীর্তির নাম ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষ। ওয়েট সাহেব ডক্টরেট পেয়েছিলেন Innsbruck বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। অস্ট্রিয়ান টিরোলের সে অঞ্চল আমাকে সম্মোহিত করেছিল। আমার কবিতায় তার সাক্ষ্য আছে।

মাহবুব উল আলমের সঙ্গে আমার পরিচয় 'বুলবুল' পত্রিকায় প্রকাশিত 'মোমিনের জবানবন্দী' সূত্রে। একদিন তিনি আসেন আলাপ করতে। সাথী আশুতোষ চৌধুরী, লোকগীতি গবেষক। 'পূরবী' নামে তাঁদের একটি লিটল ম্যাগাজিন ছিল। তাতে ছিল এক গ্রাম্য গীতি, 'মাছ ইলিশা রে।' খুব মজার। এরকম কত মণিমুক্তো ছড়িয়ে আছে গ্রামে গ্রামে। একদিন এঁদের সঙ্গে এলেন নবীন কথাসাহিত্যিক আবুল ফজল। ছদ্মনাম নয়, প্রকৃত নাম। তাঁকে অনুরোধ করলুম খাঁটি চাটগেঁয়ে কথ্যভাষায় গল্প লিখতে। তিনি লিখেছিলেন, কিন্তু সাধারণের দুর্বোধ্য। এখানে বলে রাখি যে মাহবুব উল আলমের 'মোমেনের জবানবন্দী'তে শ্রীমন্ত নামে এক নাপিত চরিত্র ছিল। সে কিন্তু হিন্দু নয়, মুসলমান। মুসলমান, অথচ নাপিত। ধর্ম বদলেছে, কিন্তু জাত বদলায়নি। দ্বিজাতিতত্ত্বের জ্বলন্ত প্রতিবাদ।

মাহবুব মনে করতেন আমার রচিত সাহিত্য এলিমেন্টাল। এটা আমারও মনের কথা। মাহবুব নিজেও একই পথের পথিক।

আবুল ফজল একদিন নিয়ে এলেন প্রায় সত্তর বছর বয়সী বৃদ্ধ আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সাহেবকে। এই জ্ঞানতপস্বী সারা জীবন লুপ্ত রত্ন উদ্ধার করে চলেছেন। তার মধ্যে পড়ে আলাওলের পদ্মাবতী, বিশুদ্ধ বাংলাভাষায় লেখা পদ্মিনী উপাখ্যান। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার—আরবি লিপিতে লেখা। এরকম বেশ কিছু আরবি লিপিতে লেখা বাংলা পুঁথি বাংলায় লিপ্যন্তর করেন সাহিত্যবিশারদ সাহেব। নইলে আমরা জানতেই পারতুম না

যে রোশঙ্গ রাজ্যে বৌদ্ধ রাজার মুসলিম সভাসদ আলাওল মাগন ঠাকুর ও দৌলত কাজী সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলা কাব্য লিখতেন আরবি লিপিতে। তাও প্রধানত হিন্দু নরনারীর কাহিনী। আবুল ফজল বলতেই আমি সাহিত্যবিশারদ সাহেবের জন্য সুপারিশ করে দিলুম সাহিত্যিক পেনশন। সেটা বোধহয় সরকারি চাকরির পেনশনের উপরি।

এ ছাড়া তাঁর ও ডক্টর এনামুল হকের সন্দর্ভ 'আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য' নামক গ্রন্থের সমালোচনা একটি স্থানীয় সাহিত্য সঙ্কলনে প্রকাশ করি আমি। সে সময় এনামুল হক সাহেবকে দেখিনি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ঢাকায় তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়। যেমন ভাষাপ্রেমিক তেমনই দেশপ্রেমিক তেমনই অসাম্প্রদায়িক পুরুষ। সাহিত্যবিশারদ সাহেবের ধারাবাহী।

লাটসাহেবের দরবারে দেখা হয়েছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের মং উপজাতির রাজা নানুমার সঙ্গে। 'রাজা' কিন্তু পুরুষ নন, নারী। চিত্রাঙ্গদার ধারাবাহিনী। একদিন আমি কর্ণফুলী নদীতে লঞ্চে চড়ে রাউদান যাই সরকারি কাজে। সঙ্গে লীলা। দেখি সেখানে বৌদ্ধদের মহামুনি মেলা বসেছে। মহামুনি হলেন বুদ্ধ। মেলা দেখতে বেরিয়ে দেখা পেলুম একটি মাচানের উপর উপবিষ্ট মং রাজা নানুমার। তিনি আনন্দের সঙ্গে আমাদের স্বাগত জানালেন ও চা পানে আপ্যায়িত করলেন। কথাবার্তা হল বাংলাতেই। হ্যাঁ, তিনি বিবাহিতা, কিন্তু তাঁদের উপজাতির নিয়ম অনুসারে পুত্র না থাকলে কন্যাই 'রাজা' হন। 'রাজা'র স্বামীকে কী বলা হয় জানতে চাইনি। 'রানি'?

পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা রাজা নলিনাক্ষ রায়ের রানি ছিলেন কেশবচন্দ্র সেনের পৌত্রী বিনীতা রায়। তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি, হবার কথা নয়, আমি নদীপথে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজধানী রাঙ্গামাটি পর্যন্ত যাইনি। সেটা আমার এলাকার বাইরে। বিনীতা রায় একটি বাংলা পত্রিকা সম্পাদনা করতেন এইটুকু জানি। চাকমারাও বৌদ্ধ। কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। বাংলায়।

কক্সবাজার চট্টগ্রাম জেলার সামিল হলেও ঠিক বাঙালি শহর নয়। বাড়িঘর অন্যরকম। বোধহয় আরাকানের সঙ্গে মিল আছে। এমন সুদীর্ঘ সমুদ্রকূল এই উপমহাদেশের আর কোথাও দেখা যায় না। একটা লম্বা মোটর দৌড় দিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু মোটর পাই কোথায়? তখনকার দিনে চট্টগ্রাম শহর থেকে মোটরপথ ছিল না। যুদ্ধের সময় হয় আমার চলে আসার পর। এখন বাংলাদেশ সরকার কক্সবাজারে একটা আন্তর্জাতিক পর্যটন কেন্দ্র করেছেন। বিলেত থেকেও পর্যটকরা আসে। মোটর দৌড় করে। ওদের জন্য দামি হোটেল হয়েছে। প্লেনও আসে যায়।

এমনই আমাদের দুর্ভাগ্য যে লীলাকে লঞ্চ থেকে নামাতে পারা গেল না। কী একটা বিসর্পে তাঁর মুখমণ্ডল দেখতে দেখতে ফুলে যায়। ওঁকে নিয়ে চট্টগ্রামে ফিরে যেতেও তো অনেক সময় লাগবে। ততক্ষণে ওঁর ফোলা আরও বেড়ে গিয়ে থাকবে। ডাক্তার বলতে কক্সবাজারে সরকারি সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন ডাক্তার দাশগুপ্ত। তাঁকেই ডেকে পাঠালুম। তিনি বললেন যে মনে হচ্ছে ইরিসিপিলাস কিন্তু এখনও বেশি দূর গড়ায়নি। তিনি ওষুধ দিয়ে লীলাকে অনেকটা সারিয়ে তোলেন। তখন আমি আমার সফর সংক্ষেপ করে লঞ্চ নিয়ে চট্টগ্রামে ফিরে যাই। মনে খেদ থেকে গেল যে এতদিন অপেক্ষা করে লঞ্চ যখন পেয়েছি তখন বাংলাদেশের শেষ প্রান্ত টেকনাফ না দেখে ফিরব কেন? সেখানেও একটা

পুলিশ স্টেশন ছিল। সুতরাং আমি থানা পরিদর্শনের অজুহাতে লঞ্চ নিয়ে ঘুরতে পারতুম। ওটা ছিল চট্টগ্রামের বৃহত্তম লঞ্চ। নদীপথের জন্য নয়, সমুদ্রপথের জন্য সংরক্ষিত। এরকম সুযোগ জীবনে দুবার আসে না। দেশভাগের পর তো সে প্রশ্নই ওঠে না।

চট্টগ্রাম শহরে একটা টিলার উপরে ছিল প্রবর্তক সংঘের আশ্রম। আমি সেখানে মাঝে মাঝে গিয়ে শান্তিলাভ করতুম। অধ্যক্ষ বঙ্কিমচন্দ্র সেন ছিলেন অতিশয় সজ্জন ও নিবেদিতপ্রাণ সাধক, শ্রীঅরবিন্দের একজন শিষ্য। কিন্তু তাঁর কর্মপদ্ধতি একজন গান্ধীপন্থীর মতো। আশ্রমিকরা হস্তশিল্প অনুশীলন করতেন। ধর্মের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল কর্ম। সেবাকর্মও তার মধ্যে পড়ে। পরে শুনেছি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় বঙ্কিমবাবু আশ্রমকন্যাদের সুরক্ষার জন্য তাদের সরিয়ে নিয়ে একটি গ্রামে আশ্রয় নেন। কিন্তু পঞ্জাবি সেনা সেখানে গিয়েও চড়াও হয়। নিহত হওয়ার সময় তিনি বুকে চেপে ধরেছিলেন একটি ভগবদ্‌গীতা। শীর্ণকায় সেই মানুষটির ভিতরে ছিল অসাধারণ তেজ ও বাইরে অসামান্য বিনয়। যদিও দেখতে অতি নিরীহ ও দুর্বল।

চট্টগ্রামে আমার বাংলোয় একদিন আমার চেয়ে এক বছরের জুনিয়র আই সি এস আজিজ আহমদ আসেন দেখা করতে। বহরমপুরে আমি তাঁকে আমার জায়গায় রেখে এসেছিলুম। আজিজ আহমদ তখন কলকাতায় উচ্চপদে অধিষ্ঠিত। বললেন, 'কলকাতায় আমি প্রত্যেকটি বাঙালি হিন্দু আই সি এস-এর বাড়িতে কল করেছি। কিন্তু একজনও আমার কল ফিরিয়ে দেননি। কেন বাঙালি হিন্দুরা এত ক্ল্যানিশ?' আমি দুঃখ প্রকাশ করি। এই আজিজ আহমদই আমার চেয়ে জুনিয়র হয়েও পার্টিশনের পরে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের চিফ সেক্রেটারি হন। আর আমি মুর্শিদাবাদের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। পার্টিশন কতক লোকের জীবনে এনে দিয়েছিল আশাতীত প্রমোশন। শুধু ওপারে নয়, এপারেও।

একদিন নাজিমউদ্দিন সাহেবের ভ্রাতা শাহাবুদ্দিন সাহেবও আমার সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। অত্যন্ত ভদ্র ও নম্র ঢাকার নবাব বংশের এই সন্তান। তখনকার বাংলা সরকারের চিফ হুইপ। রাজনীতি নিয়ে দু-চার কথা হল। বেগম শাহাবুদ্দিনের সঙ্গে ঢাকায় আমার আলাপ হয়েছিল। সেটা আমার স্ত্রী-ভাগ্য। অর্থাৎ লীলার খাতিরেই সেটা সম্ভব হয়েছিল। লীলা তাঁর সঙ্গে মিলে মহিলা সমিতির কাজ করতেন। নবাববাড়ির অন্দরমহলে গিয়ে বেগমদের জীবনযাত্রা দেখেছিলেন। তখনকার দিনে বেগম শাহাবুদ্দিন ছিলেন খুবই ফরোয়ার্ড মহিলা, পরদা মানতেন না। অথচ বেগম নাজিমউদ্দিন ছিলেন ঠিক বিপরীত। আমার এক মুসলিম সহকর্মী আমাকে বলেছিলেন, 'শাহাবুদ্দিন মুসলিম হলে কী হবে? ওঁর মস্তিষ্কটা হিন্দুর।' পার্টিশনের পরে তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গভর্নর হয়েছিলেন। আর নাজিমউদ্দিন সাহেব প্রথমে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল, পরে প্রধানমন্ত্রী ও শেষে বরখাস্ত। এখানে বলে রাখি যে ঢাকার নবাব পরিবারের সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা চলত ইংরেজিতে। ঢাকার নবাব হবিবুল্লাহ বাহাদুর নাটোরে আমার সঙ্গে সফর করেছিলেন। তিনি তখন একজন মন্ত্রী। জনসভায় বক্তৃতা দিলেন বিদঘুটে বাংলায়। ফেরার পথে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার বাংলা কেমন লাগল?' (অবশ্য ইংরেজিতে)। আমি বললুম, 'Wonderful' তিনি খুশি হয়ে বললেন, 'I have a knack for languages.'

একদিন 'বুলবুল' সম্পাদক ও মহামেডান ফুটবল টিমের অধিনায়ক হবিবুল্লাহ বাহার এসেছিলেন আমার কাছে একটি সার্কল অফিসরের চাকরির উমেদার হয়ে। সে পদ দেওয়া

তো আমার হাতে নয়। পার্টিশনের পরে তিনি হলেন পূর্ব পাকিস্তান গভর্নমেন্টে একজন মন্ত্রী। একেই বলে পুরুষস্য ভাগ্যম্।

মৌলানা মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী কিন্তু তেমন ভাগ্যবান ছিলেন না। তিনি মুসলিম লীগের বিরোধী কৃষক প্রজা পার্টির এক কট্টর সদস্য। ফজলুল হক সাহেবকে তিনি বলতেন বাংলার র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড অর্থাৎ স্বদলত্যাগী প্রধানমন্ত্রী। (তখনকার দিনে মুখ্যমন্ত্রী কথাটার চলই ছিল না।) মৌলানা সাহেব একটি অনাথ আশ্রম চালাতেন। খুবই সাদাসিধে ভাবে জীবনধারণ করতেন। তাঁকে নিয়ে আমি একবার প্রবর্তক আশ্রমে যাই। বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব ছিল। সেদিন আমার মন অত্যন্ত খারাপ। মিউনিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চেকোস্লোভাকিয়ার কতক অংশ হিটলারকে দিয়ে দেওয়া হবে। আমার বিমর্ষ ভাব দেখে উনি জানতে চাইলেন, কারণটা কী। আমি বললাম, 'চেকোস্লোভাকিয়ার অঙ্গচ্ছেদ।' তখন তিনি বললেন, 'অষ্টমীতে বলিদান।' সেদিন ছিল মহাষ্টমী।

চট্টগ্রামে আলাপ হয়েছিল মাহবুব উল আলম ও আশুতোষ চৌধুরীর সঙ্গে। এঁরা 'পূরবী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করতেন। লোকসাহিত্যের নিদর্শন দেখে আমি মুগ্ধ হই। সাধারণ মানুষও ইচ্ছে করলে ছড়া বা গান রচনা করতে পারে।

ইতিপূর্বে আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস হারিয়েছিলুম। এরপর মানুষেও বিশ্বাস হারাতে বসি। কেমনতর মানুষ ওই ইংরেজ ও ফরাসি মাতব্বররা, যাঁরা নাৎসি নেকড়ে বাঘদের মুখে চেক মেষশাবককে তুলে দেন? চাচা আপন প্রাণ বাঁচা ছাড়া কি আর কোনও মানবিক নীতি নেই? কে না জানে যে নাৎসিদের লক্ষ্য সোভিয়েট ইউনিয়নকে যুদ্ধে পরাস্ত করে কমিউনিস্ট বিপ্লবকে নির্মূল করা?

রম্যাঁ রলাঁ ফরাসি বিপ্লবের মানস সন্তান। রুশ বিপ্লবকে তিনি মনে করেন ফরাসি বিপ্লবের পরিপূরণ। তাই তিনি গত মহাযুদ্ধে যুদ্ধবিরোধী হলেও এখন আর যুদ্ধবিরোধী নন। নাৎসিদের যুদ্ধে পরাস্ত না করলে রুশ বিপ্লব ব্যর্থ হবে। তা বলে তিনি নিজে কমিউনিস্ট নন। তাদের সৎকর্মের সমর্থক, অপকর্মের নয়। রলাঁর সঙ্গে আমার আত্মিক সাযুজ্য ছিল। আমিও ফরাসি বিপ্লবের ভাবধারায় লালিত। রুশ বিপ্লবকে তার পরিপূরক মনে করি। কমিউনিস্টদের কল্যাণকর্ম আমি সমর্থন করি। কিন্তু হত্যা-বিভীষিকা সমর্থন করিনে। আমি নাৎসিদের হাতে বিপ্লবের দীপ-নির্বাণ চাইনে। তাই যুদ্ধের পক্ষপাতী। অথচ মহাত্মা গান্ধী কিছুতেই যুদ্ধে সায় দেবেন না। আর আমিও তাঁর উপর বিশ্বাস হারাব না। এই দোটানায় আমি দোদুল্যমান। পেন্ডুলামের মতো।

এই দশকটার মাঝখান থেকে আমি আমার অন্তরে একটা প্রচণ্ড জ্বালা বোধ করতুম। ইংরেজিতে যাকে বলে burning. কেন এই জ্বালা তা বোঝাতে পারব না। ব্যক্তিগত জীবনে আমার মতো ভাগ্যবান কে? কিন্তু দেশের দিকে, ইউরোপের দিকে যখন তাকাই তখন মনে হয় আমরা বুদ্ধিজীবীরা যাকে ইংরেজিতে বলে impotent. এ যুগটা আমাদের নয়। আমরা যাকে বলে idle spectator. অনেকেই ভোল বদল করে যুদ্ধবাজ হয়েছেন। আমিও দোটানায়।

লীলা বলেছিলেন, 'এই শতাব্দীতেই স্থির হয়ে যাবে পৃথিবীর মানুষ কী চায়—হিংসা না অহিংসা। এটাই এই শতাব্দীর জিজ্ঞাসা। সবাই তাকিয়ে রয়েছে ভারতের দিকে।'

দেশকে সহিংস উপায়ে স্বাধীন করলে কেউ কি ভারতের দিকে তাকাবে? অথচ

অহিংস উপায়ের বিশ্বাস কি কংগ্রেসপন্থীদের আছে? গান্ধীজী ইতিমধ্যে কংগ্রেস থেকে নাম কাটিয়ে নিয়েছেন।

পনেরো

এর পর আমি চার মাস ছুটি নিয়ে সপরিবারে বেরিয়ে পড়ি দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে। এর বিবরণ লিখেছি 'চেনাশোনা' নামক ভ্রমণকাহিনীতে। সে সব কথা ফের লিখলে পাতা বেড়ে যাবে। এক কথায় বলতে পারি, 'কত অজানারে জানাইলে তুমি/ কত ঘরে দিলে ঠাঁই/ দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,/ পরকে করিলে ভাই।' আতিথেয়তা দিয়েছিলেন বোম্বাইতে সোফিয়া ওয়াড়িয়া, ক্ষিতীশচন্দ্র সেন ও পৃথ্বীশ দাশগুপ্ত, পুণায় এস এন সেন, বরোদায় সত্যব্রত মুখার্জির সুপারিশে রাজ সরকার, বাঙ্গালোরে অরবিন্দ বসু, মাদ্রাজে অমূল্য গুপ্ত ও মনন মৈত্র, ত্রিচিনোপলিতে হীরেন্দ্রলাল বিশ্বাস, কলম্বোয় ভূপেশ দাশগুপ্ত ও করুণাদাস গুহ, কাণ্ডিতে আমার সার্ভিসের এ ভি পাই, তখন ভারত সরকারের বাণিজ্য প্রতিনিধি।

যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তাঁদের মধ্যে ছিলেন বোম্বাইতে থিয়োসফিস্ট সোসাইটির অন্যতম নায়ক বি পি ওয়াড়িয়া, বোম্বাইয়ের প্রধানমন্ত্রী বালগঙ্গাধর খের, নাট্যকার মামা বারেরকর, লীলাবতী মুনশী, এইচ জি ওয়েলস (পর্যটন কালে) পুণায় আচার্য কার্বে, এন সি কেলকর, কমলাবাই দেশপাণ্ডে, কোদণ্ড রাও (সার্ভ্যান্ট অব ইণ্ডিয়া)। অজন্তা থেকে ফিরতি ট্রেনে রাইহানা তৈয়বজী। বড়োদায় প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী, বিনয়তোষ ভট্টাচার্য, সৈয়দ মুজতবা আলী। মাদ্রাজে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। কলম্বোয় বার্নার্ড আলুবিহারে (বৌদ্ধ)। কাণ্ডিতে স্যার কুন্দা রাতওয়াতে (বৌদ্ধ)। এরনাকুলমে কবি শঙ্কর কুরুপ। চেরুতুরুচিতে কবি বল্লতোল। মাদ্রাজ থেকে কটকের রেলপথে গোপাল রেড্ডি (শান্তিনিকেতনের ছাত্র. তখন মাদ্রাজ কংগ্রেস সরকারের মন্ত্রী)।

মরাঠি ও গুজরাতি সাহিত্যিকদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন ক্ষিতীশচন্দ্র সেন, তখন বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি। তিনি রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটক ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন। সত্যব্রত মুখার্জিও ছিলেন তাঁর সমসাময়িক ইংলন্ডপ্রবাসী ছাত্র। তিনিও লিখতেন ইংরেজিতে। এই দুটি প্রতিভা রাজকর্মে মগ্ন হয়ে লিখতে ভুলে যান। ক্ষিতীশচন্দ্র আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন আমার চাকরির গোড়ার দিকে, 'সরকারি কাজ ততটুকুই করবেন যতটুকু না করলে চাকরি থাকবে না। বাকি সময়টাতে করবেন সাহিত্যের কাজ।' আমার পলিসিও ছিল তাই। কিন্তু মহকুমাশাসক ও জেলাশাসক হওয়ার পর পলিসিটা গেল উল্টে। যতটুকু সাহিত্যিক কাজ না করলে নয় ততটুকুই করব সাহিত্যে নামটা যাতে থাকে, বাকি সময়টাতে করব মহকুমা শাসন, জেলা শাসন। এমনই করে হব ম্যান অব অ্যাকশন। Iron hand in velvet glove মখমলের দস্তানার ভিতরে লোহার হাত।

এরই নাম পরধর্ম। এ ধর্ম ভয়াবহ। বুঝি আমি সাহিত্যিক হিসাবে বন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছি। তবু আমাকে পেয়ে বসেছে সহকর্মীদের সঙ্গে টক্কর দিয়ে উপরে ওঠা। ক্ষমতার নেশার মতো নেশা আর নেই। বিহারের নেশাকেও তা ছাড়িয়ে যায়। পান আহারের নেশাকেও। কামিনীকাঞ্চন ত্যাগী সন্ন্যাসীও ক্ষমতার নেশায় মত্ত।

ভগবানের মার ছাড়া কি আমি স্বেচ্ছায় স্বধর্মে ফিরতে পারতুম? 'সত্যাসত্য' সমাপ্ত করতে পারতুম? ক্ষিতীশচন্দ্র সেন ও সত্যব্রত মুখার্জির মতো আমিও হতুম একজন 'হইলে

হইতে পারিত' সুলেখক।

মাস কয়েক অবিশ্রান্ত ঘুরে আমরা যাই আমার জন্মস্থান ঢেঙ্কানালে আমার পৈত্রিক বাসভবনে। এবার শুধু বিশ্রাম। কিছুদিন বিশ্রাম। কিন্তু আমাদের ছোট ছেলে চিত্রকামের হল আমাশয়। সেটা যে ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রি তা পরীক্ষা করে জানবার উপায় তখনকার দিনে ছিল না। সেটা আরোগ্যের আধুনিক উপায়ও স্থানীয় চিকিৎসকদের জানা ছিল না। কটকে নিয়ে গিয়ে সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়া হয়। রোগের যন্ত্রণার চেয়ে চিকিৎসার যন্ত্রণা অসহ্য। ওর মা সারাক্ষণ ওর পাশে থাকেন হাসপাতালের ক্যাবিনে। আমি থাকি পুণ্য ও জয়াকে নিয়ে একটু দূরে একটা বাসায়।

চিত্র যেদিন চলে যাবে সেদিন কোথা থেকে খবর পেয়ে দেখতে আসেন সরলা। তিনি এখন নির্বাচনে জিতে এম এল এ হয়েছেন, তাঁর দাদা এখন মন্ত্রী। হাসিতে ভরে গেছে তাঁর মুখ. আমাকে বলেন, 'বিকেলে তোমার ওখানে আসব।' আমি বিকেলে ওঁর অপেক্ষায় বসে আছি তো বসে আছি। ওঁর দেখা নেই। হঠাৎ বেয়ারা এসে আমাকে ডেকে নিয়ে যায় হাসপাতালে। চিত্র আর নেই। লীলা তখন পাথর।

লীলা আমায় ক্ষমা করেননি। আমিও আমায় ক্ষমা করিনি। ওঁর অভিমানের আরও এক কারণ সরলা ওঁকে লিখেছিলেন, 'এস, তুমি আর আমি অন্নদাকে ভাগ করে নিই। রুক্মিণী আর সত্যভামার মতো।' লীলা সেই থেকে সরলাকেও ক্ষমা করেননি। ওঁর মতে সরলা অপয়া। এই দুই নারীর মাঝখানে পড়ে আমি পুত্রশোকে কাতর হব, না আপনাকে বার বার ধিক্কার দেব? আধ ঘণ্টা আগে হাসপাতালে গেলেও চিত্রকে শেষবারের মতো দেখতে পেতুম।

ওর কপালে একটি চুমু খেয়ে মনে মনে বললুম, 'এটা ফাইনাল নয়।' পুনর্বার সংকল্প করলুম এ চাকরি আমি যত শীগগির পারি ছেড়ে দেব। আরও আগে থেকেই ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমি চাকরি ছেড়ে দেব বলে কথা দিয়েও কথা রাখিনি বলেই এই শাস্তি। আবার এটা মনে পড়ল যে আমার তো আমার মায়ের মতো পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেই মারা যাবার কথা। আমার পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে আমি না গিয়ে গেল আমার ছেলে।

চট্টগ্রাম থেকে বেরিয়েছিলুম তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে। ফিরে এলুম দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে। কুমিল্লায় যোগ দিলুম অতিরিক্ত জেলা জজ পদে। ঘুচে গেল সেই আয়রন হ্যান্ডের বড়াই। চাঁদের আলোটা তো চাঁদের নয়, সূর্যের। জেলাশাসকের ক্ষমতাটাও তাঁর নিজের নয়, সরকারের। অপরপক্ষে জেলা জজ সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাঁর ক্ষমতা সরকারের কাছ থেকে পাওয়া নয়। তবে কাজটা একঘেয়ে। আর কখনও কখনও ফাঁসির হুকুম দিতে হয়। তা ছাড়া সফরে যাবার সুযোগ মেলে না ইচ্ছামতো। মানিয়ে নিতে পারলে আমার মতো সাহিত্যিকের পক্ষে শাপে বর।

আমি 'মর্ত্যের স্বর্গ' উপন্যাসে হাত দিই। মনে মনে বাস করি ইংলন্ডে। উপনিষদ, গীতা, রামকৃষ্ণকথামৃত, জাতক, বাইবেল ইত্যাদি ধর্মশাস্ত্র পাঠ করি। Emerson's Essays পড়ি। পড়ে চিন্তা করি জীবনে কোথায় কী ভুল করেছি যার সংশোধন ঘটায় প্রিয়জনের মৃত্যু। ভুলটা তো স্পষ্ট। মদ, সিগারেট, দরবারি পোশাক, লাঙ্গুল বিশিষ্ট ডিনার জ্যাকেট এসব আমার জন্য নয়। আমরা মাছ মাংস ছেড়ে দিই। জীবনটাকে যত দূর সম্ভব গান্ধীজির মতো করি। ব্রহ্মচর্যও

কিছুদিন পালন করেছিলুম। না, বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমাদের নয়।

কোনও অবস্থায়ই টেনিস খেলা ছাড়িনে। কুমিল্লা ক্লাবে চমৎকার লন ছিল। সাথী যাঁরা হতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন আখতার হামিদ খান আই সি এস, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট। ওঁকে নিয়ে আমি 'যে বাঁচায়' নামে একটি গল্প লিখেছি। দুর্লভ চরিত্র। দুরন্ত পাঠান, হিংসায় বিশ্বাসী, কিন্তু চরকা কাটেন, বাড়িতে কেউ ভিক্ষা করতে এলে তাকে দিয়ে খানিকটা চরকা কাটিয়ে নিয়ে তার কাজের মূল্য দেন, আমাকে বলেন গীতার প্রত্যেকটি শ্লোক বারবার পড়তে ও হজম করতে। নিজে কোরান পড়েন। পোশাক খাকসারের মতো। শ্বশুর আল্লামা মাসরিকি। যাঁর প্রকৃত নাম ইনায়েতুল্লা খান। খাকসার নেতা। আখতার পাকিস্তানে বিশ্বাসী, কিন্তু মুসলিম লীগে নয়। গান্ধীজির ভক্ত হলেও বোসবাবুকে পছন্দ। অর্থাৎ সুভাষচন্দ্রকে। আমার সঙ্গে তর্কের প্রধান বিষয় অহিংসা। একদিন বলেন, 'আপনি কি ভেবেছেন আপনাদের সঙ্গে আমরা এক নেশন গড়ব? তা হবার নয়, জজ।'

আখতারকে বাজিয়ে দেখলুম তিনি একজন প্যান-ইসলামিস্ট। ইসলামি দুনিয়াই তাঁর দুনিয়া। পাকিস্তান হবে তারই অঙ্গ। জিন্না নেতৃত্ব তাঁর পছন্দ নয়। জিন্না সাচ্চা মুসলমানই নয়। কী করা যায়! মুসলমানদের নেতা হবার যোগ্য আর তো কাউকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। জিন্না প্রসঙ্গে এই উক্তি আরও অনেক মুসলমানের মুখেও শুনেছিলুম। তাঁরা প্যান-ইসলামিস্ট নন, সেপারেটিস্ট। এই দুই শ্রেণীর মুসলমানকে ছাড়লে বাকি থাকেন যাঁরা ন্যাশনালিস্ট মুসলমান। যেমন আমার বন্ধু হুমায়ুন কবির। এঁর পিতা কবিরুদ্দীন সাহেবের সঙ্গে একবার ট্রেনে আলাপ হয়েছিল। তিনি হিন্দু মুসলিম ও পাশ্চাত্য স্টাইলে তাঁর ফরিদপুরের বাসভবন নির্মাণ করেছিলেন। তিনি সংস্কৃতির ত্রিবেণী সঙ্গমে বিশ্বাসী। আমারই মতো।

অফিসার শ্রেণীতে প্যান-ইসলামিস্ট বিরল। ন্যাশনালিস্ট মুসলিম মুষ্টিমেয়, অধিকাংশই সেপারেটিস্ট বা লীগপন্থী। তবে সবাই কিছু পাকিস্তানপন্থী নন। কেন্দ্রীয় সরকারের সৈন্যদলে, আইনসভায়, সিভিল সার্ভিসে সেপারেট কোটা পেলেই তাঁরা ক্ষান্ত হবেন। পাকিস্তানটা বাধ্য হয়ে শেষ চাল।

কৃষকপ্রজা পার্টি কিন্তু মুসলমানদের দল ছিল না। ওটা ছিল কংগ্রেসের মতো ধর্মনিরপেক্ষ দল। নেতাদের মধ্যে ছিলেন কুমিল্লার কামিনীকুমার দত্ত, চট্টগ্রামের মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী, কুষ্টিয়ার শামসুদ্দীন আহমদ, বীরভূমের জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (জে. এন. ব্যানার্জি) আর খোদ প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক। হক সাহেবই দলটাকে ডোবালেন, নিজেও ডুবলেন।

কুমিল্লায় আমি সামাজিকতা করার কথা ভাবতে পারতুম না। লীলাকে কেমন করে সান্ত্বনা দেব! তাই নিয়ে সন্ধ্যা কেটে যেতে। দু'জনে মুখোমুখি গভীর দুখে দুখী নয়নে জল ঝরে অনিবার। যে দুটি আছে তাদের মানুষ করতে হবে। লীলার পিয়ানো বাজানো বহুদিন বন্ধ। তিনি লেখালেখি করেন ও তাঁর ইংরেজি লেখা সোফিয়া ওয়াডিয়াকে পাঠান। মাদাম ওয়াডিয়া ছিলেন P.E.N. নামক বিশ্ব লেখক সঙ্ঘের ভারতীয় কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাত্রী আর আমি তার একজন গোড়াকার সভ্য। সেই সুবাদে আমরা তাঁর অতিথি হয়ে তাঁর ও তাঁর স্বামীর থিয়সফিক্যাল সোসাইটির আস্তানার অতিথিশালায় মাসখানেক বাস করি। খাওয়াদাওয়া নিরামিষ তো বটেই গান্ধীজির আশ্রমের মতো ঢেঁকিছাঁটা চাল সিদ্ধ শাকসবজি ইত্যাদি।

সোফিয়া ইহুদি, বোমান পারসি, অন্যান্য অধিবাসীরা পাশ্চাত্য খ্রিস্টান। কিন্তু সবাই আচার আচরণে হিন্দু তথা ভারতীয়। সোফিয়া পরে আমার দিদি হয়েছিলেন। তিনি বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ করতেন। সম্পাদনা করতেন 'The Aryan Path' ও 'Indian P.E.N.'

ষোলো

জেলা জজ ছিলেন সিমসন সাহেব। আদালতের কাজ শেষ হলেই বাসভবনে ফিরে গিয়ে টেলিস্কোপ নিয়ে বসতেন। তাঁর বিনোদন বলতে ছিল নক্ষত্রলোক পর্যবেক্ষণ। একদিন আমরা গিয়েছিলুম ওঁর সঙ্গে দেখা করতে। আমাকে দিলেন টেলিস্কোপ। মুগ্ধ হয়ে নিরীক্ষণ করলুম শনি গ্রহ ও তার উপগ্রহের বলয়।

যুদ্ধ বেধে যাবার পর এক দিন উদ্বেগ প্রকাশ করতে গেছি। তিনি বলেন, 'ভালই হয়েছে এখন যুদ্ধ বেধেছে। চার বছর পর বাধলে আমার ছেলেকে ধরে নিয়ে যেত লড়াই করতে।' তাঁর ছেলে পড়ছে তাঁর স্বদেশে। তার মা-ও সেখানে।

মিস্টার পোর্টার ছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। আমি যে একজন সাহিত্যিক এটা তিনি প্রথম আলাপকালেই উল্লেখ করেন। একদিন বলেন, 'এদেশের জমিদারদের চেয়ে ওদেশের জমিদারদের আরও ক্ষমতা। প্রজারা তাঁদের অনুমতি না নিয়ে বিয়ে করতে পারে না।' এরই নাম ইংল্যান্ডের লোকের ব্যক্তিস্বাধীনতা।

কংগ্রেস মন্ত্রীরা দেশ জুড়ে যুদ্ধের ইস্যুতে ইস্তফা দিয়েছেন শুনে পোর্টার সাহেব তো মহাখাপ্পা। উনি বলেন, 'হুঁ। এইজন্যই ওঁরা জেল রিফর্ম বিল রাতারাতি পাস করিয়ে নিয়েছেন। এখন জেলখানায় গিয়ে আরামে থাকবেন।'

এই পোর্টার সাহেবই উঠতে উঠতে অন্তর্বর্তী সরকারে বল্লভভাই পটেলের হোম সেক্রেটারি হয়েছিলেন।

বিষ্ণুপুরের সেই যে মুনসেফ তিনি কুমিল্লায় সাব-জজ হয়ে আমার সহযোগী হন। ভদ্রলোকের নাম ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাকে তাঁর মোটর ব্যবহার করতে দেন। আমারটা আমি চট্টগ্রামে রেখে যাই। পরে বিক্রি করে দিই। ভূপেনবাবুর কাছে আমি এ জন্য ঋণী।

আমার টেনিস খেলার নিত্যসাথী ছিলেন আখতার হামিদ খান, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট। খেলার পর আমরা গোমতী নদীর তীরে বেড়াতে গিয়ে তর্ক করতুম। 'গান্ধী বলছেন কেন? বলুন মহাত্মা গান্ধী।' তিনি চরকা কাটতেন, খদ্দর পরতেন, অথচ অহিংসায় বিশ্বাস করতেন না। যুদ্ধই ছিল তাঁর রোহিলা পূর্বপুরুষদের পেশা। 'গীতা যখন পড়বেন পুরোপুরি আত্মস্থ করে পরেরটি পড়বেন।' এমন যে উদারমনা মুসলমান তিনিই একদিন বলেন, 'জজ, আপনি কি মনে করেন আপনাদের সঙ্গে আমরা এক নেশন হব?' আমি হতবাক্।

পুলিশ সাহেব জাকির হুসেন একদিন বলেন, 'আপনারা আমাদের উপর "বন্দেমাতরম" চাপিয়ে দেবেন। তাই আমরা চাই পাকিস্তান। আপনারা ডালে ডালে চলেন তো আমরা চলি পাতায় পাতায়।'

একদিন অভয় আশ্রমের কর্মী অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরীর সঙ্গে মধ্যরাত্রের ট্রেনে চাঁদপুর যাই। সেখান থেকে যাই স্টিমারে প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের গ্রাম মালিকান্দায় গান্ধীজির দর্শন

পেতে। উদ্দেশ্য তাঁর কাছে পুত্রশোকে সান্ত্বনা অন্বেষণ। তিনি মেজের উপর উপবিষ্ট ছিলেন বুদ্ধের মতো। তাঁর চোখ দুটি চকচক করে উঠল আমার কথা শুনে। বললেন, 'মৃত্যুকে কি কেউ ঠেকাতে পারে?' চাকরি ছাড়ব কিনা প্রশ্ন করলে তিনি নিরুত্তর থাকেন।

চাকরি ছাড়ার কথা আমি অনবরত ভাবতুম। যেন চাকরি ছাড়লেই জীবনটা সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে নিষ্কণ্টক হবে। কোথাও কি তার দৃষ্টান্ত দেখতে পাচ্ছিলুম? স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপকের পদ খগেন্দ্রনাথ মিত্রের সঙ্গে শেয়ার করতে হয়েছিল। শরৎচন্দ্রের মতো জনপ্রিয় উপন্যাস লেখার হাত কি আমার আছে?

কুমিল্লায় সরকারি উকিল ছিলেন ভূধর দাস। অতি সজ্জন। তাঁর ওখানে মাঝে মাঝে যেতুম গভীর বিষয় আলাপ করতে। তিনি জীবনে বারবার শোক পেয়েছেন। বলেন, 'আমার মাথা হেঁট হয়ে গেছে।' শোক মানুষকে বিনম্র হতে শেখায়। আমারও তখন থেকে মনে হয় আমার মাথা হেঁট হয়ে গেছে। ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করি। আমার ইনটেলেকচুয়াল অ্যারোগ্যান্স পরিত্যাগ করি। 'সত্যাসত্য' লিখে আমি অসাধারণ একটা কিছু করছি এটাও আমার অ্যারোগ্যান্স। কিন্তু চাকরি ছেড়ে দিলেই কি আমি অ্যারোগ্যান্স ছাড়তে পারব? লীলা আর আমি আমাদের জীবনযাপনের ধারাকে গান্ধীজি মতো সরল করার চেষ্টা করি। তবে একজন আই সি এস-এর জীবনযাত্রার স্টাইল বজায় রাখাটাও ফর্‌জ। নইলে হব হংসো মধ্যে বকো যথা। আমাদের তখন মগ বাবুর্চি। রাঁধে যেন অমৃত। কিন্তু মাইনেটিও একটু বেশি।

ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ ঘোষ ছিলেন সিভিল সার্জন। তাঁর সাহায্যে আমার কনিষ্ঠপুত্র আনন্দরূপ ভূমিষ্ঠ হয়। একদিন তিনি আমাদের তাঁর যুদ্ধের অভিজ্ঞতা শুনিয়েছিলেন। যুদ্ধকে দূর থেকে সবাই ভয় করে। তিনিও ভয় করতেন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে দেখেন ভয়ডর উধাও হয়ে গেছে। মানুষ মারা যাচ্ছে, তিনিও মারা যাবেন, তবু ভয় বলে কিছু নেই। আমি ভাবি তবে কি মৃত্যু বলে কিছু নেই? আমরা অযথা ভয় পাই? আমার প্রতীতি জন্মায় যে মৃত্যুই জীবনের শেষ নয়। মানবজীবনের শেষ বলতে পারো। কিন্তু মানবজীবনই কি শেষ? পূর্ণ থেকে পূর্ণ বাদ দিলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে।

ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছল। কিন্তু তার দরুন আমার স্ত্রীকেও তাঁর পাসপোর্ট দেখাতে হবে সেটা আমি কল্পনা করতে পারিনি। একদিন একজন ইংরেজ মিলিটারি ইনটেলিজেন্স অফিসর এসে যথেষ্ট ভদ্রতা ও লজ্জার সঙ্গে জানতে চান আমার স্ত্রী কোন দেশের নাগরিক। জার্মান হয়ে থাকলে তাঁকে দেরাদুনে বা নৈনিতালে পাঠানো হত, যেমন করেছিল মিসেস এস. এন. গুপ্তকে।

লীলা তখন পাসপোর্টখানি বাড়িয়ে দেন। British Subject of Indian Domicile. ভদ্রলোক ভুল বুঝতে পেরে মাপ চান।

কুমিল্লায় এক রেজিমেন্ট না ব্রিগেড ভারতীয় সৈন্য এসে হাজির হন। ওঁরা যাচ্ছেন বর্মায় না মালয়ে। ব্রিগেডিয়ার আমাদের নিমন্ত্রণ করেন। ইংরেজ, মধ্যবয়সী। বলেন, 'যুদ্ধ একসময় ছিল একটা বেপরোয়া অ্যাডভেঞ্চার। এখন আর তা নয়। জওয়ানদের চোখ পরীক্ষা করাও, দাঁত পরীক্ষা করাও, হার্ট পরীক্ষা করাও। এরকম হাজার ঝামেলা পোহাতে হয়। আসুন, আপনাদের ঘুরে দেখাই।' যুদ্ধক্ষেত্র নয়, অস্থায়ী শিবির।

মানুষের আসল চিন্তা জীবনকে নিয়ে কী করা যায়। এ চিন্তা আমার ছেলেবেলা থেকেই। কোনও অবস্থাতেই আমি সাহিত্যিক ছাড়া আর কিছু নই। কোনও অবস্থাতেই আমি প্রেমিক ছাড়া আর কিছু নই। জজ, ম্যাজিস্ট্রেট এহো বাহ্য। এ সব এক-একটা পোশাক বই তো নয়। যে কোনও দিন ঝেড়ে ফেলতে পারি, সে সাহস যেন থাকে। কিন্তু পরিবার চলবে কী করে? বাবাও তো নেই যে তাঁর আশ্রয়ে ছেলেমেয়েদের পাঠাব, যদি চালাতে না পারি।

'মর্ত্যের স্বর্গ' লিখনে ব্যাপৃত থাকি। তাতে আমার শোকের অনুভূতিও গাঁথা হয়ে যায়। ইউরোপে যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল তারও অগ্রিম ছায়া পড়ে। রাজশাহিতে বা চট্টগ্রামে লেখা হলে এরকমটি হত না। কোনও এক অদৃশ্য হস্ত আমাকে তখন নিরস্ত হতে বাধ্য করেছে। লেখক নিজেকে যতটা স্বাধীন মনে করে ততটা সে নয়।

যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। কুমিল্লায় এসে হাজির হয় এক রেজিমেন্ট। অফিসররা ইংরেজ। তাঁরা একদিন আমাকে নিমন্ত্রণ করেন। অতি ভদ্র তাঁদের ব্যবহার। যাচ্ছেন বার্মা হয়ে মালয়ে সিঙ্গাপুর অভিমুখে। কেন? সেদিকে কীসের বিপদ! আমি ভাবতেই পারিনে যে জাপান এত দূর এসে হানা দেবে। একদিন এক মিলিটারি ইনটেলিজেন্স অফিসর এসে লীলার পাসপোর্ট দেখতে চাইলেন। লীলা ব্রিটিশ সাবজেক্ট দেখে লজ্জিত হয়ে ফেরত দেন। আমেরিকান হলে তাঁকে বেঙ্গল থেকে সরতে বলা হত। আমার স্ত্রী বলে রেহাই পেতেন না। জার্মান হলে তো তাঁকে অন্তরীণ করা হত দেরাদুন বা সিমলায়।

আমি মন স্থির করে ফেলি যে চাকরি ছেড়ে দেব। শান্তিনিকেতনে বসে পুণ্যকে পাঠভবনে দেব। নিজে লেখালেখি নিয়ে কষ্টেসৃষ্টে সংসার চালাব। আসবাবপত্র জলের দরে বিক্রি করে দিয়ে ছুটি নিয়ে ফের বেরিয়ে পড়লম।

এবার ডেরা শান্তিনিকেতন। রবীন্দ্রনাথ লীলাকে আগে থেকেই চিনতেন। লীলা তাঁর কবিতার অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর পছন্দ হয়েছিল। তাঁকে বলেছিলেন, 'আমি জানি তুমি কর্মঠ মেয়ে। এখানে অনেকগুলো বিভাগ। একটা না একটায় তুমি কাজ পেয়ে যাবে।' এ কথা বলেই তিনি কালিম্পং চলে যান।

সমস্যা দেখা দিল পুণ্যকে পাঠভবনে ভর্তি করা নিয়ে। ওর বয়স আট বছর। অথচ এক বর্ণও ইংরেজি শেখেনি। পড়াশুনো করেছে সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায়। ওর মা ওর সঙ্গে বাংলায় কথা বলেন, একটিও ইংরেজি শব্দ মুখে ধরেন না। গৃহশিক্ষক যাবতীয় পাঠ্য বিষয় পড়িয়েছেন বাংলা মাধ্যমে। এ সমস্ত জেনেও কর্তৃপক্ষ তাকে তার বয়সের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পাঠভবনের ক্লাস থ্রিতে ভর্তি করবেন না। কারণ সে ইংরেজি জানে না। বাড়িতে শিখে নিতেও তো পারে। না, সেটাও নিয়ম নয়। তাসের দেশের নিয়ম মানতে হলে তাকে ভর্তি হতে হবে ক্লাস ওয়ানে। ছবছর বয়সীদের সঙ্গে। তা হলে যে দুটো বছর নষ্ট হবে। হয় হোক নষ্ট দু বছর। তা বলে তো তাসের দেশের নিয়ম ভাঙা চলবে না একটি ছেলের খাতিরে।

কৃষ্ণ কৃপালানি তখন পাঠভবনের অধ্যক্ষ। তিনি আবেদন করলেন পুণ্যকে দিয়ে একটা এক্সপেরিমেন্ট করা হোক। দেখা যাক যে সে এক বছরের মধ্যে ইংরেজি আয়ত্ত করতে পারে কিনা। শিক্ষক প্রতিনিধিরা নারাজ হন। পুণ্য কিছুদিন পরে ওর সমবয়সীদের দলপতি হয়ে আম পাড়তে ঢিল ছোড়ে। এমনই অব্যর্থ লক্ষ্য যে ঢিল পড়ে ওর নিজের মাথায়। ওকে কলকাতা নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করে দিতে হয়। ওর মা ওকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে থাকতে নারাজ। আমি যেখানে যাব তিনি সেখানে যাবেন, ছেলেমেয়েদের

সেখানে রাখবেন। আমি উপলব্ধি করলুম যে পুণ্যর জীবনের দুটো বছর নষ্ট করার অধিকার আমার নেই। এটাও আমি উপলব্ধি করলুম যে এখন চাকরি ছেড়ে দিলে পরে পস্তাব। অপেক্ষা করতে হবে এমন এক লগ্নের জন্য যখন ইস্তফা না দিলে পরে পস্তাব। একটি ছেলে মারা গেছে বলে আর-একটি ছেলের ভবিষ্যৎ মাটি করব এটা কেমনতরো ন্যায়?

ছুটি ফুরোবার পূর্বেই ডাক পড়ে মেদিনীপুর জেলা জজ পদে যোগ দিতে। প্রথমে একাই যাই। পরে সবাইকে নিয়ে যাই। পুণ্যকে ইংরেজি শেখানো হয় আট বছর বয়সে। সে চটপট শিখে নেয়। বছর তিনেক পরে কৃষ্ণনগরের মিশনারি স্কুলে তার নিজের ক্লাসেই ভর্তি হয়। ইংরেজ অধ্যক্ষ তাকে পরীক্ষা করে দেখেন সে কথাবার্তায় দক্ষ। তখন থেকে সে ইংরেজি মাধ্যমেই পড়ে।

আমরা শান্তিনিকেতন ছাড়লেও শান্তিনিকেতন আমাদের ছাড়ে না। সুধাকান্তদার (সুধাকান্ত রায়চৌধুরী) ছেলেমেয়েরা মেদিনীপুরে এসে আমাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নাটিকা অভিনয় করে। বড় ছেলে সৌম্য ফিরে গিয়ে লেখে, 'কাকিমা, এখানে একটা প্লট খালি পাওয়া যাচ্ছে। আপনার নামে কিনতে চাই। টাকা পাঠান।' টাকা পাঠানো হয়। প্লট কেনা হয়। কিন্তু বাড়ি করার কথা উঠলে রথীবাবু হেসে বলেন, 'ওটা আমরা বিশ্বভারতীর জন্য অধিগ্রহণ করেছি।' শুধু ওটা নয়, অনেকগুলো প্লটই সরকার অধিগ্রহণ করে বিশ্বভারতীকে দেয়।

বলতে ভুল গেছি রথীবাবু মেদিনীপুরে আমাকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। আমি কি বাংলা সাহিত্যের চেয়ার নিতে রাজি হব? বেতন দেড় শত টাকা। আমার পক্ষে অত কম টাকায় সংসার চালানো সম্ভব হত না। তা ছাড়া আমি তার উপযুক্ত ছিলাম না। ধন্যবাদ জানাই। পরে সে পদে নিযুক্ত হন প্রবোধচন্দ্র সেন।

মেদিনীপুরে গুছিয়ে বসতে না বসতেই বদলি হই বাঁকুড়ার জেলা জজ পদে। আমার পুরনো কর্মস্থল। এবার আমি সময় পাই আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির সঙ্গে তাঁর বাসভবনে আলাপ আলোচনার। এক জীবন্ত বিশ্বকোষ। কটক কলেজে তিনি আমার ছোটকাকার শিক্ষাগুরু ছিলেন। অশীতিপর বয়সেও নিত্য অধ্যয়নশীল। তবে নির্বাসিত ও নিঃসঙ্গ। পরিবারের ভিতরেও পার্টিশন। রোজ ঘড়ি ধরে খান, ঘড়ি ধরে শোন, ঘড়ি ধরে হাঁটেন, ঘড়ি ধরে খাটেন। যদুনাথ সরকারের মতো। তাঁর পুত্র মণীন্দ্র আমাকে ও আমার স্ত্রীকে নানা ভাবে সাহায্য করেছিলেন।

বাঁকুড়ায় বসে আমি 'অপসরণ' লিখি। 'সত্যাসত্য' উপন্যাসের ষষ্ঠ ও শেষ খণ্ড। বারো বছরের তপস্যার সেইখানেই ইতি। জীবনে যত কাজ হল না সারা এই কাজটিও তার মধ্যে পড়ত যদি জীবনটাই পঁয়ত্রিশ বছরে সারা হত। জীবনদেবতা আমাকে তিন বছর গ্রেস দিয়েছিলেন। 'অপসরণে'ও আগাম সংকটের ছায়া পড়েছে। যদিও 'সত্যাসত্য' উপন্যাসের বৃত্তান্ত ১৯২৭ থেকে ১৯২৯ সালের। সে সময় আমি ইংল্যান্ডে ছিলুম। সেটা একটা যুগসন্ধি। প্রথম মহাযুদ্ধ ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক মাঝামাঝি এক গোধূলিকাল। আমি ভাগ্যবান যে সে সময় ইউরোপে ছিলুম। বিদগ্ধ বাঙালি পাঠকের জন্য এটা ছিল আমার কৃত্য। ব্রতও বলা যেতে পারে। তখন মনে করতুম এটাই আমার জীবনের কাজ। লাইফ ওয়ার্ক।

এ সবই জনগণের জন্য নয়। তাদের জন্য কিছু লেখার দায় আমি বরাবর অনুভব করতুম। যেটা তাদের শ্রমের কাছে আমার অশনবসনের ঋণ শোধ করার উপায়ান্তর না

পেয়ে। হঠাৎ ছড়ার হাত খুলে যায় বুদ্ধদেব বসুর অনুরোধে। 'এক পয়সায় একটি' সিরিজের জন্য লিখি 'উড়কি ধানের মুড়কি'।

জাপানি বোমাবর্ষণের ভয়ে কলকাতা থেকে বহু ভদ্র পরিবার বাঁকুড়ায় আশ্রয় নেন। কেউ কেউ আমার প্রতিবেশী হন। আমার পুত্রকন্যার সাথী হয় তাঁদের পুত্রকন্যা। শহরটা হয় জমজমাট। একদিন সন্ধ্যাবেলা রিকশা থেকে নামেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। জানতে চান Encyclopaedia Britannica আছে কিনা। ছিল। দেখাই। এক খণ্ড ধার নিয়ে যান, দু দিন বাদে ফেরত দিয়ে যান। আইরিশ নেতা পার্নেল সম্বন্ধে তাঁর স্মৃতি ঝালিয়ে তিনি 'মডার্ন রিভিউ'-তে নিবন্ধ লেখেন। পার্নেলের নামে অপপ্রচার করেছিল ইংলন্ডের পত্রিকা। সম্প্রতি একই রকম অপপ্রচার করা হয় ভারতের কোনও এক নেতার বিরুদ্ধে। রামানন্দবাবু অতন্দ্র প্রহরী। পার্নেলের ঘটনাটা তাঁর যৌবনকালের। কী আশ্চর্য স্মৃতি তাঁর। দুটি ঘটনার মধ্যে সাদৃশ্য দেখিয়ে দেন।

আমরা প্রায়ই তাঁর ওখানে যেতুম। দেখেছি কত যত্ন করে তিনি সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখতেন। এক প্রস্থ 'প্রবাসী'র জন্য। আর এক প্রস্থ 'মডার্ন রিভিউ'র জন্য। ঠিক পয়লা তারিখে পত্রিকা দুটিতে বেরোনো চাই। একবার লীলাকে দিয়ে একটি নিবন্ধ লিখিয়ে নিয়ে 'মডার্ন রিভিউ'র সম্পাদকীয় কলমে যোগ করেন, লীলার নামেই।

সোফিয়া ওয়াডিয়ার অনুরোধে আমি ইংরেজিতে বাংলা সাহিত্যের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখে দিই। লীলা তার সঙ্গে যোগ করেন গদ্য পদ্যর নমুনার ইংরেজি অনুবাদ। সোফিয়া ওয়াডিয়া রামানন্দবাবুকে পাঠিয়ে দেন সে পুস্তকের পাণ্ডুলিপি। তিনি একটি ভূমিকা লিখে দেন। আমি তাঁর বাংলা নিবন্ধের সম্বন্ধে প্রশংসা করে কয়েক ছত্র লিখেছিলুম। তা পড়ে তিনি বলেন, 'আমি সাহিত্যিকই নই। কারণ আমি যা লিখেছি তা সাহিত্যই নয়। আমাকে বাদ দিন।' আমি তো হতবাক। পরে ভেবে দেখলুম তাঁর 'বিবিধ প্রসঙ্গ' পুস্তকাকারে প্রকাশ করলে স্থায়িত্ব লাভ করবে না। সাহিত্যের একটি শর্ত স্থায়িত্ব। আমার সংকল্প ছিল চাকরি ছেড়ে দিয়ে আমি সাংবাদিক হব রামানন্দবাবুর মতো। সে সংকল্প ত্যাগ করলুম। তা হলে আমাকে পেনশনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তখনকার দিনে আনুপাতিক পেনশন শুধু ইউরোপিয়ানরা পেতেন। ভারতীয়দের জন্য সেটা চালু হয় পার্টিশনের সময়।

বাঁকুড়ার জজ কোর্টের লাইব্রেরিতে অনেকগুলি আইনের বই ছিল। তার একটিতে দেখি, "The term Hindu includes an Ismailia Khoja." আইনটি কেন্দ্রীয় আইনসভায় পাশ হয়েছিল। কবে সেটা আমার মনে নেই। বিষয়টি অনুসন্ধানযোগ্য।

বাঁকুড়ার রামকৃষ্ণ মিশন ছিল একটি নিভৃত অঞ্চলে। মাঝে মাঝে সেখানে আমরা যেতুম স্বামীজির সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে। স্বামী মহেশ্বরানন্দ ছিলেন ডাক্তার থেকে হোমিওপ্যাথ। হোমিওপ্যাথির সাহায্যে তিনি আমার মহৎ উপকার করেন। আমার পুরাতন উদরাময় সারিয়ে দেন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায়।

বাঁকুড়ায় একটি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ ছিল। ডাক্তাররা আমাদের বন্ধু। লীলা প্রতিদিন তাঁদের সৌজন্যে রোগী দেখতে ও সেবা করতে হাসপাতালে যেতেন। এক-একটি রোগী হয়তো মৃতপ্রায়। লীলা তাদের নিয়ে ব্যস্ত থাকায় বাড়ি ফিরতে দেরি করতেন। কেউ কেউ তাঁরই শুশ্রূষায় বেঁচে যেত। প্রসূতিদের জন্য লীলা ছিলেন সদা তৎপর। তাঁর হাতে

বাচ্চা হলে তো তিনি আনন্দে উদ্ভাসিত হতেন। অবশ্য কোনও কোনও ক্ষেত্রে মৃত্যু দেখতে হত। তখন তাঁর বিষাদও তেমনই দৃশ্যমান।

মোহনলালবাবু নামে সেখানে এক দয়ালু মারোয়াড়ি ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি একদিন লীলার সঙ্গে দেখা করে বলেন, চরকার উৎপাদন এখন অর্থনীতির দিক থেকে স্বনির্ভর হয়েছে। তাঁর উৎসাহে দুঃস্থ মেয়েদের নিয়ে একটি চরকা কাটার ক্লাস বসে আমাদের বাড়িতে লীলার পরিচালনায়। তিনি স্বয়ং চরকা কাটতেন অনেক দিন আগে থেকে গান্ধীজির প্রেরণায়। তাঁর ক্লাসের কয়েকটি মেয়ে চরকা কেটে বেশ দু' পয়সা রোজগার করতে লাগল। মোহনলালবাবু বিক্রয়ের ভার নিলেন।

'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন চলার পরও সে কাজ বন্ধ হয়নি। সরকার বাধা দেয়নি। বাঁকুড়ায় সেটা তেমন জমেওনি। কিন্তু দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে হিংসাত্মক কাজের খবর আসতে লাগল। তা শুনে রামানন্দবাবু আমাকে বলেন, 'ইংরেজরা জানে কেমন করে ভায়োলেন্স দমন করতে হয়। জানে না শুধু নন-ভায়োলেন্স দমন করতে। আন্দোলন ভায়োলেন্সের দিকে মোড় নিয়েছে। এটা বেশি দিন চলতে পারে না।'

কিছু দিন পরে আমাকে কলকাতা যেতে হয় একটা কাজে। উঠি মেফেয়ারে দ্বিজেন্দ্রলাল মজুমদারের বাড়িতে। তখন কলকাতায় রাত্রে ব্ল্যাক আউট চলছে। আমি কলকাতায় এসেছি খবর পেয়ে গান্ধীপন্থী কংগ্রেস নেতা অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী আমার সঙ্গে গোপনে দেখা করেন। আমরা দু জন অন্ধকারে জনহীন পথে পায়চারি করি। তিনি আমাকে বলেন তিনি কলকাতা থেকে নির্দেশ দিচ্ছেন অসমের কংগ্রেস কর্মীদের আর তাঁরা সেখানে রেললাইন ওপড়াচ্ছে, ব্রিজ ভাঙছে, টেলিগ্রাফের তার কাটছে, সৈন্য চলাচল যাতে বন্ধ হয় তার জন্য রাস্তা বন্ধ করছে। আমি জিজ্ঞাসা করি, 'সম্পত্তিনাশও কি অহিংসা?' তিনি উত্তর দেন, 'আমরা তো মানুষের প্রাণনাশ করছিনে। আমরা সম্পত্তিনাশ করছি। তাও আমাদের সম্পত্তি। পরে সে সব আবার বানিয়ে দেব।' গান্ধীজির অবর্তমানে 'হরিজন' পত্রিকা সম্পাদনা করছিলেন কিশোরলাল মসরুওয়ালা। তিনি কিন্তু সেই পত্রিকায় লেখেন যে সম্পত্তিনাশও হিংসা। গান্ধীজি সেটা সমর্থন করেন না।

সরকার থেকে গান্ধীজির নামে অপপ্রচার চলছিল যে তিনি এখন অহিংসা ছেড়ে হিংসায় বিশ্বাসী ও হিংসাত্মক কাজকর্মের জন্য দায়ী। নিজেকে কলঙ্কমুক্ত করার জন্য গান্ধীজি পুণের আগা খাঁ প্যালেসে রাজবন্দি থাকাকালে একুশ দিনের অনশন শুরু করেন। লীলা ও আমি তাঁর জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে অনশনে অংশগ্রহণ করি। কিন্তু অল্প কয়েকদিন। তাঁর অবস্থা যখন খুবই আশঙ্কাজনক তখন বন্দিশালার দরজা খুলে দেওয়া হয়। বহুলোক দর্শন করতে যান। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সোফিয়া ওয়াডিয়া। তিনি আমাদের চিঠি লিখে জানান যে গান্ধীজি শান্তমুখে কথাবার্তা বলছেন।

অনশন ভঙ্গের কিছু দিন পরে একদিন বাঁকুড়ার পুলিশসাহেব মিস্টার ক্লিয়ারি আমাকে গান্ধীজি সম্বন্ধে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বলেন, 'তাঁর সব কটা আইডিয়া ঠিক। তবে তিনি দুশো বছর আগে জন্মেছেন।' মিস্টার ক্লিয়ারি একজন আইরিশম্যান ও রোমান ক্যাথলিক। চিরকুমার। বোনেদের অর্থসাহায্য করতে হয় বলে বিয়ে করেননি। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় একজন পুলিশসাহেবের মুখে এই প্রশস্তি শুনে আমি অভিভূত। জয় হোক মহাত্মা গান্ধীর।

বাঁকুড়ায় আমার চাপরাশিদের মধ্যে একজনের নাম ছিল হরি। হঠাৎ একদিন সে এসে বলে, 'হুজুর যদি আমাকে অনুমতি দেন, আমি ডাকাতি করব।' আমি চমকে উঠে বলি, 'সে কী? তুমি ডাকাতি করবে কেন?' হরি বলে, 'রাতের বেলা গাড়ির পর গাড়ি বস্তার পর বস্তা চাল নিয়ে গাঁয়ের বাইরে চলে যাচ্ছে। আমরা তা হলে বাঁচব কী খেয়ে? সেই জন্য ভাবছি লুট করব।' তখন আমি তাকে বোঝাই যে আইন তাকে রেহাই দেবে না। আমিই তাকে জেলে পাঠাব। তখন সে বলে, 'তা হলে হুজুরই আমাদের খোরাকের ব্যবস্থা করুন।'

কিছু দিন আগেও চালের দর ছিল চোদ্দো টাকা মন। কিন্তু হঠাৎ এক দিন সিলিং উঠে যায়। তখন চালের দর হু হু করে বাড়তে থাকে। কলকাতা থেকে দালালরা এসে চল্লিশ টাকা মনে চাল নিয়ে যায়। সে সময় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন অজয়কুমার ঘোষ, আই সি এস। তিনি চালের গতি নিয়ন্ত্রণ করার আদেশ দেন। তখন সরকার থেকে তাঁকে ধমক দেওয়া হয়। চালের ফ্রি ফ্লো বন্ধ করলে শাস্তি পেতে হবে। কিছু দিন পরে বিভাগীয় কমিশনার সুধীন্দ্রনাথ হালদার, আই সি এস, বাঁকুড়া পরিদর্শনে আসেন। সার্কিট হাউসে আমি তাঁর সঙ্গে মোলাকাত করি। তিনি বলেন, 'চাল বাইরে চলে যাচ্ছে, যেতে দিন। দেখবেন দরকারের সময় বাইরে থেকে এত চাল আসবে যে বাজার প্লাবিত হয়ে যাবে।'

সেই আশাবাদীর সঙ্গে আমি তর্ক করতে পারলুম না। নিজেই আমার আদালতে কর্মচারীদের নিয়ে একটি প্রাইভেট রেশন প্রথা শুরু করে দিলুম। বাজার থেকে একসঙ্গে কয়েক মন চাল কিনে আদালতের একটি কক্ষে মজুত করা হল। সেটা ন্যায্য দরে সকলের মধ্যে বন্টনের ব্যবস্থা হল। কিন্তু পরিকল্পনাটা সফল হয়েছিল কি না বলতে পারব না। কেন না আমি ছুটি নিয়ে সপরিবারে আলমোড়া চলে যাই।

তার আগে একদিন বাঁকুড়ার এক ভদ্রলোক আমাকে তাঁর বিলিতি রেডিয়োটি দিয়ে বলেন, সেটা বিকল, সেটাকে চালু করতে পারি কিনা। নাড়াচাড়া করতে করতে শুনতে পাই, 'আমি সুভাষ, বার্লিন থেকে বলছি। আমি পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে যেমন করে চলে এসেছি তেমন ভাবেই ফিরে যাব।' আমি তো অবাক। এতদিন বাদে তাঁর খোঁজ পাওয়া গেল। কিন্তু কোন পথে সেদেশে গেলেন?

আলমোড়ায় থাকতেন বশী সেন ও তাঁর স্ত্রী গার্ট্রুড এমার্সন সেন। আমেরিকার বিখ্যাত ঋষি এমার্সনের পৌত্রী। স্বামী-স্ত্রী দু জনেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভক্ত। আলমোড়ায় রামকৃষ্ণ আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর মহকুমায় বশী সেনের পৈত্রিক নিবাস। অল্প বয়সে তিনি আমেরিকায় যান ও সেখান থেকে ফিরে আসেন বৈজ্ঞানিক হয়ে। সন্ন্যাস দীক্ষা নেন না কিন্তু থাকেন গৃহস্থ সন্ন্যাসীর মতো।

বশী সেন বলেন, 'চার মাসের জন্য বাসা পাওয়া শক্ত। পেলেও আজকাল ঘরকন্না পেতে বসা খুব সুবিধের নয়। আপনারা ছুটি উপভোগ করতে এসেছেন। অত ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যাবেন কেন? এখানে ছোট একটি হোটেল আছে। আপনাদের জন্য আমি সেখানেই বন্দোবস্ত করেছি। সাধারণত চার্জ যা লাগে আপনারা তার চেয়ে কম দেবেন। মালিক একজন মুসলমান। সে নিজেই রান্নাবান্না করে।' আমরা হোটেলেই উঠি। মালিকের নাম ভুলে যাচ্ছি। লোকটি আমাদের খুব যত্ন করে খাওয়ায়।

হোটেল না বলে ওটিকে একটি বোর্ডিং হাউস বলা যায়। নামটি ঠিক মনে পড়ছে না। যত দূর মনে পড়ছে নামটি হিমালয় হোটেল। আলমোড়ার পক্ষে গ্র্যান্ড হোটেলও বলা যায়।

আগে এক বার আমরা লছমনঝোলা পর্যন্ত গিয়েছিলুম। সে বার এত ভাল লেগেছিল, আবার ফিরে আসবার ইচ্ছে ছিল। কেন এ বার লছমনঝোলায় গেলুম না, তার বদলে আলমোড়ায় গেলুম, তার কারণ মনে পড়ছে না। লছমনঝোলায় ছিল গঙ্গা। তার অপরূপ সৌন্দর্য। আলমোড়ায় দেখি গাছপালা কেটে পাহাড়কে ন্যাড়া করে ফেলা হয়েছে। তবে আমাদের ইচ্ছে ছিল, আমরা আরও উঁচুতে উঠব।

দিলীপদার বন্ধু কৃষ্ণপ্রেম যেখানে থাকতেন সেই জায়গাটির নাম আমার মনে পড়ছে না। সেটি যশোদামাঈয়ের আশ্রম। যশোদামাঈ নামে তিনি পরিচিত। তাঁর প্রকৃত নাম ভুলে গেছি। তিনি লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর পত্নী। তাঁর অনেক শিষ্য ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন কৃষ্ণপ্রেম। তাঁর প্রকৃত নাম মনে পড়ছে না, তবে পদবি ছিল নিকসন। তখন লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন। চাকরি ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাসী হন ও আলমোড়া থেকে আরও উঁচুতে যশোদামাঈয়ের আশ্রমে বাস করেন। তাঁর ইংরেজিতে লেখা উপনিষদ ও গীতার ব্যাখ্যা পড়ে আমি মুগ্ধ হয়েছিলুম। কলকাতায় তাঁকে একবার চাক্ষুষ করেছিলুম। কিন্তু আলমোড়া থেকে আরও উঁচুতে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। আলমোড়াতেই সাধুসঙ্গ নিয়ে আমি সন্তুষ্ট থাকি।

আমার ব্যক্তিগত জীবনে সেসময় একটা ক্রাইসিস চলছিল। যার জন্য আমি ব্যাকুল হয়েছিলুম সেটা একপ্রকার রিনিউয়াল বা নবীকরণ। সরকারি চাকরিতে একেবারেই মন ছিল না। মন ছিল সাহিত্যে, কিন্তু বাজার-চলতি সাহিত্যে নয়। 'সত্যাসত্য' যখন লিখেছিলুম তখন তার পেছনে ছিল সত্যের অন্বেষণ। বারো বছর ধরে সেই সত্যের অন্বেষণ আমাকে নিবিষ্ট রেখেছিল।

এখন আমাকে নিবিষ্ট রাখতে পারে কীসের অন্বেষণ? এক কথায় বলা যেতে পারে, ইংরেজিতে যাকে বলে new order। স্বাধীনতাই যথেষ্ট নয়। ইংল্যান্ডের মতো স্বাধীন দেশকেও ভাবতে হচ্ছে নতুন শৃঙ্খলার কথা। আমি New Statesman-এর গ্রাহক। আমার চিন্তাধারা অনেকটা New Statesman-এর লেখকদের মতো। চাই একপ্রকার welfare state যা আবহমান কালের coercive state নয়। অর্থাৎ যার বাহন আর্মি ও পুলিশ নয়। ইতিমধ্যেই আমি সোভিয়েত কমিউনিজমের উপর বিরূপ হয়েছিলুম। কারণ তার বাহন ছিল আর্মি ও পুলিশ। সেটাও ইংল্যান্ডের তুলনায় অধিকতর মাত্রায়। ইংল্যান্ডে পার্লামেন্ট আছে। পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি আছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে তেমন কিছু নেই। কিন্তু ইংল্যান্ডেও প্রচ্ছন্ন ভাবে রয়েছে উচ্চশ্রেণীর আধিপত্য। তারাই স্কুল-কলেজ চালায়। তাদের ছেলেরাই ইটন-হ্যারো অক্সফোর্ড-কেমব্রিজ থেকে বেরিয়ে দেশের তথা সাম্রাজ্যের কর্ণধার হয়। পার্লামেন্টেও তাদের বংশের লোকেরাই নির্বাচিত হয়ে আসেন। শ্রমিকরা আশা করছে যে যুদ্ধের পর নির্বাচনে তাদের প্রতিনিধিরাই জয়ী হবেন। তারপর ক্রমে ক্রমে সামাজিক পরিবর্তন ঘটাবেন। তারা বিপ্লবে নয়, বিবর্তনে বিশ্বাস করে। তবে সেই বিবর্তনটা নিম্নতর শ্রেণীর পক্ষে হবে ঊর্ধ্বমুখী আর উচ্চতর শ্রেণীর পক্ষে নিম্নমুখী। শ্রমিক নেতারা বিশ্বাস করেন এর জন্য আর্মি ও পুলিশের সাহায্য নিতে হবে না। আইনের সাহায্যই যথেষ্ট।

ভারতের রাজনীতিতে জবাহরলাল নেহরু যে-পরিবর্তন চান সেটা ব্রিটেনের লেবার

পার্টির অনুরূপ। অথচ গান্ধীজির মতবাদ একেবারেই সেরূপ নয়। তিনি চান উচ্চতর শ্রেণীর অন্তর পরিবর্তন। তাই যদি হয় তবে আইনের প্রয়োজন হবে না। আর্মি ও পুলিশের প্রয়োজন তো কখনওই নয়। তাঁর আদর্শের নাম তিনি দিয়েছেন সর্বোদয়। সেটা রাস্‌কিনের Unto The Last লেখাটির স্বদেশি ভাবানুবাদ। আসলে ওটি যিশুখ্রিস্টেরই বাণী। দু হাজার বছর পরেও তাঁর শিষ্যদের আদর্শ। কিন্তু সেই আদর্শের বাস্তব রূপ খ্রিস্টানদের দেশগুলিতেও নেই। যাঁরা খ্রিস্টান নন তাঁরা এর মর্ম কী বুঝবে।

এমন একটা আদর্শ চাই যাকে বাস্তব রূপ দিতে আমাদের জীবৎকালেই আমরা পারব। আপাতত এটাই আমার ধ্যান, এটাই আমার অন্বেষণ। আলমোড়াতে বসে আমি মনে মনে একটি প্রবন্ধের খসড়া করি। পরে তার নাম রাখি 'নতুন করে বাঁচা'।

মাঝে মাঝে আমরা সেনেদের সঙ্গে আলাপ করতে যেতুম। তাঁদের বাড়ির সামনে দেখতুম একগাদা নানা জাতের ঘাস। বশী সেন নতুন নতুন ফসল ফলাবার গবেষণা করতেন। একদিন আমাকে বলেন, 'আমি ইচ্ছে করলেই ডক্টরেট পেতে পারতুম। আমার অধীনে গবেষণা করে কত লোক ডক্টরেট পেয়েছেন। কিন্তু ডক্টরেট পেলে আমি মনে করতুম আমি সব কিছু জেনে গেছি। আমার নতুন কিছু শেখবার নেই। তা তো নয়। আমি রোজই শিখছি।' ওদিকে মিসেস সেন যা নিয়ে মগ্ন ছিলেন তা ভারতবর্ষের ইতিহাস। তিনি সেটি এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে লিখেছিলেন। আমি একদিন তাঁকে বলি, 'ভারতের ইতিহাস তো প্রধানত উত্তর ভারতের ইতিহাস।' তিনি প্রতিবাদ করে বলেন, 'দক্ষিণ ভারতের প্রভাব কিছুমাত্র কম নয়। অনেক কিছু এসেছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে। যেমন শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ, রামানুজের দ্বৈতবাদ, নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ।' তিনি আরও অনেকের নাম করেন। আমি তাঁর জ্ঞানের গভীরতা দেখে মুগ্ধ হয়ে যাই। তিনি ASIA পত্রিকাতে ভারত সম্বন্ধে নিয়মিত লিখতেন।

আমার প্রধান আকর্ষণ ছিল উদয়শঙ্করের কালচারাল সেন্টার। সেটা আলমোড়ার কাছাকাছি অবস্থিত। সেখানে গেলেই দেখতে পেতুম উদয়শঙ্কর ও তার ছাত্রছাত্রীদের নৃত্য অনুশীলন। কেরলের নৃত্যাচার্য শঙ্করণ নম্বুদিরিও সেখানে থাকতেন। একদিন সেখানে গিয়ে শুনি তিনি দুঃশাসনের রক্তপান দৃশ্য নৃত্য আকারে দেখাতে দেখাতেই হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েন ও কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা যান। তাঁর পুত্রের সে কী বিলাপ।

উদয়শঙ্কর আরও অনেক গুণীজনকেও তাঁর কেন্দ্রে স্থান দিয়েছিলেন। সিমকিকেও সেখানে দেখলুম। উদয়শঙ্কর অমলাকে বিবাহ করার পর সিমকিও তাঁদের দলের এক নৃত্যশিল্পীকে বিবাহ করেন। অমলার কোলে তখন শিশু আনন্দ। আমার বন্ধু শরৎ আমাকে একপাশে ডেকে নিয়ে বলে, 'সিমকির মুখখানি লক্ষ করছ তো?'

ইতিমধ্যে আমার বন্ধু শরৎ মুখোপাধ্যায়ও বিহার থেকে এসেছিল কিছু দিন আমার সঙ্গে কাটাতে। সে ছিল সেখানকার এক সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট।

উদয়শঙ্করের সেই কালচারাল সেন্টার কেন যে স্থায়ী হল না তা বলতে পারব না। তবে উদয়শঙ্কর খুবই অস্বস্তি বোধ করছিলেন। তিনি যুদ্ধের দরুন ভারত ভ্রমণের জন্য রেলগাড়ি পাচ্ছিলেন না। তিনি তো যোগী-ঋষি নন যে গুহায় বসে তপস্যা করবেন। সেখানে তাঁর audience কোথায়? আমাদের মতো দু-চার জন ছাড়া কে বা যায় তাঁর নৃত্যকলা দর্শন করতে! তাঁর পক্ষে সেটা একপ্রকার নির্বাসন।

শুনলুম গভর্নর স্যার মরিস হ্যালেট ছিলেন উদয়শঙ্করের পৃষ্ঠপোষক। বশী সেনকেও তিনি সাহায্য করতেন। হ্যালেট সম্বন্ধে আরও একটি কথা শুনলুম। যুদ্ধকালে খাদ্যশস্যের যাতে টান না পড়ে তার জন্য এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক রুদ্র আর তিনি দু জনে মিলে একটি কমিটি গঠন করেছিলেন। প্রত্যেক সপ্তাহে তাঁরা মিলিত হয়ে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতেন ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করতেন। ফলে তাঁর প্রদেশে বাংলার মতো অন্নাভাব হয়নি। তাঁর প্রদেশেও কতক লোকের ভাতই ছিল প্রধান খাদ্য। আলমোড়ায় তেমন লোকের সংখ্যাই বেশি।

একদিন আমাদের হোটেলে একজন ইংরেজ অতিথি আসেন। তিনি একজন পর্বতারোহী। তিনি ছিলেন দেরাদুনের বিখ্যাত পাবলিক স্কুলের মাস্টার। ছুটির সময় হিমালয়শৃঙ্গে আরোহণ করতেন। তিনি একদিন আমাকে একটা মোক্ষম কথা বলেন যেটা শুধু পর্বতারোহণ সম্পর্কে নয়, উপন্যাস রচনা সম্বন্ধেও সত্য। আরোহণকারী যখন বুঝতে পারবে যে আর এক পা এগোলেই খাদে পড়ে নিশ্চিত মৃত্যু তখন সে পিছু হটবে। সেক্ষেত্রে পশ্চাদা পসরণই প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায়। The most important thing for a mountaineer to know is when he is defeated. He must accept that defeat, for not to do so is certain death.

আলমোড়া থেকে ফেরবার পথে ভাগলপুর স্টেশনে আমার পাটনা কলেজের সহপাঠী সিংহেশ্বর প্রসাদের সঙ্গে দেখা। অসহযোগ আন্দোলনে নেমে তিনি জেল খেটেছিলেন। ভারত ছাড়ো আন্দোলন সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় তিনি দুঃখের সঙ্গে বলেন, 'ত্যাগের যুগ শেষ হয়ে গেছে। ত্যাগ করতে এখন কেউ রাজি নয়।' আমার আশঙ্কা ছিল একবার মন্ত্রিত্বের স্বাদ পেলে মানুষ ভোগের কথাই চিন্তা করবে। হুমায়ুন কবির একবার আমাকে বলেছিলেন, 'এক বার জেল থেকে ঘুরে এলেই যদি মন্ত্রী হওয়া যায় তবে জেলে যেতে কে না রাজি হবে!' কংগ্রেসের সেই ভাবমূর্তি বিয়াল্লিশের আন্দোলনে ছিল না।

কলকাতায় দেখলুম হাজার হাজার লোক গ্রাম থেকে এসে হাজির হয়েছে, তাদের জন্য লঙ্গরখানা খোলা হয়েছে। কান টানলে যেমন মাথা আসে চাল টানলে তেমনই মানুষ আসে। গ্রামের মানুষ গ্রাম ছেড়ে চলে এসেছে অন্নের অন্বেষণে। যে-অন্ন প্রকারান্তরে তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা অন্ন।

আমি কৃষ্ণনগরে জেলা জজ হিসেবে যোগ দিই। খোলা বাজারে চাল কিনতে পাইনে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে অনুরোধ করি এক মন চাল কিনে দিতে। তিনি চল্লিশ টাকা দরে এক মন চাল পাঠিয়ে দেন। লেখেন, 'এইটেই শেষ বস্তা। এর পরে আর পাবেন না।' চাকরবাকররা ভাত ছাড়া আর কিছু খাবে না। সেই চাল তাদের দিয়ে আমরা দু বেলা রুটি খেয়ে চালাই।

একদিন শুনলুম ফুড কমিশনার পিনেল সাহেব এসেছেন। সার্কিট হাউসে উঠেছেন। তিনি আমার পুরাতন বস্। গেলুম সৌজন্য-সাক্ষাৎ করতে। তিনি তখন সভা করছিলেন। সভায় যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে এক জন কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি ও এক জন মুসলিম লীগের প্রতিনিধি। কংগ্রেস বা ফরওয়ার্ড ব্লকের কেউ নেই। কমিউনিস্ট প্রতিনিধি বললেন, লীগের প্রতিনিধির দিকে তাকিয়ে, 'দাদা আর আমি যাব গ্রাম থেকে চাল প্রোকিয়োর করতে। সরকারি দরে যদি না দেয় তবে জবরদস্তি কেড়ে নিয়ে আসব।' তা শুনে পিনেল সাহেব

বললেন, 'সেটা আপনারা এক বার মাত্র পারবেন, দ্বিতীয় বার পারবেন না।'

আসল কথা সরকার যে-দর বেঁধে দিয়েছিলেন সেই দরে চাষিরা কেউ ধানচাল ছাড়বে না, সরকারও জোরজবরদস্তি করবে না। এর পরিণতি খোলা বাজারে চালের আকাল। কেন এরকম পরিস্থিতি হল তার কারণ যুদ্ধের গোড়ার দিকে কলকাতায় রেশন প্রথা প্রবর্তন করা হয়নি। যেমন হয়েছিল লন্ডনে। পিনেল নাকি বলেছিলেন লন্ডনে যেটা সম্ভব কলকাতায় সেটা সম্ভব নয়। তেতাল্লিশ সালের মার্চ মাসে দেখা গেল কলকাতায় মাত্র দশ দিনের চাল অবশিষ্ট আছে। তখন চাল কেনা-বেচার উপর থেকে সিলিং তুলে নেওয়া হল। চালের দর হুহু করে বেড়ে গেল। তখন আর নির্দিষ্ট দরে চাল কিনতে পারা গেল না। এই যে বিভ্রাট এটা নিশ্চয়ই নিবারণ করতে পারা যেত। যদি হ্যালেটের মতো গভর্নর আর রুদ্রের মতো পরামর্শদাতা কলকাতায় থাকতেন।

কিছুদিন পর আমাকে কলকাতা যেতে হল একটা কাজে। রাস্তার মোড়ে ট্রামের জন্য অপেক্ষা করছি। এমন সময় ট্রাম থেকে নামলেন দুই মূর্তি খাকসার। তাঁদের একজন আমার পুরাতন সহকর্মী আখতার হামিদ খান, আই সি এস। আখতার নিজে থেকে বললেন, 'এইমাত্র চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ফিরছি। চিফ সেক্রেটারির সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল। তিনি কৈফিয়ত চাইলেন কেন আমি চালের অবাধ গতি আটক করেছি। আমি বললুম আমি আমার মহকুমার লোকজনদের আকাল থেকে বাঁচিয়েছি। তিনি আমার উপর রাগ করলেন। আমি বললুম এই নিন ইস্তফা।' আমি তাঁর কথা শুনে একদম হতবাক। তখন তিনি আমাকে বললেন, 'আপনাকেও ইস্তফা দিতে হবে, জজ।' আমি বললুম, 'আমি তো জজ। এ-সব ব্যাপারে আমার তো কিছু করবার নেই।' তিনি বললেন, 'আপনি তো মানুষ। মানুষ না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে, আপনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবেন? মানুষকে বাঁচানো আপনারও দায়িত্ব।'

চালের অবাধ গতি না আটকালে দালালরা বেশি দাম দিয়ে চাল নিয়ে যাবে জেলার বাইরে, কলকাতায় বা অন্য কোনও বড় শহরে, যেখানে বেশি দাম দিয়ে চাল কেনার লোক আছে। গ্রামের লোক নায্য মূল্যে চাল কিনতে পারবে না। তারা না খেয়ে মারা যাবে কিংবা শহরে গিয়ে ভিড় করবে। সেখানে তাকে ভিক্ষা করে খেতে হবে বা পথেঘাটে মরতে হবে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে আখতার সত্যি সত্যি চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন। পরে আমাকে আলিগড় থেকে লেখেন যে তিনি বেকার যুবকদের তালা তৈরি করতে শেখাচ্ছেন।

কৃষ্ণনগরে আমার পুরাতন বেহারা বৃদ্ধ নারায়ণকে হারাই। লীলার মতো সহধর্মিণী লাভ যেমন একটি blessing নারায়ণের মতো বেহারা লাভও তেমনই আর একটি blessing। সেবক হিসাবে সে যেমন কর্তব্যপরায়ণ ছিল তেমনই মানুষ হিসেবে শ্রদ্ধেয়। বিধাতার চক্ষে সে-ই হয়তো বড়; আমি ছোট। ওর ভাইপো বলল, 'আপনার কৃপায় ওর গঙ্গাপ্রাপ্তি হল।' দাহকর্ম হয়েছিল ভাগীরথীর ঘাটে।

কৃষ্ণনগরে আমার প্রধান কাজ হল আমার বড় ছেলে পুণ্যকে মিশনারি হাই স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া। ইংরেজ হেডমাস্টার তার ইংরেজি-জ্ঞান পরীক্ষা করে তাকে তার সমবয়সীদের পাশেই ভর্তি করেন।

এ সময় আমি আবার লেখালেখিতে হাত দিয়েছিলুম। তখন আমার চিন্তা, এত কাল আমি এলিতের জন্য লিখেছি, এখন পীপলের জন্য লিখব। ভাষা হবে এত সহজ সরল যে

তার চেয়ে সহজ সরল হতে পারে না, অথচ ভাব হবে বিষয় অনুসারে গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ। এটা একপ্রকার অসাধ্যসাধন। একদা আমার লেখায় ব্রিলিয়ান্স ছিল, কিন্তু পরে তা রইল না। এটা ক্ষমতার অভাবে নয়। আমি ইচ্ছাপূর্বক ব্রিলিয়ান্স ত্যাগ করি। দৃষ্টান্ত টলস্টয়ের তেইশটি কাহিনী। সহজ সরল গভীর মহৎ। বাহুল্য বর্জিত। এই নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করছি। এমন সময় পড়ে গেলুম কৃষ্ণনগরের মশার কোপে। জজের কুঠি যেখানে সে পাড়ায় ছিল গরিব লোকদের বসতি। প্রত্যেক রাত্রে একজন না একজন মারা যেত। আমিও তাদের একজন হতে যাচ্ছিলুম। কারণ আমার চার বার বিনাইন ও দু বার ম্যালিগনান্ট ম্যালেরিয়া হয়েছিল। আমার ডাক্তার-বন্ধু জ্যোতির্ময় দাশগুপ্ত বললেন, 'আর এক বার যদি আপনার ম্যালেরিয়া হয়, আপনাকে বাঁচাতে পারব না। আপনি পালান।' আমি ছুটি নিয়ে সপরিবারে চলে গেলুম বিহারে জামুই বলে একটি জায়গায়। আমার বন্ধু শরৎ তখন সেখানে এস ডি ও।

ডাক্তার দাশগুপ্ত আমাকে টনিক হিসাবে Vinum Grapes খেতে বলেছিলেন। এক বোতল কেনা হল। তা দেখে লীলা বললেন, 'মদ একবার ধরলে আর ছাড়তে পারবে না। এটা বিদায় করো।' সেই মনোরম বোতলটি দোকানে ফেরত দিতে হল। দেশে বিদেশে অনেক বার সুরার অফার প্রত্যাখ্যান করেছি। সেটা লীলার নির্বন্ধে।

শরৎ বলল, 'ভাগ্যিস জাপানিরা আসেনি। ওরা এলে আমরা পাটনা থেকে টেলিগ্রাম পেতুম। বেঙ্গল কামিং। তখন বেঙ্গল গভর্নমেন্টের উচ্চপদস্থ অফিসারদের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হত। তখন তোমাকে আমরা বিহার সরকারের তরফ থেকে অভ্যর্থনা করতুম।'

বলতে ভুলে গেছি, বাঁকুড়ায় আমি এই মর্মে একটা সরকারি সার্কুলার পেয়েছিলুম যে জাপানিরা যদি কোনও জেলায় এসে হাজির হয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ভিন্ন আর সব বড় বড় অফিসর নিজ নিজ অফিসের ভার অধস্তন অফিসরের জিম্মায় দিয়ে বিহারে চলে যেতে পারেন। কিন্তু জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে যদি জাপানিরা অনুরোধ করে তবে তিনি থেকে যেতে পারেন। আমি যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলুম না সেটা আমার বাঁচোয়া। তবে মেদিনীপুরে জাপানিরা জলপথে উপস্থিত হতে পারে এই আশঙ্কায় সেখানকার কয়েকটি বিভাগ বাঁকুড়ায় স্থানান্তরিত হয়েছিল। কৃষ্ণনগরে দেখলুম যে সেখানেও কলকাতার কয়েকটি বিভাগ স্থানান্তরিত হয়েছে। আমার ডাক্তার-বন্ধু জ্যোতির্ময় দাশগুপ্ত কলকাতা কর্পোরেশনের হেলথ ডিপার্টমেন্টের একজন অফিসর। জাপানি আক্রমণের আশঙ্কায় সরকার এ রকম অনেক সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন।

জামুইতে শরৎ আমাকে সতর্ক করে দেয় যে ইংরেজ চলে গেলে সহিংস উপায়ে ক্ষমতা দখলের জন্যে তৈরি হচ্ছে মুসলমানদের খাকসার দল ও হিন্দুদের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক। সামনে আসছে বলপরীক্ষা অস্ত্র হাতে নিয়ে।

জামুইতে মাসখানেক থেকে আমি বীরভূমে চলে যাই জেলা জজ হয়ে। কৃষ্ণনগরের মশা নিয়ে কবিতাটি বোধহয় সিউড়িতে বসে লেখা। সেখানে আমার ছড়ার হাত খুলে গিয়েছিল। নতুন ধরনের ছোটগল্প লিখতে শুরু করি। 'বিনুর বই' সেখানে বসেই লেখা। বীরভূম আমি চেয়েই নিয়েছিলুম, যেটা আমি আর কখনও করিনি। উদ্দেশ্য ছিল শান্তিনিকেতনে গিয়ে আমার বসবাসের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করা।

বীরভূমে থাকতে আমি একবার শান্তিনিকেতনে গিয়ে চীনা ভবন পরিদর্শনকালে দেখি এক চীনা মহিলা নিবিষ্ট মনে একখানি বই ইংরেজি থেকে চীনা ভাষায় তর্জমা করছেন। বইখানি অন্নদাশঙ্কর ও লীলা রায়ের লেখা 'বেঙ্গলি লিটারেচর', পি ই এন থেকে প্রকাশিত। এই দৃশ্য দেখে আমি যেমন অবাক, লেখককে চাক্ষুষ করে তিনিও তেমনই অবাক। তাঁর স্বামী চীনা ভবনের প্রফেসর। এই দম্পতিকে আমি আবার দেখি প্রায় চল্লিশ বছর বাদে শান্তিনিকেতনে। তাঁরা আমাকে ও আমার স্ত্রীকে চিনতে পারেন। ইতিমধ্যে চীন দেশে দু বার বিপ্লব ঘটে গেছে। দ্বিতীয়টির নাম সাংস্কৃতিক বিপ্লব। সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপককে রাজধানী থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় গ্রামে হাল-লাঙল ধরে চাষ করতে। আর তাঁর বিদুষী পত্নীকে রান্না করতে বাসন মাজতে কাপড় কাচতে। দেং শিয়াং পিং পরে তাঁদের স্বস্থানে বহাল করেন। বকেয়া বেতন দেন। উপযুক্ত বাসস্থান দেন। কিন্তু সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ক্যাজুয়ালটি হয় আমাদের 'বেঙ্গলি লিটারেচর'-এর চীনা অনুবাদ। ভদ্রমহিলা দুঃখপ্রকাশ করে বলেন, 'তখনকার গোলমালে আপনার বইয়ের অনুবাদ কোথায় হারিয়ে গেছে।'

শান্তিনিকেতনে প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী শেষ বয়সে বসবাস করতেন। তাঁদের সঙ্গে দেখা করি। চৌধুরীর তখন বাহাত্তুরে দশা। কথাবার্তা এলোমেলো। বেরিয়ে আসছি, এমন সময় পুরাতন ভৃত্য ননী এসে বলে, 'সাহেব এখন বড় কষ্ট পাচ্ছেন। খাচ্ছেন শুধু সোডাজল। আপনি কি এক বোতল ইয়ে কিনে দিতে পারেন?' কিন্তু আমি তা কিনে দিতে পারিনে।

সিউড়ির পাবলিক লাইব্রেরিতে বেশ কয়েকখানি দুর্লভ গ্রন্থ ছিল। একখানি গ্যেটের আত্মজীবনী। নাম যতদূর মনে পড়ে 'Poetry and Truth'. অন্য একখানা টলস্টয় পত্নীর ডায়রি। টলস্টয়ের গৃহত্যাগ সম্বন্ধে তাঁর জবানি অন্যরূপ। যতদূর মনে পড়ছে, কে একজন ডাক্তার নাকি তাঁকে বলেছিলেন যে তাঁর স্বামী টাইফয়েড নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন, সেই রোগেই মারা যান।

দুই

সিউড়িতে থাকতে এক বার আমি কেন্দুলির জয়দেব মেলা দেখতে গিয়েছিলুম। বাউলদের সঙ্গে ছিলেন তাঁদের সাধনসঙ্গিনীরা। তাঁদের এক জনকে দেখে আমার মনে হল আমার 'দু কানকাটা' গল্পের নায়িকা সারি। আশ্চর্য তাঁর পার্সোন্যালিটি। বাউল মেয়েরা গরিব হলে কী হয়, তাঁরা স্বাধীন। তাঁরা পুরুষের আশ্রিতা নন, সেবিকাও নন। গান গেয়ে তাঁরা আপন জীবিকা নির্বাহ করেন। সেটা ভিক্ষা নয়, পারিশ্রমিক।

সিউড়িতে থাকতেই পঁয়তাল্লিশ সনের শেষের দিকে শুনতে পাই দুটি গুজব। একটি গুজব, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতারা চিন্তা করছেন, বাংলাদেশকে দু ভাগ করবেন। পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষাকৃত ছোট, সেই জন্য তাকে মেলাতে হবে বিহারের সঙ্গে। এ গুজব আমি হেসে উড়িয়ে দিই। আর একটি গুজব, ইউরোপীয় অফিসররা ক্ষতিপূরণ পেলেই পেনশন নিয়ে এ দেশ থেকে চলে যাবেন। ইজিপ্ট থেকে কাগজপত্র আনিয়ে দেখছেন সে দেশ থেকে বিদায় দেওয়ার সময় ইউরোপীয়দের ক্ষতিপূরণের হার কী রকম ছিল। এই গুজবটা শুনে আশান্বিত হই। ভারতীয়দের বেলাতেও হয়তো এ রকম একটা ব্যবস্থা হতে পারে। তা হলে আমিও অসময়ে বিদায় নিতে পারব। ভারত থেকে নয়, ভারতীয় সিভিল সার্ভিস থেকে।

সেই বছরের শেষের দিকে, নভেম্বরে, আমার কনিষ্ঠ কন্যা তৃপ্তি ভূমিষ্ঠ হয়। ডিসেম্বরে আমি পাই ময়মনসিং বদলির হুকুম। সরকারকে অনুরোধ করি আমাকে মাসখানেক সময় দিতে।

এই সময়ের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী আসেন শান্তিনিকেতনে। আমার কংগ্রেসি বন্ধু অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী আমাকে জানান যে গান্ধীজি আমাকে পনেরো মিনিট সময় দিতে রাজি হয়েছেন, যদি আমি শান্তিনিকেতনে গিয়ে দেখা করি। আমি একদিন বিকেলে মোটরে করে শান্তিনিকেতনে যাই। আমার সঙ্গে মুনসেফ বিপুল চট্টোপাধ্যায়। গান্ধীজি বিনয় ভবন থেকে শ্যামলীতে এলেন একটু দেরি করে। আমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বললেন। রথীবাবু আমার পরিচয় দিলেন আমি এখানকার জেলা জজ। গান্ধীজি একটু হেসে বললেন, 'But he is no judge'. তাঁর প্রার্থনার সময় আসন্ন। তিনি আমাকে দু মিনিটের বেশি সময় দিতে পারলেন না। আমি সেই দু মিনিটের মধ্যে তাঁকে বললুম, 'বাংলার মন্বন্তরের জন্য দায়ী কলকাতার বড়লোকরা।' তিনি বললেন, 'আমিও কারও কারও মুখে সে-কথা শুনেছি। আমি কলকাতা যাচ্ছি। তুমিও সেখানে আমার সঙ্গে দেখা কোরো। তোমার মুখে আমি আরও শুনতে চাই।'

গান্ধীজির প্রার্থনাসভায় আমরাও—বিপুলবাবু আর আমি—যোগ দিই। যত দূর মনে হল তিনি নীরবে মালা জপ করছিলেন। সেটাই তাঁর প্রার্থনা। কাকে প্রার্থনা, কী প্রার্থনা তা বোঝবার উপায় ছিল না। প্রার্থনা শেষে তিনি ভাষণ দিলেন। বিশেষ করে তিনি বললেন অস্পৃশ্যতা দূর করতে হবে। 'অস্পৃশ্যতা' তিনি উচ্চারণ করলেন 'অস্‌প্রুশ্যতা'। গুজরাটি মরাঠি ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষার 'ঋ'-র উচ্চারণ হয়ে যায় 'রু', যেমন ক্রুষ্ণ, ক্রুপা, রুষি, সংস্ক্রুত ইত্যাদি।

শান্তিনিকেতন থেকে মোটরে করে কিছু দূর গেছি। বিপুলবাবু বলে উঠলেন, 'ওইয্‌যা! মহাত্মা যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন সেখানকার একটু পায়ের ধুলো কুড়িয়ে আনতে ভুলে গেলুম।' তাঁর দুঃখে আমিও দুঃখিত হলুম।

এর কিছু দিন পরে সপরিবারে কলকাতা হয়ে ময়মনসিংহে যাই। কলকাতায় গান্ধীজি ছিলেন সোদপুরে। আর আমি পার্ক সার্কাসে। তার প্রোগ্রাম পরিচালনা করছিলেন রাজকুমারী অমৃত কওর, রাজা হরনাম সিং-এর কন্যা। রাজা হরনাম সিং খ্রিস্টান দীক্ষা নিয়ে তাঁর দীক্ষাগুরু রেভারেন্ড গোলোকনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। রাজকুমারী টেলিফোনে আমাকে উত্তর দেন, 'বাপুর সঙ্গে কথা বলতে হলে তিনি যখন ভোরবেলা হাঁটতে বেরোন তখন তাঁর সঙ্গে হাঁটতে হবে।' গান্ধীজির পক্ষে যেটা হাঁটা অপরের পক্ষে সেটা দৌড়নো। আমি দৌড়তে রাজি ছিলুম। কিন্তু মুশকিল হল এই, লীলা চেয়েছিলেন গান্ধীজিকে দর্শন করতে। কিন্তু দেড় মাসের মেয়েকে তিনি নিয়েও যেতে পারেন না, রেখেও যেতে পারেন না। আর পার্ক সার্কাস থেকে সোদপুর কম দূর নয়। সুতরাং আমার সোদপুরে যাওয়া হল না, গান্ধীজির সঙ্গে দৌড়নো হল না, মন্বন্তরের সময় কলকাতার ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হল না।

বীরভূমে আমার কার্যকাল দু বছরের চেয়েও কম। এ বার বদলি একেবারে বাংলার অপর প্রান্তে। ময়মনসিংহ কলকাতা থেকে এত দূরে যে আমি আমার কলকাতার বন্ধুদের সঙ্গে মাঝে মাঝে মিলিত হতে পারব না। তাঁরাও ময়মনসিংহে এসে আমার সঙ্গে মিলিত

হতে পারবেন না। সাহিত্যিকের পক্ষে এটা একপ্রকার নির্বাসন। এটা তিন বছর স্থায়ী হতেও পারে।

তখন কি আমি জানতুম যে বছর দেড়েক পরে দেশ আর প্রদেশ দু ভাগ হয়ে যাবে! পূর্ববঙ্গ পড়বে পাকিস্তানে! সেখান থেকে হিন্দু অফিসর-শ্রেণী পাইকারি হারে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসবেন! তাঁদের অনুসরণে হিন্দু মধ্যবিত্ত-শ্রেণী এবং অবশেষে সর্বশ্রেণীর হিন্দু! এটা এমন একটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপার যে ছেচল্লিশ সালের গোড়ায় আমি ময়মনসিংহে এর বিন্দুবিসর্গ টের পাইনি। হতে পারে যে আমি ছ বছর পূর্ববঙ্গের বাইরে থাকায় সেখানকার মুসলমানদের মানসিক পরিবর্তনের সঙ্গে যোগ রাখতে পারিনি। ওঁরাই তো সাঁইত্রিশ সাল থেকে সারা বাংলায় সরকার পরিচালনা করে এসেছেন। পাকিস্তান পেলে ওঁদের এমন কী লাভ হবে? পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় স্তরে কি ওঁরা সরকার পরিচালনায় ন্যায্য ভাগ লাভ করতে পারবেন? হিন্দু প্রতিযোগিতা থাকবে না, কিন্তু অবাঙালি মুসলমান প্রতিযোগিতা তো থাকবে। তাঁরাই তো প্রত্যেকটি কেন্দ্রীয় সার্ভিসে সিংহভাগ পেয়ে বসে আছেন। সৈন্যদলে তো তাঁরাই সর্বেসর্বা। হিন্দুই একমাত্র শত্রু নয় অথবা প্রধান শত্রু নয়। কাজী আবদুল ওদুদ তো মনে করেন পঞ্জাবের সঙ্গে বাংলার জোড়াতালি বিপজ্জনক হবে।

যাই হোক, ছেচল্লিশ সালের গোড়ার দিকে আমি ময়মনসিংহে গিয়ে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতিই দেখেছি। আমার সেরেস্তাদার ছিলেন সরফুদ্দিন আহমদ। তিনি শার্ট প্যান্ট পরতেন। একদিন আমাকে তিনি নিয়ে যান ময়মনসিংহের ব্রাহ্ম সমাজে উপাসনায় যোগ দিতে।

জেলাশাসক ছিলেন বাঙালি মুসলমান। মানুষটি খর্ব, নামটি দীর্ঘ। তাজ্উল ইসলাম মহম্মদ নুরউন্-নবী চৌধুরী, আই সি এস। বন্ধুরা সংক্ষেপে বলতেন Tiny Tim। তাঁর অন্তঃকরণ ছিল মহৎ। নুরউন্-নবী সাহেবের সফর ছিল এক শোভাযাত্রা। একখানা জিপে তিনি, পেছনে তিনখানা ট্রেলার। তাতে তাঁর ভাণ্ডার ও চাকরবাকর। সরেজমিনে মামলা-মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করতেন। তিনি গান্ধীজির গঠনকর্মে বিশ্বাস করতেন। একেবারেই সাম্প্রদায়িক ছিলেন না।

নুরউন্-নবী সাহেব একবার আমাকে ময়মনসিংহ সদর হাসপাতালে টি বি ওয়ার্ড স্থাপনের জন্য অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে সেখানকার মহারাজার ভবনে নিয়ে গিয়েছিলেন। সিতাংশুকান্ত, সুধাংশুকান্ত ও স্নেহাংশুকান্ত এই তিন কুমারকেই আমরা ভেট করলুম। কিন্তু তাঁরা আমাদের নিরাশ করলেন। তবে বেশ মজা লাগছিল এ কথা জেনে যে সিতাংশুকান্ত ছিলেন হিন্দু মহাসভা-পন্থী, সুধাংশুকান্ত কংগ্রেসপন্থী এবং স্নেহাংশুকান্ত মার্কসপন্থী তথা মুসলিম সমাজে জনপ্রিয়। কমিউনিস্টরা তো জানিয়েই রেখেছিলেন যে তাঁরা পাকিস্তান সৃষ্টির পক্ষে। এই বংশের এক শরিক মুক্তাগাছার জীবেন্দ্রকিশোর একদিন আমাকে সফর থেকে ফিরে আসার পথে ধরে নিয়ে যান তাঁর ভদ্রাসনে। সেখানে তাঁর নিজের রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেন 'বিসর্জনে'র রঘুপতির ভূমিকা। Solo অভিনয়।

ক্রমে মেজ বউরানির সঙ্গে আমার পত্নীর ও তাঁর পুত্রকন্যার সঙ্গে আমার পুত্রকন্যার ঘনিষ্ঠতা হয়। কনিষ্ঠ কুমার একবার তাঁদের পরিবারের এক দুঃখকর কাহিনী নিয়ে পরামর্শ চাইতে আমার বাড়িতে আসেন। তখনকার হিন্দু আইনে এর কোনও প্রতিবিধান ছিল না।

একদিন এক হিন্দু যুবক আমার কুঠীতে এসে আমাকে একরাশ কমিউনিস্ট কেতাব

দেখায় ও কিনতে বলে। আমি কৌতূহলী হয়ে কয়েকখানা কিনি। সে আবার আসে। আমি আবার কিনি। স্টালিন সম্বন্ধে আমার ধারণা বদলে যায়। তিনি প্রত্যেকটি পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে কমরেডদের বুঝিয়ে দিতেন। কী কী কারণে কোন কোন সিদ্ধান্ত অপরিহার্য।

কিছু দিন পরে পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্টের পদে বীরভূম থেকে বদলি হয়ে এলেন মজাফফর আলি খান। তিনি ছিলেন পঞ্জাবি মুসলমান। সিউড়িতে তিনি প্রায়ই সফরে যেতেন। তখন তাঁর কুঠিতে তাঁর স্ত্রী থাকতেন একান্ত নিঃসঙ্গ। বাংলা একটু একটু বুঝতেন, উর্দু বুঝতেন না। ইংরেজি তো নয়ই। তিনি আমাদের প্রতিবেশিনী বলে আমার স্ত্রী গিয়ে তাঁর সঙ্গে কী জানি কেমন করে আলাপ করতেন। তাঁর প্রসবের সময় লীলা সাহায্য করেছিলেন। এ-সব কারণে পুলিশ সাহেব আমাকে খাতির করতেন। এক বার কথা প্রসঙ্গে তিনি আমাকে বলেন মুসলমানরা আলাদা একটা জাতি নয়, তারা যে-প্রদেশে বাস করে সেই প্রদেশের ভাষায় কথা বলে। কোথাও পঞ্জাবি, কোথাও তামিল, কোথাও উর্দু, কোথাও গুজরাটি, কোথাও মরাঠি, কোথাও বাংলা। তিনি পাকিস্তান চান না। জিন্না তাঁর মতে খাঁটি মুসলমান নন। এমন কথাও পরে তিনি আমাকে এক সময় বলেছিলেন তাঁর বংশ রাজপুত মুসলমান বংশ। তাঁদের হিন্দু শাখার সঙ্গে তাঁদের বিয়েশাদি হয়। বিবাহের পর বধূ পিতৃকুলের ধর্ম অনুসরণ করে, শ্বশুরকুলের নয়। তবে এটা শুধু তাঁদের বংশেরই নিয়ম, অন্যান্য বংশের নয়।

তিনি একজন প্রমোটেড পুলিশ অফিসর। তাঁর পূর্বজীবনের কথা একদিন তাঁর মুখে শুনেছিলুম। জেনারল চিয়াং কাইশেক যখন ভারত ভ্রমণে আসেন তখন তাঁর স্পেশাল ট্রেনে খানসামা সেজে আহার্য পরিবেশন করেছিলেন মিস্টার খান। আসলে তিনি পাহারা দিচ্ছিলেন চিয়াং কাইশেককে।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল সেকালের একজন ঝানু পুলিশ অফিসর পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ীর কথা। তিনিও একজন প্রমোটেড অফিসর। অবসর নিয়ে তিনি কুষ্টিয়ায় বাস করতেন। একদিন তিনি আমাকে তাঁর জীবনের কথা শোনান। পঞ্চম জর্জ যখন করোনেশন উপলক্ষে দিল্লির দরবার করেন তখন তাঁর আর্দালি সেজে লাহিড়ীমশায় হন তাঁর নজরদার। তাঁর নজরে পড়ে কুইন মেরির নয়নে ঈর্ষার কটাক্ষ যখন তাঁর লেডি ইন ওয়েটিং পঞ্চম জর্জের সন্নিকটে গিয়ে হাস্য বিনিময় করেন। আমি বলি, 'তা কী করে সম্ভব! ওঁরা যে আদর্শ দম্পতি।' তখন লাহিড়ী বলেন, 'ওঁরাও রক্তমাংসের মানুষ।'

সিভিল সার্জন ছিলেন ডাক্তার প্রভাতকুমার বিশ্বাস। কলকাতার লোক, তাঁর স্ত্রী পদ্মাপারে আসবেন না। কাজেই তিনি থাকতেন তাঁর বাসভবনে একাকী। মাঝে মাঝে সফরে যেতেন। এক বার আমি ওঁর ওখানে গিয়ে দেখি, উনি অসুস্থ। আমি ওঁর পাশে বসি, জানতে চাই কী অসুখ।

আগে বলে রাখি, ঢাকায় থাকতে আমি একবার ময়মনসিংহে বেড়াতে এসেছিলুম। অতিথি হয়েছিলুম আমার বন্ধু হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের। একদিন চায়ের আসরে আগমন করেছিলেন স্বয়ং জেলাশাসক সত্যেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, আই সি এস। লিখতেন এস ব্যানার্জি। উনি কথাপ্রসঙ্গে বলেন, 'আপনারা কি জানেন এখানে একটা গুপ্ত বৃন্দাবন আছে?' আমি কৌতূহলী হই। কিন্তু তিনি চেপে যান, বোধহয় হিরণ্ময়-পত্নীর ভয়ে।

ডাক্তার বিশ্বাস আমাকে জানালেন যে বেড়াতে বেড়াতে একদিন তিনি উপস্থিত হন

সেই গুপ্ত বৃন্দাবনে। নিরীক্ষণ করেন চাঁদিনী রাতে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের কেলি। বসনভূষণ বর্জিত। ডাক্তার বিশ্বাস এই দৃশ্য বিশ্বাস করতে না পেরে অজ্ঞান হয়ে যান। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি গুপ্ত বৃন্দাবনের ঠিকানা। তার উত্তরে তিনি বলেন, তা যদি আপনাকে বলি তা হলে সেটা হয়ে যাবে একটা প্রকাশ্য বৃন্দাবন। অবশেষে লুপ্ত বৃন্দাবন।

জেলা জজের কুঠি ছিল ব্রহ্মপুত্র নদের খুবই কাছে। দোতলার বারান্দা থেকে গারো পাহাড় দেখতে পাওয়া যেত। বাগানটিও ছিল মনোরম। একদিন আমার বাগানের মালী এসে আমার গৃহিণীকে বলে, 'মা, এই যে শুনছি, পাকিস্তান হবে। সেটা কি জিনিস?' তিনি উত্তর দেন, 'পাকিস্তান হবে মুসলমানদের আপন দেশ, যেমন সাহেবদের দেশ বিলেত।' এর পরে সে একদিন এসে বলে, 'মা, ওরা বলছে আমি যদি পাকিস্তানকে ভোট না দিই তা হলে আমার লাশকে ওরা কাঁধ দেবে না। আমি কী করব, মা?' তিনি তাকে বলতে পারেন না কী করা উচিত। তবে আমি বুঝতে পারলুম পাকিস্তানের পক্ষে এত ভোট পড়েছে কী ভাবে।

মুসলিম লীগ পার্টিশনের ইস্যুতে তার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী কৃষক প্রজা পার্টিকে হারিয়ে দিল। কৃষক প্রজা পার্টির নেতা ফজলুল হক সাহেবই লেবার পার্টির নেতা র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের মতো নিজের পার্টিকে ডুবিয়ে দিয়েছেন, নিজেও ডুবেছেন। মুসলিম লীগ তাঁকে নিজের নেতা বলে স্বীকার করেনি, যদিও তাঁকে দিয়েই দেশভাগের প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিয়েছে। কী জানি কেন স্যার নাজিমুদ্দিন নির্বাচনে দাঁড়াননি। তাই বাংলার আইনসভার মুসলিম লীগ পার্টির নেতা হয়েছেন হোসেন শাহিদ সুহরাবর্দী। তাঁকে প্রধানমন্ত্রী করেছেন স্যার ফ্রেডারিক বারোজ। তখনকার কালে মুখ্যমন্ত্রী না বলে প্রধানমন্ত্রী বলা হত। অক্সফোর্ডে সুহরাবর্দী ছিলে কিরণশঙ্কর রায়ের সহপাঠী। বাংলার কংগ্রেসের বিভাজনের পরে বাংলার আইনসভার বিরোধী পক্ষের নেতা। নতুন মন্ত্রীমণ্ডলে এক জনও বর্ণহিন্দু ছিলেন না, ছিলেন দুজন তপশিলি হিন্দু। মুসলিম লীগ মন্ত্রীমণ্ডল এমন কিছু করেননি যার দরুন বর্ণহিন্দুরা বিক্ষুব্ধ হতে পারেন। কিন্তু বোম্বাই থেকে জিন্না সাহেব নির্দেশ দিলেন যে ১৬ অগস্ট ডাইরেক্ট অ্যাকশন ঘোষণা করতে হবে। তখন ডাইরেক্ট অ্যাকশনের প্রস্তুতি চলতে লাগল। তা চালনার ভার ছিল প্রাদেশিক লীগের নেতা স্যার উপাধি ত্যাগী খাজা নাজিমুদ্দিনের উপর, প্রধানমন্ত্রী সুহরাবর্দীর উপর নয়। কিন্তু সুহরাবর্দীকে সে নির্দেশ মানতে হল। তিনি সে দিনটিকে ছুটির দিন বলে ঘোষণা করলেন। নতুন গভর্নরও না বুঝে সায় দিলেন। তিনি বিলেত থেকে সদ্য আগত, প্রশাসনেও অনভিজ্ঞ।

জিন্না সাহেব বড়লাটের উপর রাগ করে মুসলিম লীগকে দিয়ে ডাইরেক্ট অ্যাকশনের প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিয়েছিলেন। কারণ বড়লাট তাঁর কথা রাখেননি। মুসলিম লীগকে সরকার গঠন করতে ডাকেননি। কথা ছিল ক্যাবিনেট মিশন স্কিম যারা গ্রহণ করবে তাদের ডাকা হবে। কংগ্রেস গ্রহণ করল না, লীগ গ্রহণ করল। তা সত্ত্বেও লীগকে না ডেকে বড়লাট তাঁর মনোনীত আমলাদের দিয়ে শাসন-পরিষদ গঠন করলেন। কংগ্রেস ক্ষিপ্ত হল না, কিন্তু লীগ ক্ষিপ্ত হল। কার্যকালে দেখা গেল দাঙ্গা-হাঙ্গামার লক্ষ্য হয়েছে ইংরেজ নয়, কংগ্রেস। তার মানে হিন্দু। আর সে দাঙ্গা দমন করতে ব্যর্থ হয়েছেন সুহরাবর্দী সাহেব। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর কর্তব্য দাঙ্গাবাজ মুসলমানদের দমন করা। কিন্তু তা হলে ডাইরেক্ট অ্যাকশন করবে কারা? সেটা যে মাঠে মারা যাবে। এই দোটানায় পড়ে সুহরাবর্দী সাহেব হিন্দুদের কাছে হলেন অবিশ্বাসের পাত্র। তাঁরা চাইলেন তাঁর পদত্যাগ বা পদচ্যুতি। গভর্নর নারাজ।

তলে তলে চলতে লাগল নিত্যনতুন দাঙ্গা-হাঙ্গামার ষড়যন্ত্র। কোনও পক্ষই নির্দোষ নয়।

জিন্না সাহেবের ডাইরেক্ট অ্যাকশনের আরও জটিল কারণ ছিল। কংগ্রেস নেতারা তাঁর সঙ্গে কোয়ালিশন না করে প্রাদেশিক সরকার ছেড়ে জেলে চলে যান। তখন তিনি বুঝতে পারেন যে কোয়ালিশন করা কংগ্রেসের পলিসি নয়। তিনি পাকিস্তানের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। এতদিন তিনি আইনসম্মতভাবে আন্দোলন করছিলেন। এখন তিনি দেখলেন তাতে কোনও কাজ হয় না। তিনি তাই ডাইরেক্ট অ্যাকশনের সংকল্প নিলেন। বলেন, তাঁর হাতেও একটা পিস্তল আছে। তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে তাঁকে বাদ দিয়ে ব্রিটেন ও কংগ্রেস সমঝোতায় পৌঁছবে। সেটার বিরুদ্ধেই তাঁর অভিমান তথা অভিযান।

আমাদের ভাবনা হল যে কলকাতার প্রতিক্রিয়ায় যেন অন্য কোনওখানে দাঙ্গা না বাধে। ময়মনসিংহে আমি ভৈরববাজারে হাঙ্গামার আসামিদের একজনকেও জামিন দিইনি। সেটা ঘটেছিল কলকাতার দাঙ্গার পূর্বে। কলকাতার দাঙ্গার পর জেলাশাসক, পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট এঁরাও সতর্ক ছিলেন। দাঙ্গা বাধতে দেননি।

জিন্না সাহেবের ডাইরেক্ট অ্যাকশন কল্পিত হয়েছিল ইংরেজের বিরুদ্ধে। অথচ কলকাতার দাঙ্গায় ইংরেজদের গায়ে আঁচটি লাগে না। তাদের বাড়িঘর দোকান আপিস অক্ষত থাকে। কিন্তু ইংরেজরা উপলব্ধি করে যে মুসলিম লীগকে বাইরে রেখে কেন্দ্রীয় সরকার চালানো যাবে না। ওরা খেপে গেলে দেশের নানা জায়গায় এর পরে আসবে ইংরেজদের উপর আক্রমণ। তা বলে কংগ্রেসকে উপেক্ষা করা যায় না। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিস্টার অ্যাটলীর নির্দেশে বড়লাট লর্ড ওয়াভেল জবাহরলাল নেহরুকে আহ্বান করলেন শাসন-পরিষদ গঠন করতে। যেহেতু তিনি ভারতের বৃহত্তম দলের প্রধান নেতা। অবশ্য গান্ধীজি ব্যতীত। গান্ধীজি শাসন ক্ষমতা চান না। তিনি কংগ্রেসের সভ্যই নন।

আগে থেকেই মুসলিম লীগের জন্য শাসন-পরিষদে পাঁচটি আসন বরাদ্দ ছিল। নেহরু গেলেন জিন্নাকে আমন্ত্রণ করতে। জিন্না সাহেব বললেন আমন্ত্রণটা আসা উচিত সরাসরি বড়লাটের দিক থেকে। কংগ্রেসের দিক থেকে নয়। বড়লাটের শাসন-পরিষদ ব্রিটিশ পদ্ধতির ক্যাবিনেট নয়। নেহরু ব্রিটিশ পদ্ধতির প্রধানমন্ত্রী নন। ব্রিটিশ কেতা এ দেশে খাটে না।

জিন্নার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি ছিল। কিন্তু তাঁর যোগ না দেওয়ার ফল হল এই যে, নেহরু পেলেন বিদেশ দফতর, বল্লভভাই স্বরাষ্ট্র দফতর, বলদেও সিং প্রতিরক্ষা দফতর, একজন খ্রিস্টান অর্থনীতিবিদ অর্থ দফতর। পরে যখন বড়লাটের আহ্বানে মুসলিম লীগ শাসন-পরিষদে যোগ দিল তখন চারটি উচ্চতম পদের একটিও লীগ সদস্যরা পেতেন না যদি না ওই খ্রিস্টান ভদ্রলোক পদত্যাগ করতে রাজি হতেন। জিন্না নিজে যোগ দিতে এলেন না। তবে লিয়াকৎ আলি খান স্বরাষ্ট্র দফতর না পেয়ে অর্থ দফতর পেলেন। বল্লভভাই তাঁর স্বরাষ্ট্র দফতর ত্যাগ করতে রাজি হলেন না। তিনি তল্পিতল্পা গোটাতে আরম্ভ করলেন। বল্লভভাইকে বাদ দিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে কথাবার্তা চালানো যায় না। কংগ্রেস হাইকম্যান্ডের তিনি কর্তা। অগত্যা বড়লাট লিয়াকৎ আলি খানকে অর্থ দফতর দেন। সেটাও কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। তার জন্য বিলেত থেকে বিশেষজ্ঞ আনানো হত। কিন্তু লিয়াকৎ মনে করলেন তাঁকে খাটো করা হচ্ছে তথা মুসলিম লীগকেও। অর্থ দফতর তিনি নিলেন ঠিকই, কিন্তু পদে পদে কংগ্রেসিদের বিরোধিতা করতে লাগলেন।

তিন

ইতিপূর্বে জবাহরলাল নেহরু মুসলিম লীগকে সঙ্গে না নিয়ে অন্য কয়েকজন লীগ বহির্ভূত মুসলমানকে সঙ্গে নিয়ে সরকার গঠনের পর সুদূর নোয়াখালি জেলায় বাধল হিন্দুদের উপর মুসলমানদের হামলা। বহু হিন্দু মারা গেল, বহু হিন্দু নারীকে অপহরণ করা হল, আরও অনেক হিন্দুকে মুসলমান করা হল, বহু হিন্দুর বাড়ি লুটপাট করা হল। ঘটনার চেয়ে রটনা হল ঢের বেশি। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারের, কেন্দ্রীয় সরকারের নয়। কংগ্রেস পড়ে গেল বেকায়দায়।

তখন মহাত্মা গান্ধী ছুটে গেলেন নোয়াখালিতে তাঁর নিজস্ব উপায়ে শান্তি স্থাপন করতে। তাঁর সঙ্গে গেলেন গান্ধীপন্থী কর্মীরা। তাঁরা কাউকে শাস্তি দিতে পারেন না। কিন্তু শাস্তি দেওয়ার জন্য হিন্দুজনমত উত্তেজিত হয়ে রয়েছিল।

আমি চিফ সেক্রেটারিকে একখানি চিঠি লিখি। আমি চাই লন্ডনের New Statesman পত্রিকায় নোয়াখালির ব্যাপার নিয়ে লিখতে। তিনি উত্তর দেন, 'You have lost your balance' । অনুমতি দেওয়া হবে না। আমি তখন আমার সার্ভিসের কয়েক জন ইউরোপীয় অফিসরকে ব্যক্তিগত চিঠি দিই। তাতে বলি, এই জমানায় কোনও হিন্দু নারী নিরাপদ নয়। আপনারা যখন তাদের রক্ষা করতে পারছেন না তখন আমরাই অস্ত্র ধারণ করতে চাই। এর উত্তরে একজন হাইকোর্ট জজ লিখলেন, অসম্মানিত নারীর সম্মান একদিন ফিরে আসতে পারে, কিন্তু এক জন মানুষের জীবনদীপ নিবে গেলে সে দীপ আর জ্বলবে না। আমি আমার সার্ভিসের হিন্দু অফিসরদেরও চিঠি লিখি। তাতে বলি নোয়াখালিতে মিলিটারি পাঠানো উচিত। তার উত্তরে একজন জেলাশাসক লেখেন, রোগের চেয়ে দাওয়াটাই মারাত্মক। মিলিটারিকে বিশ্বাস করা যায় না। আমি সার্ভিসের মুসলিম অফিসরদের চিঠি লিখি। তার উত্তরে নোয়াখালির জেলাশাসক মিস্টার জামান আমাকে লেখেন, আমার নামটাই আরবি, কিন্তু আমি কারও চেয়ে কম বাঙালি নই। আমি আপনাকে পরিসংখ্যান দিচ্ছি। তাতে দেখবেন যে যা ঘটেছে তার চেয়ে অনেক বেশি রটেছে। আমাদের হলদে খবরের কাগজগুলোতে যা প্রকাশিত হয়েছে তা হয় অসত্য নয় অতিরঞ্জিত। জামান ছিলেন আমার বন্ধু হুমায়ুন কবিরের ভাগ্নে। হুমায়ুনের মতোই অসাম্প্রদায়িক। আমি তাঁকে অবিশ্বাস করতে পারিনে।

বিলেত থেকে আমার পুরনো বস্ মার্টিন সাহেব লিখলেন, 'আমি তো গোলাম সারওয়ারকে জেলে পুরে এসেছিলুম। ওকে ছেড়ে দিল কে?' আমিও পরে জানতে পেলুম যে নোয়াখালির ব্যাপারটা সুহরাবর্দীর নয়, গোলাম সারওয়ারের চক্রান্ত। ওই লোকটাকে মুসলিম লীগের টিকিট দেননি সুহরাবর্দী। তাই সে সুহরাবর্দীকে অপদস্থ করতে চেয়েছিল।

নোয়াখালির হিন্দু নারীদের অবস্থা নিয়ে যখন আমি উদ্বিগ্ন তখন একদিন গভর্নরের গার্ডেন পার্টিতে মুসলিম লীগের নেতা গিয়াসউদ্দিন পাঠানের সঙ্গে আলাপ হয়। তিনি বলেন, 'এত ভাবনার কী আছে? আমরা যদি তোমাদের মেয়েদের ধরে নিয়ে এসে থাকি তা হলে তোমরাও আমাদের মেয়েদের ধরে নিয়ে যাও না কেন!' আমি হাস্য সংবরণ করতে পারিনে। বলি, 'সে বিষয়ে মুসলিম নারীদেরও কিছু আপত্তি থাকতে পারে।' কথা প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, 'আমি আপনার মতোই নিরামিষাশী। সেই জন্যে দিল্লিতে মুসলিম লীগের আহ্বানে যেতে পারছিনে। গেলে নিজের রাঁধুনি নিয়ে যেতে হবে। ওঁরা সেটা পছন্দ

করবেন না।'

নোয়াখালি সম্বন্ধে পরে জানা গেল সে জেলায় হিন্দু শতকরা দশ জন। অথচ তাদের হাতেই শতকরা নব্বই ভাগ জমি। পূর্ববঙ্গের অন্যান্য কয়েকটা জেলাতেও মোটামুটি একই রকম অর্থনৈতিক বৈষম্য। ভূমিহীনরা যদি মুসলমান না হয়ে কমিউনিস্ট হত তা হলেও লুটতরাজ খুনজখম করত। জোর করে শ্রেণীচ্যুত করত। যেটা করত না সেটা হিন্দু নারীহরণ। সেইটেই আমাকে বেশি আঘাত করেছিল। নারী মুসলমান হলেও আমি সমান আহত হতুম।

আমার ভারসাম্য সত্যিই নষ্ট হয়েছিল। তা না হলে তিন মাস কাল ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করতে গেলুম কেন? কাজী আবদুল ওদুদকে এ কথা চিঠি লিখে জানাতেই তিনি পরিহাস করে লেখেন, 'ব্রহ্মচর্যই দেখছি অগতির গতি।' এর মধ্যে একদিন অতুল্য ঘোষের কাছ থেকে পেলুম 'পাকিস্তান ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা' নামক পুস্তিকা। তাতে তিনি বলেছেন যে এ সমস্যার একমাত্র সমাধান দ্বিপাক্ষিক পার্টিশন। মুসলিম মাইনরিটির খাতিরে ভারত-ভাগ ও হিন্দু মাইনরিটির খাতিরে বাংলা-ভাগ ও পঞ্জাব-ভাগ। আমি তাঁকে উত্তরে লিখি, 'এটা সম্পূর্ণ হাস্যকর।' এক সময় আমি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করতুম যে আমেরিকার মতো গৃহযুদ্ধই শ্রেয়। গৃহযুদ্ধে কংগ্রেসের জয় সুনিশ্চিত। কিন্তু যুদ্ধ একবার শুরু হলে তা কংগ্রেস বনাম মুসলিম লীগ না হয়ে হিন্দুরাজ বনাম মুসলিমরাজের রূপ নিত। যেন কৌরব বনাম পাণ্ডব। নতুন এক কুরুক্ষেত্র। তেমন যুদ্ধ আমি চাইনে।

কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল ততই হিন্দু জনমত দ্বিপাক্ষিক পার্টিশনের দিকেই ঝুঁকল। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বললেন ভারত-ভাগ হোক আর নাই হোক, বাংলা-ভাগ চাইই চাই। আমার এক ডাক্তার-বন্ধু আমাকে লিখলেন, বুঝেছি আপনি কেন বাংলা-ভাগের বিরোধী। আপনাকে ময়মনসিংহের জেলা জজ করেছে মুসলিম লীগ। তাই আপনি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। আমি তাঁকে জানালুম যে আমি যখন ময়মনসিংহে বদলি হই তখন গভর্নরের শাসন চলছিল।

ইতিমধ্যে ঘটে গিয়েছিল বিহারের হাঙ্গামা। সেখানে বহু মুসলমান নিহত ও মুসলিম নারী লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ উচ্চবংশীয়া। বহু মুসলমান নিহত হয়েছিলেন। আমি বিহারি মুসলিম বন্ধুদের কাছে চিঠি লিখে দুঃখ প্রকাশ করি। পাটনা কলেজে মহামেডান হস্টেলে আমরা কজন হিন্দু ছাত্র থাকবার অনুমতি পেয়েছিলুম। সেই সূত্রে তাঁদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল।

বিহারের ঘটনার পর জিন্না সাহেব গোঁ ধরলেন যে লোকবিনিময় করতে হবে। আর সত্যি সত্যি কয়েক হাজার বিহারি মুসলমান এসে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিলেন। তখন পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা উত্ত্যক্ত হয়ে তাঁদের তাড়াবার জন্য বাংলা-ভাগকে মনে করলেন একমাত্র সমাধান। তার মানে ওই বিহারি মুসলমানদের চালান করা হবে পূর্ববঙ্গে। পার্টিশনের পরে হলও তাই। তাঁরা পূর্ববঙ্গে গিয়ে সেখানকার হিন্দুদের তাড়ালেন।

নোয়াখালিতে যাওয়ার সময় গান্ধীজি বলেছিলেন, 'The Battle for India is going to be fought in Noakhali.' এর থেকে সাধারণের ধারণা জন্মেছিল তিনি নতুন এক সংগ্রাম শুরু করতে যাচ্ছেন। সেটা ঠিক নয়। তিনি চেয়েছিলেন অন্তরের পরিবর্তন।

গান্ধী না চাইলেও অর্ন্তবর্তী ভারত সরকার নোয়াখালিতে সৈন্য পাঠিয়েছিল। তার

থেকে স্থানীয় মুসলমানদের ধারণা জন্মায় যে তিনিই সৈন্যদের ডেকে এনেছেন। ফলে অন্তরের পরিবর্তন না হয়ে যেটা হয় সেটা আরও বেশি হিন্দু বিরোধিতা। আর হিন্দুরাও হয়ে পড়ে গান্ধী নির্ভর নয়, সৈন্য নির্ভর। তার ফলে মুসলমানরাও গান্ধীর উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে।

নোয়াখালিতে গান্ধীজি শান্তি স্থাপনে কতকটা সফল হয়েছেন। এমন সময় ঘটে বিহারের ঘটনা। তখন মুসলিম নেতারা জেদ ধরেন যে তাঁকে বিহারে যেতে হবে। যানও তিনি বিহারে। সৈন্যদলও ফিরে যায়। ফলে নোয়াখালির হিন্দুরা আবার অসহায় বোধ করেন।

কোথায় সেই Battle in Noakhali যেটা the Battle for India? এই হতাশার থেকে আসে বঙ্গভঙ্গের প্রেরণা। যেটা গান্ধীজির কাছে সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত ও অপ্রত্যাশিত। কিন্তু গান্ধীপন্থীদের অনেকের অভিপ্রেত। লোকে উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপায়। গান্ধীজিকেই তাঁর ভক্তদের কার্যক্রমের জন্য দায়ী করে। বঙ্গভঙ্গের পরিণামের জন্যেও।

বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছিল, যেটা সবচেয়ে জরুরি সেটা মুসলিম লীগের সঙ্গে একটা political settlement. মহাত্মা গান্ধী ভেবেছিলেন সেটা সবুর করতে পারে। আগে তো ব্রিটিশ ভারত থেকে অপসরণ করুক। কিন্তু কংগ্রেস নেতারা কেন্দ্রীয় সরকারে মুসলিম লীগ সদস্যদের ব্যবহারে তিক্তবিরক্ত হয়েছিলেন। সেটা যেন একটা ছুঁচো গেলার মতো অবস্থা। মুসলিম লীগকে বাদ দেওয়া যায় না, আবার সামলানোও যায় না। গান্ধীজি কংগ্রেসকে পরামর্শ দিলেন, জিন্না সাহেবকে সরকার গঠনের ভার দিয়ে তোমরা সরে পড়ো। তার মানে ব্রিটিশ অপসরণের পূর্বে কংগ্রেস অপসরণ।

ইতিমধ্যে লর্ড লুইস মাউন্টব্যাটেন এসেছিলেন বড়লাট হয়ে। তিনি তখনও স্বনামে লর্ড হননি, সৌজন্যসূচক লর্ড। পরে উত্তরাধিকার সূত্রে লর্ড মাউন্টব্যাটেন হন। তিনি কিছুতেই কংগ্রেসিদের ছাড়বেন না, negotiation চালাতে হলে তাঁদের কাছে রাখাই চাই। কংগ্রেসের নেতারা শেষ পর্যন্ত মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনা অনুসারে ভারত-ভাগ, বাংলা-ভাগ ও পঞ্জাব-ভাগ একই সঙ্গে গ্রহণ করলেন। কিন্তু পরিত্যাগ করলেন অসমের সিলেট জেলা আর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। এই রূপ পরোক্ষ ভাবে কংগ্রেসের সঙ্গে লীগের একটা political settlement হয়ে গেল। তার থেকে এল ব্রিটেনের সঙ্গে আর একটা political settlement. ব্রিটেন দুই উত্তরাধিকারী রাষ্ট্রের হাতে ক্ষমতা সমর্পণ করে বিদায় নিল।

ইতিমধ্যে একটা চেষ্টা চলেছিল বাংলাকে অবিভক্ত রাখার। মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন,'বাঙালি হিন্দুরা কি বুঝতে পারছে না যে বাংলা ভাগ চেয়ে কী বিপত্তি ডেকে আনছে? শরৎ কী করছেন?' শরৎচন্দ্র বসু ও কিরণশঙ্কর রায়, আবুল হাশিম প্রমুখ মুসলিম লীগের নেতাদের সঙ্গে ঘরোয়া আলোচনা চালান। মুসলিম লীগ যদি separate electorate দাবি ছেড়ে দেয় তবে তাঁরা separate province-এর দাবি ছেড়ে দেবেন। আর বাংলাদেশ অবিভক্ত থাকবে। মুসলিম লীগ তাঁদের প্রস্তাবে নারাজ হয়। সুতরাং তাঁরা ব্যর্থ হন। গান্ধীজি আর কী করতে পারেন।

সেই সময় একদিন আমি আমার অধীনস্থ এক সাবজজের বাড়িতে দেখা করতে যাই। লোকটি গোবেচারি নিরীহ হিন্দু। পদবি উকিল ব্যানার্জি। তিনি বলেন, 'আমাদের সেই সোনার চাঁদ ছেলেরা গেল কোথায়? তারা কি গান্ধীকে গুলি করে মারতে পারে না?' আমি

চমকে উঠি। বলি, 'গান্ধীর কী অপরাধ?' তিনি বলেন, 'গান্ধী কেন বাংলা ভাগের বিরোধিতা করছেন? বাংলা ভাগ না হলে কি বাঙালি হিন্দু বাঁচবে?' এর বছরখানেক আগে রেলপথে ভ্রমণের সময় একটি স্টেশনে এক মুসলিম বেতার-শিল্পীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। সেই যুবকটি অত্যন্ত করুণ স্বরে আমাকে বলেছিলেন, 'পাকিস্তান না হলে আমরা বাঁচব না।' একদিকে হিন্দু সাব জজ আর অন্যদিকে মুসলমান বেতার-শিল্পী—এঁরা দু জনেই এঁদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করছিলেন। সে ভবিষ্যৎ নির্ভর করছিল রাজনৈতিক বন্দোবস্তের উপর। এমন এক বন্দোবস্ত যা উভয় পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। সেই কাজটি করে দিয়ে গেলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন।

তার মানে দ্বিতীয়বার বঙ্গভঙ্গ। প্রথমবার বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন নিয়ে যে স্বদেশি আন্দোলন তা সন্ত্রাসবাদের দিকে মোড় নেয়। সন্ত্রাসবাদীদের নায়ক বারীন্দ্রকুমার ঘোষ আর উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বারো বছর আন্দামানে কারাবন্দি হয়ে বাস করেন। প্রথমবার বঙ্গ ভঙ্গ রদ করার জন্য যাঁদের এত দুর্ভোগ তাঁরাই কিনা লেখনীমুখে চাইলেন দ্বিতীয়বার বঙ্গ ভঙ্গ। গান্ধীজি চান না বলে তাঁর উপর উষ্মা। সেই সাবজজের মতো মনোভাব।

আমার মনের অবস্থা তখন একজন পরাজিত ভারতীয় তথা বঙ্গীয় জাতীয়তাবাদীর। আমার দেড় বছরের মেয়ে একদিন নাড়াচাড়া করতে করতে আমার জবাকুসুম তেলের শিশিটা ভেঙে ফেলে। আমার স্নান করায় বাধা পড়ে। আমি ওর উপর রাগ করে একটা ছড়া লিখে ফেলি। 'তেলের শিশি ভাঙল বলে খুকুর পরে রাগ করো তোমরা যেসব বুড়ো খোকা ভারত ভেঙে ভাগ করো! তার বেলা?' সেই ছড়া এখন বাংলার এপার ওপার দুই পারেই হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই সমান জনপ্রিয়।

এর আগে জানুয়ারি মাসে একদিন বাংলার গভর্নর বারোজ সাহেব আমাকে ও আমার স্ত্রীকে সার্কিট হাউসে ডিনারে ডাকেন। আর কেউ ছিলেন না। লীলা রায় জিজ্ঞাসা করেন,'ইয়োর এক্সেলেন্সি থাকতে কলকাতায় দাঙ্গা বাধল কী করে?' বারোজ সাহেব রাগত ভাবে উত্তর দেন, 'হিন্দু-মুসলমান যদি পরস্পরের সঙ্গে লড়তে চায় তো লড়ুক। আমরা কেন রিং ধরে থাকব? আমরা যাচ্ছি। আমরা গেলেই আমাদের বাণিজ্যের উন্নতি হবে। যেমন হয়েছে আয়ার্ল্যান্ডে।'

এই আয়ার্ল্যান্ডের দৃষ্টান্ত থেকে মনে পড়ল যে ইংরেজরা প্রথম মহাযুদ্ধের পরে আয়ার্ল্যান্ডকে হোমরুল দিতে প্রতিশ্রুত ছিল। কিন্তু যুদ্ধের মাঝখানে প্রটেস্টান্ট নেতারা দাবি করলেন যে আয়ার্ল্যান্ডকে হোমরুল দিলে সেদেশের প্রটেস্টান্টদেরও স্বতন্ত্র আলস্টার দিতে হবে। নইলে তারা লড়কে লেবে আলস্টার। আয়ার্ল্যান্ডের অধিকাংশ লোকই ক্যাথলিক। সুতরাং হোমরুল হলে ক্যাথলিকদেরই প্রাধান্য হত। আইরিশ স্বাধীনতা সংগ্রামে ক্যাথলিক প্রটেস্টান্ট সমানে কারাবরণ ও মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে দেখা গেল ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে প্রটেস্টান্টদের যুদ্ধং দেহি ভাব। ইংরেজরা আইরিশ ক্যাথলিকদের বোঝান যে গৃহযুদ্ধের প্রস্তুতি চলেছে। সেটা এড়াতে গেলে পার্টিশনই শ্রেয়। তা হলে ইংরেজরা আরও বেশি ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। কলিন্স, গ্রিফিথস প্রমুখ নেতারা অধিকতর ক্ষমতার খাতিরেই তথা গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ার আশ্বাসে পার্টিশনে রাজি হয়ে যান। কিন্তু ডি ভ্যালেরা ও তাঁর অনুগামীগণ এই দেশভাগে সায় দেন না। ক্যাথলিক প্রটেস্টান্টদের ঝগড়া আজও মেটেনি। তেমনি ভারত পাকিস্তানের কলহ।

লাটসাহেবের সঙ্গে আমাদের নৈশভোজনের কিছু দিন পরেই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিস্টার অ্যাটলী ঘোষণা করেন যে ইংরেজরা ১৯৪৮-এর জুন মাসের মধ্যেই ভারত থেকে অপসরণ করবে। কোনও সেটেলমেন্ট হোক আর না-ই হোক। ইতিমধ্যে ইউরোপীয় আই সি এস মহলেও তল্পিতল্পা গোটানো শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা পেনশন ও ক্ষতিপূরণের আশ্বাস পেয়েছিলেন।

যত দূর মনে পড়ছে, সাতচল্লিশ সালের জানুয়ারি মাসেই একদিন শুনলুম দিনটার নাম ভিয়েতনাম ডে। ভিয়েতনাম যে কোথায় তা-ই ভাল করে জানতুম না। আদালতে বসে কাজ করছি। এমন সময় এক জন লোক এসে বলল যে আমার গাড়ি ভাঙচুর হচ্ছে। গাড়িবারান্দায় গিয়ে দেখি একদল ছোকরা আমার গাড়ি ঘিরে আছে। তাদের এক জন কি দু জন গাড়ির ড্যাশবোর্ড থেকে হাতুড়ি ঠুকে ব্রিটিশ পতাকা ইউনিয়ন জ্যাক খুলে নিচ্ছে। গাড়িটা ছিল স্ট্যান্ডার্ড কার। ইংরেজরা তাদের পতাকাকেও স্ট্যান্ডার্ড বলে। গাড়ির কোম্পানিটার চিহ্ন পতাকা আর সেই নামেই কোম্পানির নামকরণ। আমি সবিনয় নিবেদন করি, 'আমার গাড়ি ভেঙে তোমাদের কী লাভ হচ্ছে? তোমরা যদি ব্রিটিশ পতাকা সরাতেই চাও তা হলে কালেক্টরের অফিসে যাও। সেই বিল্ডিংয়ের উপরে বিরাট একটা ইউনিয়ন জ্যাক সগর্বে উড়ছে। সাহস থাকে তো সেটাকে নামাও।'

সত্যি সত্যি ওরা আমার গাড়ি ছেড়ে কালেক্টরের অফিসের দিকে ছুটল। কিছুক্ষণ পরে শুনতে পেলুম গুলির আওয়াজ। বারান্দায় গিয়ে দেখলুম, গিয়াস-উদ্দিন পাঠান হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছেন। চেঁচিয়ে বলছেন, 'গুলি চলছে। ছেলেগুলো মারা গেল গো।'

আমি আদালত কক্ষে ফিরে যাব কিনা ভাবছি। এমন সময় একজন পিয়ন এসে বলল, 'স্যার, ওরা আপনার রেকর্ড রুম পোড়াতে যাচ্ছে।' জজের রেকর্ড রুমটা ছিল বেশ কিছু দূরে। সেখানে যেতে যেতে শুনলুম ওরা রেজিস্ট্রি অফিস পুড়িয়েছে। পথের মাঝখানে দেখা হল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ব্যাসস্টিন সাহেবের ও পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট মজফফর আলি খান সাহেবের সঙ্গে। ওঁরা সদলবলে চলেছেন আগুন নেভাবার সরঞ্জাম নিয়ে।

আমি আদালতে ফিরে আসি। যারা আমার গাড়ি ভাঙতে এসেছিল তাদের মধ্যে মুসলমানও ছিল। আর যারা গুলিতে জখম হয়েছিল তাদের মধ্যে একটি হিন্দু মেয়েও ছিল। কেউ মারা যায়নি। কিন্তু অনেকদিন পরে শুনলুম মেয়েটি পঙ্গু হয়ে গিয়েছে। চলে আসে কলকাতায়।

হিন্দু-মুসলমানের যে-একতা আমার গাড়ি ভাঙচুরের সময় দেখেছিলুম সেটা কিন্তু দেশ ভাঙচুরের সময় দেখা গেল না। ইংরেজরা ১৯৪৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত সবুর না করে ১৯৪৭-এর অগস্ট মাসের মাঝখানে ভারত ছেড়ে চলে গেল। এক মাসের মধ্যেই পঞ্জাবে চার লক্ষ হিন্দু, মুসলমান ও শিখ পরস্পরের হাতে নিহত, নব্বুই লক্ষ হিন্দু, মুসলমান ও শিখ শরণার্থী। একই রকম ব্যাপার বাংলাদেশে ঘটতে পারত। ঘটেনি তার কারণ মহাত্মা গান্ধীর কলকাতায় উপস্থিতি ও বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের অন্তর্নিহিত সম্প্রীতি।

আমার আদালতে একদিন এক হিন্দু সরকারি কর্মচারী সাক্ষী দিতে এসেছিলেন। মামলা শেষ হলে আমি তাঁকে আমার চেম্বারে এনে জিজ্ঞেস করি, 'আপনার গ্রামে ক ঘর হিন্দু আর ক ঘর মুসলমান।' তিনি উত্তর দেন, 'এক ঘর হিন্দু, বাকি সব মুসলমান।' তখন আমি জানতে চাই তিনি কাদের ভরসায় পরিবারকে একা রেখে ট্যুর করে বেড়ান। তিনি

বিস্মিত হয়ে বলেন, 'কেন? মুসলমানদের ভরসায়। তারা তো কোনওদিন কোনও অবিশ্বাসের কাজ করেনি।' সেই নোয়াখালির ঘটনার পরেও গ্রামাঞ্চলে হিন্দু-মুসলমানের সদ্‌ভাব ছিল।

একদিন একজন হিন্দু পণ্ডিত আমাকে একখানি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ দিয়ে যান। তার জন্য আমি তাঁকে কিছু টাকা দিই। সেটা ছিল 'মহুয়া' কাহিনীর নাট্যরূপ। নাটকের অভিনয় হয়েছিল গত শতাব্দীর শেষ দিকে। নাটকে যারা অংশ নিয়েছিল তাদের মধ্যে হিন্দুও ছিল, মুসলমানও ছিল। সেটা ময়মনসিংহ গীতিকা সংকলন প্রকাশের পূর্বে। গ্রামাঞ্চলে হিন্দু-মুসলমানে মিলেমিশে পরস্পরের আনন্দ বিধান করেছে। তা হলে এমন কী ঘটল যে পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা ঘরবাড়ি ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থী হবে ও পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানেরা পূর্ববঙ্গে? এর উত্তর, হিন্দুদের মনে মুসলিম আমল ফিরে আসার ভয় এবং মুসলমানদের মনে মুসলিম হোমল্যান্ড লাভ করার মোহ।

মুসলিম হোমল্যান্ডের দিকে প্রথম পদক্ষেপ ১৯০৫ সালে যখন পূর্ববঙ্গ ও আসাম সৃষ্টি হয়। তার পরের পদক্ষেপ মুসলিম লীগ পত্তন ঢাকার নবাব ভবন আহসান মঞ্জিলে। তার পরের পদক্ষেপ মুসলিম লীগের আবেদনে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন কেন্দ্র প্রবর্তনে। মাঝখানে যুক্তবঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হল বটে কিন্তু স্বতন্ত্র নির্বাচন সূত্রে মুসলিম লীগই তার মসনদে বসল। সে বার বঙ্গভঙ্গ রদের আন্দোলন হয়েছিল, এ বার হল বঙ্গভঙ্গ হাসিলের আন্দোলন। দুই বারেই হিন্দুদের দ্বারা। সে বারের বঙ্গভঙ্গের সময় মুসলমানরা সকলেই স্বীকার করতেন যে তাঁরা ইন্ডিয়ান। হিন্দুদের সঙ্গে তাঁদের শরিকি বিবাদ, ইন্ডিয়ার সঙ্গে নয়। কিন্তু চল্লিশ বছরের মধ্যে মুসলিম মানসে একটা sea change বা আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়।

হিন্দু আর ইন্ডিয়ান প্রাচীন যুগে সমার্থক ছিল। হিন্দু আর্ট, ইন্ডিয়ান আর্ট। হিন্দু মিউজিক, ইন্ডিয়ান মিউজিক। কিন্তু কুতবমিনার ও তাজমহলের পর থেকে আর সেকথা বলা যায় না। অথবা তানসেনের পর থেকে। সেতার, সরোদ, এসরাজ, পাখোয়াজ, তবলা কোনটাই বা হিন্দু? মন্দিরের খিলানগুলো ভারতীয় নয়। দক্ষিণ ভারতে তার দৃষ্টান্ত নেই। সাতশো বছর আগে একটা অর্থান্তর ঘটে যায়। সেটাও একটা sea change. উদারতর অর্থে আমরা আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রের নাম রাখি ইন্ডিয়া অর্থাৎ ভারত। অথচ হিন্দু রাষ্ট্র নয়, ধর্মনিরপেক্ষ।

লর্ড পেথিক লরেন্স জিজ্ঞাসা করেন, 'মিস্টার জিন্না, আপনি কি একজন ইন্ডিয়ান নন?' জিন্না সাহেব তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন,'না, আমি একজন ইন্ডিয়ান নই।' আশ্চর্যের ব্যাপার পাঁচ কোটি মুসলমান তাঁর সঙ্গে একমত হয়ে, হিন্দু সমাজের বাইরে তো ছিলই, ভারতীয় রাষ্ট্রেরও বাইরে থেকে গেল বা চলে গেল। চার কোটি মুসলমান ভারতীয় রাষ্ট্রকেই আপনার করে নিল।

নতুন বিভাজন হল ইন্ডিয়ান মুসলিম ও পাকিস্তানি মুসলিম। এটা হিন্দুদের অনেকের পছন্দ হয়নি। তাঁদের মতে যারা হিন্দু হয়ে জন্মগ্রহণ করেনি তারা ভারতমাতার সন্তান নয়। তারা বিধর্মী, তারা বিজাতি। অতএব বিদেশি, অতএব এলিয়েন। তারা যদি আপনা থেকে সরে না যায় তবে তাদের মেরে তাড়াতে হবে:

হিন্দু মানসিকতার এটাও একটা sea change. ভারতের জাতীয় সংগ্রাম যত দিন

চলছিল তত দিন হিন্দু-মুসলমান ছিল ভাই-ভাই। হিন্দু মুসলমানকে ডিভাইড করেছে বলে ইংরেজদের উপর সে কী রাগ! মুসলমানরা যেন কাজের বেলায় কাজি, কাজ ফুরোলেই পাজি। মুসলমানরা বিধর্মী, অতএব বিজাতি, অতএব বিদেশি, অতএব এলিয়েন। অর্থাৎ সবাই ওরা পাকিস্তানি।

রবীন্দ্রনাথ ন্যাশনালিজম নামক তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন না। তিনি ওই নামে একখানা বই লিখে যুদ্ধের জন্য ওই তত্ত্বকে দায়ী করেছিলেন। ভারত পাকিস্তান দুই নেশন হলে যুদ্ধ বাধার সম্ভাবনা অনুভব করে গান্ধীজিও দুই নেশন সৃষ্টির বিরোধী ছিলেন। লর্ড পেথিক লরেন্সের মতো ইংরেজরাও ছিলেন পার্টিশন বিরোধী। ক্যাবিনেট মিশন স্কিমে পার্টিশনের পরিবর্তে তিনটি গ্রুপ ও তাদের উপর একটি তিন সদস্যের কেন্দ্রীয় ফেডারল সরকার গঠনের প্রস্তাব ছিল। দুনিয়ার কোথাও তেমন কোনও সংবিধান নেই। কংগ্রেস নেতারা সেটা প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে ভারতীয় ঐককেন্দ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য ইংরেজদের আর কোনও দায়িত্ব থাকে না।

যাঁরা সেটা খারিজ করেন তাঁরা এমন কোনও বিকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারলেন না যেটা ন কোটি মুসলমান মাথা পেতে মেনে নেবে। তাঁদের মধ্যে একটা ন্যাশনালিজমের অভীপ্সা জেগেছিল। সেটা মুসলিম ন্যাশনালিজম। তবে তাঁদের মধ্যে ভিন্ন মতের মানুষও ছিলেন। তাঁরা দ্বিজাতিতত্ত্ব স্বীকার করতেন না। ধর্ম দুই, সমাজ দুই, কিন্তু ভাষা এক, সংস্কৃতি এক, অর্থনীতি এক, অতএব নেশন এক। এঁরা কোণঠাসা হন।

অফিসর শ্রেণীর মধ্যেও দ্বিজাতি-তত্ত্বের পক্ষে ও বিপক্ষে দুই মতাবলম্বী মুসলমান ছিলেন। তা যদি না হত তবে অপশন দেওয়ার কথা উঠত না। সব মুসলমানকেই পাকিস্তানের কোটায় ফেলা হত। অপশনের সুযোগ দেওয়ার ফলে দেখা গেল ময়মনসিংহের অ্যাডিশনাল পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট মাসুদ অপশন জানালেন ইন্ডিয়ার পক্ষে। যদিও তাঁর বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। নোয়াখালির জেলাশাসক জামানও একই অপশন জানালেন। বম্বের তৈয়বজি পরিবার দু ভাগ হয়ে গেল। যুক্ত প্রদেশের বহু খানদানি পরিবারও দু ভাগ।

আমার এক পশ্চিমা মুসলিম সহযোগীকে বলেছিলুম, তোমরা ছয়-শো বছর ধরে ভারত শাসন করেছ। তোমাদের রাজনৈতিক বিজ্ঞতা আমাদের চেয়ে বেশি। তোমরা কি বুঝতে পারছ না যে পাকিস্তান হলে তোমাদেরই ক্ষতি হবে সবচেয়ে বেশি? তা না হলে কেউ দিল্লি, আগ্রা, লখনউ, এলাহাবাদ, পাটনা, আহমেদাবাদ, আজমীর, আলিগড় ছেড়ে যায়? সারা ভারতের তিরিশ শতাংশ চাকরি পাকিস্তানের শতকরা একশো শতাংশের চেয়ে বেশি।'

তিনি বলেন, 'পাকিস্তানে আমরাই হব সর্বেসর্বা। সেটাই বিজ্ঞতা।'

অথচ আমার বাঙালি মুসলিম সহযোগী মাসুদ অত্যন্ত দুঃখিত। তিনি বলেন, 'তোমরা দেশকে ভালবাসতে, কিন্তু দেশের মানুষকে ভালবাসতে না। তাই দেশ ভাগ হল।'

আমার অপর এক মুসলিম সহযোগী সাদুল্লাহ বলেন, 'সব হিন্দু সব মুসলমানের শত্রু—এটা কি কখনও সত্যি হতে পারে?' তবে তিনি পাকিস্তানের পক্ষে অপশন দেন। যেমন মাসুদ ভারতের পক্ষে। কয়েকজন হিন্দু অফিসরও তো পাকিস্তানের পক্ষে অপশন দেন। তাঁরাও বিশ্বাস করতেন না যে সব মুসলমান সব হিন্দুর শত্রু।

নীট ফল—বহু পরিবার বিভক্ত হল। কিন্তু ধর্মানুসারে নয়, পছন্দ অনুসারে। কার

কোন দেশ পছন্দ।

হিন্দুদের মধ্যে কেউ কেউ পাকিস্তানের পক্ষে অপশন জানালেন। তাঁরা জিন্না সাহেবের আশ্বাসবাণী বিশ্বাস করতেন যে এখন থেকে রাষ্ট্রের চক্ষে সবাই পাকিস্তানি, যদিও ধর্মের চক্ষে কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান। পাকিস্তানি পতাকার দু ভাগ সবুজ ও এক ভাগ সাদা রাখা হয়। এই আশ্বাসবাণী গোড়ার দিকে কার্যকর হয়েছিল। নতুবা পূর্ববঙ্গের সরকারি অফিসগুলি অভিজ্ঞ হিন্দু কর্মচারীর অভাবে অচল হত। মুসলমান জমিদারদের জমিদারি চালাত হিন্দুরা। এটা আমি টাঙ্গাইলে গজলবীদের গেস্ট হাউসে দু-তিন দিন থাকার সময় দেখেছি। ময়মনসিংহ সদরে এক মুসলিম মুনসেফ আমাকে বলেন, 'আমাদেরও এক চিলতে জমিদারি আছে। চালায় হিন্দুরা। হিন্দুরাও খায়, কিন্তু মালিকের জন্য কিছু রাখে। মুসলমানরা চেঁচেপুঁছে খায়।'

তবে লক্ষণ যা দেখলুম তা সুবিধের নয়। হিন্দুরা এক পা তুলে বসে আছে। কলকাতাই তাদের প্রাণকেন্দ্র। তার থেকে বিচ্ছিন্ন হলে তাদের ভবিষ্যৎ নেই। আমার আদালতের হিন্দু পিয়ন বা চাপরাশি পর্যন্ত অপশন দেয় ইন্ডিয়ার জন্য। আখেরে কলকাতার জন্য। পার্টিশনটা যদি লর্ড কর্নওয়ালিসের আমলে হত তা হলে এক জনও হিন্দু পূর্ববঙ্গ ছাড়ত না। বাংলায় তখন হিন্দুরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। ঢাকা ছিল আরও সমৃদ্ধ।

এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে ধনবান ও গুণবান হিন্দুরা অনেক সুযোগ সুবিধা পূর্ববঙ্গে হারাবেন ও পশ্চিমবঙ্গে পাবেন। কিন্তু তাঁরাই যে কেবল চোখে আঁধার দেখলেন তাই নয়। না, দাঙ্গা-হাঙ্গামার ভয় ততটা নয়। যতটা নারী হরণের ভয়, জমি বেদখলের ভয়। এই দু ধরনের ভয় সব দেশে ও সব কালে মানুষের অস্থিমজ্জায় নিহিত। উপরন্তু আরও একটা ভয় ছিল। সেটা মুসলমান হয়ে যাওয়ার ভয়। মোল্লাদের বোলচাল শুনলে মনে হত তারা দার-উল-ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবেই। পৌত্তলিকদের ইসলাম গ্রহণ করতে হবে, নতুবা দেশত্যাগ করতে হবে, আর নয়তো প্রাণ হারাতে হবে। যারা মুসলমান হবে না তারা যদি বাঁচতে চায় তো যঃ পলায়তি স জীবতি।

আমার সেরেস্তাদার সরফুদ্দিন আহমদ ছিলেন অতি উদারমনা মুসলমান। একদিন আমাকে তিনি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় নিয়ে গিয়েছিলেন। আমার অকাল অবসরের পর আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহে তিনি কলকাতায় এসে যোগ দেন। এই রকম আরও অনেকের কাছেই আমি আন্তরিক ভালবাসা পেয়েছি। এক সময় আমার সংকল্প ছিল অকালে অবসর নিয়ে আমি কুষ্টিয়াতেই বসবাস করব। রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ ও লালন ফকিরের ছেঁউড়িয়া এই দুটি স্থান ছিল হিন্দু মুসলমানের মিলনতীর্থ। আমরা যে পরস্পরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এটা আমি বাউল বোষ্টমদের সঙ্গে মিশে সর্বদা অনুভব করেছি। আমার অভিলাষ ছিল আমি এঁদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে এমন কিছু সৃষ্টি করে যাব যা এঁরা গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দেবেন। আমার লেখা কি শুধু এলিতের জন্যে পীপলের জন্যে নয়?

পূর্ববাংলার মতো অমন সমৃদ্ধ লোকসাহিত্য আর কোথায়? অমন মনপসন্দ মাটি জল মানুষই বা কোথায়? দেশটা আমার প্রিয়, মানুষগুলোও আমার প্রিয়। তবে সত্যের খাতিরে স্বীকার করতে হবে যে আমার ভিতরে একপ্রকার superiority complex ছিল আর ওদের ভিতরেও একপ্রকার inferiority complex. এ দুটো complex না থাকলে হয়তো এই আত্মঘাতী ট্র্যাজেডি ঘটত না। যার ফলে পূর্ববাংলায় আমি এলিয়েন, পশ্চিমবঙ্গে সরফুদ্দিন

এলিয়েন।

উচ্চবংশীয় মুসলমানদের মনেও একটা superiority complex ছিল। তাঁদের পূর্বপুরুষরা একদা ছয় শতক ধরে হিন্দুস্থান শাসন করেছিলেন। এক-একজন মুসলমান চার-চারজন হিন্দুর সমান। বাহুবলে তাঁরাই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ নিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হিন্দুরা সাহেবদের সঙ্গে টক্কর দিচ্ছে। সাহেবরা গেলে তারাই চায় মসনদে বসতে। 'কী! আমরা হব আমাদের গোলামদের গোলাম? না, হিন্দুরাজত্ব কিছুতেই নয়। লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান।' ন্যাশনালিজম ও ডেমোক্রেসি এ দুটো তত্ত্বের কোনওটাই এঁরা মানতেন না। সত্যাগ্রহ তো দুর্বলের পন্থা। গান্ধী এক ধূর্ত বানিয়া। কংগ্রেস এক হিন্দু শিবির।

ভারত ভাগ নিবারণের জন্য জিন্নার ফর্মুলা ছিল ফিফটি-ফিফটি। তাতেও মুসলিম সুপেরিয়রিটি প্রমাণ হত না। তার জন্য মুসলমানদের দিতে হত পঞ্চাশটিরও বেশি আসন। এই ফর্মুলা চাকরি-বাকরির বেলাতেও প্রযোজ্য হত।

কলকাতা থেকে কালীপদ মুখোপাধ্যায় ও কিরণশঙ্কর রায় এলেন ময়মনসিংহের হিন্দুদের বোঝাতে। হিন্দুদের প্রশ্ন হল, আমাদের ছেলেরা চাকরিবাকরি পাবে তো? নইলে আমাদের মেয়েদের বিয়ে হবে কী করে? এই দুই মোক্ষম প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে নেতারা নাজেহাল। তাঁরা বলেন, পশ্চিমবঙ্গে আমরা একটা শক্ত ঘাঁটি তৈরি করব। আপনারা যখনই দরকার হবে তখনই চলে আসবেন।

কালীপদবাবুর সঙ্গে আমি অনাহূত হয়ে সাক্ষাৎ করলুম। আর কিরণশঙ্কর রায়কে ডিনারে নিমন্ত্রণ করলুম। আগে থেকেই আমাদের পরিচয় ছিল। আমি তাঁর লেখার পক্ষপাতী। তিনিও বোধহয় আমার লেখার। তিনি 'সবুজপত্র' গোষ্ঠীর বিশিষ্ট লেখক। আমি 'সবুজপত্র'-এর উৎসাহী পাঠক।

কিরণশঙ্কর কথাপ্রসঙ্গে বললেন,'ন্যাশনালিস্ট মুসলমানরা আমাদের asset নয়, liability।' আমি অবাক হলুম। তিনি কি বলতে চান যে মুসলিম লীগের সঙ্গে বিবাদের মুখ্য কারণ কংগ্রেসে আবুল কালাম আজাদ, খান আবদুল গফ্ফর খান প্রমুখ ন্যাশনালিস্ট মুসলমানদের উপস্থিতি? তা হলে তো ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে হিন্দু জাতীয়তাবাদে পরিণত করতে হয়। যে-সব মুসলিম অফিসরকে স্বাধীন ভারতে চাকরির অপশন দেওয়া হচ্ছে তাঁরাও কি liability? যে-সব মুসলমানকে স্বাধীন ভারতে থেকে যেতে আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে তাঁরাও কি liability?

তা হলে গান্ধী নেহরুর ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিটাই ভ্রান্ত। কিরণশঙ্করের সঙ্গে অন্নদাশঙ্করের মৌল মতভেদের শুরু সেই ময়নসিংহেই পার্টিশনের প্রাক্কালে। তার পরিণতি মুর্শিদাবাদে বছরখানেক বাদে।

ময়মনসিংহে থাকতে আমি হাইকোর্টে চিঠি লিখে জানাই যে খুনের মামলায় জুররা ঘুষ খেয়ে মামলা নষ্ট করছেন। জুরিপ্রথা কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখা উচিত। অবাক কাণ্ড! স্বাধীনতার পর জুরিপ্রথা ভারতের সর্বত্র বন্ধ হয়ে গেল। তাও বরাবরের জন্য। পাকিস্তানের খবর জানিনে। না, আমি এটা বরাবরের জন্য বন্ধ করতে বলিনি।

একদিন আমার এজলাসে একটা নারী-হরণের মামলার আপিল উপলক্ষে আসামি পক্ষের উকিল হয়ে এলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক সাহেব। তখনকার দিনে প্রাদেশিক

সরকারের মুখ্যমন্ত্রীদের প্রধানমন্ত্রী বলা হত, মৌলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর ভাষায় উনি ছিলেন বাংলাদেশের র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড্। কারণ উনি নিজের দল ত্যাগ করে পরের দলের মোড়ল হয়েছিলেন।

আসামি মুসলমান। অপহৃতাটি হিন্দু। হক সাহেব হিন্দু-মুসলমানের চিরদিনের সম্পর্ক উল্লেখ করে আর্দ্র নয়নে ও করুণ কণ্ঠে নিবেদন করলেন, 'After all, they will have to live together' ।

হিন্দু-মুসলমানকে একসঙ্গে থাকতে হবে কি হবে না সেটাই ছিল তাঁর ও আমার উভয়ের অন্তর মথিত করা প্রশ্ন। যেন হ্যামলেটের সেই 'To be or not to be that's the question.' এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে নোয়াখালিতে গিয়েছিলেন গান্ধীজি। দেশসুদ্ধ মানুষ তাকিয়ে রয়েছিল তাঁর দিকে।

আর একদিন আমার এজলাসে এলেন কুমিল্লার বিখ্যাত উকিল ও কৃষক-প্রজা পার্টির নেতা কামিনীকুমার দত্ত। তাঁকে তাঁর মামলার শুনানির পরেই আমার চেম্বারে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলার পরিস্থিতিটা কীরূপ?' তিনি সম্পূর্ণ শান্তভাবে উত্তর দিলেন, 'একদম স্বাভাবিক। অপহৃতা মেয়েরা সবাই বাড়ি ফিরে এসেছে। হিন্দু সমাজ তাদের গ্রহণ করেছে। যে-সব পুরুষকে মুসলমান করা হয়েছিল তারা প্রায়শ্চিত্ত করে আবার জাতে উঠেছে। লুটের মাল যথাসম্ভব উদ্ধার করা গেছে। এখন যেটা চাই সেটা হচ্ছে forgive and forget' ।

আমার ভিতরটা জ্বলছিল। কামিনীবাবুর কথা বিশ্বাস করতে মন চাইছিল না। কিন্তু তাঁর মুখে চোখে এমন এক সুদৃঢ় প্রত্যয় লক্ষ করলুম যে আমি তাঁর কথা উড়িয়ে দিতে পারলুম না। আমি তাঁকে খুবই শ্রদ্ধা করতুম। পরবর্তী কালে তিনি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের আইনমন্ত্রী হন।

লীগ নেতা ও বিশিষ্ট উকিল নুরুল আমীন সাহেবের বাড়িতেও একবার ভোজ খেয়েছিলুম। উপলক্ষটা মনে নেই। এমনিতেই মানুষটি সুভদ্র ও সদালাপী। পরবর্তী কালে তিনি পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হন। তখনও 'পূর্ব পাকিস্তান' আখ্যা বিধিবদ্ধ হয়নি। একুশে ফেব্রুয়ারির হত্যাকাণ্ড তাঁকে কুখ্যাত করে।

আমার আদালত কক্ষের পেছনের সারিতে বসতেন উকিল মোনায়েম খান। অমন sinister চেহারা আমি কম লোকের দেখেছি। এই রত্নটিকেই কিনা জহুরি আয়ুব খান বেছে বেছে পূর্ব পাকিস্তানের হর্তাকর্তা করেন।

ময়মনসিংহের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল কাজিয়া। দু-পক্ষেই দলবদ্ধ মুসলমান। হাতে ভয়ানক সব অস্ত্র। ঢাল, তরোয়াল, সড়কি, কোচ, বল্লম ইত্যাদি। ভীষণ চিৎকার করে দু-পক্ষ ঝাঁপিয়ে পড়ত দু-পক্ষের উপর। কিছু লোক হতাহত হত। পুলিশ দু-পক্ষকেই চালান দিত। কাজিয়ার ইস্যু হয়তো নতুন একটা চর কিংবা পুরনো একটা কোঁদল।

অন্য দিক থেকে বৈশিষ্ট্য সারি, জারি, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া ইত্যাদি লোকসংগীত। ময়মনসিংহ গীতিকা তো সুপ্রসিদ্ধ।

আমার একটি প্রিয় গান ছিল, 'মন মাঝি, তোর বৈঠা নে রে, আমি আর বাইতে পারলাম না।'

একদিন আমি সপরিবারে মুক্তাগাছার পথ দিয়ে সফর থেকে ফিরছি। এমন সময়

সেখানকার বিখ্যাত জমিদারবংশের শরিক জীবেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরি আমাদের ধরে নিয়ে যান পথের মাঝখান থেকে। তাঁর ভদ্রাসনে রঙ্গমঞ্চ ছিল কলকাতার মতো। সেখানে তিনি একাই 'বিসর্জনে'র রঘুপতির ভূমিকা অভিনয় করেন। দর্শক কেবল আমার স্ত্রী ও আমি। তাঁর পার্ট তাঁর মুখস্থ ছিল। পাকিস্তান তাঁকে দেশান্তরী করে।

মজফফর আলি খান যত দিন ছিলেন তত দিন পুলিশের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি দেখা যায়নি। বদলি হয়ে তিনি কলকাতায় চলে যাওয়ার পর একদিন আমি আদালত থেকে বাড়িতে ফিরে লীলার মুখে শুনি দুপুরবেলায় এক পুলিশবাহিনী রাস্তা দিয়ে মার্চ করে যাওয়ার সময় আওয়াজ তোলে, 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ'। তা শুনে আমি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারিনে। লীলা বলেন, 'এর মানে ব্রিটিশ রাজত্ব আর বেশি দিন নয়। এর পরে আসছে পাকিস্তানের জন্য লড়াই।'

খান ছিলেন পাকিস্তানের সম্পূর্ণ বিরোধী। কিন্তু তিনিও যাবার আগে আমাকে বলে গিয়েছিলেন পাকিস্তান রুখতে পারা যাবে না। নোয়াখালির হাঙ্গামার পরে যেমন হিন্দুদের সহসা মনোভঙ্গ হয়েছিল তেমনই বিহারের হাঙ্গামার পরে মুসলমানদেরও একই প্রকার। কোনও পক্ষেই সাধারণ মানুষদের মধ্যে এর জন্য মানসিক প্রস্তুতি ছিল না। কলকাতার দাঙ্গার পরেও এ রকম মনোভঙ্গ লক্ষ করা যায়নি। সমস্ত ব্যাপারটাই অভাবিতপূর্ব।

আশ্চর্যের ব্যাপার, মুসলিম অফিসরদের মধ্যে যাঁরা সবচেয়ে আধুনিক, যাঁদের মহিলারা পর্দা মানেন না, কেউ কেউ ক্লাবে গিয়ে পরপুরুষের সঙ্গে নাচেন, সে পরপুরুষ বিধর্মীও হতে পারেন, যাঁরা সুরা পান করেন ও বন্ধুজনকে সুরা অফার করেন, যাঁরা সাহেবিয়ানায় সাহেবদের উপর টেক্কা দেন তাঁরাই কিনা সবচেয়ে সেপারেটিস্ট।

অথচ তাঁদের আমি কমিউনালিস্ট বলব না। তাঁদের ঝগড়া হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে নয়, হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে নয়, কিন্তু অসপত্ন ও নিরঙ্কুশ হিন্দু মেজরিটির শাসনের বিরুদ্ধে। যেখানে হিন্দু মাইনরিটি ও তাঁরাই মেজরিটি সেখানে তাঁদের হিন্দুর বিরুদ্ধে বিবাদ নেই। জিন্না সাহেব যদি ডাইরেক্ট অ্যাকশনের নির্দেশ না দিতেন তবে মুসলিম মেজরিটি সাধ করে হিন্দু মাইনরিটির গায়ে হাত দিত না। তার ফল হল এই যে সেপারেটিস্টরা সবাই চিহ্নিত হয়ে গেল কমিউনালিস্ট বলে।

দুঃখের বিষয় বাঙালি হিন্দুদের মধ্যেও একদল সেপারেটিস্টকে দেখা গেল। এত দিন ধরে যাঁরা গেয়ে আসছিলেন 'জাগে নব ভারতের জনতা। এক জাতি এক প্রাণ একতা' তাঁরাও চাইলেন স্বতন্ত্র পশ্চিমবঙ্গ। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কথা আলাদা। হিন্দু মহাসভার সভাপতি হওয়ার পর থেকে মুসলমানকে তিনি স্বজাতি মনে করেন না। কিন্তু অতুল্য ঘোষের মতো অসাম্প্রদায়িক মানুষকেও মানতে হল সাম্প্রদায়িক শান্তির জন্য বাংলা ভাগ করতে হবে। আমার মতে সেটা এক হিসেবে পরাজয় মেনে নেওয়া। ছেলেবেলা থেকে আমি বাঙালি জাতীয়তাবাদের গান শুনে এসেছি, লেখা পড়ে এসেছি, আলোচনা করে এসেছি। এমনকী ঘটল যাতে বাঙালি জাতীয়তাবাদ বর্জিত হতে পারে? পশ্চিমবঙ্গীয় জাতীয়তাবাদ কি তার স্থান নিতে পারে?

সেবার বর্ষাকালে ব্রহ্মপুত্র পার হতে গিয়ে একটা খেয়া নৌকো যাত্রীদের ভার সামলাতে না পেরে ডুবে যায়। যারা সাঁতার জানত তারা প্রাণে বাঁচে। বেশিরভাগই ভেসে যায় বা ডুবে যায়। নৌকোটার যত যাত্রী বইবার কথা তার চেয়ে ঢের বেশি ছিল। এই

ঘটনার উল্লেখ করে আমি একটি সভায় বলি, 'পশ্চিমবঙ্গ একটি ছোট নৌকো। সেটিও ডুবে যাবে যদি পূর্ববঙ্গ থেকে আপনারা সবাই গিয়ে ভার বাড়ান।'

যাঁরা পাকিস্তান চেয়েছিলেন তাঁরা পাকিস্তান পেলেন, যাঁরা পশ্চিমবঙ্গ চেয়েছিলেন তাঁরা পশ্চিমবঙ্গ পেলেন। ময়মনসিংহের হিন্দু সরকারি কর্মচারীরা প্রায় সকলেই একসঙ্গে অপশন দিলেন ইন্ডিয়ার জন্য। উকিলদের আমি জিজ্ঞাসা করলুম, তাঁরা কী করবেন? তাঁদের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে পসার জমানো মোটেই সহজ হবে না। তাই তাঁরা দ্বিধাগ্রস্ত। অন্নদাবাবু বলে এক উকিল ছিলেন, তাঁর পদবি আমার মনে পড়ছে না, আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, 'আপনি তো মুসলমানদের ইতিহাস জানেন। ক্ষমতার জন্য নিজেদের মধ্যে মারামারি করাই তাদের ঐতিহ্য। মুসলমানকে মুসলমানের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যই হিন্দুর থাকা দরকার। আমরাই তাদের কোঁদল মেটাতে পারি। অগত্যা আমি থাকছি।'

না, ওটা রসিকতা নয়। ভদ্রলোক সত্যিই মুসলমানদের জন্য চিন্তিত। তখনকার মতো তিনি থেকে গেলেন। কিন্তু বছর দুই বাদে শুনতে পেলুম তিনি আলিপুর বার-এ প্র্যাকটিস করছেন।

ময়মনসিংহ উকিল-বার একদিন সভা ডেকে আমাকে বিদায় সংবর্ধনা দেয়। নেতৃস্থানীয় একজন হিন্দু উকিল আমাকে সম্বোধন করে বলেন, 'আপনি ছিলেন বলেই আমাদের মনে ভরসা ছিল।' আমি বুঝতে পারলুম যে তিনি ভাবছেন আমি হিন্দু বলেই হিন্দুদের মনে ভরসা ছিল। উত্তরে আমি বললুম, 'বিচারকের আসনে বসে আমি নিজেকে হিন্দু ভাবিনে। আমি চিনতেও পারিনে কে হিন্দু কে মুসলমান, শুধু চিনি কে দোষী কে নির্দোষ, কার শাস্তি হওয়া উচিত, কার শাস্তি হওয়া উচিত নয়। একজন মুসলমান বলে সে শাস্তি পাবে আর হিন্দু বলে সে ছাড়া পাবে এর নাম ন্যায়বিচার নয়। আমি ন্যায়বিচারের জন্য নিযুক্ত হয়েছি। সেই সূত্রে ভরসা দিয়েছি। শুধু এক সম্প্রদায়কে নয়, সর্বসাধারণকে।'

আমি বলতে পারতুম কিন্তু বলিনি যে হিন্দুদেরকে আমার চাইতে বেশি ভরসা দিয়েছিলেন নুরউন্ নবী চৌধুরী ও মজফফর আলি খান এই দুই মুসলমান। এঁরা ছিলেন সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির ঊর্ধ্বে। আমার ভাবতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল যে, তাঁরা হয়ে যাবেন পাকিস্তানি আর আমি ইন্ডিয়ান। স্বাধীনতার জন্য আমাদের মেনে নিতে হয়েছিল যে, আমরাও পরস্পরের কাছে ইংরেজদের মতোই এলিয়েন। এই যে এলিয়েনেশন এর কি সত্যিই কোনও দরকার ছিল? পঞ্চাশ বছর ধরে আমি এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছি।

এমন হিন্দুও ছিলেন যাঁরা স্থানীয় মুসলমানদের উপর সম্পূর্ণ আস্থাশীল ছিলেন। তাঁরা কোনও কারণেই দেশত্যাগ করবেন না। একজন বলেছিলেন, 'আমি মানবপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত ভালয় বিশ্বাস করি।' আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, 'এটা কি আপনার স্ত্রীর, আপনার কন্যার মনের কথা? সমস্যাটা তো নারীর নিরাপত্তা নিয়ে।' পরে দেখা গেল সেই বিশ্বাসীও দেশত্যাগী।

বিদায়ের দিন স্টেশনে গিয়ে দেখি দারুণ ভিড়। ট্রেন আসে দেরি করে। সঙ্গে সঙ্গে বোমা ফাটে। ভয় পেয়ে যাই। কী ব্যাপার? ওই ট্রেনে নতুন স্টেশন মাস্টার এসেছেন। তিনি মুসলমান। স্টেশন স্থাপনের ষাট বছর পরে এই প্রথম একজন মুসলমান স্টেশন মাস্টার এলেন। তাই তাঁকে গান স্যালিউট দেওয়া হচ্ছে। এতকাল বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কেউ স্টেশন মাস্টার হতে পারতেন না। সেটাই ছিল ময়মনসিংহের মহারাজার সঙ্গে চুক্তির শর্ত।

জমিটা ছিল তাঁর। তিনি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। এই বার পাকিস্তান সৃষ্টির একটা অর্থ পাওয়া গেল। পাকিস্তান না হলে কোনওদিন কোনও মুসলমান ময়মনসিংহের স্টেশন মাস্টার হতে পারতেন না। তিনি হিন্দুর চাইতে যোগ্যতর হলেও না। নতুন স্টেশন মাস্টার ট্রেন থেকে অবতরণ করেন, গণ-অভ্যর্থনা পান। বিদায়ী জেলা জজের দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। সেটা শুধু ময়মনসিংহ থেকে বিদায় নয়, এক সপ্তাহ পরে আগতপ্রায় পাকিস্তান থেকেও বিদায়। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি সুসং দুর্গাপুরের মুনসেফকে ব্রাহ্মণ হতেই হবে, অব্রাহ্মণ হলে চলবে না, মুসলমান হওয়া তো দূরের কথা। জায়গাটা এমন দুর্গম যে ব্রাহ্মণ মুনসেফরাও যেতে চান না, গেলে থাকতে চান না। আমি যাঁকেই দুর্গাপুরে বদলি করতে যাই তিনিই কাতর কণ্ঠে বলেন, 'আমার কী অপরাধ?' এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য পাকিস্তানের প্রয়োজন ছিল। ব্রাহ্মণ মুনসেফরা পশ্চিমবঙ্গে পলাতক। দুর্গাপুরের ব্রাহ্মণ বাড়িওয়ালারাও ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কাউকে বাড়ি ভাড়া দিতে নারাজ।

আমি কমলিকে ছাড়তে চাইলেও কমলি আমাকে ছাড়বে না। আমি পাকিস্তান ছাড়তে চাইলেও পাকিস্তান আমাকে ছাড়বে না। আমার অন্যতম চাপরাশি আব্বাস আমাকে সপরিবারে কলকাতা পৌঁছে দেবার জন্য ট্রেনে উঠে বসবে। রাহাখরচ তো সরকার বহন করবে। আমার আপত্তি কীসের?

আমি ওকে বোঝাই যে দিনকাল খারাপ। ওর ইয়া গোঁফদাড়ি দেখে কলকাতার রাগী হিন্দুরা ওকে মারতে এলে আমি বাঁচাব কী করে? সে দাড়ি নেড়ে বলে,'হুজুর, রাখে আল্লা মারে কে? মারে আল্লা রাখে কে?'

কলকাতায় সে অদৃশ্য হয়ে যায়। দিন দুই বাদে আপনিই এসে বিদায় নেয়। সারাদিন সে ট্রামগাড়িতে চড়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। রাত কাটিয়েছে রেলের ওয়েটিং রুমে। তার চাপরাশ দেখে সবাই তাকে সমীহ করেছে। ব্রিটিশ সূর্য তখনও অস্ত যায়নি।

আমি বলি, 'খোদা হাফিজ।'

সেও বলে, 'খোদা হাফিজ।'

সঙ্গে সঙ্গে ছিন্ন হয়ে গেল পূর্ববঙ্গের সঙ্গে আমার এতদিনের প্রশাসনিক সম্পর্ক। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বলতে যাকে বোঝায় তা পূর্ববঙ্গই। সোনার বাংলা যাকে বলা হয় সে-ও পূর্ববঙ্গ। হায়, সেখানে আমি বিদেশি।

ব্রিটিশ আমলের শেষ মাসটা ছিল একপ্রকার দ্বৈরাজ্য। আইনসিদ্ধ মন্ত্রীমণ্ডলীর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন শহীদ সুহরাবর্দী। ছায়া মন্ত্রীমণ্ডলীর প্রধান প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। আইনসিদ্ধ চিফ সেক্রেটারি এইচ এস স্টিভেন্স। ছায়া চিফ সেক্রেটারি সুকুমার সেন। তিনিই স্থির করেন আমরা কে কোথায় বদলি হব।

একদিন খবর পাই আমাকে বদলি করা হয়েছে হাওড়ায় জেলা জজ হিসেবে। এই পদে আমি পার্টিশনের পূর্বেই যোগ দিতে পারব। দিন কয়েক বাদে আর এক চিঠি। আমাকে বদলি করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের Commissioner for Workmen's Compensation পদে। এ পদে আমাকে যোগ দিতে হবে পার্টিশনের পরে। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ প্রতিষ্ঠার পরে।

আমি হাওড়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে টেলিগ্রামে সার্কিট হাউসে আমার জন্য ঘর রাখার অনুরোধ করলুম। উত্তরটা এল তাঁর কাছ থেকে নয়, আমার প্রাক্তন পুলিশ সুপার মজফফর

আলি খান সাহেবের কাছ থেকে। তিনি ইতিমধ্যে কলকাতায় বদলি হয়েছিলেন। তাঁর অনুরোধ, তাঁকে হাওড়া সার্কিট হাউসে একটু জায়গা দিতে হবে। আমি টেলিগ্রামে জানালুম, সানন্দে। কিন্তু আপনি আমাকে সপরিবারে শিয়ালদা থেকে হাওড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য সরকারি পরিবহনের বন্দোবস্ত করুন।

ময়মনসিংহ থেকে বিদায়কালে আমার ছোট মেয়ে তৃপ্তি কান্নাকাটি করে তার পোষা বাঁদরছানাটিকেও সঙ্গে নিতে হবে। উঠব তো সার্কিট হাউসে। সেখানে বাঁদরছানাকে রাখব কোথায়? বাবুর্চির আর্জি তাকেও যেন কলকাতায় নিয়ে যাই। সবাই তাকে ভালবাসত। কিন্তু কলকাতায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা যে কোনওদিন বাঁধতে পারে। খুনখারাপি তো লেগেই আছে। লোকটিকে দেখতে হিন্দুর মতোই। পোশাক-পরিচ্ছদও হিন্দুর মতো। সন্দেহশীল হিন্দুরা আজকাল কাপড় খুলে নিশ্চিত হতে চায়, হিন্দু না মুসলিম। তা ছাড়া কখন মুখ দিয়ে 'পানি' বেরিয়ে যাবে আর সঙ্গে সঙ্গে প্রাণটিও। আমি তেমন ঝুঁকি নিতে নারাজ।

আমরা নিরাপদে শিয়ালদায় নাবলুম। বাইরে অপেক্ষা করছিল পুলিশ ভ্যান। চারদিক বন্ধ এক খাঁচার ভিতর ঠাসাঠাসি হয়ে বন্দুকধারী সিপাহিদের হেপাজতে আমরা কলকাতার বিপজ্জনক এলাকাগুলি এড়িয়ে হাওড়া সার্কিট হাউসে পৌঁছই।

খান সেখানে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর মুখে শুনলুম গোড়া সার্কিট হাউসটাই আমার জন্য রিজার্ভ। তাঁকে একটু আশ্রয় দেওয়ার জন্য তিনি আমার অনুমতিপ্রার্থী। তিনি বদলি হয়ে পাকিস্তানে যাচ্ছেন। কলকাতার বাসা থেকে নির্বাসিত। বদলির কাগজপত্র এখনও হাতে আসেনি। আমি বলি, যত দিন খুশি থাকুন। তিনি সেই দিনই কাগজপত্র পেয়ে যান।

কাগজপত্র জোগাড় করা কী ঝকমারি। আমাকেও সংগ্রহ করতে হবে আমার কলকাতা নিযুক্তির পাকা অর্ডার। রাইটার্স বিল্ডিংয়ে গিয়ে দেখি রথযাত্রার ভিড়। গোটা পূর্ববঙ্গের হিন্দু কর্মচারী সমষ্টি সেখানে পাকা অর্ডারের জন্য চাতকের মতো সতৃষ্ণ। ভিড় ঠেলে চিফ সেক্রেটারি সুকুমার সেনের সঙ্গে মোলাকাত করতেই তিনি বললেন, অমুক কেরানির কাছ থেকে কালেক্ট করুন।

আমি দেখলুম আমার সহকর্মী জজ বারান্দায় দাঁড়িয়ে। কেরানির কৃপাপ্রার্থী। অথচ একদা ইনিই ছিলেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ আন্ডার সেক্রেটারি। কেরানিকুলকে খাড়া করিয়ে রাখতেন। এখন কেরানিকুলই সাহেবকে খাড়া করিয়ে রেখেছেন। Last pay certificate চটজলদি দেবে না। আমি দাঁড়িয়ে থাকতে অক্ষম। ফিরে গেলুম হাওড়ায়। পাঠিয়ে দিলুম এক কেরানিকে। তাঁকেও আমার কাগজপত্র আনতে কয়েক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। আসলে এটা গাফিলতি নয়। হাজার হাজার অর্ডার একই দিনে টাইপ করতে হয়।

হাওড়ায় একজন কেরানি এসে আমাকে বললেন, 'বেঙ্গল গভর্নমেন্ট চোদ্দোই অগস্ট পর্যন্ত মাইনে দেবে। আপনি এই কটা দিনের জন্য pay bill সই করুন। নইলে এই ক'দিনের জন্য টাকা নতুন সরকার দেবে না। কে যে দেবে তার ঠিক-ঠিকানা নেই।' ওই কেরানি আমাকে খবরটা না দিলে আমি কি জানতুম? ব্রিটিশ রাজত্বের শেষ চোদ্দো দিনের মাইনের জন্য হয়তো আমাকে বিলেতের সেক্রেটারি অব স্টেট ফর ইন্ডিয়া পর্যন্ত ধাওয়া করতে হত। কারণ তিনিই আমার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন। আই সি এসরা বিলেত থেকে নিযুক্ত।

জর্জ গেলেন কেনিয়ায়, ব্যাসটিন নিউজিল্যান্ডে, সিমসন অস্ট্রেলিয়ায়। তবে অধিকাংশই ইংল্যান্ডে, স্কটল্যান্ডে, আয়ারল্যান্ডে, ওয়েলসে। ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে দক্ষিণ

আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গও ছিলেন। আর ছিলেন সিংহলের হিন্দু বা বৌদ্ধ। তা ছাড়া ভারতের নানা প্রদেশের হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান, পারসি, ইহুদি, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, ডোমিসাইলড ইউরোপীয়রা।

সে রকম সার্ভিস পৃথিবীতে আর হয়নি ও হবে না। তাকে বলা হত heaven born service. বাঙালি সদস্যরা কেউ কাজ করতে যেতেন বোম্বাইতে, কেউ মাদ্রাজে, কেউ যুক্তপ্রদেশে, কেউ মধ্যপ্রদেশে, কেউ বিহার-ওড়িশায়, কেউ আসামে, কেউ পঞ্জাবে। ওই সব প্রদেশের বাসিন্দারা বেঙ্গলে। ব্রিটিশ বিদায়ের সময় সার্ভিসটাকে গুটিয়ে নেওয়া হল। কতক আই সি এস যোগ দিলেন ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসে, কতক পশ্চিমবঙ্গ স্টেট জুডিসিয়াল সার্ভিসে। আমি যোগ দিলুম প্রথমটিতে। কিন্তু আমরা আই সি এস হিসাবেই বেতন ও পেনশনের অধিকারী রইলুম।

চার

হাওড়া সার্কিট হাউসে থাকতেই চোদ্দোই অগস্ট মধ্যরাত্রে জানতে পেলুম দেশ স্বাধীন হয়েছে। সকালবেলা কলকাতা যাবার উদ্‌যোগ করছি। এমন সময় হাওড়ার বিশিষ্ট নাগরিকরা এসে আমাকে ধরে নিয়ে যান হাওড়া ময়দানে। সেখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে হয়। তারপর জজ আদালতের আমলাদের অনুরোধে সেখানেও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করি।

কলকাতা সেদিন আনন্দ উচ্ছল। কোথাও ব্রিটিশ পতাকা নেই। সর্বত্র জাতীয় পতাকা। শুধু লাটভবনে নতুন গভর্নর চক্রবর্তী রাজগোপালাচারির নিজস্ব নিশান। হিন্দু মুসলমান মাতালের মতো কোলাকুলি করছে। মুসলমান ছিটোচ্ছে হিন্দুর গায়ে গোলাপজল। এই ম্যাজিকের পেছনে ছিল মহাত্মা গান্ধীর প্রভাব। তিনি কিন্তু সেদিন অনশনে মৌন। দিনটি শুধু স্বাধীনতার নয়, দেশভাগের ও প্রদেশভাগেরও। আমারও হৃদয় ভারাক্রান্ত। স্বদেশেই আমি বিদেশি হয়ে গেলুম।

পনেরোই অগস্ট কলকাতার রাজপথে দেখা হয়ে গেল কাজী আবদুল ওদুদের সঙ্গে। তিনি বিতরণ করছিলেন তাঁর লেখা একটি পুস্তিকা 'স্বাধীনতা দিবসের ভাবনা'। তিনি কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় যাননি। যদিও ফরিদপুর জেলার বাগমারা গ্রামে তাঁর বাড়ি। জীবনের অবশিষ্ট তেইশ বছর তিনি পাকিস্তানে পা দেননি। তিনি ছিলেন যেমন কট্টর বাঙালি তেমনই কট্টর ভারতীয়। একইকালে মুক্তবুদ্ধি মুসলমান। ঢাকা 'শিখা' গোষ্ঠীর অন্যতম নায়ক। স্বাধীনতার পর তিনি দু খানি বই বার করেন। একটির নাম 'শাশ্বত বঙ্গ', আর একটির নাম 'Creative Bengal'. যত দিন কলকাতায় ছিলুম, প্রায়ই তাঁর সঙ্গে দেখা হত। পার্টিশনের পর একদিন চট্টগ্রাম থেকে আসেন মাহবুব উল আলম। কাজীসাহেব ও আমি তাঁকে অভ্যর্থনা করি। মাহবুব যত না বাঙালি তার চেয়ে বেশি মুসলমান। আর কাজীসাহেব যত না মুসলমান তার চেয়েও বাঙালি। আমরা তিনজনেই মনে করি যে হিন্দু মুসলমান দেশান্তরী না হয়ে যে যার স্থানে থাকে। যে যা ধর্ম পালন করে।

সন্ধ্যায় অতুল্য ঘোষের ভবনে আচার্যের আসনে বসে ভাষণ দিলুম। চার জন নতুন মন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানালুম। ফিরে এলুম হাওড়া সার্কিট হাউসে।

পরের দিন থেকে বালিগঞ্জে নিজের বাসায় নতুন পর্যায় শুরু।

এর আগে যত বার কলকাতায় এসেছি সাধারণত উঠেছি মণীন্দ্রলাল বসুর পার্ক সার্কাসের বাড়িতে। মণিদা আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু। ছেচল্লিশ সালে কলকাতায় যে হাঙ্গামা হয় মণিদা হন তার ফলে গৃহহীন। তাঁকে আশ্রয় নিতে হয় এক আত্মীয়ের বাড়িতে। সেটাও বালিগঞ্জে। কিন্তু পরের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে মেলামেশা করতে পারিনে। তিনিও আমার বাড়িতে আসবার সময় পান না। সেটা সাহিত্যচর্চার সময়ও নয়। সকলেরই চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।

মহাত্মা গান্ধী শান্তি রক্ষার জন্য স্বাধীনতা দিবসের কয়েকদিন আগে থেকেই সক্রিয় ছিলেন। পরেও কয়েকদিন শহরের নানা জায়গায় সভা করে বেড়িয়েছেন। একদিন তিনি রাসবিহারী অ্যাভিনিউতে আসেন। সেদিন আমি লীলাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলুম তাঁকে দর্শন করাতে। লীলার সেই প্রথম ও শেষ সুযোগ। কিন্তু অতিশয় দুঃখের বিষয় লীলা ঠিক সেই দিনই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আমাদের পক্ষে আর বেলেঘাটায় যাওয়া সম্ভব ছিল না। এদিকে মহাত্মা গান্ধী জরুরি আহ্বান পেয়ে দিল্লি চলে যান। ভেবেছিলুম তিনি সেখান থেকে ফিরে এলে আমরা তাঁর দর্শন পাব। কিন্তু তিনি আর ফিরলেন না। লীলার মনে একটা গভীর খেদ রয়ে গেল। ইতিমধ্যেই তিনি গান্ধীজির সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখে প্রকাশ করেছিলেন। তিনি চরকা কাটতেন, খদ্দর পরতেন, নিরামিষ খেতেন। তিনি একান্তভাবে গান্ধীর পন্থায় বিশ্বাস করতেন।

কলকাতায় একদিন আমার বাসায় উপস্থিত হন স্বয়ং ঢেঙ্কানালের রাজাসাহেব শঙ্করপ্রতাপ মহীন্দ্র বাহাদুর। কথা প্রসঙ্গে জানতে পারলুম দেশীয় রাজ্যের রাজারা ভারত রাষ্ট্রে যোগ দিয়েও হেনস্থা হচ্ছেন। দিল্লীতে কোনও মন্ত্রী বা সেক্রেটারি তাঁদের দর্শন দেন না। ওড়িশার 'গড়জাত'গুলিতে প্রজা আন্দোলন চলেছে। প্রজারা দলবদ্ধ হয়ে শান্তিভঙ্গ করছে। বল্লভভাই পটেল তাদের নিবৃত্ত না করে উলটে রাজাদেরই বলছেন প্রশাসনের ভার সরকারের উপর অর্পণ করতে। তা হলে দেশীয় রাজাদের হাতে ক্ষমতা বাকি থাকল কী? তাঁরা হবেন ঠুঁটো জগন্নাথ। তবে পেনশন পাবেন। কিন্তু যাঁরা গান-স্যালিউট পেতেন তাঁরা তা পাবেন না।

রাজাসাহেব আমাকে কাঁদিয়ে ছাড়লেন। হতভাগ্য রাজকুলের জন্য। তাঁর মামাতো বোন পাটিয়ালার মহারাজা যাদবেন্দ্র সিংহের দশ মহারানির প্রথম মহারানি। পাটরানিকে মহলের থেকে বহিষ্কার করা হল। তিনি কলকাতা এলে আগেকার দিনে ফোর্ট উইলিয়াম থেকে তোপধ্বনি হত। গভর্নরের এডি কং গিয়ে তাঁকে হাওড়া স্টেশনে অভ্যর্থনা করতেন। এখন কেউ চিনতে পারে না। মহারানি না চাকরানি। দ্বিতীয় মহারানিকে রেখে আর সব মহারানিকে পাটিয়ালার বাইরে এক-একখানা বাসভবন দান করে বিদায় দিয়েছেন। দশটি উপপত্নীর কোনও ব্যবস্থা করে উঠতে পারেননি। তাঁদের কী হবে কেউ জানে না। ওঁর বাবার ছিল দুশো জন মহারানি ও হাজার জন উপপত্নী। অমন মহাপুরুষের পুত্র কিনা এমন কাপুরুষ? মাত্র একটি নারী নিয়ে সন্তুষ্ট?

তবে আমাদের রাজাসাহেব তাঁর পিতা ও পিতামহের মতো একটি নারী নিয়েই সংসার করেন। উপপত্নী তাঁদের ছিল না, তাঁরও নেই। তাঁর দুঃখ একটাই। ঢেঙ্কানাল রাজ্য এখন ওড়িশা রাজ্যের একটা জেলা। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য। জেলার শাসনভার এখন এক জন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের উপর। রাজাসাহেবের ক্ষমতা

হস্তান্তরিত হয়েছে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে। রাজাসাহেব বেশিরভাগ সময় রাজ্যের বাইরে কাটান। রাজ্যহারা রাজা।

সূর্য-বংশ ও চন্দ্র-বংশ রাজন্যদের এই দুর্গতি? তিন-চার হাজার বছরের পুরাতন রাজতন্ত্র যে এমন অচিরাৎ লুপ্ত হবে তা আমিও কল্পনা করতে পারিনি। আমিও তলে তলে রাজতন্ত্রী। 'এক যে ছিল রাজা' ছাড়া কি রূপকথা হয়? রানির মতো মিষ্টি নাম কি আর আছে? এখন কি আমরা লিখব 'এক যে ছিল রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল? তার যে ছিল এক ফার্স্ট লেডি?' দুঃখের বিষয় এখন আইন অনুসারে একাধিক লেডি বারণ।

ভারতবর্ষের একটা অংশ ছেড়ে দিয়ে কংগ্রেস নেতারা ক্ষমতা হস্তান্তরের একটা শর্ত পূরণ করেন। অন্য শর্ত পূরণ করা হল দেশীয় রাজন্যদের পেনশন ইত্যাদি বহু সুযোগ-সুবিধা দেওয়া, কিন্তু গান-স্যালিউট দেওয়া নয়। এমন কোনও কথা ছিল না যে রাজা বা নবাব বা নিজামের অটোক্রাসি বহাল রাখতেই হবে। প্রজারা যদি চায় তো ডেমোক্রাসি প্রবর্তন করা যেতে পারে। তবে জম্মু ও কাশ্মীরের মহারাজা হিন্দু ও প্রজারা প্রধানত মুসলমান বলে জবাহরলাল প্লেবিসাইটের প্রতিশ্রুতি দেন। না দিলে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে বাধ্য করতেন না। কিন্তু কথা দেবার পর আর ফেরত নেবার উপায় থাকে না। সে প্লেবিসাইট এখনও বাকি।

কলকাতায় আমার অফিসঘরের দেওয়ালে টাঙানো ছিল ব্রিটিশ ভারতের একখানা বড় মাপের মানচিত্র। রোজ সেখানার উপর নজর পড়ত, কারণ ওটা ছিল ঠিক চোখের সামনেই। McMohan Line যাকে বলা হয় সেখানে লেখা ছিল 'Boundary not yet demarcated' তার উত্তরে তিব্বত, দক্ষিণে North East Frontier Agency বা NEFA সেই NEFA-কে আমি ১৯২৮ সালের কোনও মানচিত্রে দেখিনি। আমার কাছে ১৯২৮ সালের Encyclopaedia Britannica ছিল। তাতে বিতর্কিত অঞ্চলটি ছিল তিব্বতের অঙ্গ। পরে আন্দাজ ১৯৪৫ সালে Pears' Cyclopaediaতে সেটি হয় ভারতের অঙ্গ NEFA.

মানচিত্রের উত্তর পশ্চিমে যাকে আকসাই চিন বলা হয় সেখানেও দেখি Boundary not yet settled, তার উত্তরে তিব্বত, দক্ষিণে জম্মু ও কাশ্মীর।

যাই হোক, এ-সব বিষয় নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার কথা নয়। ব্যাপারটা আমার মনের শিকেয় তোলাই ছিল। কিন্তু শিকে থেকে নামাতেই হল চীন-ভারত সংঘর্ষের সময় যখন 'যোগভ্রষ্ট' লিখে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশ করি।

জবাহরলালের মতো আমারও একটা tryst with destiny ছিল। তাঁর যেমন ভারতের স্বাধীনতা আমারও তেমনই সাহিত্যিকের স্বাধীনতা। মনে মনে স্থির করে রেখেছিলুম দেশ যে দিন মুক্ত হবে আমিও তার এক বছরের মধ্যে আনুপাতিক পেনশন নিয়ে মুক্ত হব। আঠারো বছরের চাকরির পর এই প্রথম কলকাতায় বদলি। একটা বছর তো এখানে কাটাবই। ইতিমধ্যে একদিন Accountant General-এর সঙ্গে দেখা করে জানতে চাইব অকালে অবসর গ্রহণ করলে আমি কত টাকা আনুপাতিক পেনশন পাব।

আগেকার দিনে শুধু ইউরোপীয়রাই আনুপাতিক পেনশনের অধিকারী ছিলেন। যাবার সময় ব্রিটিশ ভারত সরকার সেটা ভারতীয়দেরও প্রাপ্য করেন। আমি ঠিক এই সুবিধারই প্রতীক্ষায় ছিলুম। এখন আমি এক বছর সময় নিচ্ছি পাট গুছিয়ে নিতে।

কিন্তু আমার গান্ধীপন্থী বন্ধু অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী তা শুনবেন কেন? তাঁর মতে আমার

মতো অফিসরদের উপর নির্ভর করছে নতুন সরকারের সুষ্ঠু পরিচালনা। আমি তো নিছক বুরোক্রাট নই, আমি এক জন লোকসেবক। আমি যাঁদের চিনি তাঁরাই তো সরকার গঠন করেছেন। গান্ধীপন্থী কংগ্রেসকর্মী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ গোষ্ঠী।

প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ বেছে বেছে সেই সব অফিসরকে চিফ সেক্রেটারি, হোম সেক্রেটারি, এডুকেশন সেক্রেটারি ও প্রাইভেট সেক্রেটারি করেছিলেন যাঁরা ব্রিটিশ আমলে অপেক্ষাকৃত স্বাধীনচেতা বলে বিচার বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন অথচ শাসন বিভাগেও অফিসর হিসাবে অপেক্ষাকৃত সুদক্ষ। প্রাইভেট সেক্রেটারি করুণাকুমার হাজরার সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা ছিল। চিফ সেক্রেটারি সুকুমার সেনের সঙ্গেও ছিল সদ্‌ভাব।

শ্রমিকদের হাত পা কাটা গেলে তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হত। সেই সুবাদে আমাকে একদিন যেতে হয়েছিল দার্জিলিঙে। ফেরার পথে শিলিগুড়ি স্টেশনে আমার কামরায় উঠলেন একজন ইংরেজ মিলিটারি অফিসর। আর এক সাহেব তাঁকে বিদায় দিতে এসেছিলেন। তাঁদের কোলাকুলি থামতেই চায় না। ট্রেন ছেড়ে দেওয়ার পর আমার ইংরেজ সহযাত্রী আমাকে বলেন, 'উনি আমার দাদা। চা-বাগানের ম্যানেজার। বিশ বছর বাদে দেখা। আবার কবে দেখা হবে কে জানে। আমি ইন্ডিয়া ছেড়ে যাচ্ছি শুনে তিনি প্রশ্ন করেন, আমরা কেন চিরকালের জন্য ইন্ডিয়া ছেড়ে যাচ্ছি? আমি বললুম, Might is Right. আমাদের সে মাইট আর নেই।'

একদিন হাজরা আমাকে টেলিফোনে জানালেন মুর্শিদাবাদের লোক সেখানকার জন্য একজন আই সি এস জেলাশাসক চেয়েছে। আমাকেই পাঠানো হবে। আর কাউকে পছন্দ হচ্ছে না। আমি যেন আপত্তি না করি।

আমার স্ত্রী তা শুনে প্রবল আপত্তি করেন। চার মাসের মধ্যে বদলি। সতেরো বছরে ষোলো বার। ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা মাটি। পুণ্যর তো সামনে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা।

আমি কিন্তু দারুণ খুশি। আট বছর জজিয়তি করে আমার হাত-পা আড়ষ্ট। আমি ভালবাসি তাঁবু নিয়ে বেদুইনের মতো ঘুরতে। কখনও হাতির পিঠে, কখনও হাউসবোটে, কখনও টমটমে, কখনও পদব্রজে বেড়াতে। হাজরাকে বললুম আমি রাজি। সুকুমার সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে শুধু একটি প্রশ্নই করলুম। সরকারের সঙ্গে মতভেদ হলে আমাকে কি আপনি সাপোর্ট করবেন? তিনি উত্তর দেন, 'নিশ্চয়, সর্বতোভাবে, আপনি যদি অন্যায় কিছু না করেন।' সরকারি আমলাদের নির্ভয়ে কাজ করবার ভরসা দিতেন সেকালের চিফ সেক্রেটারিগণ। সুকুমার সেন সেই ধারা অনুসরণ করেন।

বহরমপুর ছিল আমার প্রথম স্টেশন। সেইখানেই লেখা হয়েছিল 'অসমাপিকা' আর 'আগুন নিয়ে খেলা'। সেইখানেই লীলার সঙ্গে প্রথম দর্শন। রাঁচিতে বিবাহের পরে বহরমপুরেই মধুমাস। বহরমপুর না হয়ে অন্য কোনও স্থান হলে আমি অত সহজে রাজি হতুম কিনা সন্দেহ।

বহরমপুরে গিয়ে দেখি নদীতে অগভীর জল, সেটা লোকে পায়ে হেঁটে পারাপার করছে, শহর থেকে স্টেশনে যাবার পথে অনেক ফাঁকা জায়গা ছিল। সেসব বাড়িঘরে ভরে গেছে। ইউরোপীয় খ্রিস্টান মিশনারি সাহেব মেমসাহেব ও আর্মেনিয়ন বণিক শ্রেণী নেই। মেদিনীপুর জমিদারি কোম্পানির ইউরোপীয় কর্মচারীরাও নেই। মুসলমান অফিসর একজনও নেই। অন্য প্রদেশের হিন্দু অফিসররাও নেই। সেই জমজমাট বহরমপুরই আর

নেই। আমার rank-এর অফিসর বলতে আমিই একাকী। ক্লাবকে বলা হত ইউরোপীয়ন ক্লাব। ইংরেজি ভাষার অনেক ভাল ভাল বই-কাগজ ছিল—এখন নেই।

বহরমপুরে গিয়ে আমার প্রথম কাজ হল সেখানকার ক্লাবে মদ বন্ধ করা। ক্লাবটি স্থাপিত হয়েছে ইউরোপীয়দের দ্বারা ও তাদেরই মেলামেশার জন্য। চমৎকার একটি বিলিয়ার্ড টেবল ছিল, সুন্দর একটি লাইব্রেরি ছিল, তা ছাড়া টেনিস তাস প্রভৃতি খেলাধুলো তো ছিলই। বড় বড় অফিসররা সেখানে মিলিত হতেন বড় বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। এমন যে প্রতিষ্ঠান তার ব্যয়নির্বাহ হত বেশির ভাগ সুরাপায়ীদের বিল থেকে। আবগারি বিভাগের আনুকূল্যে ক্লাব সুরা কিনত কম দামে, মেম্বারদের বেচত বেশি দামে। এই প্রথা চলে আসছিল অন্তত শতখানেক বছর ধরে। আমি এটি বন্ধ করে দিই। ইউরোপীয়নরা কেউ ছিলেন না। আর বড় বড় ভারতীয় অফিসর যাঁরা ছিলেন তাঁরা কেউ প্রকাশ্যে সুরা পান করতেন না। গোপনে কী করতেন আমি জানিনে। তা হলে ক্লাব চলবে কীসের টাকায়? শুধুমাত্র মেম্বারদের চাঁদায়? তা সম্ভব নয়। মেম্বার সংখ্যাও কমতে আরম্ভ করে। আমি একাই বিলিয়ার্ড খেলি। টেনিসে দু-চার জন সাথী পাই।

এই সময় আমি বহরমপুর জেলের দিকেও নজর দিই। সেখানকার জেলে প্রচুর শাকসবজি উৎপন্ন হত। সে-সব ভোগ করতেন জেলের কর্মচারীরা। মাঝে মাঝে জেলাশাসক বা জেলা জজকে বা সিভিল সার্জন বা পুলিশ সাহেবকে পাঠিয়ে দেওয়া হত। আমি আদেশ দিলুম উৎপন্ন শাকসবজি বাজারে ন্যায্য দামে বিক্রি করতে হবে। এই প্রথম শহরবাসী জেলের শাকসবজি খেতে পারবে। সে রকম শাকসবজি ছিল বাজারে দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু জেল কর্তৃপক্ষ আমার উপর খুশি হননি।

মার্চ মাসে একদিন চালের উপর থেকে সিলিং উঠে যায়। উঠিয়ে দিলেন নতুন খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন। চালের দাম হু হু করে বেড়ে যায়। আমি সরকারকে বলি আরও চাল পাঠাতে। সরকার পাঠাতে পারে না। ভাগ্যক্রমে সরকারি গুদামে কিছু চাল মজুত ছিল। সেটা আমি পারমিট সিস্টেম করে বন্টন করি। চালের মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য আমি পুলিশ বিভাগকে বলি একসঙ্গে বেশি চাল না কিনতে। সেটাই তাদের রীতি ছিল। পুলিশের মতো জেলও একসঙ্গে অনেক চাল কিনত। আমি তাদের বলি, চালের বদলে তোমরা ধান কেনো, কয়েদিদের বলো ধান ভানতে। তা হলে তোমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারবে। এটা অনুমান করতে পারা যায় যে পাইকারি হারে কেনাকাটায় কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে কিছু পাওয়া যেত। সেটা হারাতে হয়। কেউ খুশি হননি।

একদিন স্বয়ং খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন এলেন বহরমপুর পরিদর্শনে। সঙ্গে অতুল্য ঘোষ। দু জনকে আমাদের বাড়িতে ডিনারের নিমন্ত্রণ করলুম। প্রফুল্লবাবু মাত্র দু খানি রুটি খেলেন। বললেন তার বেশি তিনি খান না। অনেক দিন পরে তাঁর সঙ্গে আর একবার দেখা। তখন আমি চাকরিতে নেই। জিজ্ঞাসা করি, 'আপনি আজকাল ক'খানা রুটি খান?' তিনি বলেন, 'একখানা।' পরে আবার দেখা। জানতে চাই, 'আজকাল ক'খানা?' তিনি বলেন, 'একখানাও নয়। আজকাল আমি সয়াবিন খাই।'

প্রফুল্লচন্দ্র সেন খাদ্যমন্ত্রী হিসাবে দেশের লোককে যা পরামর্শ দিতেন তা নিজে পালন করতেন। আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শেখাই। তাঁকে নিয়ে আমি কয়েকটা ছড়া লিখেছি। তার একটাতে ছিল, চাল কম খান লাল গম খান। সবাই যদি তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করত তা

হলে চালের ঘাটতি হত না। তখন আমি তাঁর উপর রুষ্ট হয়েছিলুম। কেন তিনি আচমকা সিলিং তুলে দিলেন! কিন্তু আমাদের সুসম্পর্ক চিরস্থায়ী হয়েছিল।

প্রফুল্লচন্দ্র সেনের কথায় মনে পড়ে গেল প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের কথা। পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি আদেশ দেন ইংরেজির বদলে বাংলা ব্যবহার করতে হবে। কাজটা যত সহজ মনে হয় তত সহজ নয়। বাংলায় রচনার যে নমুনা দেখা গেল তা ইংরেজির চাইতেও দুর্বোধ্য। অ্যাডভোকেট জেনারেল সে সময় ছিলেন একজন মাড়োয়ারি। যত দূর মনে পড়ছে, খৈতান। সরকারি মামলা প্রসঙ্গে তাঁর কাছে পরামর্শ চাইলে তিনি নোট লিখতেন ইংরেজিতে। ঘোষ মহাশয় মাসকয়েকের মধ্যে পদত্যাগ করেন। তাঁর স্থান নেন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়।

ঘোষ মহাশয় তাঁর সততার জন্য ব্যবসায়ী মহলে অপ্রিয় হন। স্টেটসম্যান পত্রিকা তাঁর সম্বন্ধে লেখে 'A good man goes.' আমি তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করি ও সমবেদনা জানাই। সেই সময় আমি তাঁকে বলি, 'আপনি আবার ফিরে আসবেন। ইতিমধ্যে আপনাকে ভাল করে অর্থনীতি অধ্যয়ন করতে হবে।' তিনি বলেন, 'কেন, অর্থনীতি আমাকে পড়তে হবে কেন? আমি অর্থনীতিবিদদের পরামর্শ নেব।' তখন আমি তাঁকে বলি, 'তাঁরা ঠিক পরামর্শ দিচ্ছেন, না ভুল পরামর্শ দিচ্ছেন সেটা যাচাই করার দায়িত্ব আপনার।'

বহুকাল পরে তিনি একদিন আমার শান্তিনিকেতনের বাসায় এসে উপস্থিত। বলেন, 'আপনাকে রুশো ভোলতেয়ারের মতো লিখতে হবে যাতে এ দেশেও ফ্রান্সের মতো বিপ্লব হয়।' একজন গান্ধীবাদীর এই পরিণতি দেখে আমি বিস্মিত হই।

আসলে বহরমপুরে আমাকে পাঠানো হয়েছিল ভারতের একমাত্র মুসলমানপ্রধান জেলায় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে শান্তি রক্ষা করতে। দিন সাতেকের জন্য মুর্শিদাবাদ পাকিস্তানের সামিল হয়েছিল। তখন হিন্দুরা আশঙ্কায় তটস্থ। সাত দিন পরে মুর্শিদাবাদ হয় ভারতভুক্ত। তখন মুসলমানরা বিড়ম্বিত হয়ে অশান্ত। কয়েকটা থানায় গণ্ডগোল বেধেছে। আবার সব ক'টা থানা থেকে মুসলিম ভদ্রলোকদের বন্দুক কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে আছেন মুর্শিদাবাদ নবাব ঘরানা।

পুলিশের মনে ভয় ঢুকেছে! একদিন আমাদের পুলিশম্যান (পুলিশ সুপারিন্টেডেন্টকে আমরা সিভিলিয়ানরা পুলিশম্যান বলতুম) আমাকে পদ্মানদীতে বোয়ালমারীতে নিয়ে যান। আমাদের দুজনের চোখে binoculour. 'দেখেছেন, দেখেছেন নদীর ওপারে। রাজশাহির জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কুঠির গেটের দু-ধারে দুটো কামান!' তিনি বলেন, 'ওরা সেই কামান দিয়ে আমাদের সঙ্গে লড়বে।' একদা ওই কুঠিতে আমিও ছিলুম। ওই কুঠিতেই আমাদের বড় মেয়ে জয়ার জন্ম। আমি পুলিশম্যানকে অভয় দিই যে লড়াইটা রাজশাহি মুর্শিদাবাদের ব্যাপার নয়, ভারত পাকিস্তানের ব্যাপার। সুতরাং বেশিদূর গড়াবে না।

মাসখানেক বাদে তিরিশে জানুয়ারি। বিনা মেঘে বজ্রপাত। 'Mahatma Gandhi shot dead by a down-country Hindu.' আমি এই কোডেড (coded) টেলিগ্রাম দেখে ভয় পাই। হিন্দুটি বাঙালি নয় তো? পরবর্তী কোডেড টেলিগ্রাম 'Name of assassin Nathuram Godse.' হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। পরদিন সকালে স্বতঃস্ফূর্ত মিছিল। খালি পায়ে আমিও হাঁটলুম সকলের সঙ্গে। হাঁটতে হাঁটতে শুনলুম গত রাত্রে কয়েকটি সুপরিচিত হিন্দু পরিবারে মিষ্টান্ন পরিবেশন হয়েছে। গ্রাম অঞ্চল থেকেও মিষ্টান্ন বিতরণের খবর পেলুম। আমি প্রতিজ্ঞা

করলুম যে আমি গান্ধীজির প্রিয় কর্ম যতটুকু পারি সম্পাদন করব। হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতি সাধন হবে আমারও প্রিয় কর্ম।

দিল্লি থেকে আবার এক কোডেড মেসেজ : রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ করা হল। এই কাজটি গান্ধী নিধনের পূর্বে করা উচিত ছিল। স্বাধীনতার কিছুদিন পরে নবদা দিল্লি ঘুরে এসে আমাকে বলেছিলেন, দিল্লি এখন আর.এস্.এস্.-এর দখলে। ওরাই মেজরিটি, কংগ্রেস মাইনরিটি।

হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতির চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত দেখলুম একদিন পদ্মাতীরে তাঁবু খাটিয়ে রাত জেগে। মাসতুতো ভাইয়েরা এপার থেকে ওপারে চাল পাচার করছেন। ওপারে হঠাৎ আকাশপ্রদীপ জ্বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে এপার থেকে মাল বোঝাই নৌকো রওনা হল। আটক করার জন্য সরকারি কর্মচারী নেই। সেটা আমার কর্তব্য নয়। সেটা কাস্টমসের ব্যাপার। তবে কেউ অভিযোগ করলে আমি প্রতিবিধান করতে পারি।

সে রকম অভিযোগ হল বহরমপুরের দোকান থেকে মাল চালান হচ্ছে, স্থানীয় লোকে কাপড় কিনতে পারছে না। তখন দোকানে কড়া পাহারা বসাতে হয়। যাতে স্থানীয় লোক কাপড় কিনতে পায়।

ইতিমধ্যে কিছু কিছু শরণার্থী ওপার থেকে এসে কোনও কোনও ফাঁকা জায়গায় বসতি করেছে। এ রকম একটি জায়গা দেখতে কলকাতা থেকে মন্ত্রী নিকুঞ্জবিহারী মাইতির শুভাগমন হল। আমার পুলিশ সুপার বিনয় মুখার্জি ও আমি তাঁকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাই। সেখানে এক প্রকাশ্য জনসভায় মন্ত্রীবর বলেন, 'মেদিনীপুরে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় এইসব হিন্দু অফিসররাই শত শত নারীকে ধর্ষণ করেছে।' আমি তো থ। বিনয়বাবু আমার কানে কানে বলেন, 'শুনলেন তো স্যার? আমরা নাকি শত শত নারীকে ধর্ষণ করেছি।'

তখন থেকে আমি স্থির করি যে মন্ত্রীদের পাহারার জন্য অন্য ব্যবস্থা করব। স্বয়ং পাহারাদার হব না। সেই মন্ত্রীর আচরণের রিপোর্ট পাঠানো হয় পুলিশ থেকে।

সেদিন আমরা দুজনে মন্ত্রী মহোদয়কে বহরমপুর শহরে একটি সভাকক্ষে নিয়ে যাই। বেশির ভাগ শ্রোতাই ছিলেন বামপন্থী যুবক। তাঁরা স্লোগান তুলে ও হেক্‌ল্ করে তাঁকে এমন ভয় পাইয়ে দেন যে তিনি আমাদের শরণাপন্ন হন। এই হিন্দু অফিসররাই সেদিন তাঁকে সন্তর্পণে সেখান থেকে বার করে নিয়ে তাঁর মান রক্ষা করে। নইলে সেদিন তিনি নাকাল হতেন।

নিকুঞ্জবিহারী মাইতির মুর্শিদাবাদ আগমনের পূর্বে অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী মহাশয়ের কাছে জানতে চেয়েছিলুম, 'পূর্ববঙ্গের শরণার্থীদের সম্বন্ধে আপনার সরকারের পলিসি কী?' তিনি বলেছিলেন, 'আমরা যদি উৎসাহ দিই তবে ওপারের সব হিন্দুই এপারে চলে আসবে। আমরা তা হলে নাস্তানাবুদ হব।'

কথাটা ঠিক। হিন্দুরা যদি মুসলমানদের সঙ্গে মান-সম্মান নিয়ে বাস করতে না পারে তবে সবাই হয়তো চলে আসতে চাইবে। পশ্চিমবঙ্গে অবশ্য অত লোকের ঠাঁই নেই। কিন্তু সারা ভারতে তো আছে, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে ওরা যেখানেই যাবে সেখানকার ভাষা শিখতে হবে, ছেলেমেয়েদের সেই ভাষায় মানুষ করতে হবে। হিন্দুত্ব বজায় রাখতে গিয়ে বাঙালিত্ব হারাতে হবে। তখন আর তাদের বাঙালি বলে গণ্য করা হবে না। সে যে আরও এক

ট্র্যাজেডি।

ইতিমধ্যে প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রধানমন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। বিধানচন্দ্র রায় মহাশয় প্রধানমন্ত্রী হন। পরে মুখ্যমন্ত্রী আখ্যাটি চালু হয়। কারণ কেবলমাত্র জবাহরলাল নেহরু প্রধানমন্ত্রী। বিধানচন্দ্রের পলিসি কী সেটা তিনি রাইটার্সে অফিসরদের সভা ডেকে বুঝিয়ে দেন।

'ওপার থেকে যারা আসছে তাদের বসিয়ে দিতে হবে সীমান্তের এক-একটি গ্রামে। সেখানে বাস করবে এক-একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজ। এই যেমন চাষি, তাঁতি, কলু, কামার, কুমোর, ধোপা, নাপিত, ময়রা, গয়লা, মিস্ত্রি ইত্যাদি।'

আমি তো হাঁ। সীমান্ত ঘুরে আমি এক টুকরো ফাঁকা জমি দেখতে পেলুম না যেখানে তাঁবু খাটাতে পারি। সর্বত্র ঘন বসতি। তারই মধ্যে একটি কোনায় কোনওমতে মাথা গুঁজি। আস্ত একটা সমাজ উঠে আসবে? গয়লারা আসবে গোরুর পাল নিয়ে? কামার আসবে কামারশাল নিয়ে? কলুরা আসবে ঘানি নিয়ে? এটা স্বদেশি আন্দোলনের সময় ছিল রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের স্বপ্ন। এখন বাস্তব বদলে গেছে।

ডাক্তার রায়ের বক্তৃতা শেষ হতেই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'অসম্ভব! সীমান্তে অত জমি নেই।'

তিনি রেগে গেলেন। বললেন, 'আমরা যা আদেশ করব তা পালন করতে হবে।'

আমিও রেগে বললুম, 'আমি ছুটি নেব।'

'আমরা যদি ছুটি না দিই?' তিনি খেপে গেলেন।

আমি চুপ। তখন অন্য প্রসঙ্গ উঠল।

আমার জেলায় অনেক শরণার্থী এসেছিল। সীমান্তের দিকে কেউ ঘেঁষে না। সদরের দিকেই তাদের টান। সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ। গ্রামে কোথায় অত সুযোগ। আমাকে প্রায়ই তাঁবু নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হত। নদীর নাম যেখানে পদ্মা না হয়ে গঙ্গা সেখানে নিমতিতার জমিদার বাড়ি। যেখানে পদ্মা সেখানে লালগোলার জমিদার বাড়ি। দুটোই দেখানো হয়েছে সত্যজিৎ রায়ের 'জলসাঘর' ফিল্মে। একবার আমি ফারাক্কার গঙ্গায় অবগাহন করে আনন্দ পাই। ফারাক্কার বাঁধ তখনও হয়নি। ভাগীরথীতে প্রাণসঞ্চারের জন্য ফারাক্কায় বাঁধ নির্মাণ আমি সমর্থন করেছিলুম। কিন্তু উত্তরবঙ্গে যাতায়াতের জন্য রেলওয়ে নির্মাণ আমি অসঙ্গত মনে করেছি। নদীকে বহতা না রাখলে রাজশাহি, পাবনা, কুষ্টিয়া শুকিয়ে যাবে। ইংরেজরা যে কাজে হাত দেয়নি সে কাজে স্বাধীন ভারতের হাত দেওয়া অদূরদর্শিতা।

এপার পদ্মা ওপার পদ্মা মধ্যিখানে চর। সেই চরের উপর ফসল ফলায় মুর্শিদাবাদ সীমান্তের চাষিরা। এক দিন এক মুসলমান চাষি আমাকে জানায় সে আগে যেমন অবাধে চাষ করতে চরে যেত এখন তেমন পারে না। রাজশাহি থেকে এক বিহারি মুসলমান একটা ছোট লঞ্চ চালিয়ে তীর ও চরের মাঝখানের স্রোত দাপিয়ে বেড়ায়। দাবি করে স্রোতের মাঝখান পর্যন্ত পাকিস্তানের সীমানা। সেটা টপকালে রাজশাহি এলাকায় প্রবেশ ঘটবে। অনধিকারীকে সে ধরে নিয়ে যাবে।

নদীর দুই স্রোতের মধ্যে যেটা মুখ্য স্রোত সেটা কখনও বয় চরের উত্তর প্রান্তে। যেদিকে রাজশাহি। কখনও চরের দক্ষিণ প্রান্তে। যেদিকে মুর্শিদাবাদ। পার্টিশনের সময় মুখ্য স্রোতটা ছিল চরের দক্ষিণ দিকে। মুখ্য স্রোতের মধ্যরেখা অনুমানসাপেক্ষ। এ নিয়ে কখনও

কোনও বিবাদ বাধেনি। এই প্রথম এক জন পাকিস্তানি চরে যাতায়াতে বাধা দিচ্ছে।

আমাদের কাছে যে-মানচিত্র ছিল তাতে চরগুলির একটা সম্পূর্ণভাবে ও আর দুটো অংশিকভাবে মুর্শিদাবাদে দেখানো হয়েছিল। চাষ হয়েছিল যেখানে সেটা মুর্শিদাবাদের সামিল। এ নিয়ে যে চিঠিপত্র লেখালেখি হয় তাতে পাকিস্তানের তরফ থেকে তর্ক করা হয় যে আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে মুখ্য স্রোতের মধ্যরেখা পর্যন্ত পাকিস্তানের ভাগে পড়ে।

এগারো বছর আগে আমি যখন রাজশাহির জেলাশাসক তখন খোন্দকার আলি তৈয়ব ছিলেন আমার সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। এখন তিনিই সেখানকার জেলাশাসক। আমি তাঁকে চিঠি লিখে বলি যে চরে যারা চাষ করেছে তাদের যেন সেখানে যেতে বাধা না দেওয়া হয়। তিনি আমাকে রাজশাহিতে আমন্ত্রণ করেন।

পদ্মায় জল ছিল না। আমার ওয়েপন ক্যারিয়ার নদী পেরিয়ে আমাকে নিয়ে গেল শহরে। সেখানে আমার সাদর সংবর্ধনা। খোন্দকার সাহেব আমাকে আগেকার মতো 'সার' বলে সম্বোধন করলেন। অন্যান্য আমলারা আমাকে আদর করে খাওয়ান, যেন আমি পরমাত্মীয়।

খোন্দকার আমাকে তাঁর কুঠিতে নিয়ে যান। সেটা ছিল আমারও কুঠি। আমার বড় মেয়ে জয়া সেখানে ভূমিষ্ঠ হয়। কথাবার্তায় এই স্থির হল যে আমরা দুজনে একত্র চর পরিদর্শন করব ও চাষিদের দাবিদাওয়া মেটাব। তিনি ছিলেন সত্যিকার সজ্জন। আমার শ্রদ্ধার পাত্র। তা ছাড়া তিনি ছিলেন মুর্শিদাবাদের সন্তান। মুর্শিদাবাদের মুসলিম চাষিদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি স্বাভাবিক। এর মধ্যে কোনও হিন্দু জড়িত ছিল না। হিন্দু বলতে একমাত্র আমি।

কিছু দিন পরে খবর পেলুম খোন্দকার সাহেব বদলি হয়ে গেছেন। তাঁর জায়গায় এসেছেন এক পশ্চিমা মুসলমান। তিনি অল্পবয়সী ও সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তাঁর মনোভাব মিটমাটের পক্ষে অনুকূল নয়। আমি পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট বিনয় মুখার্জিকে বললুম ওই পাকিস্তানি লগুটাকে আটক করতে।

তিনি সন্ত্রস্তভাবে বললেন, 'সার, পুলিশ কি মরতে এসেছে? আমাদের কাজ ছিল চোর-ডাকাত ধরা। তারপর বলা হল টেররিস্ট ধরতে। এখন আপনি বলছেন পাকিস্তানি পাকড়াতে। এ নিয়ে ভীষণ গোলমাল বেধে যাবে। এক জনও পুলিশ যদি মারা যায় তবে সমগ্র পুলিশবাহিনী বি-বি-বিদ্রোহ করবে।'

আমারও রোখ চেপে যায়। আমি উপরওয়ালাদের লিখলুম মিলিটারি পাঠাতে। একদিন কলকাতা থেকে এক ব্রিগেডিয়ার এসে উপস্থিত। লীলা ও আমি তাঁকে মধ্যাহ্নভোজনে নিমন্ত্রণ করলুম। ব্রিগেডিয়ারটি মহারাষ্ট্রীয়। তাঁর নাম ভুলে গেছি। তিনি বললেন, 'আমি তিন-তিনটে যুদ্ধে লড়াই করেছি। কিন্তু এখন এ দেশে আমার মতো অহিংসাবাদী আর কেউ নেই। আমি আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি, আপনি মিলিটারিকে ডাকবেন না।'

আমি তখন আবার উপরওয়ালাদের চিঠি লিখলুম। তখন আগমন করলেন লেফটেনান্ট জেনারেল লখীন্দর সিং। তিনি বললেন, 'আমাদের এক জনও সৈন্য যদি মারা যায় তা হলে আমাদের প্রেস্টিজে বাধবে। তখন পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ অনিবার্য। আমি আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি আপনি মিলিটারিকে না ডেকে আর্মড পুলিশকে ডাকুন।'

তখন আমি আবার উপরওয়ালাকে লিখলুম। এবার বেশ কিছু সশস্ত্র পুলিশ এসে হাজির হল। আমাকে দেখাল কাকে বলে ব্রেনগান, কাকে বলে স্টেনগান। এখন এদের সামলাবে কে? ডিভিশনাল কমিশনার ছিলেন যতীন্দ্রনাথ তালুকদার, আই সি এস। তিনি বললেন, সশস্ত্র পুলিসকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করে পাঁচ জন কম্যান্ডারের জিম্মায় দিতে। সেই পাঁচ জন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। এখন ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সার্ভিসে নিযুক্ত হয়েছেন। আপাতত বিভিন্ন জেলায় অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি সেই পাঁচজনকে মুর্শিদাবাদে বদলির ব্যবস্থা করলেন।

একে একে এলেন উইং কমান্ডার ভি এফ সি বনার্জি, লেফটেনান্ট কর্নেল আইভান সুরিটা (আর্মেনিয়ান), মেজর এস কে ব্যানার্জি, মেজর বি সি গাঙ্গুলি ও ক্যাপ্টেন জে সি তালুকদার। এঁরাই হলেন আমার পঞ্চ পাণ্ডব। ব্যানার্জিকে রাখলুম সদরে। তিনি এয়ারফোর্সের লোক। তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল আশমানের, জমিনের নয়। বাকি চার জনকে সরেজমিনে পাঠানো হল। তিনটে চর আমরা দখল করব যখন বন্যার জল নেমে যাবে ও মাটি জেগে উঠবে। আমরাই যদি প্রথম দখল করি তা হলে চর আমাদের। এটা বিনা রক্তপাতে সম্ভব। তবে ওরা যদি লড়তে চায় তখন দেখা যাবে।

এখন এই চর অপারেশনের জন্য লঞ্চের দরকার হল। আমি লঞ্চের জন্য চিঠি দিলুম। পার্টিশনের সময় পশ্চিমবঙ্গের লঞ্চগুলো মোতায়েন ছিল খুলনায়, একটি কি দুটি বাদে। খুলনা পাকিস্তানে চলে যাওয়ায় লঞ্চগুলো হাতছাড়া হল। আমি আশা করেছিলুম আমার চেনা লঞ্চ কলকাতা থেকে বহরমপুরে আসবে। তার বদলে এল একটার পর একটা নেভির লঞ্চ। বেশির ভাগই যাকে বলে ট্যানাক (Tanac)। এগুলো আমাদের কোনও কাজে লাগবে না। এগুলোতে মানুষের জন্য খুব কম জায়গা। আর একটা বড়সড় লঞ্চ এল। তার নাম পমফ্রেট। তাতে দু-চার জনের জায়গা হতে পারে।

এখন এই সব লঞ্চের লস্কর যারা তারা সবাই চট্টগ্রাম-নোয়াখালির মুসলমান। তাদের দেখে তাদের কোনও কোনও সহযোগী আমাকে বলেন, 'মুসলমানদের আপনি বিশ্বাস করেন? তাও পাকিস্তানি মুসলমান? এইসব লঞ্চ যখন পদ্মায় পড়বে তখন ওরা এগুলো নিয়ে পাকিস্তানে চলে যাবে।'

আমি বললুম, 'এরা ইন্ডিয়ার জন্য অপশন দিয়েছে। কারণ ইন্ডিয়াতেই ওদের দানাপানির সুযোগ বেশি। এই লঞ্চগুলো এরা ছাড়া কেউ চালাতে পারবে না। কাজেই এদের বিদায় দিলে লঞ্চগুলোকে বিদায় দিতে হয়।'

তখন ওঁরা বলেন, 'মাদ্রাজ উপকূলে হিন্দু লস্কররা আছে। তারাই এসে লঞ্চ চালাবে।'

আমি বললুম, 'তত দিনে আমাদের চর-অপারেশনের সময় পেরিয়ে গিয়ে থাকবে। তা ছাড়া আমি গভর্নমেন্টকে বোঝাব কী করে যে মুসলমানরা অবিশ্বাসী আর হিন্দুরাই বিশ্বাসী? তাই যদি হয় তা হলে চর-অপারেশনের ব্যবস্থা কাদের স্বার্থে?'

পমফ্রেট গভীর জলের লঞ্চ। পদ্মায় পড়ে সে চরে ঠেকে গেল। তাকে কিছুতেই নড়ানো গেল না। সে খুব ভারী ধাতু দিয়ে তৈরি। হঠাৎ যদি বন্যা আসে তা হলেই পমফ্রেট তৎক্ষণাৎ ভেসে উঠবে ও ভাসতে ভাসতে বঙ্গোপসাগরে পৌঁছবে। তখন আমাদের লজ্জার সীমা থাকবে না। তাই আনন্দের সঙ্গে বিস্মিত হলুম যখন শুনলুম যে লস্কররা তাকে ডাঙায় টেনে এনেছে। ভেসে যাওয়ার ভয় নেই। দেখা গেল মুসলমান লস্কররা ভারতের সম্মান

রেখেছে। তারা এইভাবে তাদের বিশ্বস্ততার পরিচয় দিল।

অনেক লেখালেখির পর কলকাতা থেকে আনাতে পারলুম আমার সেই পূর্ব-পরিচিত লঞ্চ যাতে চড়ে আমি নদিয়ার জেলাশাসক হিসাবে বন্যা পরিদর্শনে বেরিয়েছিলাম বারো বছর আগে। সঙ্গে ছিলেন সার নাজিমউদ্দিন ও খান বাহাদুর আজিজুল হক। এ বার আমি সেই লঞ্চে বেরিয়ে পড়লুম। সঙ্গে লীলা।

বহরমপুর থেকে রওনা হয়ে ভাগীরথী উজিয়ে আমরা যখন নুরপুরে পৌঁছলুম তখন দেখলুম পশ্চিমে গঙ্গা আর পুবে পদ্মা। একই নদীর দুই নাম। এতক্ষণ যে পদ্মার তিন চরের কথা বলেছি সেটা ঠিক নয়। একটা চর গঙ্গার। সেটা নিমতিতার উত্তরে।

নিমতিতার জমিদারবাড়িতে একটা মহল নিয়ে জমিয়ে বসেছিলেন লেফটেনান্ট কর্নেল সুরিটা। নদীর তীরে মোতায়েন হয়েছিল একদল সশস্ত্র পুলিশ। আর একদল চরের প্রান্তে। একদিন মাঝরাত্রে সুরিটার কাছ থেকে পুলিশ ওয়্যারলেস মেসেজ। 'দু শো রাউন্ড গুলি চলেছে। শিগগির আসুন।'

এই ঘটনাটা আমার লঞ্চ যাত্রার আগেকার। তখন বহরমপুরের নদীতে জল কম ছিল। ওয়েপন ক্যারিয়ারে চড়ে নদী পার হয়ে সোজা চলে গেলুম নিমতিতা। পৌঁছলুম ভোরবেলা। সুরিটাকে জিজ্ঞাসা করলুম ব্যাপারটা কী! ব্যাপার যা শুনলুম তা যেমন ভয়ংকর তেমনই হাস্যকর। গুলি চালিয়েছে চরের দিক থেকে তীরের দিকে আমাদেরই একদল পুলিশ। আর তীরের দিক থেকে চরের দিকে গুলি চালিয়েছে আমাদেরই আর একদল পুলিশ. এরা ভাবছে ওরা পাকিস্তানি, ওরা ভাবছে এরা পাকিস্তানি।

ইতিমধ্যে চর জেগে উঠেছিল। চরের পুলিশের সন্দেহ হল অন্ধকারে কারা যেন পা টিপে টিপে এগুচ্ছে। তারা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে গুলি চালিয়ে দিল। খেয়াল ছিল না যে গুলি চলে গেল তীরের দিকে। আর তীরের পুলিশও তেমনই দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য. তারা গুলি চালিয়ে দিল চরের দিকে। ভোরবেলা ঘুরেফিরে দেখা গেল শত্রুদের পায়ের চিহ্ন নেই। মরে পড়ে আছে একটি বাছুর। সে বেচারি কেমন করে দলছুট হয়ে চরের পুলিশের কাছাকাছি এসেছিল। আমরা এই নিয়ে হাসাহাসি করছি। এমন সময় একদল গোয়ালা এসে হাজির। সঙ্গে একপাল গোরু। তারা রাত্রে চরে এসেছিল গোরু চড়াতে, নতুন ঘাস গজিয়েছে এই খবর পেয়ে। তারা নালিশ করে, তাদের বাছুর কে মারল! খেসারত দিতে হবে।

এর মধ্যে আমাকে বার বার কলকাতায় গিয়ে চিফ সেক্রেটারি ও তাঁর পরে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হয়েছিল। একবার বিধানচন্দ্র কিরণশঙ্করকে টেলিফোন করে বললেন, 'প্রিন্স অব ডেনমার্ক এসেছেন।' কিরণশঙ্কর তাঁর ঘর থেকে আসেন মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে। আমি যে কাজে হাত দিয়েছি সে কাজে বিধানচন্দ্র পূর্ণ সমর্থন জানান। এবং আমার প্রত্যেকটি প্রয়োজন মঞ্জুর করেন।

কলকাতা থেকে ফিরে আমি আরও পাঁচ রকম কাজে ব্যস্ত ছিলুম। একদিন আবার ডাক পড়ল কলকাতায়। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে। শিয়ালদা স্টেশনে নেমে একখানা খবরের কাগজ কিনলুম। তাতে পড়লুম পশ্চিমবঙ্গ থেকে মুসলমানদের তাড়িয়ে দেওয়া হবে এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। সরকারের তেমন কোনও অভিপ্রায় নেই।

যথাকালে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করি। সেখানে দেখি তিনি ছাড়া রয়েছেন হোম সেক্রেটারি রণজিৎ গুপ্ত ও নদিয়ার জেলাশাসক রণজিৎ কুমার রায়।

মুখ্যমন্ত্রী আমাকে অবাক করে দিয়ে বললেন, 'অমুক তারিখের মধ্যে সীমান্তের মুসলমানদের খেদিয়ে দিতে হবে।' রণজিৎ রায় বললেন, এত আগে সেটা সম্ভব হবে না, আরও সময় চাই। তখন মুখ্যমন্ত্রী আরও সময় বাড়িয়ে দিলেন। আমি হতভম্ব। মুখ ফুটে হ্যাঁ না কিছু বললুম না।

ঘর থেকে বেরিয়ে আসার পর রণজিৎ রায়কে বললুম, 'রক্তপাত হতে পারে। লিখিত আদেশ চাই। আপনি ভিতরে গিয়ে সেটা নিয়ে আসুন।' তিনি ভিতরে গিয়ে হোম সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বললেন। হোম সেক্রেটারি জানালেন, লিখিত আদেশ দেওয়া হবে না।

আমি বহরমপুরে ফিরে যাই ও চর-অপারেশনে মন দিই।

চর-অপারেশন একদিন সত্যি সত্যি আরম্ভ হয়ে গেল। মেজর ব্যানার্জি নিমতিতার সেই চর সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে দখল করলেন ও ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন। খবর পেয়ে আমি ছুটে গেলুম নিমতিতায়। উৎসাহের আতিশয্যে পুলিশ ওয়্যারলেস যোগে খবরটা জানিয়ে দিলুম হোম সেক্রেটারিকে।

কিছু দিন পরে কলকাতা থেকে বার্তা এল হোম মিনিস্টার কিরণশঙ্কর রায় চর পরিদর্শনে আসছেন। লালগোলার মহকুমাশাসক মহেন্দ্রনাথ চৌধুরীর উপর ভার দিলুম লালগোলা ঘাট স্টেশনের অদূরে নদীর ধারে রেলওয়ের একটি ফ্ল্যাটে তাঁর এলাহি অভ্যর্থনার।

সেই অভ্যর্থনার খরচটা মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী তুলেছিলেন স্থানীয় মুসলমান প্রধানদের কাছ থেকে। তাঁদের কিন্তু ফ্ল্যাটে প্রবেশ ছিল না। কলকাতা থেকে মন্ত্রীর সঙ্গে এসেছিলেন মন্ত্রীর দলবল। তথা প্রেসিডেন্সি ডিভিশনের কমিশনার মিস্টার জে এন তালুকদার মহাশয়। বহরমপুর থেকে কয়েকজন কংগ্রেস কর্মী এসে মধ্যাহ্নভোজকে সমৃদ্ধ করেছিলেন।

ভোজনের পর মন্ত্রী মহোদয় ও কমিশনার সাহেব একটি রুদ্ধদ্বার ক্যাবিনে বিশ্রাম করেন। আমি বাইরে থেকে যাই অন্যান্য অভ্যাগতদের সঙ্গে আলাপ করতে।

হঠাৎ শুনতে পেলুম একজন কংগ্রেস কর্মী বলছেন অপর একজন কংগ্রেস কর্মীকে, 'দিল্লি থেকে টেলিফোন এসেছে কলকাতায়, ও তো এখন দেশের বাইরে, যা করবার এই বেলা করে নাও।'

আমার মনে হল কথাটা হচ্ছে নেহরুকে নিয়ে। তিনি তখন দেশের বাইরে। যা করবার তা হল সীমান্ত থেকে মুসলমান তাড়ানো। আমি ইতিমধ্যে দিল্লি থেকে নেহরুর একটা সার্কুলার পেয়েছিলুম। কোনও জেলায় যদি মুসলিম পেটানো হয় তা হলে তার জন্য জেলাশাসককে দায়ী করা হবে। কংগ্রেস কর্মীদের ওই কথোপকথন শুনে আমি সতর্ক হয়ে যাই। এমন সময় ডাক আসে মন্ত্রী মহোদয়ের রুদ্ধদ্বার ক্যাবিন থেকে।

তাঁরা দুজনে আমার সঙ্গে খুবই সদ্ব্যবহার করেন। কিরণশঙ্কর রায় বলেন, 'আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে শুনছি পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ আসন্ন। যুদ্ধের সময় সীমান্তের মুসলমানরা শত্রুপক্ষের চর হতে পারে। সুতরাং তাদেরকে এখন থেকেই তাড়িয়ে দেওয়া দরকার। এই কাজটি কি আপনি করতে পারবেন? তা হলে আপনাকে যুদ্ধের শেষে রাজশাহির জেলাশাসক করে দেওয়া হবে।'

আমি মনে মনে হাসি। মন্ত্রী মহাশয় জানেন না যে আমি রাজশাহির জেলাশাসক

ছিলুম এগারো বছর আগে। আমি দৃঢ়কণ্ঠে বললুম, 'আমি ইস্তফা দেব, কিন্তু অমন অপকর্ম করব না।'

তিনি চমকে উঠে বললেন, 'কেন, অপকর্ম কেন?'

আমি বললুম, 'হাজার হাজার লোককে বেআইনিভাবে খেদিয়ে দিতে গেলে রক্তপাত হবে।'

তিনি বললেন, 'হোক না, হোক না।'

আমি বললুম, 'রক্তপাতের দায়িত্ব আমি নিতে পারব না। তা হলে এমন হইচই শুরু হয়ে যাবে যে আপনারাও আপনাদের পলিসি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হবেন। ইতিমধ্যে যে অনর্থ ঘটে যাবে সেটাকে অঘটিত করতে পারা যাবে না।'

এবার কমিশনার সাহেব মুখ খুললেন। 'দেখুন, ওপার থেকে হাজার হাজার হিন্দু শরণার্থী আসছে। তাদেরকে স্কুইজ করে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমরা এটা কত দিন সহ্য করতে পারি? আমরাও এপার থেকে পালটা চাপ দেব।'

আমি বললুম, 'যুদ্ধ বাধলে আমি শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে তৈরি। কিন্তু এরা তো শত্রু নয়। আমাদের অনুগত নাগরিক। কেমন করে আমি এদের গায়ে হাত দিই?'

তখন মন্ত্রী বললেন, 'তা হলে আপনিই বলুন আমাদের পলিসি কী হওয়া উচিত?'

আমি বললুম, 'যারা আসছে তাদেরকে আশ্রয় দিন। পশ্চিমবঙ্গে যদি তাদের সবাইকে না রাখতে পারেন তা হলে অন্যান্য রাজ্যে পাঠিয়ে দিন। তাঁরা আশ্রয় দিতে বাধ্য। কারণ তাঁরাও পার্টিশনের জন্য দায়ী।'

তখন মন্ত্রী বললেন, 'ওরা যদি অন্য কোথাও যেতে রাজি না হয়?'

আমি বললুম, 'তা হলে আমি কী করতে পারি?'

মন্ত্রী উত্তপ্ত হয়ে বললেন, 'আপনাকে পলিসি ঠিক করতে কে বলেছে? আমরাই পলিসি ঠিক করব। আপনি ক্যারি আউট করবেন কি করবেন না?'

আমি বললুম, 'আমি ক্যারি আউট করব না। ইস্তফা দেব। I am a man with an all India reputation. Do you think I shall starve?'

তখন মন্ত্রী বললেন, 'আপনি যেতে পারেন।'

আমি স্বস্থানে ফিরে এলুম। তাঁরাও চলে গেলেন তাঁদের জন্য রক্ষিত রেলওয়ে সেলুনে। বিকেলবেলা তাঁদের জন্য চায়ের আয়োজন করা হয়। কিন্তু তাঁরা চা খেতে আসেন না।

ফ্ল্যাটের বাইরে নদীর ধারে দাঁড়িয়েছিলেন মুসলমান প্রধানরা। কমিশনারকেও দেখলুম সেলুনের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে। তাঁকে শুনিয়ে শুনিয়ে মুসলমানদের বললুম, 'আপনারা নির্ভয়ে বাস করুন। আমি থাকতে আপনাদের গায়ে কেউ হাত দেবে না।' বুঝতে পেরেছিলুম কর্তাদের আসল কথা। সীমান্তের মুসলমানদের হটিয়ে শরণার্থী হিন্দুদের বসানো।

ডিনারের সময় মন্ত্রী ও কমিশনার সেলুনের বাইরে এলেন না। তাঁদের খাবার আমি সেলুনে পাঠিয়ে দিই। তাঁদের প্রস্থানের সময় হলে আমি রাত দশটার সময় তাঁদেরকে বিদায় সম্ভাষণ জানাই। মন্ত্রী মহাশয় বিদ্রূপের স্বরে প্রতি-সম্ভাষণ করেন।

বহরমপুরে ফিরে এসে গৃহিণীকে বলি তৈরি থাকতে। দু দিন বাদে খবর পেলুম যে

আমার জায়গায় অশোক মিত্র, আই সি এস আসছেন।

কিছু দিন পরে কলকাতা থেকে টেলিফোন এল, চিফ সেক্রেটারি জানতে চান আমি আজমিরের জুডিসিয়াল কমিশনারের পদ নিতে রাজি কিনা। পদটা হাইকোর্ট জজের সমান। বাংলার বাইরে যেতে আমার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না। লীলা বললেন, বছর তিনেকের জন্য বাংলার বাইরে যাওয়াই ভাল। এই রাজ্যে গণ্ডগোল বাধবে।

আমি চিফ সেক্রেটারিকে জানিয়ে দিই যে আমি রাজি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পদটা ফসকে যায়। তখন এই স্থির হয় যে আমি কলকাতাতেই আমার পুরোনো পদে ফিরে যাব। কিন্তু এক মাসের আগে বাসা খালি পাওয়া যাবে না। সেই এক মাস আমাকে ছুটি নিতে হবে।

অশোক মিত্রকে আমি যেদিন মুর্শিদাবাদ জেলাশাসকের ভার দিই তার এক দিন কি দুদিন আগে হোম সেক্রেটারি চিঠি লিখে জানালেন, আমাকে যে আদেশ দেওয়া হয়েছিল সেই আদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে। তার মানে সীমান্ত থেকে মুসলিম খেদাতে হবে না। তার বদলে আমিই খেদিত হব।

জেলা জজের বাড়ির দোতালাটা খালি ছিল। জজসাহেব মণীন্দ্রনাথ গণ ও তাঁর পত্নী সুলেখাদেবী দয়া করে আমাকে সপরিবারে দোতলায় থাকতে দেন। একটা মাস আমি শুয়ে শুয়েই কাটিয়ে দিই। কারণ ভীষণ ক্লান্ত ছিলুম। ইতিমধ্যে একদিন আমাকে বিদায় সম্বর্ধনা দেন একদা অধীনস্থ অফিসরগণ।

দুঃখের বিষয় এবার বহরমপুরে আমি কদাচিৎ সাহিত্যের জন্য সময় পেতুম। সেখানে কর্মসূত্রে আলাপ হয় কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের সঙ্গে। সাধারণের ধারণা তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী নন, কিন্তু সে ধারণা ভুল। তিনি পরম ঈশ্বরবিশ্বাসী। আমাকে উপহার দেন তাঁর 'রথী ও সারথি' নামক কাব্যগ্রন্থ। রথী অর্জুন সারথি শ্রীকৃষ্ণ। একই কালে তিনি গান্ধীপন্থী রাজনীতির পক্ষপাতী। গান্ধী নিধনে বজ্রাহত।

বহরমপুর স্টেশন থেকে যেদিন কলকাতা রওনা হই সেদিন কিন্তু কেউ আমাকে বিদায় দিতে আসে না। ট্রেন যখন বেলডাঙা স্টেশনে থামে তখন এক জন অচেনা মুসলমান আমার কামরায় উঠে এক হাঁড়ি রসগোল্লা রেখে নেমে যান। নাম জানতে চাইলে বলেন কাদের বক্স্। একেই বলে মধুরেণ সমাপয়েৎ।

পাঁচ

আমার ভাল করেই জানা ছিল যে সরকারি কর্মচারী যদি সরকারের আদেশ ক্যারি আউট না করে তো শাস্তি অবধারিত। কিন্তু সরকারি আদেশ পালন করতে গেলে যদি হাজার হাজার মানুষ বাস্তুহারা হয় ও তাদের কারও কারও বল্লম বা সড়কির আঘাতে যদি এক জনও পুলিশ নিহত হয় তবে গোটা পুলিশবাহিনী আমার বিরুদ্ধে বি-বি-বিদ্রোহ করবে। আর পুলিশের গুলিতে যদি দশ জন মুসলমান নিহত হয় তো গোটা মুসলিম সমাজ আমার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামবে। আমিও প্রমাণ করতে পারতুম না, কর্তারাও স্বীকার করতেন না যে তাঁরা মৌখিক আদেশ দিয়েছিলেন। আমার চাকরিটাই যাবে। তার চেয়ে অনেক ভাল মানে মানে ইস্তফা দেওয়া।

প্রথম কথা, ভারতীয় নাগরিকদের আইন অনুসারে deport করা যায় না। দ্বিতীয় কথা

কারও বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ না থাকলে warrant ইস্যু করা যায় না। বিনা warrant-এ কাউকে গ্রেফতার করলে তাকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করতে হবে। ইংরেজরা বলে, 'An Englishman's home is his castle.' বিনা পরোয়ানায় তার দুর্গে প্রবেশ করলে সে অনধিকার প্রবেশকারীকে হত্যা করতেও পারে। হত্যা করলে তার সাজা হবে না। এ নিয়ম ভারতের মাটিতে ভারতীয় নাগরিকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। পুলিশ যদি বিনা পরোয়ানায় মুসলমানদের ঘরে ঢুকে তাকে ধরে বা তার বিবির গায়ে হাত দেয় তো সে ছোরা বা কাটারি বা তরোয়াল দিয়ে পুলিশের মৃত্যু ঘটাতে পারে। তা হলে তার সাজা হবে না।

সাজা যদি পেতেই হয় তবে আদেশ পালন না করার জন্য সাজাই শ্রেয়। সেটা এল বদলির অর্ডাররূপে। কলকাতায় বদলি তো শাপে বর। লীলা খুশি। পুণ্য সিট পেয়ে যায় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে, আনন্দ বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুলে, জয়া কমলা গার্লস স্কুলে, তৃপ্তি মহাদেবী বিড়লা শিশু বিদ্যালয়ে। এমন সৌভাগ্য তো মুর্শিদাবাদে ছিল না। মন্ত্রীদেরকে আমার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।

আর একটু খুলে বলি। মহাত্মা গান্ধী হিন্দু মুসলমান একতার জন্য প্রাণ দিলেন। আমি প্রাণ দিতে পারব না, কিন্তু তার চেয়ে কম কিছু দিতে পারব। দেওয়া উচিত। ফল যতটুকু হয় হবে। দ্বিজাতিতত্ত্ব আমি কিছুতেই মেনে নেব না। লোক বিনিময় আমি কিছুতেই সমর্থন করব না। দেশভাগ যেন একখানা শাড়িকে দু-খণ্ড করা। লোকভাগ টানা ও পোড়েনকে আলাদা করা। সুতরাং পরনের অযোগ্য।

দুঃখের বিষয় কিরণশঙ্কর রায় অল্পদিনের অসুখে মারা গেলেন। তাঁর শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ পেয়ে তাঁর বাসভবনে গিয়ে তাঁর পুত্র কল্যাণশঙ্করকে সমবেদনা জানিয়ে আসি। অফিসরমহল আমার প্রতি বিরূপ। আমি যেন কত বড় অপরাধ করেছি। হাজরার মুখে শুনি যে ক্যাবিনেট মিটিঙে মন্ত্রীরা মুর্শিদাবাদের খবর শুনে আমার সম্বন্ধে একবাক্যে বলেন, 'এক্ষুনি তাড়াও।'

হাজরা আমাকে তাঁর অভিমত জানান, 'আপনি আয়রন হ্যান্ডে শাসন করেছেন।'

আমি জানাতে পারতুম, 'আমার হাতে ভেলভেট গ্লাভসও ছিল।' মুর্শিদাবাদের এক গ্রামে গোয়ালারা মুসলিম চাষিদের খেতে গোরু চরতে দেয়। চাষিরা গোরু খোঁয়াড়ে দিলে গোয়ালারা চাষিদের ঘর জ্বালায়। গোয়ালাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে পুলিশ। তখন কয়েকজন স্থানীয় কংগ্রেস কর্মী এসে গোয়ালাদের বিনা বিচারে খালাস দিতে বলেন আমাকে। আমি বলি, 'ওরা নিজেদের খরচে পোড়া ঘর সারিয়ে দিলে ওদের লঘুদণ্ডের জন্য সুপারিশ করতে পারি, কিন্তু খালাসের জন্য নয়।' কংগ্রেস কর্মীরা আমার উপর চাপ দিতে ব্যর্থ হন। মামলা যথারীতি চলে। গোয়ালারা জেল হাজতে থাকে। আমি মামলা প্রত্যাহারের নির্দেশ দিইনে।

মুর্শিদাবাদ প্রসঙ্গে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। জিয়াগঞ্জে একটি বেসরকারি জেনানা হাসপাতাল ছিল। সেটি ইউরোপীয় খ্রিস্টান মিশনারিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। প্রথমবার যখন বহরমপুর যাই একজন ইউরোপীয় মিশনারি আমার কাছ থেকে প্রথম মাসের মাইনের ষোলো ভাগের এক ভাগ চাঁদা হিসেবে নিয়েছিলেন। পরিচালনা করতেন একজন ইউরোপীয় মহিলা ডাক্তার। আঠারো বছর পরে দেখি তাঁর স্থান নিয়েছেন এক বাঙালি খ্রিস্টান মহিলা।

লীলার সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। নারী ও শিশুর সেই হাসপাতালের ভূমিকা ছিল সুদূরপ্রসারী।

জিয়াগঞ্জ ও আজিমগঞ্জ ছিল রাজস্থানি জৈন বণিকদের বাসস্থান। নাহার, দুগার, সিংহি, দুধোড়িয়া প্রভৃতি পদবিধারী এঁরা। প্রত্যেকের নামের সঙ্গে সিং কথাটি যুক্ত থাকে। যেমন বিজয় সিং নাহার, ইন্দ্র সিং দুগার। এঁরা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে দাবি করেন। তিন-চার পুরুষ ধরে বাংলা দেশের বাসিন্দা, কিন্তু বিবাহাদি রাজস্থানে।

একদিন দিলীপকুমার রায় পণ্ডিচেরি থেকে কলকাতায় আসেন। দিলীপদাও আমার অতি প্রিয় বন্ধু। তিনি বলেন, 'চলো তোমাকে নিয়ে যাই আনন্দময়ী মায়ের আস্তানায়। ভারতে যে সাত-আটজন সত্যিকারের সাধুসন্ত আছেন তিনি তাঁদের একজন।' একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমি দিলীপদার সঙ্গী হলুম। আনন্দময়ী মা আমাকে তাঁর পাশে বসিয়ে দু-চার কথা বললেন, বাকিটা দিলীপদার সঙ্গে। তাঁর কথা শুনে আমার বিশ্বাস হল যে তিনি সত্যিই কিছু উপলব্ধি করেছেন। তাঁর কথাগুলি শেখানো কথা বা পুঁথিপড়া কথা নয়।

পরে একদিন সকালবেলায় কোনও এক ভক্তের অনুরোধে আবার আমি মাকে দেখতে যাই। বহু ভক্ত সমবেত হয়েছিলেন একটা খোলা জায়গায়। মা তাঁদের প্রত্যেকের কাছে গিয়ে কুশল প্রশ্ন করেন ও অনেক মিষ্টি কথা বলেন। যেন তিনি সত্যিকারের মা। সেসব কথা তত্ত্বকথা নয়, ঘরোয়া কথা। কিংবা বলা যেতে পারে তিনি তত্ত্বতালাশ করেন এবং সেইভাবে সকলকে আপনার করে নেন। সন্তানরাও এটা-ওটা আবদার করেন। তাঁরা সকলেই প্রাপ্তবয়স্ক, কেউ কেউ প্রৌঢ় বা প্রৌঢ়া। দু'-একজন বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা। সকলের কাছে তিনি আনন্দময়ী মা।

ওদিকে সাহিত্যের পাট মাথায় উঠেছিল। আমি যে একজন সাহিত্যিক সেটা আমি প্রমাণ করতে পারছিলুম না। ভেবে দেখলুম আমার জায়গায় সরকারি কাজ করার জন্য আরও অনেক যোগ্য লোক আছেন। কিন্তু আমি যে সব বই লিখতে চাই সে সব লেখবার মতো আর কেউ নেই। আমি না লিখলে সে সব অলেখা থেকে যাবে। সুতরাং বল বয়স থাকতে থাকতে অবসর নিয়ে চলে যাওয়াই বিজ্ঞতা। আনুপাতিক পেনশন তো আটশো-নশো টাকার মতো। জীবনযাত্রার ব্যয় সংকোচ করলে সেটা কি যথেষ্ট নয়? বই লিখেও তো কিছু পাওয়া যাবে। আমার man of action হবার সাধ মুর্শিদাবাদেই মিটেছিল।

একদিন জবাহরলাল নেহরু কলকাতায় আসেন। তাঁর জনসভায় আমিও উপস্থিত হই। সেখানে সুকুমার সেনের সঙ্গে দেখা। তিনি আপনা থেকে বলেন, 'রায়, আপনার কথা আমি পণ্ডিতজিকে জানিয়েছি। আর হোম সেক্রেটারি আয়েঙ্গারকেও জানাব।'

আমি বলি, 'কেন? কী দরকার?'

তিনি বলেন, 'আপনার উপর অবিচার হয়েছে।'

আমি বলি, 'আমার সাহিত্যের কাজের ক্ষতি হচ্ছে। আমাকে আপনারা রেহাই দিন।'

তিনি কী করলেন জানিনে। একদিন গভর্নর ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজু আমাকে ডেকে পাঠালেন। দু-এক কথার পর বললেন, 'আপনি ইস্তফার হুমকি দিলেন কেন? ছুটি চাইলে পারতেন?'

আমি উত্তর দিলুম, 'মুখ্যমন্ত্রী আগে একবার বলেছিলেন তিনি ছুটি মঞ্জুর না-ও করতে পারেন।'

ডক্টর কাটজু বললেন, 'আমি Constitutional Governor। আমি নির্বাচিত সরকারের

কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারি না।'

আমি বললুম, 'নির্বাচিত সরকার যদি অন্যায় আদেশ দেয় ও পার্মানেন্ট সিভিল সারভেন্ট যদি সে আদেশ পালন করতে না পারেন তবে আপনি কি তাঁকে প্রোটেকশন দেবেন না? যদি না দেন তবে পার্মানেন্ট সিভিল সারভেন্টদের হারাবেন। আপনি দেখবেন আমি সত্যিই একদিন ইস্তফা দেব।'

ইস্তফা দিলুম ঠিকই, কিন্তু মন্ত্রীদের সঙ্গে মতভেদের ইস্যুতে নয়। মন্ত্রীরা যখন আদেশ প্রত্যাহার করলেন তখন আমারই তো জিত হল। কলকাতায় বদলিও তো আমার পক্ষে শাপে বর। এর সঙ্গে অপমান জড়িত ছিল না।

সুকুমার সেন একদিন আমাকে জানান ওড়িশা সরকার ডিভিশনাল কমিশনার পদের জন্য একজন সিনিয়র অফিসর চান। তিনি আমার নাম সুপারিশ করবেন কি? আমি রাজি হইনে। আমার সমস্যাটা আরও ভাল চাকরির নয়, আরও বেশি অবসরের। এ সমস্যা মেটানোর সাধ্য কারও নেই। আমি যতই সিনিয়র হচ্ছি ততই আমার উপর আরও দায়িত্ব চাপছে।

Commissioner Workmen's Compensation; President, Agricultural Income Tax Tribunal; Judge, Goondas' Act– এই সব বোঝা বইতে বইতে একদিন আমার শরীর বেঁকে বসে। কথা বলতে গেলে কথা জড়িয়ে যায়, মুখ বেঁকে যায়, মাথার ভিতর যেন আগুন জ্বলে। আমি বুঝতে পারি এটা প্রকৃতির চেতাবনি। বাঁচতে চাও তো চাকরি ছাড়ো। আর নয় তো সাহিত্য সাধনার এই শেষ।

শারীরিক অস্বস্তির চেয়ে বড় কথা মানসিক অশান্তি। মহাত্মা গান্ধী বলেন, 'আমার জীবনই আমার বাণী।' আমি বলতে পারতুম, 'আমার বাণীই আমার জীবন।' কিন্তু কোথায় সেই বাণী? দিস্তা দিস্তা রায় বা রিপোর্ট লিখেছি। সেই সবই কি আমার বাণী? তেমন বাণীর কতটুকু পরমায়ু? অথচ চার লাইনের একটা ছড়ার পরমায়ু কয়েক শো বছর হতে পারে। যেমন 'খোকা ঘুমাল পাড়া জুড়াল বর্গী এল দেশে। বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে'?

সংস্কৃত সাহিত্যে দু লাইনে কবিতা শত শত বছর বেঁচে আছে। তার মধ্যেই বেঁচে আছেন তার কবি। যদিও তাঁর নাম সবাই ভুলে গেছে। সৃষ্টি আপনাতেই আপনিই সম্পূর্ণ। যদিও সৃষ্টিকর্তা যে কে তা কেউ জানে না বা মানে না। একটি সুন্দর কবিতা বা গল্প লিখে যে আনন্দ যে চরিতার্থতা একরাশ দরকারি দলিল লিখে তা নেই।

আমার যৌবন তো ফুরিয়ে এল। জীবনই বা আর কত দিন? আমি যদি এখন আমার পরিকল্পিত উপন্যাসমালায় হাত না দিই তবে কবে সুযোগ পাব? প্রেমের উপন্যাসের ভাষা হবে প্রেমের ভাষা। সে ভাষা তৈরি করতেও প্রচুর সময় লাগবে। আমি কি কেবল একজন সাহিত্যিক? আমি একজন শিল্পী। শিল্প মাত্রেই রেওয়াজ দাবি করে।

তবে আমার জীবনের আরও একটা দিক আছে। আমি একজন man of action. মহকুমাশাসক ও জেলাশাসক হিসাবে আমি একজন *man of action* হতে পেরেছি। কিন্তু তাই দিয়ে তো জীবনটা ভরে দেওয়া চলে না। যদি কখনও দেশের ইতিহাসে সংকট দেখা দেয় আমাকে ডাক দিলে আমি অসি ধরব। অন্য সময় আমার হাতে অসি নয়, মসী। তার পেছনে ভাবনা-চিন্তা, ধ্যান-ধারণা, শিল্পকর্ম, রসবোধ, কেলি-কৌতুক সব মিলিয়ে আমার

আমি।

একদিন সকালে উঠে লীলাকে বললুম, 'একটা আধুলি টস করো। যদি রাজার মাথা ওঠে ইস্তফা দেব।' উনি টস করেন। রাজার মাথা ওঠে। তখন আমি বলি, 'এবার টাইপরাইটার নিয়ে আমার ইস্তফাপত্র লেখো।'

আমার পত্রের মর্ম, আমার মোমবাতি দুই দিক থেকে পুড়ছে। ফলে আমার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছে। সাহিত্যের কাজ নিয়ে থাকতে চাই। তাই অকালে অবসর-প্রার্থী হয়ে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে ইস্তফা দিচ্ছি।

লীলার মুখ গম্ভীর। পুণ্যকে জানতে দিইনে। সে আমাকে অনেকদিন আগেই বলেছিল, 'তুমি কি আমাদের কথা ভাববে না?' ওইটুকু ছেলের মুখে অত বড় কথা আমাকে ভাবিয়ে দিয়েছিল।

ছেলেমেয়েদের বয়স সতেরো, বারো, দশ, চার। তাদের পড়াশুনার পর্বের সমস্তটাই বাকি। কোনও কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন পিতা কি পুত্রকন্যার ভবিষ্যৎ না ভেবে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে?

কিন্তু যে কথাটা আমি কাউকে বলিনি, লীলাকেও না, সেটা হল, আমি আই সি এস প্রতিযোগিতায় সফল হওয়ার সময় সংকল্প করেছিলুম যে পাঁচ বছর চাকরির পরেই ইস্তফা দেব, কারণ সেটা আমার স্বধর্ম নয়, পরধর্ম, পরধর্ম ভয়াবহ। কিন্তু ক্ষমতার মোহে গড়িমসি করার ফলে একটি সন্তানকে হারালুম। সে সময় প্রতিজ্ঞা করি যে ন্যূনতম আর্থিক ব্যবস্থা করতে পারলেই চাকরি ছেড়ে সাহিত্য নিয়ে থাকব। নতুবা ভগবান আর একটি সন্তানকে কেড়ে নেবেন। এই ভয়টাও একজন সন্তানবৎসল পিতার। এই ভয়টা না থাকলে আমি হয়তো আরও গড়িমসি করতুম। কেউ তো আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছিল না। মুর্শিদাবাদ থেকে অপসারণ তো আই সি এস থেকে অপসারণ নয়। পশ্চিমবঙ্গে না থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কাজ করতে পারতুম, কিন্তু তা হলেও সেটা হত সাহিত্যের প্রতি অবহেলা। কবিতার হাত তো গেছেই, কাহিনীর হাতও যেত। গোটাকতক প্রবন্ধ ও ছড়া লিখে আমার বাণী আমি লিপিবদ্ধ করে যেতে পারতুম না। আমার বাণীই তো আমার জীবন। আমার জীবন ব্যর্থ হত।

আমার বাবা পারিবারিক প্রয়োজনে আঠারো বছর বয়সে চাকরি নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। আমিও তো সেই বয়সে স্কলারশিপ নির্ভর হয়েছি। আমার ছেলেমেয়েরাও নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে শিখবে। আমার বিশ্বাস ওরা আমার দিকটাও ভেবে দেখবে।

লীলা বললেন, 'ভালই হবে। আর তোমাকে বদলি হতে হবে না। আমাকেও প্যাকিং আনপ্যাকিং করতে হবে না।'

দিল্লি থেকে যখন আমার পদত্যাগ মঞ্জুর হয়ে এল তখন চিফ সেক্রেটারি সুকুমার সেন জানতে চাইলেন আমি বিষয়টা reconsider করব কি না। আমি জানালুম শান্তিনিকেতনে বাসা খোঁজা চলেছে। কিছু দেরি হবে। সেই ক'টা মাস থাকতে পেলে ভাল হয়। তার ফলে হয়তো পেনশনও কিঞ্চিৎ বাড়বে। তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়ে সেই মর্মে অর্ডার সই করিয়ে নিলেন। বোঝা গেল মুখ্যমন্ত্রী আমার উপর রাগ পুষে রাখেননি।

এর পর তিনি আমার উপর এক বাড়তি কর্তব্য চাপালেন। আলিপুরের জেলা জজ শৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়ের সঙ্গে আমাকে গোপনে বসে কমরেড রণদিবের নেতৃত্বে বিপ্লব

ঘটাতে গিয়ে আটক কর্মীদের কাকে কাকে খালাস দেওয়া বিপজ্জনক নয় তাদের নাম সুপারিশ করতে হবে। তাঁরা বিপ্লবের ডাক দিয়ে কাজ শুরু করার আগেই ধরা পড়েছিলেন। তাঁদের ধারণা ছিল জনগণ প্রস্তুত। সর্বহারা শ্রেণী দুর্বার। কিন্তু দেখা গেল বিপ্লবের ধ্বনি ফাঁকা আওয়াজ।

আমার জনাকয়েক সাহিত্যিক বন্ধুও ছিলেন রাজবন্দিদের দলে। তাতে আমি আশ্চর্য হইনি। কিন্তু তাজ্জবের ব্যাপার চোদ্দো-পনেরো বছর বয়সের স্কুলের ছাত্রীকেও পুলিশ আটক করেছিল। আমরা জিজ্ঞাসা করি, 'এদের কী অপরাধ?' পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারল গম্ভীর মুখে উত্তর দেন, 'এই মেয়েরাই সবচেয়ে ডেঞ্জারাস। এরা নীচের ক্লাসের ছোট ছোট বাচ্চাদেরও কমিউনিজম গুলে খাওয়াচ্ছে। ওরা যখন বড় হবে দুর্ধর্ষ বিপ্লবী হবে।'

আমরা হাসি। কিন্তু সত্যিসত্যি পরে এক সময় তাঁর কথা ফলে যায়। কমিউনিস্ট কন্যারা মিছিলে নেতৃত্ব করে গুলি খায়। বিপ্লব সফল হয় না ঠিক কিন্তু এই বিশ বছর ধরে তাদের দলই তো রাজ্য চালাচ্ছেন। পুলিশ এখন ওঁদেরই অধীন।

তবে আমরা ওদের খালাসের সুপারিশ করেছিলুম। বলেছিলুম ওদের পড়াশুনার ক্ষতি না করতে।

অবশেষে শান্তিনিকেতনে আস্তানার খোঁজ পাওয়া গেল। আমরা কলকাতার পাট গুটিয়ে নেওয়া শুরু করে দিচ্ছি এমন সময় ফোন করে ডেকে পাঠালেন নতুন চিফ সেক্রেটারি সত্যেন্দ্রনাথ রায় নম্বর টু। নম্বর ওয়ান স্যার সত্যেন্দ্রনাথ রায়, একদা বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য। শুনলুম জুডিশিয়াল সেক্রেটারি শিশিরকুমার সেন অসুস্থ। আমি কি তাঁর পদে এক মাস কাজ করতে পারি? রাজি হয়ে গেলুম। পরে শুনলুম শিশির সেন আরও দু মাস ছুটি চান। আমি কি আরও দু মাস কাজ করতে পারি? হ্যাঁ, পারি। পরে শুনলুম তিনি আবার অসুস্থ, আমি কি আরও তিন মাস কাজ করতে পারি? রাজি হতে হল।

এইভাবে ছয় মাস কাজ করার পর দেখা করতে গেলুম Accountant General-এর সঙ্গে। তাঁর নাম ক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী। তিনি বললেন, 'আপনার একুশ বছর active service পুরো হয়েছে। অতএব আপনার পাওনা হচ্ছে পুরো পেনশন, বছরে এক হাজার পাউন্ড স্টারলিং। ভারতীয় মুদ্রায় বার্ষিক পেনশন তেরো হাজার টাকার উপর।

একেই বলে পুরুষস্য ভাগ্য। সাতচল্লিশ বছর বয়সে পুরো পেনশন। এ যে প্রত্যাশাতীত সৌভাগ্য। ইংরেজরা যাওয়ার সময় নিয়ম বদলে দিয়ে না গেলে আমাকে পুরো পেনশনের জন্য পুরো পঁচিশ বছর চাকরি করতে হত। তত দিনে বয়স হত পঞ্চাশ।

আই সি এস অফিসরদের কার্যকাল পঁয়ত্রিশ বছর, কিন্তু ষাট বছর বয়সের অনধিক। অনেকেই পঁচিশ বছর পূর্ণ হতেই অবসর নিয়ে চলে যেতেন। তখন হয়তো তাঁদের বয়স পঞ্চাশও হয়নি। কিন্তু তাঁরা পুরো পেনশনই পেতেন। যত দূর জানি রমেশচন্দ্র দত্ত ছিলেন তাঁদের একজন।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর নিয়মটা একটু শিথিল করা হয়। পুরো পেনশনের জন্য একুশ বছর active serviceই যথেষ্ট। অর্থাৎ ছুটিছাটা কম নেওয়া হয়েছে, বেশির ভাগ সময় কাজ করা হয়েছে। এই সুযোগটা ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে কেবল ইউরোপীয়দেরই একচেটে ছিল। পরে এটা ভারতীয়দের বেলায়ও বিধিবদ্ধ হয়। নইলে আমাকে রমেশচন্দ্র দত্তের মতো পুরো পঁচিশ বছর চাকরি করতে হয়। তার আগেই আমার শরীর ভেঙে পড়ত। আমি হয়ে পড়তুম

পঞ্চাশেই বুড়ো। 'রত্ন ও শ্রীমতী' বুড়ো মানুষের লেখা নয়। আনুপাতিক পেনশন আমি নিতে প্রস্তুত ছিলুম। যদি না ডাক পড়ত জুডিশিয়াল সেক্রেটারি হতে।

মানুষের জীবনে একটা সময় আসে যখন বিত্তের চেয়ে সময়ের মূল্য বেশি। আরও টাকা নিয়ে সে করবে কী যদি সময় থাকতে প্রিয় কাজটি করতে না পারে? যদি সময়কে আজেবাজে কাজের ভিড়ে হারায়?

কিন্তু জীবনের একটা বড় অংশই তো জীবিকা। জীবিকার অনুরোধে আজেবাজে কাজ না করে উপায় কী? জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ পাবলিকের দিক থেকে আজেবাজে নয়। আমি তো পাবলিক সার্ভেন্ট।

যে ছয় মাস আমি জুডিশিয়াল সেক্রেটারি পদে অফিসিয়েট করলুম সেই ছয় মাসের সর্বপ্রধান অভিজ্ঞতা মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে সুসম্পর্ক। প্রথম দিনেই আমি তাঁর অনুমতি না নিয়ে চেয়ার টেনে বসলুম, অথচ চিফ সেক্রেটারি স্বয়ং দণ্ডায়মান। তাঁর চাপরাশির সঙ্গে তাঁর পদমর্যাদার কোনও পার্থক্য ছিল না। তাঁর জন্য আমি লজ্জিত।

মাঝে মাঝে মুখ্যমন্ত্রী আমাকে ডেকে পাঠাতেন। তিনি আমাকে দেখলেই চেয়ারে বসতে বলতেন। বোধহয় জানতেন যে আমাকে না বললেও আমি চেয়ার টেনে নিয়ে বসব।

একদিন তিনি আমার দিকে একখানা মোটা ইংরেজি বই বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'ভাবছি এ বই আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে reprint করব। আপনার কী মনে হয়?' উনি আমাকে 'আপনি' করে বলতেন। যতদূর জানি 'তুমি' ছিল তাঁর নিয়ম।

আমেরিকায় প্রকাশিত আমেরিকান আইনের বই। তা-ও উনবিংশ শতাব্দীর। এ বই এদেশে ও একালে অচল। সেটা খুলে বলতে সাহস হয় না। কূটনীতির আশ্রয় নিই। বলি বিদেশি গ্রন্থের কপিরাইটে বাধতে পারে। খোঁজ নেওয়া দরকার।

তিনি আমাকে খোঁজ নিতে বলেন। আমিও খোঁজ নিইনে। তিনিও মনে রাখেন না। ব্রিটিশ অপসরণের পরেও আমরা ব্রিটিশ আইনে অভ্যস্ত। আমেরিকান আইন আমাদের কোন কাজে লাগত!

আর একদিন সন্ধ্যাবেলা মহাকরণ খালি হয়ে গেছে। কেবল তাঁর ঘরে তিনি, রণজিৎ গুপ্তের ঘরে রণজিৎ গুপ্ত ও আমার ঘরে আমি। তিনি আমাকে ডেকে পাঠান। কাজের কথা পাড়েন না। বলেন তাঁর নিজের জীবনের কথা। তাঁর কর্মনীতি কী। 'একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে আমি একটা বিশেষ সিদ্ধান্ত নিয়ে দেখলুম ফল হল না। আর একটা সিদ্ধান্ত নিলুম। ফল হল না। আরও একটা সিদ্ধান্ত নিলুম। ফল হল।' তিনি বললেন।

'কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত যদি ভুল হয়ে থাকে কুফলও তো হতে পারে। বহু লোকের সর্বনাশ। আমার কতকগুলো fixed principles আছে। আমি সেই অনুসারে কাজ করি।' আমি বলি।

এই নিভৃত আলাপের সময় তৃতীয় ব্যক্তি থাকে না।

এ ছাড়া তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় ক্যাবিনেট মিটিং-এ। একবার তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'অমুক থানার দারোগা ডিউটি করতে গিয়ে মারা গেছে। আমরা কি তার পরিবারকে প্রতিপালন করতে বাধ্য? কতদিনের জন্য? আজীবন?'

আমি একটু ভেবে নিয়ে বলি, 'যাঁদের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হয় তাঁদের মৃত্যু হলে তাঁদের পরিবার পথে বসবে না এই অভয়বাণী তাঁদের দিতে হবে। নইলে তাঁদের

কাছ থেকে সাহসের কাজ পাওয়া যাবে না। আমার মনে হয় ফ্যামিলি পেনশনের ব্যবস্থা থাকা উচিত।'

তিনি বলেন, 'এরকম কেস তো অনেক হতে পারে। এত টাকা কোথায়?'

আমি বলি, 'সেটা ফাইনান্স সেক্রেটারির বিবেচনার বিষয়, জুডিশিয়াল সেক্রেটারির নয়।'

পুলিশের মনোবলের জন্য কি একটা ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু তত দিনে আমি সরকারের বাইরে।

খোশমেজাজে থাকলে মুখ্যমন্ত্রী খোশগল্পও করেন। সালটা ঠিক মনে পড়ছে না, সেই সালের উল্লেখ করে একদিন ক্যাবিনেট কমিটির মিটিং-এ বিধানচন্দ্র বলেন, 'ইংরেজ জাতি সিদ্ধান্ত নেয় যে ব্রেকফাস্টের সময় খাবে বেকন ও ডিম। তিন শতাব্দী ধরে ওরা ওই অভ্যাস রক্ষা করে আসছে।' আমরা শুনে অবাক। ভাগ্যে আমাদের মধ্যে কেউ মুসলমান ছিলেন না। শুনলে 'তওবা', 'তওবা' করে উঠতেন।

তবে ইংরেজরা এ দেশে এসে সে রীতি অনুসরণ করত কিনা বলা শক্ত। আমার বস্ মিস্টার মার্টিন একদিন আমাকে বলেছিলেন তাঁর মুসলমান বাবুর্চির মনে আঘাত লাগবে বলে তিনি ওই মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন।

দেশে ফিরে এসে আমিও গোমাংস বা শূকরমাংস কোনওটা মুখে দিইনি। বিদেশেও কদাচিৎ স্পর্শ করেছিলুম। আমার বাবুর্চিরা মুসলমান কিংবা মগ। মগদেরই চাহিদা বেশি, তাই বেতনও বেশি। ইউরোপীয়রা কেউ কেউ মগ বাবুর্চি বেশি পছন্দ করতেন। বোধহয় বেকন ও হ্যাম খাওয়ার অভ্যাস বজায় রাখতে।

তবে খানসামার মনে আঘাত লাগবে বলে সাহেবরা কেউ হুইস্কি বা বিয়ার পানে বিরত ছিলেন না। মুসলিম অফিসররাও কেউ কেউ তাঁদেরই সহবত মেনে চলতেন বা বাবর জাহাঙ্গিরের পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন।

বহরমপুর ক্লাবের মার্কার তো ছিল মুসলমান। সে বিলিয়ার্ড খেলার মার্কার হলেও ক্লাবের সুরাভাণ্ডারের ভাণ্ডারী ও সুরা পরিবেশক। তাকে সাকী বলতে পারা যেত, যদি না তার বয়স হত ওমর খৈয়ামের সমান।

আমার টেবলে যে সব ফাইল জমেছিল তার মধ্যে একদিন আবিষ্কার করলুম মেননের ফাইল। পি অচ্যুত মেনন ছিলেন আমার সার্ভিসেরই একজন অফিসর। আমি যখন কুমিল্লার অতিরিক্ত জেলা জজ তখন তিনি অতিরিক্ত জেলাশাসক। প্রায়ই দেখা-সাক্ষাৎ হত। তাঁর পূর্বজীবন ছিল রহস্যময়। তিনি যখন ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস প্রতিযোগিতায় সফল হন তখন তাঁর নাম ছিল বিধুশেখর বসু। তিনি সফল হয়েই কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেন তাঁর আসল নাম পি অচ্যুত মেনন। তাঁকে বেঙ্গলে নিযুক্ত করা হয়। কেউ জানত না তাঁর পূর্ব নাম ছিল বিধুশেখর বসু। আমিও কি জানতুম যদি না কুমিল্লায় যাওয়ার আগে ছুটিতে মাদ্রাজে যেতুম!

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন ডক্টর বিমানবিহারী দে। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি আমাকে বলেন, 'আমার ছাত্র বিধুশেখর বসু এখন বেঙ্গলে নিযুক্ত হয়েছে, কিন্তু তার নাম এখন পি অচ্যুত মেনন।' তাঁর নাম বিধুশেখর হল কী করে সে কথা

জানতে চাইলে ডক্টর দে বলেন, 'অচ্যুত মেনন ছোটবেলায় শান্তিনিকেতনে ছিল। তার বাবা ছিলেন সেখানকার শিক্ষক। বিধুশেখর শাস্ত্রী ও নন্দলাল বসুকে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। একজনের নাম ও অন্যজনের পদবি নিয়ে পুত্রের নাম রাখেন বিধুশেখর বসু। কেরলের নায়াররাও বাংলার কায়স্থের সমান। সেই জন্য বসু পদবি রাখা হয়েছে।' বাঙালিদের সঙ্গে এত মিল ছিল বলে মেননের সম্বন্ধে আমার দুর্বলতা ছিল। দেখতেও তিনি ছিলেন বাঙালিদের মতো।

কুমিল্লার পর আমি আর মেননকে দেখিনি। তবে শুনেছিলুম মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলাশাসক রূপে তিনি ঘুষ নিতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েছিলেন। তাঁর কারাদণ্ড হয়। সে তো অনেকদিনের কথা। তখন ব্রিটিশ আমল। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ আমলের পর তিন বছর কেটে গেছে। এখনও তিনি জেলে? আমি অবাক হই। তাঁর দরখাস্তে তিনি লিখেছেন, তাঁর ক্যারিয়ার গেছে, তাঁর স্ত্রী তাঁকে ডিভোর্স করেছেন, জেলখানাতে তাঁর জীবনের একটা বড় অংশ কেটে গেল। তাঁর বকেয়া কারাদণ্ড মকুব না করলে তিনি আত্মহত্যা করবেন।

আমার মতে মেনন যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। একজন আই সি এস অফিসরের পক্ষে এর চেয়ে বেশি অবমাননা আর কী আছে! আমি তাঁকে খালাস দেওয়ার জন্য আমার মন্ত্রীকে পরামর্শ দিলুম। আমার সঙ্গে একমত হয়ে তিনি দিলেন খালাসের আদেশ। মেনন ফিরে গেলেন স্বরাজ্যে। এর পরে আমরা পড়ে গেলুম ফ্যাসাদে। ভারত সরকার জানতে চাইলেন তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ না করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন একজন আই সি এস অফিসরের বকেয়া কারাদণ্ড মকুব করলেন। আমার কার্যকাল ফুরিয়ে এসেছিল। আমি দেখলুম যে নিরুত্তর থাকাটাই সুবুদ্ধি। আমি কোনও জবাব-টবাব দিইনি।

কলকাতায় আমার দ্বিতীয়বার বদলির পর বোম্বাই থেকে মাদাম সোফিয়া ওয়াডিয়া আমাকে লেখেন পি.ই.এন্-এর বাংলা শাখা অনেকদিন থেকেই নির্জীব। আমি যেন পি. ই. এন্-এর পুরাতন সদস্যদের নিয়ে মাঝে মাঝে অনুষ্ঠান করি। উৎসাহী সদস্যদের মধ্যে ছিলেন লীলা রায় ও লীলা মজুমদার, রাধারাণী দেবী, নরেন্দ্র দেব, হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। আমি পদাধিকারী নই, আমি কনভেনর। চাঁদা না তুলে আমি প্রতি মাসেই একটি করে অনুষ্ঠান করি। বন্ধুরা যে যাঁর বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে আসেন। আড্ডা বসে এক নম্বর আপার উড স্ট্রিটে আন্তর্জাতিক কোয়েকার বা ফ্রেন্ডস সম্প্রদায়ের আস্তানার একটি কক্ষে। ওঁরাই আমাদের বিনা খরচে চা পরিবেশন করেন। আমরা নানা বিষয়ে আলোচনা করি। সবচেয়ে বড় জমায়েত হয় কবিগুরু গ্যেটের দ্বিজন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে। আমরা তাঁর জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করি ও বক্তৃতা দিই। বলা বাহুল্য লীলা রায় ছিলেন পি.ই.এন্-এর অন্যতম সক্রিয় সদস্য। ভোজনের দিকটা তিনিই দেখাশুনো করতেন।

শ্রী অরবিন্দের মহাপ্রয়াণের পর দিলীপদাকে আবার দেখি কলকাতায়। এবার তাঁর অন্য বেশ। এবার তিনি পরম বৈষ্ণব। আমাকে বলেন, 'আমি এখন traditional বৈষ্ণবধর্মে ফিরে যাচ্ছি। অদ্বৈত প্রভু ছিলেন আমার পূর্বপুরুষ। পণ্ডিচেরি ত্যাগ করেছি। এখন কোথায় যাব স্থির করিনি।' তাঁকে খুবই চিন্তান্বিত মনে হল। যেন একটি নোঙর ছেঁড়া নৌকো।

তাঁর জীবনে একটা আধ্যাত্মিক বিপর্যয় ঘটেছিল। এত দিন শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা ছিলেন তাঁর পরম দিশারী। এখন তিনি ফিরে যাচ্ছেন চিরায়ত বৈষ্ণব ধারায়। তবে ভেক নেননি। অদ্বৈত প্রভুর মতো গৃহী বৈষ্ণবও হননি। তিনি যা-ই হন-না কেন, গান ছাড়েননি।

তাঁর গান ছিল ভক্তিমূলক। সে বার তাঁর মধ্যে একটা অস্থিরতা লক্ষ করেছিলুম। পরে তিনি স্থিতি লাভ করেন পুনায় হরিকৃষ্ণ মন্দিরে। সেখানে তিনি বাবাজি নন, দাদাজি।

একদিন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমার আয়রন সাইড রোডের বাসায় পদার্পণ করেন। তাঁর সঙ্গে আগে থেকে আমার আলাপ ছিল। মণিদার বাড়িতে তাঁকে দেখেছি।

আমার বাগানে একটা গাছ ছিল। সেটা কী গাছ আমি জানতুম না। তিনি সেটা দেখে বললেন, 'এ যে চেরি গাছ হে।' গাছপালা সম্বন্ধে তাঁর দারুণ ঔৎসুক্য ছিল। লীলাকে বলেন, 'আমার একটা গল্প আছে। তার নাম পুঁইমাচা। খুশি হব আপনি যদি সেটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন।' লীলা বলেন, 'নিশ্চয়ই।' সেই ইংরেজি অনুবাদ যখন আমেরিকাতে প্রকাশিত হয় তার আগেই বিভূতিভূষণ পরলোকে চলে গেছেন।

সেদিন তিনি পরলোক সম্বন্ধে আমাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলোচনা করেন। আমি বলি, 'মৃত্যুর পরে কী আছে তা মৃত্যুর সময়ই জানতে পারা যাবে, তার আগে নয়।'

তখন তিনি উত্তেজিত হয়ে বলেন, 'মানুষ ইচ্ছে করলে ভগবানকে পর্যন্ত জানতে পারে। পরলোক তো তার তুলনায় কিছু নয়। তুমি আমার 'দেবযান' পড়েছ?'

আমি বুঝতে পারলুম বিভূতিভূষণের মন এখন ইহলোক সম্বন্ধে উদাসীন। তাঁর চেহারাতে একটা উদাসীন ভাব ছিল।

মাস কয়েক পরে কী একটা কাজে অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো স্টেশনে গেছি। আমাকে দেখেই ডাইরেক্টর বললেন, 'শুনেছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আর নেই?' শুনে আমি হতবাক। তিনি আমাকে বিভূতিভূষণ সম্বন্ধে রেডিয়োতে কিছু বলতে অনুরোধ করেন। আমি তাঁর অনুরোধ রক্ষা করি।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল। তাঁর পৈত্রিক নিবাস থেকে এক সময় তিনি উঠে এসেছিলেন রাসেল স্ট্রিটে তাঁর নতুন আস্তানায়। সেখানে একদিন হাজির হয়ে দেখি ডিনার জ্যাকেট পরা এক বাঙালি সাহেব বেরিয়ে এলেন। কয়েকজন অবাঙালি সাহেব তাঁকে সঙ্গে করে কোনও এক পার্টিতে নিয়ে গেলেন। আমাকে তিনি পাঁচ মিনিট সময় দেন। তখন তিনি স্টেটসম্যান পত্রিকার অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর।

আমার একটা অতিরিক্ত পদ ছিল Legal Remembrancer to the Calcutta High Court. সেই সূত্রে প্রায়ই আমায় হাইকোর্টে আপিস করতে হত। জজ সাহেবরা, ব্যারিস্টার সাহেবরা পদার্পণ করতেন। একদিন Advocate General Sir S.M.Bose আমাকে তাঁর গার্ডেন পার্টিতে নিমন্ত্রণ করেন। অতিথির ভিড়। আমি এক কোণে আসন নিই। হাতে soft drink.

এমন সময় আমার পাশে এসে বসলেন এক গ্লাস মদিরা হাতে আমার সমবয়সী এক ভদ্রলোক। বললেন, 'চিনতে পারছেন? সেই পুরনো পাপী টি. পি. দাস, ব্যারিস্টার। কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে আমার নালিশ আছে, রয়। আপনার বিরুদ্ধে আমি মানহানির মামলা আনব।'

'সে কী?' আমি তো হাঁ। আবছা মনে পড়ে লন্ডনে এঁকে একটি বার দেখেছি। কথাবার্তা হয়নি।

'আপনার নভেলে আপনি আমাকে ক্যারিক্যাচার করেছেন। তারাপদ কুণ্ডু আমি ছাড়া আর কে?' তিনি আমাকে শাসান।

'কী আপদ, তারাপদ নামটা কি আপনার একচেটে? ওটা তো অতি সাধারণ নাম।' আমি তর্ক করি।

'তা হতে পারে। কিন্তু টর্পেডো? সেটাও কি সাধারণ নিকনেম? আমার বন্ধুরা আমাকে টর্পেডো বলে ডাকে।' তিনি পানপাত্রে চুমুক দেন।

'ওটা আমার বানানো। বিলেতে আমাদের সকলেরই নাম ইংরেজদের মুখে পালটে যায়। হরি হয়ে যায় হ্যারি। রবি হয়ে যায় রবিন। তেমনই তারাপদ হয়ে যায় টর্পেডো।' আমি উত্তর দিই।

তিনি ক্রমেই নেশায় বেসামাল হন। বলেন, 'কী করে আপনি জানলেন যে আমি মাগিবাজি করি?'

আমি শান্তভাবে বলি, 'অমন অসভ্য শব্দ আমি কখনও ব্যবহার করিনি। তারাপদ কুণ্ডুও অমন কর্ম করেননি। আপনি আমার বই পড়েননি বুঝতে পারছি।'

এমন পরিস্থিতি থেকে আমাকে উদ্ধার করেন স্বয়ং স্যার এস. এম. বোস। তিনিই বোধহয় তাঁর পদে শেষ নক্ষত্র। ব্রিটিশ আমলের নাইট। এখন সে উপাধি ব্যবহার করেন না। বিধানচন্দ্র তাঁকে বিশেষ অনুরোধ না করলে তিনি হাল আমলে পদাধিকারী হতেন না।

নিভৃতে বলেন, 'আজকাল আমি বাছা বাছা কেস ছাড়া আর কোনও কেস করিনে। এক লাখের চেয়ে বেশি উপার্জন করিনে। বেশি করলে ইনকাম ট্যাক্স বর্ধিত হারে কেটে নেয়। আমার পরিশ্রমের ফল আমি পাইনে। বিধান রায়ের অনুরোধে এ কাজটা নিয়েছি।'

আমি বলি, 'আমরাও আপনার advice পেয়ে ধন্য হচ্ছি। এমন advice আর কে দিতে পারেন?'

জজদের মধ্যে ছিলেন Justice Roxburgh (জাস্টিস রক্‌সব্‌রা)। একদিন বিশেষ কারণে আমার ঘরে এসে আমার সঙ্গে কথা বলেন। কিছু দিন পরে দেশে ফিরে যান। আর একদিন আমার ঘরে এলেন জাস্টিস অমরেন্দ্রনাথ সেন। বন্ধুরা বলতেন বেবী সেন। বেবীটি ছিলেন বিশালকায় পুরুষ। ঢাকায় আমি তাঁর অধীনে জুডিশিয়াল ট্রেনিং পেয়েছি। জুডিশিয়াল সেক্রেটারি তথা লিগাল রিমেমব্রান্সার যাঁরা হন তাঁরা প্রমোশন পেয়ে হন হাইকোর্ট জজ। সে পদের জন্য আমার বিন্দুমাত্র অভিলাষ ছিল না। আমার চেয়ে সিনিয়র শিশিরকুমার সেন ও করুণাকুমার হাজরা। তাঁরা থাকতে আমার বিন্দুমাত্র সুযোগ ছিল না। তা ছাড়া আমার মজ্জাগত ভয় ছিল যে আমাকে কখনও ফাঁসির হুকুম দিতে হতে পারে।

আমার প্রথম যৌবনে আমি টলস্টয়, থোরো, রাসকিন, গান্ধী প্রমুখ আদর্শবাদীর প্রভাবে পড়ে বিশ্বাস করতুম যে স্টেট নামক প্রতিষ্ঠানটা মন্দ যেহেতু তার চারটে স্তম্ভই সহিংস। যেমন মন্দ আর্মি, তেমনি মন্দ পুলিশ, তেমনি মন্দ আদালত, তেমনই মন্দ জেল। ফাঁসির তো কথাই নেই। অথচ এমনি আমার অদৃষ্ট যে আমাকে চারটি স্তম্ভের সঙ্গেই জড়িত হতে হল। চর অপারেশনের জন্য মিলিটারিকে ডেকেছি, মিলিটারি অফিসারদের সঙ্গে মিশেছি, তাঁদের পরামর্শে আর্মড পুলিশের সাহায্য নিয়েছি, আদালত কক্ষে কারাদণ্ড দিয়েছি। জেলখানায় গিয়ে কয়েদিদের অবস্থা পরিদর্শন করেছি। স্টেট না থাকলে আমাকে মাইনে দিত কে? পেনশন দেবে কে? তা হলে মন্দ নির্জলা মন্দ নয়, অপেক্ষাকৃত ভাল। আমার সেই শিক্ষাটা বাকি ছিল। চাকরি করে সেই শিক্ষা হল।

আমি চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছি শুনে একদিন যামিনী রায় আমার বাসায় এসে

উপস্থিত। তাঁর সঙ্গে আমার অনেকদিনের চেনা। বাঁকুড়ায় থাকতে বেলিয়াতোড়ে তাঁর গ্রামের বাড়িতেও গেছি। কলকাতাতে তাঁর পুরাতন ও নতুন স্টুডিয়োতেও যাতায়াত করেছি। তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ভাবে আমাকে বলেন, 'এ কী কথা? আপনি চাকরি ছেড়ে দেবেন কেন?'

আমি বলি, 'তা না হলে আমাকে সাহিত্য ছেড়ে দিতে হয়।'

তখন তিনি আমাকে বোঝান যে শিল্পীর বা সাহিত্যিকের জীবনে একটা বিরোধ থাকা চাই। আমার জীবনে চাকরিটাই সেই বিরোধ।

আর একজন আমাকে চাকরি ছেড়ে দিতে নিষেধ করেছিলেন। তিনি শিক্ষামন্ত্রী রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী। তাঁর সঙ্গে আমার নামমাত্র পরিচয়। সরকারি কাজে তিনি আমাকে ডেকেছিলেন। কাজটা শেষ হতে তিনি আমাকে বলেন, 'শুনছি আপনি আরও ভাল লিখবেন বলে চাকরি ছেড়ে দিচ্ছেন? কিন্তু দেখবেন আরও ভাল লেখা চাকরি ছেড়ে দিলে হবে না। তখন টাকার জন্য লিখতে হবে।'

আমি চুপ করে শুনি। বিদায় নেওয়ার সময় তাঁকে বলি, 'চেষ্টা করব আরও ভাল লিখতে।'

আমার ব্যাচের বাঙালি সিভিলিয়ানদের মধ্যে একমাত্র বীরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তীই আমাকে সমর্থন করেছিলেন। বলেছিলেন, 'তুমি অকালে অবসর নিয়ে বুদ্ধিমানের কাজ করছ। তুমি আরও অনেকদিন বাঁচবে।' আমাদের পাঁচজনের ভিতর থেকে চারজনই আমার আগে চলে গেছেন বয়স ষাট থেকে সত্তরের মধ্যে।

পাঁচ রকম সরকারি কাজের ফাঁকে ফাঁকে কোনও রকমে ছড়া ও প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখি। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় যখন 'গল্পভারতী'র সম্পাদক হন তখন তাঁর অনুরোধে 'না' বলে একটা উপন্যাস লিখতে সমর্থ হই। আসলে ওটা একটা উপন্যাস নয়, উপাখ্যানমালা। তার মূল সূত্র একই। আমি বুঝতে পারছিলুম যে ক্লাসিক উপন্যাস লেখা সরকারি কাজের ফাঁকে হবার নয়। সেটাই ছিল আমার উচ্চাভিলাষ, হাইকোর্টে জজিয়তি নয়।

যিশু খ্রিস্ট বলেছিলেন, কেউ দুইজন প্রভুর সেবা করতে পারবে না। আমার জীবনে দুইজন প্রভু। একজন প্রভু হলেন সরকার; আমি যাঁর চাকরি করি। অপরজন হলেন শিল্প সাহিত্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, আমি যাঁর প্রেরণায় সৃষ্টি করি। দেবীর বর পাওয়া কারও পক্ষেই সহজ নয়। অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে সাধনা করতে হয়।

আমার চাকরি জীবন শেষ হয়ে এল। আমি কখনও কোনও নোংরা কাজ করিনি। শেষের দিনটিতে আমি সব ফাইল পরিষ্কার করে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বিদায় নেব। কিন্তু এ কী বিপত্তি! হরেন ঘোষের হত্যাকারী বোম্বাইয়া নামক আসামির রাত পোহালেই ফাঁসি। আমাকেই সই করতে হবে রেড কার্ড। সেটা পাঠিয়ে দিতে হবে জেল সুপারিনটেন্ডেন্টের কাছে। একটু বিলম্ব করা চলবে না। ফাঁসির আসামিকে মানসিক যন্ত্রণা দেওয়া অমানবিক।

একজন প্রবীণ অফিসর আমাকে বলেছিলেন, 'ফাঁসি তো আপনি দিচ্ছেন না, আপনি নিমিত্তমাত্র। নিমিত্তমাত্র ভব সব্যসাচী।' নিমিত্ত হতে আমি নারাজ।

জীবনে কখনও ফাঁসির হুকুম দিইনি। অন্যের দেওয়া ফাঁসির হুকুমে কিনা আমাকেই কার্যকর করার হুকুম দিতে হবে! হা ভগবান।

এমন সময় মিস্টার বারওয়েলের প্রবেশ। যেন স্বর্গ হতে দেবতার অবতরণ। যাকে

বলে *deus ex machina.* তিনি বলেন, 'আবার এসেছি আপনার কাছে একই আর্জি নিয়ে। এবার আমি দিল্লি থেকে আশ্বাস পেয়েছি আমার মক্কেলের mercy petition মঞ্জুর হওয়ার সম্ভাবনা। দয়া করে এর petitionটা ফরওয়ার্ড করে দিন।'

আমি বলি, 'একবার তো দিয়েছিলুম। খারিজ হল। আবার হবে। কেসটা খুবই খারাপ, মিস্টার বারওয়েল।'

নোয়েল বারওয়েল ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের শেষ ব্রিটিশ ব্যারিস্টার। অতিশয় সজ্জন। আমি ওঁকে যত বোঝাই ভারত সরকার কখনও খারিজ করা পিটিশন গ্রাহ্য করবে না তিনি ততই ব্যাকুল ভাবে বলেন, 'আমাকে আর একটা চান্স দিন।'

আমারও গরজ ছিল। আমি কেন ফাঁসির নিমিত্ত হব? যাওয়ার আগে আমার বিবেকে কেন রক্তের দাগ লাগবে? আমি ওঁকে হাঁ-ও বললুম না, না-ও বললুম না। অর্ডার শিটে লিখে দিলুম, মিস্টার বারওয়েলের অনুরোধ রক্ষা করা উচিত কিনা সেটা বিবেচনা করার মতো সময় আমার হাতে নেই। সেটা আমি মিস্টার এস. কে. সেনের নামে রেখে যাচ্ছি। এই পিটিশনটা যেন তাঁর সামনে অবিলম্বে পেশ করা হয়।

বারওয়েলকে আমার অর্ডার দেখালুম। তিনি সন্তুষ্ট হয়ে বিদায় নিলেন।

বোম্বাইয়া আপাতত বেঁচে গেল। সেই সঙ্গে আমিও বেঁচে গেলুম। পরের দিন মিস্টার সেনকে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে আমি কেবল এই পদ থেকে নয়, আমার চাকরি থেকেও বিদায় নিলুম। বিচার বিভাগের কর্মচারীরা আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বিদায়-সংবর্ধনা দিলেন। আমার মন্ত্রী নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার হলেন সভাপতি। তাঁর সঙ্গে আমার বিলেত থেকেই আলাপ।

পুণ্য ও জয়াকে আগেই শান্তিনিকেতনে রওনা করে দেওয়া হয়েছিল। সেখানে তারা হস্টেলে ভর্তি হয়েছিল। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে শেষ বার দেখা করে কলকাতার পাট গুটিয়ে আমরাও কয়েকদিন পরে শান্তিনিকেতন যাত্রা করলুম। পারিবারিক মিলনের জন্য আমরা ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলুম।

আমি শান্তিনিকেতনে বসবাস করব শুনে কাজী আবদুল ওদুদ বলেন, 'Go deeply into the country.' অর্থাৎ আরও অভ্যন্তরে কোনও গ্রামে। সেটা আমারও লক্ষ্য। তবে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ভাবনা তো আগে।

আমার যৌবন সায়াহ্ন শেষ হয়ে এসেছিল। এখন আমি চাই দ্বিতীয় যৌবন। যেমন চেয়েছিলেন আমার অন্যতম গুরু প্রমথ চৌধুরী। দ্বিতীয় যৌবনেই তাঁর প্রতিভার সম্যক স্ফূরণ হয়। তিনি সম্পাদনা করেন 'সবুজপত্র', রচনা করেন 'চার ইয়ারী কথা', বাংলা সাহিত্যের অন্যতম ক্লাসিক।

আমারও বিশ্বাস ছিল আমিও লিখতে পারব একখানি কি দুখানি ক্লাসিক। যদি অখণ্ড মনোযোগ দিই। 'সত্যাসত্য' রচনার সময় সেটা একেবারেই অসম্ভব ছিল। এইবার তো আমি জীবিকার দায় থেকে মুক্ত। এখন আমার দায় বলতে রূপের দায়, রসের দায়। অর্থাৎ আর্টের দায়, প্রেমের দায়।

কত রকম পদেই না আমি কাজ করেছি। প্রতিবারই মনে হয়েছে আমি যেন একটি ভূমিকায় অভিনয় করছি। আমাকে সাজতে হয়েছে কখনও মহকুমা হাকিমের সাজে, কখনও জেলাশাসকের সাজে, কখনও জেলা জজের সাজে, কখনও ট্রাইবুনালের প্রেসিডেন্টের

সাজে, কখনও জুডিশিয়াল সেক্রেটারির সাজে। হাসি পেলেও হাসতে পারিনি, কান্না পেলেও কাঁদতে পারিনি। সব সময় রাশভারী ও গম্ভীর।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'এরে ভিখারী সাজায়ে কী রঙ্গ তুমি করিলে।' আমি বলতে পারতুম, 'এরে হাকিম সাজায়ে কী রঙ্গ তুমি করিলে।' এখন সেই সাজসজ্জা খুলে ফেলে সহজ মানুষ হলুম। আর আমি অভিনেতা নই। আমার চাকরি নাট্যের happy ending হয়েছে।

টলস্টয় থোরো প্রমুখ মনীষীদের প্রভাবে মানুষ হয়ে আমার বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে state মাত্রেই হিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত। তার চারটি স্তম্ভ, সেনা, পুলিশ, আদালত ও জেল ভীতিপ্রদ। আমার সেই বদ্ধমূল ধারণা খণ্ডন হত কী করে যদি না আমি স্টেটের দক্ষিণ মুখও দেখতুম? Stateই মানবসভ্যতার শেষ কথা নয়। সে একদিন শুকিয়ে যেতে পারে। আপাতত Welfare Stateই অম্বিষ্ট। যেমন ব্রিটেনের তেমনই ভারতের।

রাইটার্স থেকে বিদায় নিয়ে আসবার পর লীলা আমাকে বলেন, 'এখন থেকে তোমার stature আরও উঁচু হবে।' তার মানে কি পাঁচ ফুট সাড়ে চার ইঞ্চি থেকে ছয় ফুট? আমার উপর লীলার এতখানি বিশ্বাস! লীলাই তো আমার শক্তি।

তবে এটাও ঠিক, জীবন যদি বিচিত্র না হয় তা হলে সাহিত্যও বিচিত্র হতে পারে না। আই সি এস হয়ে আমার জীবন বিচিত্র হয়েছে। এমনটি কখনও সাংবাদিক হয়ে হত না। আই সি এস না হয়ে সাংবাদিক হলে আমি আরও বড় ভুল করতুম। 'সত্যাসত্য'-এর মতো উপন্যাস কোনও দিনই লেখা হত না, 'পথে প্রবাসে'র মতো ভ্রমণকাহিনীও না। জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের বৃত্তি আমার জন্য পরধর্ম। পরধর্ম ভয়াবহ। তা সত্ত্বেও বলতে হবে আমার জীবনকে তা পরিপক্কতা দিয়েছে। সুতরাং অতীতের জন্য আফসোস করব না। দ্বিতীয় যৌবনের জন্য আশায় বুক বাঁধব। মা বলতেন, ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্য। আমি আগে মানতুম না। এখন মানি।

আমার কাছের মানুষ

ভূমিকা

সন্তোষকুমার ঘোষ-এর কন্যা কাকলি ও গৌরকিশোর ঘোষ-এর কন্যা সাহানার অনুরোধে 'বর্তমান' পত্রিকার জন্য লেখা হয়েছিল 'কাছের মানুষ'। তাতে ছিল মোট কুড়িজনের প্রসঙ্গ। পরে তার সঙ্গে আরও দশটি প্রসঙ্গ যোগ করা হয়। মোট সংখ্যা দাঁড়ায় তিরিশ। ইচ্ছে করলে আরও বাড়াতে পারা যেত, কিন্তু আমার হাতে সময় নেই। তাই এখানেই দাঁড়ি টানছি।

এগুলি লিখে দিয়েছেন সুরজিৎ দাশগুপ্ত। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

অন্নদাশঙ্কর রায়

সূচি

রাজেন্দ্রলাল দত্ত / মনোমোহন ঘোষ / দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু / শরৎ ও সবুজ দল / 'পরিচয়' ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত / ভবানী ভট্টাচার্য / মণীন্দ্রলাল বসু / অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবী / দিলীপকুমার রায় / নরেন দেব ও রাধারানী দেবী / কাজী নজরুল ইসলাম / কাজী আবদুল ওদুদ / কাজী মোতাহার হোসেন / সৈয়দ মুজতবা আলী / আবু সয়ীদ আইয়ুব / অমিয় চক্রবর্তী / বুদ্ধদেব বসু / বিষ্ণু দে / নীরদচন্দ্র / মনীষী সত্যেন্দ্রনাথ / প্রেমেন্দ্র মিত্র / অচিন্ত্যকুমার / রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় / গোপালদাস মজুমদার / সুধীরচন্দ্র সরকার / উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় / গুরুসদয় দত্ত / অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী

রাজেন্দ্রলাল দত্ত

পিতার পরে যাঁকে আমি পিতার মতো ভক্তি করতুম তিনি ঢেঙ্কানল হাইস্কুলের হেডমাস্টার রাজেন্দ্রলাল দত্ত। সাত বছর বয়স থেকে সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আমার শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক। তার পরেও তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিন্ন হয় না। সেটা পিতাপুত্রের সম্পর্কের মতো অচ্ছেদ্য।

তিনি আমাদের ক্লাস নিতেন না। কিন্তু ক্লাস টিচার অনুপস্থিত থাকলে তিনি আসতেন ক্লাস নিতে। উপরের দিকে তিনি ইংরেজি পড়াতেন। নীচের ক্লাসগুলিতে তাঁর দর্শন পাওয়া যেত কদাচিৎ কোনও শিক্ষক অনুপস্থিত থাকলে। একদিন ভূগোলের শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে তাঁর ক্লাস নিতে তিনি এলেন। কে একজন তাঁকে ভূগোলের প্রশ্ন করল। তিনি বললেন, 'আমি জানিনে। অন্নদাশঙ্কর বলতে পারে।'

আমাদের ক্লাসে বেশ কয়েকটি মানচিত্র ছিল। সেগুলি আমি খুলে দেখতুম আমার নিজের খেয়ালে। একটি ম্যাপ পয়েন্টার ছিল। তাই দিয়ে বিভিন্ন স্থান দেখাতুম। কারও নির্দেশে নয়, আমার নিজের জ্ঞান বাড়াতে। একটি গ্লোব ছিল। সেটি আমি ঘুরিয়ে দেখতুম। আর কোনও ছাত্রের আমার মতো কৌতূহল ছিল না। ভূগোলে আমি একবার ত্রিশ থেকে ছত্রিশ পেয়েছিলাম। সেটি অবশ্য অঙ্কের ভুলে।

আমার নিজস্ব একটি অ্যাটলাস ছিল। বাড়িতে আমি সেটা নিয়ে খেতে বসতুম, শুতে যেতুম। বলতে লজ্জা করে—শৌচাগারে যেতুম। মনে মনে আমি বিশ্ব ভ্রমণ করতুম। কিন্তু হেডমাস্টার মশায় আমার দিকে চেয়ে বলবেন, 'অন্নদাশঙ্কর বলতে পারে', এটা অভাবনীয়। তখন আমার বয়স কত। দশ কি এগারো।

এর পরে তিনি আর একদিন ক্লাসে ঢুকেই আমার দিকে এগিয়ে এসে বললেন, 'এই অন্নদাশঙ্কর, তুমি নাকি বলে বেড়াচ্ছ, রবি ঠাকুরই বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি? কেন? বিদ্যাপতি-চণ্ডিদাস গেলেন কোথায়? তবে মানছি রবিবাবুই বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ গদ্য লেখক।'

রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির পরে সকলেই ধরে নেন যে তিনি বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি। এই নিয়ে তর্ক বেধে যায় আমার বন্ধু মনোরঞ্জনের সঙ্গে। তাঁর মতে প্রাইজটা পাওয়া উচিত ছিল দ্বিজেন্দ্রলালের। রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি' নাকি একজন সাহেবের লেখা। তিনি এত ভাল ইংরেজি জানলেন কবে?

সম্ভবত এই বিতর্ক হেডমাস্টার মশায়ের কানে পৌঁছেছিল। কিছুদিন পরে তিনি আমাকে এক চমক দিলেন। বললেন, 'এই নাও কমনরুমের চাবি। ওই ঘরে যেসব পত্রিকা আছে সেসব এখন থেকে তোমার তত্ত্বাবধানে।'

আমি সে ঘরে ঢুকে দেখি, আধুনিক বাংলা মাসিকপত্র একটি আলমারিতে থরে থরে সাজানো। 'ভারতী', 'মানসী ও মর্মবাণী', 'গৃহস্থ' প্রভৃতির সঙ্গে প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজ পত্র'। ক্লাস কামাই করে আমি কমন রুমে গিয়ে মাসিকপত্রগুলি তন্ন তন্ন করে পড়তুম।

আমাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল 'সবুজ পত্র'। তাতে থাকত রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গল্প আর 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস, প্রমথ চৌধুরীর 'চারইয়ারী কথা', গল্প ও প্রবন্ধ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তর কবিতা, অতুলচন্দ্র গুপ্তর প্রবন্ধ। বুঝি আর না বুঝি, আমি এক প্রকার affinity বোধ করি, যেন আমিও একজন 'সবুজ পত্র' গোষ্ঠীর লেখক। এখন নয়, পরে হব।

'সবুজ পত্র' আমাকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। তার থেকে আমি পাই eternal feminine-কে। যেমন মাইলো দ্বীপের ভেনাস (Venus de Milo)। তাছাড়া 'সবুজ পত্রে'র চলতি ভাষা ও সেই ভাষার সঙ্গে আর্ট। 'সবুজ পত্রের' অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন ভারতের সঙ্গে আধুনিক ইউরোপের সমন্বয়। এটাও হয়ে ওঠে আমার জীবনের অন্যতম ব্রত। প্রাচ্যের সভ্যতাকে ঘরে বসে পেতে পারি, কিন্তু পাশ্চাত্যকে পেতে হলে ইউরোপ-আমেরিকায় যেতে হয়। আমেরিকায় যাওয়ার স্বপ্ন আমার বাবাই আমার মনে সঞ্চার করেছিলেন। বলেছিলেন, 'তুমি বড় হয়ে জর্জ ওয়াশিংটন হবে।'

ইউরোপে যাওয়ার বাসনা আমার মনে জাগে 'সবুজ পত্র' পড়ে। বিশেষত 'চারইয়ারী কথা' তথা সোমনাথের জবানী থেকে অদৃশ্য ভাবে 'পথে প্রবাসে'র বীজ বোনা হয় সেই সময়, তার ফল ফলে দশ বছর পরে। সেটা লক্ষ করে প্রমথ চৌধুরী বিস্মিত হন ও পরে আমার গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দেন স্বতঃপ্রণোদিতভাবে।

আমার হেডমাস্টার মশায় কল্পনা করতে পারেননি, আমাকে কমনরুমের চাবি দেওয়ার পরিণাম এতদূর গড়াবে। কমন রুমে 'প্রবাসী' থাকত না। তার জন্য আমি যেতুম তাঁর বাসায়। সেখানে এক রাশ পুরাতন 'প্রবাসী' ছিল। সেসব আমি তন্ময় হয়ে পড়তুম। পরে আমি এক সময় নিজেই 'প্রবাসী'র গ্রাহক হয়ে যাই। তাতে বেরোয় টলস্টয়ের একটি উপকথার অনুবাদ, আমার লেখা, চলতি বাংলায়। সেই সূত্রে আমি প্রথম বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করি। বলতে পারা যায়, টলস্টয়ের হাত ধরে।

টলস্টয়ের 'Twenty-three Tales' বইখানি আমি স্কুল থেকে পুরস্কার পেয়েছিলুম পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য। সেটিও সম্ভবত হেডমাস্টার মশায়ের দ্বারা নির্বাচিত। তার আগে ও পরে আমি আরও কয়েকবার পুরস্কার পাই। তার মধ্যে একটি ছিল John Bunyan লিখিত 'Pilgrim's Progress'. এর প্রভাব পড়ে আমার জীবন-দর্শনের উপরে। আমিও স্থির করি যে আমিও Worldly Wise Man হব না, কিংবা Mr. liable. সেটিও সম্ভবত হেডমাস্টার মশায় দ্বারা নির্বাচিত।

রাজেনবাবু মানুষটি ছিলেন লম্বা একহারা গড়নের। রং ছিল ফর্সা। কথাবার্তা খুবই সংযত। মুখভাব সাধারণত গম্ভীর। তবে আমার সঙ্গে ব্যবহারে মুখে মিষ্টি হাসি লেগে থাকত। তিনি ছিলেন খুলনা জেলার নিবাসী। কর্মসূত্রে ঢেঙ্কানল রাজ্যে প্রবাসী।

আমাদের স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা হেডমাস্টার ছিলেন অক্ষয় চন্দ্র রায়। বাঙালি ব্রাহ্মণ। তাঁর উত্তরসূরি অনুকূল চন্দ্র ঘোষ। তিনিও বাঙালি। কিন্তু ব্রাহ্ম কিনা জানি নে। তাঁর উত্তরসূরি রাজেন্দ্রলাল দত্ত। তিনি ছিলেন থিয়োসফিস্ট। আমাকে বলেছিলেন কাশীর বিখ্যাত পণ্ডিত ভগবানচন্দ্র দাসের বই পড়তে। তাঁকে কোনওদিন পুজো-পার্বণে যোগ দিতে দেখিনি। আমাদের স্কুলে ধর্মশিক্ষা ছিল না। সরস্বতী পুজো ইত্যাদিও না।

একজন মাস্টার ছিলেন বাঙালি মুসলমান। তিনি যশোহর বা খুলনার নিবাসী। তিনি রোজ চা খেতে আমাদের বাড়িতে আসতেন। কাকাদের বন্ধু বলে আমরাও তাঁকে কাকা

বলতুম। আমি যতদূর জানি, রাজেনবাবুই তাঁকে চাকরি জুগিয়ে দিয়েছিলেন। সেটা সাময়িক চাকরি। ঢেঙ্কানল থেকে আমি যাই কটক রেভেন্‌শ কলেজে আই. এ. পড়তে। দু বছর বাদে যখন পরীক্ষার ফল বেরোয় তখন গুজব শোনা যায় যে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছি। তা শুনে আমার সেজো কাকা একটি ভোজও দেন। একদিন বিকেলে আমি আমার বন্ধু প্রফুল্লর সঙ্গে টেনিস খেলছি। এমন সময় দেখি রাজেনবাবু হনহন করে ছুটে আসছেন। আমাকে ডেকে বললেন, 'তুমি ভুল শুনেছ, অন্নদাশঙ্কর। তুমি সেকেন্ড হওনি। তুমি ফার্স্ট হয়েছ। এই দ্যাখো বিহার-ওড়িশা গেজেট। তোমার বাবাকে দেখাতে যাচ্ছি।'

কটক থেকে আমি পাটনায় যাই বি.এ. পড়তে। সেখান থেকে বি.এ. অনার্সে ফার্স্ট হই। রাজেনবাবু খুব খুশি হন। তার দু বছর বাদে আই. সি. এস. প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট হয়ে বিলেত যাই। রাজেনবাবু আবার খুশি হন। দু বছর বাদে যখন ফিরে আসি ও তাঁর সঙ্গে আবার দেখা করি তখন আমি বেঙ্গলে কাজ করব শুনে তিনি আনন্দিত হন। এক বছর বাদে আমি বিয়ে করে স্ত্রীকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। সেই মার্কিন কন্যাকে তিনি সানন্দে আশীর্বাদ করেন।

তারপর তাঁর সঙ্গে দীর্ঘকাল দেখা হয় না। আমি যখন ছুটিতে ঢেঙ্কানল যাই তখন দেখি তিনি সেখানে নেই। অন্য কোথাও চলে গেছেন চাকরি করতে।

ছাব্বিশ বছর বাদে একদিন। কলকাতায় আমার বড় ছেলের বিয়ের সময় হঠাৎ দেখি, মাস্টারমশায় এসেছেন খবরটা শুনে। সেদিন তাঁর সঙ্গে আমার অনেকক্ষণ কথাবার্তা হয়। তাঁর জীবনের সুখদুঃখের কাহিনী শুনলুম। তাঁর কাছে জানতে চাই, বিদেশিনী বিয়ে করার জন্য আমার বাবা কি আমার উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন? তিনি বললেন, 'না, না, তোমার বাবা তোমার বিবাহে সম্পূর্ণ সুখী হয়েছিলেন।'

জানতে পেলুম, তিনি ঢেঙ্কানল রাজ্যের পাশের রাজ্য আটগড়ে বাড়ি তৈরি করে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। তাঁর খুলনার বাড়ি তখন পাকিস্তানে পড়েছে। আটগড়েই তিনি হেডমাস্টারি করছিলেন, পরে অবসর নিয়েছিলেন।

এরপর আর তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। কিছুকাল পরে তাঁর মৃত্যুসংবাদ শুনি। ঢেঙ্কানল নামক দেশীয় রাজ্যের হাই ইংলিশ স্কুল তখনকার দিনে ওড়িশার একটি বিখ্যাত স্কুল। রাজাসাহেব ছিলেন গুণগ্রাহী ব্যক্তি। শিক্ষকরা সাধারণত সুনির্বাচিত ছিলেন। আজ আমি যাঁর কথা বলব তিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার মনোমোহন ঘোষ। তাঁর বাড়ি পাবনা জেলায়।

মনোমোহন ঘোষ

মনোমোহনবাবু আমাদের ইংরেজি ও ইতিহাস পড়াতেন। ইতিহাসও পড়ানো হত ইংরেজির মাধ্যমে। এই দুটি বিষয়েই আমি তাঁর প্রিয় ছাত্র হয়ে উঠি। স্কুলের বাইরেও তাঁর সঙ্গে অন্যান্য বিষয়েও আলোচনা হত। একবার আমি ব্রাহ্মদের সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করি। তখন তিনি বলেন, 'ওঁদের সম্বন্ধে তুমি কী জানো? না জেনে কেন বলতে যাও? স্কুলের

লাইব্রেরিতেই আছে প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের লেখা বই, সেই বই পড়ো না কেন?' তাঁরই অনুপ্রেরণায় ব্রাহ্ম সমাজ সম্পর্কে বই পড়ি। এবং মনে মনে একজন ব্রাহ্ম হয়ে উঠি।

আর একদিন ক্লাসের মাঝখানে আমাকে বলেন, 'দেখেছ তো একজন বাঙালি হয়েছেন বিহার-ওড়িশার গভর্নর। তিনিই কি শেষ?' এই বলে তিনি আমার দিকে মুচকি হেসে এমনভাবে তাকান, যেন আমিই লর্ড সিংহ হব। এমনি করে আমার মনে তিনি উচ্চাভিলাষের বীজ রোপণ করেন।

এইভাবেই মনোমোহনবাবু আমাকে নানাদিকে উৎসাহিত করেছিলেন। সেইজন্যে আমি লাইব্রেরি থেকে ইংরেজি বই নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশোনা করেছিলুম। বিশেষ করে ইতিহাসের যেসব বই পড়েছিলুম পরবর্তীকালে সেসব আমার কলেজে কাজে লেগেছিল। আমি যখন ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিই তখন সে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ঢেঙ্কানলের বাইরে কটক শহরে। সেই সময় মনোমোহনবাবু ঢেঙ্কানলের ছাত্রদের ভার নিয়ে কটকে যান।

আমার ভারনাকুলার ছিল ওড়িয়া। ভারনাকুলার পরীক্ষার দিন যখন প্রশ্নপত্র বিলি করা হয় তখন কটকের এক অধ্যাপক আমার মুখ দেখে আমার হাতে বাংলার প্রশ্নপত্র গছিয়ে দেন। আমার সে সময় বলা উচিত ছিল, এটা ফেরত নিয়ে আমাকে ওড়িয়া প্রশ্নপত্র দিন। আমি পরীক্ষার আগে ফর্ম পূরণ করার সময় লিখেও দিয়েছিলুম যে আমার ভারনাকুলার ওড়িয়া।

সুতরাং সেই অনুসারেই প্রশ্নপত্রের সংখ্যাও নির্দিষ্ট হয়েছিল। কিন্তু পরীক্ষার হল-এ আমার এসব কথা খেয়াল ছিল না। ইতিমধ্যে আমার বাংলা রচনা টলস্টয়ের গল্পের অনুবাদ 'প্রবাসী' পত্রিকায় বেরিয়ে গেছে। প্রশ্নপত্র হাতে নিয়ে দেখি, সবই আমার জানা। কেন আমি উত্তর দেব না! লিখলুম বাংলায় উত্তর। ফলাফল সম্বন্ধে ভাবিনি।

পরীক্ষার পরে মনোমোহনবাবু জেরা করলেন। কী লিখেছ? কেমন লিখেছ? আমি বাংলায় লিখেছি শুনে বললেন, 'তোমার তো বাংলায় লেখার কথা নয়। সর্বনাশ করেছ! সব ক-টা মার্কস কাটা যাবে।' তখন তিনি আমাকে ধরে নিয়ে যান ল্যামবার্ট সাহেবের কাছে। তিনি ছিলেন কটক কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ও পরীক্ষা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ। মনোমোহনবাবু তাঁকে বলেন, 'আমার এই ছাত্র ভুল করে ওড়িয়ার বদলে বাংলায় পরীক্ষা দিয়েছে। এর উত্তরপত্র যেন বাংলার পরীক্ষকের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আর একে যেন ক্ষমা করা হয়।'

মনোমোহনবাবু খুব পড়াশোনা করতেন, ছাত্রদের জন্যেও পরিশ্রম করতেন। কেউ তাঁর কাছে জানতে চাইলে তিনি যত্ন করে বুঝিয়ে দিতেন। কখনও রাগ করতেন না। ছাত্রদের স্নেহের চোখে দেখতেন।

ওঁকে আমি রোজই দেখতুম আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে। তখন তাঁর একমাত্র ধ্যান যেন বাজারে মাছ পাওয়া যাবে কিনা। আমাদের ওটা মৎস্যপ্রধান জায়গা ছিল না। কাজেই মৎস্যের সন্ধান ছিল মৎস্যগত প্রাণ বাঙালির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ভদ্রলোক ছিলেন ওজনে ভারি। কিন্তু পা দুটো ছিল খুবই ছোট। তাই স্কুলের দুষ্টু ছেলেরা আড়ালে বলত 'গুঠনি হাতি'। তিনি খুব কম কথা বলতেন। কিন্তু ক্লাসে যখন পড়াতেন তখন খুব ভাল ইংরেজি বোঝাতেন। পরবর্তীকালে আমার উচ্চতর শিক্ষায় কৃতিত্বের জন্য আমি মনোমোহনবাবুর কাছে ঋণী।

আমাদের বাড়ি আর তাঁর বাংলো ছোট একফালি মাঠের এপার-ওপার। আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে রোজ তাঁকে আপিসে যেতে আসতে দেখি, কিন্তু কোনওদিন আলাপ হয় না। রাশভারি মানুষ। হবারই কথা। তিনি একটি দেশীয় রাজ্যের জজ না ম্যাজিস্ট্রেট। দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তাঁর সঙ্গে আলাপের আগে তাঁর বিলিতি কুকুর বাচ্চার সঙ্গে আলাপ হয়ে যায়। সে কেমন করে ছাড়া পেয়ে পালিয়ে এসেছিল আমাদের বাড়িতে। আমাদের সঙ্গে নয়, আমাদের বিলিতি কুকুর মেরির সঙ্গে আলাপ করতে।

বাচ্চা পুরোপুরি কালো। তার বড় বড় বাঁকা বাঁকা লোম। আর মেরির লোম ছোট ছোট সোজা সোজা। রং কোথাও কালো, কোথাও সাদা। কী জানি কোনখানে তাদের মিলন ঘটে। মাঠে কি রাস্তার ধারে। তিনটি কি চারটি বাচ্চা রেখে মেরি মারা যায়। একটিকে রেখে বাকি সব ক-টিকে আমরা বিলিয়ে দিই। যেটিকে রাখি তার নাম দিই টোগো। আদরের কুকুর টোগোকে গেলুম সার্কাস শেখাতে। আর সে কিনা হঠাৎ খেপে গিয়ে আমার দু হাতে দিল কামড়ে। ছয়-সাত বছর বয়সের সেই দাগ পঁচানব্বই বছর বয়সেও মিলিয়ে যায়নি। টোগোকে ঝাড়ুদার পুকুরে নিয়ে যায় স্নান করাতে। জল লেগে সে মারা যায়। জলাতঙ্ক ছাড়া আর কী! চিকিৎসার জন্য কশৌলি না গিয়েও আমি সেরে উঠি। মাঝখান থেকে খেতে পাই একাই এক টিন হান্টলি অ্যান্ড পামার্সের নাইস বিস্কুট। কষ্ট না পেলে কি কেষ্ট মেলে। তা বলে কৃষ্ণপ্রাপ্তি নয়।

বাচ্চার ভয়ে কেউ দ্বিজেনবাবুর বাংলোয় ঘেঁষত না। আরেকটা ভয়ও ছিল। তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম। তার মানে ঠাকুরদেবতা মানেন না। শোনা যেত মুর্গিও খান। তার ডিমও। কী সর্বনেশে কথা। জাত যাবে, ধর্ম যাবে। মাছমাংস আমরাও খাই, তা বলে ওই নিষিদ্ধ মাংস! আমরা কি ম্লেচ্ছ! তবে পাঠান মাস্টারের বাড়ি গেলে তাঁর বিবি আমাকে যা খেতে দিতেন তা হাঁসের ডিম নয়। সেইটুকুর জন্যই সেকালে কত লোকে মুসলমান হয়ে গেছে।

বাচ্চারও অবশেষে মৃত্যু ঘটে। পরে একদিন বাবা আমাকে নিয়ে যান দ্বিজেনবাবুর বাড়ি। তিনি হাসিমুখে আমাদের আপ্যায়ন করেন। খেতে দেন কলকাতা থেকে আনা কেক পাঁউরুটি লজেন্স। এক প্যাকেট বাড়ির জন্যেও দেন। চা না কফি কী খেতে দিয়েছিলেন মনে নেই, কিন্তু অমন জিনিস আমি আগে কখনও খাইনি। যদিও চা আমাদের নিত্য অভ্যাস।

বলতে ভুলে গেছি যে তিনি আমার বাবার চেয়ে কেবল পদমর্যাদায় নয়, বয়সেও বড়। কিন্তু চিরকুমার। তাঁর পরিচয় ক্রমে ক্রমে জানতে পারি। তিনি প্রথম বাঙালি মহিলা ডাক্তার কাদম্বিনী গাঙ্গুলির সহোদর দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু। তিনিও স্বনামধন্য। তাঁর লেখা প্রাণীবিজ্ঞানের বই 'চিড়িয়াখানা' ও 'জীবজন্তু' আমি স্কুল থেকে প্রাইজ পাই। একবার 'সন্দেশ' পত্রিকাতে তাঁর লেখা পত্র প্রবন্ধ বেরোয়। তাঁর বাংলোতেই তিনি এক বিচিত্র জীবকে আবিষ্কার করেন। সেটাকে তিনি চিমটে দিয়ে ধরে কেরোসিন ল্যাম্পের আলোয় পরীক্ষা করেন। তখনকার দিনে সে রাজ্যে বিজলি বাতি ছিল না। সেই জীবটির ছবি তুলে পাঠান, ছাপা হয়। পত্রের সম্বোধন ছিল 'ভাই সন্দেশ'। নাম সই করেছিলেন 'মেজ দাদামশাই'।

অর্থাৎ সম্পাদক সুকুমার রায়ের মেজ দাদামশাই। সুকুমার রায় ছিলেন আমার প্রিয় লেখক। দ্বিজেনবাবু যে তাঁর নিকট আত্মীয় এ তো আনন্দের কথা। এর আগে বা পরে দ্বিজেনবাবুর ভাগ্নে অমল গাঙ্গুলিকেও আমাদের বাড়ির সামনে দেখি। ছোটখাটো একটি তালগাছ। শুনি যুদ্ধে যেতে চান। তাতে মামার আপত্তি। দ্বিজেনবাবু বলেন,'কেন পরের জন্য প্রাণটা দিতে যাবে? ইংরেজ আমাদের কে?' তিনি রাজ সরকারে চাকরি করলেও মনেপ্রাণে স্বদেশী। কখনও তাঁকে বিলিতি পোশাকে দেখিনি। বরাবরই ধুতি পাঞ্জাবি পরতেন। তাই পরে আদালতেও যেতেন। গুরুজনের কাছে শুনি তিনি ছিলেন সেকালের মুকুটহীন রাজা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহকর্মী। আসামের চা বাগান কুলিদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে পাঠানো হয়েছিল তাঁকে। প্রাণ হাতে করে ঘুরতে হয়। তাঁর ভগ্নীপতি দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও ছিলেন সেই অনুসন্ধানে রত। সেই পর্বের পর কেমন করে কোন সুবাদে তিনি ঢেঙ্কানল রাজ্যে এলেন তা আমি জানতুম না, এখনও জানিনে।

এককালে ঢেঙ্কানলেও একটি ব্রাহ্মসমাজ ছিল। তার বাড়িতে পরে সংস্কৃত টোল হয়। আরও পরে টাউন হল। আমাদের স্কুলের আগেকার দিনের হেডমাস্টার অক্ষয়বাবু ছিলেন ব্রাহ্ম। সেই সুবাদে স্কুল লাইব্রেরিতে ছিল ব্রাহ্ম ধর্ম সম্বন্ধে ইংরেজি বই। কতরকম ইংরেজি বই ছিল, ছাত্রদের যা পড়বার কথা নয়। কিন্তু আমি পড়তুম। বাংলা বই ছিল বিস্তর, ওড়িয়া ছাত্রদের যা পড়বার কথা নয়। রবীন্দ্রনাথ তখনও বিশ্ববিখ্যাত হননি, কিন্তু তাঁর অনেক বই ছিল। সেই সূত্র থেকে 'চয়নিকা' পড়ে আমি কবিগুরুর সঙ্গে প্রথম পরিচিত হই।

একটু একটু করে আমার সংস্কারমুক্তি ঘটে। খ্রিস্টান, মুসলমান প্রতিবেশীদের ও সহপাঠীদের সঙ্গেও মিশি। বাবার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন নানা ধর্মের লোক। ওদিকে দ্বিজেনবাবুর বাড়ি গিয়ে অসংখ্য বই পড়ি। ইংরেজি ও বাংলা পত্রিকাও। তিনি যা অদরকারি বলে ফেলে দেন তা আমি কুড়িয়ে আনি। 'স্ট্র্যান্ড', 'পিয়ার্সনস', 'গ্রাফিক', ইত্যাদি অমনি করেই বিলেত থেকে আমার টেবিলে আসে। অমনি করেই হাতে পড়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক রিপোর্ট। ইংরেজিতে লেখা। গোড়াতেই ছিল ব্রাহ্মদের মূল বিশ্বাসের সূত্র। সেই সূত্রগুলি এমন উদার আর এমন যুক্তিযুক্ত যে আমার মন সহজেই সায় দেয়। মনে মনে আমি তাঁদের একজন হয়ে যাই। সেই পুস্তিকায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদের একটি সুদীর্ঘ তালিকা ছিল। সেটি পড়ে আমি অবাক হয়ে যাই। জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কত বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত। এঁরাই তো এদেশের নবজাগরণের নায়ক।

দ্বিজেনবাবুর জন্যই আমার এ জ্ঞানটা হল। পরে তিনি অবসর নিয়ে কলকাতা চলে যান। সেখানে আমি তাঁর বাড়ি গিয়ে দেখা করি। তিনি আমাকে চিঠি দিয়ে 'সার্ভেন্ট' ও 'বসুমতী' সম্পাদকের কাছে পাঠান সাংবাদিকতায় শিক্ষানবিশি করতে। তাঁর স্নেহশীলতায় ও আপ্যায়নে আমি মুগ্ধ হয়ে যাই। বাংলা সাহিত্যে তাঁর যোগ্য আসন তিনি পাননি, এই যা দুঃখ।

ঢেঙ্কানল হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে আমি কটক রেভেন্‌শ কলেজে যাই আই. এ. পড়তে। সেখানে থাকি ছোটকাকার বাসায়। কলেজ থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে। রোজ পায়ে হেঁটে যেতে আসতে কষ্ট হত। তাই একটা ভাঙা সাইকেল সস্তায় কিনি। একদিন সেই সাইকেল চড়ে পথে যাওয়ার সময় একজনের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। লোকটি পড়ে যায়। আমি সাইকেলে চড়ে ছুট দিই।

আর আমার পেছন পেছন ছোটে এক পুলিশ কনস্টেবল। বাসার কাছে আমি যখন থামি, সে আমাকে ধরে ফেলে। ভয় দেখায়। এমন সময় আমার সহপাঠী শরৎচন্দ্র মুখার্জির আবির্ভাব। শরৎ বলে, তোমার পকেটে কিছু আছে? আমি একটা দু আনি বার করি। শরৎ সেটা কনস্টেবলের হাতে গুঁজে দেয়। তাই নিয়ে আমাকে ছেড়ে দেয় লোকটি। তখন থেকেই শরতের সঙ্গে আমার বন্ধুতা।

মাস ছয়েক আমি পুরী জেলা স্কুলে পড়েছিলুম। সে সময় কালিন্দী চরণ পানিগ্রাহীর সঙ্গে আমার বন্ধুতা হয়। কালিন্দীও ম্যাট্রিকুলেশনের পর কটক কলেজে ভর্তি হয়েছিল। পুরী জেলাস্কুল থেকে ঢেঙ্কানল হাইস্কুলে ফিরে এসে দেখি, একটি নতুন ছেলে আমার ক্লাসে ভর্তি হয়েছে। তার নাম বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়ক। সে-ও আমার সঙ্গে কটক কলেজে ভর্তি হয়। কালিন্দীর বন্ধু ছিল হরিহর মহাপাত্র। সেও আমাদের সহপাঠী। এমনই করে আমরা পরস্পরের বন্ধু হই।

আমাদের পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে ছিল Couper's letters; উচ্চারণ কুপার্—কুপার'স্ লেটার্স। তার এক জায়গায় ছিল Nonsense Club-এর উল্লেখ। একদিন বৈকুণ্ঠ বলে, 'এসো আমরা একটা ননসেন্স ক্লাব করি।' সকলে রাজি হয়ে যায়। আমাদের ক্লাবের একটি হাতে লেখা পত্রিকা ছিল। তার নাম ননসেন্স ক্লাব ম্যাগাজিন। সেই পত্রিকায় আমি লিখতুম বাংলা, ওড়িয়া ও ইংরেজি এই তিন ভাষায়। অন্যরা দু ভাষায় বা এক ভাষায়। হরিহর পত্রিকার নামকরণ করেছিল 'অবকাশ'। অর্থাৎ অন্নদা, বৈকুণ্ঠ, কালিন্দী ও শরৎ।

বৈকুণ্ঠ থাকত তার এক আত্মীয়র বাসায়। পশু ডাক্তারখানার লাগোয়া। তার আত্মীয় ছিলেন পশু ডাক্তার। গোরু, ঘোড়া, কুকুর প্রভৃতি নানান জন্তু আসত চিকিৎসার জন্য। কারও কারও ক্ষেত্রে অপারেশনও হত। বৈকুণ্ঠকে শুনতে হত তাদের আর্তনাদ। তাছাড়া বৈকুণ্ঠ দেখত মিউনিসিপ্যালিটির লোক রাস্তার কুকুর ধরে নিয়ে যাচ্ছে মেরে ফেলার জন্য। শেষ পর্যন্ত সহ্য করতে পারত না। বিষণ্ণ মনে কবিতা লিখত। করুণ রসের কবিতা। তার কোনও কোনও কবিতা 'উৎকল সাহিত্য' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হত। কয়েক বছর বাদে আমরা সকলেই বিভিন্ন ওড়িয়া পত্রিকায় স্থান পাই। লোকে আমাদের বলে 'সবুজ দল'। 'সবুজ' কথাটা ওড়িয়া ভাষায় ছিল না। এটা আমি পেয়েছিলুম বাংলা 'সবুজপত্র' থেকে।

আমাদের দলের মতবাদও ছিল 'সবুজপত্রে'র অনুরূপ। আমরা সকলেই প্রচুর বাইরের বই পড়তুম। বেশিরভাগ ইংরেজি কিংবা ফরাসি, জার্মান, রাশিয়ান ইত্যাদি ভাষার থেকে ইংরেজি অনুবাদ। আমরা সকলেই ছিলুম রবীন্দ্র অনুরাগী। সেই সঙ্গে শেলি কিটস

ইত্যাদি রোমান্টিক কবিদের অনুরাগী। আমাদের জীবনদর্শন ছিল রোমান্টিক।

তবে কালিন্দী ও শংকরের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল কলেজে ভর্তি হওয়ার আগেই। আমরা যারা অবিবাহিত তারা প্রেমের স্বপ্ন দেখতুম, পরবর্তীকালে প্রেমের কবিতাও লিখতুম। বৈকুণ্ঠের একটি কবিতার দুটি লাইন ছিল, যাকে বাংলা করলে দাঁড়ায়, 'দেখিলে গোলাপি অঞ্চল আমি শিশুমতো হই চঞ্চল।' এই নিয়ে তাকে আমরা খ্যাপাতুম। কিন্তু ওর নাম হয়েছিল পশুপাখিদের কবি হিসেবে। বার্নার্ড শ একবার বলেছিলেন 'Birds, Beasts and Bergson', তাঁর সেই উক্তির অনুকরণে নবদা বলতেন, 'Birds, Beasts and Baikuntha.' নবদা ছিলেন আমাদের সকলের বয়ঃজ্যেষ্ঠ বন্ধু—নবকৃষ্ণ চৌধুরী।

আমাদের সামাজিক মতবাদ ছিল সংস্কারকের। সম্ভব হলে আমরা বিয়ে করতুম জাতিভেদ ধর্মভেদ না মেনে। তার আগে প্রেমে পড়ে। আমাদের রাজনৈতিক মতবাদ ছিল কংগ্রেস পন্থীদের মতো। দেশের লোক যখন স্বরাজের জন্য জেলে যাচ্ছে তখন আমরা কিনা গোলামখানায় পড়ছি?

শরৎকে আমি বলি, 'চলো, আমরাও গান্ধীজির পরিকল্পিত গণ-সত্যাগ্রহে যোগ দিয়ে কারাবরণ করি।' শরৎ বলে, 'আমরা দুজন মাত্র যোগ দিলে কী হবে? দলবদ্ধ ভাবে যোগ দেওয়ার দরকার। তার জন্য চাই একজন নেতা। যেমন ডক্টর প্রাণকৃষ্ণ পরিজা।' সবচেয়ে জনপ্রিয় অধ্যাপক। শরৎ গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে ও প্রস্তাবটা জানায়।

পরিজা সাহেব বলেন, 'প্রস্তাবটা তো ভালই। আমি কেমন করে চাকরি ছাড়ি? সরকারি বৃত্তি নিয়ে বিলেত যাওয়ার সময় আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলুম যে পাশ করে ফিরে এসে আমি অন্তত পাঁচ বছর সরকারি চাকরি করব, নতুবা সরকারকে বৃত্তির টাকা ফেরত দেব। এখনও পাঁচ বছর হয়নি।' তাঁর সেই কথা শুনে আমরা আমাদের সংকল্প ত্যাগ করি। পড়াশুনোয় মন দিই।

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই.এ. পরীক্ষায় আমার স্থান হয় প্রথম, শরতের দ্বিতীয়। শরৎ চলে যায় পাটনায় অর্থনীতি নিয়ে বি.এ. পড়তে। তার টান এড়াতে না পেরে আমিও তাকে অনুসরণ করি। কিন্তু অর্থনীতি নয়, ইতিহাস নিয়ে বি.এ. অনার্স পড়তে। সেটা যদুনাথ সরকারের আকর্ষণে। কিন্তু ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকগুলি দেখে আমি ভয় পেয়ে যাই। সেগুলি এক-একটি গন্ধমাদন। আমার পক্ষে ইংরেজি আরও সহজ। তাই ইংরেজিই বেছে নিই। যথাকালে আমরা দুজনেই প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাই। যে যার বিষয়ে।

সংকল্প ছিল কলকাতায় ফিরে গিয়ে আমি সাংবাদিকতা পাব। কিন্তু পাটনাতেই আমি এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হই। বছর দুই বাদে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হয়ে বিলেত যাই। এবং পড়া সাঙ্গ হয় না।

আর শরৎ এম. এ. পড়তে পড়তে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ পেয়ে বিহার-ওড়িশা সরকারের অধীনে চাকরি নেয়। বি.এ.-র কিছুদিন পরেই বিয়ে। অসবর্ণ বিবাহ। অন্যতম সাক্ষী আমি।

তখন কি আমি জানতুম যে বিলেত থেকে ফিরে আসার এক বছরের মধ্যেই এক মার্কিন তরুণীর সঙ্গে আমার পরিচয়, প্রেম ও পরিণয় হবে! সব কিছু দু-মাসের মধ্যে। আশ্চর্যের ব্যাপার, বিয়েটা হয় রাঁচিতে, শরতের সরকারি বাসস্থানে। শরৎ অন্যতম সাক্ষী। বিয়ের যাবতীয় বন্দোবস্ত শরৎই করেছিল। নেমন্তন্ন করেছিল বিশিষ্ট বাঙালি নাগরিকদের।

তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। তাঁদের রাঁচিতে একটি বাড়ি ছিল।

আমাদের সবুজ দল ক্রমশ ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। আমি ওড়িয়ায় লেখা বন্ধই করে দিই। বাংলায় আমার লেখা আগে থেকে বের হত। এরপর কেবলমাত্র বাংলা লেখাতেই মনোনিবেশ করি। শরতের লেখা বন্ধ হয়ে যায়। সেটা সরকারি কাজের চাপে। হরিহরের লেখা বন্ধ হয়ে যায় ওকালতির দাবিতে। বাকি থাকে কালিন্দী আর বৈকুণ্ঠ। এরাও চাকরিবাকরি করে, কিন্তু লেখা চালিয়ে যায়। দায়বদ্ধভাবে কিছু করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

এমন সময় শরৎ কটকে বদল হয় ও 'সবুজ সাহিত্য সমিতি' গঠন করে। সমিতির প্রথম গ্রন্থের নাম 'সবুজ কবিতা'। লেখক আমরা পাঁচজন। দ্বিতীয় গ্রন্থ 'বাসন্তী' নামক বারোয়ারি উপন্যাস। ইয়ারদের মধ্যে কয়েকজন বাইরের লেখক-লেখিকা ছিলেন। বৈকুণ্ঠ ভিন্ন আমরা চারজন ছিলুম। বৈকুণ্ঠ কিছুতেই গদ্য লিখবে না। গদ্য লিখলে নাকি কবিতার হাত নষ্ট হয়ে যায়। এই প্রতিজ্ঞা সে সারাজীবন পালন করেছিল। কবি হিসেবে সে বিখ্যাত হয়েছিল।

তবে কালিন্দীর মতো নয়। কালিন্দী পেয়েছিল পদ্মভূষণ সম্মান। হরিহর হয়েছিল হাইকোর্টের জজ। আর শরৎ হয়েছিল ইংরেজ শাসনের শেষ বছরের রায়বাহাদুর। কংগ্রেস আমলে কমিশনার পদে উন্নীত হয়ে সে যথাকালে অবসর গ্রহণ করে। কিন্তু তার সাহিত্যের সাধনায় ছেদ পড়ে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে সবুজ সাহিত্য সমিতিও লোপ পেয়েছিল। শরৎ সবুজ সাহিত্যের গোড়ার দিকের ইতিবৃত্ত রচনা করে। পরবর্তীকালে ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাসে 'সবুজ যুগ' বলে একটি অধ্যায় যুক্ত হয়।

এখানে বলে রাখি যে সাহিত্যিক কীর্তির বাইরে কালিন্দীর আর এক কীর্তি তার কন্যা নন্দিনী শতপথী, একদা ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী। আর বৈকুণ্ঠের কীর্তি তার কন্যা সুনন্দা পট্টনায়ক, স্বনামধন্যা মার্গ সঙ্গীতশিল্পী।

কলেজ থেকে বেরোবার পর আমরা সবুজ দলের সদস্যরা যে যার কর্মস্থলে যাই ও পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি।

হরিহর মহাপাত্র কটকে বসে ওকালতি করার সময় সবুজ দলের নিজস্ব মুখপত্র 'যুগবীণা' সম্পাদনা করে। বেশ সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল। চালাতে পারলে দীর্ঘস্থায়ী হত। কিন্তু ওকালতির ব্যবসায়ে সফল হতে হলে আদালতের বাইরে মক্কেলদের কাজে অনেক সময় খরচ করতে হয়। হরিহর বছরখানেক বাদে পত্রিকার হাল ছেড়ে দেয়। সে সময় কটকে আমাদের দলের আর কেউ ছিল না যে এই ভারটি নিতে পারে।

শরৎ বদলি হয়ে কটকে এসে পত্রিকাটি বাঁচাবার চেষ্টা করে। সবুজ সাহিত্য সমিতি স্থাপন করে। সমিতির সভ্যপদে আরও কয়েকজনকে নেওয়া হয়েছিল। তারা গোষ্ঠীর বাইরের। সমিতি তাদেরও পুস্তক প্রকাশ করে।

তাদের একজনের নাম হরিশচন্দ্র বড়াল। আমাদের সহপাঠী, কিন্তু গোষ্ঠীভুক্ত নয়। কলেজে পড়ার সময় তার সাহিত্যিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়নি। পরে হরিশ নিখিল ভারতীয় প্রতিযোগিতায় জিতে ইন্ডিয়ান রেলওয়ে সার্ভিসেসে যোগ দেয়। আমার সঙ্গে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসেস প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে সে বেশ উঁচু স্থান পেয়েছিল, কিন্তু

প্রথম নয় জনের নীচে, অথচ খুবই কাছাকাছি। জীবিকার ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে সে ওড়িয়া ভাষায় বই লিখতে আরম্ভ করে। সমিতি হয় তার প্রকাশক। অবশ্য তার চাকরি ওড়িশার বাইরে। গোড়ার দিকে বোম্বাইতে।

আমার চাকরি তৎকালীন বঙ্গদেশে। কালিন্দী কিছুদিন ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে কাজ করেছিল। আর বৈকুণ্ঠ কটকের বাইরে কোথায় যেন শিক্ষকতা করছিল।

বলতে গেলে শরৎ এক হাতেই সমিতি পরিচালনা করে। টাকাপয়সার হিসাব রাখে। বই ছাপতে দেয়। বিক্রির ব্যবস্থা করে। লাভের অংশ দেয়। ওর মতো অসাধারণ কর্মপটু পরিচালক আমরা আর কেউ ছিলুম না।

সবুজ সাহিত্য সমিতি উঠেই যেত যদি না কালিন্দী ময়ূরভঞ্জের চাকরি ছেড়ে দিয়ে কটকে এসে বসত। তখন তার পেশা বলতে জীবনবীমার এজেন্সি। সে সমিতি পরিচালনার দায়িত্ব নেয়। আরও বই প্রকাশ করে। আর তার মধ্যে লেখে তার বিখ্যাত উপন্যাস 'মাটির মণিষ' ('মাটির মানুষ')। সেটির বাংলা অনুবাদ করেন সুখলতা রাও। আর লীলা রায় করেন ইংরেজি অনুবাদ। বইখানি সমিতির তরফ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল কিনা! ওর আরও দু-খানি উপন্যাসের নাম মনে আছে। 'মুক্তাগড়র ক্ষুধা'। 'অমর চিতা'। তার নাটক 'সোমেনা' আমাকে উৎসর্গ করেছিল। পরিবর্তে আমিও তাকে আমার একটি কবিতার বই উৎসর্গ করি। 'কামনাপঞ্চবিংশতি'।

সমিতির কাজ ভালই চলছিল। কিন্তু কী জানি কেন কী কারণে ছেদ পড়ে যায়। কালিন্দীর সঙ্গে পরে কটকে আমার কথাবার্তা হয়। সে বলে, 'বাজারে যার চাহিদা নেই তেমন বই প্রকাশ করে লাভ নেই। লিখতে হয় চাহিদা অনুসারে।'

আমি খুবই দুঃখিত হই। আমার নীতি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। চাহিদা যদি না থাকে, আমি চাহিদা সৃষ্টি করব। একদিন-না-একদিন চাহিদা হবে। ভাগ্যক্রমে কলকাতায় ছিলেন সুধীরচন্দ্র সরকার ও গোপালদাস মজুমদার। তাঁরা ঝুঁকি নিয়ে আমার বই বার করেছেন। সেটা বাংলা বইয়ের বেলাতেই সম্ভব, ওড়িয়া বইয়ের বেলায় নয়।

ওড়িশায় তখন পাঠ্যপুস্তক কি ধর্মপুস্তকের চাহিদা। বৈকুণ্ঠকে তার কবিতা গ্রন্থের জন্য এক মহারাজার শরণাপন্ন হতে হয়েছিল। অথচ বৈকুণ্ঠ ছিল কবি হিসাবে সবুজ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। অপরজন কালিন্দী।

শরৎ রাঁচি বদলি না হলে বোধহয় এ জীবনে লীলার সঙ্গে আমার প্রেম ও পরিণয় সম্ভব হত না। সেই গল্পটা একটু বিশদভাবে বলি।

মার্কিন কন্যা অ্যালিস ভার্জিনিয়া বেরিয়েছিলেন ইউরোপে বাইরুট সঙ্গীত উৎসবে যোগ দিতে। লন্ডনে তাঁর দেখা হয়ে যায় ব্রিটিশ মিউজিয়মে আমার বন্ধু ভবানী ভট্টাচার্যের সঙ্গে। তখন লীলার খেয়াল হয়, তিনি ভারতীয় সঙ্গীত শিক্ষা করবেন। ভবানী তাঁকে পরামর্শ দেয়, আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে।

আমি তখন বহরমপুরে নতুন চাকরিতে যোগ দিয়েছি। 'আগুন নিয়ে খেলা' উপন্যাস লিখছি। কলকাতা থেকে অ্যালিস ভার্জিনিয়ার চিঠি পেয়ে আমি তাঁকে বহরমপুরে আমন্ত্রণ করি। সেখানকার সার্কিট হাউসে তাঁর রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করে দিই। দিনের বেলা তাঁকে সঙ্গে নিয়ে মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারি দর্শন করি। তিনি যখন ফিরে যান তখন ধরে নিই, তাঁর সঙ্গে আর কখনও আমার দেখা হবে না।

মাসখানেক বাদে যখন আমি পুজোর ছুটিতে কলকাতায় আসি তখনও তিনি কলকাতায়। সঙ্গীত শিক্ষার জন্য লখনউ যেতে পারছেন না। বাড়ি থেকে টাকা আসেনি বলে। আমি বেরিয়েছিলুম রাঁচিতে পুজোর ছুটি কাটাতে। তাঁকে বললাম, 'কলকাতায় বসে না থেকে রাঁচিতে গিয়ে আদিবাসীদের সঙ্গীত শুনুন। থাকবেন শরতের ওখানে।'

ভাবিনি তিনি সত্যি সত্যি রাঁচিতে গিয়ে উপস্থিত হবেন এবং আমার বন্ধু শরতের অতিথি হবেন। সেইখানেই আকস্মিকভাবে প্রেম ও সতেরো দিনের মাথায় বিবাহ। শরৎই আয়োজন করেছিল। তার স্ত্রী শান্তিই বলতে গেলে বিবাহটা দিয়েছিলেন।

বিবাহের পরদিন ওঁর নতুন নাম হয় লীলা। শরতের বিয়েতে আমি সাক্ষী ছিলুম, আমার বিয়েতে শরৎ সাক্ষী হল।

বিয়ের পরে আমি লীলাকে নিয়ে আমাদের ঢেঙ্কানলের বাড়িতে যাই। আমার মা ছিলেন না। আমার বাবা লীলাকে সাদরে গ্রহণ করেন। তিনি তখন শাঁখা সিঁদুর ও শাড়ি পরে বাঙালি বধূ। বাংলায় দুটি-একটি কথা বলেন।

লীলার আর লখনউ যাওয়া হল না, ভারতীয় মার্গ সঙ্গীত শেখাও হল না। পিতার আদেশে দেশে ফিরে যেতে হল। সেখানে তাঁর বাবা-মা তাঁকে বললেন, স্বামীকে ত্যাগ করতে আর নয়তো বাবা-মাকে ত্যাগ করতে। শেষেরটাই তিনি করলেন। ফিরে এসে হলেন আমার জীবন সঙ্গিনী। যথাকালে শরৎ হল আমার পুত্রকন্যার শরৎমামা।

সবুজ দলের লেখকরা ইচ্ছে করলে যে কোনও ভাষায় লিখতে পারতেন। আমরা লিখতুম তিনটি ভাষায়। বাংলা, ওড়িয়া, ইংরেজি। বাংলা লেখা প্রকাশিত হত 'প্রবাসী'তে, 'ভারতী'তে। ওড়িয়া 'উৎকল সাহিত্যে' ও 'সহকারে'। আর ইংরেজি লেখা কটক কলেজ ও পাটনা কলেজ ম্যাগাজিনে। একদিন অনুভব করলুম, তিনটি ভাষায় লিখে আমি বেশি দূর অগ্রসর হতে পারব না। ওড়িয়া ভাষায় আমার লেখার বিষয় ছিল সীমাবদ্ধ। আমাকে বাংলাতেই লিখতে হবে এবং একমাত্র বাংলাতেই।

ইতিমধ্যে আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলুম শান্তিনিকেতনে। আমার জিজ্ঞাসার বিষয় ছিল আর্ট। 'Is Art too good to be human nature's daily food?' টলস্টয়ের ও রলাঁর সঙ্গে আমার মত মিলছিল না। গুরুদেব বললেন, 'উচ্চতর গণিত যেমন সকলের জন্যে নয় তেমনই উচ্চাঙ্গের আর্টও সকলের জন্যে নয়। তার জন্যে শিক্ষার প্রয়োজন।' তিনি কলকাতা যাচ্ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে। বললেন যে সেই বক্তৃতায় তিনি আমার প্রশ্নের উত্তর দেবেন।

আমি একটা মধ্যপন্থা গ্রহণ করি। আমি পাঠকের অভিমুখে অর্ধেক পথ যাব, পাঠকও অর্ধেক পথ আমার অভিমুখে আসবে।

পরবর্তী জীবনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আরও কয়েকবার দেখা হয়েছিল। সেসব কথা পরে।

ওড়িয়া ভাষায় যখন 'সবুজ যুগ' বাংলা ভাষায় তখন 'কল্লোল যুগ'। কিন্তু 'কল্লোলে' আমার কলেজ জীবনে আমি কিছু লিখিনি। পরে বিলেত গিয়ে যখন 'পথেপ্রবাসে' লিখি তখন 'কল্লোলে'র অনুরোধে কয়েকটি লেখা পাঠাই। দুঃখের বিষয়, আমার বিলেত থেকে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে 'কল্লোল' উঠে যায়। আমার লেখা 'বিচিত্রা'তেই প্রধানত প্রকাশিত হয় সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিশেষ অনুরোধে।

‘পরিচয়’ ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

কিছুদিন পরে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাছ থেকে একখানি চিঠি পাই। তাঁর ইচ্ছা ‘পরিচয়’ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করার। ত্রৈমাসিক পত্রিকা। আমাকে তাঁর পরিকল্পনা জানান ও আমার সহযোগিতা চান। আমি তাঁকে লিখি, ‘পরিচয়’কে করতে হবে ফরাসি পত্রিকা 'Nouvelle Revue Francaise'-এর আদর্শে। অর্থাৎ ওটা হবে একটা ম্যাগাজিন নয়, একটা রিভিউ। উনি তার উত্তরে লিখলেন, অত বড় আদর্শ কাজে পরিণত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না।

আমি লেখা দিই। লেখা ছাপা হয়। সেই সূত্রে আমি ‘পরিচয়’ গোষ্ঠীর সামিল হয়ে যাই।

‘পরিচয়ে’র বৈশিষ্ট্য ছিল তার পুস্তক পরিচয় বিভাগ। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ভাষার গ্রন্থ ছিল সমালোচনার বিষয়। যে-কাজ ‘সবুজ পত্র’ পারেনি সে-কাজ ‘পরিচয়’ পেরেছিল। তাছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ বেরোত। তারও বিষয়বস্তু বিশ্বব্যাপী। লেখকেরা ‘সবুজ দলে’র লেখকদের মতো ছাত্র নয় বা ‘কল্লোলে’র লেখকদের মতো বোহেমিয়ান নয়। পরিণত বয়সী ও সুপ্রতিষ্ঠিত।

‘পরিচয়ের’ও একটা আড্ডা ছিল। সেটা বসত প্রত্যেক শুক্রবার, সুধীন্দ্রনাথের বাসভবনে। চা পরিবেশন করতেন তাঁর সহধর্মিণী। যাঁরা যোগ দিতেন তাঁদের মধ্যে থাকতেন শাহেদ সুহরাবর্দির মতো কয়েকজন বিদগ্ধ অধ্যাপক, কয়েকজন ইউরোপীয় সাংবাদিক বা মিশনারি, তাছাড়া নতুন ও পুরাতন বাঙালি লেখক। বলা যেতে পারে কলকাতার এলিত (elite)। সবাই যে ‘পরিচয়ে’ লিখতেন তা নয়, তাঁরা আসর জমিয়ে রাখতেন। মধ্যমণি ছিলেন স্বয়ং সুধীন্দ্রনাথ। প্রিয়দর্শন ও সুপুরুষ। তাঁর পত্নীও ছিলেন তেমনই সুন্দরী। আমার কর্মস্থল ছিল কলকাতার বাইরে। কখনও কখনও কলকাতায় এলে আমি ‘পরিচয়ে’র আসরে গিয়ে উপস্থিত হতুম।

সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন বিনয়ের অবতার। তাঁর মধ্যে কোনও হামবড়া ভাব ছিল না। যদিও তাঁর ছিল এক বিরাট পুস্তক সংগ্রহ। তাঁর জীবনে ছিল দেশবিদেশের বিচিত্র অভিজ্ঞতা। তাঁর পিতা হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় ছিলেন বিখ্যাত দার্শনিক। পুত্রকে তিনি পাঠিয়েছিলেন বেনারস হিন্দু কলেজে। ফলে তিনি সংস্কৃত ভাল জানতেন। আমি তাঁর গদ্য ও পদ্য পড়ে ঠাট্টা করে বলতুম, তিনি চিন্তা করেন ইংরেজিতে, অনুবাদ করেন সংস্কৃতে, প্রকাশ করেন বাংলায়। তিনি নিজেও স্বীকার করতেন, তাঁর রচনা দুর্বোধ্য। তিনি আমার রচনার প্রসাদগুণের প্রশংসা করতেন।

কথাটা শুনেছি, তবে কতদূর সত্য বলতে পারব না। ‘পরিচয়’ প্রকাশের পূর্বে তিনি আমাদের সবাইকে লেখার জন্য আমন্ত্রণ করেছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে নয়, যদিও তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রিয়পাত্র ভ্রমণসঙ্গী। তাঁর আশঙ্কা ছিল যে রবীন্দ্রনাথ এলে ‘পরিচয়’ হয়ে উঠবে তাঁর মুখপত্র। যেমন হয়েছিল ‘সবুজ পত্র’।

মজার ব্যাপার, এই যে রবীন্দ্রনাথ অযাচিতভাবে লেখা পাঠিয়ে দেন। আর সুধীন্দ্রনাথ সেটি প্রকাশ না করে পারেন না। হীরেন্দ্রনাথ দত্তও ‘পরিচয়ে’র সঙ্গে বেখাপ। কারণ তিনি

এ যুগের লোক নন। কিন্তু ‘পরিচয়’ চলত তাঁরই অর্থানুকূল্যে।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর হীরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। সুধীন্দ্রনাথ একদিন আমাকে লেখেন, আমি আর ‘পরিচয়’ চালাতে পারছি না। এটা কমিউনিস্টদের হাতে তুলে দিচ্ছি। এরপর তিনি যে কেবল ‘পরিচয়’ ছাড়লেন তা-ই নয়, উত্তর কলকাতার পৈত্রিক ভিটাও ছাড়লেন। পুরাতন পত্নীও ছাড়লেন। নতুন পত্নী গ্রহণ করলেন। উঠে গেলেন সাহেব পাড়ায় নতুন ফ্ল্যাটে। কাজ নিলেন ইংরেজি কাগজ স্টেটসম্যানে। তাঁর বেশভূষা হল ইংরেজদের মতো। একই সঙ্গে বাংলা ভাষাও ছাড়লেন। বাংলায় লিখতেন কদাচিৎ। তার ফলে বাঙালি সাহিত্যিক মহলের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব বেড়ে যায়।

তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ আমরা কেউ সমর্থন করিনি। হয়তো করতুম যদি সাহেবদের মতো তিনি তাঁর প্রথম স্ত্রীকে ডিভোর্স করতেন। তখন সেই মহিলা পুনরায় বিবাহ করতে পারতেন। কিন্তু হিন্দু আইনে সেটা সম্ভব ছিল না।

তাছাড়া এটাও ঠিক, তিনি তাঁর প্রথম স্ত্রীকে ভালবাসতে ভোলেননি। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর বিষয়-সম্পত্তি দেবযানী ও শর্মিষ্ঠার মধ্যে সমান ভাগ করে দিয়েছিলেন। একটি কবিতায় তিনি নিজেকে যযাতির সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। তাঁর প্রথম স্ত্রীর নাম আমার মনে পড়ছে না। দ্বিতীয় স্ত্রী রবীন্দ্রসঙ্গীত-গায়িকা রূপে খ্যাত রাজেশ্বরী বাসুদেব।

ভবানী ভট্টাচার্য

শরৎ না থাকলে লীলার সঙ্গে পরিণয় হত না, আর ভবানী না থাকলে লীলার সঙ্গে আমার পরিচয়ই হত না। আমার জীবনে এই দুজনের ভূমিকা শুধুমাত্র সাহিত্যের সৌহার্দ্য নয়। কীভাবে ভবানীর সৌজন্যে লীলার সঙ্গে যোগাযোগ হয় সেকথা আগেই বলেছি।

ভবানী ছিল পাটনা কলেজে বছর তিনেকে জুনিয়র। কী করে ওর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয় সেটা বেবাক ভুলে গেছি।

দ্বিতীয়বার ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস প্রতিযোগিতায় যোগদানের সময় মেডিক্যাল এগজামিনেশনের জন্য আমাকে যেতে হয়েছিল রাঁচিতে। সেবার ভবানীর সৌজন্যে আমি হই ওর বাবার অতিথি। তিনি তখন রাঁচির সাবজজ।

তাঁর সঙ্গে একদিন কথা প্রসঙ্গে বলি, ‘ভবানী সাহিত্যিক হতে চায়। ওর সাহিত্যিক প্রতিভা আছে।’

তিনি গম্ভীরভাবে বলেন, ‘ওকে বিয়ে করাতে হবে, সংসারী হতে হবে। তার জন্যে চাই একটা কেরিয়ার। তুমি কেন নিজের জন্যে কেরিয়ার চাও?’

প্রতিযোগিতায় সফল হয়ে আমি বিলেত যাই। লন্ডনে শিক্ষানবিশি করি। পরের বছর দেখি, ভবানীও সেখানে উপস্থিত। সে লন্ডনে কিংস কলেজে ভর্তি হয়। সেখানে ইতিহাস নিয়ে বি.এ. পড়বে। যদিও আমরা দুজনে দুই পাড়াতে থাকি, দেখাসাক্ষাৎ কদাচিৎ হয়। তবে দুজনেই বিদেশে থাকার দরুন সম্পর্কটা আরও নিবিড় হয়।

একদিন ইস্টারের ছুটিতে ভবানী ও আমি এক জায়গায় মিলিত হই। এমন সময়

দেখতে পাই, আমাদের সামনে দিয়ে একটা বাস যাচ্ছে। আমরা দুজনে হুড়মুড় করে তাতে উঠে পড়ি। বাস কোথাও থামে না। এক দমে ছুটে যায় ব্রিস্টল নগরে। এটা একটা অ্যাডভেঞ্চার। আমরা ভেবে দেখি, এতদূর যখন এসেছি, কার্ডিফটাও দেখে আসি। কার্ডিফে পৌঁছবার পর মনে হল, ওয়েলসটাও পুরোপুরি দেখা যাক। আরও একটা বা দুটো জায়গায় থেমে আমরা চলে যাই বাস যোগে ম্যানোরভিয়া বলে একটা গ্রামে। সেটা সমুদ্রের ধারে। এমন করে ইস্টারের ছুটি কাটিয়ে আমরা এক দৌড়ে লন্ডনে ফিরি। এবার রেলপথে। আবার আমাদের ছাড়াছাড়ি। আমরা যে যার পাড়ায় থাকি।

আমার শিক্ষানবিশি শেষ হয়ে যায়। দুবছর লন্ডনে থেকে আমি দেশে ফিরি। লন্ডনে ভবানী বি.এ. পাস করে পিএইচ.ডি করে। সে সময়ে সে লন্ডনের সাহিত্যিক মহলে ঘোরাফেরা করে। একদিন দেখি আমার হাতে এসেছে 'দ্য গোল্ডেন বোট' নামে একটি বই। রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' ও আরও কিছু লেখার অনুবাদ। যতদূর মনে পড়ে 'লিপিকার'ও কিছু অংশের অনুবাদ ছিল। অনুবাদক ভবানী ভট্টাচার্য। প্রকাশক জর্জ অ্যালেন অ্যান্ড আনউইন। আমি তো খুব খুশি। ভবানী তার প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে ইংরেজি ভাষায়। আর সে ইংরেজি ভারতীয়দের মতো নয়, ইংরেজদের লেখা ইংরেজি।

বছর পাঁচেক বাদে ভবানী যখন দেশে ফিরে আসে তখন ওর বাবা পূর্ণিয়ার জেলা জজ। তিনি ওর বিয়ের জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দেন। সে বিজ্ঞাপনটা পড়ে আমি খুব মজা পাই। কৌতুক করে লিখে ফেলি 'পুতুল নিয়ে খেলা'। ভবানী হল এই উপন্যাসের নিমিত্ত।

এর আগে লিখেছিলুম 'আগুন নিয়ে খেলা'। সেটাও ফুর্তি করে লেখা। কেউ জানত না যে 'আগুন নিয়ে খেলা'র নিরুদ্দেশ যাত্রার সহযাত্রী ছিল ভবানী। ভবানীকেই আমি পেগি সাজিয়েছি। 'আগুন নিয়ে খেলা' যখন বই হয়ে বেরোয় তার কিছুদিন পরে আমার বিয়ে হয়ে যায়। তখন লোকে ভাবে, পেগি আর কেউ নয়, লীলা।

বিজ্ঞাপনের ফলে ভবানীর বিয়ে হয়ে যায় নাগপুরের বিখ্যাত ডাক্তারের কন্যা সলিলার সঙ্গে। লীলার সঙ্গে সলিলার নামের মিল কেমন কাকতালীয়। ভবানী আর সলিলা স্থির করে তারা কলকাতায় থাকবে। দক্ষিণ কলকাতায় একটা বাড়িও তৈরি হয় তাদের জন্য। কিন্তু লন্ডনের ডক্টরেট পাওয়া সত্ত্বেও কোথাও ভবানীর চাকরি জোটে না। ভবানী অগত্যা টালিগঞ্জে সিনেমা স্টুডিয়ো ঘুরে ঘুরে 'টলিউড' নাম দিয়ে কলকাতার একটি ইংরেজি দৈনিকপত্রে প্রত্যেক সপ্তাহে ফিচার লেখে। প্রতিভার অপচয় দেখে আমি দুঃখিত হই।

একদিন ভবানীর বাবা মারা যান। একমাত্র পুত্রের জন্য রেখে যান প্রচুর অর্থ ও পুরী প্রভৃতি জায়গায় একাধিক বাড়ি। ভবানী চলে যায় নাগপুরে। তার শ্বশুরের বাড়ির সংলগ্ন তাঁরই একখানি বাড়িতে নিয়মিত ভাড়া দিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। সঙ্গে ওর মা ও স্ত্রী। এক এক করে ওর তিন পুত্রকন্যা হয়। সে সময় ও সাংবাদিকতা ছেড়ে সাহিত্যে মন দেয়। বিলেত থেকে বেরোয় ওর ইংরেজি উপন্যাস 'So Many Hungers.' বাংলার পঞ্চাশের মন্বন্তরের উপর লেখা। ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় বইখানির তর্জমা বেরোয়।

স্বাধীনতার পর ভারত সরকার ওয়াশিংটনের দূতাবাসে ভবানীকে একটি পদ দেয়। প্রেস কাউন্সিলর বা সেই জাতীয় কিছু। ভবানী ছিল মুখচোরা লাজুক প্রকৃতির মানুষ। কথা বলত কম। স্বভাবত কুনো। রাষ্ট্রদূত ঠিক যেরকমটি চান ভবানী সেরকমটি নয়। তার চাকরিটি যায়। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসে।

কিন্তু ঘরে পা দেওয়ার আগেই বোম্বাইতে তাকে আটক করেন ইলাসট্রেটেড উইকলি অব ইন্ডিয়ার সম্পাদক। তাকে দেন সহকারী সম্পাদকের পদ। ভালই চলছিল। তবে তাকে থাকতে হচ্ছিল পরিবারের থেকে দূরে।

কিছুদিন পরে সোভিয়েত ইউনিয়নে একটি ডেলিগেশন যায়। ভবানীও তার সামিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের কোনও একটি শহরে এক অভ্যর্থনা সভায় ভবানীর পরিচয় দেওয়া হয়, 'ইনিই সেই বিখ্যাত লেখক ভবানী ভট্টাচার্য যাঁর লেখা "সো মেনি হাঙ্গার্স"-এর অনুবাদ আপনারা পড়েছেন।' অমনি সভার সদস্যরা এক সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে মদের গেলাস হাতে নিয়ে ভবানীর স্বাস্থ্য পান করে। ভবানীও মদের গেলাস হাতে নিয়ে তাঁদের প্রতিদান করে। সোভিয়েতের অন্যান্য স্থানেও ভবানী একই রকম সংবর্ধনা পায়। তারপর দেশে ফিরে ইলাসট্রেটেড উইকলি অব ইন্ডিয়ার পাতায় সোভিয়েত ইউনিয়নের গুণগান করে। তখন শোর ওঠে, ভবানী একজন প্রচ্ছন্ন কমিউনিস্ট। ভবানী চাকরি ছাড়তে বাধ্য হয়।

এবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে নাগপুরে বসে আবার বই লিখতে আরম্ভ করে দেয়। সেসব বই আমেরিকায় সমাদর পায়। নানা দেশে সে সবের অনুবাদ হয়।

ভবানী নিমন্ত্রিত হয়ে যখন সে দেশে যায় তখন তার হোটেলে এসে ভিড় করেন নানা ভাষার প্রকাশকরা। তাঁরা চান অনুবাদ প্রকাশের অধিকার। ভবানীর আন্তর্জাতিক সুখ্যাতি ভারত সরকারের মন গলায়। তাঁরা তাকে দেন গান্ধীজি সংক্রান্ত একটি গ্রন্থ সংকলনের ভার।

ভবানীর মায়ের মৃত্যুর পর ভবানী চলে যায় আমেরিকায় স্ত্রীকে নিয়ে। আমেরিকায় তার ছেলে অর্জুন ডাক্তার হয়েছিল। আর তার বড় মেয়ে বিয়ে করেছিল এক গুজরাটি ব্যবসায়ীকে। যাওয়ার আগে তার ছোট মেয়ের বিয়ে দিয়ে গিয়েছিল কলকাতায়।

আমেরিকায় বসবাস করতে করতে ভবানী আরও অনেক বই লেখে, আরও বেশি নাম করে, আরও বেশি অর্থ পায়। সেটাই হয় তার কেরিয়ার। যেমনটি ছিল তার ছাত্রজীবনের স্বপ্ন।

আমেরিকাতেই ভবানী দেহরক্ষা করে। তার আগে সে একবার কলকাতায় এসেছিল তার ছোটমেয়েকে দেখতে। সেই আমার সঙ্গে তার শেষ দেখা। ইতিমধ্যে আরও একবার দেখা হয়েছিল। লন্ডনে। ১৯৬৩ সালে। আমি যখন দ্বিতীয়বার ইংল্যান্ডে যাই। এবার সাহিত্যিক হিসেবে। ব্রিটিশ সরকারের নিমন্ত্রণে। দেখলুম ভবানীও নিমন্ত্রিত। পি.ই. এন্ একটি পার্টিতে আমাদের দুজনকেই আপ্যায়িত করে। সে সময় ভবানী বলে যে সে লন্ডনের ছাত্রজীবনে পি. ই. এন্-এর একটি শাখার সদস্য হয়। তার নাম ইয়ং পি. ই. এন্।

দুঃখের বিষয় বাংলা সাহিত্যে ভবানীর কোনও দান নেই। তাই তার কোনও স্থানও নেই। সে কিন্তু বাংলাতেই প্রথম লেখা আরম্ভ করেছিল। 'বিচিত্রা'য় তার লেখা বেরিয়েছিল। কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।

শুনেছি বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরির একটি আলমারিতে ভবানীর সমুদয় ইংরেজি প্রকাশন সংরক্ষিত হয়েছে। গবেষকরা পরে হয়তো তার উপরে সন্দর্ভ লিখে ডক্টরেট পাবেন। ভবানীর নামে আমি আমার একটি বই, 'যার যেথা দেশ', উৎসর্গ করেছি। সেটুকুই আমার বন্ধুকৃত্য। যতদূর মনে পড়ে ভবানী তার 'মিউজিক ফর মোহিনী' উপন্যাসটি লীলার নামে উৎসর্গ করেছিল।

মণীন্দ্রলাল বসু

ভবানীর মতো পাটনা কলেজে আমার আরও একজন বন্ধু ছিল। নাম কৃপানাথ মিশ্র। মৈথিলী ব্রাহ্মণ। ভাগলপুরের অধিবাসী। বাংলা বলত বাঙালির মতো। আমারই মতো ইংরেজি সাহিত্যে অনার্সের ছাত্র। আমি প্রথম, সে দ্বিতীয়।

ভাগলপুরে তার পিতার প্রতিবেশী ছিলেন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি যখন কলকাতায় গিয়ে 'বিচিত্রা' পত্রিকা সম্পাদনা করেন তখন কৃপানাথ তাঁকে আমার সাহিত্য সাধনার কথা জানায়। তিনি আমার লেখা দেখতে চান। 'রক্তকরবীর তিনজন' নামে যে-লেখাটি 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত হয় সেটি আমি কৃপানাথের মারফত তাঁকে পাঠিয়েছিলুম। সঙ্গে সঙ্গে সেটি ছাপা হয়ে যায়। তখন তিনি আরও লেখা চান। বলি, 'আমি বিলেত যাচ্ছি। ভ্রমণ কাহিনী লিখব। আপনি কি প্রকাশ করবেন?' তিনি রাজি হয়ে যান। তখন লিখতে আরম্ভ করি 'পথে প্রবাসে'।

বিলেত যাওয়ার আগেই শুনেছিলুম যে আমার প্রিয় লেখক মণীন্দ্রলাল বসু ব্যারিস্টার হবার জন্য বিলেত গেছেন। লন্ডনে পৌঁছে শুনলুম তিনি তখন সুইটজারল্যান্ডে। সেখানে তাঁর ভাই ডাক্তার পঞ্চানন বসু ছিলেন চিকিৎসাধীন। মণীন্দ্রলালকে আমি চিঠি লিখি। তিনি 'বার' ডিনার খেতে যখন লন্ডনে আসবেন তখন আমি যেন জানতে পাই। আমি তাঁর লেখার ভক্ত।

মণীন্দ্রলাল উলটে আমাকেই সুইটজারল্যান্ডে যেতে আমন্ত্রণ করেন। লেখেন শীতের সুইটজারল্যান্ড শীতের লন্ডনের চাইতে অনেক উপভোগ্য। আমি বড়দিনে সুইটজারল্যান্ডে গিয়ে লেজাঁ নামক গ্রামে ছুটিটা কাটাই। মাথার উপরে সূর্যের আলো, পায়ের তলায় বরফ। না আছে লন্ডনের মতো কুয়াশা, না হাড় কাঁপানো শীত।

একদিন মণিদা আমাকে ভিল্‌নভ (Villeneuve) গ্রামে রম্যাঁ রলাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে নিয়ে যান। সেখানে রলাঁ থাকতেন একটি কটেজে। যে প্রশ্ন আমি রবীন্দ্রনাথকে করেছিলুম সেই প্রশ্ন আমি তাঁকেও করি। 'Is Art too good to be human nature's daily food?' তিনি বললেন, ইটালীয় রেনেশাঁসের সময় সামান্য কারিগরও নিত্যব্যবহার্য সামগ্রী সুন্দর রূপে তৈরি করত। আমার প্রশ্ন শুনে তিনি একটু অবাকই হলেন। তাঁর উত্তর শুনে আমিও কম অবাক হইনি। যেন আর্ট ব্যাপারটা এতই সহজ। রলাঁ আমাকে উপদেশ দেন, টাকার জন্য লিখবেন না, আনন্দের জন্য লিখবেন। তাঁর সেই উপদেশ আমি মাথা পেতে গ্রহণ করি।

রলাঁর 'জাঁ ক্রিস্তফ' নামক বৃহৎ উপন্যাস ছিল আমার আদর্শ-স্বরূপ। আমাকে যখন পাটনা কলেজে বি.এ. পড়ার সময় প্রবন্ধ লেখার জন্য পুরস্কার দেওয়া হয় তখন আমি তাঁর সেই উপন্যাসের ইংরেজি সংস্করণ 'জন ক্রিস্টোফার' বেছে নিই। তা না হলে বোধহয় আমার 'সত্যাসত্য' লেখা হত না।

মণীন্দ্রলাল বসু 'প্রবাসী'তে গল্প লিখে একাধিকবার পুরস্কার পেয়েছিলেন। তাঁর গল্প আমার খুব ভাল লেগেছিল। তারপরে তাঁর 'রমলা' উপন্যাসটি পড়ে আরও খুশি হই। তাঁর সমসাময়িক বাঙালি কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে তিনিই ছিলেন আমার সবচেয়ে প্রিয়। তাঁর

সঙ্গে আমার একটা মানসিক affinitty বা সাযুজ্য ছিল। সুইটজারল্যান্ডে আমরা পরস্পরের খুবই কাছাকাছি হই, মনের দিক থেকে।

পরের বছর গরমের ছুটিতে আমি বেরিয়ে পড়ি মণিদার সঙ্গে ইউরোপ ভ্রমণে। তিনি ছিলেন আমার গাইড। তাঁর হাতেও ছিল একটি বেডেকার গাইড বুক। ফরাসি ও জার্মান দুই ভাষাতেই তিনি বিদেশীদের সঙ্গে কথা বলতে পারতেন। আমরা দুজনে স্থির করলুম যে দেশে ফেরার পর ইউরোপ নিয়ে লেখালেখি করব নিজেদের একটি পত্রিকার মাধ্যমে। আমাদের সে উদ্দেশ্য অনেকটা সিদ্ধ হয় সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'পরিচয়' প্রকাশের সূত্রে।

ব্যারিস্টারি করতে গিয়ে সময় পান না বলে মণিদা ইচ্ছামতো লিখতে পারেন না। কিন্তু তিনি পি.ই.এন্ নামক বিশ্বসাহিত্যিক সংস্থার বোম্বাইস্থিত ভারতীয় কেন্দ্রের একটি বাংলা শাখা স্থাপন করেন তাঁর এক বন্ধুর সহযোগে। এই শাখা ক্রমেই প্রসার লাভ করে। তার সভ্যরা মাঝেমাঝে কোনও হোটেলে বা রেস্তোরাঁয় মিলিত হন। একবার শরৎচন্দ্রকে স্যাভয় হোটেলে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। মণিদাই ছিলেন বাংলায় পি.ই.এন্-এর প্রাণপুরুষ।

'জীবনায়ন' উপন্যাস প্রকাশের পর তিনি লেখেন 'সহযাত্রিণী' নামে আর একটি উপন্যাস। সেটি তিনি আমাকে উৎসর্গ করেন। আমি তাঁকে উৎসর্গ করেছিলুম 'আগুন নিয়ে খেলা'।

নানাকারণে মণিদার লেখা বন্ধ হয়ে যায়। সবচেয়ে বড় কারণ ছেচল্লিশের দাঙ্গায় তাঁর পার্কসার্কাসের বাড়ি আক্রান্ত হয়। এখানে-ওখানে নানা স্থানে মাথা গুঁজতে গুঁজতে তিনি গড়িয়াহাট অঞ্চলে বাড়ি করেন। ততদিনে তাঁর লেখার অভ্যেস একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বন্ধুদের উপরোধে দুটি-একটি উপন্যাস লেখেন। কিন্তু সাহিত্যে তাঁর পূর্ববর্তী স্থান ফিরে পান না। আমরা তাঁকে বারবার অনুরোধ করি কিছু-না-কিছু লিখতে। এর উত্তরে তিনি বলতেন, 'এই গরমে কি কিছু লিখতে পারা যায়? শীত পড়ুক।' শীত পড়লে তিনি বলতেন, 'এই শীতে কি কিছু লেখা যায়? গরম পড়ুক।' একদিন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থমন্ত্রী ড. অশোক মিত্র আমার বাড়িতে এসে আমাকে বলেন, 'মণীন্দ্রলাল বসুকে আমরা একটা সংবর্ধনা দিতে চাই। তিনি কিছুতেই রাজি হচ্ছেন না। আপনি তাঁকে বোঝান।' আমি তাঁকে বোঝাতে অনেক চেষ্টা করি। কিন্তু তিনি একেবারে অবুঝ, তাঁর মনে প্রচণ্ড অভিমান যে দেশের লোক তাঁকে ভুলে গেছে। পি.ই.এন-এর শাখা ইতিমধ্যে উঠে গিয়েছিল। লেখকদের সঙ্গ থেকে তিনি বহুদূরে চলে গিয়েছিলেন। পাঠকদের জন্যেও তাঁর কোনও বই বাজারে ছিল না। যাই হোক, সংবর্ধনা সভায় তিনি তাঁর সাহিত্য-সাধনা সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ পাঠ করেন। সেটাই বোধহয় তাঁর শেষ রচনা।

বছর নব্বই পর্যন্ত বেঁচেছিলেন তিনি। নিয়মিতভাবে আধুনিকতম বিদেশী বই পড়তেন। মৃত্যুর দিন পনেরো আগেও এক ভক্ত পাঠকের হাতে পাঁচশো টাকা দিয়ে বলেন, অত্যাধুনিক ইংরেজি বই কিনে আনতে। তাঁর লাইব্রেরিতে ইংরেজি ফরাসি বাংলা এই তিন ভাষার বিস্তর বই ছিল। প্রত্যেকটি তিনি সযত্নে রাখতেন।

আমার নিজের ধারণা, প্রমথ চৌধুরীর মতো তিনি ব্যারিস্টারি পেশা বেছে নিয়ে ভুল করেছিলেন। লক্ষ্মী সদয় হননি। সরস্বতী উপেক্ষিতা হয়েছিলেন। তবে প্রমথ চৌধুরী তাঁর সাহিত্যের হাত পরে ফিরে পেয়েছিলেন। 'সবুজ পত্র' সম্পাদনা করে, 'চার ইয়ারি কথা' লিখে বিশ্ব সাহিত্যে উচ্চ স্থানের অধিকারী হয়েছিলেন। কিন্তু ব্যারিস্টারিতে সম্পূর্ণ বিফল।

মণিদার বেলায় সাহিত্যে ফিরে আসা কেন সম্ভব হল না তা কে বলতে পারে!

মণিদার জীবনের একটি গোপন তথ্য আমি জানি। তিনি যাঁকে ভালবেসে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন তাঁর অন্য একজনের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায়। সে আঘাত মণিদা ভুলতে পারেননি। পরে অবশ্য বিয়ে করেছিলেন। প্রেমে পড়ে নয়, সম্বন্ধ করে। কিন্তু সন্তান লাভ করেননি। যদিও ছেলেপিলেদের তিনি খুবই ভালবাসতেন।

সম্প্রতি মণীন্দ্রলালের শতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর নির্বাচিত রচনার দুটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে তাঁর বিখ্যাত ছোটগল্পগুলিও আছে। সংকলনের বাইরে থেকে গেছে ইউরোপের চিত্রকলা সম্বন্ধে লেখা তাঁর অসামান্য প্রবন্ধমালা। ভেতরে ভেতরে তিনি ছিলেন একজন চিত্ররসিক।

মণিদার প্রতিভার যে সম্যক প্রকাশ সম্ভব হল না এরজন্য আমি ভীষণ দুঃখিত। কে জানে হয়তো চিত্রলেখার মতো সঙ্গীতশিল্পীর সঙ্গে পরিণয় হয়ে থাকলে এই শিল্পরসিকের জীবন সর্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণ হত।

এক এক সময় মনে হয় আমার বন্ধু ভবানীর জীবন যেমন great success তেমনই আমার বন্ধু মণিদার জীবন great failure, তবে 'রমলা' যতদিন থাকবে ততদিন মণিদার মহিমাও থাকবে।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

বিলেতে থাকতেই অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের সঙ্গে পত্রালাপ হয়েছিল। তিনি ছিলেন 'কল্লোলে'র নিয়মিত লেখক। আমি তাঁর লেখা পড়ে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলুম। তিনি বোধহয় আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত আমার 'পথে প্রবাসে' পড়ে।

দেশে ফিরে এসে আমি বহরমপুরে যাওয়ার আগে কলকাতায় চিফ সেক্রেটারির সকাশে হাজির হই। গভর্নরের সঙ্গেও মোলাকাত করি। এইসব কারণে আমাকে কলকাতায় থাকতে হয়। আস্তানা ক্যালকাটা হোটেল। সেটা মণিদার ব্যবস্থাপনায়। সেই ক-দিনে আমার প্রায় নিত্যসঙ্গী ছিলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। তিনিই আমার কলকাতার গাইড।

তখন প্রমথ চৌধুরী মহাশয় অচিন্ত্যর মারফত খবর পাঠান যে তিনি আমাকে দেখতে চান। অচিন্ত্যই নিয়ে যান মেফেয়ারে করুণা চৌধুরীর বাড়িতে। নিজের বাড়ি 'কমলালয়' বিক্রি করে দিয়ে প্রমথ চৌধুরী বাস করছিলেন তাঁর এক দাদার সঙ্গে। সেদিন তিনি আমাদের নিয়ে গিয়ে বসান তাঁর লাইব্রেরি ঘরে। 'পথে প্রবাসে' তাঁর ভাল লেগেছিল। সেই সূত্রে সেদিনকার কথাবার্তা।

বহরমপুরে গিয়ে কাজে যোগ দেওয়ার পর বড়দিনের ছুটিতে আমি আবার কলকাতায় আসি। এবার অচিন্ত্য আমাকে নিয়ে যান শান্তিনিকেতনে। কবিগুরুকে দ্বিতীয়বার দর্শন করি। আমার কবিতার বই 'রাখী' তাঁকে উপহার দিই। বইখানি ইতিমধ্যে কলকাতায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশক ছিলেন সুধীরচন্দ্র সরকার। বইখানি হাতে নিয়ে গুরুদেব বললেন, 'এই নাম তুমি কোথায় পেলে? এই নামটি তো আমি নিজের জন্যে রেখেছিলাম।'

'বিচিত্রা'য় তাঁর লেখা 'যোগাযোগ' ও আমার লেখা 'পথে প্রবাসে' প্রতিমাসে পাশাপাশি প্রকাশিত হচ্ছিল। 'পথে প্রবাসে' তিনি পড়েছিলেন। আমাকে বললেন, ওটা ইংরেজিতে অনুবাদ করতে। আমার 'রাখী' তিনি স্বহস্তে সংশোধন করেন। পরে আমার দেওয়া কপিখানিই তিনি আমাকে ফেরত পাঠান। তাঁর সেই সংশোধন অনুসারেই 'রাখী'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

সে সময় প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবী দুজনেই শান্তিনিকেতনে বাস করছিলেন। ইন্দিরা দেবী আমাকে ডেকে নিয়ে বলেন, 'আমাদের শিক্ষিতা মেয়েদের যে বিয়ে হচ্ছে না এ-সমস্যার প্রতিকার কী?' আমি চটপট উত্তর দিই, 'তাদের বিলেত পাঠিয়ে দিন। সেখানে বিয়ে হয়ে যাবে।' তিনি গম্ভীর মুখে বলেন, 'ওটা একটা আসুরিক সমাধান।' উনি বোধহয় ভেবে রেখেছিলেন যে আমি বলব, আমিই একজনকে বিয়ে করতে রাজি।

এমনই আমার অদৃষ্ট যে আমার বিয়ে হয়ে যায় এক মার্কিন কন্যার সঙ্গে। রাঁচিতে সেই কন্যাকে নিয়ে আমি যখন তাঁর বাসভবনে দেখা করতে যাই, তাঁর মন্তব্য হল, 'তোমরাই যদি বিদেশিনী বিয়ে করো তাহলে আমাদের মেয়েদের গতি কী হবে?' যাই হোক, আমাদের বিয়েতে তিনি উপস্থিত ছিলেন ও উপহার দিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রমথ চৌধুরী। তিনি কিন্তু কোনও বিরূপ মন্তব্য করেননি।

এখন শান্তিনিকেতনের কথায় ফিরে আসি। প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি আমাকে একটি গল্প শোনান। আকবর বাদশার দরবারে একদিন এক নতুন ওস্তাদ গান গেয়ে শোনালেন। তা শুনে পুরনো ওস্তাদরা এমন অভিভূত হন যে মাথা থেকে পাগড়ি খুলে সামনে রাখেন। বলেন, এখন থেকে ইনিই গাইবেন, আমরা শুনব। গল্পটা শেষ করে চৌধুরী আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এখন থেকে তুমিই লিখবে, আমরা পড়ব। আমি আমার কানকে বিশ্বাস করতে পারিনে। এর পরে তিনি সুধীরচন্দ্র সরকারকে জানান যে 'পথে প্রবাসে' যখন বই হয়ে বেরবে তখন তিনি লিখবেন তার ভূমিকা। সে ভূমিকা পড়ে আমি কৃতার্থ হই। তিনিই তো আমার দ্রোণাচার্য আর আমি তাঁর একলব্য। 'সবুজ পত্র' থেকেই আমার সাহিত্যিক আদর্শ স্থির হয়ে যায়।

শান্তিনিকেতনে সেবার অচিন্ত্যকে গুরুদেব বলেছিলেন, 'সব সময় মনে রাখবে যে লোকলক্ষ্মী গর্ভিণী।' সে কথা অচিন্ত্য আমাকে জানালে আমি জানতে চাই, 'ও কথার তাৎপর্য কী!' অচিন্ত্য বলেন,'সাহিত্যিক যেন অন্তঃসত্ত্বা নারী। তাঁকে তাঁর অন্তরের সত্ত্ব সযত্নে রক্ষা করতে হবে।' অচিন্ত্যকে দেওয়া গুরুদেবের এই বাণী আমিও গ্রহণ করি।

কিছুদিন পরে 'আকস্মিক' নামে অচিন্ত্যর একখানি উপন্যাস বেরোয়। দেখি, সেটি আমাকে উৎসর্গ করা হয়েছে। তখন আমি 'অসমাপিকা' নামে একখানি উপন্যাস লিখি। সেটি আমি অচিন্ত্যকেই উৎসর্গ করি।

সেটাই আমার প্রথম উপন্যাস নয়, প্রথম উপন্যাস 'সত্যাসত্য'। 'বিচিত্রা' সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় আমাকে বলেছিলেন, 'পথে প্রবাসে তো শেষ হয়ে গেল। এবার তুমি উপন্যাস লেখো।' আমি বলি, 'আমি কি উপন্যাস লিখতে পারব?' তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই পারবে। যে ময়রার ভিয়ানে সন্দেশ তৈরি হয় সেই ময়রার ভিয়ানে রসগোল্লাও উৎরায়।'

উপেন্দ্রনাথের কথায় ভরসা পেয়ে আমি 'সত্যাসত্য' উপন্যাস 'বিচিত্রা'য় লেখা শুরু

করি। কিন্তু 'সত্যাসত্য' বা 'অসমাপিকা' কোনওটাই আমার গ্রন্থাকারে মুদ্রিত প্রথম উপন্যাস নয়। সেই স্থানটি লাভ করে 'আগুন নিয়ে খেলা': এর সঙ্গেও জড়িত অচিন্ত্য।

অচিন্ত্যর বিয়ের রাত্রে ওঁর দাদার বাড়িতে বরযাত্রী রূপে উপস্থিত ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম ও তাঁর প্রকাশক গোপালদাস মজুমদার। গোপালবাবু আমাকে বলেন, 'আমাকে একখানি উপন্যাস দিন। কিস্তিতে কিস্তিতে কপি পাঠাবেন, আমি আপনাকে সঙ্গে সঙ্গে প্রুফ পাঠাব।'

এইভাবেই 'আগুন নিয়ে খেলা' লিখিত হয়। ছয় সপ্তাহের মধ্যে লেখা শেষ, কিছুদিন পরে ছাপাও শেষ। গোপালবাবু আমাকে প্রথম সংস্করণের আগাম রয়্যালটি দিলে আমি সেই টাকা দিয়ে বিয়ের আংটি ও শাড়ি কিনি। বিয়েতে বরযাত্রী হন গোপালদাস ও অচিন্ত্যকুমার। বিয়ে হয় রাঁচিতে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে অচিন্ত্যকুমার আমার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের সঙ্গে শুধু নয়, আমার বিবাহ অনুষ্ঠানের সঙ্গেও জড়িত। কিন্তু ওঁর বিবাহ অনুষ্ঠানে আমি যোগ দিতে পারিনি। সেই রাত্রে বিবাহ লগ্নের পূর্বেই আমাকে বহরমপুরে ফিরে যেতে হয়েছিল।

ইতিমধ্যে অচিন্ত্যর মুনসেফ-এর চাকরি জুটে গিয়েছিল। তিনি আমারই মতো নানা জায়গায় বদলি হন। আমাদের দেখাসাক্ষাৎ বড় একটা হয় না। চিঠিপত্রও ক্রমে কমে আসে। তবে বন্ধুতা অটুট থাকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আবার দেখা হয় তাঁর সপ্ততিপূর্তির জন্মদিনে। শান্তিনিকেতনে। সঙ্গে ছিলেন আমার নবপরিণীতা স্ত্রী লীলা রায়। চারদিকে খুব ধুমধাম। অজস্র দর্শক। গুরুদেব সেদিন তাঁর পোশাক ছেড়ে ধুতি পরেছিলেন। উদ্দীপ্ত কণ্ঠে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার বয়ান আমার মনে নেই, তবে তাঁর কবিতার একটি পঙ্‌ক্তি মনে আছে। 'চিরনূতনেরে দিল ডাক পঁচিশে বৈশাখ।' কোনও এক সুযোগে লীলার সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিই। তিনি খুশি হন।

এরপর আমি বদলি হয়ে যাই রাজশাহী জেলার নওগাঁয়। সেই মহকুমাতেই রবীন্দ্রনাথের জমিদারি, পতিসর যার কেন্দ্র। তখন জমিদারির ম্যানেজার ছিলেন রবীন্দ্রনাথের শ্যালক নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী। একদিন নগেনবাবুর নিমন্ত্রণে আমি আত্রাইঘাট থেকে কবির হাউস বোটে চড়ে সস্ত্রীক পতিসর যাই ও হাউসবোটেই রাত কাটাই নাগর নদীর বুকে। পরদিন সকালে সকলের সঙ্গে দেখা হয়।

কবিগুরু তাঁর প্রজাদের জন্য একটি তহবিল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার নাম কল্যাণবৃত্তি তহবিল। প্রজারা খাজনার টাকায় এক আনা চাঁদা দিত, জমিদার তার সঙ্গে তাঁদের এক আনা জুড়ে দিতেন। এমনই করে যে-টাকা উঠত তা দিয়ে জমিদারির তিনটি বিভাগে তিনটি ডাক্তারখানা ও তিনটি স্কুল পরিচালিত হত। পতিসর সদরের স্কুলটি হাইস্কুল। এরকম ব্যবস্থা আর কোনও জমিদারিতে দেখিনি। এটা রবীন্দ্রনাথের নিজের কীর্তি।

বহুকাল ধরে কবি স্বয়ং নিজের জমিদারি পরিদর্শনে যেতে পারতেন না, রথীন্দ্রনাথকে পাঠাতেন। সে যাত্রায় আমার রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হয়। তাঁর মাতুল নগেনবাবুর সঙ্গেও। রথীন্দ্রনাথ তখন জমিদারি পরিদর্শনে এসেছিলেন।

এর পর আমি নানা জায়গায় বদলি হই। কবির সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হয় না। তবে তাঁর শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে থাকার সৌভাগ্য হয়। তখন আমি কুষ্টিয়ার মহকুমা হাকিম। সস্ত্রীক শিলাইদহ পরিদর্শনে যাই।

মহর্ষির মৃত্যুর পর তাঁর জমিদারি ভাগ হয়ে যায়। শিলাইদহ পড়ে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাগে, যেমন পতিসর রবীন্দ্রনাথের ভাগে। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সুরেন্দ্রনাথ মালিক হন, কিন্তু দেনার দায়ে তাঁর অংশ বিক্রি হয়ে যায়। কিনে নেন ভাগ্যকুলের রায়রা। আমি যখন যাই তখন ভাগ্যকুলই শিলাইদহের মালিক।

তবে জমিদারির অফিসে পুরনো আমলারা কাজ করছিলেন। তাঁদেরই একজন আমাকে নিয়ে যান দপ্তর দেখাতে। সেখানে রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তে লেখা দুখানি পুরনো চিঠি মজুত ছিল। তাতে তিনি আমলাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথের জন্য তিনশো বিঘা না কত চর জমি খরিদ করতে। আমেরিকা থেকে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার পর তাঁর পুত্র সেখানে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে কৃষিকার্য পরিচালনা করবেন। সেই চিঠি দুটির ভাষা কবির ভাষা নয়, উপরওয়ালা মনিবের ভাষা।

কবির সে পরিকল্পনা সার্থক হয়নি। রথীন্দ্রনাথ যখন দেশে ফেরেন তার কিছুদিন পরেই রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পান। তাঁর পুত্রকে তিনি কাছাকাছি রাখেন। পরে তো বিশ্বভারতীর সেক্রেটারি করে দেন। তাছাড়া চর জমি মোটেই ট্রাক্টর দিয়ে চাষের উপযোগী নয়। ট্রাক্টর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দুর্বলতা ছিল। পতিসরেও দেখেছি একটা ট্রাক্টর বেকার পড়ে আছে। শুনলুম রাজশাহীর কালেক্টর রিড সাহেব নাকি বলেছিলেন, ট্রাক্টর না কিনে ওই টাকায় বলদ কিনতে পারা যেত। ওই মাটিতে চাষের পক্ষে ট্রাক্টরের চেয়ে বলদই উপযুক্ত।

এর পরে আমি যখন রাজশাহীর কালেক্টর তখন হঠাৎ একদিন একটি টেলিগ্রাম পাই। রবীন্দ্রনাথ আমাকে আত্রাইঘাটে দেখতে চান, পতিসর থেকে ফেরার পথে। সেইদিনই বিকেলে। আমি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে যাই নাটোর পর্যন্ত মোটরে, তারপর ট্রেনে। আত্রাইঘাটে নেমে দেখি কবিগুরুও হাউসবোট থেকে নামছেন। তাঁকে অভ্যর্থনা করে স্টেশনের প্লাটফর্মে গিয়ে বসি। দুজনে দুখানি চেয়ারে। কলকাতাগামী ট্রেনের অপেক্ষায়।

পতিসর থেকে পায়ে হেঁটে এসেছিল নাগর ও আত্রাই নদী দুটির পাড় ধরে শতখানেক প্রজা। বেশিরভাগেরই মুখে পাকা দাড়ি। কারও কারও চোখে জল। তাদের প্রিয় বাবুমশায়কে তারা আর বোধহয় দেখতে পাবে না। এই হয়তো শেষ দেখা।

গুরুদেব বলেন, 'জানো, ওরা কী বলছে? পয়গম্বরকে আমরা চোখে দেখতে পাইনি, হুজুরকে দেখলুম।' লম্বা আলখাল্লা পরা রবীন্দ্রনাথকে দেখলে পীরের মতো মনে হওয়া স্বাভাবিক। আর তাঁর দাড়িও সেইরকম। তার উপরে মাথায় তাঁর লম্বা চুড়ো টুপি।

কলকাতাগামী ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাসে কবিকে আমি সেই প্রথম ও সেই শেষবার নিভৃতে পাই। নাটোর পর্যন্ত টানা চল্লিশ মিনিট। তিনি বলেন, তিনি ছড়া লিখছেন, আমিও লিখি না কেন! আমি বলি, গুরুদেব, ছড়া আমার দ্বারা হবে না। এরপর তিনি বলেন, তিনি একটি

নাটক লিখতে চেয়েছিলেন সারাজীবন। লেখা হয়ে ওঠেনি। আমি যেন সেটি লিখি। আমি কৌতূহলী হলে তিনি বলেন, শ্রীকৃষ্ণের প্রয়াণের পর অর্জুন যখন যদুবংশের নারীদের নিমজ্জমান দ্বারকা থেকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন জঙ্গলের মাঝখানে এক দল দস্যু এসে সেই নারীদের মধ্যে থেকে কয়েকজনকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। তারা আনন্দের সঙ্গেই দস্যুদের সহগামিনী হয়। শ্রীকৃষ্ণের বিয়োগে অর্জুনের গাণ্ডীব তখন শক্তিহীন। তাই অর্জুন দস্যুদের সঙ্গে লড়তে পারলেন না। কবিগুরু বললেন, 'বুঝলে হে, ওই দস্যুরা ছিল নারীদের ছদ্মবেশী প্রেমিক। আগে থেকে ঠিক ছিল যে পথের মাঝখানে তারা তাদের প্রেমিকাদের হরণ করে নিয়ে যাবে।' আমি অবাক হয়ে শুনি। 'এটা আপনি কোথায় পেলেন?' উত্তরে তিনি বলেন, 'মহাভারতেই আছে। ওইসব নারী শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুরে বন্দিনী হয়ে বাস করছিল। তিনি তাঁদের ধরে নিয়ে এসেছিলেন।' আমি হাত জোড় করে বলি,'গুরুদেব, দোহাই, আমার উপর এ ভার দেবেন না। যে কাজ আপনি পারলেন না তা কি আমার দ্বারা সম্ভব? আমারও তো ভয়ডর আছে। কৃষ্ণভক্তরা আমাকে সহজে ছাড়বে?' উনি হাসলেন।

ট্রেন যখন নাটোরে থামল, আমি নেমে গেলুম। সেকেন্ড ক্লাস থেকে নামলেন সুধাকান্ত রায়চৌধুরী। কবিগুরুর সেক্রেটারি। তিনি আমার কানে কানে বললেন, 'উনি আপনাকে কেন ডেকেছিলেন, জানেন? পতিসরের জমিদারির ম্যানেজার বীরেন সর্বাধিকারীকে প্রথম শ্রেণীর সরকারি অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়ার জন্য সুপারিশ করতে হবে।'

বাড়ি ফিরে গিয়ে কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত খুলে পড়ি। অবাক হয়ে দেখি, দস্যুরা যাঁদের অপহরণ করেছিল তাঁদের কেউ কেউ আনন্দের সঙ্গেই গিয়েছিলেন। ছদ্মবেশী প্রেমিক কথাটা কবিগুরুর কল্পনা।

আমার চাপরাশিদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ছিল শফি জমাদার। সে আমার উপর গোঁসা করে বলে, 'আপনি ঠাকুরবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন? তা আমাকে নিয়ে গেলেন না কেন?' আমি জানতে চাই, 'তুমি তাঁকে চিনতে?' সে বলে, 'চিনব না? পালিতসাহেব যখন জজ ছিলেন তখন ঠাকুরবাবু এসেছিলেন। কী সুন্দর মানুষ! কী চমৎকার গান করলেন!' আমি হিসেব করে দেখলুম, ঘটনাটা বলছে চল্লিশ বছর আগেকার। যখন লোকেন পালিত রাজশাহীর জজ ছিলেন। তাঁর শফি জমাদারও অবসর নেওয়ার বয়সের পর সাহেবদের অনুগ্রহে সত্তর বছর বয়স পর্যন্ত বহাল রয়েছে।

বীরেন সর্বাধিকারীকে আমি গুরুদেবের মুখরক্ষার জন্য অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতার জন্য সুপারিশ করি ঠিকই, কিন্তু সেকেন্ড ক্লাস ক্ষমতার জন্য।

কলকাতায় ফিরে গিয়ে গুরুদেব আমায় তাঁর 'সে' নামক বইখানি পাঠিয়ে দেন। তাতে অনেকগুলি ছড়া ছিল। তাঁর বোধহয় ইচ্ছে ছিল আমাকে ছড়া লেখায় আগ্রহী করা। আমি ছড়া লেখায় উৎসাহিত হই, কিন্তু তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে নয়, বাংলা ছড়ার পুরনো আদর্শে।

কিছুদিন পরে আমাকে নিজের প্রয়োজনে পতিসরে যেতে হয়। এবার স্থলপথে হাতির পিঠে চড়ে। পথের মাঝখানে হাতি জল খেতে যায়। তাকে পুকুরে ছেড়ে দিয়ে পুকুরের পাড়ে আমি একটি চেয়ার পেতে বসি। কোথা থেকে এসে হাজির হয় দেবনাথ মণ্ডল নামে

সেই গাঁয়ের এক বাসিন্দা। বলে, সে কলকাতায় গিয়ে মহর্ষিকে দেখেছিল। তাঁর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ পতিসরে আসেন। জমিদারির পুরনো প্রথা অনুসারে প্রজারা রবীন্দ্রনাথের সকাশে গিয়ে তাঁর বোটের উপর যে যা পারে উপঢৌকন দেয়। সোনাদানা থেকে আরম্ভ করে নিজেদের গাছের ফলমূল পর্যন্ত। কবি সেদিন নিঃশব্দে সব গ্রহণ করেন। কিন্তু তার পরদিন তলব করেন প্রজাদের। বলেন, 'কাল আমি সারারাত ঘুমোতে পারি নি। ছি, ছি! আমি এ কী করেছি! আমার পিতার শ্রাদ্ধ। আমারই তো তোদের কিছু দেওয়ার কথা। আমি কেন তোদের দান নেব? নিয়ে যা, নিয়ে যা, তোরা সব ফেরত নিয়ে যা।' কিছু ফলমূল রাখেন, আর সব ফিরিয়ে দেন। তিনি প্রজাদের পরে একদিন একটা ভোজ দেন। দেবনাথ মণ্ডলের মুখে এই বিবরণ শুনে আমি বিস্মিত হই। প্রজাদের দেওয়া উপঢৌকন আর কোন জমিদার কবে ফেরত দিয়েছেন?

আমার মেজ ছেলের অকালমৃত্যুর পর আমি চাকরি ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবি ও কুমিল্লা থেকে ছুটি নিয়ে সপরিবারে শান্তিনিকেতনে যাই। উদ্দেশ্য, বড় ছেলের লেখাপড়ার একটা ব্যবস্থা করা। আর নিজের লেখাপড়া নিয়ে থাকা। কবিগুরু লীলাকে দেখে বলেন, 'শুনেছি তুমি কর্মিষ্ঠা মেয়ে। তুমি এখানকার কোনও একটি বিভাগে কাজ করতে পারবে।' এর কিছুদিন পরে তিনি গ্রীষ্মের অবকাশে পাহাড়ে চলে যান। যাবার সময় তাঁকে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ দেখেছি।

বড় ছেলের পড়াশুনোর সুবিধে হল না বলে আমাকে আবার মত পরিবর্তন করতে হল। মেদিনীপুরের জেলা জজ হয়ে আমি চাকরিতেই থেকে যাই।

গুরুদেব পাহাড় থেকে ফিরেছিলেন। আমি গেলুম দেখা করতে। কিন্তু এ কী দৃশ্য দেখলুম! গুরুতর অসুখের পর বিধ্বস্ত শরীর। থপথপ করে পা ফেলে কোনওমতে চেয়ারে এসে বসলেন। তখন দু-চার কথার পর তাঁকে বলি রাজশাহীতে শফি জমাদারের মুখে শোনা সেই কথা—কী চমৎকার গান করতেন। তিনি খুশি হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, তখন আমার গানের গলা ছিল। পরে ভেঙে যায়।'

আরও কয়েকটি কথার পরে দেশের কথা ওঠে। তখন তিনি অত্যন্ত ক্লিষ্ট মুখে বলেন, 'এই যে বাংলাদেশ, এ হচ্ছে ভারতের গেঁটে বাত।' অনেক দুঃখে তিনি একথা বলেন। কেন না একদল লোক বছরের পর বছর, মাসের পর মাস, তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করে চলেছে। যেন তিনি দেশের জন্য কিছুই করেননি। কিছুদিন আগেই তাঁর একটি কবিতা পড়েছিলুম, 'গৌড়ী রীতি', তাতে ছিল—

'নাহি চাহিতেই ঘোড়া দেয় যেই,
ফুঁকে দেয় ঝুলি থলি,
লোকে তার 'পরে মহারাগ করে
হাতি দেয় নাই বলি।

সামনে আসিয়া নম্র হাসিয়া
স্তবের রবের দৌড়,
পিছনে গোপন নিন্দারোপণ
ধন্য ধন্য গৌড়।'

এর পরে যখন তাঁর জন্মদিন এল, গুরুদেব আমার উদ্দেশে একটি কবিতা লিখে পাঠান। সেই কবিতাটি হল—

আমার এ জন্মদিন-মাঝে আমি হারা
আমি চাহি বন্ধুজন যারা
তাহাদের হাতের পরশে
মর্ত্যের অন্তিম প্রীতিরসে নিয়ে
যাব জীবনের চরম প্রসাদ,
নিয়ে যাব মানুষের শেষ আশীর্বাদ।
শূন্য ঝুলি আজিকে আমার।
দিয়েছি উজাড় করি
যাহা কিছু আছিল দিবার,
প্রতিদানে যদি কিছু পাই
কিছু স্নেহ, কিছু ক্ষমা
তবে তাহা সঙ্গে নিয়ে যাই
পারের খেয়ায় যাব যবে
ভাষাহীন শেষের উৎসবে।

তখন আমি বুঝতে পারিনি যে এই কবিতাই হচ্ছে তাঁর বিদায়বাণী। তিন মাস পরে তাঁর মহাপ্রয়াণ।

সমগ্র দেশ শোকে মুহ্যমান।

বাঙালি তো কেবল কয়েকজন ঈর্ষাপরায়ণ ছিদ্রান্বেষী সমালোচক নয়। শুনেছি কয়েক লক্ষ লোক তাঁর অন্ত্যেষ্টির সময় সমবেত হয়েছিল। কোনও বাদশাহেরও এমন বিদায় সংবর্ধনা হয়নি।

তারপর থেকে তাঁর যশ দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। তাঁর একটি গান ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হয়েছে আর একটি বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। এমন সৌভাগ্য কি আর কারও হয়েছে?

প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবী

বিয়ের একমাস পরে লীলা ফিরে যান আমেরিকায় তাঁর মা-বাবার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে। সে সময় ইন্দিরা দেবী তাঁর হাতে 'চার ইয়ারী কথা'র ইংরেজি অনুবাদের পাণ্ডুলিপি দেন। বলেন আমেরিকায় কোনও প্রকাশককে দেখাতে। তাঁর আশা বইটি আমেরিকায় সমাদর পাবে। অনুবাদ করেছিলেন স্বয়ং ইন্দিরা দেবী। তাঁর বিশ্বাস তিনি ভাল ইংরেজি লিখতে পারেন। যেহেতু তাঁর শৈশব কেটেছিল ইংল্যান্ডে।

দুঃখের বিষয় আমেরিকার কোনও প্রকাশক দেখতে রাজি হলেন না। লীলা সেই পাণ্ডুলিপি বহন করে ফিরে এলেন। সেটি ইন্দিরা দেবীকে ফেরত দেওয়া হল।

আমার বুদ্ধিসুদ্ধি বরাবরই একটু কম। আমি ভাবলুম ইন্দিরা দেবীর ইংরেজি রানী ভিক্টোরিয়ার আমলের ইংরেজি, পঞ্চম জর্জের আমলের ইংরেজি নয়। তা যদি হত তবে বইখানি প্রকাশকের দপ্তরে উতরে যেত। আমি প্রমথ চৌধুরী মশায়কে লিখলুম, একালের ইংরেজি ভবানী ভট্টাচার্য ভাল জানেন। ওকে দিয়ে একবার মাজাঘষা করিয়ে নিলে কেমন হয়?

চৌধুরীমশায় রুষ্ট হয়ে জবাব দিলেন, আমার স্ত্রীর ইংরেজি জ্ঞানের উপর আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। আর কাউকে দিয়ে মাজাঘষা করাতে হবে না।

স্বামী যে স্ত্রীর পক্ষ নেবেন এটা স্বাভাবিক। আর ইন্দিরা দেবী ও তাঁর স্বামী তো অভিন্ন হৃদয়। অমন একটি মানিকজোড় এদেশে বিরল। আমি দুঃখ প্রকাশ করি। কিন্তু চৌধুরী মশায়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক আর আগের মতো স্বচ্ছন্দ থাকল না।

পরে এক সময় তাঁর সঙ্গে আমার কলকাতায় দেখা হয়েছিল। আমি তাঁকে জানাই যে 'সত্যাসত্য' নামে যে উপন্যাসটি লিখছি তার কথোপকথন অংশটি কথ্য, আর বিবরণ অংশটি সাধুভাষায়। তিনি বলেন, সাধুভাষার কী দরকার? ওটা বেমানান। আমি তাঁর উপদেশ গ্রহণ করি। 'সত্যাসত্যে'র গোড়ার অংশ পুনর্লিখিত হয়। সেই সময়েই কথ্য ভাষা সম্বন্ধে তিনি আমাকে বলেন, 'আমাদের এই কথ্য ভাষা আমাদেরই শ্রেণীর। কাজেই এটাও সাধুভাষার মতো একদিন পরিত্যাজ্য হতে পারে। সুতরাং একে জনসাধারণের উপযোগী করতে হবে। একে আরও সহজ সরল করা দরকার।'

চৌধুরী মশায়ের সেই উপদেশ আমি মনে রাখি। এবং যথাসাধ্য অনুসরণ করি। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখতে পারিনে। আমাকে নানা ঘাটে ঘুরতে হয়।

আমি যখন কুষ্টিয়া মহকুমার হাকিম তখন জানতে পাই যে ধোবড়াকোল নামে একটা চরে ইন্দিরা দেবীর জমিদারি। অনাদি নামে তার নায়েব আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ করত। ও বলত প্রজারা খাজনা দিচ্ছে না। আমি যেন একবার সরেজমিনে যাই। আমার ঠিক মনে পড়ছে না কবে ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে আমার আবার দেখা হয়। তিনি আমাকে বলেন, 'অন্নদা, অনাদি বলছে এখনও কিছু আদায় করতে পারা যায়।'

কুষ্টিয়া থেকে বদলি হয়ে আমি কৃষ্ণনগরে নদীয়া জেলার কালেক্টর হই। সে সময় ইন্দিরা দেবীর দূত কলকাতা থেকে এসে আমার সঙ্গে দেখা করেন। বলেন, চৌধুরীদের বিশেষ অর্থাভাব। ইন্দিরা দেবীর জমিদারিটা কোর্ট অব ওয়ার্ডসের পরিচালনায় এনে তাঁকে মাসে পাঁচশো টাকা মাসোহারা দেওয়ার জন্য সরকারকে আমি যেন সুপারিশ করি। স্যার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র তখন বাংলার গভর্নরের শাসন পরিষদের সদস্য। ভূমি রাজস্ব বিভাগ তাঁরই অধীনে পড়ে। আমি এক লাইন লিখলেই কাজটা হয়ে যায়।

কিন্তু সেটা লেখার আগে আমি আমার অধীনস্থ ডেপুটি কালেক্টর বৃন্দাবনবাবুর অভিমত জানতে চাই। তিনি বলেন, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর ধোবড়াকোলের সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডস নিতে পারে না, কারণ ওর স্বত্ব জমিদারি স্বত্ব নয়। আর নিলেই বা কী হয়েছে! তার থেকে বছরে কোর্টের আয় এক হাজার কি বারোশো টাকার বেশি হবে না। মাসোহারার পাঁচশো টাকা দেওয়া যায় কী করে!

আমি ইন্দিরা দেবীর দূতকে বলি, পাঁচশো টাকা সুপারিশ করতে আমি অক্ষম। আবার একশো কি দেড়শো টাকা সুপারিশ করা লজ্জার বিষয়। তিনি চৌধুরীদের দুরবস্থার কথা

স্মরণ করিয়ে দিয়ে পীড়াপীড়ি করেন। কলকাতায় গিয়ে তিনি বোর্ড অব রেভিনিউর কাছে তদ্বির করেন। সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানকার সেক্রেটারি। আমি চোখ বুজে চৌধুরীদের পাঁচশো টাকা সুপারিশ করলুম। পরিণাম কী হল জানিনে।

এখানে বলে রাখি স্যার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র ও সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দুজনে আমাকে চিনতেন। কুষ্টিয়া থেকে একবার কৃষ্ণনগরে সফর করতে এসে তাঁদের সঙ্গে মায়াপুর বেড়াতে যাই। নবদ্বীপের অন্তর্বর্তী মায়াপুর গ্রামটিকে আসল নবদ্বীপ বলে দাবি করছে একদল। এখন সেটা ইসকনের কেন্দ্র রূপে বিশ্ববিখ্যাত।

মহাযুদ্ধের সময় চৌধুরী দম্পতি কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে চলে যান ও সেখানে 'উত্তরায়ণে'র অন্তর্গত একটি কুটিরে অবস্থান করেন। একদিন চৌধুরী মশায়ের কাছ থেকে একটি পত্র পাই। বিশ্বভারতী পত্রিকা নামে ত্রৈমাসিকপত্র সম্পাদনার ভার তাঁর উপর পড়েছে। তিনি আমার কাছে একটি লেখা চান। আমি ধন্য হয়ে যাই। আমার লেখা দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের কাহিনী 'চেনাশোনা' কয়েক কিস্তি বেরোয়। তারপর আবার তাঁর একটা চিঠি পাই। এবার তিনি লিখেছেন, এখন থেকে এই পত্রিকা আরও বড় আকারে বেরোবে—তিনি সম্পাদক থাকছেন না।

সুতরাং তাঁর সঙ্গে আমার সম্পাদক-লেখক সম্পর্ক অকালে সাঙ্গ হয়।

ঘুরতে ঘুরতে আমি যখন বীরভূমের জেলা জজ হই তখন শান্তিনিকেতনে গিয়ে চৌধুরী দম্পতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তখন তাঁদের খুব করুণ অবস্থা। ননী নামক পুরাতন ভৃত্য তখনও তাঁদের সেবা করে। ননী আমাকে একান্তে বলে, 'সাহেব এখন শুধু সোডাজল খান। আপনি তাঁকে একটা ইয়ে এনে দিতে পারেন?'

যতবার আমি তাঁকে দেখেছি ততবারই ননী তাঁকে ইয়ে এনে দিয়েছে। তাঁর পুরনো অভ্যাস তিনি ছাড়তে পারেননি। পুরনো ঠাট আর নেই। সুরার স্বাদ সোডায় মেটাতে হয়। কিন্তু আমি ননীর অনুরোধ রক্ষা করতে পারিনে।

পরের বছর আবার যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে শান্তিনিকেতনে যাই তখন চৌধুরীদের অবস্থা আরও করুণ। ননী তখন ইহলোকে নেই।

যুদ্ধের পরে চৌধুরী দম্পতি কলকাতায় ফিরে যান। সেইখানে কিছুদিন পরে চৌধুরী মশায়ের জীবনাবসান হয়।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের শূন্যতা চৌধুরীমশায় কতকটা পূরণ করেছিলেন। বিশ্বভারতী পত্রিকার সূচনা তাঁরই হাতের। পরে আমার মনে হয়েছিল যে ননীর অনুরোধ রক্ষা করলে ভাল করতুম। পুরাতন অভ্যাস বজায় রাখলে চৌধুরীমশায় হয়তো সেই বয়সে 'সীতাপতি রায়ে'র মতো চমৎকার গল্প আরও লিখতে পারতেন। আমার আফসোস যে আমি তাঁকে তাঁর প্রেরণার উৎস যোগাতে পারি নি। কেননা আমি স্বয়ং ছিলুম ও রসে বঞ্চিত।

দিলীপকুমার রায়

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ছিলেন আমার প্রিয় নাট্যকার। তাঁর পুত্র দিলীপকুমার রায়ের গায়ক হিসেবে সুখ্যাতি আমি বিলেত যাওয়ার আগেই শুনেছিলুম। তাঁর উপন্যাস 'মনের পরশ'

আমার মনে বিলেত সম্বন্ধে আগ্রহ জাগিয়েছিল। কিন্তু কোনওদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি।

বিলেতে থাকতে আমি 'তারুণ্য' নামে একটি প্রবন্ধের বই লিখি। সেটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক সুধীরচন্দ্র সরকার। একদিন 'কালিকলম' পত্রিকায় খুশি হয়ে দেখলুম তার একটি সুদীর্ঘ সমালোচনা লিখেছেন দিলীপকুমার রায়। বইখানির প্রশংসাই করেছেন। তবে শেষের দিকে অনুযোগ করেছেন যে আমি একদেশদর্শী। কারণ আমি সন্ন্যাসীদের বিরোধী।

বিলেত থেকে ফিরে এসে শুনলুম, দিলীপকুমার চলে গেছেন পণ্ডিচেরিতে ও শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য হয়েছেন। একদিন মাদ্রাজের ভেলোর জেল থেকে আমার বান্ধবী সরলা দেবীর চিঠি পাই। তিনি লবণ সত্যাগ্রহ করে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ওড়িশার থেকে ভেলোরে। সেখানে খুব কষ্ট হচ্ছে ওঁর। আমি এই প্রসঙ্গে দিলীপকুমারকে একখানি চিঠি লিখে ভেলোরে যেতে অনুরোধ করি। সরলা দেবী তাঁর গানের একজন ভক্ত। তিনি যেন ভেলোর জেলে গিয়ে সরলা দেবীর একটু খোঁজখবর নেন। এইভাবে দিলীপকুমারের সঙ্গে আমার পত্রালাপ শুরু হয়ে যায়। তিনি আমাকে জানান যে তাঁর আশ্রমের বাইরে যাওয়ার স্বাধীনতা নেই।

পত্রালাপ ক্রমশ সাহিত্যের দিকে মোড় নেয়। ঠিক মনে পড়ছে না কেন তিনি আমার কোন কবিতার খুঁত ধরেছিলেন। এর উত্তরে আমি লিখি, 'মনের কথা মনের মতো করে / কইব আমার মনের মতনকে / কবি হবার নাই দুরাশা ওরে / সার মেনেছি সত্য কথনকে।' দিলীপকুমার ইতিমধ্যেই দিলীপদা হয়েছিলেন। তিনি আমার বিরুদ্ধে শ্রীঅরবিন্দের কাছে নালিশ করেন। শ্রীঅরবিন্দ আমার পক্ষ নেন।

দিলীপদার সঙ্গে আমার আর একবার তর্ক বাধে। আমি যা লিখেছিলুম তার সারমর্ম: সাহিত্যে সকলের স্থান আছে। যেমন বরাঙ্গনার তেমনই বারাঙ্গনার স্থান। যেমন পুণ্যবানের স্থান তেমনই পাপীতাপীর স্থান। যেমন সাধুসজ্জনের স্থান তেমনই চোর ডাকাতের স্থান। দিলীপদা কোনও একটি পত্রিকায় আমার এ মতামত পড়ে ভীষণ খেপে যান। তার উত্তরে তিনি সেই পত্রিকায় লেখেন—ঠিক মনে পড়ছে না, তবে এরকম—সাহিত্যে কি তাহলে মলমূত্র কৃমিকীট ইত্যাদিরও স্থান থাকবে? আমি এর জবাব দিইনে।

কিছুদিন পরে আমি যখন রাজশাহীর জেলাশাসক তখন দিলীপদা সেখানে আসেন আষাঢ়ে ক্লাবের বার্ষিক সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে। আমার অনুরোধে আমার বাড়িতে অতিথি হন। সেই প্রথম তাঁর সঙ্গে আমার মুখোমুখি। আমার স্ত্রী লীলারও।

আমাদের তিনি খুব সহজে আপনার করে নেন। তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ গেরুয়া হলেও রেশমের তৈরি। শৌখিন পুরুষ। আষাঢ়ে ক্লাবের সভায় সুরসিকের মতো বক্তৃতা দেন। তাঁর আশ্রম জীবন সম্বন্ধে কথা উঠলে বলেন, 'আমি এখন সব সহ্য করতে পারি। যে কোনও জায়গায় ঘুমোতে পারি। যে কোনও খাদ্য খেতে পারি। কিন্তু একটি জায়গায় আমার আপত্তি। আমি দুর্গন্ধ শৌচাগার সহ্য করতে পারিনে।' এই কথা শুনে আমি তাঁকে অভয় দিই যে আমাদের বাড়ির শৌচাগার ইউরোপীয় স্টাইলে, সেখানে দুর্গন্ধ নেই।

অনেকদিন বাদে তাঁর সঙ্গে আবার দেখা হয় কলকাতায়। তিনি আমাকে নিয়ে যান শ্বেতাঙ্গ সন্ন্যাসী কৃষ্ণপ্রেমের সকাশে। লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক নিকসন সন্ন্যাস নিয়ে বৈষ্ণব হয়েছেন। তিনি যশোদামাইয়ের শিষ্য। যশোদামাই হলেন ভাইস

চ্যান্সেলার চক্রবর্তীর স্ত্রী। তাঁর নিজের একটি আশ্রম আলমোড়ার কাছে পাহাড়ের উপরে। কৃষ্ণপ্রেম সেখানে থেকে সাধনা করেন। দিলীপদা আমাকে তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। গীতা ও উপনিষদের উপর তাঁর দুখানি ইংরেজি বই ছিল। দুখানাই আমি পড়েছিলুম। অসাধারণ তত্ত্বজ্ঞান।

আর একবার দিলীপদা আমাকে নিয়ে যান আনন্দময়ী মাকে দর্শন করতে। ভারতে যে ক-জন সত্যিকার সাধু সন্ন্যাসী আছেন আনন্দময়ী মা তাঁদের অন্যতম। মার সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমারও মনে হল যে তিনি সত্যিই কিছু উপলব্ধি করেছেন যা গতানুগতিক নয়।

দিলীপদা সন্ন্যাস দীক্ষা নেননি। তাঁকে সন্ন্যাসী বলা যায় না। অথচ তিনি গৃহীও নন। তাঁর গৃহ নেই। তাঁর গৃহিণী নেই। বরাবরই তিনি বিবাহবিমুখ। অথচ বন্ধুনী বিমুখ নন। তাঁর জীবন সম্বন্ধে যতদূর জানতে পেরেছি, তিনি সাহানা দেবীকে ভালবাসতেন।

সাহানা দেবী ছিলেন অসাধারণ সুগায়িকা। দিলীপদা ও তিনি এককালে দুজনে মিলে গান করতেন। তাঁর বিয়ে হয়ে যায় উত্তর ভারতের এক উচ্চ বংশে। তাঁরা তাঁর সঙ্গীতচর্চা পছন্দ করতেন না। তাতে বংশের মর্যাদাহানি হয়। স্বামীর সঙ্গে বনিবনা হয় না। তিনি গুরুতর অসুখে পড়েন। একদিন সব ছেড়ে চলে যান শান্তিনিকেতনে। গুরুদেব বলেন, তুমি এইখানেই থাকো। আমি তোমার অসুখ সরিয়ে দেব। তুমি সঙ্গীত ভবনে গান শেখাবে। কিন্তু সেখানে সাহানা দেবীর মন লাগে না। তিনি একাই চলে যান পণ্ডিচেরি। সেখানে মাদারের আশ্রয় চান ও পান।

ইতিপূর্বে দিলীপকুমার পণ্ডিচেরিতে শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য হয়েছিলেন। সাহানা দেবী হলেন অপর এক শিষ্যা। শ্রীঅরবিন্দ ও মাদারের সম্মতি নিয়ে দুজনে মিলেমিশে সঙ্গীত সাধনা করেন। এইভাবে বেশ চলছিল।

শ্রীঅরবিন্দের জীবনাবসানের পর দিলীপদা পণ্ডিচেরিতে আর তেমন কোনও প্রেরণা পেলেন না। কলকাতাতে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়। তখন তিনি যেন এক নোঙর-ছেঁড়া নৌকো। কোন ঘাটে ভিড়বেন তা জানেন না। বলেন, 'আমি আমাদের ট্র্যাডিশনাল বৈষ্ণব ধর্মে ফিরে যাচ্ছি। অদ্বৈত আচার্য আমার পূর্বপুরুষ।'

আমি খুবই বিস্মিত হই। একদিন তিনি সত্যি সত্যি তাঁর নিজের একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। পুনায় অবস্থিত হরিকৃষ্ণ মন্দির। যাঁর প্রেরণায় করেন তাঁর নাম ইন্দিরা দেবী। এক পাঞ্জাবি কন্যা। পণ্ডিচেরিতেই তাঁদের আলাপ। ইন্দিরার অর্থেই হরিকৃষ্ণ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা। দিলীপদা হন দাদাজি। তাঁর ভক্তদের নিয়ে তিনি সন্ধ্যাবেলা বসতেন। সেখানে হত ভজন আর ধর্মীয় সঙ্গীত। সেই সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা'র মতো জাতীয় সঙ্গীত।

পুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে লীলা রায় একবার পুনা যান রবীন্দ্রনাথের উপর বক্তৃতা দিতে। আমিও তাঁর সঙ্গী হই। একদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা গেলুম হরিকৃষ্ণ মন্দিরে দিলীপদার গান শুনতে। তিনি তন্ময় হয়ে গান করলেন, একটির পর একটি, কখনও ইংরেজিতে, কখনও হিন্দিতে, কখনও বাংলা। শ্রোতারাও তন্ময় হয়ে শুনলেন। তাঁরা পুনার নাগরিক।

পরবর্তীকালে তিনি প্রত্যেক বছর কলকাতায় আসতেন সদলবলে। মিলন সেনের অতিথি হতেন। রোজ সন্ধেবেলায় গানের আসর বসত। সেখানেও তিনি পুনার মতোই

তিনটি ভাষায় গান গেয়ে শোনাতেন। শ্রোতাদের সংখ্যায় ঘর ভরে যেত। আমরাও ছিলুম তাঁর শ্রোতাদের মধ্যে।

দিলীপদার মধ্যে একটা চুম্বকশক্তি ছিল। সবাইকে তিনি টানতে পারতেন। আমার সঙ্গে চিঠিপত্র লেখালেখি কোনওদিন বন্ধ হয়নি। তাঁর লেখা উপন্যাস বা কাব্য নিয়মিত পাঠাতেন। লিখতেনও বিস্তর। তাঁর শেষ উপন্যাস 'পতিত ও পতিতপাবন' আমার ভাল লেগেছিল। মৃত্যুর পূর্বে তিনি আমাকে লিখলেন যে তাঁর পরবর্তী উপন্যাস তিনি আমাকে উৎসর্গ করবেন।

তাঁর শেষের দিকের একখানি চিঠিতে ছিল, তিনি দুজনকে প্রায়ই স্বপ্ন দেখতেন। একজন আমি ও অন্যজন নিশিকান্ত। তাঁর সবশেষের চিঠিতে তিনি লেখেন যে তিনি স্বপ্নে রাধারানীর দর্শন পেয়েছেন তাঁর জীবন সার্থক।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাধনার শেষ কথা হল রাধারাণীর কৃপালাভ। এরপরে আর কিছু নেই। এইবার তাঁর প্রয়াণের সময় হল। একদিন খবর এল, তিনি আর নেই। তিনি তাঁর সাধনোচিত ধামে গমন করেছেন যেখানে সেই বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম।

নরেন দেব ও রাধারানী দেবী

আমি যখন কলেজের ছাত্র তখন সাপ্তাহিক 'বিজলী' পত্রিকায় মাঝেমাঝে দেখতুম, রাধারানী দত্ত নামে এক মহিলার লেখা চিঠি বা নিবন্ধ। তিনি এক বিদ্রোহিণী নারী। এক কট্টর ফেমিনিস্ট। কিন্তু তিনি যে একজন কবি বা সাহিত্যিক তার কোনও নিদর্শন ছিল না। 'বিজলী' পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। আমি চলে যাই বিলেতে।

আমি তো তাঁকে ভুলেই গিয়েছিলুম। তাই বিলেত থেকে ফিরে তাঁর লেখা একটি কাব্যগ্রন্থ পেয়ে আশ্চর্য হই। গ্রন্থটি 'লীলাকমল'।

এতকাল পরে মনে পড়ছে না লেখিকার পদবী দত্ত ছিল না দেবী ছিল। তবে দত্ত থাকাই স্বাভাবিক। কেন না তখনও নরেন্দ্রদেবের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়নি ও সেই সূত্রে তিনি দেবী হননি।

'লীলাকমল' বইটির আমি একটি সমালোচনা লিখি। সাপ্তাহিক 'নবশক্তি' পত্রিকায় সেটি প্রকাশিত হয়। কবিতাগুলি পড়ে মনে হল তাঁর বিদ্রোহ নিস্তেজ হয়ে এসেছে। সম্ভবত তিনি প্রেমে পড়েছেন। সেই অনুমানটাই যথার্থ। কিছুদিন পরে তাঁর বিবাহের খবর পাই।

লিলুয়ায় গিয়ে বিবাহের জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাই। তখন তিনি ও নরেন্দ্র দেব লিলুয়ায় একটি বাসা নিয়ে হনিমুন করছিলেন। তিনি সলজ্জমুখে বলেন, 'বিয়ে করেছি বটে, কিন্তু সহবাস করি না।' আমি হেসে বলি, 'তাহলে হনিমুন করতে কলকাতা ছেড়ে এখানে আসা নিরর্থক।'

কয়েকবছর বাদে আর একখানা বই পাই। নাম 'বুকের বীণা'। লেখিকা অপরাজিতা দেবী আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। বাংলা সাহিত্যেও নবাগত। ভাষা সম্পূর্ণ নতুন, আঙ্গিক সম্পূর্ণ নতুন, ছন্দ সম্পূর্ণ নতুন, বিষয়ও সম্পূর্ণ নতুন। মনে হল এক মুক্তি নারী বা নিউ উম্যান।

যেমনটি আমি কলেজ জীবনে চেয়েছিলুম। ইতিমধ্যে আমারও বিবাহ হয়েছে। যাঁকে পেয়েছি তাঁকে নিয়ে আনন্দে আছি। বন্ধনের মধ্যেই মুক্তি।

আমার কখনও মনে হয়নি যে অপরাজিতা একটি ছদ্মনাম। অর্থাৎ 'বুকের বীণা' যিনি লিখেছেন তিনি বিবাহ সত্ত্বেও অপরাজিতা। ওই বইটি পাওয়ার পরে আমি তার সমালোচনা লিখিনি। তখন আমি নিজের রচনায় মগ্ন ছিলুম। অপরাজিতা দেবীও আমায় চিঠি দেননি সমালোচনার জন্যে।

আরও একখানি কি দুখানা বই পাই। একটির নাম 'সিঁথিমৌর', লেখিকার নাম, যতদূর মনে পড়ছে, রাধারানী দেবী। লেখা পড়ে মনে হল ট্র্যাডিশনাল গৃহবধূ। আমি সেটিরও সমালোচনা লিখিনি। অন্য বইখানির নাম মনে পড়ছে না।

যথাকালে খবর পাই, রাধারানী দেবীর একটি কন্যা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তার নাম রেখেছেন নবনীতা। জেনে খুশি হই।

নরেন্দ্র দেব ছিলেন উত্তর কলকাতার এক বনেদি বংশের সন্তান। ছেলেবেলায় 'মৌচাকে' তাঁর লেখা পড়েছি। তিনি একটি কাব্য সংকলন সম্পাদনা করেন। তার নাম 'কাব্যদীপালি'। কবি হিসাবে তাঁরও খ্যাতি ছিল। তাই নরেন্দ্র-রাধারানী মিলে হন এক কবি দম্পতি। এঁরা উত্তর কলকাতা থেকে উঠে গিয়ে দক্ষিণ কলকাতায় বাড়ি করেন। বাড়ির নাম রাখেন 'ভালবাসা'। বন্ধুবান্ধবরা সেখানে গিয়ে জড় হতেন ও সাহিত্যচর্চা করতেন।

আমি থাকতুম মফস্বলের বিভিন্ন জায়গায়। কলকাতায় প্রথম বদলি হই স্বাধীনতা দিবসে। দেব-দম্পতির সঙ্গে মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ হয়।

পি.ই.এন্-এর বেঙ্গল চ্যাপ্টার বলে আমাদের একটা প্রতিষ্ঠান ছিল। সেটা ভেঙে গিয়েছিল, অল ইন্ডিয়া সেন্টার থেকে আমার উপর ভার দেওয়া হয় ঘরোয়াভাবে পি.ইন.এন্ সভ্যদের নিয়ে অনুষ্ঠান করার। সেই সূত্রে নরেনদা ও রাধারানীদির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়।

আমি যখন ইস্তফা দিয়ে কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে চলে যাই তখন ভার দিই লীলা মজুমদারের উপর। তিনি কিছুদিন চালাবার পর ভার দেন নরেন্দ্র দেব ও রাধারানী দেবীর উপর। এঁদের উদ্‌যোগে পি.ই.এন্-এর ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্রাঞ্চ গঠিত হয়, এঁরা দুজনেই হন তার যুগ্ম সেক্রেটারি। এঁদেরই অধ্যবসায়ে শাখার সদস্য সংখ্যা বেড়ে যায় ও প্রভাব বৃদ্ধি হয়।

এঁরা দুজনে একবার ইউরোপ ভ্রমণে যান। সেখানে তাঁরা 'ভারতের ব্রাউনিং দম্পতি' রূপে পরিচিত হন।

এরই মধ্যে কোনও এক সময় রাধারানীদি ফাঁস করেন যে তিনিই অপরাজিতা দেবী। আমার কাছে এটা গোপন রেখেছিলেন অন্তত বিশ বছর। রাধারানী দেবীর 'লীলাকমলে'র সঙ্গে অপরাজিতা দেবীর 'বুকের বীণা'র কিছুমাত্র মিল ছিল না। বই দুটি যে একই মানুষের লেখা এটা বিশ্বাস করতে পারিনি। তবে এটা আরও অনেকে জানতেন। বলা যেতে পারে একটা ওপেন সিক্রেট।

যে কারণেই হোক রাধারানীদির লেখা একটু একটু করে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু নরেনদা লেখা চালিয়ে যান। তবে কবিতা নয়, ভ্রমণকাহিনী ইত্যাদি।

আমি শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় আসি মাত্র তিনদিনের জন্য। কিন্তু একটি

দুর্ঘটনা ঘটে যায়। লীলা জখম হন। অপারেশনের পরে ডাক্তার তাঁকে বিছানায় থাকতে বলেন দুবছর। তার পরেও কলকাতায় থাকতে হয় পারিবারিক কারণে। রাধারানীদির সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা বলি টেলিফোনে। পনেরো মিনিটের আগে তিনি কিছুতে থামবেন না। আমিও থামিয়ে দিতে পারিনে। সেজন্য আমিও ভয় পেতুম তাঁকে ফোন করতে।

নরেনদা বিগত হওয়ার পরে রাধারানীদি আরও কিছুকাল জীবিত ছিলেন। সে সময় নবনীতা ছিল তাঁর একমাত্র সঙ্গী। মেয়েটির বিয়ে দেওয়া হয়েছিল ঘটা করে নরেনদার জীবিতকালে, কিন্তু কেন জানিনে, বিবাহবিচ্ছেদ হয়। নবনীতা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ পায় নিজের গুণে। পিতার অবর্তমানে একাই মাতার সেবা-শুশ্রূষা করে। পরবর্তীকালে নবনীতাই রাধারানীদির বইগুলিও পুনঃপ্রকাশ করে। সে নিজেও স্বনামধন্য হয়েছে।

কাজী নজরুল ইসলাম

পনেরো বছর বয়সে আমি 'প্রবাসী'র গ্রাহক হয়ে দেখি, প্রথম সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়েছে দু'পঙ্‌ক্তির একটি কবিতা, পৃষ্ঠার একেবারে তলায়। কবির নাম হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম। কবিতার দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির শেষ অংশ ছিল—'পশবে তোর ও নাসায়।' তারপর কেটে গেছে আশি বছর। যতদূর মনে পড়ছে, কবিতাটি ছিল হাফিজের কোনও প্রেমের কবিতার মর্মানুবাদ।

এর আগে কাজী নজরুল ইসলামের অন্য কোনও রচনা দেখিনি। আমার কাছে এটাই তাঁর প্রথম পরিচয়।

বছর দুই বাদে 'প্রবাসী'তেই পুনর্মুদ্রিত হয় 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বিদ্রোহী'।

'বল বীর—
বল উন্নত শির,
শির নেহারি' আমার নত-শির ওই শিখর হিমাদ্রির।'

অতি দীর্ঘ কবিতা। তবু মনে রাখবার মতো। এ কবিতা আমাকে মাতিয়ে তোলে। আমি নজরুলের ভক্ত হয়ে যাই। বন্ধুমহলে এর প্যারোডি শোনা যায়—

'আমি রোম নগরের পোপ
আমি সীতা খিলিয়ানির গোঁফ।'

সীতা খিলিয়ানি ছিলেন শান্তিনিকেতনের এক সিন্ধি ছাত্রী। এছাড়া আরও অনেক প্যারোডি বেরিয়েছিল। সবই মজাদার। যাই হোক, কাজী নজরুল একদিনেই বিখ্যাত হয়ে গেলেন। সকলেই বলত বিদ্রোহী কবি নজরুল।

কোথায় যেন এক কপি 'ধূমকেতু' আমার চোখে পড়ে। নজরুল সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্রিকা। তাতে ছিল তাঁর পুত্রশোকের কবিতা। 'ওরে খোকা, ওরে আমার পলাতকা।' এইটে সম্পূর্ণ অন্যরকম কবিতা।

এরপরে তাঁর 'অগ্নিবীণা' গ্রন্থখানি বেরোয়। আমি কিনি। সবাই কাড়াকাড়ি করে পড়ে।

'আনোয়ার। আনোয়ার।
বুক ফেঁড়ে আমাদের কলিজাটা টানো আর
খুন করো—খুন করো—ভীরু যত
জানোয়ার।'

এই পর্যন্ত মনে আছে। এরও প্যারোডি বেরোয়। আর একটি কবিতার এক পঙ্‌ক্তি—'এ কি রণবাজা বাজে ঘনঘন ঝন রণ-রণ রণ ঝন-ঝন' ইত্যাদি। এখন সব মনে পড়ছে না, কিন্তু তখন সব মুখস্থ হয়ে যায়। এটা বোধহয় 'মহরম' বা 'আগমনী'র কবিতা।

এর পরে কী যেন লেখেন। তাঁকে জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর নামে 'বসন্ত' নামে একটি পুস্তিকা উৎসর্গ করেন।

আমি তখন পাটনা কলেজের ছাত্র। কটক থেকে পাটনায় যাওয়া-আসার সময় একদিন কি দুদিন কলকাতায় থামি। কাজী নজরুল ইসলামকে প্রথম দেখি অ্যালবার্ট হল্‌-এ ফরাসের উপর হার্মোনিয়াম নিয়ে বসে গান করতে। 'হে ভাই চাষি ধর কষে লাঙল, হে ভাই মজুর, ধর কষে শাবল।' দূর থেকে তাঁকে দেখি। কথা বলার সুযোগ হয়নি।

'অগ্নিবীণা'র পর তাঁর আর একখানি বই বেরোয়। 'দোলনচাঁপা'। সেটিও কিনি। তার সুর একেবারে অন্যরকম। প্রেমের কবিতা। এরপরে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারিনে।

ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের শিক্ষানবিশ হয়ে বিলেত চলে যাই। সেখানে এক ছাত্রের মুখে শুনি 'কে বিদেশি মন উদাসী বাঁশের বাঁশি বাজাও বনে।' শুনলুম, ওটা নাকি গজল। কাজী তখন কবিতা ছেড়ে গান লিখছেন।

বিলেত থেকে ফিরে বহরমপুরে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট পদে যোগ দিই। ইতিমধ্যে অচিন্ত্যকুমারের সঙ্গে আমার বিলেত প্রবাসকালে পত্রযোগে বন্ধুত্ব হয়েছিল। দেশে ফেরার পর তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক আরও গভীর হয়। তাঁর বিবাহ উপলক্ষে তাঁর দাদার বাড়িতে বরযাত্রীদের মধ্যে আমিও উপস্থিত ছিলুম। সে সময় কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়। তাঁর পরনে গেরুয়া ধুতিপাঞ্জাবি, গলায়—যতদূর মনে পড়ে—রুদ্রাক্ষের মালা। দেখে মনে হয় একজন সাধক। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর প্রকাশক গোপালদাস মজুমদার, ডি.এম. লাইব্রেরির স্বত্বাধিকারী। গোপালবাবু বলেন, কাজীর বই বেশিরভাগ মুসলমানরাই কেনে। কাজী বলেন, না, না, বেশিরভাগ হিন্দুরাই কেনে। কে একজন প্রশ্ন করেন, অন্নদাশঙ্কর রায় আজকাল কী লেখেন। কাজী চটপট উত্তর দেন, তিনি রায় লেখেন। অচিন্ত্যর বিয়ে নিয়ে খুব হাসিতামাশা করেন। অচিন্ত্যর প্রথম বইখানির নাম ছিল 'বেদে'। পরে তার একটি বইয়ের নাম 'বিবাহের চেয়ে বড়'। কাজী তামাশা করে বলেন, অচিন্ত্য আগে বলত, 'বে দে', 'বে দে'। বিয়ের পরে দেখে, 'বিবাহের চেয়ে বড়'—। ইঙ্গিতটা অশ্লীল। হাসাহাসি পড়ে যায়।

গোপালবাবু সেদিন আমাকে বলেন, 'আপনি আমাকে একখানি উপন্যাস দিন।' তখন 'বিচিত্রা'য় আমার, 'যার যেথা দেশ' শুরু হয়েছিল। সেটা সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপরোধে। ইতিমধ্যে 'অসমাপিকা' লেখা হয়ে গিয়েছিল। সেটা সুধীরচন্দ্র সরকারের অনুরোধে। এরপরে আরও একখানি উপন্যাস লিখতে হবে শুনে প্রথমটায় নারাজ হই। তারপরে লিখি 'আগুন নিয়ে খেলা'। তখনও আমার বিয়ে হয়নি। 'আগুন নিয়ে খেলা' ছ-সপ্তাহের মধ্যে লেখা হয়ে যায় ও সঙ্গে সঙ্গে বই হয়ে বেরিয়ে যায়। তার কিছুদিনের মধ্যে

আমার বিয়ে। ভাগ্যিস গোপালদাসবাবু রয়্যালটি হিসেবে কিছু টাকা দেন। সেটা বিয়ের আংটি ও শাড়ি কিনতে খরচ হয়।

কাজী নজরুলের সঙ্গে আমার এর পরে কোনওদিন দেখা হয়নি। সেদিন অচিন্ত্যর বিয়েতে আমি তাঁর সহযাত্রী হইনি। বহরমপুরে ফেরার জন্য আমার তাড়া ছিল। দেখলুম তিনি রসিকপুরুষ। কিন্তু সেই সঙ্গে গেরুয়া পরা হিন্দু সাধক। তিনি হিন্দু কি মুসলমান তা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। বরং দেখে মনে হল হিন্দুর ভাগটাই বেশি।

শুনেছিলুম নলিনাক্ষ সান্যালের বিয়ের সময়ও নজরুল ছিলেন বরযাত্রী। মুসলমান বলে তাঁকে আলাদা ঠাঁই করে দেওয়া হয়। তখন নলিনাক্ষ বলেন, কাজীকে আমার পাশেই বসতে দিতে হবে। তা না হলে আমি বসব না। তখন কাজীকে তাঁর পাশে বসতে দেওয়া হয়। আর আপত্তি ওঠে না।

কাজীকে হিন্দু ছেলেরা কাজীদা বলত। মুসলমান বলে বাছবিচার করত না। তিনিও শ্যামাসঙ্গীত লিখতেন। লোকে তা ভালবাসত।

একবার চট্টগ্রামে কর্মরত এক হিন্দু ভদ্রলোক এসে বললেন, তিনি তারাচরণ পরমহংসের শিষ্য। তাঁর গুরুর নামে কাজী নজরুল ইসলাম একটি গান লিখে দিয়েছেন। গানটি আমাকে দেখালেন। পড়ে দেখলুম, হিন্দু সাধনমার্গের গান। যিনি লিখেছেন তিনি তন্ময় হয়ে লিখেছেন। বোঝবার উপায় নেই যে তিনি ভিন্ন ধর্মাবলম্বী।

বহুদিন পরে আমি যখন ময়মনসিংহে, একদিন দেখি যে আমার কর্মচারীদের মধ্যে কয়েকজন হিন্দু হার্মোনিয়ম নিয়ে বসেছেন ও গান করছেন। গানের কথাগুলি আমার মনে নেই। তবে ভাবটা এই যে কাজী নজরুল তুমি আরোগ্য লাভ করো। তোমার জন্য আমরা উদ্বিগ্ন। এ ঘটনাটা পার্টিশনের কিছুদিন আগেকার। আমি জানতে চাই, কাজী নজরুলের কী হয়েছে। তাঁরা বললেন যে কাজী এখন গুরুতর অসুস্থ, তাঁর মুখে কথা নেই।

পার্টিশনের পরে আমি একটি কবিতা লিখি নজরুলকে নিয়ে।

‘ভুল হয়ে গেছে বিলকুল।
আর সব কিছু ভাগ হয়ে গেছে
ভাগ হয়নি কো নজরুল।
এই ভুলটুকু বেঁচে থাক।
বাঙালি বলতে একজন আছে
দুর্গতি তাঁর ঘুচে যাক।’

তখনও আমার বিশ্বাস ছিল যে তিনি সেরে উঠবেন। তাঁকে সারিয়ে তোলার জন্য চেষ্টাও হয়েছিল। কাজী আবদুল ওদুদ ও রবিউদ্দিন আহমেদ তাঁকে নিয়ে ভিয়েনায় গিয়েছিলেন। ডাক্তার নাকি বলেন যে বড্ড দেরি হয়ে গেছে। তাঁকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে তাঁকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেও তাঁর অবস্থার উন্নতি হয় না। একদিন কলকাতায় আমি কী একটা উপলক্ষে রবীন্দ্রসদনে গিয়েছি। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের পাশে দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় নজরুলের পুত্রবধূ কল্যাণী কাজী এসে আমাদের পায়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে। তার কান্নার কারণ তার ভাশুর সব্যসাচী গিয়েছিল পিতার মৃত্যুর খবর পেয়ে ঢাকায়। তাকে বিমানবন্দরে আটক করে রাখা হয়। ছাড়া পাওয়ার

পর সে গিয়ে দেখে মৃতদেহ গোর দেওয়া হয়ে গেছে। তাকে একমুঠো মাটি দেবারও সুযোগ দেওয়া হয়নি।

আমরা তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করি। কিন্তু বুঝতে বাকি থাকে না যে সব্যসাচীকে তার পিতৃকৃত্য থেকে বঞ্চিত করা ইচ্ছাকৃত। কাজী নজরুল তখন আর বাঙালি নন, তিনি মুসলমান। মুসলমানের ছেলের নাম সব্যসাচী কেন? সে কি মুসলমান? হতে পারে বাঙালি, কিন্তু শেষ মুহূর্তে বাঙালিত্বের তেমন কদর নেই যেমন মুসলমানত্বের।

এইখানে বলে রাখি যে নজরুলের স্ত্রীর নাম প্রমীলা, পুত্রদের নাম সব্যসাচী ও অনিরুদ্ধ। পুত্রবধূদেরও নাম হিন্দু, কিন্তু পদবী কাজী। এই পরিবারের প্রথা এখনও সেইরকম। হিন্দু মুসলমানের সমন্বয় এইভাবে হয়েছে।

কাজী আবদুল ওদুদ

কাজী আবদুল ওদুদের নাম প্রথম দেখি 'প্রবাসী'র পাতায়, আমার কলেজ জীবনে। তিনি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথের উপরে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ যা দুই সংখ্যায় বা তিন সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল।

সরকারি চাকরি নিয়ে আমি যখন ১৯৩৩ সালে ঢাকায় বদলি হই তখন সেখানকার ইন্টারমেডিয়েট কলেজে কাজী আবদুল ওদুদ ও কাজী মোতাহের হোসেন দুজনের সঙ্গেই আলাপ হয়। এঁরা দুজনেই ছিলেন একদা 'শিখা' গোষ্ঠীর সদস্য। 'শিখা' গোষ্ঠী ততদিনে নিষ্ক্রিয়। এই গোষ্ঠীর প্রধান সদস্য আবুল হোসেনের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। পরে এক এক জায়গায় এক এক সময় আলাপ হয়েছিল আবুল ফজল ও মোতাহের হোসেন চৌধুরী ও আবদুল কাদির ও আনোয়ারুল কাদির এই চারজনের সঙ্গে। আমি যতদূর জানি, 'শিখা' গোষ্ঠী বলতে এই ক-জনকে বোঝাত। এঁরা প্রায় সকলেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা ইন্টারমেডিয়েট কলেজ এই দুই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। কেউ বা অধ্যাপক, কেউ বা ছাত্র। এঁরা সকলেই বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ।

গত শতাব্দীর কলকাতায় হিন্দু কলেজের ইয়ং বেঙ্গলদের সঙ্গে এই শতাব্দীর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথা ইন্টারমেডিয়েট কলেজের নব্য যুবকদের তুলনা করতে পারি। এঁরাই নতুন এক রেনেসাঁসের পূর্বসূরী। সেটা বাঙালি মুসলমানদের রেনেসাঁস। দু-একজনকে বাদ দিলে গত শতাব্দীর রেনেসাঁসে বাঙালি মুসলমানদের অংশ ছিল না। বলতে গেলে এক শতাব্দীকাল তাঁরা নিদ্রিত ছিলেন।

তাঁদের সেই নিদ্রাভঙ্গের নিট ফল হয় পরবর্তী জমানায় একুশে ফেব্রুয়ারির দিন ভাষার জন্য প্রাণদান। প্রায় পঁচিশ বছর বাদে। ততদিনে দেশভাগ ও প্রদেশভাগ হয়েছে। কাজী আবদুল ওদুদ বরণ করেছেন স্বাধীন ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ। অন্যরা পূর্ববঙ্গ ওরফে পূর্ব পাকিস্তান।

কাজী আবুল ওদুদের সঙ্গে নামমাত্র আলাপ হয়েছিল। আমি তাঁকে আমার 'সত্যাসত্য' উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড উপহার দিই। পরে একসময় তিনি আমাকে উপহার

পাঠান তাঁর লেখা 'কবিগুরু গ্যেটে' প্রথম খণ্ড। কয়েকবছর বাদে দ্বিতীয় খণ্ড। কবে এক সময়, আমার ঠিক মনে পড়ছে না, 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ' প্রথম খণ্ড। তারপর তাঁর শেষ জীবনে 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ' দ্বিতীয় খণ্ড। ইতিমধ্যে কলকাতায় তাঁর সঙ্গে আমার মাঝে মধ্যে দেখা হয়। কিন্তু পত্রালাপ ছিল নিয়মিত।

তিনি ছিলেন পাকিস্তান আইডিয়াটার সম্পূর্ণ বিরোধী। একটি প্রবন্ধে লেখেন, পাঞ্জাবের সঙ্গে বাংলার সংযোগ ঘোর অনর্থ ডেকে আনতে পারে। সেই অনর্থ যে-বছর ঘটে তার এক বছর আগেই তিনি কলকাতায় বিগত হন। তাঁর বাড়ি যদিও পূর্ববঙ্গে তবু তিনি কোনদিন পার্টিশনের পর সেখানে পদার্পণ করেননি।

মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন ঢাকায়। তা নইলে সমস্ত পরিবারটাই ভারতে থেকে যায় ও ছেলেরা পড়াশুনো করে।

স্বাধীনতাদিবসে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় কলকাতার রাজপথে। তিনি বিলি করছিলেন তাঁর লেখা একটি পুস্তিকা। তার নাম, যতদূর মনে পড়ে, 'স্বাধীনতা দিবসের উত্তর'। বঙ্গভঙ্গ তিনি মন থেকে মেনে নেননি। তাই তাঁর পরবর্তী গ্রন্থের নাম হয় 'শাশ্বত বঙ্গ'। তার একটি ইংরেজি সংস্করণও বেরিয়েছিল। নামটি, যতদূর মনে পড়ে, 'ইটারনাল বেঙ্গল'। তাঁর মতো বঙ্গ-প্রেমিক আমি দেখিনি। ভারত প্রেমিকও কম দেখেছি।

পূর্ব পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবী সমাজ তাঁকে ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর লেখা বই সে দেশের থেকে প্রকাশিত হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পর স্বাধীন বাংলাদেশ তাঁর রচনাবলী প্রকাশ করে। পশ্চিমবঙ্গে তাঁর একখানি ভিন্ন আর কোনও বই পাওয়া যায় না। সেই বইখানির নাম 'হিন্দু-মুসলমান বিরোধ'। এই বইখানি শান্তিনিকেতনে প্রদত্ত ভাষণ, রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে। কবি তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। তিনিও কবির একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন।

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধেও তিনি একখানি বই লিখেছিলেন। বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপনা করতেন। তবে তিনি ছিলেন ইকনমিক্সে এম. এ.। আইনও পড়েছিলেন। কথা ছিল ওকালতি করবেন। কিন্তু দীনেশচন্দ্র সেনের সুপারিশে ঢাকা ইন্টারমেডিয়েট কলেজে বাংলা সাহিত্যের লেকচারার নিযুক্ত হন। বহু বিষয়ে তাঁর পড়াশোনা ছিল। বহু প্রবন্ধ তিনি লিখেছিলেন বাংলায়। তাঁর একটি সংকল্প ছিল। তিনি তিনখানি জীবনী-গ্রন্থ লিখবেন। কবিগুরু গ্যেটের, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের, আর তৃতীয়টি হচ্ছে হজরত মহম্মদের। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর এই তিনটে সংকল্পই পূর্ণ হয়।

তিনি যে কেবল একজন ধর্মপরায়ণ মুসলমান ছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন একজন উদারমনা হিউম্যানিস্ট ও কট্টর বাঙালি। অধিকন্তু একনিষ্ঠ ভারতপ্রেমিক।

তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পরে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। শেষ বয়সে হয় পার্কিন্‌সন ডিজিজ। একদিন খবর পাই যে কাজী আবদুল ওদুদের যায় যায় অবস্থা, আমি যেন একবারটি দেখা করতে যাই। ছুটে গিয়ে দেখি, তিনি অনেকটা ভাল আছেন। কিন্তু পরের বার খবর পাই, তিনি আর নেই। আবার ছুটে যাই। দেখি, অনেকেই উপস্থিত হয়েছেন, বেশির ভাগই হিন্দু। কলকাতার মুসলমান সমাজ প্রধানত উর্দুভাষী। শুনলুম, তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র বোম্বাই থেকে না এলে শবানুগমন হবে না। আমি চলে আসি। শবানুগমন হয় অনেক দেরিতে। হিন্দুরাও যায় গোবরার গোরস্থান পর্যন্ত। পরে একদিন আমি গোবরায় গিয়ে গোরস্থান পরিদর্শন করি। পাশাপাশি দুজনের কবর—স্বামী ও স্ত্রীর। কাজী সাহেব অত্যন্ত

পত্নীপরায়ণ ছিলেন।

আমি যখন চাকরিতে অকালে অবসর নিয়ে শান্তিনিকেতনে চলে যাই তখন কাজী সাহেব আমাকে উপদেশ দেন, 'আরও গভীরভাবে আপনি অভ্যন্তরে যাবেন।' অর্থাৎ অতি দূরবর্তী গ্রামে। আমাদের গ্রামবাসীদের উপরে তাঁর আন্তরিক বিশ্বাস ও ভালবাসা ছিল, হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে। তবে একথা তিনি একবার বলেছিলেন যে সাম্প্রদায়িকতা এখন গ্রামবাংলার ভেতরেও ঢুকেছে। এর জন্য তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন।

তিনি সেকিউলার মতামত বিশ্বাস করতেন। পার্টিশনের পরে তাঁর নিজের সম্পাদনায় একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। নামটি আমি ভুলে গেছি। যতদূর মনে পড়ছে 'সংকল্প'। দেশের মানুষকে প্রকৃতিস্থ করতে হবে। সেটাই বুদ্ধিজীবীদের কাজ। তিনি গান্ধী ও নেহরু দুজনেরই অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু রাজনীতি নিয়ে লিখতেন না।

তাঁর 'কবিগুরু গ্যেটে' গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশের জন্য তিনি একজন প্রকাশকের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেই প্রকাশক কথা রাখেন না। আমার মতে সেটাই তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। তাতে গ্যেটের কবিতার অনুবাদ তিনি নিজেই করেছিলেন। সেই গ্রন্থটির পুনঃপ্রকাশ করা একান্ত আবশ্যক। তাহলে আমরা তাঁকে ভুলে যাব না, মনে রাখব। কিছুদিন আগে তাঁর জন্মশতবর্ষ পালিত হয়। একটা রাস্তারও তাঁর নামে নামকরণ হওয়ার কথা। হয়েছে কি না তা আমি জানিনে।

বাংলা সাহিত্যে একজন বড় মাপের ভাবুকরূপে কাজী আবদুল ওদুদের স্থান সুনির্দিষ্ট হয়ে থাকবে। আমার সঙ্গে তাঁর অকৃপণ বন্ধুত্ব ছিল। আমি তাঁকে 'প্রত্যয়' নামে আমার একখানি বই উৎসর্গ করেছিলুম।

কাজী মোতাহার হোসেন

সেই ১৯৩৩ সালে আমি যখন ঢাকায় বদলি হই তখন একদিন ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে আলাপ হয়ে যায় কাজী মোতাহার হোসেনের সঙ্গে। তিনি ছিলেন 'শিখা' গোষ্ঠীর সদস্য। কিন্তু তার পরে আমাদের আলাপ আর এগোয়নি। কয়েকমাস পরে আমি আবার বদলি হয়ে যাই।

কাজী আবদুল ওদুদের সঙ্গে মাঝে মাঝে পত্রালাপ হত। তিনি কলকাতায় বদলি হয়ে আসেন।

অপরপক্ষে মোতাহার হোসেন সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে যায়। তাঁর কোনো লেখাও আমার চোখে পড়ে না। কিন্তু আমি জানতুম প্রবন্ধ লেখক হিসেবে তাঁরও একটা স্থান আছে। সেইজন্য ঢাকার ঐতিহাসিক একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখটির জন্য বর্ষপূর্তির সময় শান্তিনিকেতনে যে সাহিত্যমেলা অনুষ্ঠিত হয় তাতে যোগ দেওয়ার জন্য কাজী মোতাহার হোসেন সাহেবকে আমন্ত্রণ করি। তিনি যেন দেশভাগের পাঁচ বছরের মধ্যে পূর্ববঙ্গে প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রগতি সম্বন্ধে একটি ভাষণ দেন।

মজার ব্যাপার। নিমন্ত্রণপত্রের উত্তর আসে যাঁর কাছ থেকে তাঁর নাম মোতাহের

হোসেন চৌধুরী। তিনি কাজীও নন, মোতাহারও নন। আমার অজ্ঞাতসারে আমার অফিস থেকে ভুল ঠিকানায় চিঠি গিয়েছিল। চৌধুরী সাহেব মনে করলেন আমরা সত্যি সত্যি তাঁকেই চেয়েছি। তিনি সবিনয়ে জানালেন তিনি আসতে পারবেন না যেহেতু তিনি 'বর্বর' হয়ে গিয়েছেন। পাছে আমি ভুল বুঝি সেজন্য তিনি ব্যাখ্যা করেন 'বর্বর' মানে 'বরবর' অর্থাৎ তিনি দ্বিতীয়বার বর হয়েছেন।

যাই হোক, আমরা আবার চিঠি লিখি। সেটা ঠিক ঠিকানায় যায়। কাজী মোতাহার হোসেন সাহেব ঠিক সময়ে উপস্থিত হন ও ওপারের প্রবন্ধ বিষয়ে ভাষণ দেন। সকলে তাঁর ভাষণের প্রশংসা করেন। সাহিত্যমেলার কাজ শেষ হওয়ার পরে রাত্রিবেলা আমরা কফি পার্টির আয়োজন করি। সেটা হয় প্রাক্তনী বাড়ির ছাদে। সকলেরই তখন হালকা মেজাজ। দোলপূর্ণিমার রাত। চাঁদ উঠেছিল গগনে। সবাইকে চমৎকৃত করে মোতাহার হোসেন সাহেব একখানি রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে শোনান। পদার্থ বিজ্ঞানের নীরেট অধ্যাপকের কণ্ঠে সরস রবীন্দ্রসঙ্গীত কেউ প্রত্যাশা করেননি। বোঝা গেল তিনি একজন সঙ্গীত রসিক। বিশেষত রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুরাগী।

এর কিছুদিন পরে তাঁর কন্যা সন্‌জীদা খাতুন আসে শান্তিনিকেতনে অধ্যয়ন করতে। তার গবেষণার বিষয় ছিল সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা। তাকে দেখতে একবার তার মা বেগম সাহেবা শান্তিনিকেতনে আসেন ও আমাদের গৃহ-অতিথি হন। তখন আমি জানতুম না তিনি পশ্চিমবঙ্গের একটি উর্দুভাষী পরিবারের কন্যা। তাঁর কথাবার্তায় সেটা মালুম হত না।

আশ্চর্যের ব্যাপার, সন্‌জীদা ফিরে গিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। তার নাম ছায়ানট। সে সময় ঢাকায় রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন চলছিল। তিনি নাকি হিন্দু কবি, মুসলমানের জন্য কিছুই লেখেননি, তাঁর গান ইসলামি গান নয়। সন্‌জীদা কিন্তু অবিচলভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চা করে ও শিক্ষা দেয়। একদল রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিল্পী তার হাতে গড়া। এর মূলে নিশ্চয়ই তার পিতার উৎসাহ ও প্রেরণা ছিল। কারণ তিনি স্বয়ং রবীন্দ্রসঙ্গীত-শিল্পী। সেই সঙ্গে একজন স্বধর্মনিষ্ঠ মুসলমান।

গোড়ায় তিনি ছিলেন পদার্থবিজ্ঞানের ডেমনস্ট্রেটার। পরে লেকচারার। ঢাকা থেকে কলকাতায় এসে অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট-এ সংখ্যাতত্ত্ব শিক্ষা করেন ও ফিরে গিয়ে সেই বিদ্যার অধ্যাপনা করেন। তার উপর তিনি ছিলেন দাবা খেলায় ওস্তাদ। পরে একসময় শুনলুম একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় করাচিতে দাবা খেলতে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়ে পুরো নয় মাস আটকা পড়েছিলেন।

রবীন্দ্রশতবার্ষিকীর সময় বিশ্বভারতীর তরফ থেকে যাঁদের আমন্ত্রণ করা হয় তাঁদের মধ্যে ছিলেন কাজী মোতাহার হোসেন। ইতিমধ্যে চিঠিপত্র পাঠানো নিয়ে কড়াকড়ি কায়েম হয়েছিল। বিশ্বভারতীর চিঠি গেল পশ্চিমবঙ্গ সরকারে, সেখান থেকে ভারত সরকারে, সেখান থেকে পূর্ব পাকিস্তান সরকারে। চিঠিখানা কাজী সাহেব পেলেন খোলা অবস্থায়, প্লেন ধরার ঠিক একদিন আগে। তাঁর বা বক্তব্য ছিল তা তিনি লিখলেন শান্তিনিকেতনে পৌঁছে। আমার সঙ্গে যখন দেখা হল তখন বললেন যে তিনি ভেবেচিন্তে লিখবার সময় পাননি। যাই হোক, তিনি যে আসতে পেরেছিলেন সেটাই যথেষ্ট। অনেকদিন বাদে তাঁকে দেখে আমরা খুব খুশি হই। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিবিড় হয়েছিল তাঁর কন্যা

সন্‌জীদার জন্য। সন্‌জীদা সেখানে ছিল বেশ কয়েক বছর।

মুক্তিযুদ্ধের পরে আমি তিনবার নিমন্ত্রিত হয়ে বাংলাদেশে যাই। দ্বিতীয়বার চুয়াত্তর সালে একটি সভায় তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। তিনি আসন থেকে উঠে এসে আমায় জড়িয়ে ধরেন।

শেষেরবার ঢাকায় গিয়ে দেখি ইমারজেন্সি জারি হয়ে গেছে। সহজে কারও দেখা পাওয়া যায় না। বাড়ি গিয়ে দেখা করাও সুবিধের নয়। আমিও চেষ্টা করিনি। তিনিও চেষ্টা করেননি। কাজেই দেখা হয়নি। বছর কয়েক পরে খবর পেলুম যে তিনি নেই।

কোনও একটি পত্রিকায় কাজী সাহেব সম্বন্ধে পড়লুম যে তিনি নাকি মৃত্যুর আগে বলেছিলেন, জন্মদিন যেমন আনন্দের দিন মৃত্যুদিনও তেমনই আনন্দের দিন। সুতরাং শোক করা উচিত নয়। তিনি শান্তভাবেই বিদায় নিলেন।

ঢাকা বাংলা একাডেমি থেকে তাঁর প্রবন্ধ সংগ্রহ তিনখণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলি আমি উপহার স্বরূপ পাই বছর তিনেক আগে। বিবিধ বিষয়ে তিনি চিন্তা করেছিলেন। দুঃখের বিষয় এই বয়সে দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতায় সেগুলি আমার পাঠ করা সম্ভব হয়নি। বরাবরই তিনি একজন উদারমনা মুসলমান ও সেইসঙ্গে দেশপ্রাণ বাঙালি এবং সকলের উপর একজন সৎ মানুষ।

সৈয়দ মুজতবা আলী

সালটা ১৯২৪, মাসটা জানুয়ারি। আমি তখন পাটনা কলেজের ছাত্র। শ্রীপঞ্চমীর ছুটিতে আমি চলে যাই শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য। বিষয়টা—আর্ট কি মানুষের দৈনন্দিন খোরাক হতে পারে? শান্তিনিকেতনে আমাকে স্থান দেওয়া হয় পুরাতন গেস্ট হাউসে। সেটা ছিল শান্তিনিকেতনের আদি ভবন। তার নামই ছিল শান্তিনিকেতন। মহর্ষির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। আমি যখন যাই তখন গেস্ট হাউসের ম্যানেজার ছিলেন গাঙ্গুলিমশাই। ওঁর পুরো নামটা আমার মনে পড়ছে না। তিনি আমাকে গছিয়ে দেন তাঁর সহকারী সৈয়দ মুজতবা আলীর হাতে। আলী তখন বিশ্বভারতীর একজন প্রথম যুগের ছাত্র। আমারই সমবয়সী।

তিনি আমাকে যত্ন করে শান্তিনিকেতন ঘুরিয়ে দেখান। যেখানেই যান সেখানেই দেখি তিনি জনপ্রিয়। বিশেষ করে পাঠভবনের বালক ছাত্রদের মধ্যে। ওঁকে দেখলেই বালকরা ছুটে আসে। তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল কানাই। পরবর্তী জীবনে কানাইলাল সরকার। আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকের আত্মীয়।

আলী আমাকে নিয়ে যান কুয়োর জলে স্নান করাতে। নিজেও স্নান করেন। গৌরবর্ণ সুপুরুষ। মাথায় একরাশ চুল। বোধহয় বাবরি। তারপর নিয়ে যান রান্নাঘরে। সেখানে আর সকলের মতো আমরাও পাত পেড়ে খাই। আহারের শেষে পাতা দুটি হাতে করে নিয়ে গিয়ে বাইরে এক জায়গায় ফেলি। চাকরের পাট নেই। ছাত্ররা সবাই স্বনির্ভর। তবে রান্নার লোক ছিল।

আলীর সঙ্গে আমার সাহিত্য বিষয়ে আলাপ হয়নি। তিনি কোন্ বিষয়ের ছাত্র তাও জানতুম না। কথাবার্তা যা হয়েছিল তা আশ্রমের জীবন সম্বন্ধে। তিনি থাকতেন গেস্ট হাউসের নীচের তলায় ছোট একটা কামরায়। অন্যান্য আশ্রমিকদের সঙ্গে নয়।

শান্তিনিকেতনে পরের বছর যখন যাই তখন অন্যত্র উঠি। সঙ্গে পাটনা কলেজের দলবল। সেবার আলীর দেখা পাইনে। সেই প্রথমবারের দেখাই শেষ দেখা। তাঁর ও আমার প্রথম যৌবনে। তবে তাঁর সম্বন্ধে বরাবরই আমার কৌতূহল থেকে যায়। শান্তিনিকেতনে ওঁর মতো দ্বিতীয় ব্যক্তি আমি দেখিনি। তাঁকে মুসলমান বলেই মনে হত না। অশনেও নয়, বসনেও নয়, ভাষণেও নয়। নামটাই যা আরবি। আসলে তিনি একজন খাঁটি বাঙালি।

এর চৌদ্দ বছর বাদে ১৯৩৮ সালের শেষের দিকে তাঁর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যায় বরোদায়। সেখানে তিনি মহারাজার কলেজের অধ্যাপক। তাঁর বিষয় তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব। বরোদায় আমি পর্যটক হিসেবে। আস্তানা মহারাজের গেস্ট হাউসে। সেখানে আমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছিলেন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী সত্যব্রত মুখার্জি।

একদা সত্যব্রত মুখার্জি রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন। তখন তিনি কেমব্রিজের ছাত্র। আই. সি. এস. হতে না পারলেও যথেষ্টই যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। মহারাজা সওয়াজি রাও গায়কোয়াড় তাঁকে ডেকে এনে বরোদায় চাকরি দিয়েছিলেন। তাঁর প্রথম বিবাহ সুখের হয়নি। বিবাহ বিচ্ছেদের পরে তিনি বিখ্যাত অসমীয়া কবি লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া ও ঠাকুর পরিবারের বিখ্যাত লেখিকা প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর কন্যা অরুণাকে বিবাহ করেন। আমি সপরিবারে তাঁদের ওখানে ডিনার খেতে যাই। তিনি তাঁর জীবনের কাহিনী শোনান।

সেদিন অন্যতম অতিথি ছিলেন সৈয়দ মুজতবা আলীও। ততদিনে তাঁরও বয়স হয়েছে। আমারও বয়স হয়েছে। আমরা গল্পসল্প করি। আড্ডা দিই। আলী একজন রসিক পুরুষ। সেই বয়সেও অকৃতদার। তাঁর মতো একজন আড্ডাবাজ পুরুষ কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। খুবই হাসিখুশি। বেপরোয়া। বোধহয় বোহেমিয়ান।

তখনও টের পাওয়া যায়নি যে তিনি একজন সাহিত্যরসিক বা সাহিত্যিক।

অনেকদিন বাদে, যতদূর মনে পড়ে, তাঁকে আবিষ্কার করি লেখকরূপে, 'দেশ' পত্রিকায়, ১৯৪৫ কি ৪৬ সালে। তখনও তিনি বিখ্যাত হননি। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে 'দেশেবিদেশে' ভ্রমণ কাহিনী লিখে সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। এতদিন তিনি তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভাকে লুকিয়ে রেখেছিলেন কেমন করে তা জানিনে। কিন্তু তাঁর রচনা একজন জাতশিল্পীর।

ইতিমধ্যে বরোদার মহারাজার মৃত্যু হয়েছিল। ফলে আলী সাহেবের চাকরিটি গিয়েছিল। শুনতে পাই তাঁর ভক্ত কানাইলাল সরকার তাঁকে 'দেশ' পত্রিকায় লেখার কাজ জুটিয়ে দেন। কিন্তু চাকরি নয়। পার্টিশনের পরে নতুন ভারত সরকার তাঁকে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেসন্স-এর সেক্রেটারি পদে নিয়োগ করে। আলী ভারতীয় নাগরিক হয়ে যান।

ইতিমধ্যে তিনি বিবাহও করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী রাবেয়া বেগম কিন্তু পাকিস্তানের নাগরিক রূপে পূর্ববঙ্গে স্কুল ইন্সপেকট্রেস হিসেবে বসবাস করেন। স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে থাকতে পারেন না। দুটি ছেলে হয়েছিল। তারা বাপের কাছে থাকতে পারে না। এই যখন অবস্থা

তখন ১৯৫১ সালে একদিন আমার শান্তিনিকেতনের বাসায় আলী সাহেব এসে হাজির।

আমি ইতিমধ্যে চাকরি থেকে অকালে অবসর নিয়ে শান্তিনিকেতনে আশ্রমিক হয়েছিলুম। বিশ্বভারতী যখন কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হয় তখন আমি হই তার কর্মসমিতির মনোনীত সদস্য। চাকরি-বাকরির নতুন করে বিন্যাস হচ্ছিল।

আলী সাহেব বলেন, তিনি দিল্লির চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন, শান্তিনিকেতনে থাকতে চান। তাঁকে যদি বিশ্বভারতীতে চাকরি দেওয়া হয় তবে তিনি ফরাসি ও জার্মান ভাষা দুটোই পড়াবেন। রিডারের পোস্ট খালি ছিল। কর্তৃপক্ষ নাকি রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু আলী সাহেব ধরে বসলেন, তাঁর স্ত্রীকেও রিডার পদ দিতে হবে। তাহলে তাঁরা দু'জনে মিলে একসঙ্গে বাস করতে পারবেন। কর্তৃপক্ষ তাতে নারাজ।

আলী আবার দিল্লি ফিরে যান। সেখানে তাঁর নতুন চাকরি জুটে যায়। তিনি হন আকাশবাণীর একজন ডাইরেক্টর। প্রথমে নিযুক্ত হন পাটনায়। তারপর কটকে। তারপর তাঁকে অল ইন্ডিয়া রেডিওর মুখপত্রের এডিটর করা হয়। কিন্তু কী জানি কেন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর বনিবনা হয় না। আলী সাহেব ছুটি নিয়ে শান্তিনিকেতনে আসেন। ছুটির পর ফিরে যান না। আবার বেকার।

'দেশেবিদেশে'র পর তিনি আরও অনেক বই লেখেন। সেগুলির মধ্যে প্রধান হচ্ছে 'চাচাকাহিনী' ও 'পঞ্চতন্ত্র'। লেখার আয় থেকে কোনরকমে সংসার চালান।

কিছুকাল পরে বিশ্বভারতীর নিজাম অধ্যাপক পদ খালি হয়। বিষয়টা ইসলামিক স্টাডিজ। অন্য কোনও প্রার্থী না থাকায় আলী সাহেবকেই নিয়োগ করা হয়। তিনি সেই পদে পাঁচ বছর ছিলেন। মেয়াদ ফুরিয়ে যাবার পরে আশা করেছিলেন তাঁকে আবার নিয়োগ করা হবে। দুঃখের বিষয় কর্তৃপক্ষ তা করেন না। ফলে আলী সাহেব আবার বেকার।

তাঁর এক ভক্ত তাঁকে বোলপুরে একটি বাসা ঠিক করে দেন। তাঁর প্রিয় শান্তিনিকেতন থেকে তিনি নির্বাসিত হন। বোলপুরেও তিনি তিষ্ঠোতে পারেন না। কাজ নেই, কর্ম নেই, গুণিজনের সঙ্গ নেই। লেখালেখির কাজও তেমন হচ্ছিল না। তাঁর বোলপুরে যাওয়ার পরে আমার সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হয়েছিল।

বোলপুর থেকে কোনও একসময় তিনি কলকাতায় চলে আসেন। সেখানে তাঁর নিজের একটা আস্তানা ছিল। নীচের তলার ঘরে তিনি থাকতেন, ওপরতলায় তাঁর বন্ধু আবু সয়ীদ আইয়ুব। বোলপুর থেকে কলকাতায় যাবার পর বড় একটা বেরোতেন না। শুনতে পাই অনবরত সুরা পান করতেন। প্রকাশক বা সম্পাদকদের সঙ্গে আগের মতো সম্পর্ক ছিল না। বলা যেতে পারে তিনি ছিলেন স্বেচ্ছানির্বাসিত। একদিন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন তাঁকে ধরে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ঢাকায় তাঁর স্ত্রীর কাছে। কিছুদিন পরে সেখানেই তাঁর জীবনাবসান হয়।

কিন্তু তাঁর যত কিছু সাহিত্যকীর্তি সমস্তই পশ্চিমবঙ্গে বা কলকাতায়। পাকিস্তান তাঁকে গ্রহণ করেনি, তিনিও পাকিস্তানকে গ্রহণ করেননি, নজরুলের মতো তিনিও ভাগ হয়ে যাননি। তিনি একজন অবিভক্ত বাঙালি। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর রচনাবলি কলকাতায় খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এখনও তাঁর যথেষ্ট চাহিদা। বাঙালি পাঠক সমাজ তাঁকে ভোলেনি। তাঁর 'দেশেবিদেশে' এখনও বেস্টসেলার।

আবু সয়ীদ আইয়ুব

আবু সয়ীদ আইয়ুবের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা কৃষ্ণনগরে ১৯৩৪ সালে। তিনি ছিলেন সেখানকার কলেজের তরুণ লেকচারার। আমি সেখানকার জেলা জজ। তিনি একদিন আমার বাসায় এসে পরিচয় দেন ও আলাপ করেন। আর বললেন, এটাই তাঁর প্রথম চাকরি, কিন্তু এখানে তাঁর ভাল লাগছে না। কৃষ্ণনগরে আমি অল্প কয়েক মাস ছিলুম। তিনিও বেশীদিন থাকেননি। একসময় চাকরি ছেড়ে দেন ও কলকাতায় ফিরে যান।

কয়েকবছর পরে তিনি ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মিলে আধুনিক বাংলা কবিতার একটি সঞ্চয়ন প্রকাশ করেন। তাতে আমার একটি কবিতাও ছিল। আমিও একটি কপি পাই।

সেই পরিচয়ের অনেকদিন পরে, ১৯৫১ সালে আমি যখন অকালে অবসর নিয়ে শান্তিনিকেতনে বাস করছি তখন, বিশ্বভারতীতে দর্শনের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হয়ে আসেন আবু সয়ীদ আইয়ুব। আমার পুত্র পুণ্যশ্লোক ছিল দর্শনের ছাত্র। সেই সূত্রে আইয়ুব সাহেবের সঙ্গে আমার আবার আলাপ।

যতদূর মনে পড়ে তিনি একাই একটি একতলা বাড়িতে বাস করতেন। ছাত্রছাত্রীরা গিয়ে তাঁর খোঁজখবর নিতেন। পুণ্যর সহপাঠিনী গৌরী দত্ত ছিল তাঁর ছাত্রী। গৌরীর পিতা দর্শনের অধ্যাপক ড. ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত অবসর নিয়ে তখন শান্তিনিকেতনে বাস করতেন।

কিছুদিন পরে আইয়ুব সাহেব অসুস্থ হয়ে পড়েন। গৌরী গিয়ে তাঁর সেবাযত্ন করে। তাঁর টিবি হয়েছিল। চিকিৎসার জন্য তাঁকে কলকাতায় ফিরে যেতে হয়। বিশ্বভারতীর অধ্যাপক পদ তাঁকে ছেড়ে দিতে হয়।

কলকাতায় ভাল হবার পরে আইয়ুব সাহেব কোয়েস্ট' (Quest) নামক একটি দ্বিমাসিক পত্রের সম্পাদক হন। পত্রিকাটি পরে ত্রৈমাসিক হয়। এটা তাঁর নতুন ভূমিকা। অপর সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক অম্লান দত্ত। পত্রিকাটি বেশ নাম করেছিল। দেশবিদেশের অনেক বিখ্যাত লেখক তাতে লিখতেন। আমিও দু-একবার লিখেছিলুম।

শান্তিনিকেতন থেকে বি. এ. অনার্স পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে পুণ্যশ্লোক। সে জার্মানিতে চলে যায় ও ট্যুবিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট পায়। গৌরী এক বছর বিনয় ভবনে পড়ে কলকাতায় চলে যায় দর্শনে এম. এ. পড়তে। তখন শান্তিনিকেতনে দর্শনে এম. এ. ছিল না।

কিছুকাল পরে শুনলুম যে আইয়ুবের সঙ্গে গৌরীর বিয়ে হয়ে গেছে। গৌরীর বাবা মর্মাহত হন। গৌরীকে তিনি প্রাণাধিক ভালবাসতেন। অথচ তাকেই তিনি ত্যাজ্যকন্যা করলেন। আইয়ুবের গুরুজন কী ভাবলেন জানিনে। নতুন সিভিল ম্যারেজের আইন অনুসারে বর কিংবা কনে কাউকে তার ধর্মমত ঘোষণা করতে হত না। আগেকার দিনে বলতে হত, আমি হিন্দু নই, মুসলমান নই, খ্রিস্টান নই, শিখ নই ইত্যাদি। এইভাবে নিজের ধর্ম অস্বীকার করা বিবেকবিরুদ্ধ হওয়ায় অনেকে বিয়েই করতেন না। আইয়ুব বা গৌরী কেউ কারও ধর্ম অস্বীকার করেনি। কেউ কাউকে ধর্মান্তরিত করেনি।

তাদের যখন একটি পুত্রসন্তান হয় তখন আইয়ুব তার নাম রাখেন পুষন্। ওইটি একটি বৈদিক শব্দ। ওর অর্থ সূর্য। পিতা মুসলমান, সুতরাং পুত্রের সুন্নত হবার কথা। কিন্তু গৌরীর তাতে আপত্তি ছিল। আইয়ুবও তার পক্ষপাতী ছিলেন না। মুসলমান হলেও তিনি ছিলেন একজন নন-কনফোর্মিষ্ট (non-conformist).

আমি যতদূর জানতুম, দার্শনিক হিসেবেও আইয়ুব একজন অজ্ঞেয়বাদী বা নাস্তিক। সাধারণত ইউরোপীয় দার্শনিকরা যা হয়ে থাকেন। তাঁদের পরিচয় তাঁরা হিউম্যানিস্ট। আইয়ুব সাহেবকেও আমরা একজন হিউম্যানিস্ট বলতে পারি। ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টানদের হিউম্যানিস্ট বলা হয় না। শব্দটির বাচ্যার্থ যা-ই হোক না কেন, ভাবার্থ হচ্ছে ঈশ্বরের চাইতে মানুষে যার বিশ্বাস বেশি তিনিই মানবিকবাদী। এই অর্থে আইয়ুব সাহেবকেও একজন মানবিকবাদী বলতে পারা যায়।

পুণ্যশ্লোক জার্মানি থেকে ফিরে এসে শান্তিনিকেতনে উচ্চতর গবেষণা করে। পরে চলে যায় কটকে উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের লেকচারার হয়ে। সেও 'কোয়েস্ট'-এর অন্যতম লেখক হয়। আইয়ুবের সঙ্গে তার সম্পর্ক এবার সম্পাদকের ও লেখকের। আইয়ুবও তার লেখার প্রশংসা করেন। সেই সূত্রে সে পেয়ে যায় রকিফেলার ফাউন্ডেশনের (Rockefeller Foundation) ফেলোশিপ। আমেরিকায় গিয়ে ভাষাতত্ত্ব নিয়ে কাজ করে।

একদিন জানাজানি হয়ে গেল 'কোয়েস্ট' ছিল সি আই এ অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সির অর্থ সাহায্যে পরিচালিত। ফলে পত্রিকাটির মর্যাদাহানি হয়। সম্পাদকদ্বয়েরও। আমি গৌরীকে পরামর্শ দিয়েছিলম, আইয়ুবকে বলতে যে তাঁর পদত্যাগ করা উচিত। গৌরী বলে, তাহলে সংসার চলবে কী করে? কিন্তু শেষ পর্যন্ত সম্পাদকদ্বয় 'কোয়েস্ট'-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। 'কোয়েস্ট' বন্ধ হয়ে যায়। আইয়ুব আবার বেকার।

পুণ্যর কাছে শুনেছিলুম শান্তিনিকেতনে তাকে নাকি আইয়ুব বলেছিলেন, 'আমার কিছু পৈতৃক পুঁজি আছে। সেটা যেদিন ফুরিয়ে যাবে সেদিন আত্মহত্যা করব।' সুতরাং 'কোয়েস্ট' উঠে যাবার পর আমার আশঙ্কা ছিল যে আইয়ুব হয়তো আত্মহত্যা করবেন। তাঁর শরীরের যা অবস্থা তাতে অন্য কোনো চাকরি পেলেও রাখতে পারতেন না। ভাগ্যক্রমে গৌরীর একটি চাকরি ছিল।

আমি যতদূর জানি আইয়ুব পিতৃকুল থেকে কোনরকম সাহায্য পাননি। গৌরীর গুরুজনদের মতো আইয়ুবের গুরুজনরাও তাঁকে ত্যাগ করেছিলেন। সেটাই সবচেয়ে মর্মান্তিক। আমি যতদূর জানি আইয়ুব ছিলেন সচ্ছল পরিবারে সন্তান। কিন্তু বিবাহের পরে গৌরীকে নিয়ে একাই সংসার পাতেন।

এর পরে আইয়ুব আত্মপ্রকাশ করলেন বাংলা সাহিত্যের প্রবন্ধকার রূপে। তাঁর 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' বইখানি রবীন্দ্র পুরস্কার পায়। পুরস্কার কমিটিতে আমি প্রস্তাব কবি, তারাশঙ্কর সমর্থন করেন। অন্যান্য সদস্যরা সম্মত হন। পরে রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে আরও কয়েকখানা বই লেখেন। 'পথের শেষ কোথায়', 'পান্থজনের সখা' ইত্যাদি। আইয়ুবের বাংলা ভাষার উপর দখল যে কোনও শিক্ষিত বাঙালি হিন্দুর মতো। অথচ তিনি জন্মসূত্রে উর্দুভাষী। শুনেছি তিনি 'গীতাঞ্জলি' পড়ে বাংলা শেখেন ও তারপরে সংস্কৃত শেখেন। আরও শুনেছি, তিনি গোড়ায় ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র—ফিজিক্সে অনার্স

পেয়েছিলেন। পরে ফিজিক্স ছেড়ে ফিলজফি পড়েন। এম. এ.-তে ফার্স্ট ক্লাস পান। বলতে ভুলে গেছি, মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি বিভাগে যোগ দিতে তিনি একবার অস্ট্রেলিয়ায় গিয়েছিলেন। যতদূর জানি, তিনিই এই বিভাগের প্রথম অধ্যাপক। কিন্তু শারীরিক কারণে সেখানেও থাকতে পারেন না।

আইয়ুবের স্বাস্থ্যই শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়। ১৯৮২ সালে একদিন খবর পেয়ে আমি ছুটে যাই পার্ল রোডের ফ্ল্যাটে। দেখি, ফ্ল্যাট ভরে গেছে বন্ধুবান্ধবদের সমাগমে। সকলের ভাবনা—এর পরে কী হবে! কোন্‌মতে অন্ত্যেষ্টি! কবর না ক্রিমেশন! গৌরী সিদ্ধান্ত দেয়, আইয়ুব যখন কোনও নির্দেশ দিয়ে যাননি তখন ধরে নিতে হবে, অন্ত্যেষ্টি প্রথাগতভাবেই হবে। অর্থাৎ মুসলিম মতে। আমার আশঙ্কা ছিল, মৌলবীরা হয়তো প্রত্যাখ্যান করবেন। কিন্তু সেটা তাঁরা করেননি। আইয়ুবের শেষকৃত্য ইসলামি শরিয়ত মতে সম্পন্ন হয়।

আইয়ুব বলতেন, আমি মরে গেলেও পাকিস্তানে যাব না। তিনি কথা রাখেন। মরে গেলেন, কিন্তু পাকিস্তানে গেলেন না। গেলেও সেখানে টিকতে পারতেন না। মুক্তিযুদ্ধের সময় উর্দুভাষী বাঙালিদের বাংলাভাষী বাঙালিরা বিশ্বাস করতেন না। অথচ তিনি ছিলেন মনেপ্রাণে বাঙালি। পরম রবীন্দ্রভক্ত। তাঁর রবীন্দ্র বিষয়ক গ্রন্থগুলি তাঁকে চিরদিন জীবিত রাখবে।

অমিয় চক্রবর্তী

'পারিবারিক নারী-সমস্যা' নামে আমার একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় 'ভারতী' পত্রিকায়। ১৯২২ সালে। আমি তখন কটক কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। তাতে আমি বলেছিলুম, বিবাহ করতে হলে বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য পথঘাট খোলা রাখতে হয়, কারণ বিবাহ সবক্ষেত্রে সফল হয় না। বিবাহ-বিচ্ছেদ এক ঝামেলার বিষয়। অতএব বিবাহ না করলেই ভাল। তার পরিবর্তে 'লিভিং টুগেদার' শ্রেয়। 'ভারতী'র পরবর্তী সংখ্যায় এর বিরূপ সমালোচনা করেন 'বঙ্গনারী' ছদ্মনামে অনিন্দিতা দেবী। তাঁকে আমি চিনতুম, তিনি আমাকে চিনতেন না। কলেজের ছুটিতে পুরী গেলে প্রত্যেকদিন বিকেলবেলা সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যাওয়া ছিল আমার নিয়ম। দেখতুম এক প্রৌঢ় বাঙালি মহিলা হনহন করে হেঁটে চলে যাচ্ছেন আমার সামনে। মোড় ঘুরতেই আমার সঙ্গে মুখোমুখি। তখনকার দিনের মেয়েদের পক্ষে তিনি খুবই আধুনিক ও নবীন নারী। পোশাক-পরিচ্ছদ হাল ফ্যাশনের। মাথায় ঘোমটা নেই। সমুদ্রের ধারে অগণিত পুরুষ। নারী আর ক'জন? মেয়েরা যদি বা কেউ যান তবে তাঁদের সঙ্গে পুরুষ মানুষ থাকেন। ইনি কিন্তু সম্পূর্ণ একা। থাকতেন তিনি সমুদ্রের ধারে একটি বাড়িতে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য—সঙ্গে চাকরবাকর। আসল বাড়ি বাংলাদেশে। সেই সময় আমি জানতুম না যে এঁর জ্যেষ্ঠপুত্র অমিয় চক্রবর্তী। আর অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে যখন প্রথম পরিচয় তখন জানতুম না যে ইনি তাঁর মা। পরে একথা শুনি আমার সেজো কাকিমার মুখে। কাকিমা তাঁকে চিনতেন। সেজো কাকা ছিলেন পুরীর ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার।

কটক থেকে আমি যখন পাটনায় যাই বি. এ. পড়তে তখন সহপাঠীদের মুখে শুনি অমিয় চক্রবর্তী বলে একজন ছাত্র হাজারিবাগ কলেজ থেকে বি এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে অনার্স পেয়েছেন। কিন্তু ইনি ইংরেজি পড়বার জন্য পাটনা আসেননি। তিনি নাকি নানা দেশের মনীষীদের সঙ্গে পত্রালাপ করতেন।

অমিয় চক্রবর্তী সম্বন্ধে আমি কৌতূহলী হলুম। তাঁর নামটি আমার অচেনা ছিল না। মাঝে মাঝে মাসিকপত্রে দেখতুম তাঁর কবিতা। কতকটা মরমী ধারার। অবশেষে জানা গেল, তিনি গেছেন শান্তিনিকেতনে। তবে পড়াশুনোর জন্য নয়, রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যের জন্য। পরে জানা গেল, তিনি হয়েছিলেন গুরুদেবের অন্যতম সেক্রেটারি।

পাটনা কলেজে এম. এ. পড়তে পড়তে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের শিক্ষানবিশি করতে আমি ১৯২৭ সালে বিলেত যাই। বছর দুয়েক বাদে যখন ফিরি তখন একদিন গুরুদেবকে দর্শন করতে শান্তিনিকেতনে যাই। সেই সময় অমিয়বাবুকে প্রথম দেখি। ইতিমধ্যে তিনি আমার লেখা পড়েছিলেন। কিন্তু জানতেন না যে আমি তাঁর মাকে চিনতুম। আমিও সেকথা উল্লেখ করিনি।

শুনলুম ইতিমধ্যে অমিয়বাবু শান্তিনিকেতনে এক বিদেশিনী মহিলাকে বিবাহ করেছেন, যাঁর নাম রবীন্দ্রনাথ রেখেছেন হৈমন্তী। শুনেছিলুম হৈমন্তী এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁর পুত্র ও পুত্রবধূর সঙ্গে ইউরোপ থেকে। বোধহয় কবির পালিতা নাতনি নন্দিনীর গৃহশিক্ষিকা রূপে। বিবাহের পর শান্তিনিকেতনেই থেকে যান। শুনেছিলুম বিবাহসভায় বরকর্তা ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও কনেকর্তা এন্ডরুজ সাহেব। বলাবাহুল্য অমিয় চক্রবর্তীর গুরুজন এ বিবাহ সমর্থন করেননি। অমিয় চক্রবর্তীও কোনও দিন আমাকে তাঁর গুরুজনদের কথা বলেননি, যদিও আমাদের পরিচয় পরিণত হয়েছিল আজীবন বন্ধুতায়।

অমিয়বাবুকে যখন প্রথম দেখি তখন তিনি একাই থাকতেন। তখন হৈমন্তী দেবীকে দেখিনি। শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে আসার পরে অমিয়বাবুর কাছ থেকে চিঠি পাই। সেটা গুরুদেবের তরফে লেখা। হাতের লেখাটাও গুরুদেবের মতো। বোধহয় তিনিও শিক্ষানবিশি করছিলেন রবীন্দ্রোত্তর কবি হবার জন্য।

এরপর তিনিও বিলেত যান। সেটা কোয়েকারদের আনুকূল্যে। বছরখানেক পরে ফিরে আসেন। বলতে ভুলে গেছি যে তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাইভেট এম. এ. পরীক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু ফার্স্ট ক্লাস পাননি। মনে বোধহয় আফশোস ছিল। তাই কিছুদিন পরে তিনি আবার বিলেত যান। অক্সফোর্ডের বেলিয়োল (Balliol) কলেজের ছাত্র হন ও ডক্টরেট নিয়ে দেশে ফেরেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল টমাস হার্ডির 'দ্য ডাইনাস্টস' নামক কাব্যনাট্য। তিনি আধুনিক ইংরেজ কবিদের সম্বন্ধেও একখানি বই লেখেন ও সেটি আমাকে পাঠিয়ে দেন। শান্তিনিকেতনে তাঁর উপযুক্ত পদ ছিল না। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার পদের জন্য প্রার্থী হন। ব্যর্থ হয়ে লাহোরে যান ও সেখানকার একটি কলেজে অধ্যাপনা করেন।

অক্সফোর্ড থেকে যখন রবীন্দ্রনাথকে ডি লিট উপাধি দেওয়া হয় তখন সেই উপাধি প্রদানের জন্য ভারতের ফেডারেল কোর্টের চিফ জাস্টিস শান্তিনিকেতনে স্বয়ং উপস্থিত হন। সেই সময় অক্সফোর্ড ফেরতা অমিয় চক্রবর্তী তাঁর সাহচর্য করেন ও তাঁর কাছে সমাদর পান। এবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অমিয় চক্রবর্তীকে সাগ্রহে গ্রহণ করে। তিনি সস্ত্রীক

কলকাতায় বাস করেন। সঙ্গে তাঁদের কন্যা সেবন্তী। তার মানে সেঁউতি ফুল। নামকরণ গুরুদেবের।

কিছুদিন পরে অমিয়বাবু আমাকে তাঁর লেখা দুখানি কবিতার বই উপহার দেন। নাম 'খশড়া' ও 'একমুঠো'। লক্ষ করলুম যে তিনি তাঁর সেই মরমী ধারা সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠেছেন, এমনকী রবীন্দ্রনাথের প্রভাবও। তাঁর ভাব, ভাষা আঙ্গিক—সমস্তই অত্যাধুনিক। বই দুটির থেকে খানিকটা খানিকটা আমার মনে আছে। যেমন—

'মেলাবেন তিনি ঝোড়ো হাওয়া আর
পোড়ো বাড়িটার
ঐ ভাঙা দরজাটা।
মেলাবেন।'

কিংবা

'তালিকা প্রস্তুত :
কী কী কেড়ে নিতে পারবে না
হই না নির্বাসিত কেরানি।'

অথবা

'বুকে প্রাণটা এমনিই রইল, জানো ভাই
ঘরে দাঁড়িয়ে মন বললে শুধু, যাই
—যাই।
সেদিন রাত্রে যখন আমার কুমু বোনকে
হারাই।'

আবার

'সোনা বানাই। সাঁকোর বাঁ পাশে গয়না
কাচের বাক্সে, জানলায় দ্রষ্টব্য; জানলার
উপরে ময়না' ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের পরে অমিয়বাবু মহাত্মা গান্ধীর আরও কাছে আসেন। গান্ধীজীর নিধনের কিছুদিন আগে অমিয়বাবু তাঁকে একটি চিঠি লেখেন। উত্তরে তিনি অমিয়বাবুকে 'অমিয়' বলেই সম্বোধন করেছিলেন, যা লিখেছিলেন তার সারমর্ম : তিনি মহাসমুদ্রের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন, তাতেই তাঁর জীবনের স্রোত মিশে যাবে। সেই চিঠিখানি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

সেই মর্মান্তিক ঘটনার পরে অমিয়বাবু কলকাতার চাকরি থেকে ছুটি নিয়ে আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হন। নামটি বোধহয় ওয়াশিংটনের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। সেখান থেকে চলে যান বস্টনে। সেখানে তিনি দীর্ঘকাল থাকেন। তাঁর অধ্যাপনার বিষয় হয় তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, ইংরেজি সাহিত্য নয়। প্রত্যেক বছর আমেরিকার কৃতী অধ্যাপকদের তালিকা বেরোয়। তার মধ্যে একবার অমিয়বাবুর নামটি যুক্ত হয়।

অমিয়বাবু দু-তিন বছর অন্তর অন্তর একটা-না-একটা উপলক্ষে দেশে আসতেন। আমার সঙ্গে দেখা করতেন। আমি তাঁকে বলি, 'কলকাতার ছাত্ররা আপনাকে চায়। আপনি তাদের বঞ্চিত করছেন কেন? শান্তিনিকেতনেও আপনার কর্মক্ষেত্র পড়ে রয়েছে। হৈমন্তী

দেবী সেখানে তো নিজের উপার্জনের টাকায় একটি বাড়িও তৈরি করেছেন।' এর উত্তরে তিনি বলেন, 'আমি নানা দেশ ঘুরে বেড়াতে চাই। তার জন্য আমার টাকার দরকার। আমেরিকায় থাকলে নানা প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থানুকূল্য পাই। দেশে থাকলে এত অর্থ কোথায় পেতুম।'

অমিয়বাবু ছিলেন স্বভাবত বিশ্বপথিক। তাঁর শ্রদ্ধার পাত্ররা ছিলেন কেউ বা আফ্রিকায়, কেউ বা রাশিয়ায়, কেউ বা চীন দেশে। শোয়াইৎজারের সঙ্গে তাঁর আত্মার সম্পর্ক ছিল। পাস্তেরনাকের প্রতি সহমর্মিতা। এঁদের সঙ্গে দেখা করার জন্য তিনি বহু কষ্ট স্বীকার করেছিলেন। তাঁর বিশ্ব ভ্রমণের নিশানা পাওয়া যায় তাঁর বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে।

শেষের দিকে তিনি ছিলেন নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত বাইরের একটি কলেজে। একবার আমাকে বলেন, 'আমার অবসর নেবার বয়স হয়ে গেছে, অবসর আমি নিয়েওছি। কিন্তু ওঁরা আমাকে ছাড়বেন না। একখানি সুসজ্জিত ঘর আমাকে দিয়েছেন। আমি যতদিন ইচ্ছে, থাকতে পারি। খরচ লাগবে না।'

যতবার আসতেন, অমিয়বাবুকে খেতে বললে অতি সামান্যই খেতেন। সেটা পাখির আহার। এত কম খেয়ে কী করে বেঁচে থাকা যায় সেটাই আশ্চর্য। অবশেষে তিনি পড়লেন কঠিন অসুখে। তাঁকে জোর করে স্বদেশে নিয়ে আসা হল। তাঁর সেই প্রিয় আবাসে। শান্তিনিকেতনে। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই।

আয়ু শেষ হয়ে এসেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করি, 'আপনার কী মনে হয়? মৃত্যুর পরে কিছু আছে?' তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, কন্টিনিউটি আছে।' এটা একজন মরমী সাধকের কথা। ভেতরে ভেতরে তিনি ছিলেন তা-ই।

বুদ্ধদেব বসু

বুদ্ধদেব বসু ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শীর্ষস্থানীয় ছাত্র। একই কালে 'প্রগতি' নামক একটি বাংলা পত্রিকার সম্পাদক। ঢাকা থেকে তিনি কলকাতায় চলে আসেন ও রিপন কলেজে (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজে) ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। তাঁর কলকাতার বাসভবনের নাম রাখেন 'কবিতা ভবন'। বিবাহ করেন ঢাকার স্বনামধন্য গায়িকা প্রতিভা সোমকে।

বুদ্ধদেবের সঙ্গে আমার পরিচয় কবে ও কীভাবে হয় তা মনে পড়ে না। তবে তাঁর লেখার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় তাঁর 'বন্দীর বন্দনা' নামক কাব্যপাঠের সূত্রে। বইখানি আমাকে দিয়েছিলেন গোপালদাস মজুমদার। আমাদের উভয়ের প্রকাশক। 'বন্দীর বন্দনা' লিখেই বাংলাসাহিত্যে তিনি স্থায়ী আসন লাভ করেন। তাঁর প্রশংসা সকলের মুখে। পণ্ডিচেরি থেকে দিলীপকুমার আমাকে লেখেন, 'ছেলেটা গেঁজে যাবে না তো!' তার মানে আশাতীত সাফল্যে মাথা ঘুরে যাবে না তো! কিন্তু বুদ্ধদেবের বেলায় তেমন কিছু ঘটেনি। তিনি নিবিষ্ট চিত্তে লিখে যেতে থাকেন অনেকগুলি নভেল। সবগুলোই জোর করে লেখা— সংসার চালানোর জন্য। পরবর্তীকালে কয়েকটি স্মরণীয় উপন্যাস লিখেছেন। যেমন 'কালো

হাওয়া' আর 'তিথিডোর'। বইদুটি তিনিই আমাকে পাঠিয়েছিলেন। পড়ে তাঁকে আমার প্রশংসা জানিয়েছিলুম।

কবিতা ভবন থেকে 'কবিতা' নামে একটি পত্রিকা বেরোত। সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু ও সমর সেন। পরে শুধুমাত্র বুদ্ধদেব। সেই পত্রিকার বিশেষত্ব ছিল তার সম্পাদকীয় রচনা। অতি উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক প্রবন্ধ। তাঁর গদ্য শৈলীও ছিল চমৎকার। শুনেছি প্রমথ চৌধুরী মশায় নাকি বলেছিলেন, তাঁর লিখনশৈলীর উত্তরসূরি থাকবেন দু'জন—একজন বুদ্ধদেব বসু, অপরজন কে তা না-ই বা বললুম।

বুদ্ধদেব একবার 'বৈশাখী' বলে একটি বার্ষিকী পত্রিকা বের করেন। আমার লেখা চেয়েছিলেন। আমি দিয়েছিলুম। কবিতা ভবন থেকে প্রকাশ করেন 'এক পয়সায় একটি' নামে কবিতার বইয়ের সিরিজ। তার মানে ষোল পয়সায় ষোলটি কবিতা। তাঁর অনুরোধে কবিতা লিখতে গিয়ে আমার ছড়ার হাত খুলে যায়। বইটির নাম দিই 'উড়কি ধানের মুড়কি'। একটি পুরনো ছড়ার একাংশ। বইটি উৎসর্গ করি দিলীপকুমার রায়কে। এরপর বুদ্ধদেব একটি ছোটগল্পের সিরিজও প্রকাশ শুরু করেন। আমার কাছে ছোটগল্প চান। একটি ছোটগল্পে একটি পুস্তিকা সমাপ্ত। এই সিরিজে বেরোয় আমার 'দু কান কাটা' ও 'হাসনসখী' নামে দুটি গল্পের দুটি পুস্তিকা। গল্পদুটিও পরীক্ষামূলক। বুদ্ধদেববাবু আমাকে উৎসাহ দিয়েছিলেন। না হলে গল্পদুটি লেখাই হত না। তাঁর অনুরোধে আমি 'কবিতা'র জন্য আর্ট নিয়ে একগুচ্ছ প্রবন্ধ লিখি। পরে সেগুলি বই হয়ে 'আর্ট' নামে বেরোয়। আমি তাঁকেই 'আর্ট' বইখানি উৎসর্গ করি।

পার্টিশনের কিছুকাল পরে বুদ্ধদেববাবু চাকরি হারান। একদিন সজনীকান্ত দাস—যিনি বুদ্ধদেবকে সহ্য করতে পারতেন না ও 'শনিবারের চিঠি'তে সবসময় বিরূপ সমালোচনা করতেন—তিনিই আমাকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে লেখেন, বুদ্ধদেবকে বাঁচান, তিনি বিশ বছর ধরে 'কবিতা' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। সজনীবাবুর কাছে বুদ্ধদেববাবুর জন্য এরূপ উৎকণ্ঠা প্রত্যাশা করিনি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বুদ্ধদেবের জন্য একটি রিডার পদ যাতে পাওয়া যায় তাই বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ শশীভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়কে অনুরোধ করি। তিনি জানান যে সেটা অসম্ভব।

ভালই হল। যিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রিডার পদের অযোগ্য তিনিই হলেন কিনা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যের প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান। বুদ্ধদেব প্রভূত পরিশ্রম করে তুলনামূলক সাহিত্যকে একটি আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত করেন। ভারতে বোধহয় তুলনামূলক সাহিত্যের চর্চা প্রবর্তনে তিনিই পথিকৃৎ।

এরপর তাঁকে দেখা গেল অনুবাদক রূপে। আমাকে পাঠালেন 'মেঘদূতে'র বাংলা অনুবাদ। তাতে দেখলুম তিনি 'কামী' শব্দটির বাংলা করেছেন 'কামুক'। সেটি বোধহয় ছন্দ ঠিক রাখার জন্য। 'কামুক' বললে একটা 'কু' ধারণা জন্মায়। কিন্তু 'কামী' বললে, এই পরিপ্রেক্ষিতে, বোঝায় 'প্রেমী'। 'মেঘদূতে'র যক্ষ ছিল কান্তার বিরহে ম্রিয়মান প্রেমিক। এরপর বুদ্ধদেব ফরাসি ভাষা থেকে ব্যোদেলেয়র (Baudelaire)-এর কবিতা ও জার্মান থেকে হ্যোল্ডারলিন্ (Hoelderlin)-এর কবিতা অনুবাদ করেন। দ্বিতীয়জন প্রথম জনের মতো সুপরিচিত ছিলেন না। অথচ জার্মান ভাষায় তাঁর স্থান অতি উচ্চে। যতদূর মনে পড়ছে, বুদ্ধদেবকে জার্মানি থেকে নিমন্ত্রণ করা হয়। তিনি 'কবিতা' পত্রিকার একটি ইংরেজি সংখ্যা

বের করেন। তার ফলে আমেরিকাতেও তিনি নিমন্ত্রিত হন একাধিকবার। তাঁর মতো আন্তর্জাতিক পরিচিতি বাঙালি কবিদের মধ্যে তখন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের পরে আর কারও হয়নি। পরে হয় জীবনানন্দ দাশের। সেটা তাঁর মৃত্যুর পরে।

বুদ্ধদেব কাব্যনাটকও লিখতেন। তাঁর প্রসিদ্ধ কাব্যনাট্য 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'। এতে তিনি প্রচুর সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। এটা সেই ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে নিয়ে লেখা। তরঙ্গিনী ছিল তাদেরই একজন যেসব বারাঙ্গনা মুনিকে ভুলিয়ে আনতে গিয়েছিল অযোধ্যার রাজমন্ত্রীর আদেশে। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথেরও একটি বিখ্যাত কবিতা রয়েছে।

এরপর তিনি আরও বেশি সাহসের পরিচয় দেন 'রাত ভরে বৃষ্টি' নামে একটি উপন্যাস লিখে। তাঁর বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ ওঠে। নিম্ন আদালতে দণ্ডিত হলেও আপিলে তিনি মুক্তি পান। আমি তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি লিখি। তাতে বলি, 'আপনার লেখনী কলঙ্কমুক্ত হল।' তিনি ভুল বুঝলেন। উত্তরে লিখলেন, 'আমি জানতুম না যে আমার লেখনী কলঙ্কিত হয়েছিল।'

তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম মহাভারত নিয়ে আলোচনা 'মহাভারতের কথা'। এর জন্য তাঁকে তাঁর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রপুরস্কার দেওয়া হয়। পুরস্কার কমিটির সভাপতি আমি।

জীবনে বুদ্ধদেববাবু যাঁকে সঙ্গিনী রূপে লাভ করেছিলেন তিনিও প্রথমে সঙ্গীতে সুপ্রতিষ্ঠ হয়ে পরে উপন্যাস লিখে সুনাম অর্জন করেন। সম্প্রতি প্রতিভা বসু তাঁর স্বামীর মতো মহাভারত নিয়ে আর একখানি বই লিখেছেন। বুদ্ধদেবকে স্মরণ করলে তাঁর প্রতিভাকেও স্মরণ করতে হয়। দুই অর্থেই।

বিষ্ণু দে

বিলেত থেকে ফিরে কলকাতায় আমি যে-হোটেলে উঠেছিলুম তার নাম ক্যালকাটা হোটেল। সেটা ছিল আমহার্স্ট স্ট্রিট ও হ্যারিসন রোডের মোড়ে। সেই ব্যবস্থা মণিদাই করে দিয়েছিলেন। ম্যানেজার নরেন্দ্রনাথ বসুও ছিলেন একজন সাহিত্যিক ও মণিদার বন্ধু। সেই হোটেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন একজন তরুণ সাহিত্যিক। বিষ্ণু দে।

আমি জানতুম না যে বিষ্ণু দে তখনও ছাত্র। দেখে মনে হয় ছাত্রের তুলনায় বয়স বেশি। কথাবার্তাও ছাত্রের তুলনায় আরও শিক্ষিত ব্যক্তির। তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক একটু একটু করে বন্ধুতায় পরিণত হয়। আমাদের সেই বন্ধুতা আজীবন স্থায়ী হয়। আমরা পরস্পরকে পালা করে চিঠি লিখি। তাঁর লেখা চিঠিগুলি হারিয়ে গেলেও আমার লেখা চিঠিগুলি তিনি যত্ন করে রেখে দেন।

আমি তাঁর কবিতা পড়ে খুশি হয়েছিলুম। একইরকম কবিতা বারবার লিখছেন দেখে তির্যক মন্তব্যও করেছিলুম। 'উর্বশী ও আর্টেমিস' তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। গ্রিক মিথোলজির সঙ্গে ভারতীয় মিথোলজির এমন ব্যবহার প্রবীণরাও করেননি। একজন নবীনের পক্ষে এটা দুঃসাহসের পরিচয়। আমি তখন তাঁর সেই কাব্যের রসগ্রহণ করতে পারিনি। বিষ্ণু তা সত্ত্বেও আমাকে তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ প্রতিবারই পাঠাতেন। আমি ক্রমেই

তাঁর একজন সমঝদার হয়ে উঠি। কিন্তু সেটা তাঁর কবিতার বহিরঙ্গের। ভেতরে যা থাকে তা বোঝে কার সাধ্য! রবীন্দ্রনাথ নাকি বলেছিলেন, এই কবির কাব্য যে বোঝে তাকে আমি শিরোপা দেব।

বিষ্ণুর কবিতা ক্রমশ সমাজতন্ত্রের দিকে মোড় নেয়। তিনি হয়ে ওঠেন একজন ইনটেলেকচুয়াল কমিউনিস্ট। কেবল তিনি নন, তাঁর মতো অনেকেই। বুদ্ধদেবের মতো তিনিও হন সেকালের রিপন কলেজের একজন অধ্যাপক। ইংরেজি সাহিত্যের। আশ্চর্যের ব্যাপার, তাঁর যে-বংশে জন্ম সেটি পাক্কা বুর্জোয়া। শ্যামাচরণ দে ছিলেন তাঁর পূর্বপুরুষ। তার নামে কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়ায় রাস্তা হয়েছে। সুধীন্দ্রনাথ তাঁর 'পরিচয়ে'র আড্ডায় কমিউনিস্টদের আমন্ত্রণ করতেন। সেখানে বিষ্ণুও ছিলেন একজন অভ্যাগত। আত্মীয় হিসেবে নয়, কবি হিসেবে। যদিও অসমবয়সী।

বিষ্ণুর যেমন বুর্জোয়া মহলে যাতায়াত তেমনই কমিউনিস্ট মহলেও। ওদিকে চিত্রশিল্পী যামিনী রায়ের সঙ্গেও তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয়। যামিনী রায় সম্বন্ধে তিনি ইংরেজিতে লিখেছিলেন। শিল্প-সমালোচক হিসেবেও তাঁর নাম ছিল। পরবর্তীকালে ভারত সরকার জাতীয় সংগ্রহালয়ের জন্য কার কার ছবি কিনবে সে-বিষয়ে যাঁদের পরামর্শ নিতেন বিষ্ণুও তাঁদের একজন। তাঁর বাড়িতে গেলে নতুন চিত্রকরদের চিত্রকর্ম দেখা যেত। যুদ্ধের সময় যেসব ইংরেজ এদেশে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন ইংরেজ কবিও ছিলেন। নামটি এখন মনে পড়ছে না। তাঁর সঙ্গে বিষ্ণুর যোগাযোগ হয়। শুনেছি সেই সূত্রে বিষ্ণু পড়েন বাংলার তৎকালীন গভর্নর কে সি সাহেবের সুনজরে। যে কারণেই হোক বিষ্ণু পেয়ে যান সরকারি চাকরি। লেকচারার নিযুক্ত হন সেন্ট্রাল ক্যালকাটা (বর্তমানে মৌলানা আজাদ) কলেজে। সেখানেই তিনি পুরো কার্যকাল কাটিয়ে দেন।

যুদ্ধের মাঝখানে এক সময় বিষ্ণু বাঁকুড়া হয়ে বেলিয়াতোড় গ্রামে যান যামিনী রায়ের দেশের বাড়িতে। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী প্রণতি ও দুই কন্যা ইরা আর তারা। আমিও সেই সময় যামিনী রায়কে দেখতে যাই। শুনি, বিষ্ণু সপরিবারে বাঁকুড়া রেল স্টেশনে নেমে ছোট ট্রেনের অপেক্ষায় সারাটা দিন কাটিয়ে দেন। অথচ বাঁকুড়া শহরে এসে আমার বাড়িতে পদার্পণ করেননি। আমি খুব রাগ করি। তাঁর কৈফিয়ত—তিনি আমাদের বিরক্ত করতে চাননি।

আসলে তিনি ছিলেন খুবই লাজুক প্রকৃতির। তা ছাড়া আমি একজন আই. সি. এস. বলে তিনি নিজেকে আমার তুলনায় খাটো মনে করতেন। আমি যতই চেষ্টা করি এই সাম্যবাদীর সঙ্গে সমান হতে তিনি ততই বিব্রত বোধ করতেন। তাঁর দুই কন্যা ইরা ও তারার নামে আমি দুটি ছড়া লিখি। তাঁর নিজের নামেও। তাঁর প্রেরিত 'সাত ভাই চম্পা' পড়ে আমিও একটি কবিতা লিখি। সেটির নামও 'সাত ভাই চম্পা—বিষ্ণু দের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা পূর্বক।' 'চটি ফটফট চটরজী/মুখ মকমক মুখরজী/সেনগুপ্ত দাশগুপ্ত/ ঘোষ বোস আর বানরজী/গবরমেন্টো এঁরাই চালান রায় বাহাদুর রাও সাহেব/এঁরাই আবার কঙ্গরসে গর্জে ওঠেন, যাও সাহেব।' ইত্যাদি।

পার্টিশনের সময় আমার কলকাতায় বদলি হয়ে আসার পরে বিষ্ণু এসে একদিন আমার বাসায় উপস্থিত। রাজস্থান থেকে কে একজন কবি এসেছিলেন। তাঁর সম্মানে যে সভা হয় তাতে বিষ্ণুকে ও আমাকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। বিষ্ণু একা যেতে সাহস পান না।

আমার সঙ্গে যেতে চান। বলে, 'আমাকে ওঁরা ডাকলেন কেন বুঝতে পারছিনে। I am a neglected poet; and a difficult poet at that.' আমি ওঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যাই। আমরা কেবল শ্রোতা, বক্তা নই।

কিছুদিন পরে আমি অকালে অবসর নিয়ে শান্তিনিকেতনে চলে যাই। একবার কী একটা উপলক্ষে কলকাতায় এসে শুনতে পাই, কাছে এক জায়গায় বিষ্ণুর জন্মোৎসব হচ্ছে। আমাকে কেউ ডাকেনি। আমি রবাহূত। দেখলুম সভায় বিস্তর বৈষ্ণব। তবে সবাই কমিউনিস্ট কবি কি না জানিনে। কে বলবে অবহেলিত কবি! কে বলবে দুর্বোধ্য কবি! ঘর ভরা ভক্ত।

বৌদ্ধরা বৈষ্ণবদের দেখতে পারত না, বৈষ্ণবরাও বৌদ্ধদের। একদল বুর্জোয়া, আর একদল প্রলেটেরিয়ন। দেখা গেল দিল্লির সাহিত্য অকাদেমির পুরস্কার পেয়েছেন বিষ্ণু। সেটা 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ' নামে কবিতার বইখানির জন্য। সেই বইটি তিনি আমাকে উৎসর্গ করেছিলেন। ঘটনাচক্রে আমিও সেদিন উপস্থিত ছিলুম দিল্লির পুরস্কার বিতরণী সভায়। বিষ্ণুর জন্য গর্ব বোধ করি। এরপরে বিষ্ণুর ভাগ্যে আরও বড় সম্মান মেলে। জ্ঞানপীঠ পুরস্কার। সেটাও 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ' বইখানির জন্য। একই বই দু-দুটি পুরস্কার পায়। বিষ্ণুকে অভিনন্দন জানিয়ে বলি, 'এবার অপারেশনটা করিয়ে নাও। টাকার তো অভাব নেই।' কীসের অপারেশন সেটা আমার ঠিক মনে পড়ছে না আজ।

একবার পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে আমাকে একটি ফর্ম পাঠিয়ে দিয়ে বলা হয় আবেদন করতে। ফরাসিদের খরচে ছয় মাস প্যারিসবাসের আমন্ত্রণ। বয়সের উর্ধ্বসীমা পঁয়তাল্লিশ হওয়া চাই। আমার বয়স তার চেয়ে বেশি। আমি সেই ফর্মটা বিষ্ণুকে পাঠিয়ে দিয়ে বলি, তাঁর তো বয়স আছে—তিনি আবেদন করুন। তিনি তার উত্তরে লেখেন, 'এম. ডি. ডাক্তারের সার্টিফিকেট চেয়েছে। আমি মাত্র একজন এম. ডি. ডাক্তারকেই চিনি—বিধানচন্দ্র রায়। একদা আমাদের পারিবারিক চিকিৎসক। তাঁর কাছে আমি যেতে পারব না।' বিষ্ণুর উপরে অত্যন্ত বিরক্ত হলুম। কিন্তু এটাই তাঁর স্বভাব। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকেও তাঁকে একটা পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। আমন্ত্রণ করা হয়েছিল বিনা খরচে সোভিয়েত রাশিয়ায় যেতে। সেখানেও যেতে তিনি রাজি নন। মোট কথা তিনি একজন ঘরকুনো বাঙালি ভদ্রলোক। একা বিদেশে যেতে ভয় পান।

শান্তিনিকেতন থেকে আমি কলকাতায় আসি পারিবারিক প্রয়োজনে ও নানাকারণে থেকে যাই।

১৯৪২ সালের একদিন খবর পাই, বিষ্ণুর গুরুতর অসুখ। ছুটে যাই। গিয়ে দেখি, বড় বেশি দেরি হয়ে গেছে। বিষ্ণুর তখন অচৈতন্য অবস্থা।

বিষ্ণুর উদ্দেশে সেই ১৯৪২ সালে একটি কবিতা লিখেছিলুম —

তোমায় আমায় মিল নাই কথা ঠিক সে
মিল নাই পলিটিক্সে।
কিন্তু রয়েছে মিল তো একটি ব্যাপারে
দুই জনেই তো ক্ষ্যাপা রে।
তোমার আমার দু'জনেরই অভিলষিত
কোটি কোটি জন তৃষিত।

শখের লেখায় সুধীদের খুশি করতে
কে চায় লেখনী ধরতে।
তুমি চাও আর আমি চাই মহাজনতায়
অমিল তবুও আছে, হায়!
তুমি চাও তারা গান গেয়ে গেয়ে কাজ করে
সমসমাজের তাজ গড়ে।
আমি চাই তারা সৃষ্টির নব নব লীলায়
গান গায় আর হাত মিলায়।
তুমি কবি যত কর্মীর, যত শ্রমিকের
আমি কবি যত প্রেমিকের।

নীরদচন্দ্র

নীরদচন্দ্রকে আমি জীবনে মাত্র দুই বার দেখেছি। প্রথমবার ১৯২৭ সালে বিলেত যাওয়ার মুখে কলকাতার ফুটপাথে। আলাপ করিয়ে দেন আমার সতীর্থ দ্বিজেন্দ্রলাল মজুমদার। তখনই তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল। বিলেত থেকে ফিরে আসার পর আমার প্রকাশক সুধীরচন্দ্র সরকারের মুখে শুনি নীরদবাবুকে তিনি একটি ছোট মাপের এনসাইক্লোপেডিয়া লেখার ভার দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত সেটা প্রকাশিত হল না। নীরদবাবু হলেন শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের সেক্রেটারি। সরে গেলেন 'প্রবাসী', 'মডার্ন রিভিয়্যু'র সাব-এডিটর পদ থেকে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন বাধে, নীরদবাবু রেডিয়োতে যুদ্ধসম্পর্কে বেতার-ভাষণ দিতে শুরু করেন। এরপর তিনি অল ইন্ডিয়া রেডিয়োতে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হন। দেশ ভাগের পরেও তাঁর সেই চাকরি বহাল থাকে। চাকরি করতে করতেই তিনি ইংরেজি ভাষায় তাঁর আত্মজীবনী প্রকাশ করেন। বইখানি তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নামে উৎসর্গ করেছিলেন। উৎসর্গ-পত্রের মর্ম—দেশের যা কিছু ভালো তার মূলে ব্রিটিশ আমল। বইখানি ইংল্যান্ডে প্রকাশিত হয় ও অসাধারণ সমাদর পায়।

অপরপক্ষে ভারতের রাজনৈতিক মহলে অসামান্য অনাদর। শুনেছি নীরদবাবুকে বলা হয়, ভারতীয় শাসন যদি এতই খারাপ হয় তবে ভারতীয় রাজত্বে চাকরি করছেন কেন? তাঁর উপরওয়ালা কৈফিয়ত চায়, সরকারি চাকরি করতে করতে তিনি বই লিখে যা উপার্জন করছেন তা সরকারকে দিচ্ছেন না কেন? নীরদবাবু কড়া জবাব দেন। সেই সঙ্গে ইস্তফা।

নীরদবাবুকে আমি দ্বিতীয়বার দেখি ১৯৫৪ সালে দিল্লিতে আমার বন্ধু দ্বিজেন্দ্রলাল মজুমদারের বাসভবনে মধ্যাহ্নভোজন উপলক্ষে। আমি জানতে চাই, সংসার চলছে কেমন করে। তিনি উত্তর দেন, ম্যাকমিলান আরও একখানি বই লেখার জন্য অ্যাডভান্স দিয়েছেন। তিনি তার উপর নির্ভর করে সমস্ত সময় বই লেখায় মনোনিবেশ করেছেন। তাঁকে আর ফিরে তাকাতে হয়নি। যথাকালে ম্যাকমিলান প্রকাশ করেন তাঁর বৃহৎ গ্রন্থ 'দ্য কন্টিনেন্ট অব সার্সি'। অন্যান্য প্রকাশক অন্যান্য ইংরেজি গ্রন্থ। একবার বিলেত ঘুরে এসে তিনি আবার

যখন বিলেত যান তখন অক্সফোর্ডে বাড়ি কিনে সেখানেই বসবাস করতে শুরু করেন।

ততদিনে নীরদবাবু সত্তর অতিক্রম করেছেন। বাঙালিরা বলে বার্ধক্যে বারাণসী। কিন্তু নীরদবাবু তো শুধু বাঙালি হিন্দু নন, তিনি একজন ইংলিশ জেন্টলম্যান। তাঁর বেলায় বার্ধক্যে বিলেত। তাঁর পূর্বসূরী ছিলেন রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁরা বিলেতেই দেহত্যাগ করেন। পূর্ব-পুরুষদের বেলায় বিলেতে অগ্নিসংস্কারের ব্যবস্থা ছিল না। রামমোহন ও দ্বারকানাথের মরদেহ সমাধিস্থ হয়। আর উমেশচন্দ্রের নির্দেশ অনুসারে তাঁর মরদেহ কফিন-বন্দি করে স্বদেশে ফেরত পাঠানো হয়। এখানে যথারীতি ভস্মীভূত হয়। লন্ডনে অবস্থান কালে ১৯২৮ সালে আমি লন্ডনের গোল্ডার্স গ্রীন ক্রিমেটেরিয়ম লক্ষ করি। পরে আরও অনেক জায়গায় ক্রিমেটেরিয়ম স্থাপিত হয়। কতক ইংরেজ সেটাই পছন্দ করেন। ফলে প্রবাসী ভারতীয়দের সুবিধা হয়।

নীরদচন্দ্রর বেলায়ও অন্ত্যেষ্টির আয়োজন অক্সফোর্ডের ক্রিমেটেরিয়মে হয়। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বেই তিনি একখানি কাগজে লিখেছিলেন, 'গ্রেগোরিয়ান চান্ট' অর্থাৎ রোমান ক্যাথলিক সাধুদের কণ্ঠসংগীত। তাই তাঁর শ্মশানযাত্রার সময় ধ্বনিত হয় গ্রেগোরিয়ান চান্ট, মোৎসার্টের সিম্ফনি, সংস্কৃত শ্লোক ও রবীন্দ্রসংগীত 'আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে'। এটাও একপ্রকার প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সমন্বয়, বাঙালি হিন্দুর সঙ্গে ইংলিশ জেন্টলম্যানের মেলবন্ধন। এমনটি আর কখনও দেখা যায়নি। তা ছাড়া শতাধিক বৎসর পরমায়ু তাঁর মতো ক-জনের? ম্যাক্সমূলেরকে নীরদবাবু বলেছিলেন, 'A Scholar Extra Ordinary'—নীরদবাবু নিজেও তা-ই। উপরন্তু তিনি একজন writer extra ordinary. নিরানব্বই বছর বয়সে লিখেছিলেন, 'Three Horsemen of the Apocalypse'. তার মানে মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর ও মহামারী। বাইবেলে চতুর্থ এক হর্সম্যানের উল্লেখ আছে। তার মর্ম মহাপ্রলয়। নীরদবাবু মানবজাতিকে সাবধান করে দিয়ে গেছেন, সামনে কী আসছে। তাঁর আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ ছিল ও রয়েছে।

একদা নীরদবাবু সম্বন্ধে ভারতের লোকের ধারণা ছিল, তিনি দেশদ্রোহী। কিন্তু এখন কেউ তা মনে করে না। বাংলা ভাষাতেও তাঁর কয়েকটি উৎকৃষ্ট বই আছে। সেসব বই পড়ে মনে হয় তিনি স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেমিক। শতাধিক বৎসর পরমায়ু একেই তো এক অসাধারণ কীর্তি। তার উপর অসাধারণ বৈদগ্ধ্য। তাঁর দেশবাসী তাঁকে ভুলবে না, মনে রাখবে। তবে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেল বাঙালি হিন্দু ইংলিশ জেন্টলম্যানদের যুগ।

মনীষী সত্যেন্দ্রনাথ

আমার কর্মজীবনে আমি ঢাকায় বদলি হই ১৯৩৩ সালের মাঝামাঝি জুডিসিয়াল ট্রেনিঙের জন্য। সেখানে সবে গুছিয়ে বসেছি। এমনসময় একদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের রিডার সতীশরঞ্জন খাস্তগীর আমার বাসভবনে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। বলেন, 'আমরা বারোজন সদস্য নিয়ে একটি গোষ্ঠী তৈরি করতে চাই। বারো মাসে বারোটা বৈঠক হবে বারোজন সদস্যের বাসায়। আপনাকেও একজন সদস্য হতে অনুরোধ

করি।' এই বলে তিনি আমাকে বাকি এগারোজন সদস্যের নাম শোনান। তাঁদের একজনের নাম সত্যেন্দ্রনাথ বসু, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও প্রধান। আর যাঁরা ছিলেন—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্বনামধন্য সাহিত্যিক ও বাংলাবিভাগের লেকচারার, আর একজন ছিলেন আর্থার হিউজ ঢাকার অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট।

আমি রাজি হয়ে গেলুম। তারপর ডক্টর খাস্তগীর বলেন, 'এই গোষ্ঠীর নাম কী হবে তা আপনিই স্থির করে দিন।' আমি একটু ভেবে নিয়ে বললুম, 'বারোজনা'। আমি তখন সাহিত্যে নতুন, চাকরিতেও নতুন। অপরপক্ষে সত্যেন্দ্রনাথ তখন বিশ্ববিখ্যাত ও চারুচন্দ্র বঙ্গবিখ্যাত। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ হীরেন্দ্রলাল দে, দুজন মুসলিম অধ্যাপক—একজন ইংরেজির ও একজন ইতিহাসের, তাছাড়া ঢাকার বোর্ড অব এডুকেশনের সেক্রেটারি ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় যাঁর জামাতা লর্ড অরুণকুমার সিনহা, তিনি ব্রাহ্মসমাজেরও একজন নেতা। এই গোষ্ঠীতে স্থান পাওয়া আমার পক্ষে এক দুর্লভ সৌভাগ্য।

বারো মাসে বারোবার বৈঠক হবার আগেই আমি ঢাকা থেকে বদলি হয়ে যাই। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বাসভবনে ইতিমধ্যে বৈঠক বসেনি। এমনই একদিন তাঁর বাড়িতে গিয়ে আমি 'কল্' করি। আমার পরিচয় দিই। তিনি আমার নাম আগে থেকে জানতেন। নামমাত্র আলাপ। আমি তাঁর বৈজ্ঞানিক কর্ম সম্বন্ধে অল্পস্বল্প অবহিত ছিলুম। আইনস্টাইনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর নাম বোস-আইনস্টাইন স্ট্যাটিসটিকস-এর সুবাদে। তখন জানতুম না যে তাঁর নামে একটি মৌলিক পদার্থকণার নামকরণ হয়েছে 'বোসন'।

তাঁর সম্বন্ধে তখন একটা প্রবাদ ছিল যে তিনি অঙ্ক কষতে বসলে খাওয়া-শোওয়া ভুলে যেতেন। যতক্ষণ না অঙ্কটার উত্তর পান ততক্ষণ তাঁর বিরাম নেই। তার মানে রাতকে দিন করে দিতেন।

তাঁকে নিয়ে বারোজনের একটা গ্রুপ ফোটো তোলা হয়েছিল। আমি যেখানেই যাই সেটি আমার সঙ্গে যায়। অকালে অবসর নিয়ে আমি যখন শান্তিনিকেতনে বসি তখনও সেই ফোটো আমার সাথী হয়।

সত্যেন বোসের সঙ্গে আমার আবার দেখা হয় ১৯৫৬ সালে যখন তিনি বিশ্বভারতীর উপাচার্য রূপে শান্তিনিকেতনে বাস করেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। দেখি বারোজনের সেই ফোটো তাঁরও দেওয়ালে। আমার পুত্র পুণ্যশ্লোককে তিনি দেখতে চাইলেন। সে তখন সবে জার্মানি থেকে ফিরেছে। পুণ্যশ্লোককে তিনি বিশ্বভারতীতে একটি ফেলোশিপ দেন। সে ইতিমধ্যে ট্যুবিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চ প্রশংসার সঙ্গে পিএইচ. ডি. ডিগ্রি পেয়েছিল।

আমি মাঝে মাঝে সন্ধেবেলা তাঁর ওখানে হাজির হতুম গল্প করতে। দেখতুম তিনি তখন থেকেই মশারি টাঙিয়ে তার ভেতরে শুয়ে শুয়ে বই পড়তেন। এক-একদিন এক-এক রকম বই। কিন্তু কোনওটাই বিজ্ঞানের বই নয়। একদিন দেখি তিনি প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ পড়ছেন। বললেন, 'কয়েকটা জায়গা বুঝতে পারছিনে—পুণ্যকে জিজ্ঞাসা করতে চাই।' পুণ্যকে তিনি প্রায়ই ডেকে পাঠাতেন। আর একদিন দেখি তিনি ফরাসি ঔপন্যাসিক আঁদ্রে জিদ-এর বই পড়ছেন। জিদ-এর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিল। আর একদিন দেখি তিনি ফ্রান্সের ইতিহাস পড়ছেন এক বিখ্যাত ঐতিহাসিকের লেখা। সপ্তদশ শতাব্দীর ফ্রান্সে রাজমাতা ক্যাথারিন দ্য মেডিচির আদেশে ব্যাপকভাবে প্রোটেস্টান্ট নিধন হয়েছিল। যারা

বাঁচে তারা ইংল্যান্ডে আশ্রয় নেয়। এই প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ আমাকে বলেন, রানি এলিজাবেথ রাজমাতা ক্যাথারিনকে লেখেন, দিদি, তুমি প্রোটেস্টান্টদের মেরে তাড়িয়ে দিলে কেন? তার উত্তরে ক্যাথারিন লেখেন, বোন, তুই ক্যাথলিকদের মেরে তাড়িয়ে দিচ্ছিস না কেন? সত্যেন্দ্রনাথ মজা করে বলেন। যে-ইতিহাসে এসব কথা ছিল সে বইখানি ফরাসি ভাষায় লেখা। সত্যেন্দ্রনাথ মূল ফরাসি পড়ছিলেন।

ফরাসিদের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক টান ছিল। শেষ বয়সে তিনি মাথায় ফরাসি ধরনের 'বেরে' (beret) পরতেন।

তাঁকে দিল্লির রাজ্যসভার মনোনীত সদস্য করা হয়েছিল। সেই সুবাদে তিনি মাঝে মাঝে দিল্লি যেতেন। তখন উপাচার্যের পদ শূন্য থাকত। কোনও গোলমাল বাধলে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য কেউ থাকতেন না। রেজিস্ট্রারের ক্ষমতা বিশ্বভারতীর আইনে খর্ব করা হয়েছিল। এর নিট ফল অরাজকতা। একদিন ছাত্ররা গ্রীক নাটক 'অ্যান্টিগোনে'র বাংলা অনুবাদ অভিনয় করছিল। এমন সময় বেধে গেল দুই অধ্যাপকের ঝগড়া। বিতর্কটা রাজার গাড়ি নিয়ে। অধ্যাপক সুধীন্দ্রনাথ ঘোষ বিলেত ফেরতা। চিত্রশিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ নাট্যরসিক। ঘোষ মহাশয় নাকি খেপে গিয়ে রামকিঙ্করের গালে এক চড় মারেন। রামকিঙ্কর হতভম্ব। কিন্তু তাঁর ছাত্ররা মারমুখো। ঘোষ বিপদ বুঝে ছুটে যান রেজিস্ট্রারের বাড়িতে ক্ষমা চাইতে। পথের মাঝখানে ছাত্ররা তাঁকে রিকশ থেকে নামিয়ে উত্তম-মধ্যম দেয়। তাঁর চশমা ভেঙে যায়। সে অনেক কথা। এই নিয়ে শান্তিনিকেতন তোলপাড়। সত্যেন্দ্রনাথ যখন দিল্লি থেকে ফেরেন তখন দেখেন সবাই ঘোষ-এর বিপক্ষে। শেষ পর্যন্ত ঘোষকে কয়েক মাসের মাইনে দিয়ে বিদায় করে দেওয়া হল। আমি ঘটনার সময় শান্তিনিকেতনে ছিলুম না, বরোদায় গিয়েছিলুম একটা সম্মেলনে যোগ দিতে। এই নিয়ে লেখালেখি করে আমিও অপ্রিয় হই।

ঘোষ-এর বিদায়ের পর বোস-এর বিদায়-পালা। তাঁকে জাতীয় অধ্যাপক রূপে ভারত সরকার মাসিক আড়াই হাজার টাকা বেতন দিতে চান। তিনি যেখানে ইচ্ছা সেখানে বসে গবেষণা করবেন। যে-কোনও বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন। বিশ্বভারতীর উপাচার্যের মাইনে দেড় হাজার টাকা। সুতরাং ওটা একটা মওকা। আমি গেলুম তাঁকে অভিনন্দন জানাতে। তিনি গম্ভীর মুখে বললেন,'অন্নদা, ওরা আমাকে তাড়ালে।'

তিনি শান্তিনিকেতন ছাড়লেন। মনের দুঃখে কলকাতায় গিয়ে বাড়িতে বসে কাজকর্ম চালালেন। বহুদিন পরে আমিও গিয়ে কলকাতায় বসবাস শুরু করলুম। তাঁর সঙ্গে কালেভদ্রে দেখা হত। তাঁর জন্মদিনে তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে শুভকামনা জানাই। দেখি তিনি একখানি ফরাসি বই পড়ছেন—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস। বইখানি আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'খুঁজে বার করো দেখি সেই কমিউনিস্টদের প্রসঙ্গে কিছু লিখেছে কিনা যুদ্ধের আরম্ভে যাদের ফ্রান্সে আটক করা হয়েছিল।' আমি একটু নাড়াচাড়া করে বললুম, 'আমি তো খুঁজে পাচ্ছিনে। আপনি এক কাজ করুন। এর একটা ইংরেজি সংস্করণ বেরিয়েছে—ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে আনিয়ে নিয়ে পড়ুন।'

এর অল্পদিন পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মতো এত বড় একজন মনীষী বিজ্ঞানে আরও অনেক কাজ করে দেখাতে পারতেন। কিন্তু নানা কারণে সেটা পারলেন না। একবার নাকি বলেছিলেন, সে পরিবেশ এ-দেশে নেই। হয়তো তিনি ইউরোপে থাকলে আরও কাজ দেখাতে পারতেন।

আমার যতদূর মনে পড়ছে ১৯২১ বা '২২ সালে কলকাতায় ফোর আর্টস ক্লাব নামে একটি গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত হয়। বিজয়চন্দ্র মজুমদারের কন্যা সুনীতি দেবী ছিলেন তার প্রাণ-স্বরূপ। সদস্যদের মধ্যে ছিলেন মণীন্দ্রলাল বসু, গোকুলচন্দ্র নাগ, দিনেশরঞ্জন দাশ প্রমুখ শিল্পী ও সাহিত্যিকগণ। পুরুষদের সঙ্গে মহিলাদের মেলামেশা তখনকার দিনে নিন্দনীয় ছিল। একজন বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে একজন বিবাহিতা মহিলার প্রেম ও বিলাতযাত্রা ক্লাবটির সুনামের অন্তরায় হয়। এর পরে গোকুলচন্দ্র নাগ ও দিনেশরঞ্জন দাশ উদ্যোগী হয়ে 'কল্লোল' নামে একটি ক্ষুদ্র মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। ইতিমধ্যে 'সবুজপত্র' বন্ধ হয়ে গেছে। এক হিসেবে 'কল্লোল' তার শূন্যতা পূরণ করে। অনেক তরুণ লেখক 'কল্লোলে'র পৃষ্ঠায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। কিংবা অন্যত্র আত্মপ্রকাশ করলেও 'কল্লোলে'র লেখক বলে খ্যাত হন। যে দুজন নতুন লেখকের নাম প্রায়ই শোনা যেত তাঁরা হলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও প্রেমেন্দ্র মিত্র। গোকুলচন্দ্র নাগ ছিলেন 'কল্লোলে'র প্রাণপুরুষ। তাঁর রচিত 'পথিক' একটি অসাধারণ উপন্যাস। তাতে মায়া নামের এক অসাধারণ নায়িকার দেখা মেলে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র সে সময় কী লিখেছিলেন তা আমার মনে পড়ছে না। 'কল্লোলে' কিনা তা-ও আমি বলতে পারছিনে। তিনি সাহিত্যের দোরগোড়ায় পা দিয়েই ঘোষণা করেন,

'আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের
মুটে মজুরের
—আমি কবি যত ইতরের।
আমি কবি ভাই কর্মের আর ঘর্মের;
বিলাস-বিবশ মর্মের যত স্বপ্নের তরে ভাই
সময় যে হায় নাই!'

এটি একটি নতুন কণ্ঠস্বর। এই কণ্ঠস্বর একজন বাঙালি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের নয়। অনেক নিচের তলার। আমার ধারণা যাঁর স্বর তিনি বস্তির বাসিন্দাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত। 'পাঁক' বলে একটি উপন্যাস লিখে তিনি এই ধারণার আরও উদাহরণ দেন।

কয়েকবছর বাদে আমি যখন বিলেত যাই তখনও 'কল্লোল' চালু ছিল। যে কোনও কারণেই হোক, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও মুরলীধর বসু সহযোগে 'কালিকলম' নামে অন্য একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। মুরলীধর বসুর অনুরোধে আমিও তাতে লিখি। ইতিমধ্যে 'বিচিত্রা'য় আমার 'পথেপ্রবাসে' বেরোতে আরম্ভ করেছিল। সেই সূত্রে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের সঙ্গে আমার পত্রালাপ হয়। তিনি কিন্তু 'কল্লোল' ছেড়ে যাননি। তাঁর কিংবা তাঁর কোনও বন্ধুর অনুরোধে আমিও 'কল্লোলে' লেখা দিই।

দুঃখের বিষয় গোকুলচন্দ্র নাগ অকালে মারা যান ও দিনেশরঞ্জন দাশ সিনেমা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। 'কল্লোল' কিছুদিন পরে উঠে যায়। তার উত্তরসূরি হয় সুধীন্দ্রনাথ দত্তের দ্বারা সম্পাদিত 'পরিচয়'। তাঁর অনুরোধে আমি 'পরিচয়ে'ও লিখতে আরম্ভ করি। তাতে কিন্তু আমি অচিন্ত্য কি প্রেমেন্দ্র দুজনের কাউকেই দেখতে পাইনে। আসলে এঁরা ছিলেন

'কল্লোল' যুগের লেখক। 'কল্লোল যুগ' নামে অচিন্ত্যর একখানি বই আছে। তা ছাড়া ড. জীবেন্দ্রকুমার সিংহ লিখেছেন 'কল্লোলের কাল'। দুটি গ্রন্থই সমান মূল্যবান। 'কল্লোল' গোষ্ঠীর লেখকরা অত্যাধুনিক বলে খ্যাত ছিলেন। এই অত্যাধুনিকরা রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করতেন। রবীন্দ্রনাথ এঁদের অনেককে তাঁর জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা ভবনে ডেকে পাঠান। সে সময় আমি বিলেতে। শুনেছি, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের বক্তব্য শুনে নিজের বক্তব্য ব্যাখ্যা করেছিলেন। প্রেমেন্দ্র সেই সভায় ছিলেন কি না ঠিক জানিনে, কিন্তু অচিন্ত্য ছিলেন।

পরবর্তীকালে অচিন্ত্যর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। সেই সুবাদে ডি. এম. লাইব্রেরির গোপালদাস মজুমদারের সঙ্গে আলাপ। তিনি আমারও প্রকাশক হন। একদিন তিনি আমাকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'বেনামীবন্দর' উপহার দেন। এইটেই প্রেমেন্দ্রর প্রথম প্রকাশিত ছোটগল্পের সংকলন। দেখলুম তিনি ছোটগল্পে ওস্তাদ। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হল একদিন এম.সি. সরকার এন্ড সন্সের দোকানে। কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আর যোগাযোগ হয় না। তিনি চলে যান সিনেমার জগতে। তার পরে কলকাতা রেডিয়োতে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আমন্ত্রণে আমি রবীন্দ্রপুরস্কার কমিটিতে যোগ দিই। সালটা বোধহয় ১৯৬২। সেখানে প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে আবার দেখা হয়। সে সময় তিনটি রবীন্দ্রপুরস্কারের জন্য একটি কমিটি ছিল। পরে বিজ্ঞানের জন্য পুরস্কার ও ইংরেজি লেখার জন্য পুরস্কার আলাদা হয়ে যায়। সাহিত্যের কমিটিতে আমাকে করা হয় সভাপতি। আমার সাথী হন প্রেমেন্দ্র মিত্র ও আরও কয়েকজন। প্রত্যেক বছরে আমরা সাহিত্যের জন্য রবীন্দ্রপুরস্কার কাকে দেওয়া হবে তা স্থির করতুম। প্রেমেন্দ্রর মতকে আমি গুরুত্ব দিতুম। আমরা দুজনে একমত হলে অন্যেরাও সায় দিতেন। সেইভাবে আমরা সতীনাথ গুহকে তাঁর 'নাট্যকার' উপন্যাসের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সুপারিশ করি। দুঃখের বিষয় সতীনাথ গুহ ছিলেন একজন বিতর্কিত লেখক এবং তাঁর বই আরও বিতর্কিত।

আমাদের খুবই বদনাম হয়। আশাপূর্ণা দেবীও ছিলেন আমাদের একজন। তিনি খুব দুঃখ পান। আমরা যে সতীনাথবাবুকে পুরস্কারের জন্য মনোনীত করলুম, এর পেছনে ছিল কিছু ব্যক্তিগত কারণ। যতবারই কলকাতায় ইউরোপের নানা দেশ থেকে সরকারের অতিথিরূপে সাহিত্যিকরা আসতেন সরকার তাঁদের খাতিরে নিজেরা সান্ধ্য মজলিস না করে সে ভার চাপিয়ে দিতেন সতীকান্তবাবুর উপরে। গুহ ছিলেন সাহেবি কেতায় অভ্যস্ত বাঙালি ভদ্রলোক। তিনি তার সান্ধ্যপার্টিতে নিমন্ত্রণ করতেন প্রেমেন্দ্রকে ও আমাকে। সাহিত্যিকদের সভা-সমিতিতে সতীকান্তবাবু মুক্তহস্তে অর্থসাহায্য করতেন।

আমি একবার সদ্যমুক্ত বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের কলকাতার একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে নিমন্ত্রণ করি। পঞ্চাশজনের জায়গায় দেড়শো জন এসে উপস্থিত হন। তখন ভিসার বালাই ছিল না। সতীকান্তবাবু আমাদের সহায় না হলে সেই বাড়তি একশো জনকে আমরা রাখতুম কোথায়? তিনি তাঁর স্কুলের বিল্ডিঙে বাড়তি অতিথিদের ঠাঁই করে দিলেন। শুধু শয়নের জন্য নয়, ভোজনের জন্যও। এইসব কথা মনে করেই প্রেমেন্দ্র ও আমি রবীন্দ্রপুরস্কারের জন্য সতীকান্তবাবুর কথা ভাবি। সেই সঙ্গে এটাও ঠিক যে আমাদের সামনে আর কোনও পুরস্কার-যোগ্য বই ছিল না। তা ছাড়া সভাপতি হিসেবে আমার পলিসি ছিল প্রত্যেকবারই একজনকে না একজনকে পুরস্কারের জন্য সুপারিশ করা। কোনওবারই

পুরস্কার বাদ যেত না। 'নাট্যকার' তেমন একটা উঁচুদরের বই না হলেও তার ভাষা ও স্টাইল ছিল প্রশংসার যোগ্য।

এর পরে একবার আমি স্থির করি যে অচিন্ত্যকুমারকে পুরস্কার দেব। কারণ তাঁর মতো লেখককে কোনও পুরস্কারই দেওয়া হয়নি। অথচ প্রেমেন্দ্রকে একবার সাহিত্য অকাদেমী পুরস্কার, একবার রবীন্দ্র পুরস্কার ও একবার আনন্দবাজার বা অমৃতবাজার পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। অচিন্ত্যর নাম শুনে প্রেমেন্দ্র জোর আপত্তি করে। আমি বিস্মিত হই। কারণ একদা ছিল তাঁদের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুতা। হতে পারে কারণটা অচিন্ত্যর এক সোনার খনি আবিষ্কার। তার নাম 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ'। অচিন্ত্যকে ধর্মসভায় বক্তৃতা দিতে আহ্বান করা হত। শ্রোতা থাকত প্রায় পাঁচশোজন ভক্ত। তাঁর বাড়িতে প্রকাশকেরা ভিড় করতেন আরও ধর্মগ্রন্থের জন্য। অথচ অচিন্ত্য ছিলেন গোড়ার দিকে একজন অজ্ঞেয়বাদী এবং প্রেমেন্দ্রও কতকটা তাই। প্রেমেন্দ্রর প্রকৃতি ছিল বৈজ্ঞানিক ধরনের। তার সাক্ষী ঘনাদার গল্পগুলি।

যা-ই হোক, বোধহয় একজনের ভক্তিবাদ ও অপরজনের যুক্তিবাদ তাঁদের দুজনকে পৃথক করেছিল। কিন্তু প্রেমেন্দ্রর আপত্তি সত্ত্বেও আমি অচিন্ত্যর কবিতাকেই সেবার রবীন্দ্রপুরস্কারের জন্য সুপারিশ করি। অচিন্ত্য পুরস্কার পান। কিন্তু তার একবছরের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়।

এর পরে সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে পুরস্কার কমিটির পুনর্গঠন হয়। আমার নাম বাদ যায়। প্রেমেন্দ্রর নামও বাদ গেল কিনা জানিনে। প্রেমেন্দ্রর সঙ্গে আমার আর একসঙ্গে বসা হয় না। তবে একদিন সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে কয়েকজন সাহিত্যিক কলকাতায় আসেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলার জন্য আমরা দুজনেই আমন্ত্রণ পাই। বিপ্লবের দেশের সাহিত্যিকদের প্রেমেন্দ্র প্রশ্ন করেন, আপনাদের দেশে আর বিপ্লব হচ্ছে না কেন? শ্রোতারা নিরুত্তর।

প্রেমেন্দ্রর সঙ্গে আমার শেষ দেখা তাঁর বাড়িতে। তাঁর গুরুতর অসুখের খবর পেয়ে আমি ছুটে যাই তাঁকে দেখতে। তখন তাঁর শেষ অবস্থা। কিন্তু জ্ঞান ছিল। দু-চার কথার পরে তিনি বললেন, আজ থাক। আমার বলবার মতো বিশেষ কিছু ছিল না। বলতে পারতুম মামুলি স্তোকবাক্য। ঈশ্বরের কৃপায় আপনি সেরে উঠবেন। ইত্যাদি। কিন্তু তিনি ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন না। তাই আমি তাঁকে বিরক্ত করিনি। তিনি শান্ত মনেই প্রয়াণ করেন।

প্রেমেন্দ্রর কথা যখনই মনে পড়ে তখনই স্মরণ করি তাঁর আশ্চর্য গল্প বলার ক্ষমতা। বিশেষ করে 'তেলেনেপোতা আবিষ্কার' গল্পটির টেকনিক—গল্পটি বলা হয়েছে অতীতে কী হয়েছে তা নিয়ে নয়, ভবিষ্যতে কী হবে বা মনে হবে তা-ই নিয়ে। প্রেমেন্দ্রর ভঙ্গি ও ভাষা তাঁর গল্পের সম্পদ—বিষয় যা-ই হোক না কেন। ঘনাদা তাঁর এক অপূর্ব সৃষ্টি। ঘনাদার জন্য তার স্রষ্টার নাম চিরস্থায়ী হবে।

অচিন্ত্যকুমার

অচিন্ত্যকুমারের সঙ্গে আমার পত্রালাপ শুরু হয়েছিল সুদূর লন্ডন থেকে। ইতিমধ্যেই আমরা পরস্পরকে তুমি বলতে আরম্ভ করেছিলুম। কলকাতায় পৌঁছেই ওঁর সঙ্গে প্রথম দেখা। তখন সে আমাকে বলল, 'তোমার পথে প্রবাসে পড়ে তোমাকে যেমন মনে হত এখন দেখছি তুমি তেমন নও।' আমি ভেবে উঠতে পারলুম না, ওই উক্তিটা কি নৈরাশ্যসূচক, না তার বিপরীত। অচিন্ত্য আমার গাইড হয়ে প্রমথবাবুর বাড়ি নিয়ে যায়, পরে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের উদয়ন ভবনে। পরের দিন অচিন্ত্য একাই যায় বিদায় নিতে। কবি তাকে বলেন, 'সব সময় মনে রাখবে লোকলক্ষ্মী গর্ভিণী।' অচিন্ত্যকে জিজ্ঞাসা করলুম, 'কথাটার তাৎপর্য কী?' সে বলল, 'গর্ভিণীর কাজ গর্ভ রক্ষা করা, তেমনই শিল্পীর কাজ শিল্পীর সত্তা রক্ষা করা।'

অচিন্ত্য ইতিমধ্যেই 'বেদে' নামে একটি উপন্যাস প্রকাশ করে নাম করেছিল। তেমনই আমিও 'তারুণ্য' নামে একটি প্রবন্ধ-পুস্তিকা রচনা করে। আমাদের দুজনেরই প্রকাশক এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্সের সুধীরচন্দ্র সরকার। অচিন্ত্য আমাকে সুধীরবাবুর দোকানে নিয়ে যান। তিনি আমাকে একখানি 'বেদে' উপহার দেন। বইখানি সত্যিই নতুন ধরনের।

কলকাতা থেকে আমার কর্মস্থল বহরমপুর যাই। আমাদের পত্রালাপ অব্যাহত থাকে। একবার কর্মোপলক্ষে কলকাতায় গিয়ে শুনি, অচিন্ত্যর বিয়ে। ওর দাদার বাড়িতে গিয়ে ওকে আমার অভিনন্দন জানাই। দেখি, বরযাত্রী এসেছেন, কাজী নজরুল ইসলাম ও তাঁর প্রকাশক গোপালদাস মজুমদার। গোপালবাবু আমার কাছে একটি উপন্যাস চান। আমি ইতিমধ্যেই 'বিচিত্রা' পত্রিকায় 'যার যেথা দেশ' উপন্যাসটি আরম্ভ করে দিয়েছিলুম। তার উপর সুধীরবাবুর অনুরোধে লিখি 'অসমাপিকা' উপন্যাস। তৃতীয় একটি উপন্যাস লেখার সময় আমার ছিল না। তাই গোপালবাবুকে 'না' বলে দিলুম।

সেই রাত্রেই বহরমপুরে ফিরে যাওয়ার ট্রেন ধরি। রেলপথে আমার মনে উদয় হয় মাঝপথে লন্ডন থেকে পশ্চিম মুখে নিরুদ্দেশ যাত্রা। যখন যেখানে রাত হয় তখন সেখানে থামি ও রাত কাটাই। পরের দিন আবার নিরুদ্দেশ যাত্রা। স্থির করলুম, ওই ভ্রমণ কাহিনী লিখে আমি একটি উপন্যাসের আকার দেব। তার টেকনিক হবে শেষের দিন থেকে তার আগের দিনে, আগের দিনের আগের দিনে ইত্যাদি। পরে আবার শেষ দিন। বহরমপুরে ফিরে গিয়ে আমি গোপালবাবুকে জানিয়ে দিলুম যে আমি তাঁর জন্য 'আগুন নিয়ে খেলা' লিখছি। তিনি লিখলেন, আমি যেদিন যেটুকু লিখব সেটুকু তাঁকে পাঠিয়ে দেব, তিনি সেটুকু ছেপে প্রুফ দেখবার জন্য আমায় পাঠিয়ে দেবেন, আমি প্রুফ ফেরত পাঠাবার সময় আরও নতুন কপি পাঠাব। এমনই করে ছ-সপ্তাহের মধ্যে লেখাও শেষ ছাপাও শেষ।

ইতিমধ্যে আমার জীবনে ঘটে গেল আর এক আগুন নিয়ে খেলা। এক অজানা অচেনা বিদেশিনীর সঙ্গে দেখা, ভালোবাসা ও বিয়ের সিদ্ধান্ত। টাকার অভাব। গোপালবাবুকে বলতেই তিনি 'আগুন নিয়ে খেলা' বাবদ আড়াইশো টাকা দিলেন। বিয়ে হল রাঁচিতে, আমার বন্ধু শরৎ মুখোপাধ্যায়ের বাসভবনে। বরযাত্রী হলেন অচিন্ত্যকুমার ও গোপালদাস। এঁরা দুজনে কষ্ট করে কলকাতা থেকে রাঁচি যান।

অচিন্ত্য ইতিমধ্যে চাকরিতে যোগ দিয়েছিল। মুনসেফের চাকরি। মুনসেফদেরকে এমন সব জায়গায় বদলি করা হত যেখানে রেলস্টেশন নেই, মহকুমা অফিস নেই, হাইস্কুল নেই, ডাক্তারখানা নেই। তার ফলে অচিন্ত্যকে একরকম বনবাসে থাকতে হত, সঙ্গে তার স্ত্রীকেও। মুনসেফের আদালতে যারা সাক্ষী দিতে আসত অচিন্ত্য তাদের মুখে রকমারি শব্দ শুনে তার নোটবুকে টুকে রাখত। পরে সেগুলি তার লেখা গল্পে চালিয়ে দিত। হিন্দু-মুসলমান নানা স্তরের স্ত্রী পুরুষের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। তারা তার লেখা গল্প-উপন্যাসেও চলে আসে। যেমন 'সারেঙ', যেমন 'যতনবিবি'। অচিন্ত্যর একটা নিয়ম ছিল যে প্রত্যেকদিন কিছু-না-কিছু লিখবেই—তা সে গল্পই হোক, কি উপন্যাসই হোক, কি প্রবন্ধই হোক। প্রত্যেক বছরেই তার নতুন বই বেরোয়। কোনওটাই ধর্মীয় বিষয়ের নয়।

অচিন্ত্যর কথাবার্তা শুনে মনে হত সে ভগবান বিশ্বাস করে না। সে 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' লিখে ধার্মিক লেখকদের সবাইকে হার মানিয়েছে। যেখানে ধর্ম সেখানে অর্থ। অচিন্ত্যকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয় না। এর পরে সে চৈতন্য মহাপ্রভুর পরিবারদের নিয়ে আর-একখানি বই লেখে।

সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বিষয়ে গল্প-উপন্যাস লেখা যেমন চলছিল তেমনই চলতে লাগল। কবিতা লেখার অভ্যাসও ছেড়ে দেয়নি। আশ্চর্যের ব্যাপার চাকরিতেও তার প্রমোশন অব্যাহত ছিল। অবসরের পূর্বে সে জেলা ও দায়রা জজ বা অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিল। সে যে কেবল দেওয়ানী মামলা বিচার করত তা নয়, ফৌজদারী মামলাও বিচার করত। একজন রাশভারী কড়া দায়রা জজ বলেও তার খ্যাতি ছিল। অবসরের পরেও তাকে বিচার বিভাগের কী একটা উচ্চপদে বহাল করা হয়।

কিন্তু একদিনের জন্যও অচিন্ত্য ভুলে যায়নি যে লোকলক্ষ্মী গর্ভিণী। সমানে বই লিখে গেছে। সমানে প্রকাশ করেছে। কোনওদিন প্রকাশকের অভাব হয়নি। প্রকাশকরাই তার বাড়িতে হানা দিয়েছে। সেও দর কষাকষি করেছে। ধর্ম আর অর্থ আর শিল্প আর রাজকর্ম এই চতুর্বর্গের সমন্বয় আমাদের আর কারও জীবনে ঘটেনি।

আমার প্রতি তার ছিল অপরিমেয় প্রীতি। দেখা হলেই আমার হাত এমন জোরে চেপে ধরত যে আমার তখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।

অচিন্ত্যই আমাকে প্রুফ দেখতে শিখিয়েছিল। ছোটগল্প লিখতে আমার সাহস হত না। অচিন্ত্যই আমাকে উৎসাহ দেয়। অচিন্ত্যকে আমি আমার 'অসমাপিকা' উপন্যাসটি উৎসর্গ করেছিলুম। সেও আমাকে একখানি উপন্যাস উৎসর্গ করেছিল এবং সেটাই আগে।

গোড়ার দিকে অচিন্ত্য ছিল একজন অত্যাধুনিক লেখক। রবীন্দ্রনাথের চেয়ে আরও এগিয়ে। সে ঘোষণা করেছিল 'কল্লোলে'র পৃষ্ঠায়—ঠিক মনে পড়ছে না, কিন্তু কতকটা এই রকম—

পশ্চাতে শত্রুরা শর অগণন হানুক ধারালো,
সম্মুখে থাকুন বসে পথ রুধি' রবীন্দ্র ঠাকুর—
আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীব্র তীক্ষ্ণ আলো
যুগ সূর্য ম্লান তার কাছে—মোর পথ আরো দূর।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'শেষের কবিতা' লিখে প্রমাণ করে দিলেন যে তিনি অত্যাধুনিকদের চেয়েও আরও আধুনিক। তাঁর শেষ জীবনের গল্প-উপন্যাসগুলিতে তিনি সেই সর্বাধিক

আধুনিকতার পরিচয় অব্যাহত রাখেন। আর অচিন্ত্য চলে গেল উলটো পথে 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' লিখতে গিয়ে। অচিন্ত্যর শেষ বয়সে আমি তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে জানতে পেরেছিলুম যে তার মধ্যে সত্যিই একটা আধ্যাত্মিক চেতনা এসেছে। সে আর নিরীশ্বরবাদী বা অজ্ঞেয়বাদী নয়, পরিপূর্ণ ঈশ্বরবিশ্বাসী। তাকে ধর্মপ্রাণ বললে অত্যুক্তি হয় না। সে আমাকে প্ল্যানচেট নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার গল্প বলত। পরলোকগত আত্মারা নাকি সাড়া দিয়ে তাকে বলতেন, 'ইহজন্মে আর একটু এগিয়ে থাকো।' আমার মনে হয়, অচিন্ত্য অধ্যাত্মমার্গে একটু এগিয়ে রয়েছিল। তেমন মানুষের কাছে রবীন্দ্রপুরস্কার বড় একটা প্রাপ্তি নয়। আমাদের মতো মানুষের পক্ষে তাকে রবীন্দ্রপুরস্কারের জন্য সুপারিশ করা বড় একটা সৎকর্ম।

এখানে বলে রাখি যে রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ করে সুন্দর একটি কবিতা লিখেছিল। তাতে ছিল,

আমি তো ছিলাম ঘুমে
তুমি মোর শির চুমে
গুঞ্জরিলে কী উদাত্ত মহামন্ত্র মোর
কানে কানে
চলো রে অলস কবি
ডেকেছে মধ্যাহ্ন রবি
হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

আমাদের স্কুলের কমনরুমে 'ভারতী' ছিল 'সবুজপত্র' ছিল, 'মানসী ও মর্মবাণী' ছিল। কিন্তু 'প্রবাসী' ছিল না। তার জন্য আমাকে যেতে হত হেড মাস্টার মশায়ের বাড়িতে। সেখানে 'প্রবাসী'র পুরাতন সেট পড়তুম। 'গোরা' আবিষ্কার করি সেখানেই। এর পরে আমি 'প্রবাসী'-র প্রতি মাসের সংখ্যা অন্যত্র সংগ্রহ করি। আমার বিশেষ ভালো লাগে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'বিবিধ প্রসঙ্গ'। একদিন তাঁকে চিঠি লিখে তাঁর একটা বাণী চাই ও তার সঙ্গে একটা ফোটো। তিনি ফোটো পাঠাতে পারেন না বাণী পাঠান। সেই বাণীর এক জায়গায় ছিল : 'কারও সেবা করতে পারলে যেমন আনন্দ হয় তেমন আর কিছুতে নয়।' আরও একটু বড়ো হয়ে আমি নিজেই 'প্রবাসী'র গ্রাহক হয়ে পড়ি। কিছুদিন পরে স্কুল থেকে আমাকে পুরস্কার দেওয়া হয় টলস্টয়ের তেইশটি গল্পের ইংরেজি অনুবাদ। সেই পুস্তকে একটি গল্প ছিল, তার নাম 'তিনটি প্রশ্ন'। সেটি আমি 'সবুজপত্রে'র অনুকরণে কথ্য ভাষায় অনুবাদ করে 'প্রবাসী'তে পাঠিয়ে দিই। উত্তরে পাই একটি পোস্টকার্ড। চারু বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন যে, গল্পটি গৃহীত হয়েছে। মাস কয়েকের মধ্যেই আমি আমার অনুবাদ ছাপার অক্ষরে দেখি। যতদূর মনে পড়ছে, পাঁচ টাকার একটি মনিঅর্ডারও পাই। কিন্তু আর একটি গল্প অনুবাদ করে পাঠিয়ে দিলে সেটি ফেরত আসে।

'প্রবাসী'র মতো 'মডর্ন রিভিয়্যু' ছিল আমার প্রিয় পাঠ্য। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার

সময়ও আমি পাঠ্যপুস্তক ছেড়ে 'মডর্ন রিভিয়্যু' পড়েছি। কলেজে গিয়ে আমি সাত টাকার স্কলারশিপ পাই। তার থেকে পাঁচ টাকা যেত কলেজের ফী বাবদ। বাকি দুটাকা জমিয়ে রাখতুম। সেই টাকা থেকে একাংশ যেত 'প্রবাসী' ও 'মডর্ন রিভিয়্যু'র চাঁদা হিসেবে। রামানন্দবাবু যা-কিছু লিখতেন সবই আমার ভালো লাগত। ভাবতুম আমি একদিন তাঁরই মতো সম্পাদক হব এবং নির্ভীকভাবে নিবন্ধ লিখব।

কলেজে গিয়ে 'প্রবাসী'তে প্রকাশের জন্য 'কৃষ্ণ' নামে লম্বা একটি কবিতা লিখে পাঠাই। সেটি প্রকাশিত হয় রামানন্দবাবুর 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র ঠিক পরেই। যাকে বলে প্লেস অব অনর। গোটা একটি সনেটও 'প্রবাসী'তে স্থান পায়। তারপরে আমি হয়ে যাই 'বিচিত্রা'র লেখক। আর কোনও লেখা 'প্রবাসী'তে পাঠাইনে।

অনেকদিন বাদে আমি যখন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক ও বাঁকুড়ার জেলা জজ, তখন জামশেদপুর থেকে নিমন্ত্রণ আসে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সাহিত্যশাখার সভাপতিত্ব করতে। সভাপতি পদের আসন নিয়ে আমি ঘোষণা করে দিই যে বক্তার সংখ্যা অনেক, কাউকে আমি পাঁচ মিনিটের বেশি সময় দিতে পারব না। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও প্রফুল্লকুমার সরকার। দুজনেই আমার নমস্য ব্যক্তি। এঁদের ক্ষেত্রেও আমি ব্যতিক্রম করলুম না। খুব খারাপ লাগছিল থামিয়ে দেওয়ার জন্য ঘণ্টা বাজাতে।

বিয়াল্লিশ সালে কলকাতায় জাপানী বোমা পড়ে। বাঁকুড়ায় চলে আসেন আরও অনেকের মতো রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ও। স্কুল ডাঙায় তাঁর নিজস্ব বাড়ি ছিল। সেইখানে ওঠেন। একদিন দেখি তিনি রিকশায় চড়ে আমার বাসভবনে উপস্থিত। জানতে চান এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা আছে কিনা। ছিল। তিনি বলেন, 'আইরিশ নেতা পার্নেলের বিরুদ্ধে সেকালের ইংল্যান্ডের সংবাদপত্রগুলিতে মিথ্যা প্রচার করা হয়েছিল। একইরকম মিথ্যা প্রচার হয়েছে গান্ধীজীর বিরুদ্ধে ইংরেজদের সংবাদপত্রে। আমি প্রতিবাদ করতে চাই।' তিনি আমার এনসাইক্লোপেডিয়ার একটি খণ্ড বেছে নিয়ে বাড়ি নিয়ে যান। এবং পরে ফেরত দিয়ে যান। 'মডর্ন রিভিয়্যু'তে ও 'প্রবাসী'তে তাঁর মন্তব্য প্রকাশিত হয়। তিনি বাঁকুড়ায় বেশ কিছুদিন ছিলেন। সে-সময় লীলা ও আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতুম। তিনি লীলাকেও 'মডর্ন রিভিয়্যু'তে লেখান।

একদিন বিষ্ণুপুর থেকে তাঁর ও আমার নিমন্ত্রণ আসে। সেখানে একটি সাহিত্যসভায় আমরা দুজনে বক্তৃতা দিই। আমি যা বলেছিলুম তার উপর মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন, সাহিত্য বলতে ইনি বোঝেন রস সাহিত্য, কিন্তু সেটাই সব নয়, সাহিত্যের সংজ্ঞা আরও ব্যাপক।

ভারতীয় পি. ই. এন. সেন্টার থেকে ভারতের বিভিন্ন সাহিত্য সম্বন্ধে কয়েকটি পুস্তক প্রকাশ করা হয়। বাংলা সাহিত্যের ভার পড়ে আমার উপরে। লীলাকেও আমি সঙ্গে নিই। আমাদের পাণ্ডুলিপি পি. ই. এন.-এর কর্ণধার ম্যাডাম সোপি ওয়াডিয়া রামানন্দবাবুর কাছে পাঠিয়ে দেন ও তাঁর মত চান। তাঁকেই ভূমিকা লিখতে বলেন। রামানন্দবাবু আমার পাণ্ডুলিপি পড়ে কয়েকটি জায়গায় হস্তক্ষেপ করেন। বাংলা প্রবন্ধের উৎকর্ষের জন্য আমি রামানন্দবাবুর প্রশংসা করেছিলুম। তিনি আপত্তি করে বলেন, 'আমি সাহিত্যিকই নই। আমি যা লিখেছি তা সাহিত্যই হয়নি। আমার নামটা আপনি বাদ দিন।' অগত্যা বাদ দিতেই হল। আমি ভেবে দেখলুম যে রামানন্দবাবুর 'বিবিধ প্রসঙ্গ' যতই উৎকৃষ্ট হোক না কেন, কিছুদিন

পরে বাসি হয়ে যায়। যা বাসি হয়ে যায় তা সাহিত্য নয়, সাংবাদিকতা। আমার জীবনে তাঁর এই মন্তব্য একটা দিকপরিবর্তন আনে। আমি স্থির করেছিলুম, চাকরি ছেড়ে দিয়ে রামানন্দবাবুর মতো সাংবাদিক হব ও নিবন্ধ লিখব। সে সংকল্প ত্যাগ করলুম। সরকারি চাকরিতে আপাতত বহাল থাকতে সম্মত হলুম। আমার জীবনে এই পরিবর্তনটি ঘটিয়ে রামানন্দবাবু মহা উপকার করলেন।

সময় পেলেই আমি গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতুম। নানা বিষয়ে আলোচনা করতুম। কুইট ইন্ডিয়া আন্দোলন যখন আরম্ভ হয় তার কিছুদিন পরে তিনি আমাকে বলেন, 'এর মধ্যে ভায়োলেন্স এসে পড়েছে। ইংরেজরা জানে কী করে ভায়োলেন্স দমন করতে হয়। নন-ভায়োলেন্স দমন করতে তারা জানে না। এই আন্দোলন ব্যর্থ হবে।' রামানন্দবাবু মাসের মধ্যে পনেরো দিন 'প্রবাসী'র জন্য কাজ করতেন আর পনেরো দিন 'মডর্ন রিভিয়্যু'র জন্য। 'প্রবাসী' বেরোত বাংলা মাসের প্রথম দিনে আর 'মডর্ন রিভিয়্যু' ইংরেজি মাসের প্রথম দিনে। তিনি কলকাতার বাইরে থাকতেন বলে এর ব্যতিক্রম হয়নি। অসাধারণ নিয়মনিষ্ঠ মানুষ ছিলেন। একদিন আমাকে বলেন, 'আমার একজিমা হয়েছে—বড় কষ্ট দিচ্ছে। কে একজন ঋষি নাকি এর জন্য তুষানলে দগ্ধ হয়েছিলেন।' আমার ইংরেজি বইটিতে আমি লিখেছিলুম রবীন্দ্রনাথের জীবন ছিল সুখের জীবন। রামানন্দবাবু বলেন,'না, না, আপনি জানেন না, তাঁর মতো দুঃখী মানুষ আর নেই।' আমাকে সেই লাইনটি ছাঁটতে হল।

কলকাতায় ফিরে গিয়ে তিনি আমাকে লম্বা চিঠি লিখেছিলেন। সে-চিঠির বয়ান আমি সম্পূর্ণ ভুলে গেছি। তাঁর নাতনি শ্যামশ্রী লাল সে চিঠিখানি আমার কাছ থেকে সংগ্রহ করে আমাকে তার নকল পাঠিয়ে দেন। সেটি কোথায় যে রয়েছে আমি বলতে পারছিনে। কিছুদিন পরে শুনি, তিনি আর নেই। আমি শুনে মর্মাহত হই। শুধু সম্পাদক হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন অসাধারণ। উপবীত ধারণ করলে সুবিধাভোগী হওয়া যায়। সেইজন্য তিনি যৌবনকালে উপবীত ত্যাগ করেন। চিঠির উত্তর যখন দিতেন, 'ইতি'-র পরে লিখতেন 'বিনীত নিবেদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়'। সাহিত্যিক রুচির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন পিউরিটান। আমাকে বলেন, 'প্রবাসী'-তে আপনাদের সকলের লেখা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু একজনের হয়নি।' আমি জানতে চাই, 'তিনি কে?' তিনি উত্তর দেন, 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়'।

গোপালদাস মজুমদার

গোপালদাস মজুমদারের সঙ্গে আমার পরিচয় অচিন্ত্যকুমারের বিবাহের বরযাত্রী রূপে। প্রথম আলাপেই তিনি আমাকে অনুরোধ করেন একখানি উপন্যাস দিতে। তাঁর সে অনুরোধ রাখতেই আমি 'আগুন নিয়ে খেলা' উপন্যাসটি লিখি। বইখানি সঙ্গে সঙ্গে ছাপা হয়ে যায়। ইতিমধ্যে লীলার সঙ্গে আমার পরিচয়, প্রেম ও পরিণয়ের সিদ্ধান্ত। গোপালদাসবাবু স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাকে 'আগুন নিয়ে খেলা'র প্রথম সংস্করণের জন্য আমার প্রাপ্য মিটিয়ে দেন। সে টাকা না পেলে আমার বিয়ের খরচায় টান পড়ত। ভাগ্যিস গোপালদাসবাবু

ছিলেন! 'আগুন নিয়ে খেলা' রাতারাতি লেখা ও ছাপা হয়েছিল। রাঁচিতে আমার বিবাহ-বাসরে গোপালবাবু ও অচিন্ত্যকুমার দুজনেই বরযাত্রী হয়েছিলেন। বিবাহ-সভায় ছিলেন স্বয়ং প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। তখনও লীলার বাংলা নামকরণ হয়নি, পরের দিন হয়।

কিছুদিন পরে গোপালদাসবাবু আমার কাছে আরও একখানি উপন্যাস চান। আমি বলি, 'ইতিমধ্যেই আমি সত্যাসত্য নামে পাঁচখণ্ডের একটি এপিক উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করে দিয়েছি। উপন্যাসটির বিষয় খুবই সিরিয়াস। ক-জনই বা কিনবে। আপনি যদি প্রকাশ করেন, আপনার লোকসান হবে।' তিনি বলেন, 'আমি রাজি আছি। আমার বিশ্বাস কিছু লোক নিশ্চয়ই কিনবে আর আমার খরচ উঠে আসবে।' তখনকার দিনে পাঁচখণ্ড দূরের কথা দুখণ্ডেরই প্রকাশক দুর্লভ ছিল। সুতরাং গোপালদাসবাবু আমাকে একটা মস্ত ভাবনা থেকে উদ্ধার করেন। আমার ধারণা ছিল, প্রত্যেক বছর এক খণ্ড বেরোবে, পাঁচ বছরেই পাঁচ খণ্ড লেখা শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আমার সরকারি কাজের চাপে আমি উপন্যাস লেখার জন্য যথেষ্ট সময় পাচ্ছিলাম না। পর পর দুখণ্ড বেরিয়ে যাবার পর গোপালদাস বললেন,'পাঠকরা বলছে আপনার লেখা তাদের কাছে দুর্বোধ্য। আপনি কি আর-একটু হালকা লেখা লিখতে পারেন না?' তাঁকে খুশি করার জন্যে তৃতীয় খণ্ড লিখি সিরিয়াসের সঙ্গে কমিক মিশিয়ে। কিন্তু পরে আমার অনুতাপ হয়। আমি বলি, 'আমার এ বই পুরোপুরি সিরিয়াস হলেই ভালো হত। আমি এখন থেকে আবার আমার পূর্ব সংকল্পে ফিরে যাব। আপনার কষ্ট হবে। কিন্তু বইখানা বাঁচবে।' চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড লেখার পরে দেখলুম, আরও একখণ্ড না লিখলে নয়। সে-কথা শুনে গোপালদাসবাবু অভয় দিলেন। বই শেষ করতে লেগে গেল বারো বছর। ততদিন গোপালবাবু ধৈর্য করে ছিলেন। আমাকে অবাক করে দিয়ে বললেন, 'আপনি আরও এক খণ্ড লিখুন। চাহিদা আছে।' কিন্তু আমি আর ওই বিয়োগান্ত কাহিনী বাড়াতে চাইনে। ওটা মিলনান্তক হবার নয়।

'সত্যাসত্য' লেখার অবসরে আমি আরও কয়েকটি বই লিখেছিলুম। গল্প উপন্যাস ও কবিতা। সেগুলি গোপালবাবু বিনা বাক্যে প্রকাশ করেন। লাভক্ষতি খতিয়ে না দেখে। এর পরেও তিনি আমার কাছে আরও লেখা চান। আরও লেখা দিই। যেখানে বদলি হই সেখানেও তিনি মাঝে মাঝে হাজির হন ও লেখা আদায় করেন। আমার ধারণা ছিল উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী বলে তাঁর কাছে আমার অত খাতির। অকালে অবসর নেওয়ার পরে সে খাতির থাকবে না। কিন্তু দেখা গেল, আমার খাতির কমল না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, আমার লেখার মর্যাদা একদিন সকলে মেনে নেবে। তা আমি সুধীরচন্দ্র সরকারের কাছে আগে থেকে দায়বদ্ধ ছিলুম। তৃতীয় কোনও প্রকাশককে বই দিতুম না। গোপালবাবুকে আমি নাটকও দিয়েছি। কিন্তু ভ্রমণকাহিনী দিইনি বলে তাঁর আক্ষেপ ছিল। সেজন্য তাঁকে 'চেনাশোনা' দিলুম। সেটা সুধীরবাবুকে দেবার কথা ছিল।

আমার দ্বিতীয় বৃহৎ উপন্যাসের নাম 'রত্ন ও শ্রীমতী' ভেবেছিলুম চার খণ্ডে সমাপ্ত হবে। গোপালবাবুও রাজি ছিলেন। কিন্তু দুই খণ্ড লেখার পরে মুশকিলে পড়লুম। একজন ইংরেজ পরিব্রাজক আমাকে বলেছিলেন, 'পর্বত আরোহণের সময় যখন দেখবেন আর এক-পা এগোলেই পতন ও মৃত্যু তখন যাত্রা থামাবেন।' তৃতীয় খণ্ড আরম্ভ করতে গিয়ে আমার কলম আর এগোতে চায় না। এমন কিছু বক্তব্য ছিল যা সরকারের দিক থেকে নয়,

পাবলিকের দিক থেকেও নয়, প্রিয়জনের দিক থেকে আপত্তিকর। কাহিনীটা একটু বদলে দিলেই লেখা তরতর করে এগোত। কিন্তু আমার মনে হল, সেটা অনুচিত। এরকম দ্বন্দ্ব কখনও আমার জীবনে আসেনি। সব কথা খুলে বললে প্রিয়জনের ক্ষতি, না বললে কাহিনীর ক্ষতি। যাহোক, আমি ঘোষণা করে দিলুম, 'রত্ন ও শ্রীমতী দুখণ্ডেই শেষ।' গোপালবাবু ঈষৎ ক্ষুণ্ণ। কিন্তু হাল ছেড়ে দিলেন না। বারবার তাড়া দিতে থাকলেন। প্রায় দশ বছর ধরে, আমার অন্তর্দ্বন্দ্ব আমাকে লিখতে দিচ্ছিল না। গোপালবাবুর দশা দেখে আমার মন আরও খারাপ হচ্ছিল। গান্ধীজির উপদেশ ছিল যা আরম্ভ করবে তা শেষ করবে। সেই উপদেশ স্মরণ করে আমি 'রত্ন ও শ্রীমতী' আবার লিখতে শুরু করি, কিন্তু তার আগে কাহিনীটা একটু বদলে দিই। চতুর্থ খণ্ড আর লেখা হয় না। তৃতীয় খণ্ডেই সমাপ্তি।

এর পরে গোপালদাসবাবু আরও একটা উপন্যাস চান। কিন্তু আমি তাঁকে কথা দিতে পারিনে। আমার ধারণা ছিল আমি মায়ের মতো মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বাঁচব। কিন্তু দেখলুম পঁচাত্তর বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচে আছি। তখন কপাল ঠুকে 'ক্রান্তদর্শী' আরম্ভ করে দিই। চার খণ্ডে শেষ হবার কথা। গোপালবাবু মহা খুশি। আমাকে প্রথম খণ্ডের জন্য কিছু অগ্রিম টাকা দিতেও ইচ্ছুক। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর নিজেরই আয়ু শেষ হয়ে এসেছিল। বিরানব্বই বছর বয়সে তিনি প্রয়াণ করেন। তাঁর ভাই অমূল্যগোপাল মজুমদার 'ক্রান্তদর্শী' প্রকাশের ভার নেন। অন্যান্য বই নিতেও তাঁর সমান আগ্রহ। গোপালদাসবাবু গেলেও তাঁর ডি. এম. লাইব্রেরীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ গেল না। অনেক দিন পর্যন্ত বজায় রইল।

গোপালদাসবাবু প্রথম জীবনে ছিলেন সন্ত্রাসবাদী। সেই সূত্রে বারীন্দ্রকুমার ঘোষের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ। বারীন্দ্র যখন 'বিজলী' নামক সাপ্তাহিক সম্পাদনা করেন তখন গোপালদাসবাবু তাঁর সহযোগী হন। আরেকজন সহযোগী ছিলেন বোধহয় বিধুভূষণ দে। দুজনে মিলে একটা আলমারি কিনে 'বিজলী' অফিসে রাখেন। দে-র 'ডি' এবং মজুমদারের 'এম' মিলে ডি. এম. লাইব্রেরী গঠিত হয়। প্রথমে সেটা ছিল একটা 'বিজলী' অফিসে রাখা আলমারি। উদ্দেশ্য ছিল শ্রীঅরবিন্দর অনুমতি নিয়ে কলকাতায় তাঁর গ্রন্থ বিক্রয়। কিছুদিন পরে একটি দোকান ঘর কিনে গোপালবাবু সেখানে যাবতীয় পুস্তক বিক্রয় শুরু করেন। তিনি হন দোকানের একমাত্র স্বত্বাধিকারী। পুস্তক বিক্রয় করতে করতে তিনি হয়ে ওঠেন পুস্তক প্রকাশক। কাজী নজরুল ইসলামের 'অগ্নিবীণা' দিয়ে প্রকাশনা শুরু। এক এক করে কাজীর অন্যান্য পুস্তক প্রকাশ করতে করতে তিনি 'কল্লোল' পত্রিকার গোষ্ঠীর সঙ্গেও যুক্ত হন। এবং অচিন্ত্য, প্রেমেন্দ্র প্রমুখ নবীন লেখকদের পুস্তক প্রকাশ করেন। তিনিই হন তাঁদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তাঁর ছোট্ট দোকানঘরটা হয় তাঁদের অবসর সময়ের আড্ডাঘর। পরে তিনি আরও বড় দোকানঘর ভাড়া নেন। একই কালে পুস্তক বিক্রেতা ও পুস্তক প্রকাশক রূপে প্রসিদ্ধ হন। তাঁর দীর্ঘজীবনের শেষের দিকে তাঁকে বলা হত প্রবাদপুরুষ। তাঁর আগে প্রবাদপুরুষ ছিলেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, যাঁর প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী—পরে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স।

'বিজলী'তে কাজ করার সময় তার পরবর্তী সম্পাদক শচীন সেনগুপ্ত গোপালবাবুকে পাঠাতেন প্রমথ চৌধুরীর বাস ভবনে। প্রত্যেক সপ্তাহে সমসাময়িক বিষয়ে নিবন্ধের জন্যে। বীরবলের লেখা ছিল 'বিজলী'র অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আমি সেই সময় 'বিজলী'র গ্রাহক হই।

তখন আমি কলেজের ছাত্র। কিছুদিন পরে 'বিজলী' উঠে যায়। বীরবলের জায়গায় একটি শূন্যতা রেখে যায়। ইতিমধ্যে গোপালবাবু পুস্তক বিক্রেতা রূপে স্বনির্ভর হয়েছিলেন। পরে পুস্তক প্রকাশক রূপে নবীন লেখকদের সহায় হন। উপরন্তু কাজী নজরুল ইসলামের ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ বন্ধু। কাজী সাহেব মোটরগাড়ি কেনার জন্য গোপালবাবুর কাছে টাকা চান, তার পরিবর্তে সমস্ত পুস্তকের কপিরাইট ডি. এম. লাইব্রেরীর নামে লিখে দেন। সেটাই হয় ডি. এম.-এর আয়ের প্রধান উৎস।

সুধীরচন্দ্র সরকার

সুধীরচন্দ্র সরকারের সঙ্গে আমার প্রথম সম্পর্ক 'মৌচাকে'র সম্পাদক রূপে। বিলেত থেকে আমি তাঁকে 'মৌচাকে'র জন্য ধারাবাহিক ভাবে 'ইউরোপের চিঠি' লিখে পাঠাতাম। সেটা কিশোর বয়সীদের জন্য। তা ছাড়া ছড়াও লিখতুম। যেমন 'ফগ কথাটার মানে সত্যি ক'জন জানে/জানতে যদি চাও লন্ডনমে আও।' তখনকার দিনে 'সন্দেশে'র পরে 'মৌচাক'ই ছিল ছেলেমেয়েদের সবচেয়ে প্রিয় পত্রিকা। সুধীরবাবু আমার লেখা সাদরে গ্রহণ করতেন। সম্পাদক থেকে তিনি ক্রমে প্রকাশক হন। বিলেত থেকে তাঁকে 'তারুণ্য' পাঠিয়ে দিই। আমি আংশিকভাবে প্রকাশের ব্যয় বহন করি। এরপরে পাঠিয়ে দিই 'রাখী'। আংশিক খরচ আবার বহন করি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যখন দেখা করতে যাই তখন একখানি 'রাখী' তাঁকে দিই। তিনি বলেন, 'এই নামটি তো আমার মনে ছিল। তুমি পেলে কোথায়?' তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কয়েকটি কবিতা সংশোধন করে দেন, কিছু-কিছু পালটেও দেন। বলেন, 'অমৃত-র' উচ্চারণ অম্‌রিত নয়, এই বলে তিনি আবার উচ্চারণ করলেন এমনভাবে যাতে 'ঋ' আর 'রি' রইল না। কাজেই ছন্দ ঠিক রাখার জন্য লাইনটি পালটাতে হল।

সুধীরবাবুর সঙ্গে যখন আবার দেখা হল তখন তিনি আমার কাছে একটি উপন্যাস চান। আমি ইতিমধ্যে উপেনবাবুর কাছ থেকে উপন্যাস লেখার প্রস্তাব পেয়েছিলুম। কিন্তু সুধীরবাবুর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে পারলুম না। 'অসমাপিকা' কোনও মাসিক পত্রে প্রকাশ না করে সোজাসুজি পুস্তকের আকারে প্রকাশ করতে দিলুম। পরকীয়া প্রেমের কাহিনী। সুধীরবাবু ইতস্তত করে বছরখানেক ফেলে রাখলেন। তাঁর নীতিবোধে বাধল। 'মৌচাকে'র জন্য একটা লেখার উল্লেখ করেছিলুম, আইল অব ওয়াইটে আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল এক বৃদ্ধ শকট চালকের, সে একটি তরুণীকে দেখে তার গালে একটি চুমু দিয়েছিল। ইউরোপীয় সমাজে ওটা একটা শিষ্টাচার। সুধীরবাবু 'মৌচাকে' প্রকাশ করলেন ঠিকই। তাঁর সঙ্গে আলাপের পর একদিন আমাকে বলেন, 'আপনার ওই লেখা পড়ে ছেলেমেয়েদের অভিভাবকরা আপত্তি জানিয়েছিলেন।' সুধীরবাবু ওটি ছেপে যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন, কিন্তু কুণ্ঠার সঙ্গে।

এরপর একদিন তিনি আমাকে বলেন, 'আপনি ছেলেদের জন্য একটি উপন্যাস লিখে মৌচাকে দিন। আমি আপনাকে একশো টাকা দেব।' ততদিনে আমি অতি ব্যস্ত মহকুমা হাকিম। 'পাহাড়ী' উপন্যাসখানা যত বড় হবে মনে করেছিলুম তত বড় হলো না, মাঝপথে দাঁড়ি টানলুম। সুধীরবাবু আমাকে পঞ্চাশ টাকা দিলেন। 'পাহাড়ী' পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন

তাঁরই প্রতিষ্ঠান থেকে, কিন্তু অনেক দেরিতে। এর কারণ এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্সের স্বত্বাধিকার নিয়ে ঘরোয়া বিবাদ চলছিল। সেটার নিষ্পত্তি হল এই ভাবে যে সুধীরবাবুর দাদা পেলেন আইনের বই প্রকাশ করার সম্পূর্ণ অধিকার আর সুধীরবাবুর ভাগে পড়ল গল্প, উপন্যাস, কবিতা প্রভৃতি প্রকাশের ভার। এর সঙ্গে তিনি জুড়ে দিলেন তাঁর নিজের সম্পাদিত হিন্দুস্থান ইয়ার বুক (Hindusthan Year Book)। সাহিত্যের চেয়ে সেটাই বেশি অর্থকরী। এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্সের Goodwill টা তিনি একাই পেলেন। দাদাদের প্রকাশন সংস্থার অন্য নাম।

ঘরোয়া বিবাদ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকায় বছর দশেক আমার বই তিনি চাননি, পানওনি। সে সময় আমার একমাত্র ভরসা গোপালদাস মজুমদার ও তাঁর ডি. এম. লাইব্রেরী। সুধীরবাবু এটা পছন্দ করেননি। দুই প্রকাশকের মধ্যে রেষারেষি ছিল। পরে যখন আমি তাঁকে বই দিতে আরম্ভ করি তখন আমাদের মধ্যে আবার সৌহার্দ্য হয়। তিনি আমাকে বলেন, 'আপনি গান্ধী সম্বন্ধে একখানি বই লিখুন।' ততদিনে মহাত্মাজীর মহাপ্রয়াণ হয়েছে। বললাম, 'আমি কি তাঁর মতো মহাপুরুষের জীবনী লেখার যোগ্য?' তিনি আমাকে অভয় দেন। উপন্যাসকার থেকে হয়ে উঠলুম জীবনীকার। এর পরে আমি যখন জাপান যাই, সুধীরবাবু বলেন, 'আপনি জাপান সম্বন্ধে একখানি বই লিখুন। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জাপান' পুরোনো হয়ে গেছে। বাজারে আর চলে না।' তাঁর অনুরোধে আমি 'জাপানে' নামক ভ্রমণকাহিনী লিখি। তার জন্য আমি সাহিত্য অকাদেমির পুরস্কার পাই।

ইতিমধ্যে সুধীরবাবু আমার অনেকগুলি ছড়ার বই প্রকাশ করেছেন। সবগুলোই ছেলেমেয়েদের জন্য ছড়া। যেমন 'রাঙা ধানের খৈ', 'ডালিম গাছে মৌ', আতাগাছে তোতা', 'রাঙা মাথায় চিরুনি'। শেষেরটা বোধহয় তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র সুপ্রিয় সরকারের আমলে প্রকাশিত। সুধীরবাবু আমাদের পি. ই. এন. এর একজন সম্মানিত সদস্য ছিলেন। পি. ই. এন.-এর বেঙ্গলি চ্যাপটার যখন ভেঙে যায় তখন তিনি কেন্দ্রীয় পি. ই. এন. ছেড়ে দেন কিনা মনে পড়ছে না, কিন্তু যখন ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্রাঞ্চ গড়ে ওঠে তখন তিনি আমাদের সঙ্গেই থাকেন, নরেন্দ্রদেব ও রাধারাণী দেবী হন যুগ্ম সম্পাদক। কয়েক বছর পরে ভারতীয় কেন্দ্রের নির্দেশে সম্পাদক পরিবর্তন করতে হয়। তখন আমরা সুধীরবাবুকে করে দিই সম্পাদক। তাঁর সম্পাদনায় পি. ই. এন. ভালোই চলছিল।

সুধীরবাবু প্রত্যেক বছর তাঁর নিজের উদযোগে একটি সাহিত্যিক অনুষ্ঠান প্রবর্তন করেন। তার জন্য প্রত্যেক বছর আমাকে শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় আসতে হত। একবার সেই অনুষ্ঠানে আমি প্রস্তাব করি, বেসরকারি উদযোগে বাংলা সাহিত্যের জন্য কয়েকটি পুরস্কার দেওয়া হোক। আমার এ প্রস্তাবে অমৃতবাজার ও যুগান্তর পত্রিকার তরফ থেকে তুষারকান্তি ঘোষ দুটি পুরস্কার দিতে রাজি হন, অশোককুমার সরকার আনন্দবাজার ও দেশ পত্রিকার তরফ থেকে আরও দুটি পুরস্কার দিতে রাজি হন, সুধীরচন্দ্র সরকার দিতে রাজি হন মৌচাকের তরফ থেকে কিশোরদের জন্য সাহিত্যের উপর একটি পুরস্কার, এ ছাড়া উল্টোরথ পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক আরও একটি পুরস্কার দিতে রাজি হন। মোট প্রায় পাঁচ হাজার টাকার পুরস্কার প্রবর্তিত হয়। বার্ষিক অনুষ্ঠানের যাবতীয় ব্যয় সুধীরবাবু বহন করতেন। অতিথিরা সকলে প্রীতিভোজনের দ্বারা আপ্যায়িত হতেন। অমন একজন সৎ প্রকাশক দুর্লভ। তাঁর দোকানে রোজ বিকেলে আড্ডা বসত। বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক যোগ

দিতেন। কলকাতায় এলে, আমিও। এছাড়া তিনি প্রতি রবিবার বন্ধুদের বাড়িতে আড্ডা দিতে যেতেন। আড্ডাই ছিল তাঁর প্রাণ। পরিণত বয়সেই তাঁর মৃত্যু হয়।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতে অনুষ্ঠিত আই. সি. এস. প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান অধিকার করে আমি যখন বিলেত যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি তখন একদিন পাটনা কলেজের বন্ধু কৃপানাথ মিশ্র আমাকে চিঠি লিখে জানাল যে কলকাতা থেকে 'বিচিত্রা' নামে নতুন একটি বাংলা মাসিক-পত্র বেরোচ্ছে, তার সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কৃপানাথের চেনা। সে তাঁকে আমার কথা বলেছে। তিনি আমার লেখা দেখতে চান। তখন আমি তাড়াতাড়ি একটি প্রবন্ধ লিখে তাঁকে পাঠিয়ে দিই। 'রক্তকরবীর তিনজন' নামে সেটি 'বিচিত্রা'র দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সম্পাদক আমার আরও লেখা চান। আমি বলি, 'আমি বিলেত যাচ্ছি, সেখান থেকে ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনী পাঠাব। যদি তিনি ছাপতে রাজি হন।' তিনি রাজি হলেন। আমিও শুরু করে দিলুম 'পথেপ্রবাসে'।

দু'বছর ধরে 'পথেপ্রবাসে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। ইতিমধ্যে আমি লন্ডনে গিয়ে অধ্যাপক সরোজকুমার দাস ও তার পত্নী তটিনী দাসের সঙ্গে শেয়ার করে একটি স্বতন্ত্র বাড়িতে থাকি। আমার পাশের ঘরে থাকত আমার সতীর্থ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। বেশ আনন্দেই ছিলুম আমরা। একদিন এক বিভ্রাট ঘটে। আমার ঘরের লাগোয়া একটি ছোট ঘর ছিল। তাতে থাকত দাস দম্পতির শিশুপুত্রের ইংরেজ নার্স। অবাধ্যতা করায় দাস-দম্পতি তাকে বিদায় করে দেন। যাবার সময় সে শাসায়, সেও তাঁদের বিরুদ্ধে নালিশ করবে। সবাই জানত যে নার্স চলে গেছে, অথচ ঘর খুলতে গিয়ে দেখা গেল যে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ।

তবে কি নার্স ফিরে এসে ঘরে ঢুকে আত্মহত্যা করেছে? দাসেরা ভীষণ উদ্বিগ্ন। তাঁদের এক ইংরেজ বন্ধু পুলিশ ডেকে আনলেন। পুলিশ কনস্টেবল আমার ঘরে ঢুকে রাস্তার দিকে জানলা দিয়ে বেরিয়ে লাফ দিয়ে নার্সের ঘরের জানলা দিয়ে ঢুকলেন। অবাক কাণ্ড! নার্স ও-ঘরে নেই। তাহলে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করল কে?

এই নিয়ে আমি একটা নাটক লিখে ফেললুম। সেটি পাঠিয়ে দিলুম 'বিচিত্রা' সম্পাদকের কাছে। তাতে দাস দম্পতির অন্য নাম দিয়েছিলুম। দাসকে বলেছিলুম ভেটেনারি ডাক্তার। অথচ তিনি দর্শনের অধ্যাপক। খবরটা তাঁর কাছে ফাঁস করতেই তিনি কম্পমান কণ্ঠে বললেন, 'সর্বনাশ করেছ। সবাই চিনতে পারবে। ভাববে, আমিই নার্সকে তাড়িয়েছি, যদিও আমার নাম তুমি লেখোনি।' তিনি আমায় একটি টাকা দিয়ে বললেন, 'যাও, একখুনি টেলিগ্রাম করো সম্পাদককে ছাপা বন্ধ করতে।' আমি তৎক্ষণাৎ গিয়ে টেলিগ্রাম করলুম। দেশে ফেরার পরে জানতে পেলুম, লেখাটি ছাপা হয়েছিল ঠিক। কিন্তু আমার টেলিগ্রাম পাবার পরে প্রকাশ বন্ধ হল। সম্পাদক আমাকে সেই মুদ্রিত ফাইল দেখালেন।

'পথে প্রবাসে' আমার দেশে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যায়। তখন উপেন্দ্রনাথ

আমাকে বলেন, 'এইবার তুমি আমাকে একটা উপন্যাস দাও।' আমি বললুম, 'উপন্যাস কি আমার দ্বারা হবে? কখনো তো লিখিনি।' তিনি বললেন, 'অবশ্যই হবে। যে ময়রার ভিয়ানে সন্দেশ হয় সেই ময়রার ভিয়ানে রসগোল্লাও হয়।' তখন তিনি আমাকে উপন্যাস রচনার কয়েকটি সূত্র শিখিয়ে দিলেন। তার মধ্যে একটা সূত্র ছিল—'কাহিনীটার সব কিছু খুলে বলবে না, সব সময় কিছু হাতে রেখে দেবে।' আমি আমার কর্মস্থল বহরমপুরে গিয়ে 'সত্যাসত্য' আরম্ভ করে দিলুম। 'বিচিত্রা'য় সেটা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। কিন্তু আমি নিজেই ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারিনে। 'বিচিত্রা'ও বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। উপেনবাবুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক তখনকার মতো চুকে যায়। কিন্তু আমার প্রতি তাঁর স্নেহ বজায় থাকে।

অনেককাল পরে তিনি আমাকে চিঠি লিখে জানান যে 'গল্পভারতী' সম্পাদনার ভার তাঁর উপর পড়েছে। আমি যেন তাঁকে আগের মতো লেখা পাঠাই। পাঠিয়েছিলুম কয়েকবার কিছু লেখা। ইতিমধ্যে আমি চাকরি থেকে অকালে অবসর নিয়েছি। নেওয়ার আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করে বলেছি, 'অবসর নেওয়ার কথা ভাবছি। কিন্তু এই মুহূর্তে নিতে পারছিনে। দেশের অবস্থা একটু শান্ত হোক।' তখন তিনি বলেন, 'তুমি কি ভাবছ দেশের অবস্থা সহজে শান্ত হবে?' এই বলে তিনি একটি সংস্কৃত শ্লোক শোনালেন। শ্লোকটি ঠিক মনে পড়ছে না, কতকটা এই রকম হবে, মিচ্ছন্তি শান্তে সমুদ্রসলিলে স্নাতুমিচ্ছন্তি দুর্মতিঃ। এর পরে একবার তার সঙ্গে দেখা করতে গেছি। তিনি কোথায় যেন নিমন্ত্রিত হয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু শরীর অশক্ত। হৃদরোগ অ্যানজাইন হয়েছে। রহস্য করে বললেন, 'অঞ্জনা দেবীকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।' কিছুদিন পর শুনলুম, তিনি আর নেই।

উপেন্দ্রনাথ শুধু যে সম্পাদক ছিলেন তা-ই নয়, তিনি ছিলেন একজন ঔপন্যাসিক। অনেক উপন্যাস লিখেছেন, ছোটগল্পও লিখেছেন। তিনি ছিলেন শরৎচন্দ্রের মাতুলবংশের ভাগলপুরের বাসিন্দা। আমার বন্ধু কৃপানাথ তাঁর ভাগলপুরের বাড়ির প্রতিবেশী এবং স্নেহের পাত্র। আমার বন্ধুভাগ্য থেকেই আমার সম্পাদক-ভাগ্য।

কিন্তু উপেনবাবুর ধারণা ছিল অন্যরকম। তাঁর এক ভাইঝির নাম ছিল নির্মলা দেবী। বিলেত যাবার সময় কটক থেকে কলকাতা যাবার পথ বন্যার জন্য বন্ধ হয়ে যায়। তাই আমাকে কটক থেকে মাদ্রাজ মেল ধরে দক্ষিণমুখে বেজোয়াড়া যেতে হয়। বেজোয়াড়া থেকে ট্রেন বদল করে নিজামের রেলপথে নিজামরাজ্য পার হতে হয়। তারপর আবার ট্রেন বদল করে যেতে হয় বম্বে। মাদ্রাজ মেলে আমার কামরায় আমিই একমাত্র যাত্রী। ট্রেনে উঠতে যাচ্ছি, কটকের এক বন্ধু এসে বললেন, 'আমার বৌদিও এই ট্রেনে যাচ্ছেন। তিনি অনেক ঘুরে কলকাতায় যাবেন। আপনি তাঁকে একটু দেখবেন।' তাঁর বৌদিদি কটকের বিখ্যাত উকিলের পত্নী, পরবর্তীকালে তাঁর স্বামী হাইকোর্টের জজ হন। নির্মলা দেবীর তখন অসহায় অবস্থা। সঙ্গে একটি লোক ছিল। সে বসল অন্য এক কামরায়। আমাদের কামরা প্রায় ফাঁকা। আমি নির্মলা দেবীকে দেখাশুনো করব কী, তিনিই আমার দেখাশুনো করেন। যাত্রার আগে হঠাৎ আমার উদরাময় হয়। আমার সঙ্গে মাত্র এক বোতল ঘোল। সেটা এক অদ্ভুত রেলযাত্রা। আমার ভাগ্য ভালো যে আমি একজন সহযাত্রিনী পাই। তিনি আমার চেয়ে বয়সে বড়। আমি তাঁকে দিদি বলি। দিদির দুর্ভাবনার অন্ত নেই। সত্যিই কি তিনি কলকাতায় পৌঁছতে পারবেন! তিনি সেকেন্দ্রাবাদে নেমে গেলেন। ট্রেন বদল করে মানমদ যাবেন। সেখান থেকে আবার ট্রেন বদল করে কলকাতা। আমি যে একজন লেখক দিদি

সেটা জানতেন না। জানবার কথাও নয়। কিন্তু উপেনবাবু ধারণা, দিদিই তার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। কৃপানাথের কথা ভুলে যান। কোথাকার জল কোথায় গড়ায়!

'বিচিত্রা'য় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় একই কালে রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ', বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' ও আমার 'পথে প্রবাসে'। সেই সূত্রে গুরুদেব জানতে পান আমার আর বিভূতিভূষণের পরিচয়। তিনি নাকি একদিন উপেন্দ্রনাথকে বলেন, 'বাংলাসাহিত্যে তুমি দুজন নতুন লেখককে নিয়ে এলে।' পরবর্তী কালে যখন আবার তাঁর সঙ্গে দেখা হয় তখন তিনি আমাকে বলেন,'তোমার পথে প্রবাসে তুমি ইংরেজিতে তর্জমা করছ না কেন?'

'পথে প্রবাসে'র ধারাবাহিক প্রকাশ সমাপ্ত হলে উপেন্দ্রনাথ বলেন, 'আমরা একটি পুস্তক প্রকাশ-ঘর স্থাপন করতে যাচ্ছি। তোমার "পথে প্রবাসে" আমরা পুস্তকাকারে প্রকাশ করব, যদি রাজি হও।' আমি কৃতার্থ হয়ে যাই। কিছুদিন পরে তিনি নিজেই বলেন, 'পুস্তক প্রকাশ করা সম্ভব হল না। 'পথেপ্রবাসে' ছাপা কয়েক ফর্মা পর্যন্ত হয়েছে। এটা আমি এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্সের সুধীরচন্দ্র সরকারকে দিচ্ছি। বাকিটা তিনি ছেপে প্রকাশ করবেন। তোমার আপত্তি নেই তো?' আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিই। সুধীরবাবু ইতিমধ্যে আমার 'তারুণ্য' বইখানি প্রকাশ করেছিলেন। তিনিই আমার আদি প্রকাশক। ভালোই তো হল। এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স বনেদি প্রকাশক। আমার সৌভাগ্য। আবার বলি, কোথাকার জল কোথায় গড়ায়!

গুরুসদয় দত্ত

গুরুসদয় দত্তকে আমি প্রথম দেখি ১৯২৮ সালে লন্ডনের বাঙালি সভায়। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল বাঙালির জাতীয়তাবাদ। তাঁর বক্তৃতার শেষে আমাকে কিছু বলতে বলা হয়। আমি বলি, জাতীয়তাবাদ যথেষ্ট নয়, চাই আন্তর্জাতিকতাবাদ। দত্তসাহেব ক্ষিপ্ত হয়ে বলেন, আমি চললুম। এই বলে তিনি সভা ছেড়ে চলতে উদ্যত। আমি খুবই অপ্রতিভ হলুম। নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার তাঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করলেন। তাঁর পরে একদিন আমি আমার এক বন্ধুকে নিয়ে তাঁর হোটেলে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তখন তিনি আমাদের সাদরে আপ্যায়ন করলেন। মানুষটি ক্ষণে রুষ্ট, ক্ষণে তুষ্ট।

দেশে ফিরে আসার পরে আমি ১৯৩১ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে যাই। সেদিন একজনের বাসায় বসে আমি গল্প করছি। এমন সময় আমি দেখি সামনের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন বীরভূমের কালেক্টার গুরুসদয় দত্ত। পায়ে হেঁটে একখানি কাগজ বিলি করতে করতে। আমাকে দেখে আমার হাতে একখানি কাগজ ধরিয়ে দিলেন। তাতে মুদ্রিত ছিল, 'ওহে রবি, আমরা তোমায় অস্ত যেতে দেব না।' তার নিচে যা ছিল সেটি বোধ হয় একটি পদ্য। স্বরচিত। সেসময় তিনি জেলা শাসক নন, আমাদেরই মতো একজন রবীন্দ্রভক্ত।

এর চার বছর বাদে আমি যখন কুষ্টিয়ার মহকুমা হাকিম তখন একদিন সন্ধ্যাবেলা আমার বাসভবনে উপস্থিত হন, প্রাদেশিক সরকারের অন্যতম সেক্রেটারি গুরুসদয় দত্ত।

তাঁর পরনে প্যান্ট-কোট নয়, ধুতি-পাঞ্জাবি। ধুতিটিও মালকোঁচা মারা। তিনি তখন ব্রতচারী আন্দোলনের গুরু। আমাকেও ব্রতচারী দীক্ষা দেন। ব্রতচারীর কয়েকটি বাঁধা পণ স্বীকার করতে হয়। পণগুলির নমুনা, 'কোঁচা দুলাইয়া চলিব না। খিচুরি ভাষা বলিব না।' আমি মালকোঁচা মারিনে, কিন্তু কোঁচাকে কোমরে গুঁজে দিই। আমার বাবা যেমন করতেন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবু যেমন করেন। কিন্তু কোঁচা দোলানো ছিল ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের অভ্যেস। সেটা আমি লক্ষ করি যখন জুডিসিয়াল সেক্রেটারি হয়ে মহাকরণে যাই।

'কোঁচা দুলাইয়া চলিব না'-র পরে ছিল 'খিচুরি ভাষা বলিব না।'

সেই পণ আমি মানতে পারিনি। মানতে গেলে প্রত্যেকটি ইংরেজি শব্দের বাংলা অনুবাদ করতে হয়। এমনই আরও অনেকগুলি মানা ছিল, এখন সব মনে পড়ছে না। ব্রতচারীর আদর্শ ছিল কৃত্য আর নৃত্য। কৃত্যের নমুনা, 'এসো কোদাল চালাই, ছেড়ে মানের বালাই, পেটের খিদের জ্বালায়, খাব ক্ষীর আর মালাই।' তেমনই আর-একটি নমুনা, 'আয় কচুরি নাশি, ওই রাক্ষসী যে বাংলাদেশের দিচ্ছে পরান গ্রাসি।' স্মৃতি থেকে বলছি। হয়তো কিছু ভুল থাকতে পারে।

বীরভূমে থাকতে রায়বেঁশে নাচ দত্তসাহেব পুনরুদ্ধার করেছিলেন। এককালে ওটা ছিল মল্লদের মল্লনৃত্য। সেই মল্লরা আর নেই, সেই নৃত্যও আর নেই। এখন যেটুকু আছে সেটুকু আছে নিম্নবর্গের মধ্যে। ওর নাম কেন যে রায়বেঁশে হল তা বলা যায় না।

কুষ্টিয়ায় একদিন কয়েকজন ছাত্র ব্রতচারীদের নিয়ে একটি আসর হল। তাতে রায়বেঁশে নাচ নেচে দেখান স্বয়ং ব্রহ্মচারী-গুরু। আমাকেও আসরে নামতে হয় নাচে যোগ দিতে। ছাত্রদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ লক্ষ করলুম। তাদের মধ্যে হিন্দুও ছিল মুসলমানও ছিল। ব্রতচারীদের জন্য প্রার্থনার ভাষায় শোনা যেত 'ভগবান হে খোদাতালা হে'। ব্রতচারী অন্দোলনের পরিচালকদের মধ্যে দু-একজন মুসলমানও ছিলেন। আন্দোলনটি সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক, কিন্তু পুরোপুরি বাঙালি।

নদীয়ার জেলা শাসক হিসেবে আমাকে একদিন যেতে হয়েছিল কলকাতার মহাকরণে। সেখানে দত্তসাহেবের সঙ্গে বারান্দায় দু-একটি কথা হয়। তাঁর মুখে শুনি বাংলার গভর্নর স্যার জন অ্যান্ডার্সন ব্রতচারীর সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। বয়েজ স্কাউট-এর সঙ্গে তুলনা করে স্যার জন বলেন সেটা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের আন্দোলন আর এটা স্বদেশীদের। তিনি নাকি দত্তসাহেবকে বলেছিলেন, 'আপনাকে কমিশনার পদ না দেওয়ায় আপনি কি খুব দুঃখিত?' দত্ত নাকি উত্তর দেন, 'একটুও না। কমিশনারের পদ তো একটা পোস্টাপিস। এই আমি বেশ ভালো আছি—স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছি।'

সে সময় তিনি প্রসঙ্গক্রমে আমাকে বলেন, 'কিছুদিন পরে অবসর নিয়ে আমি একটা যাত্রার দল গড়ব। সেই দল নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরব।' তাঁর অবসরের বেশি দেরি ছিল না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অবসরের অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। যাত্রার দল আর গড়া হল না।

কিন্তু যা তিনি গড়েছিলেন তার একটি ছিল সরোজনলিনী নারী কল্যাণ সমিতি। তার মুখপত্র ছিল 'বঙ্গলক্ষ্মী' নামক মাসিক পত্র। তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিকে জীবিত রাখার জন্য শোকসন্তপ্ত স্বামীর এই উদ্‌যোগ। কে যেন আমাকে বলেছিল যে গুরুসদয় যখন খেতে বসতেন তখন তাঁর খাবার টেবিলে আর-একজনের খাবার পরিবেশন করা হত। তিনি [illegible] সরোজনলিনী, যদিও অশরীরী।

স্ত্রীর নামে এমনই একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে আর কোনও আই. সি. এস.-কে দেখিনি। ব্রতচারীর মতো আন্দোলন আর কোনও আই. সি. এস. প্রতিষ্ঠা করেননি। রায়বেঁশের মতো একটি লুপ্ত নৃত্য পুনরুদ্ধার আর কারও দ্বারা হয়নি। এছাড়া তিনি সংগ্রহ করেছিলেন নকশিকাঁথার মতো অনেক গ্রাম্যশিল্প। সেসব জিনিস নিয়ে ঠাকুরপুকুরে একটি সংগ্রহশালা আছে। তাঁর এইসব কীর্তির জন্য তাঁর বাড়ির রাস্তা স্টোর রোডের নতুন নামকরণ হয়েছে গুরুসদয় দত্ত রোড। রমেশচন্দ্র দত্তের পরে আর কোনও বাঙালি আই. সি. এস.কে গুণমুগ্ধ দেশবাসী এমনভাবে স্মরণীয় করেনি। সরকার তাঁকে তাঁর প্রাপ্য পদ থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। দেশবাসী তার ক্ষতিপূরণ করেন উচ্চতর সম্মান দিয়ে। 'সেই ধন্য নরকুলে লোকে যারে নাহি ভুলে।'

অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী

ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, ডক্টর সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। এঁরা অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। অসহযোগ আন্দোলন যখন স্থগিত রাখা হয় তখন এঁরা কারাগার থেকে ফিরলেও আর ঘরে ফেরেন না, বিয়ে করেন না, জীবিকার জন্যে চাকরি খোঁজেন না, কুমিল্লায় গিয়ে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। গান্ধীজি সেই আশ্রমের নাম রাখেন অভয় আশ্রম। সব কিছুর আগে চাই 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ সেথা শির'। আশ্রমের কাজে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেও এঁদের লক্ষ্য ছিল স্বরাজ অর্জন ও তার জন্য কারাবরণ। এরপরে যখন লবণ সত্যাগ্রহের ডাক আসে তখন এঁরাই তিন বন্ধু কুমিল্লা ছেড়ে মেদিনীপুর জেলার সমুদ্রোপকূলে যান ও লবণ আইন ভঙ্গ করে লবণ তৈরি করেন। ফলে হয় কারাবাস। কারামুক্তির পর অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী কর্মোপলক্ষে বাঁকুড়ায় আসেন। আমি সেসময় সস্ত্রীক বাঁকুড়া সদরে। চৌধুরী মহাশয় একদিন আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে আসেন। তাঁর নিবাস মেদিনীপুর জেলার ক্ষীরপাই গ্রামে, চন্দ্রকোণার কাছে। বস্ত্র ব্যবসার জন্য স্থানটি বিখ্যাত। সেই ব্যবসা করতে এঁর পূর্বপুরুষ লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরী কটকে যান। কটক শহরের চৌধুরী বাজার উক্ত চৌধুরী মহাশয়ের পদবী বহন করে। চৌধুরী বাজার দিয়ে আমি চলাফেরা করতুম, যখন ছাত্র হিসাবে কটকে ছিলুম। অন্নদাবাবুর ভাই বরদাবাবু পৈতৃক ব্যবসা ত্যাগ করলেও খাদির কাজে কটকেই বসবাস করেন। অন্নদাবাবুও খদ্দরধারী। যতদূর মনে পড়ে তাঁর পরনের ফতুয়াটি তাঁরই হাতে কাটা সুতো দ্বারা তৈরি।

তিনি আমার কাছে কিছু চাননি, তবে তিনি জানতেন আমিও একজন গান্ধীভক্ত ও সরকারি কর্মচারী হয়েও খদ্দরধারী। তফাতটা এই যে আমি জেলে যাইনে, জেলে পাঠাই।

আমার বদলির চাকরি। আমি বদলি হতে হতে আটবছর বাদে উনচল্লিশ সালে কুমিল্লায় নিযুক্ত হই। সেখানে আবার অন্নদাবাবুর সঙ্গে দেখা। তিনি আমাকে একদিন ডেকে নিয়ে যান তাঁর সঙ্গে অদূরে একটি গ্রামে। সেখানে কয়েকঘর তাঁতি চরকার সুতো দিয়ে কাপড় বোনে। অন্নদাবাবুর মুখে শুনলুম, গান্ধীজির নির্দেশ—খদ্দর বুনে তাঁতিরা যেন দিনে অন্তত আটআনা রোজগার করে। তখনকার দিনে আটআনাও অকিঞ্চিৎকর নয়। তবু

তাঁতিদের তাতে পোষায় না। তারা খদ্দর পরে না, নিজেরা মিলের কাপড় কিনে পরে। গান্ধীজির নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা কঠিন ব্যাপার।

একদিন অন্নদাবাবু বলেন, 'গান্ধীজি প্রফুল্লবাবুর গ্রাম মালিকান্দায় আসছেন। সেখানে গান্ধী সেবা সঙ্ঘের অধিবেশন।' অন্নদাবাবুও সেখানে যাচ্ছেন। আমি যদি গান্ধীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই তবে আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবেন। আমি একই দিনেই ফিরে আসতে পারব। আমি রাজি হয়ে যাই। পরের দিন বোধহয় ছুটি ছিল। কোর্ট কামাই করতে হল না। রাত বারোটার ট্রেনে উঠে চাঁদপুর যাত্রা। ভোরবেলার স্টিমারে চড়ে মালিকান্দায় অবতরণ। গান্ধীজির সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য পনেরো মিনিট সময় ধার্য ছিল। গান্ধীজিকে আমি আমার পুত্রশোকের কথা জানিয়ে সান্ত্বনা প্রত্যাশা করি। তাঁর চোখ ছলছল করে ওঠে। তিনি কাতর কণ্ঠে বলেন, 'Can any one help?' আমি বুঝতে পারি, এই শোক সান্ত্বনার অতীত। অন্নদাবাবু গান্ধীজিকে বলেন, 'ইনি চাকরি ছেড়ে দেশের কাজ করতে চান।' গান্ধীজি জিজ্ঞাসা করেন আমার পদের নাম। আমি বলি,'অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জাজ।' তিনি ওই পদের পুনরাবৃত্তি করে নীরব হন। আমি আর কথা বাড়াইনে, প্রণাম করে বিদায় নিই। বিদায়কালে বলি, 'মহাত্মাজি, আপনি ফেডারেশনটা করে দিয়ে যান।' কথাটা বোকার মতো হল। যেন তার পরে তাঁর আর বেঁচে থাকার দরকার নেই। পরে আমি এর জন্য অনুতাপ করেছি।

অন্নদাবাবুর সঙ্গে আবার দেখা কুইট ইন্ডিয়া আন্দোলনের সময়ে কলকাতায় ব্ল্যাকআউটের অন্ধকারে বালিগঞ্জের রাস্তায় গা ঢাকা দিয়ে। পাইচারি করতে করতে তিনি বলেন, তিনি কলকাতায় বসে আসামের আন্দোলন পরিচালনা করছেন। সেখানকার কর্মীরা টেলিগ্রাফের তার কাটছে, রেলের লাইন উপড়ে ফেলছে, মোটরের পথের পুল ভেঙে ফেলছে। উদ্দেশ্য—সৈন্য চলাচল বন্ধ করা। ব্রিটিশ সৈন্য যেতে পারবে না, জাপানী সৈন্যও আসতে পারবে না। মাঝখানে কংগ্রেস রাজত্ব। স্বাধীন সরকার।

আমি বলি, এই পন্থাকে কি অহিংস পন্থা বলতে পারা যায়? তিনি উত্তর দেন, 'কেন নয়? আমরা তো মানুষ মারছিনে। আমরা সম্পত্তি ধ্বংস করছি। সেসব আমাদেরই সম্পত্তি। পরে আমরাই পুনর্নির্মাণ করব।' আমি আর তর্ক করিনে। কিছুদিন পরে শুনি, মেদিনীপুরে গেলে তাঁর মাথার দাম পাঁচ হাজার টাকা। তাঁকে লুকিয়ে থাকতে হয়।

কয়েক বছর বাদে উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালের শেষ প্রান্তে আমি যখন সিউড়িতে ডিস্ট্রিক্ট জাজ তখন অন্নদাবাবু একদিন উপস্থিত। তিনি বলেন, 'গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করতে চান তো শান্তিনিকেতন চলুন। আপনার জন্য তিনি পনেরো মিনিট সময় ধার্য করেছেন।' সেদিনটা বোধ হয় ছুটির দিন। আমি তৎক্ষণাৎ মোটরে উঠে বসি। পথে দেখা হয় মুনসেফ বিপুল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। গান্ধীদর্শনে যাচ্ছি শুনে তিনিও আমার সঙ্গী হন। শান্তিনিকেতনে পৌঁছে দেখি, রথীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে আছেন শ্যামলী কুটিরের সামনে। গান্ধীজি গেছেন এন্ডরুজ পল্লীতে বিনয় ভবন উদ্বোধন করতে। তিনি পায়ে হেঁটেই গেছেন, পায়ে হেঁটেই ফিরবেন। গুরুদেবের আশ্রমে তিনি মোটরে চড়বেন না। তিনি যখন ফিরলেন তখন প্রার্থনার সময় আসন্ন। আমাকে পনেরো মিনিট সময় দেওয়া দূরের কথা, পাঁচ মিনিটও দিতে পারলেন না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা হল। আমি বললুম, 'মহাত্মাজি, বাংলার দুর্ভিক্ষটা মানুষের তৈরি। বিশেষ করে দায়ী কলকাতার বাবুরা।' তখন তিনি বলেন, 'আমিও শুনেছি কারও কারও মুখে। আজ আমার সময় নেই। আমি যাচ্ছি কলকাতায়। তুমি সেখানে আমার

সঙ্গে দেখা কোরো।' আমার বদলির হুকুম হয়েছিল। আমি ময়মনসিংহের পথে কলকাতায় থেমে গান্ধীজির সাক্ষাৎপ্রার্থী হই। তিনি উঠেছিলেন সোদপুরে সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের আশ্রমে। আর আমি মণীন্দ্রলাল বসুর বাসভবনে পার্কসার্কাসে। টেলিফোনের উত্তরে রাজকুমারী অমৃত কউর জানান, আমাকে হাঁটতে হবে বাপুর সঙ্গে ভোরবেলায় তাঁর প্রাতঃভ্রমণের সময়। সেটা জানুয়ারি মাসের গোড়ার দিক। পার্কসার্কাস থেকে সোদপুর যেতে হলে রাত থাকতে উঠতে হবে। আমি শীতে কাতর। সুতরাং সে যাত্রায় গান্ধীদর্শন হল না। পরেও আর হয়নি।

এর পর জিন্নাসাহেবের ডাইরেক্ট অ্যাকশন। সেটাও এক প্রকার কুইট ইন্ডিয়া আন্দোলন। লিগপন্থী মুসলমানরা ইন্ডিয়া কুইট করে পাকিস্তানে গেলেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গকে পাকিস্তানে টেনে নিয়ে যেতে পারলেন না। পশিচমবঙ্গে একটি ছায়া মন্ত্রী-সভা গঠিত হয়। গান্ধীজি কলকাতায় এসে সুহরাবর্দি সাহেবের সহযোগিতা নিয়ে দাঙ্গা নিবারণ করেন। দেশ স্বাধীন হয়। একই কালে দ্বিধাবিভক্ত। আমি কলকাতায় নিযুক্ত হই। ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষের মন্ত্রীসভায় সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় থাকেন। বাদ পড়েন অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী। কিছুদিন পরে মন্ত্রী-সভা পুনর্গঠিত হয়। অন্নদাবাবুকে করা হয় অর্থমন্ত্রী। ইতিমধ্যে তিনি প্রৌঢ় বয়সে এক প্রৌঢ়া মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন। তিনি এক ব্রাহ্ম অধ্যাপিকা। একদিন তাঁদের দুজনের সঙ্গে আমাদের দুজনের আলাপ হয়।

কিছুদিন পরে অন্নদাবাবু আমাকে বলেন,'আমি যে-বাজেট তৈরি করেছি সেটা নলিনী রঞ্জন সরকার মহাশয়কে দেখিয়েছি। তিনি সমর্থন করেছেন।' এর কিছুদিন পরে অন্নদাবাবুর সঙ্গে আবার দেখা। বললেন,'আমরা পদত্যাগ করছি। ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করবেন।'

এর পরে ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও তাঁর বন্ধুরা পাকিস্তানগামী মৌলানা আকরম খানের কাছ থেকে 'আজাদ' পত্রিকার প্রেস ও বাড়ি কিনে নিয়ে 'লোকসেবক' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হন অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী। অভয় আশ্রমের কর্মীরা কুমিল্লা ত্যাগ করে চলে এসেছিলেন। তাঁদের কয়েকজনকে 'লোকসেবক' পত্রিকায় কর্ম দেওয়া হয়। একদিন অন্নদাবাবু বললেন,'আমরা বিজ্ঞাপন পাচ্ছি না। ডক্টর রায় বিজ্ঞাপন দাতাদের ডেকে বারণ করে দিয়েছেন আমাদের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে। কাগজ কী করে চলবে বোঝা যাচ্ছে না।' বলা বাহুল্য 'লোকসেবক' ছিল ডক্টর রায়ের উপদলের বিরোধীপক্ষ। কংগ্রেস তখন দু-দলে বিভক্ত। অন্নদাবাবুরা মাইনরিটি। রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁদের দুর্বল অবস্থা। অন্নদাবাবু এটা স্বীকার করেন। কিছুদিন পরে কাগজটা উঠে যায়। তিনি কলকাতা ছেড়ে তার স্বগ্রাম ক্ষীরপাইয়ে চলে যান। স্ত্রী থাকেন কলকাতায় তাঁর চাকরি নিয়ে। কলকাতা ছাড়ার আগে অন্নদাবাবু আমার সঙ্গে দেখা করেন। বলেন, 'আমি এক গান্ধীভক্ত মাড়োয়ারির কাছ থেকে ষোল হাজার টাকা সংগ্রহ করেছি। তাই দিয়ে আমি আমার গ্রামে হস্তশিল্প পুনরুদ্ধার করব। রাজনীতির সঙ্গে সংশ্রব থাকবে না।'

তাঁর জীবনে এটাই হয় শেষ পর্ব। আমি থাকি শান্তিনিকেতনে। তাঁর সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হয় না। কিছুদিন পরে শুনি, তিনি আর নেই। ক্ষীরপাই গ্রামেই তাঁর জীবনারম্ভ, তাঁর জীবনাবসান।

শতাব্দীর মুখে

ভূমিকা

গত কয়েক বছরে লেখা প্রবন্ধগুলি একত্র করে এই গ্রন্থের সামিল করেছি। নামকরণ আমার নয়, বন্ধুবর রবীন বল-এর। তাঁর ধারণা আমার বয়স শতবর্ষের অভিমুখে। আমি তাঁর সঙ্গে এক মত নই। আমি বেঁচে আছি আমার কাজের জন্য। কাজ ফুরোলে আমিও চলে যাব।

অন্নদাশঙ্কর রায়

সূচীপত্র

আমার শতাব্দী ভাবনা / যা চেয়েছি যা পেয়েছি / পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা! / রবীন্দ্রনাথ ও জাতীয়তাবাদ / বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের মূল্যায়ন / 'সবুজ পত্র' সঙ্কলন / রেনেসাঁস প্রসঙ্গে / মৌলবাদ প্রসঙ্গে / রাষ্ট্র, ধর্ম ও জনগণ / এ যুগে আগামী যুগের চিন্তা / মানবাধিকার দাবি / বিশ্ব মানবাধিকার / চতুঃসপ্ততিপূর্তি উপলক্ষে / বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রতি / গণতন্ত্রের শর্ত / স্বরাজের সংজ্ঞা / নান্য পন্থাঃ / কাশ্মীর তুমি কার? / ২৬শে জানুয়ারি উপলক্ষে / হুঁশিয়ারি / ১৫ই আগস্ট উপলক্ষে / উপায় ও উদ্দেশ্য / গান্ধী চিন্তাধারার প্রাসঙ্গিকতা / গরীবের মা-বাপ গান্ধী / সাধু সাবধান / স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিনিশ্চয় / বাংলাভাষা অবিভক্ত ও অবিভাজ্য / বাংলার রূপকথা / কৈশোর স্বপ্ন / বঙ্গদর্শন-এর রূপান্তর / শুভ সূচনা / সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি / বাঙালির সম্ভাবনা / বাঙালির ভবিষ্যৎ / বাঙালির ভবিষ্যৎ / বাঙালির ভবিষ্যৎ-চিন্তা / বাঙালিরা একটাই জাতি / এক জাতি দুই দেশ / ভ্রান্তিবিলাস / কলকাতা আমার ভালোবাসার শহর / নাম বদল / রবীন্দ্র পুরস্কার প্রসঙ্গে / গৌরী / গরবাচব-রাজীব দলিল / হইচই এড়াতে শান্তিনিকেতন যাচ্ছি / আমার প্রেরণার উৎস আর্ট ও প্রেম / একটি স্মরণীয় সন্ধ্যা / বসুমতী ও আমি, সাতাত্তর বছর / গুরুদেব আমাকে দেখতে চেয়েছিলেন / আমার ছেলেবেলা / আপন কথা / হারানো দিনের কথা / রহস্যে ভরা রাজার বাগানে / বাল্যকাল / পুরনো দিনের কথা / ইসকুলের গল্প / দোলের দুদিন বড়দের আমরা ভয় করতুম না / ছোটদের জন্য লেখা / সাক্ষাৎকার—'সমাচার' সম্পাদকমণ্ডলীর সঙ্গে / আমার ছোট মেয়েই সেই বিখ্যাত ছড়ার প্রেরণা / আলাপ—'যুগান্তর'-এর গৌরাঙ্গ ভৌমিকের সঙ্গে / আলাপ—'আজকাল'-এর প্রতিনিধির সঙ্গে / আলাপ—'বুক লাইন'-এর প্রতিনিধির সঙ্গে

এক

আমার শতাব্দী ভাবনা

ভালোর দিকটাই মনে রাখতে হবে। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে অনেকগুলি সাম্রাজ্য ছিল—ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, ফরাসী সাম্রাজ্য, চীন সাম্রাজ্য, জাপান সাম্রাজ্য, তুরস্ক সাম্রাজ্য, অস্ট্রিয়-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্য, স্প্যানিয় সাম্রাজ্য, ওলন্দাজ সাম্রাজ্য, পোতুর্গীজ সাম্রাজ্য, ইটালিয়ান সাম্রাজ্য। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে দেখা গেল অনেক সাম্রাজ্যের পতন হয়েছে। তার ফলে অনেকগুলি 'নেশন'-এর সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীর সবকটি নেশনকে নিয়ে একটি 'লীগ অফ নেশনস' হয়েছে। কিন্তু তার থেকে বাদ পড়েছে জার্মানি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এটাও একটা কারণ। আর একটা কারণ রুশ সাম্রাজ্য ভেঙে গিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন গড়ে ওঠে। তার সঙ্গে কিছুতেই জার্মানির বনিবনা হয়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে দেখা গেল লীগ অফ নেশনস-এর জায়গায় ইউনাইটেড নেশনস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাতে যোগ দিয়েছে নতুন এক একটা নেশন। যেমন ভারত, পাকিস্তান, বার্মা, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া, কেনিয়া, তানজানিয়া, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, ইজরায়েল। এর বেশিরভাগই বিভিন্ন সাম্রাজ্যের ভগ্নাংশ। প্রায় সব কটাই প্রজাতন্ত্রী। তা বলে সবকটিই গণতন্ত্রী নয়, কোনো কোনো রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতা সৈন্যদলের হাতে।

তারপর দেখা গেল সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুসরণে কয়েকটি রাষ্ট্রে কমিউনিস্ট শাসন। মাত্র একটিই দল সেখানে স্বীকৃত। যাই হোক তৃতীয় মহাযুদ্ধ এখন পর্যন্ত ঘটেনি। ঘটার আয়োজন চলছিল। এমন সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়ল। রাশিয়া ও তার স্বাধীন প্রতিবেশীরা। ব্রিটেন ভারত-পাকিস্তান প্রভৃতি দেশ গড়ে তোলে। কমনওয়েলথ সদস্যরা সকলেই স্বাধীন। এই আদর্শ নিয়েই গড়ে উঠেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। সদস্যরা সকলেই স্বাধীন, সকলেই সমান, সকলেই মিত্র-মিত্র। তুরস্ক সদস্য হওয়ার জন্যে অনেকদিন ধরে চেষ্টা করে এসেছে। এই সেদিন খবর পেলুম তুরস্কের অনুরোধ গ্রহণ করা হয়েছে। তার কারণ তুরস্কের একটা অংশ ইউরোপে রয়েছে। তুরস্ককে বাদ দিয়ে তুরস্ক হয় না। এটা একটা আজব সম্পর্ক। তুরস্ক মুসলিমদের দেশ, অন্যান্য দেশ খ্রিস্টানদের। একটা ধর্মীয় ভেদবুদ্ধি কাজ করছিল। কিন্তু তুরস্ক মুসলিমদের দেশ হলেও ধর্মনিরপেক্ষ। সেখানে অনেক খ্রিস্টানের বাস। তাদের সমানাধিকার স্বীকৃত হয়েছে। তুরস্ককে নতুন ফর্ম দিয়েছেন কামাল আতাতুর্ক। কামালের পলিসি উলটে দেওয়ার জন্যে বারবার চেষ্টা হয়েছে কিন্তু শেষপর্যন্ত কামালের অসাম্প্রদায়িক নীতি বলবৎ হয়েছে। অনেকেই মনে করেন ইসলামী দেশ গণতন্ত্রী হতে পারে না। কিন্তু তুরস্ক প্রমাণ করে দিয়েছে সেটা সম্ভব।

আগামী শতাব্দীতে সর্বত্র গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আশা করা যায়।

যে কারণেই হোক, সমাজতন্ত্র অনেক জায়গায় পিছু হটেছে। ব্যতিক্রম অবশ্য দু'টি একটি আছে। যেমন চেক প্রজাতন্ত্র। বোধহয় পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরী। এদের এখনো ইউরোপীয়ান ইউনিয়নে নেওয়া হয়নি। ইউরোপীয়ান ইউনিয়নে কয়েকটি দেশ সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা করেছে।

এই শতাব্দীর সবচেয়ে বড়ো কীর্তি আমার মতে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ বৈষম্য লোপ। আঠাশ বছর কারাবাসের পর নেলসন ম্যান্ডেলা সে দেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। তাঁর পক্ষে ভোট পড়েছিল শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ নির্বিশেষে। এখনো অনেক পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে। তিব্বত চায় স্বাধীন হতে, কুর্ত নামক একটি জাতি তিনটি রাষ্ট্রের অধীন। সে চায় স্বতন্ত্র একটি রাষ্ট্র। আর্মেনিয়ানদেরও একই দশা। প্যালেস্টাইনবাসী আরবদের দুর্ভাগ্য ইজরায়েল তাদের রাজধানী জেরুজালেমের একাংশ থেকে তাদের বঞ্চিত করেছে। কাশ্মীর এক অমীমাংসিত সমস্যা। এর সমাধানের উপর নির্ভর করছে সাউথ এশিয়ান ইউনিয়ন, যার সদস্য হবে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ ও শ্রীলঙ্কা। এখন নতুন শতাব্দী যদি এই সমস্যা মেটাতে পারে তবে আমাদের এই খণ্ডিত দেশের সব বন্ধ দরজা খুলে যাবে। একদা আমি ময়মনসিংহে বসে পেশোয়ারের আঙুর ডাকযোগে আনিয়ে খেয়েছি। আবার আমি কলকাতায় বসে পেশোয়ারের আঙুর খেতে চাই সেটাও ডাকযোগে আসবে।

ডাকমাশুল ছাড়া অন্য মাশুল লাগবে না। আবার আমি সিলেটের কমলালেবু খেতে চাই। পদ্মার ইলিশও খাব না কেন? যশোরের কই। ওরাও কলকাতা থেকে ওদের প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র পাবে। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসুক এটাই আমার নতুন শতাব্দীর কাছে প্রার্থনা।

দুই

যা চেয়েছি যা পেয়েছি

শতাব্দী তো শেষ হয়ে এল। আমার বয়সও পঁচানব্বুই। এখন ভাবছি কী চেয়েছি, কী পেয়েছি। আমার নিজের জীবনে নয়, দেশের সামাজিক জীবনে। বিশেষ করে নারীদের বেলায়।

সতেরো বছর বয়সে কলেজে ভর্তি হয়েই লিখতে আরম্ভ করে দিলুম কলেজ ম্যাগাজিনে। ইংরেজিতে। একটি প্রবন্ধে বললুম, আমি চাই নারীদের ভোট দেওয়ার অধিকার। ইংল্যান্ডের সাফ্রেজেটরা দুরন্ত সংগ্রাম করে ভোটের অধিকার আদায় করে নিয়েছেন। তবে সব নারীর জন্য নয়। ফ্রান্সের সেই ধাপটা তখনো বাকি। ভারতে সেটা কল্পনার বাইরে। আমি তার জন্যে অপেক্ষা না করে অবিলম্বে নারীদের জন্যে ভোটের জন্য অধিকার দাবি করি। স্বনামে নয়, 'সুচরিতা' ছদ্মনামে।

পরের সংখ্যায় একটি কবিতা বের হল—An Anti-feminist Cry. লেখক আমাদের ইংরেজির অধ্যাপক শচীন্দ্রলাল দাস বর্মা। আমি তার উত্তরে লিখলুম আর একটি কবিতা—A Feminist Counter Cry. এবার নিজের নামে। অধ্যাপক দাস বর্মা কী মনে করলেন জানিনে। এ প্রসঙ্গে তিনি আর লিখলেন না।

সেই যে আমি নিজেকে ফেমিনিস্ট বলে ঘোষণা করলুম তার পরে আবার লিখলুম নারী জাতির পক্ষে বাংলায় ও ওড়িয়ায় বিভিন্ন প্রবন্ধ। তার মর্ম—নারীকে দিতে হবে পুরুষের সমান অধিকার, সমান স্বাধীনতা। সে আপনিই তার পতি নির্বাচন করবে। বিবাহ

যদি সুখের না হয় তবে বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার থাকবে। বিবাহ-বিচ্ছেদের বিস্তর ঝামেলা। সেটা এড়াতে চাইলে বিবাহ না করাই শ্রেয়। তার পরিবর্তে প্রেমিক-প্রেমিকা একসঙ্গে থাকবে। সন্তান যদি হয় তাহলে তার দায়িত্ব নেবে মা। মা-ও স্বাধীনভাবে চাকরি বাকরি করবে। 'ভারতী'-তে আমার 'পারিবারিক নারী-সমস্যা' প্রবন্ধটি পড়ে ভীষণ ক্রুদ্ধ হন 'বঙ্গনারী' ছদ্মনামে অনিন্দিতা দেবী। তিনি সুদীর্ঘ সমালোচনা লেখেন। তিনি ধরে নেন যে আমি একজন প্রবীণ লেখক। যদিও আমি তখন সবে সাবালক।

তখনো কলেজ সহশিক্ষা প্রবর্তিত হয়নি। আমিও সহশিক্ষার প্রস্তাব করিনি। বোধহয় সেটা তখন ছিল আমার কল্পনাতীত। কারণ হিন্দুদের মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষা ততদূর অগ্রসর হয়নি।

কটক কলেজে থেকে আমি পাটনা কলেজে যাই। সেখানে বছর খানেক পরে ইতিহাসের এম.এ. ক্লাসে যোগ দেন মিস দত্ত। পুরো নামটি বোধহয় ইন্দু দত্ত। বিহার-ওড়িশায় তিনিই সর্বপ্রথম ছেলেদের কলেজে পড়তে এলেন। তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের কন্যা। পিতা ব্যারিস্টার। তার পক্ষে যেটা সম্ভব অপরের পক্ষে তা নয়।

যতদূর জানি গত শতাব্দীর শেষ ভাগে ডক্টর পি কে রায় যখন প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন তখন দুটি ব্রাহ্ম মেয়েকে তাঁর কলেজে ভর্তি হবার সুযোগ দিয়েছিলেন। সেটা কেবল যে ভারতে নতুন তা-ই নয়, ইংল্যান্ডেও নতুন। কিন্তু সেটা স্থায়ী হয়নি। পাটনা কলেজের নজির আমার জানা। তখনকার প্রেসিডেন্সি কলেজের দৃষ্টান্ত আমার অজানা। তবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে—তার আগে হোক বা পরে হোক—এম. এ. ক্লাসের জন্য সহশিক্ষার অনুমতি দেওয়া হয়। হিন্দু মেয়েরাও তার সুযোগ নেয়।

বিলেত থেকে ফিরে বহরমপুরে চাকরি করার সময় আমার নিজের বিয়ে হয়ে যায়। আমি আর আমার সহকর্মী দ্বিজেন্দ্রলাল মজুমদারের জন্য তার পিতার অনুরোধে পাত্রী দেখতে যাই। তিনি আমার মতামত জানতে চেয়েছিলেন। সেই সময় অবগত হলুম যে পাত্রীটি বি এ পাস করেছেন। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারের কন্যা। শান্ত স্নিগ্ধ স্বভাব। লক্ষ্মী। বন্ধুর বাবা আমার মত জানতে চাইলে বললুম, ভালোই হবে।

হিন্দু মহিলা গ্র্যাজুয়েট এর আগে আমি দেখিনি। হিন্দুর মেয়েরা যে এতটা অগ্রসর হয়েছে তা আমি ১৯৩০ সালেই প্রথম আবিষ্কার করি। তখনো কড়া পর্দা ছিল। যেসব হিন্দু অফিসারের বাড়িতে আমি আলাপ করতে গেছি তাঁদের গৃহিণীরা কেউ আমার সামনে আসেনি। চাকরের হাতে জলখাবার পাঠিয়ে দিয়েছেন। কলকাতাতেও ট্রামে-বাসে মেয়েদের দেখতে পাওয়া যেত না। কিন্তু গান্ধীজির নেতৃত্বে লবণ সত্যাগ্রহে বহু মহিলা যোগ দেন। দেখতে দেখতে ভদ্র পরিবার থেকে পর্দা প্রথা উঠে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সহশিক্ষার দৃষ্টান্ত বাড়ে।

কয়েক বছর বাদে রাজশাহী কলেজের ইংরেজ প্রিন্সিপ্যালকে লীলা রায় প্রশ্ন করেন, তাঁর কলেজে মেয়েদের পড়াশুনোর বন্দোবস্ত আছে কিনা। তিনি উত্তর দেন, আমি তো চাই, কিন্তু তার আগে মেয়েদের জন্য আলাদা ড্রেসিং রুম ও টয়লেটের জন্য ঘর তৈরি করা দরকার। সেটা ব্যয়সাপেক্ষ।

যে করেই হোক, সহশিক্ষার প্রচার বাড়ে। বলতে ভুলে গেছি যে সহশিক্ষা বিশ্বভারতীতে প্রথম থেকেই চালু ছিল। আমি যেবার ১৯২৪ সালে গুরুদেবকে দর্শন করতে যাই সেবার দেখি, মেয়েরাও ছেলেদের সঙ্গে পড়ছে। একজন তো রীতিমতো সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে। শান্তিনিকেতন বরাবরই নারী প্রগতির পক্ষে।

গণ সত্যাগ্রহের পরে যখন বিভিন্ন প্রদেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তখন নারীরা ভোট দেবার অধিকারিণী হনই, তাঁদের কেউ কেউ বিধানসভায় আসনও গ্রহণ করেন। যুক্তপ্রদেশে মন্ত্রীর পদও পেয়ে যান বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত। পরবর্তীকালে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হন সুচেতা কৃপালনী। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় মন্ত্রী হন অমৃত কাউর। আরো পরে প্রধানমন্ত্রী হন ইন্দিরা গান্ধী। নারী প্রগতির আর বাকি রইল কী! কংগ্রেস প্রেসিডেন্সিরও পদ পাওয়া গেছে। এবার পেতে হবে ভারতের রাষ্ট্রপতির পদ। সেটাও কালক্রমে সম্ভব।

ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে মেয়েদের স্থান ছিল না। ইন্ডিয়ান পুলিশেও না। অন্যান্য নিখিল ভারতীয় সার্ভিসেও না। স্বাধীনতার পরে মেয়েদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হয় একটি বাদে আর সব সার্ভিসে। সেই একটির নাম ইন্ডিয়ান আর্মি। না, আমি ততদূর দেখতে পাচ্ছিনে যখন একজন নারী চিত্রাঙ্গদা হবে। তবে বলা যায় না। অগ্রগতি তো শেষ হয়ে যায়নি। আমেরিকায় মেয়েদেরও আর্মিতে নিচ্ছে। আমাদের আদর্শ তো এখন আমেরিকা। আমাদেরও পরমাণু বোমা আছে। সুতরাং আমাদেরও মহিলা মেজর, মহিলা কর্নেল, মহিলা মেজর-জেনারেল ক্রমে ক্রমে দেখা যাবে।

ইতিমধ্যে কয়েকজন মেয়েকে ফরেন সার্ভিসে নেওয়া হয়েছে। তাঁদের কেউ কেউ রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হয়ে বিদেশে গেছেন। তাঁদের একজনের নাম অরুন্ধতী ঘোষ। যতদূর জানি তিনি বিয়ে করেননি। মুশকিল হচ্ছে, যাঁরা এসব পদ পান তাঁরা সমান ঘরে পাত্র পান না। পাত্র পেলেও স্বামী-স্ত্রীকে একই জায়গায় সমান পদ দেওয়া যায় না। তবে ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিসট্রেটিভ সার্ভিসে একই জায়গায় নিয়োগের দৃষ্টান্ত রয়েছে। আমার পরিচিত অচলা মৌলিকের বিয়ে হতে পেরেছিল এক সতীর্থের সঙ্গে। দুজনেই কাজ করতে পেরেছিলেন কর্ণাটক সরকারের সেক্রেটারি লেভেলে। অচলা তো আরো উন্নতি করেছিলেন বলে জানি। তাঁর স্বামীর নাম বলতে পারব না। তাঁদের সন্তানাদি হয়েছিল কিনা জানিনে। সন্তানাদি হলে কী হয় তার একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

আমার এক ভাগনির ছেলের চাকরি হয় ইন্ডিয়ান পুলিশে প্রতিযোগিতার সূত্রে। তার বিয়ে হয় তার সতীর্থের সঙ্গে। কিছু দিন পর্যন্ত তারা একই স্টেশনে নিযুক্ত হয়েছিল। পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্টেশন বদলে যায়। দুটি সন্তানও হয়। তাদের দায়িত্ব নেন তাদের দিদিমা। তিনি থাকেন তৃতীয় এক স্থানে। শেষে নাকি তিনি বিরূপ হয়েছিলেন। এ সমস্যার সমাধান বোধহয় ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন হোস্টেলে পাঠিয়ে দেওয়া। আমি এই সমস্যা সমর্থন করিনে। অথচ বিকল্প কী তা-ও বলতে পারছিনে। পুরনো প্রথা মেনে চললে সন্তান পালন করা মায়ের দায়িত্ব। কিন্তু তাহলে তার মা চাকরি করবে কী করে। শুনেছি সে কোথায় যেন ডাইরেক্টর জেনারেল হয়েছে। তাকে নিশ্চয়ই বেশির ভাগ সময় ঘুরে বেড়াতে হয়।

আমি চেয়েছিলুম নারী তার পতি নির্বাচন করবে। সেটা এখন বহু পরিবারে স্বীকৃত। আমি চেয়েছিলুম অসবর্ণ বিবাহ অবাধ হোক। সেটাও এখন বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়। আমি চেয়েছিলুম আন্তঃপ্রাদেশিক বিবাহ চলতি হোক। সেটাও বহু ক্ষেত্রে চালু হয়েছে। আমি চেয়েছিলুম আন্তঃসাম্প্রদায়িক বিবাহ আইনসম্মত হোক। সেটাও এখন আইনসম্মত হয়েছে। পাত্রপাত্রীকে ধর্মের পরিচয় দিতে হয় না। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান বিবাহে একটা অন্তরায় হল হিন্দুরা কিছুতেই মুসলিম জামাতাকে বা মুসলিম বধূকে ঘরে তুলবে না। অপর পক্ষে আর একটা অন্তরায় হল মুসলমানরা কিছুতেই হিন্দু বরকে বা হিন্দু কনেকে হিন্দু থাকতে দেবে

না, তাকে মুসলমান করবেই। এই দুটি অন্তরায় যাঁরা অমান্য করেন তাঁদের সংখ্যা খুবই কম ও তাঁদের পুত্রকন্যার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।

তার চেয়ে সহজ আন্তর্জাতিক বিবাহ। ভারতীয়রা ইংরেজ আমেরিকান ফরাসি জার্মান বিবাহ করছেন এটা আজ আর একটা ঘটনা নয়। ঘটনা হচ্ছে ভারতীয় মেয়েরা বিদেশে পড়াশুনো করতে গিয়ে ইংরেজ আমেরিকান বা ফরাসি জার্মান বিবাহ করছেন। গুরুজনরা মেনে নিচ্ছেন। বরেরা বিদেশি খ্রিস্টান, কিন্তু তাঁরা হিন্দুমতেই বিবাহ করছেন। পূর্বে বা পরে করছেন সিভিল ম্যারেজ। আমি প্রয়োজন হলে বিবাহ-বিচ্ছেদের পক্ষপাতী ছিলুম। কিন্তু হিন্দু আইনে তার ব্যবস্থা ছিল না। ধাপে ধাপে আইনের পরিবর্তন হয়েছে। এখন আর আদালতে গিয়ে প্রমাণ করতে হয় না যে স্ত্রী অসতী বা স্বামী নপুংসক। এখন দুই পক্ষ কোনও রকম কারণ না দর্শিয়েও শুধুমাত্র আবেদন করেন যে তারা বিবাহ-বিচ্ছেদ চান। আদালত তাদের কিছুদিন ভাববার সময় দেন। তারপর তাঁদের আবেদন মঞ্জুর করেন। সন্তান হয়ে থাকলে দুপক্ষ নিজেদের মধ্যে একটা বন্দোবস্ত করেন।

আমার কলেজ জীবনের বাংলা প্রবন্ধে আমি প্রস্তাব করেছিলুম যে বিবাহ-বিচ্ছেদের ঝামেলা এড়াতে বিবাহ না করে লিভিং টুগেদার-ই শ্রেয়। কিন্তু আমার প্রস্তাবের একটা গলদ ছিল আমি মায়ের ওপরেই ছেড়ে দিয়েছিলুম সন্তানের দায়িত্ব। সন্তান নিয়ে ঝামেলা এড়াবার জন্য ইউরোপ আমেরিকায় অনেকেই সন্তানের জন্ম দেয় না। কুমার-কুমারী হিসেবে আজীবন একসঙ্গে থাকতে পারা যায়, কিন্তু জনক-জননী হিসেবে নয়। ছত্রিশ বছর আগে আমি প্যারিসে গিয়েছিলুম। আমাকে অভ্যর্থনা করলেন এক মহিলা শিল্পী—ফরাসী কন্যা। তার স্বামী একজন বাঙালি শিল্পী। মহিলাটি বললেন, তিন বছর একসঙ্গে থাকার পরে আমরা তিন মাস আগে বিবাহ করেছি। আমরা এখন সন্তান পেতে পারি। আমি প্রথমে একটু আশ্চর্য হলুম। তিন বছর একসঙ্গে থাকার মানে কী! সন্তানহীন দাম্পত্য জীবন। এখন তাদের অবস্থা অনেকটা সচ্ছল হয়েছে, দুজনেই উপার্জন করছেন। সুতরাং—আর বিলম্ব কেন? সমাজ-সম্মতভাবে বিবাহিত দম্পতি রূপে সংসার করা যাক। লিভিং টুগেদার ইউরোপে এখন একটা আর ঘটনা নয়। বিশেষ করে ফ্রান্সে। তার একটি অপরিহার্য শর্ত দুইজনাকেই স্বাবলম্বী হতে হবে। নয়তো লোকে বলবে, অমুক নারী অমুক পুরুষের রক্ষিতা। বিখ্যাত ফরাসি লেখিকা জর্জ সাঁকে কেউ মুসে বা শপ্যাঁর রক্ষিতা বলতে সাহস পায়নি। তাঁর উপার্জন তাঁদের চেয়েও বেশি। তেমনই জর্জ এলিয়টকে কেউ লুইসের উপপত্নী বলেননি। তাঁর স্ত্রী তাঁর সঙ্গে বাস করতেন না, অন্যের সঙ্গে বাস করতেন। তেমনই জর্জ সাঁ বা জর্জ এলিয়ট অপরের বিবাহিতা পত্নী ছিলেন, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে থাকতেন না। তারপরে দেড়শ বছর চলে গেছে। লিভিং টুগেদার আজকাল আর ব্যতিক্রম নয়। বলা যেতে পারে, বিবাহের মতো এটাও নিয়ম।

যাই হোক লিভিং টুগেদার আমাদের সমাজেও শুরু হয়েছে। একটি দৃষ্টান্ত আমি জানি। স্বামী-স্ত্রীর বনিবনা হয় না। কেউ কারো বিরুদ্ধে ডিভোর্সের আবেদনও করতে পারে না। এই অচল অবস্থায় স্ত্রী তার এক সহকর্মীর সঙ্গে সংসার পাতে। কিন্তু আইন অনুসারে বিবাহ সম্ভব হয় না। শেষপর্যন্ত মেয়েটি আত্মহত্যা করে।

মোটামুটি বলতে গেলে আমি যেসব সামাজিক পরিবর্তন চেয়েছি তার সবগুলোই পেয়েছি। কিন্তু কোনও পরিবর্তনই শেষ কথা নয়। সঙ্গে সঙ্গে নতুন সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে।

নতুন শতাব্দীতে যেসব সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে। এক বিরাট প্রশ্ন হচ্ছে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ যে বিস্ফোরণ পোখরানকেও হার মানায়। যে-হারে জনসংখ্যা বাড়ছে সেইভাবে বাড়তে থাকলে প্রত্যেকের ভাগে ন্যূনতম অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থান জুটবে না। সেইজন্য পরিবার পরিকল্পনার প্রসঙ্গও জরুরি। অথচ তা কাগজেকলমেই সীমাবদ্ধ। আগে এই সমস্যার সমাধান ছিল যুদ্ধ আর মহামারী। মহামারী কতকটা রোধ করা গেছে। যুদ্ধ নিবারণ করা যায়নি। সেটা নিবারণ করলেও বিপদ, না করলেও বিপদ।

তিন

পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা!

আমার যখন ১৭ বছর বয়স তখন ১৩ বছর বয়সের বোনের বিয়ে হয়। আমার বাবা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের বিয়েতে পণ দেবেন না ও পণ নেবেন না। কাজেই তিনি আমার বোনের বিয়ের সময় পণ দিলেন না। তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা হল। কিন্তু ফল হল হিতে বিপরীত।

বিবাহানুষ্ঠান যেই শেষ হয়ে গেল অমনই বরকর্তা বরকনেকে সভা থেকে উঠিয়ে নিয়ে চলে গেলেন। আমি তখন বসেছিলুম কন্যাযাত্রীদের সঙ্গে আহারে। খাবার ফেলে ছুটে গেলুম কী হয়েছে দেখতে। দেখলুম বাবা অত্যন্ত অপমানিত।

ইতিমধ্যে আমার মায়ের মৃত্যু হয়েছিল। সেইজন্য সাত তাড়াতাড়ি মেয়ের বিয়ে দেওয়া। বাড়িতে আর কেউ নেই যে মেয়েদের দেখাশুনো করবে। বাবা তো চাকরি করতে বেরিয়ে যান। আমরাও যে যার স্কুলে বা কলেজে যাই।

এরপর আমার বোন বাবাকে মাঝে মাঝে চিঠি লিখে জানায় যে তার খুব কষ্ট হচ্ছে। তিনিও ছুটে যান মেয়েকে দেখতে ও শ্বশুর-শাশুড়িকে কিছু টাকা দিয়ে আসেন। হরে দরে একই কথা। কিস্তিতে কিস্তিতে বরপণ।

বছরখানেক বাদে আমার বোনের একটি ছেলে হল। বাবাও খুশি, শ্বশুরও খুশি, শাশুড়িও খুশি। জাদুমন্ত্রের মতো কাজ হল। নির্যাতন বন্ধ। আদরযত্ন শুরু। শ্বশুর শাশুড়ির বৈপ্লবিক পরিবর্তন। দুই পক্ষের মধ্যে চমৎকার বনিবনা। বরকনের মধ্যেও মধুর সম্পর্ক।

এর থেকে আমার শিক্ষা হল তিন রকম। আমি উপলব্ধি করলাম যে নারীর নিজের কোনও মূল্য নেই, বরপণের মূল্যেই তার মূল্য। দ্বিতীয়তঃ, নারীত্বের কোনও মূল্য নেই, মাতৃত্বেই তার মূল্য। সে যদি বন্ধ্যা হয় তবে রূপে গুণে অনবদ্য হলেও বন্ধ্যাত্বের জন্য নিন্দা পায়। তৃতীয়তঃ, মাতৃত্ব যদি পুত্রের মাতৃত্ব না হয়ে কন্যার মাতৃত্ব হয় তাহলে সেটা তার অপরাধ। মেয়ের বিয়ের সময় অনেক খেসারত দিতে হয়। তার জন্য তার বাপ দায়ী নয়, তার মা-ই দায়ী। শাস্ত্রেই বলেছে পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা। কেউ তো কোনওদিন বলেনি কন্যার্থে ক্রিয়তে ভার্যা। পুত্রই পিণ্ডদান করে, কন্যা পিণ্ডদান করে না। পুত্রঃ পিণ্ড প্রয়োজনাৎ। মৃত্যুর পরে পিণ্ড চাই। সেইজন্য মৃত্যুর আগে পুত্র চাই। আর পুত্র চাই মানেই ভার্যা চাই। আর ভার্যার সঙ্গে চাই পণ-যৌতুক। এই হল আমাদের পূর্বপুরুষদের ন্যায়বিচার।

বিষম রাগ করে আমি বনে গেলুম ফেমিনিস্ট। 'পারিবারিক নারীসমস্যা' নামে একটি

প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়ে দিলুম 'ভারতী'তে। আঠারো বছর বয়সী এক সদ্য সাবালকের প্রবন্ধ প্রকাশিত হল 'ভারতী'তে। পরবর্তী সংখ্যায় বার হল তার তীব্র সমালোচনা। লেখিকার ছদ্মনাম 'বঙ্গনারী'। তাঁর আসল নাম অনিন্দিতা দেবী। থাকতেন তিনি স্বাস্থ্যের জন্য পুরীতে। ছুটির সময় পুরী বেড়াতে গিয়ে আমি উঠতুম আমার সেজকাকার বাড়িতে। কাছাকাছি বাড়ি বলে আমার সেজকাকীমার সঙ্গে অনিন্দিতা দেবীর আলাপ ছিল। আমাকে তিনি চিনতেন না বটে, কিন্তু আমি তাঁকে চিনতুম। রোজ বিকালবেলা তিনি নিয়ম করে হাঁটতেন সমুদ্রতীরে। আমিও হাঁটতুম তাঁর পিছুপিছু। তিনি যখন ফিরতেন আমার সঙ্গে তাঁর মুখোমুখি হয়ে যেত। তিনি ছিলেন আমার মায়ের বয়সী বা আরো বড়। কিন্তু আমার লেখার সমালোচনার সময় তিনি ধরে নিলেন যে আমি একজন প্রবীণ লেখক। একজন দায়িত্বশীল লেখক হিসেবে আমি কলমের মুখে কেমন করে বলতে পারলুম এত অপমান সয়ে বিবাহ করার চেয়ে বিয়ে না করে লিভিং টুগেদার শ্রেয়। কী ভয়ানক কথা! এর নাম সমাজসংস্কার, না সমাজ সংহার!

আমারও দোষ ছিল। লিখেছিলুম যে সন্তান হলে জননীই তার দায় নেবে। বোকার মতো চিন্তা করিনি যে জননী উপার্জনক্ষম হবেন কী করে।

সে বয়সে সব দিক বিবেচনা করার বুদ্ধিশুদ্ধি আমার ছিল না। কিন্তু ইদানীং ইউরোপ আমেরিকা এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। জননীও উপার্জনক্ষম হয়েছে। জনককেও ভরণপোষণের অংশ গ্রহণ করতে হয়।

উনিশ বছর বয়সে আমি কটক থেকে পাটনায় যাই বি.এ. পড়তে। সেই সময় সেখানে শুনি অমিয় চক্রবর্তী নামে একটি ছাত্র হাজারীবাগ সেন্ট কলম্বাস কলেজ থেকে ইংরেজিতে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স পেয়ে শান্তিনিকেতনে চলে গেছেন, এম.এ. পড়তে পাটনায় আসবেন না। তিনি কলেজে পড়ার সময় থেকেই দেশবিদেশের বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে পত্রালাপে নিযুক্ত। আমিও তাঁর দুটি একটি কবিতা 'প্রবাসী'তে বা অন্যত্র পড়েছিলুম। কাকীমার মুখে শুনলুম এই যে অমিয় চক্রবর্তী তিনি সেই যে অনিন্দিতা দেবী তাঁর পুত্র। অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ শান্তিনিকেতনে, বছর পঁচিশ বয়সে, যখন আমি সদ্য বিলেতফেরত। ক্রমশঃ আমরা অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে উঠি। কিন্তু কোনওদিন আমি তাঁর মুখে তাঁর মায়ের নাম শুনিনি। অনিন্দিতা দেবীকেও আর কখনো দেখিনি।

তখনকার দিনে তিনিও ছিলেন একজন নারীবাদী লেখিকা। তিনিও একজন প্রগতিবাদী মহিলা। সমুদ্রের তীরে যখন হাঁটতেন তখন মাথায় কাপড় থাকত না সঙ্গেও আর কাউকে নিতেন না। 'ভারতী'তে তাঁর অনেক রচনাই পড়েছি। নারীর প্রগতির জন্য তিনি সত্যিই ছিলেন ভাবিত, কিন্তু ধীরে ধীরে, এক লাফে নয়। সমুদ্রের তীরে আমাদের মুখোমুখি আর 'ভারতী'র পৃষ্ঠাতে আমাদের মুখোমুখি দুটোই আমার জীবনে অবিস্মরণীয়।

চার

রবীন্দ্রনাথ ও জাতীয়তাবাদ

উনবিংশ শতাব্দী যেদিন শেষ হয়ে যায় সেদিন রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা লেখেন, তার প্রথম বাক্য 'শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ-মাঝে অস্ত গেল', আর শেষ দুইটি পঙ্‌ক্তি 'কবিদল

চিৎকারিছে জাগাইয়া ভীতি শ্মশান-কুক্কুরদের কাড়াকাড়ি-গীতি।' এর অব্যাহতি আগের পঙ্‌ক্তিগুলি হল ঃ 'লজ্জা শরম তেয়াগি জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায় ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।' সেই জাতিপ্রেম যে বিভিন্ন জাতিকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে সে সম্পর্কে কবি সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। চোদ্দ বছর বাদে ইউরোপে বেধে যায় এক ভয়ংকর মহাযুদ্ধ যেমনটি আগে কখনো হয়নি। কবি ইতিমধ্যে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। তিনি ইংরেজিতে Nationalism নামে একখানি বই লেখেন। তাতে ছিল ন্যাশনালিজম নামক তত্ত্বের বিরুদ্ধে তাঁর মতবাদ। জাপানে গিয়ে তিনি প্রাচ্য বাণীমূর্তি রূপে উষ্ণ অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন। কিন্তু ন্যাশনালিজমের উপর বক্তৃতার পর দেখা গেল তাঁর ভক্তরা তাঁর প্রতি বিমুখ। জাপান থেকে তাঁর বিদায়ের সময় উপস্থিত ছিলেন মাত্র একজন জাপানি—তিনি যাঁর অতিথি। জাপানিরা তখন উৎকট ন্যাশনালিস্ট।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ১৯৫৭ সালে আমি যখন আন্তর্জাতিক পি ই এন কংগ্রেস-এ যোগ দিতে জাপানে যাই তখন তোকিয়োর একটি অধিবেশনে একজন ফরাসি সাহিত্যিক বলেন, প্রথম মহাযুদ্ধে তিনি যখন ট্রেঞ্চে ঢুকেছিলেন তখন তাঁর হাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ন্যাশনালিজম গ্রন্থখানি পড়ে। সেটি পাঠ করে তাঁর দৃষ্টি খুলে যায়।

এই রকম সময়ে তিনি 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসটি লেখেন। তাতেও তিনি ন্যাশনালিজমের বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন। জাতিপ্রেম তাঁর মতে একটা সংকীর্ণ মানসিকতা যার অপর পিঠে বিদ্বেষ ও হিংসা। 'ঘরে বাইরে' জনপ্রিয় হয়নি। দেশের লোকরা তখন ব্রিটিশ শাসনের বিরোধী হতে গিয়ে যা-কিছু-ব্রিটিশ নির্বিচারে সে-সব কিছুর বিরোধী। অসহযোগ আন্দোলনের সময় সেটা সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ প্রায় একঘরে হয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে তিনি বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সাড়াও পেয়েছিলেন। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ বিশ্বকে এক-নীড় করতে পারে না। অথচ সেটাই ছিল বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথ মনে আঘাত পেয়েছিলেন। এই প্রশ্নে তিনি কোনদিনও আপোস করেননি। দেখা গেল জাতিবাদ থেকে, এল আবার এক মহাযুদ্ধ। জাতিবাদের উগ্রতম রূপ জার্মানির জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদ। ওদিকে জাপানেও তার প্রতিরূপ দেখতে পাওয়া যায়। হতাশ হয়ে কবি লেখেন 'সভ্যতার সঙ্কট'।

অবশ্য জাতিপ্রেমই একমাত্র নিদান ছিল না। এর সঙ্গে ছিল উপনিবেশ গ্রাস করার জন্য লোলুপতা এবং একটি মাত্র দলের একাধিপত্য প্রচেষ্টা। ভারতের জাতীয়তাবাদ এতদূর অগ্রসর হয়নি, তবু সন্ত্রাসবাদ ও বর্জননীতি স্বদেশের শ্রেষ্ঠ আদর্শের ক্ষতি সাধন করেছিল। রবীন্দ্রনাথ তা সহ্য করতে পারছিলেন না। ওদিকে সরকারের সঙ্গেও তাঁর গভীর মতভেদ। তিনি নাইট উপাধি ত্যাগ করেছিলেন জালিয়ানওয়ালাবাগে হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে, ফলে ইংল্যান্ডে তাঁর পাঠক সংখ্যা কমে যায়।

ভালোমন্দ যে কারণেই হোক, ন্যাশনালিজম তখন ভারতের জনগণের কাছে একমাত্র আদর্শ। গান্ধী জবাহরলাল সুভাষচন্দ্র তখন জনগণমন অধিনায়ক। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তখন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিবদ্ধ। সেক্ষেত্রে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজন স্বীকৃত। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা বরাবর অটুট ছিল। কিন্তু তাঁর কথা রাজনীতির ক্ষেত্রে কেউ গ্রাহ্য করত না। তিনি দুঃখ পেতেন। মহাকবি গ্যেটের শেষজীবনও অনেকটা একই রকম ছিল। তিনিও ছিলেন মানবপ্রেমিক।

পাঁচ

বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের মূল্যায়ন

দেশের দৃষ্টিতে যার নাম পাশ্চাত্য, যুগের দৃষ্টিতে তার নাম আধুনিক। মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণের জন্য আমরা পাশ্চাত্য সাহিত্যের উপর নির্ভর করি। প্রাচীন সংস্কৃত এই কাজে আমাদের সহায় হতে পারত না, তাই আমরা আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যের উপর মনোনিবেশ করি। আমাদের ভাষায় গদ্য ছিল না। আমরা গদ্য-প্রবন্ধ পাই। মহাকাব্য ছিল না। আমরা মহাকাব্য পাই। আমাদের ভাষায় লিরিকজাতীয় কবিতা ছিল না। আমরা লিরিকজাতীয় কবিতা পাই। উপন্যাস ছিল না উপন্যাস পাই। নাটক ছিল না। নাটক পাই। নাটকের জন্য থিয়েটার পাই। ভ্রমণকাহিনী ছিল না। ভ্রমণকাহিনী পাই। ইতিহাস ছিল না। ইতিহাস পাই। ভূগোল ছিল না। ভূগোল পাই। বিজ্ঞান ছিল না। বিজ্ঞান পাই। এর ফলে আমাদের সাহিত্য শুধু যে আধুনিক হয় তাই নয়, বিচিত্র হয়।

গত শতাব্দীর শেষে মনে হল, আমরা দেশকে উপেক্ষা করছি। বিদেশকে অনুসরণ করছি। একে তো এই দেশ পরাধীন, তার উপর বিদেশি পণ্যে বাজার ছেয়ে গেছে। চাই স্বদেশির পুনরুজ্জীবন। কেবল শিল্পে নয়, সাহিত্যে ও শিক্ষায়। ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ দেখা যায়। সেটা যেন গোলামি মানসিকতার জন্মদাতা। দেখা দিল একপ্রকার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্ব। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় রাজনীতির ক্ষেত্রে ওঠে স্বরাজের দাবি, অর্থনীতির ক্ষেত্রে ওঠে স্বদেশির দাবি, সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রাচ্যের দাবি। এমন সময় রবীন্দ্রনাথ লাভ করেন সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার। এর ফলে পাশ্চাত্যের প্রতি মনোভাব নরম হয়, বিশ্বচেতনা জাগ্রত হয়। কিছুদিন পরে রুশদেশে ঘটে যায় সমাজবিপ্লব। শ্রমিক-কৃষকশ্রেণীর উপর দৃষ্টি পড়ে। কিছুদিন পরে ভারতে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। জনগণের উপরে প্রভাব পড়ে। নবীন সাহিত্যিকরা একদিক থেকে বিশ্বচেতন অন্যদিক থেকে গণচেতন। সাহিত্য কেবল উচ্চবর্গের জন্য নয় সাহিত্য নিম্নবর্গের জন্যও। নবীন লেখকরা নিম্নবর্গকে নিয়ে আসেন সাহিত্যের অঙ্গনে। অনেকেই বিশ্বাস করেন যে আমাদের দেশেও সমাজবিপ্লব ঘটবে। সেটা নাকি আমাদের ঐতিহাসিক নিয়তি। সাহিত্যের তার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে। লেখকেরা নাকি সমাজের কাছে দায়বদ্ধ। বহু লেখক বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণকে অস্বীকার করেন। যেহেতু সেটা পরাধীন আমলের বাবু কালচার। কিন্তু নতুন যা লেখা হয় তার থেকে কোনও নবজাগরণ আসে না। নবজাগরণ সেই একবারই হয়েছে যদি তাকে নবজাগরণ বলে স্বীকার কর। দেশ স্বাধীন হয়েছে, তবে সমাজবিপ্লব এখনো হয়নি, তার জন্যে লেখকেরা আর কতকাল দায়বদ্ধ থাকবেন। তাই দায়বদ্ধ লেখকের সংখ্যা কমে আসছে। সাহিত্যে এখন বুর্জোয়াদের বৈঠকখানাই সৃষ্টি হচ্ছে। এটাই আপাতত আমাদের সাহিত্যিক নিয়তি।

ছয়

সবুজপত্র সঙ্কলন-ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'সবুজপত্র' একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। প্রথমতঃ 'সবুজপত্র'-ই বাংলাভাষাকে সাধুভাষার প্রভাব থেকে মুক্ত করে, কথ্য ভাষাকে প্রাধান্য দেয়। আজকাল সর্বত্র চলতি ভাষার প্রচলন। সাধুভাষা সম্পূর্ণভাবে কোণঠাসা। দ্বিতীয়তঃ 'সবুজপত্র' সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী নতুন লেখকদের শেখান 'কী লিখব' এটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ 'কেমন করে লিখব' সেটাও তেমনই। তাই দিয়ে বোঝা যায়, লেখাটা আর্ট হয়েছে কিনা। তৃতীয়তঃ সবুজপত্রের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন ভারতের সঙ্গে আধুনিক ইউরোপকে মেলানো। আধুনিকতম পাশ্চাত্য চিন্তাকে সবুজপত্র বাংলায় পরিবেশন করে। তবে সম্পাদকের আফশোস ছিল যে সত্যেন্দ্রনাথ বোসের মতো বিজ্ঞানীরা তাঁর অনুরোধে বাংলায় লেখেন না।

'সবুজপত্র' ছিল এক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের মুখপত্র। এটা তাঁরই আইডিয়া। সম্পাদক হিসেবে প্রমথ চৌধুরী তাঁরই দ্বারা মনোনীত। 'সবুজপত্রে'র ভার পেয়ে প্রমথ চৌধুরী সেটাকে নিজের মুখপত্র হিসেবেও প্রকাশ করেন। নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পরে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগতে একটা পরিবর্তন ঘটে। তিনি এমন সব তরতাজা গল্প উপন্যাস লেখেন যা রক্ষণশীল পাঠকদের কাছে অগ্রাহ্য। এমন কী উদারমতি পাঠকদের কাছেও স্পর্শকাতর। সেইসব সাহসিক রচনার জন্য তিনি নতুন একটি পত্রিকা প্রয়োজন মনে করেন। প্রমথ চৌধুরী ছিলেন তাঁর বিশেষ আস্থাভাজন। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবী ছিলেন প্রমথনাথের স্ত্রী। সেই সূত্রে প্রমথনাথ ছিলেন তাঁর বিশেষ স্নেহভাজন। বাংলা সাহিত্যে এরকম মানিকজোড় দেখা যায় না। 'সবুজপত্র' এই দুই মনীষীর যুগ্মকীর্তি।

'সবুজপত্রে' আরো কয়েকজন মননশীল ব্যক্তি লিখতেন। সুতরাং তাঁরাও কীর্তির অংশীদার। অতুলচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তিনি কোনও প্রবন্ধ সংগ্রহ রেখে যাননি। সুতরাং তাঁর এবং তাঁর মতো লেখকদের রচনার একটি সংকলনের প্রয়োজন ছিল।

'সবুজপত্রে'র আয়ুষ্কাল মাত্র ছয় বছর। সেই ছয় বছর তৎকালীন বিশ্বের ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। 'সবুজপত্রে'র আরম্ভ প্রথম মহাযুদ্ধের সমসাময়িক। মহাযুদ্ধ শেষ হবার আগেই ঘটে যায় রুশ বিপ্লব। মহাযুদ্ধ শেষ হবার পরে ভারত সরকারের রুদ্রনীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। ঘটে যায় জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড। ফলে রবীন্দ্রনাথের 'নাইট' উপাধিত্যাগ। এর পরে আসে অসহযোগ আন্দোলন। কিন্তু তার পূর্বেই 'সবুজপত্র' বন্ধ হয়। প্রধান কারণ প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবীর এক নম্বর ব্রাইট স্ট্রিটের বাসভবন বিক্রি হয়ে যায়। সেইখানে বসত 'সবুজপত্রে'র আড্ডা। সেই আড্ডাতেই আলোকিত হত দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়। আড্ডাহীন 'সবুজপত্র' যেন প্রাণহীন দেহ। আরো একটা কারণ ছিল। 'সবুজপত্র' কোনওকালেই অর্থকরী ছিল না, বিজ্ঞাপন নিত না। সম্পাদক ব্যয়ভার বহন করতে ক্রমেই অক্ষম হন। তাছাড়া আরো একটা কারণ, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী নিয়ে ও বিশ্বভ্রমণ নিয়ে দারুণ ব্যস্ত থাকায় নিয়মিত লেখা পাঠাতে পারতেন না। তাঁর অভাব পূরণ করা আর কারো সাধ্য নয়। সম্পাদক হিসেবে প্রমথনাথ একাই পত্রিকাটিকে নিজের রচনা দিয়ে ভরে দিতে সংকোচ বোধ করতেন। তাঁর নিজের মনও আকৃষ্ট হয়েছিল

রাজনীতির দিকে। এরূপ ক্ষেত্রে পত্রিকাটি বন্ধ না হয়ে পারে না। কিন্তু ছয় বছর আয়ুষ্কালে যে রচনা সম্ভার রেখে যায় তা এখনো প্রণিধানযোগ্য।

বর্তমান সংকলন প্রকাশ করে 'মিত্র ও ঘোষ' একটি প্রশংসনীয় কাজ করছেন। এর থেকে নতুন লেখকরা লেখার আদর্শ ও দৃষ্টান্ত খুঁজে পাবেন। পাঠকরাও একটা হারানো যুগের সঙ্গে পরিচিত হবেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি খুশি, কারণ আমিও মনে মনে 'সবুজপত্র' গোষ্ঠীর একজন উত্তরসূরি।

সাত
রেনেসাঁস প্রসঙ্গে

ইটালীয় রেনেসাঁস একশো বছরের বেশি স্থায়ী হয়নি। ক্যাথলিক চার্চ প্রচণ্ড প্রতিবাদ করে। শুরু হয়ে যায় কাউন্টার রেনেসাঁস। তার থেকে বোঝা যায় লড়াইটা আসলে ছিল ভক্তিবাদীদের সঙ্গে যুক্তিবাদীদের। যুক্তিবাদীরা বলে ধর্ম আর দর্শন এক জিনিস নয়। দর্শনও দুই ভাগে বিভক্ত : Mental and Moral Philosophy বনাম Natural Philosophy. Natural Philosophy-র পরবর্তী কালে নাম দেওয়া হয় Science—পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান ইত্যাদি। আরো পরবর্তী কালে আসে Psychology. আরও পরবর্তীকালে আসে Sociology, Anthropology. আমেরিকার কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের Science-এর উপর একশোটার বেশি Faculty. তারপর যুক্তিবাদীরা বলেন Mythology এবং History এক জিনিস নয়। খ্রিস্টধর্মের মিথগুলি ইতিহাসের বিচারে ভিত্তিহীন। ভক্তিবাদীরা বলতেন, সূর্য ঘুরছে পৃথিবীর চারদিকে আর পৃথিবী চ্যাপ্টা। আর যুক্তিবাদীরা বলতেন, পৃথিবী গোল ও সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, পৃথিবীর চারদিকে শূন্য, স্বর্গ ও নরক বলে কোনও অবস্থা পাওয়া যাচ্ছে না। ক্যাথলিক চার্চ যে প্রচণ্ড খেপে যাবে তাতে আর আশ্চর্য কী। যুক্তিবাদীদের অনেককে পোড়ানো হয়। কেউ কেউ প্রাণে বাঁচার জন্য মত পরিবর্তন করেন। ভক্তিবাদীরা শব ব্যবচ্ছেদে বিশ্বাস করতেন না, মানব-শরীরের অস্থি-সংস্থান জানতেন না। লিওনার্দো দ্য ভেঞ্চি গোপনে লুকিয়ে লুকিয়ে শব-ব্যবচ্ছেদ করেন ও অস্থি সংস্থান জেনে নেন। তাঁর চিত্রকলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অ্যানাটমির উপরে। মাইকেলাঞ্জেলোর ভাস্কর্যও তা-ই। বতিচেল্লি ভিনাসের নগ্ন মূর্তি আঁকেন। সেটা চার্চের দ্বারা নিষিদ্ধ। অথচ রেনেসাঁস যুগের চিত্রকলা কোনও নিষেধ মানতে চায় না। নাটকেও বহু বিষয় নিষিদ্ধ ছিল। নাট্যকাররা তা অমান্য করেন। ইংল্যান্ডে যখন রেনেসাঁস আরম্ভ হয় তখন শেক্সপীয়রের নাটকে ঈশ্বরকে খুঁজে পাওয়া যায় না, তবে এক জায়গায় আছে 'There's a divinity that shapes our ends./ Roughhew them how will.' তাঁর কোনও নাটকই খ্রিষ্টীয় নাটক নয়। এক কথায় বলা যায়, রেনেসাঁসের সঙ্গে শুরু হয়ে গেল হিউম্যানিজমের যুগ।

মানুষ দোষেগুণে বিচিত্র। তার সেই বৈচিত্র্যকে প্রতিফলিত করে সাহিত্য ও সংস্কৃতি। যাঁরা সত্যকে জানতে চান তাঁদের কর্তব্য প্রকৃতিকে অধ্যয়ন করা, ধর্মশাস্ত্রকে নয়। এই একই সময়ে আরো কয়েকটি ঘটনা ঘটে। যেমন মুদ্রণযন্ত্রে বই ছাপা। প্রচুর পুস্তক মুদ্রণ। সংবাদপত্র প্রকাশ। নিরক্ষরদের সাক্ষর করা। সমুদ্রযাত্রা করে নানা দেশ আবিষ্কার। তারপরে নানা জাতির সঙ্গে পরিচয়। রেনেসাঁস যাকে বলা হচ্ছে তা এই সমস্ত ধরার সঙ্গম। এর মধ্যে

অর্থনীতি ও রাজনীতিও পড়ে। তা বলে এটি একটি অর্থনৈতিক পরিবর্তন নয়। তার সময় পরে আসে। রেনেসাঁস যখন ইটালি থেকে ফ্রান্স হয়ে ইংল্যান্ডে পৌঁছয় তখন লিওনার্দো ও মাইকেলাঞ্জেলোর মতো শিল্পী দেখা যায় না। তার বদলে আসে fresh air—মার্লো, মিলটন ইত্যাদি যুগান্তকারী কবি ও নাট্যকার। রেনেসাঁস যখন অন্যান্য দেশে যায় তখন একই রকম হয় না। ইটালির যেটা মডেল সেটা সব দেশের মডেল নয়। রেনেসাঁসকে ইটালীয় মডেল গ্রহণ করতে হবে এরকম দাবি জার্মানিতেও ওঠেনি, রাশিয়াতেও ওঠেনি, উঠেছে কিনা বাংলা দেশে। যেন সব দেশেই একরকম সব ভাষাই একরকম। সেভাবে সত্যকে জানা যায় না। মুর্শিদাবাদের মাটি এক রকম, মালদহের মাটি আর-এক রকম, সেজন্য আমও দু-রকম, তাদের স্বাদই আলাদা। দেশ-কাল-পাত্র এ সমস্তই বিচার করতে হবে।

বাংলার রেনেসাঁস কতকগুলি বিষয়ে দুর্বল। যেমন বিজ্ঞান, যেমন শিল্প মানে art, কিন্তু এটা মানতেই হবে যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ভারতচন্দ্রের উত্তরসূরি নন, 'মেঘনাদ বধ' হোমার-এর 'ইলিয়াড'কে মনে করিয়ে দেয়, 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'রও মডেল ল্যাটিন থেকে নেওয়া। গিরিশচন্দ্রের নাটক শেক্সপীয়রের অনুকরণ। থিয়েটার এসেছে বিদেশী আদর্শ থেকে। বাংলায় থিয়েটার আরম্ভ করেন যিনি সেই হেরেসিম লেবেডফ রাশিয়ার লোক। বাংলার থিয়েটার বাঙালির গর্ব। সেটা পুরাতন যাত্রার নতুন সংস্করণ নয়। আমরা সবচেয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছি উপন্যাসে ও লিরিক কবিতায়। একটির জন্য বঙ্কিমচন্দ্র ও অন্যটির জন্য রবীন্দ্রনাথ চিরস্মরণীয়। প্রবন্ধ আমাদের ভাষায় ছিল না। সংস্কৃত সাহিত্যেও না। এর জন্য আমরা ইংরেজির কাছে কৃতজ্ঞ। প্রবন্ধ লেখেন রামমোহন রায়, তাঁর পরে বিদ্যাসাগর। তাঁদের প্রবন্ধে আমরা আরো অগ্রসর হয়েছি। রবীন্দ্রনাথের পরে নাম করতে হয় প্রমথ চৌধুরীর ও 'সবুজপত্র' গোষ্ঠীর।

রেনেসাঁস বলতে আগে বলা হত বেঙ্গল রেনেসাঁস। তার মধ্যে পড়ত বাঙালির লেখা ইংরেজি রচনা। যেমন তরু দত্তের। যেমন লালবিহারী দের। অপর পক্ষে কয়েকজন ইংরেজও বাংলায় লেখেন। 'ফুলমণি ও করুণা' নামে একখানি উপন্যাস লেখেন একজন ইউরোপীয় খ্রিস্টান মহিলা, তাঁর নাম ক্যাথেরিন মূলেন্স। সেটিই বোধ হয় প্রথম বাংলা উপন্যাস। কেরি সাহেবও বাংলায় বই লিখেছিলেন। পরে বাংলা ভাষার উপর জোর দেওয়া হয়। ইংরেজি বর্জিত হয়। তরু দত্তকে স্থান দেওয়া হয় না। লালবিহারী দেকে মান দেওয়া হয় না।

বাঙালিদের অনেক কীর্তি বাদ পড়ে যায়। যেন রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কাজ, রমেশচন্দ্র দত্তের কাজ, শ্রীঅরবিন্দের কাজ।

আমাদের দেশেও এক প্রকার কাউন্টার রেনেসাঁস হয়। তাকে বলা হয় হিন্দু রিভাইভালিজম। বঙ্কিমচন্দ্র শেষ জীবনে একজন হিন্দু রিভাইভালিস্ট হয়ে ওঠেন। তাঁর কাজ জার্মান রেফর্মেশনের সঙ্গে তুলনীয় নয়। হিন্দু রিভাইভালিজমের সঙ্গে যুক্ত স্বামী বিবেকানন্দের নাম। অথচ অনেকে তাঁকে বেঙ্গলি রেনেসাঁসের একজন নায়ক বলে মনে করেন। এই যে বিভ্রান্তি এটা আমাদের রেনেসাঁসকে দ্বিধাগ্রস্ত করে। এই দ্বিধা আমরা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারিনি। হিন্দু রিভাইভালিজম ব্রাহ্ম সমাজের ধর্ম সংস্কার ও সমাজ সংস্কার নয়। তার সঙ্গে রামমোহন প্রবর্তিত ধারার কোনও মিল নেই। ডিরোজিয়ো ও ইয়ংবেঙ্গল হিন্দু কলেজের সঙ্গে যুক্ত। হিন্দু কলেজে হিন্দু ধর্ম শিক্ষা দেওয়া হত না। তার প্রিন্সিপাল

ছিলেন খ্রিস্টান। অনেক শিক্ষকও তাই। হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতারা ছিলেন বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোক। তাঁরা চেয়েছিলেন ইংল্যান্ডের কলেজের মতো একটি কলেজ যেখানে 'নতুন বিদ্যা', শেখানো হবে।

আগেকার দিনে ইতিহাস পড়ানো হত না, এখন ইতিহাস পড়ানো হয়। ভূগোল পড়ানো হত না, এখন ভূগোল পড়ানো হয়। মোট কথা হিন্দু কলেজ নামে হিন্দু হলেও চরিত্রে পাশ্চাত্য। ইয়ংবেঙ্গল যাঁদের বলা হয় তাঁরা ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই লিখতেন, তবে নতুন বিষয় নিয়ে লিখতেন। পরবর্তীকালে বাঙালি ভদ্রলোকের সন্তানরা ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই আত্মপ্রকাশ করতেন। তাঁদের আদর্শ হয়ে ওঠেন শেলি-কীটস-বায়রন প্রভৃতির রোমান্টিক কবিতা। আর স্কট-এর উপন্যাস।

তুষারকান্তি ঘোষ আমায় বলেছিলেন, তিনি ইংল্যান্ডে গিয়ে Strand নামক ম্যাগাজিনের পুরাতন সংখ্যা জোগাড় করেছিলেন। তিনি দেখতে পান ইংরেজিতে যেসব ছোটগল্প প্রকাশিত হয়েছিল তার অনেকগুলি বাংলায় রূপান্তরিত হয়েছে। বাংলা ছোটগল্প ইংরেজি ছোটগল্পের মানস সন্তান। ইংরেজি ছোটগল্প না হলে বাংলা ছোটগল্পই হত না। এটা লজ্জার বিষয় নয়। এরকম ঘটনা বিভিন্ন সাহিত্যে ঘটেছে। রাশিয়ানরা ফরাসি সাহিত্য অনুসরণ করত। রুশ অভিজাতের কাছে যেমন ফরাসি তেমনই বাঙালি মধ্যবিত্তের কাছে ইংরেজি। এই যে ইংরেজি চর্চা এটা স্বদেশী আন্দোলনের সময় লজ্জার বিষয় হয়। বাংলার রেনেসাঁসের দ্বিধাগ্রস্ততার এটাও একটা কারণ। বাঙালি সাহিত্যিক শিখবেন কার কাছ থেকে? মধ্যযুগের চণ্ডীদাস, কবিকঙ্কণ, কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাসের কাছ থেকে? না আরো পুরাতন সংস্কৃতজ্ঞদের কাছ থেকে? না সমসাময়িক হিন্দি কবিদের কাছ থেকে? নতুন নতুন বিষয়ে লিখতে হলে ইংরেজি অনুবাদের সাহায্যে ফরাসি জার্মান রুশ নরউইজিয়ন প্রভৃতি ভাষার সাহিত্যিকদের কাছ থেকে শিখতেই হবে। রেনেসাঁস যদি চালিয়ে যেতে হয় তবে স্বদেশী শিক্ষাই যথেষ্ট নয়। আন্তর্জাতিকতা চাই। তাকে সংক্ষেপে বলা হচ্ছে ইংরেজি শিক্ষা।

আমাদের রেনেসাঁসের দম ফুরিয়ে এসেছে। এখন অনেকে প্রশ্ন করছেন আদৌ রেনেসাঁস হয়েছিল কিনা। যাঁরা বলেন হয়নি তাঁরা কী করে বোঝাবেন বাংলা কাব্য থেকে দেবদেবীর কল্পনা উঠে গেল কেন। যে কোনও পুরানো বাংলা কাব্য পড়লে দেখবেন প্রথমেই আছে গণেশ বন্দনা অথবা সেই রকম কোনও দেবদেবীর বন্দনা। একটি কবিতায় ছিল 'বন্দে মাতা সুরধনী পুরাণে মহিমাসনী'। এটি হল গঙ্গার বন্দনা। এই যে রীতি এটা আবহমান কালের বাংলা কবিতার রীতি। এই রীতি নতুন যুগের বাঙালি কবিরা অনুসরণ করেননি। রবীন্দ্রনাথ তো নয়ই। তাঁকে বলা হত বাংলার শেলি, ইংরেজ কবিরাও গ্রিক কবিদের অনুকরণ করতেন। ইংরেজি নাট্যকাররাও ইটালীয় নাট্যকারদের অনুকরণ করতেন। সুতরাং এটা বাঙালির অনুকরণপ্রিয়তা নয়। এর জন্য রেনেসাঁসকে একেবারে অস্বীকার করার কারণ নেই। এ-বিষয়ে পুনর্ভাবনার অবকাশ আছে।

এক কথায় বলা যেতে পারে একজনের বাতি থেকে আর-একজন বাতি ধরিয়ে নেয়, ইংল্যান্ডের বাতি থেকে বাংলা বাতি ধরিয়ে নেয়। বাংলার রেনেসাঁস এসেছে ইংল্যান্ড থেকে, ইটালি থেকে নয়, ইংরেজি থেকে, সংস্কৃত থেকে নয়। হিন্দু কলেজে সংস্কৃত শেখানো হত না, তার জন্য সংস্কৃত কলেজে যেতে হত। সেখানে যেতেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলেরা, পরে কায়স্থের ছেলেরা। বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেক চেষ্টা করে নবশাখদের ছেলেদের ভর্তি

করাতে পেরেছিলেন, কিন্তু সুবর্ণবণিকদের পুত্রদের কোনওমতেই না। শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা কাওয়েল সাহেব নির্দেশ দেন যে সব জাতের ছেলেরা সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হতে পারে। তখন অধ্যাপকরা বাধা দিতে পারেন না। সেটা তাঁদের ঔদার্যের জন্য নয়, ইংরেজ শাসনের নিরপেক্ষতার জন্য।

ড. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় অনেক যত্ন করে এই বই লিখেছেন। তাঁকে আমি আমার অভিনন্দন জানাই।

আট

মৌলবাদ প্রসঙ্গে

আমার এক প্রতিবেশী লিবিয়াতে কিছুদিন অধ্যাপনা করেছিলেন। একদিন তাঁর কলেজের এক ছাত্র অনুযোগ করে, "এসব আপনি কী বলছেন? এসব কথা তো কোরানে নেই? কোরানে আছে আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করেছিলেন। আমরা আদমীরা আদমের বংশ। আপনি বলছেন ডারউইনের মতে আমাদের পূর্বপুরুষ ছিলেন একজাতীয় বানরগোষ্ঠীর প্রাণী। বিবর্তনসূত্রে আমরা মনুষ্য হয়েছি। এই তত্ত্ব যদি সত্য হয় তবে কোরান ভ্রান্ত। তা কী করে হবে? কোরান যে আল্লাহর বাণী।"

অধ্যাপক পড়ে যান বিষম ফাঁপরে। বলেন, "আধুনিক বিজ্ঞান শেখাতেই আমি এদেশে এসেছি। আধুনিক বিজ্ঞান যদি শিখতে চাও তো আমার কাছে শিখবে। কোরানের সৃষ্টিতত্ত্ব আমার আলোচ্য বিষয় নয়। আমি দুঃখিত।"

এর কিছুদিন পরে তিনি লিবিয়া থেকে বিদায় নেন। সেটা অন্য কারণে। ছাত্রদের সঙ্গে মতভেদের দরুন নয়।

কিন্তু মতভেদটা ফাণ্ডামেন্টাল। অর্থাৎ মূলগত। কোরান বনাম বিজ্ঞান। কোরান অভ্রান্ত হলে বিজ্ঞান ভ্রান্ত। বিজ্ঞান ঠিক হলে কোরান ভুল। ক'জন মুসলমান এটা সহ্য করতে পারে? তাই বিজ্ঞানচর্চা মুসলিম দুনিয়ায় অনগ্রসর। বিদেশ থেকে আধুনিকতম মারণাস্ত্র আমদানি করলে কী হবে, তাদের সাহায্যে নির্মাণ করলেই বা হবে কী, মানসিকতা বিজ্ঞানচর্চার উপযোগী নয়। মুসলিম দুনিয়ায় যুক্তির যুগ আসতে আরো কয়েক পুরুষ লাগবে। অথচ জাপানে এক পুরুষই যথেষ্ট। তাই বলে জাপানীরা তাদের ধর্মবিশ্বাস হারায় নি। তবে তাঁদেরও এক জায়গায় যুক্তিহীনতা লক্ষ্য করা যায়। তাদের সম্রাট নাকি স্বয়ং সূর্যদেবীর বংশধর। সূর্য জাপানে স্ত্রীলিঙ্গ।

মুসলমানদের যেমন কোরান অভ্রান্ত বিজ্ঞান ভ্রান্ত, হিন্দুদের তেমনি রামায়ণ অভ্রান্ত, ইতিহাস ভ্রান্ত। রাম সত্যযুগে জীবিত ছিলেন। প্রায় ন'লক্ষ বছর আগে। তাঁর রাজধানী অযোধ্যা আজকের এই অযোধ্যা, তাঁর জন্মস্থানটুকুও আজ অবধি যেমনকে তেমন। বিশ্বাসে মিলায়ে রাম তর্কে বহু দূর। হিন্দুরা কোনো দিন ইতিহাস লেখেনি, রাজতরঙ্গিনী ব্যতিক্রম। রামায়ণ মহাভারত ও অষ্টাদশ পুরাণই তাদের কাছে ইতিহাস। সেকালের ঐতিহাসিকরা ভ্রান্ত হতে পারেন, কিন্তু সেকালের কবি ও পুরাণকারীরা অভ্রান্ত।

আমাদের ঐতিহাসিকরাও রামায়ণ মহাভারতকে পুরোপুরি কাল্পনিক বলতে ভয় পান।

অথচ ইতিহাসের সঙ্গে মেলাতেও পারেননা। আর্যভাষীদের আগমন যদি খ্রিস্টপূর্ব বিংশ শতকের চেয়ে প্রাচীন না হয় তবে রামায়ণ মহাভারতের ঘটনা আরো প্রাচীন। নতুবা আর্যভাষীদের আগমনের পর ঘটিত ও আরো পরে গ্রথিত। ঘটনার কোথাও কোনো পাথুরে প্রমাণ নেই। মৌলবাদীদের কাছে তার দরকারও নেই। বাল্মীকি ও ব্যাস অভ্রান্ত। অথচ পণ্ডিতদের মতে এক-একখানি মহাকাব্য কয়েক শতক ধরে রচিত হয়েছে। একাধিক রচয়িতার হাত আছে।

এক মুসলিম অধ্যাপক আমাকে চাপা গলায় বলেছিলেন কোরানে তিনজনের হাত স্পষ্ট। একথা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করার সাহস তাঁর ছিল না। নইলে সলমান রুশদির হাল হতো। রুশদিকে আপাতত বাঁচিয়েছেন ব্রিটিশ সরকার। এঁকে বাঁচানো কারো সাধ্য ছিল না। কিন্তু একদিন না একদিন বিচার-বিবেচনার দিন আসবে। যেমন এসেছে খ্রিস্টান দুনিয়ায়। এখন রোমান ক্যাথলিক পাদ্রীরাও বিশ্বাস করেন যে পৃথিবী গোলাকার ও সূর্যকে ঘিরে প্রদক্ষিণ করছে। অথচ একথা বলার অপরাধে গ্যালিলিওকে পুড়িয়ে মারার হুমকি দেওয়া হয়েছিল। তিনি কথা ফিরিয়ে নিয়ে মার্জনা ভিক্ষা করেন।

বছর পঁয়ত্রিশ আগে আমি কালিম্পং যাই। আলাপ হয় তিব্বতী শরণার্থী লামাদের সঙ্গে। তাঁরা সকলেই বিদ্বান। একজন আমাকে তাঁর একরাশ পুঁথি দেখিয়ে বলেন, "আমার এই পুঁথিগুলি প্রকাশিত হলে বিশ্ববাসী জানতে পারবে যে পৃথিবী চতুষ্কোণ। আমি অনেক পরিশ্রম করে প্রমাণ করেছি এ সত্য।"

আমি তো অবাক। পৃথিবী চতুষ্কোণ! হ্যাঁ, ছেলেবেলায় শুনেছি বটে চারদিকে চার দিগহস্তী। চারটে দিক যদি থাকে। তবে চতুষ্কোণ না হবে কেন? পরে জাপানী বৌদ্ধমন্দিরে চার দিকপাল দেখেছি। বৌদ্ধরা চার দিকপালে বিশ্বাস করেন। এক একজনের এক এক নাম।

লামাকে আমি জিজ্ঞাসা করি, সমুদ্রগামী জাহাজ কেমন করে পশ্চিমদিকে যাত্রা করে পূর্বদিকে ফিরে আসে? তিনি এর যে বিচিত্র ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তা আমার স্মরণ নেই। তিনি সমুদ্র দেখেন নি, জাহাজে চড়েন নি। তিব্বতে বসে পুঁথিই পড়েছেন ও লিখেছেন। এমন মানুষ মৌলবাদী হবেন না তো আর কে হবেন? জানিনে এখন তিনি কোথায়? পরে নিশ্চয় নানা দেশ ঘুরে মত বদলেছেন।

মৌলবাদীরা হিন্দুই হোন আর মুসলমানই হোন আর বৌদ্ধই হোন আর খ্রিস্টানই হোন তাঁরা আঁকড়ে ধরে বসে আছেন অতি পুরাতন কতগুলি শাস্ত্রবাক্যকে বা পুরাণকাহিনীকে। তাঁদের আশঙ্কা আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান তাঁদের মূল প্রত্যয়গুলিকে টলিয়ে দেবে। পৃথিবী গোল হলে স্বর্গ তার ঊর্ধ্বে হয় কী করে? দেবতারা থাকে কোথায়? তবে কি স্বর্গ নেই কোনোখানে? বিভিন্ন শাস্ত্রে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্ব প্রশ্ন-সাপেক্ষ হয়ে যায়। বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদ তাঁরা মানেন না। মানলে সব ঢেলে সাজাতে হয়। অনেকগুলি মূলবিশ্বাসে আঘাত লাগে। আঘাত কাটিয়ে ওঠা শক্ত। চন্দ্রগ্রহণে এখনো আমাদের হাঁড়ি ফেলা হয়।

প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণের কখনো প্রাণদণ্ড হত না। এমন কি মধ্যযুগে মুসলিম আমলেও না। প্রথম প্রাণদণ্ড হয় ব্রিটিশ আমলে মহারাজা নন্দকুমারের। এ তথ্য আমি পেয়েছি তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের লেখা থেকে। প্রাণদণ্ড আর সকলের হতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মণের নয়, যদিও সে খুনের অপরাধী। এখন হিন্দুরাষ্ট্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার রব যাঁরা তুলছেন

তাঁরা যদি সফল হন তবে প্রাণদণ্ড ব্রাহ্মণের হবে না। তার অর্থ হিন্দুরাষ্ট্র হবে, সেই রাষ্ট্র যে রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণ হবে প্রথম শ্রেণীর নাগরিক, ক্ষত্রিয় দ্বিতীয় শ্রেণীর, বৈশ্য তৃতীয় শ্রেণীর, শূদ্র চতুর্থ শ্রেণীর। পুরুষরা উচ্চতর, নারীরা নিম্নতর অধিবাসী। পুরুষ স্বাধীন নারীরা পরাধীন। ন স্ত্রীস্বাতন্ত্র্যমর্হতি।

হিন্দুশাস্ত্রে স্ত্রী ও শূদ্র একই বন্ধনীভুক্ত। সেবার জন্যেই তাদের সৃষ্টি। স্বামী ও স্বামীপরিবারের সেবা। উচ্চতর বর্ণের সেবা। বেদ ও বিদ্যায় অধিকার নেই। পড়াশুনা করবেই বা কখন? মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাবে আট ন'বছর বয়সে। আর চাষী বা তাঁতি বা কামার বা কুমারের ছেলেকে কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয় সেই বয়স থেকে। নারী ও শূদ্র উভয়েরই স্থান নিম্নে। এইভাবে হাজার হাজার বছর কেটে যাবার পর গত শতাব্দী থেকেই তাদের সামাজিক মর্যাদা বাড়তে আরম্ভ করেছে। তারা লেখাপড়ার সুযোগ পেতে শুরু করেছে। বিদ্যালাভের সুযোগ লাভের ফলে নারী ও শূদ্র উভয়েই এখন উচ্চ পদ অধিকার করছে। যারা তেমন সুযোগ থেকে বঞ্চিত তাদেরও ভোট দেবার অধিকার আছে। নারী ও শূদ্রের ভোট সরকার গঠনে সহায়ক। সরকার বদলেও। যারা কোনো যুগেই সংস্কৃত পড়তে পেত না আজকাল তাদের সকলের পক্ষে সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অবশ্যপাঠ্য বিষয় করতে হবে বলে দাবি উঠেছে। তবে বেদপাঠের অধিকার এখনো স্বীকৃত হয়নি। সেটা ব্রাহ্মণদের মনোপলি।

বাইবেলও একদা খ্রিস্টান সন্ন্যাসীদের মনোপলি ছিল। লাটিন ভিন্ন অন্য কোনো ভাষায় অনুবাদ করতে দেওয়া হত না। মার্টিন লুথার বিদ্রোহী হয়ে জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দেন। ইউরোপের শিক্ষার ব্যবস্থা সন্ন্যাসীদের হাতেই ছিল। তারা সাধারণকে প্রাথমিক শিক্ষাই দিতেন। তার বেশি নয়। পরে পুরুষ সাধারণের জন্যে দরজা খুলে যায়। নারী সাধারণের জন্যে খুলতে আরো দেরি হয়। নারী ও শূদ্র জাগরণ ইউরোপের খ্রিস্টান সমাজেও গত দুই শতাব্দীর পূর্বে নয়। এদেশে যারা শূদ্র সে দেশে তারা অন্য নামে অভিহিত। চাষী বা করিগর বা মজুর বা দাস। ওয়ার্কিং ক্লাস বলে তাদের প্রতি ভদ্রতা দেখানো হলেও ভিতরে ভিতরে ছোটলোক ভাবা হয়। তাই বিপ্লবের প্রয়োজন দেখা দেয়। বিপ্লব সফল হলে ছোটলোক আর ছোটলোক থাকে না। বনে যায় ডিকটেটর তথা পলিটবুরোর সদস্য। নারীর জন্যেও সব দরজা খুলে যায়।

চীনদেশেও নারী ও শূদ্রের অবস্থা হীন ছিল। সান ইয়াৎ-সেনের বিপ্লব নারীকে ও মাও সে-তুঙ্গের বিপ্লব শূদ্রকে হীনতা থেকে উদ্ধার করে। চীনে যেটা বিপ্লবের দ্বারা সাধিত হয়েছে, জাপানে সেটা বিপ্লব বিনা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু যুদ্ধ বিনা নয়। পরাজিত জাপান নারীকে মুক্তি দিয়েছে ও শূদ্রের সঙ্গে সন্ধি করেছে।

মৌলবাদ নারী ও পুরুষের সমান অধিকার, উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের সমান অধিকার, সমান মর্যাদা স্বীকার করে না। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, মুসলমান কোনো সমাজেই এর স্বীকৃতি আধুনিক যুগের পূর্বে ছিল না। শাস্ত্রেও না। থাকলেও কার্যত অস্বীকৃত। এখন মৌলবাদ বলতে যা বোঝায় তা পুরাতন প্রত্যাবর্তন বা পুরাতনের প্রত্যাবর্তন। মৌলবাদীরা বিবর্তনে বিশ্বাস করেন না। তাঁদের কাছে পুরাতনই সনাতন। ধর্মের মধ্যে সনাতন নিশ্চয়ই অনেক কিছু আছে। কিন্তু তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বিস্তর সাময়িক প্রয়োজনজাত নিয়ম-কানুন আচার-অনুষ্ঠান। যা যার সত্য তা কালজয়ী, কিন্তু প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে নিয়ম-কানুন

আচার-অনুষ্ঠান ক্রমশ অচল বা অচলিত হয়ে পড়ে। মৌলবাদ অচলকে সচল করতে চান। অচলিতকেও প্রচলিত।

আধুনিক জগতে মৌলবাদীদের সবচেয়ে বেশি প্রচার মুসলিম দুনিয়ায়। সেখান থেকে রাজতন্ত্র ক্রমে উঠে যাচ্ছে, কিন্তু রাষ্ট্র বহু ক্ষেত্রেই পড়েছে সেনাপতিদের কবলে। তাঁদের মিত্র মোল্লারা। সুতরাং মৌলবাদ প্রবল। ইরানে মোল্লারাই বিপ্লব ঘটিয়েছেন। সেনাপতিরা তাঁদের অনুগত। যুদ্ধে ইরান ইরাককে হারিয়ে দিতে পারেনি। ইরাক মোল্লা কবলিত নয়, তবে গণতন্ত্রীও নয়। গণতন্ত্র মুসলিম দুনিয়ার কোথাও যদি থাকে তবে ফরাসী প্রভাবিত টিউনিসে কিংবা সেনেগালে। কামাল পাশা প্রজাতন্ত্রী ছিলেন, কিন্তু গণতন্ত্রী ছিলেন না। ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন, কিন্তু সিভিলের চেয়ে মিলিটারি শাসনে বিশ্বাস করতেন। তাঁর পর থেকে তুরস্কের প্রজাতন্ত্রে সিভিল যদি উপরে ওঠে তো মোল্লারা প্রবল হয়, কারণ ভোটাররা ধর্মপ্রাণ মুসলমান। সিভিলকে হটিয়ে দিয়ে মিলিটারি হর্তাকর্তা হলে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রবল হয়। ভোটারদের দ্বারস্থ হতে হয় না। তুরস্কে খ্রিস্টানও আছে। তা ছাড়া তুরস্ক চায় পশ্চিমের সঙ্গে গা মিলিয়ে নিতে। তুরস্কের একাংশ ইউরোপের অঙ্গ। তুরস্ক সুইস দণ্ডবিধি আইন, রোমান লিপি তথা পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা বেছে নিয়েছে। তবে অশিক্ষিত জনগণের উপর মোল্লাদের প্রভাব কম নয়। কিন্তু সেনাপতিরা তার ঊর্ধ্বে। এটা ইন্দোনেশিয়া সম্বন্ধেও বলা যায়। রাষ্ট্রপতি সুহর্তোর পত্নী খ্রিস্টান।

মুসলিম রাষ্ট্র পৃথিবীতে চল্লিশটির চেয়েও বেশি, কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্র হলেই ইসলামী রাষ্ট্র হয় না। ইসলামী রাষ্ট্র হতে হলে শরিয়তী আইন মেনে চলতে হবে। অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্র ছিল ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, বেলজিয়াম, ইটালিয়ান প্রভৃতি পাশ্চাত্য শক্তির অধীনে। তারা চালিয়ে দিয়ে যায় তাদের দেশের আধুনিক আইন। সেসব আইন এখনো চালু রয়েছে। তাতেই জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, উকিল, ব্যারিস্টারদের সুবিধে। তাতেই তাঁরা অভ্যস্ত। শরিয়তের সঙ্গে তাঁরা অপরিচিত। তা ছাড়া শরিয়ত এখন দেশকালপাত্র উপযোগী নয়। ইতিহাস তাকে অনেক পেছনে ফেলে এসেছে।

ইসলামী রাষ্ট্রে মদ হারাম। কিন্তু মদ না হলে সৈনিকদের চলে না। কূটনীতিকদের চলে না। সুদ হারাম। সুদ না থাকলে ব্যাঙ্ক অচল। নৃত্য গীত বাদ্য হারাম। এসব না থাকলে সংস্কৃতি বিকল। চিত্রকলায় ও ভাস্কর্যে প্রতিকৃতি হারাম। প্রতিকৃতি না থাকলে স্মৃতিচিহ্ন লোপ পায়। বাবর, হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, আওরাংজেব, নূরজাহান, মমতাজ মহল এঁদের প্রতিকৃতি আঁকা হয়েছিল বলেই আমরা এঁদের চেহারা ও বেশভূষা কেমন ছিল তা জানতে ও মনে রাখতে পারি। মোগলরা শরিয়ত মানতেন না, একজন বাদ। ইসলামী রাষ্ট্র ভারতের মাটিতে সম্ভব হয়নি। এটা দারুল ইসলামী নয়, দারুল হরব। বাংলাদেশ ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করেছে, রাষ্ট্রকে ইসলাম রাষ্ট্র করেনি। সরকারের আয়ের একটা মোটা অংশই আসে আবগারি থেকে। সরকারি ব্যাঙ্ক চালাতে গিয়ে যদি ভরতুকি দিতে হয় তো ট্রেজারি খালি হয়ে যাবে। আমলারা মাইনে পাবেন না। এসব পরীক্ষা নিরীক্ষা কেতাবেই শোভা পায়।

মৌলবাদ একটা কেতাবী মতবাদ। যেমন মোল্লাদের বেলা তেমনি পাদ্রীদের বেলা, তেমনি পুরোহিতদের বেলা, তেমনি রাব্বিদের বেলা। ইসরায়েলের রাব্বিরা সে রাষ্ট্রকে সেকালের ধর্মরাষ্ট্রে পরিণত করতে সচেষ্ট। বাধা দিচ্ছেন যাঁরা ইহুদী জাতির জন্য রাষ্ট্র

প্রতিষ্ঠা করেছেন, ইহুদী ধর্মের জন্য নয়। অর্থাৎ ইহুদী বুদ্ধিজীবীরা। ইরানের মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা স্বেচ্ছায় নির্বাসিত হয়ে প্যারিসে বসবাস করছেন। ফ্রান্স ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। ইরানী বুদ্ধিজীবীরা অপেক্ষা করছেন। তাঁদের দেশের মৌলবাদীদের পতন হলে ফিরে আসবেন। মৌলবাদ ও বিপ্লব একসঙ্গে চলতে পারে না। তারা পরস্পর-বিরোধী। বিপ্লব যদি সত্যিকার হয় তবে মৌলবাদ পরিত্যক্ত হয়। আর মৌলবাদ যদি সত্যিকার হয় তবে বিপ্লব একটা কথার কথা। তা দিয়ে জনগণের সবাইকে কিছুদিন বোকা বানানো যায়, কিছু লোককে চিরদিন বোকা বানানো যায়, কিন্তু সবাইকে চিরদিন বোকা বানানো যায় না। ধর্ম মসজিদে থাকলে কারো কোনো আপত্তি থাকে না, কিন্তু মসনদে বসলে তারও একটা বিরোধী পক্ষ থাকবে ও বাড়বে। পরে একদিন সেও মসনদে বসবে।

বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ ছিল রাজতন্ত্রী। মাত্র কয়েকটা দেশ প্রজাতন্ত্রী। সেগুলি উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায়। শতাব্দীর শেষপ্রান্তে দেখা যাচ্ছে চাকা ঘুরে গেছে। অধিকাংশ দেশই প্রজাতন্ত্রী, মাত্র কয়েকটা রাজতন্ত্রী। রাজতন্ত্রের সঙ্গে রাজধর্ম ছিল ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ব্রিটেনের রাজাকে প্রটেস্টান্ট হতেই হবে নইলে পার্লামেন্ট তাঁকে স্বীকৃতি দেবে না। চার্চ অব ইংলন্ডের প্রধান আর্চবিশপ তাঁর মাথায় মুকুট পরাবেন না। সৈনিকরা রাজভক্তির শপথ নেবে না। চার্চের প্রভাব পূর্বের তুলনায় ক্ষীণ হলেও এখনো প্রচুর। তবে জাপানীরা যদিও তাদের সম্রাটকে দেবতা জ্ঞান করে তবু তাদের নতুন সংবিধান হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ। সম্রাট স্বয়ং শিন্তো। কিন্তু শিন্তো ধর্ম আর রাজধর্ম নয়। জাপান শিন্তো রাষ্ট্র নয়।

এই যে পরিবর্তনের হাওয়া এটা আজকাল সব দেশে বইতে শুরু হয়েছে। রাজা যেখানে নেই সেখানে তাঁর শূন্যতা পূরণ করেন রাষ্ট্রপতি। তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি। রাষ্ট্রপতি বা প্রধান বিচারপতি হিন্দু বা মুসলমান বা খ্রিস্টান বা বৌদ্ধ হতে বাধ্য নন, যদি রাষ্ট্র হয়ে থাকে ধর্মনিরপেক্ষ। তার ফলে শূন্যতা পূরণ করার জন্যে ব্রাহ্মণের বা শ্রমণের বা বিশপের বা উলেমার ডাক পড়ে না। তাঁরা পরিবর্তে পান না নিষ্কর ভূমি বা প্রভূত অর্থ। তাঁরা তাহলে বাঁচবেন কী করে? তাঁদের পক্ষে এটা একটা জীবনমরণ সমস্যা।

তাই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বহুসংখ্যক প্রজাতন্ত্রী দেশে পার্লামেন্টের সাহায্যে বা পার্লামেন্টকে উৎখাত করে সেনাপতিদের সাহায্যে রাষ্ট্রকে করা হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র বা খ্রিস্টিয় রাষ্ট্র। ফিজির সেনাকবলিত রাষ্ট্র খ্রিস্টধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম করেছে। রাষ্ট্রধর্মের পরবর্তী সোপান ধর্মরাষ্ট্র। আমাদের প্রতিবেশী পাকিস্তান ইতিমধ্যে ইসলামী রাষ্ট্র হয়েছে। এখন সেখানকার মোল্লারা দাবি করছেন যে পার্লামেন্টে যেসব আইন পাশ করবে সেসব পেশ করতে হবে শরিয়তী অধিকরণে। সুপ্রিম কোর্টের উপরেও সেই অধিকরণের স্থান। কোরানে এরকম কিছু থাকলে সেটা সুলতানী তথা মোগল আমলেও দেখা যেত। কিন্তু কয়েকটা মুসলিম রাষ্ট্রে এ রকম দাবি উঠেছে। এর মূল কারণ রাজতন্ত্রের শূন্যতায় মোল্লাদের প্রাধান্য খর্বতা।

একই কারণে হিন্দু রাষ্ট্রর দাবি উঠেছে। নেপালের গণতন্ত্রী সরকার সে দেশকে ধর্মনিরপেক্ষ করতে গিয়ে বাধা পাচ্ছেন। প্রাধান্যভোগীরা হিন্দুরাষ্ট্র বহাল রাখতে বদ্ধপরিকর। ভুটান একটি বৌদ্ধ রাষ্ট্র। তাকে ধর্মনিরপেক্ষ করতে গেলে একই রকম বাধা আসবে। সুতরাং পাকিস্তানের দৃষ্টান্তটা খাপছাড়া নয়। এখন বাংলাদেশ কী করে দেখা যাক।

ইসলামকে সে রাষ্ট্রধর্ম করেছে, কিন্তু রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্র করেনি। বুদ্ধিজীবীরা এর বিপক্ষে ধর্মজীবীরা স্বপক্ষে। মৌলবাদ জিতবে না হারবে কে বলতে পারে?

বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা পা মিলিয়ে নিচ্ছেন ইউরোপ আমেরিকার প্রগতিপন্থীদের সঙ্গে। আর ধর্মজীবীরা পা মিলিয়ে নিতে সাধারণ মানুষকে শেখাচ্ছেন মধ্য প্রাচ্য ও মধ্য যুগের ঐতিহ্যপন্থীদের সঙ্গে। একপক্ষ সফল হলে অপর পক্ষ বিফল। এটা একটা মৌল বিরোধ। বাংলাদেশে নাগরিকমাত্রেরই ভোট দেবার অধিকার আছে। নির্বাচন যদি অবাধ ও নিরপেক্ষ হয় তা হলে ব্যালটের দ্বারাই জয়-পরাজয় নির্বাচিত হবে। বুলেটের প্রয়োজন হবে না। কিন্তু নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হবে কিনা তাই বা কে বলতে পারে?

কুমিল্লা থেকে বেড়াতে এসেছেন এক হিন্দু ভদ্রমহিলা। আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে প্রতীতির সঙ্গে বললেন, "বাংলাদেশে মৌলবাদ হেরে যাবেই। সাধারণ মুসলমান সাম্প্রদায়িক নয়। দেদার টাকা আসে মৌলবাদীদের হাতে মিডল ইস্ট থেকে। সেটাই একমাত্র কারণ।"

তিনি একথাও বলেন, "যারা এত কষ্ট পেয়ে দেশকে মুক্ত করেছে তারা কি হেরে যেতে পারে! পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের অনেক তফাত।"

নয়

রাষ্ট্র, ধর্ম ও জনগণ

অবাধ স্টেট পাওয়ার অবাধ ইনটলারেনস-এর জনক। এটাই ইতিহাসের শিক্ষা। রাষ্ট্র কর্ণধারগণ যেখানে একনায়কত্ব চান তারা আসলে চান পাওয়ার। তার মতেই শেষ মত সাম্রাজ্য বিস্তার, পররাজ্য গ্রাস—ফ্যাসিবাদ। তেমনি নাৎসীবাদ—জাত্যভিমান ভিত্তি করে চূড়ান্ত ডিক্টেটরশিপ। দেশ শাসনের নামে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল, একচ্ছত্র ক্ষমতা হস্তগত করে যথেচ্ছাচার। বল্গাহীন ক্ষমতা দখল করে সেই জনগণের ওপর অমানবিক অত্যাচার। হিটলারের হাতে য়ুরোপে ইহুদি ধ্বংস আফ্রিকায় মুসোলিনীর হাতে অসহায় কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের ওপর অত্যাচার। এভাবে একনায়ত্বের চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে। একজনের হাতে সার্বিক শাসন ক্ষমতা—State Power. জনগণের হাতে কোনো প্রতিকারের উপায় থাকে না, জনমতের কোনো দাম নেই। সুপ্রিম পাওয়ার যেখানে একজন শাসনকর্তার হাতে তার মতই হয় শেষ পথ। নান্যঃ পন্থাঃ। অন্য পথে গেছ কি মরেছ। রাজনীতির ক্ষেত্রে এটা এখনো চলছে পৃথিবীর বহু দেশে। পাওয়ার দখলের লড়াই। প্রজাগণের যত সর্বনাশ, আত্মকেন্দ্রিক শাসক ও অমাত্যের ততই পৌষমাস। কোন দেশটা বাদ? হাতে গোনা ক'টা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ছাড়া প্রায় সব দেশেই জনপথ জনস্বার্থ মূল্যহীন হয়ে পড়েছে, বিশেষ করে আফ্রিকায় ও এশিয়ায়। য়ুরোপের কটা ছোট রাজ্যেও সংক্রামিত হয়েছে রাষ্ট্রশক্তির মানবতা বিরোধী যথেচ্ছাচার, যেমন সারবিয়া ও চেচনায়।

ধর্মের নামেও ক্ষমতা দখল, কোথাও বা ধর্মনেতার হাতেই স্টেট পাওয়ার, আবার ধর্মনেতার সমর্থন নিয়ে সর্বময় কর্তৃত্বে বসেন সামরিক গোষ্ঠী, যেমন আফগানিস্থানে, এমন

কি পাকিস্তানেও, বাংলাদেশে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট এরশাদও একই দৃষ্টান্ত।

আসলে মানুষের ধর্ম সেখানেই সার্থক যেখানে পরমত-সহিষ্ণুতার স্বাভাবিক বিকাশ। বড় দৃষ্টান্ত শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি বলেছেন যত মত তত পথ। নিজের জীবনই দৃষ্টান্ত। তাঁর ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যেও রয়েছে এই মুক্ত মনোভাব। ধর্ম সমন্বয়। শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিয়েছিলেন মনুষ্যত্বের পথ। ভারতের এটাই শিক্ষা। প্রাচীন কাল থেকে।

রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বর্তমান যুগেও ভারতে এই নীতির স্বীকৃতি রয়েছে। স্বাধীন ভারতের সংবিধানে ভারত ধর্মনিরপেক্ষ সেক্যুলার স্টেট। রাজকার্যে ধর্মীয় ইতরবিশেষ নেই। ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মাচরণে জনগণের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। যেটা একান্তভাবে দরকার তা হচ্ছে পরমতসহিষ্ণুতা, পারস্পরিকতা, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ঐক্যবোধ। তা সত্ত্বেও হিংসা, খুন, জখম, রক্তপাত এসব এখনো চলছে, কাগজ খুললেই রোজ এসবই বড় খবর। তার জন্য দায়ী রাজনৈতিক রেষারেষি। সেই Power hunger, ক্ষমতা দখল, গ্রাম দখল, এলাকা দখল। এটা কিছুটা মজ্জাগত। আগেও ছিল না তা নয়। হিংসার তাণ্ডব, বন্দুক বোমা বিস্ফোরণ হয়তো ছিল না। কিন্তু দখল মনোভাবটা ছিল।

বহু বছর আগে সত্তর দশকের প্রথম দিকে নিজের এক অভিজ্ঞতা মনে পড়ছে। তমলুকে এক সম্মেলনে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যান আমাকে। বিকেলে ফিরে আসার পথে পাঁশকুড়া স্টেশনে ট্রেনে তুলে দিতে আসেন স্থানীয় এস. ডি. ও সাহেব। তার কাছে স্থানীয় খবর নিচ্ছি—দূরে গ্রামগুলির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, ওসব এলাকা এখন বিভিন্ন পার্টির দখলে—ওগুলো কংগ্রেস, ওদিকের গ্রামে সি.পি.আই. কোনো কোনো গ্রামে ফরোয়ার্ড ব্লক। আমি বুঝলাম, রাজনৈতিক লড়াই-এর পরিণতি এরকম গ্রাম দখল। তবে এখন যেভাবে জবরদস্তি খুনোখুনি, বিপক্ষের ঘর বাড়ি লুঠ, আগুন এসব কল্পনাও করা যেত না। হাকিম পুলিশ বিচার এসব ব্যবস্থা আগে এতটা ভেঙে পড়েনি, মানুষের ভয় ছিল, কিছুটা আস্থাও ছিল। সাধারণ মানুষের মনে এত প্রবল জিঘাংসা রয়েছে, আমার বিশ্বাস হয় না। রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য এটা ঘটেছে—কখনো এই পার্টি কখনো অন্য পার্টি উস্কানি দিয়ে চলেছে, জল ঘোলা করে তুলছে।

ধর্ম ধর্ম করে একদল লোক এভাবে ক্ষেপিয়ে তুলছে জনগণকে রাজনৈতিক সমর্থনও পাচ্ছে তারা রাষ্ট্র, সরকার থেকে, পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে। এটা সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক ও অনৈতিক। তাছাড়া দেশের সংবিধান বিরোধী। এই একটা কারণেই কঠিন শাস্তি হতে পারে। কিন্তু হাজার দোষ করেও মুক্তি পেয়ে যাচ্ছে ধর্মের দোহাই পেড়ে। ভারতে এটা চলতে পারে না। আবার সম্বিত ফিরে পেতে হবে। সাধারণ মানুষ শান্তিতে বসবাস করতে চায়। ধর্মের জিগির তুলে বড় ছোট মাঝারি নেতারা যদি ক্ষমতা দখল, পাওয়ার ক্যাপচার, রাজনৈতিক স্বার্থ পূরণ করে। এসব বন্ধ করলে তবে সমন্বয় হবে, শান্তিও হবে। এর জন্য হৃদয় পরিবর্তন দরকার। শুধু আইন, পুলিশ সৈন্যসামন্ত দিয়ে এটা হবে না। প্রেরণার জন্য রয়েছে কবির এই বাণী।

'এসো হে আর্য এসো অনার্য হিন্দু মুসলমান
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ এসো এসো খৃষ্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করো মন ধরো হাত সবাকার
এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমান ভার।'

মনকে শুচিশুদ্ধ করাটাই বড় কাজ, হৃদয় পরিবর্তন।

রাষ্ট্রের কাছে ভিন্ন ধর্ম বিশ্বাসী মানবগোষ্ঠী সমান, কেউ আপন কেউ পর তা নয়। 'In the eyes of the State, everybody is equal.' গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাজ ধর্ম নিয়ে নয়, তার দায়িত্ব শিক্ষা স্বাস্থ্য কৃষি শিল্প প্রভৃতির সঠিক উন্নয়ন, দেশে শান্তি রক্ষা, দেশ রক্ষা, জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি অর্থাৎ জাতিকে বড় করে তোলা, আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা, এসব কাজ। ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখতে এটাই মূল কথা।

এশিয়ায় আরো সেকুলার স্টেট রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান জাপান, বিভিন্ন ধর্মমত রয়েছে জাপানে—সিন্টো, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান প্রভৃতি। রাজা স্বয়ং হয় সিন্টো, কিন্তু রাষ্ট্রের কাছে এর গুরুত্ব নেই। রাজা তুমি তোমার ধর্ম নিয়ে থাক। রাষ্ট্র করবে তার নিজের কাজ, ধর্মের ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে জড়াবে না। সংবিধানের অনুশাসন লঙ্ঘন করা যাবে না। বাস্তবিক পক্ষে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ভারতের আগেই জাপান সেকুলার। স্বাধীনতার আগে ব্রিটিশ ভারতের এ বিষয়টা খুব স্বচ্ছ ছিল না। Anglican চার্চের প্রাধান্য ছিল, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। কলকাতায় সেন্ট পলস ক্যাথেড্রাল করেছেন ওরা, এখনো রয়েছে। ইংলন্ডে Anglican চার্চ, কাজে কাজেই এদেশেও।

আমরা এসব যেমন তুলে দিয়েছি আবার একটার বদলে আরেকটা এনে বসাই নি। ভারতে এসব ব্যাপারে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্র নিশ্চয়ই দেখবে কোন জুলুম জবরদস্তি বা শোষণ পীড়ন অত্যাচার না হয়। যেমন, ধর্মান্তর বিষয়টা এদেশে মস্ত বড় স্পর্শকাতর ইস্যু। রাষ্ট্রের চোখে এটাও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ব্যাপার। যেমন জাপানে তেমনি ভারতে। সাংবিধানিক রক্ষাকবচ আছে, স্টেট তার বাইরে যাবে না। এই যে এখন কমিশন বসানো হয়েছে সংবিধান সংশোধন সংযোজনের প্রশ্ন তুলে, তাদের হাতে যেন সেকুলারিটির ঘাড়ে কোপ না পড়ে। এশিয়ায় ভারত রাষ্ট্রের এই মৌলিক বৈশিষ্ট্য যেন কোনোভাবে ক্ষুণ্ণ না হয়।

তুরস্ক এ বিষয়ে আর এক বড় দৃষ্টান্ত, আতাতুর্ক প্রায় আশি বছর আগে প্রবর্তন করেন নূতন রাষ্ট্র ব্যবস্থা। ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের কোনো স্থান রাখেনি শাসনতন্ত্রে। ইসলামী মৌলবাদীরা এখন উঠে পড়ে লেগেছে এটা ভাঙতে, ইসলামী রাষ্ট্র করতে তুরস্ককে। আশ্চর্যের বিষয়, সে দেখে আর্মি, সৈন্য কর্তৃপক্ষ এটা হতে দেবে না। রাষ্ট্রশক্তিকে ইসলামী অনুশাসনের উর্ধ্বে বা পৃথক করে রাখতে হবে—তুরস্কের আর্মি এ ব্যাপারে সংকল্পবদ্ধ। তারা সাধারণ দেশবাসীর সমর্থন পেয়েছে।

ঘরের কাছে বাংলাদেশ আরেক দৃষ্টান্ত। মুজিবর রহমনের অবিসম্বাদী নেতৃত্বে সংগ্রাম চালিয়ে দেশটা স্বাধীন হল। নাম হল বাংলাদেশ। স্বাধীনতা স্বীকৃত হল সব ধর্মমতের মানুষের। ধর্মে মুসলমান গরিষ্ঠতা সত্ত্বেও। বাংলাদেশ পেল সেকুলার সংবিধান। যেটা ধ্বংস করেছিল আর্মি এসে। সেনাবাহিনীর নায়কের হাতেই মুজিবর সপরিবারে নিহত হলেন। এল জিয়ার যুগ। পরে জেনারেল এরশাদ নিজেই পাওয়ার দখল করলেন, হয়ে বসলেন রাষ্ট্রপতি। সেকুলার রাষ্ট্র বাংলাদেশে ইসলামকে করা হল রাষ্ট্রধর্ম। সেখানকার দেড় কোটি হিন্দু ধর্মাবলম্বী। হিন্দুর তবে কি গতি হবে? স্টেটাস কি হবে ও দেশের নাগরিক হিসেবে? কিন্তু মানুষ জেগে উঠলে সামরিক একনায়কত্বকেও একদিন হার মানতে হয়। বাংলাদেশই তার প্রমাণ। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামী ছাত্র আন্দোলনের কাছে নতি স্বীকার করতে হয়েছিল জেনারেল এরশাদকে। জনগণ উঠে দাঁড়ালে একচ্ছত্র অধিনায়কও একদিন পিছু

হটতে বাধ্য হন।

ডঃ সুকর্ণের নেতৃত্বে ইন্দোনেশিয়া স্বাধীনতা লাভ করে ৫৫ বছর আগে—তার সিদ্ধান্তে সেটা হয় সেকুলার স্টেট—আধুনিক কাজের উপযোগী ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। কিন্তু পরে সেই নীতির মর্যাদা রক্ষা করেন নি সুহার্তো। মুসলিম প্রধান হলেও ইন্দোনেশিয়ায় হিন্দু আছে—খ্রিস্টানও আছে। এখন দেখা যাচ্ছে সাম্প্রদায়িক খণ্ড যুদ্ধ চলছে—খ্রিস্টান গ্রামবাসীদের ওপর চড়াও হয়ে অত্যাচার চালাচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায়। যদিও সীমাবদ্ধ রয়েছে কয়েকটি অঞ্চলে। তবু ডঃ সুকর্ণের ইন্দোনেশিয়ার এটা দুঃখের ব্যাপার। আশার কথা, জনগণ শেষ পর্যন্ত ভবিষ্যৎ রচনা করে। ইন্দোনেশিয়াতেও স্বেচ্ছাচারী ও দুর্নীতিপরায়ণ রাষ্ট্রপতি সুহার্তো আর্মির ওপর বজ্রআঁটুনি সত্ত্বেও ছাত্রবিক্ষোভ ও গণআন্দোলন ঠেকাতে পারেন নি। গদি ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন।

এসব অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, মানবসমাজ এখন এক ভয়ানক অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি। মস্ত বড় চ্যালেঞ্জ মানব জাতির সামনে। সেই চ্যালেঞ্জ জয় করতে হবে। দেশের জনগোষ্ঠী নিশ্চয়ই জেগে উঠবে। তারাই পারবে একনায়কত্ব, ধর্মীয় মৌলতন্ত্র, দুর্নীতির আখড়া পাওয়ার হাঙরি স্বেচ্ছাতন্ত্রের হাত থেকে স্বদেশ ও দেশবাসীকে রক্ষা করতে। সেই লোকশক্তির ওপর আমার বড় ভরসা, মস্ত আশা। মানুষের মধ্যে পরাশক্তি তারই জয় হয়, এটা আমার বিশ্বাস। ইতিহাসেরও এটাই শিক্ষা।

দশ

এ যুগে আগামী যুগের চিন্তা

গান্ধীজী বলেছিলেন, We have to take lessons from harsh experience, অভিজ্ঞতা কঠিন হলেও তার থেকেই শিক্ষা নিতে হয়। ভারতবাসীর জীবনে ওই শতাব্দীর অভিজ্ঞতা ভালোমন্দে দুঃখশোকে মেশানো। প্রথমার্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম, দ্বিতীয়ার্ধে স্বাধীন ভারতে কিছু সার্থকতা, কিছু ব্যর্থতা। যে লক্ষ্য পূরণের স্বপ্নে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, প্রাণ দিয়েছিলেন তার সবটা এখনো সম্ভব হয়নি, অনেকটাই বাকি রয়ে গেছে। জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি এখনো দারিদ্র সীমার নীচে, নিরক্ষর চল্লিশ শতাংশের বেশি। কী আশা করা যায় সাধারণ দেশবাসীর কাছে?

রাজনীতি শিক্ষাসংস্কৃতি প্রশাসনের মধ্যেও বিভ্রান্তি ধর্ম নিয়ে। গোটা ভারতে জাতীয় সংহতির ভগ্নদশা। স্বাধীনতা আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ ভারতের চিন্তাই ছিল প্রধান। হিন্দু-মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিশ্চান প্রভৃতির ধর্ম বিশ্বাস ও আচরণের প্রভাব স্বাধীনতার লড়াই এর ওপর, রাজনৈতিক আন্দোলনের ওপর সামান্যই পড়ে ছিল প্রথম দিকে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনাকাল পর্যন্ত। ক্ষমতা ও সুযোগ সুবিধা দাবিতে মেজরিটি মাইনরিটি প্রশ্নটা ছিল। ধর্মের ভিত্তিতে দেশ বাঁটোয়ারার প্রশ্ন ত্রিশের দশক পর্যন্ত ছিল না। হিন্দুত্বের চিন্তাটা ছিল, কিন্তু সেটা ছিল ব্যাপক অর্থে,— ভারতীয়ত্ব অর্থে। অন্য ধর্মের মানুষও ভারতীয়, এই বিশ্বাসটা বজায় ছিল। এই অর্থে রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দু',— তাঁর গোরা উপন্যাসে এই তত্ত্বের প্রমাণ। একই অর্থে কবি ইকবালও 'হিন্দি',—সারে জাঁহাসে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হমারা গানে এর প্রমাণ। পরে

বিকৃতি ঘটানো হয় রাজনৈতিক স্বার্থে। বিভেদ ও বিচ্ছেদ নীতির অস্ত্রে জাতীয় ঐক্যে ফাটল ধরাবার পেছনে ছিল বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর কায়েমী স্বার্থ, তবু এটাও মানতে হবে দেশবাসী নিজেরাও কম দায়ী ছিল না। ব্রিটিশ শাসনের অবদান,—বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতার দেশ ভারতে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ঐক্য বিধান। ১৯৪৭-এ তাদেরই অবদান ভারত ভেঙে দুভাগ করা, পাকিস্তান মুসলিম রাষ্ট্র, ভারত ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। স্বাধীনতার পর ভারত বদ্ধপরিকর ছিল ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ বজায় রাখতে। দেশের নাম হিন্দুস্থান নয়, ইন্ডিয়া বা ভারত। মহম্মদ আলি জিন্নার ঘোষণা বা দাবি ছিল one separate state of the Muslims, for the Muslims, by the Muslims। সেটা যদিও হল তার অন্য চালটা টেঁকেনি,—দেশের বাকি অংশের নাম হবে হিন্দুস্থান। শেষ পর্যন্ত ধর্মনিরপেক্ষতা পরিচয়ে ইন্ডিয়া নামটাই বজায় থাকে, জাতি ধর্ম বর্ণগোষ্ঠী নির্বিশেষে সব নাগরিকের সমান অধিকার সমান মর্যাদা ভারতে। খুব বড় কথা।

কিন্তু এখন আবার ভারতের রাজনীতিতে হিন্দুত্ববাদের অসহিষ্ণুতা। মন্দির মসজিদ নিয়ে পুরনো কোঁদল ঘেঁটে তোলা হচ্ছে। বাবরি মসজিদ আর যাই হোক একটা ভালো স্থাপত্য-কীর্তি হিসেবেও তার মূল্য ছিল। সেটা গেল ফ্যানাটিক্ হিন্দুত্ববাদী করসেবকদের হাতে। গান্ধীর স্বপ্ন ছিল হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ জৈন শিখ খ্রিস্টান সবাইকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ সত্যনিষ্ঠ অহিংস ভারত। তাঁর আদর্শের বিপক্ষে যেমন জিন্না, তেমনি সাভারকর। সাভারকর ছিলেন গান্ধীর চরম বিরোধী। এখন যে হিন্দুত্ববাদের জিগির তুলেছে সঙ্ঘ পরিবার, বিশেষ করে আর-এস-এস তার গোড়াপত্তন সাভারকরই করেছিলেন। তিনি বলতেন, ভারতে উদ্ভূত হিন্দুরাই ভারতীয়, মেনস্ট্রিমে শুধু তারাই। মুসলিম, পার্শি, ইহুদি, খ্রিশ্চান সবাই বিদেশে উদ্ভূত, তারা বহিরাগত। মেনস্ট্রিমে তাদের স্থান নেই। এর মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ মেনস্ট্রিম ভারতের দরজা খুলে রেখেছেন সবার জন্য, আহ্বান জানিয়েছেন ঃ

এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে...।
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনত শিরে।

তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে আগামী নূতন যুগে নূতন ভারত গড়ে তুলতে সমস্ত দেশবাসী দায়বদ্ধ। ভারত যেন হয়ে ওঠে মহামানবের দেশ, খণ্ডিত মানবের ভগ্ননীড় নয়। কিন্তু ভাবনার কথা হচ্ছে দায়িত্ব নেবে কে? প্রচার ও সংবাদ মাধ্যমের মস্ত ভূমিকা রয়েছে। এখন দেখতে পাচ্ছি তাদের কাজে বৈচিত্র্য বেড়েছে, আরো নিশ্চয় বাড়বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে। দেশের শিক্ষা সংস্কৃতি মূল্যবোধ মানবিকতা এসব ব্যাপারে সংবাদপত্র পত্রিকা টিভি রেডিও তারা তাদের দায়িত্ব পালন করুন স্বাধীনভাবে। স্বাধীনভাবেই শুধু নয়, নিরপেক্ষভাবে। সেটা হচ্ছে কি না বলতে পারিনে। তাছাড়া মানুষের রুচিও পালটে যাচ্ছে, আগের মতো নেই। বিদেশের প্রভাবও পড়ছে। সে অনুযায়ী যেমন হচ্ছে সংবাদ, তেমনি সাহিত্য, তেমনি ছবি। ভালোমন্দ বিচার করবে কে? তাদেরই বা স্বাধীনতা কতটা? সংবাদপত্রে বা সাহিত্য পত্র পত্রিকায় নিজস্ব চিন্তা আর বিবেক বুদ্ধিমতো স্বচ্ছন্দে লেখার সুযোগ কতটুকু? বুদ্ধিজীবী ও লেখকদের খুব বড় ভূমিকা, বড় দায়িত্ব। কিন্তু কে শুনছে? সে যুগের ঔদার্য আর নেই। সত্য কথার মানুষ এখন অপাংক্তেয় যাদের হাতে অর্থ, ক্ষমতা, মালিকানা তারাই ডিক্‌টেট করে যাবে। তাদের নিজেদের কথা, নিজের লোক ছাড়া কাজ হচ্ছে না, হবেও না। তাই বলে হাল ছেড়ে দিলে ত চলবে না! স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলেও

চলবে না। এখন খুব জরুরি হচ্ছে নিজের কাজে উৎকর্ষ সাধন করা, মৌলিক ভাবনা চিন্তা বজায় রাখা। মুছে বা হারিয়ে না যাওয়া। দুর্যোগের মধ্যেও প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা, আগলে রাখা, এটাই এখন মস্ত বড় দায়িত্ব।

দেশের শিল্পী ভাস্কর চিত্রকর বেশিরভাগ থাকেন বড় শহরে, রাজধানী দিল্লি বা কলকাতায়। আধুনিকতা মানেই নাগরিকতা তাদের দৃষ্টিতে। সেটা সত্যি নয়। গ্রাম জীবন, তার সংস্কৃতি, নাচ-গান-ছড়া কবিতা আলপনা সেলাই ছবি—এসব কোথায়? যাত্রা গান পালাগান কোথায়? গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছে আরেক শিল্প,—কলকারখানা, ব্যবসা বাণিজ্য, টাকার-লেনদেন। পরিবেশ দূষণ এভাবেই হচ্ছে। এর প্রভাবে মৌলিক সম্পদ খোয়া যাচ্ছে। রুচির পরিবর্তন ঘটছে। একটা সীমা টানতে হবে। প্রাচীন, মৌলিক, শাশ্বত সবকিছু হারালে চলবে কেন? পুরানো ঢঙে না হোক, নতুন যুগের আদলে নূতনত্ব রূপায়ণ—এসব চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবীদের কাজ, কবি লেখক শিল্পী সাংবাদিকের কাজ। এ শতাব্দীর সূচনায় তাদের আবির্ভাব ঘটেছিল এদেশে; দৃষ্টান্তের অভাব নেই। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে দর্শনে চিন্তায় যদিও তারা ছিল উঁচু স্তরের মানুষ আসল কথা হল, তারাই কিন্তু সম্ভব করেছিলেন সাধারণ মানুষকে, নেপথ্য জগতের মানুষকে প্রকাশ্য মঞ্চে তুলে ধরতে, তাদের আবির্ভাব ঘটাতে। জনস্রোতে ভাসালেন গান্ধী, রাশিয়ায় লেনিন, চীনে মাও সে তুঙ্গে। এভাবেই এলিট ও কমোনার, তথাকথিত বাবু ভদ্রলোক আর গোত্র পরিচয়হীন জনসাধারণ এ দুইয়ের মধ্যে তফাতটা বিভেদটা যথাসাধ্য ঘোচাতে হবে। নূতন শতকের মুখে এটাই এখন বড় সাধনা, বড় দায়িত্ব।

এগারো

মানবাধিকার দাবী

সদ্যগঠিত রাষ্ট্রসঙ্ঘ ১৯৪৮-এর ১০ই ডিসেম্বর বিশ্বমানবাধিকার সনদ ঘোষণা করেছিল, আশা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নৃশংসতার গ্লানি ও ভয় থেকে মুক্ত নূতন পৃথিবী গড়ে তোলা যাবে। এই ঘোষণায় সম্মতি দিয়েছিল সমস্ত সদস্য রাষ্ট্র। সবার মনেই প্রবল আশা উদ্দীপনা ছিল শান্তির জন্য, মানুষের উন্নতি ও বিকাশের জন্য। পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হল মানবাধিকার ঘোষণার। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের সংবিধানেও মানবাধিকারের মূলনীতি সঙ্কল্পের ভাষায় গৃহীত হয়েছে, ১৯৫০ সালের ছাব্বিশে জানুয়ারি। তারও পঞ্চাশ বছর হতে চলেছে।

হিউম্যান রাইটস্—মানবাধিকারের কথাগুলো একেবারে নূতন নয়। খ্রিস্টধর্মে মানবাধিকারের কথা আছে, ইস্‌লামেও আছে, আমেরিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানেও আছে, আরো কিছু আছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল মানব বলতে বোঝায় পুরুষ মানুষ, মেয়ে মানুষ নয়। মেয়েদের সমানাধিকার দিতে দীর্ঘকাল কেটে গেছে, যেমন আমেরিকায় তেমনি ফ্রান্সেও, সেজন্যেই ফেমিনিজম্ কথাটার উদ্ভব হয়েছে। ফেমিনিস্টরা দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম ও আন্দোলন করে বহু ক্ষেত্রে সমানাধিকার আদায় করে নিয়েছেন, কিন্তু সব দেশে নয়। স্বাধীন ভারত এদিক থেকে অনেক দেশের তুলনায় অগ্রসর, কিন্তু পুরোপুরি নয়। আমাদের কাজ হবে নারীকেও পুরুষের মতো মানুষ বলে স্বীকার করা এবং সর্বতোভাবে সমান বলে মেনে নেওয়া।

সব মানুষকে প্রথমে দিতে হবে অন্ন, তারপরে জ্ঞান। প্রায় দু'হাজার বছর পূর্বে চীনের মহানায়ক কন্‌ফুসিয়াস এই দুটি নির্দেশ দিয়েছিলেন যা অপরিহার্য। প্রথমে দেহের খোরাক পরে মনের খোরাক। একাজ শুধু চীনের নয় সব দেশের কর্তব্য। প্রত্যেক মানুষকে এই দুটি অপরিহার্য উপকরণ যোগাতে হবে এটা আজকাল মোটামুটি সর্বস্বীকৃত। কিন্তু মতপার্থক্য ঘটছে রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক অধিকার নিয়ে। যে সব দেশ গণতান্ত্রিক নয় সেখানে রাজনৈতিক অধিকার সঙ্কুচিত। যে সব দেশ এখনো মধ্যযুগে পড়ে আছে সেখানে ধর্মীয় স্বাধীনতা লঙ্ঘিত। এছাড়া বিভিন্ন দেশে স্থানীয় নানা কুসংস্কার ও বাধা নিষেধ রয়েছে যার ফলে মানবাধিকারের মর্যাদা রক্ষা করা যাচ্ছে না। ধর্মে মৌলবাদ ও গোঁড়ামি থেকে বাধা আসছে। এসব থেকে মুক্ত হতে হবে। চাই সর্বত্র অতন্দ্র গণতন্ত্রের প্রবর্তন, চাই সর্বত্র ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতিষ্ঠা। তা না হলে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার ঘোষণার মূল্য থাকবে না।

বারো
বিশ্ব মানবাধিকার

সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য সার্বজনিক মানবাধিকারের একটি সর্বসম্মত ঘোষণাপত্র রাষ্ট্রসংঘ থেকে প্রচারিত হয়েছিল ১৯৪৮-এর ১০ই ডিসেম্বর। বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা, বিশেষ করে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণে জাপানের বুকে ধ্বংসকাণ্ড দেখে মানুষের মনে যে ভয় ও হতাশার সৃষ্টি হয়েছিল রাষ্ট্রসংঘের এই ঘোষণার উদ্দেশ্য ছিল ভয় ও আতঙ্ক থেকে মানুষকে মুক্ত করা। অবশ্য এর অনেক আগেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত Declaration of Independence ঘোষণাপত্রে "inalienable rights of all men" রক্ষার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়। বলা হয়েছে—সৃষ্টিকর্তা মানুষকে যে অলঙ্ঘ্যনীয় অধিকার প্রদান করেছেন 'তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে' 'Right to Life, Liberty and pursuit of Happiness', এসব মৌলিক অধিকার সুনিশ্চিত করবার জন্যই নির্বাচিত শাসন-সরকার! এছাড়া য়ুরোপের অগ্রণী দেশগুলোতেও, বিশেষ করে ইংল্যান্ডে মানবাধিকার স্বীকৃত হয়ে আছে বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন ভাষায়।

স্বাধীন ভারতের সংবিধানেও এসব মূলনীতি গৃহীত হয়েছে। বরং বলা যায়, ভারতের সর্বসাধারণ দেশবাসী নিজেরাই সঙ্কল্পবদ্ধ যাতে তাদের কতগুলো মৌলিক অধিকার সুনিশ্চিত করা যায়। যেমন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তিনটি ক্ষেত্রেই ন্যায়বিচার, তাছাড়া ধর্মবিশ্বাস, ধর্মাচরণ, চিন্তা ও মতপ্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা এবং তৃতীয়ত সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও সুযোগ-সুবিধার সমানাধিকার। আমাদের সংবিধানের মুখবন্ধেই রয়েছে এসব ঘোষণা।

আমরা আশা করেছিলাম ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারগুলো জনসাধারণের জন্য ঘোষিত মৌলিক অধিকার যথাযথভাবে পালন ও পূরণ করবে। কিন্তু গত পঞ্চাশ বছর আমরা যা দেখে এসেছি তা যথেষ্ট নয়।

দু'হাজার বছর পূর্বে চীন দেশের মহানায়ক কনফুসিয়াস নির্দেশ দিয়েছিলেন, সব মানুষকেই প্রথমে দিতে হবে অন্ন তারপর জ্ঞান বা শিক্ষা। এই দুটি নির্দেশ অপরিহার্য। প্রথমে দেহের খোরাক পরে মনের খোরাক। এ দুটি কাজ প্রত্যেক রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য; শুধু

চীনদেশের নয়। আজকাল এ দুটি অত্যাবশ্যক উপকরণ যে প্রতিটি মানুষকেই যোগাতে হবে এটা মোটামুটি সর্বস্বীকৃত, যদিও এখন পর্যন্ত সেটা কার্যে পরিণত করা যায়নি। কিন্তু মতপার্থক্য ঘটছে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অধিকার নিয়ে। যেসব দেশ গণতান্ত্রিক নয় সেখানে রাজনৈতিক অধিকার সঙ্কুচিত। আর যেসব দেশ এখন পর্যন্ত মধ্যযুগে পড়ে রয়েছে সেসব দেশে ধর্মীয় স্বাধীনতা লঙ্ঘিত। শুধুমাত্র রাষ্ট্রসংঘ থেকে ঘোষণা পত্র প্রকাশ করলেই সমস্যার সমাধান হবে না। তার জন্য চাই সর্বত্র প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রবর্তন, সর্বত্র ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতিষ্ঠা।

তেরো

চতুঃসপ্ততিপূর্তি উপলক্ষে

আমার একটি গল্পের নাম "মহাপ্রস্থানের পথপ্রান্তে"। গল্পের নায়কের মতো আমিও এখন মহাপ্রস্থানের পথপ্রান্তে। কিন্তু এখন আমি ওর মতো সম্পূর্ণ হতাশ আর ক্লান্ত আর ব্যর্থ নই। দেশের মতিগতি অপ্রত্যাশিত এক মোড় নিয়েছে। কী করে এই অলৌকিক ঘটনা সম্ভব হল কেউ ঠিক জানে না। যে যার খুশিমতো অনুমান করছে। তা হলে আমিই বা কেন আমার খুশিমতো অনুমান করব না? আমার অনুমানটা এই যে ভারতের অন্তরে আছে এক স্বয়ংশোধিকাশক্তি। সে আপনাকে আপনি সংশোধন করতে পারে। বরাবরই এই শক্তির উপর আমার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু মাঝখানে এ বিশ্বাস টলমল করছিল। সেই টলমলে ভাবটা কেটে গেছে। ভুল যদি আবার কোনোদিন ঘটে তবে তার সংশোধনও আবার একদিন ঘটবে। না, আমি আর হতাশ নই। আমিও একটু আধটু সংশোধনের চেষ্টা করেছি। সুতরাং আমি ব্যর্থ নই। কিন্তু ক্লান্ত। আমি এখনো ক্লান্ত। এ ক্লান্তি বার্ধক্য থেকে নয়। অতিশ্রম থেকেও নয়। আমার চাই একটা রসায়ন। যে রসায়ন আবার আমাকে সৃষ্টিতৎপর করবে। ইনটেলেকচুয়াল হিসাবে আমি যা দেবার তা দিয়েছি। কিন্তু আর্টিস্ট হিসাবে যা দিতে চেয়েছি তা দিতে পারিনি। দিতে হবে, এটাই আমার উপর জীবনদেবতার নির্দেশ। এইজন্যেই বাঁচা। মহাপ্রস্থানের পথপ্রান্তে এসে পৌঁছলেও প্রস্থানের জন্যে আমি প্রস্তুত নই। আমার প্রস্তুতিটা নতুন এক সৃষ্টির জন্যে। তার জন্যে চাই একটা রসায়ন। প্রতীক্ষায় আছি।

আমার কাছে দেশ যেমন সত্য যুগও তেমনি সত্য। এই দেশে আমি জন্মেছি। আর কোনো দেশে জন্মাইনি। তেমনি, এইযুগে আমি জন্মেছি। আর কোনো যুগে জন্মাইনি। যুগের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যুগের মর্মকথাও আমি ব্যক্ত করে যাব। যেমন দেশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে দেশের মর্মকথা। এটাও আমার উপর আমার জীবনদেবতার নির্দেশ। দেশের উত্তরাধিকারের মতো যুগের উত্তরাধিকারও আমি মহামূল্য মনে করি। তাই টলস্টয়, চেখভ, রম্যাঁ রলাঁ, বার্নার্ড শ, বারট্রাণ্ড রাসেল আমার কাছে গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দের মতো আপনার। বাল্যকাল থেকেই আমি যুগসচেতন। আমি যে বিংশ শতাব্দীর সন্তান এ নিয়ে আমি বেশ গর্ব বোধ করতুম। প্রথম মহাযুদ্ধও আমার সে গর্বকে টলাতে পারে না, কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আমাকে লজ্জায় ম্রিয়মাণ করে।

গত পাঁচ শতাব্দীর আধুনিক যুগ পৃথিবীর চেহারা বদলে দিয়েছে তা তো সকলেই

প্রত্যক্ষ করছে। সর্বমানবের পক্ষে এটা নিশ্চয়ই অগ্রগতি। কিন্তু আমার এক ইংরেজ অধ্যাপক আমাকে বলেছিলেন, "অগ্রগতিটা কিসের অভিমুখে? পাটনা কলেজ থেকে গঙ্গার গর্ভের অভিমুখে ধাবিত হওয়াও তো অগ্রগতি। তা যদি কর তবে তুমি তলিয়ে যাবে।" যুক্তিটা সে বয়সে আমার মনে ধরেনি। কিন্তু বাহান্ন বছর পরে এখন আমারও সেই একই যুক্তি। অগ্রগতিটা কিসের অভিমুখে! সভ্যতা যদি ধ্বংসের অভিমুখেই ধাবিত হয়ে থাকে তবে আমরা যারা এই ধাবমান জেট প্লেনের আরোহী হয়ে বিশ্বপরিক্রমায় বাহির হয়েছি তাদের পরিণাম ভাবতে গেলে শিউরে উঠতে হয়। আমাদের নিয়তি নির্ভর করছে পাইলটের উপরে। পাইলট কি অভ্রান্ত? আর পাইলটও অসহায়, যদি ইনজিন ফেল করে বা হঠাৎ আগুন ধরে যায়।

বুদ্ধিজীবীদের কাছে সকলেই প্রত্যাশা করে মুশকিল আসান। কোথাও কিছু বিগড়ে গেলে লোকে বলে, "বুদ্ধিজীবীরা নীরব কেন! নিষ্ক্রিয় কেন!" কিন্তু একালের সমস্যাগুলো এমন জটিল যে জট খুলতে না পারলে শুধুমাত্র হাত লাগিয়ে আমরা কে কী করতে পারি? জেট প্লেনে যদি আগুন ধরে যায় তবে যাত্রীদের মধ্যে যাঁরা সেরা বুদ্ধিজীবী তাঁরা অভ্রভেদী চিৎকার করে বা আগুনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কেউ কিছু সুফল দেখাতে পারবেন না। যা হবার তা হবেই। গত দুই মহাযুদ্ধের সময় বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা দেখে বিশ্বাস হয় না যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে তাঁদের ভূমিকা আরো গৌরবের হবে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যদি বাধে। আমরা বড়ো জোর আশা করতে পারি যে বাধবে না। কিন্তু আশা করা ও নিশ্চিত হওয়া কি এক? তা বলে একেবারে হাত গুটিয়ে চুপ করে থাকা যায় না। সেটা মানুষের মতো কাজ নয়। মানুষ ভাববে, বলবে, সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবে। কে জানে জট হয়তো খুলে যাবে। এটা শুধু বুদ্ধিজীবীদের নয়, মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য।

এটা কেবল যুদ্ধের যুগ নয়, বিপ্লবেরও যুগ। কেউ বলতে পারে না কোথায় কবে বিপ্লব ঘটবে। যাঁদের মতে ওটা ঘটাই বাঞ্ছনীয় তাঁদের আমি বলব, ঘটলে যেন বিনা রক্তপাতে ঘটে। তাঁরা হেসে উড়িয়ে দেবেন, জানি। তবু আমার বক্তব্য ও ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। যাঁদের মতে ওটা ঘটাই উচিত নয়, তাঁদের আমি বলব, তা হলে আপনারা বিপ্লবের বিকল্প খুঁজে বার করুন। যাতে সত্যিকার পরিবর্তন ঘটে। বিনা পরিবর্তনে বিপ্লবের গতি রোধ করা যাবে না। আর সেটা যদি অবশ্যম্ভাবী হয় তবে হিংসা প্রতিহিংসাকেই বা রোধ করবে কে?

চৌদ্দ
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রতি

কলেজে তোমরা এসেছ জ্ঞান অর্জনের জন্যে। জ্ঞান অর্জনের পরে জীবিকা অর্জনের জন্যে। কিন্তু জীবিকাটাই তো জীবনের সবখানি নয়। দিনে দশ ঘণ্টা খাটার পর দেখবে অনেকটা ফাঁক। সেই ফাঁক তোমরা ভরাবে কী দিয়ে? তার জন্যে চাই আরেক রকম প্রস্তুতি। কারো অভীষ্ট সাহিত্যসৃষ্টি, কারো অভীষ্ট সংগীত-নাটক-নৃত্যকলা, কারো অভীষ্ট চিত্রভাস্কর্য-ললিতকলা, কারো অভীষ্ট বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, কারো অভীষ্ট দার্শনিক তত্ত্বচিন্তা, কারো অভীষ্ট রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্যে সংগ্রাম, কারো অভীষ্ট সামাজিক পবিবর্তনের জন্যে

আন্দোলন, কারো অভীষ্ট সমাজবিপ্লব, কারো অভীষ্ট নৈতিক তথা আধ্যাত্মিক উন্নতি, কারো অভীষ্ট দুর্গতদের সেবা, কারো অভীষ্ট জনগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, কারো অভীষ্ট প্রতিবন্ধীদের হিতসাধন, কারো অভীষ্ট আন্তর্জাতিক শান্তিস্থাপন। এমনই কতকগুলি অভীষ্ট আছে যার জন্য প্রস্তুতির প্রয়োজন এবং সেটা তরুণ বয়স থেকেই।

এতে পড়াশুনোর ক্ষতি হতে পারে। সেই জন্যে গুরুজনরা আপত্তি করতে পারেন। নিজেরও আশঙ্কা থাকতে পারে যে পরীক্ষার ফল খারাপ হতে পারে। অপরপক্ষে এটাকে ভবিষ্যতের জন্যে তুলে রাখলে পরে আর সময় পাওয়া যাবে না। যতদিন না জীবনসংগ্রাম শেষ হয়। অর্থাৎ জীবিকা অর্জনের পর অবসর গ্রহণের সময় হয়। তার মানে সাধারণত ষাট বছর বয়স। ষাট বছর বয়সের পরে দেখা যাবে প্রস্তুতির সময় গড়িয়ে গেছে তখন জীবনটা ফাঁকা বোধ হবে। সাধারণত দেখা যায়, অবসর নেওয়ার পরে মানুষ কাজের অভাবে দিশেহারা হয়ে পড়ে। তখন গুরু অন্বেষণ করে, পরকালের জন্যে প্রস্তুত হয়। এদেশে গুরুর অভাব নেই। এক-একটি গুরু এক-একজন অবতার। ভগবানের চাইতে ভগবানের অবতারই হন প্রধান।

আমার আসল কথাটা হল এই যে জীবনকে ভরিয়ে নিতে হবে। পূর্ণ জীবনের জন্যে তরুণ বয়স থেকেই প্রস্তুত হতে হবে। প্রস্তুতির পর্বটাও যথালাভ। এমনও হতে পারে, জীবিকার জন্যে সংগ্রামে জীবনটাই ক্ষয় হয়ে যাবে। সেরূপ ক্ষেত্রে কলেজ জীবনে কবিতা লেখা বা গান গাওয়া বা বাঁশি বাজানো বা নাটক অভিনয় বা ক্রিকেট খেলা মনে পড়বে ও মনটা খুশি হবে। সেটাও কি কম তৃপ্তি? সেটুকু না হলে অতৃপ্তি।

আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখায়। আমার নিজের কলেজ জীবন ছিল পড়াশুনো ছাড়া লেখালেখির জীবন। ছ বছর ধরে যা করেছি তা এক প্রকার অ্যাপ্রেনটিসশিপ। তার ফলে সাহিত্যের দরবারে নিয়ে এলুম 'পথেপ্রবাসে'। আশীর্বাদ পেলুম রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর। আমার জীবন তখনকার মতো পূর্ণ হল।

পনের
গণতন্ত্রের শর্ত

জোর যার মুলুক তার সর্বত্র প্রচলিত অতি পুরাতন নীতি। কিন্তু ইংরেজদের ইতিহাসে দেখা গেল এর স্থান নিয়েছে ভোট যার মুলুক তার। সাধারণ নাগরিকের ভোটে নির্বাচিত হবে প্রজা-প্রতিনিধিসভা। সেই সভার অধিকাংশের ভোটে নির্বাচিত হবে মন্ত্রীমণ্ডল। রাজা সেই মন্ত্রীমণ্ডলকে শাসনভার অর্পণ করবেন। সেই মন্ত্রীমণ্ডল পলিসি স্থির করবেন, সিদ্ধান্ত নেবেন। বছর পাঁচেক পরে আবার নির্বাচনের পালা আসবে। সাধারণের ভোটে আবার তাঁরাই ফিরে আসতে পারেন, নতুবা আসবেন তাঁদের বিরোধী দল। পার্লামেন্টে সাধারণত দুটি দলই থাকে। তাঁরা পালা করে মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করেন। রাজা হস্তক্ষেপ করেন না। এটাই হল গণতন্ত্রের কাঠামো। রাজতন্ত্রের সঙ্গে এটা বেখাপ নয়। তবে ক্রমে ক্রমে অন্য কোন কোন দেশে রাজতন্ত্রের পরিবর্তে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজার স্থান নেন প্রেসিডেন্ট। রাজার মতো তিনিও প্রকৃত ক্ষমতা ছেড়ে দেন মন্ত্রীমণ্ডলের হাতে। কিন্তু আমেরিকা

যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃত ক্ষমতা থাকে প্রেসিডেন্টের নিজের হাতে। তিনি একটি দলের দলপতি। কিন্তু চার বছর পরে তাঁকেও পুননির্বাচনের সম্মুখীন হতে হয়। জয়ী হলে তিনি ফিরে আসেন, নতুবা বিরোধী দলের দলপতিকে গদি ছেড়ে দেন। সেখানেও দুটি প্রধান দল। পালাবদল সেই দুটি দলের মধ্যেই হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে বলে প্রেসিডেনসিয়াল সিস্টেম। আর ইংল্যান্ডের ব্যবস্থাকে বলে পার্লামেন্টারি সিস্টেম।

আমাদের দেশের নেতারা অনেক বিবেচনা করে পার্লামেন্টারি সিস্টেমই বরণ করেন। এই ব্যবস্থা পঞ্চাশ বছর ধরে বহাল রয়েছে। তবে মাঝে মাঝে এর বদলে প্রেসিডেনসিয়াল সিস্টেমের প্রস্তাব উঠেছে। কিন্তু সে-প্রস্তাব লোকসভায় দুই-তৃতীয়াংশের ভোট পায়নি। সুতরাং গৃহীত হয়নি। আমরা পার্লামেন্টারি সিস্টেমেই অভ্যস্ত। তবে আমাদের মুশকিল হচ্ছে আমাদের এখানে দুটি প্রধান দল নয়, বহু সংখ্যক দল। বারবার দেখা যাচ্ছে কোন একটি দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় না, একাধিক দল মিলেমিশে স্থায়ী সরকার গঠন করতে পারে না। বারবার অসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কোনও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা দুবছরে বা তিন বছরে সম্পূর্ণ করতে পারা যায় না। দলের সংখ্যা যদি দুটিতে বা তিনটিতে নিবদ্ধ না করা যায় তবে কাজের কাজ কিছুই হবে না। ভারতের প্রধান সমস্যাই হচ্ছে জন্মনিয়ন্ত্রণ। সেটা রাজনৈতিক দলগুলির বেলায়ও প্রয়োজন। তাহলে গণতন্ত্র থাকবে, কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী কাজ দেখাতে পারবে না। ঘনঘন সিদ্ধান্তের পরিবর্তন হবে। লোকে তিক্ত-বিরক্ত হয় বলবে, এর চেয়ে সামরিক শাসন শ্রেয়। আমরা ভাগ্যবান যে আমাদের দেশে এখনো সামরিক শাসন জারি হয়নি। পাকিস্তানে বারবার হয়েছে। বাংলাদেশেও বারবার হয়েছে। এই মুহূর্তে পাকিস্তানে ক্ষমতা চলে গেছে প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে প্রধান সেনাপতির হাতে। পাকিস্তানের সুপ্রীমকোর্ট এটা সমর্থন করেছে। এটাই নাকি নেসেসিটি। ইংরেজরা বলে নেসেসিটি নোজ নো ল (Necessity knows no law). সুপ্রীমকোর্ট নাকি বলেছে, দু বছর না তিন বছর সামরিক শাসন বহাল থাকবে।

দেখা যাচ্ছে ইংল্যান্ড বা আমেরিকার মতো পাকিস্তানের বিচার-ব্যবস্থা স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ নয়। অথচ এটা গণতন্ত্রের একটা অলিখিত শর্ত। তেমনই আরেকটা অলিখিত শর্ত হচ্ছে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সভাসমিতিতে মত প্রকাশের স্বাধীনতা, এককথায় যাকে বলে সিভিল লিবার্টি। আমাদের দেশে সিভিল লিবার্টি বিপন্ন হয়েছিল ইন্দিরা গান্ধীর ইমার্জেন্সির সময়। সেরকম ইমার্জেন্সি দ্বিতীয়বার হয়নি। যাতে আবার না হয় তার জন্য সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। 'Eternal vigilance is the price of Liberty.' বলেছিলেন একজন আইরিশ স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা। এটাও গণতন্ত্রের একটা অলিখিত শর্ত।

ভোট যার মুলুক তার হলেও চাই একটি স্বাধীন নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা, একটি সদা সতর্ক 'প্রেস' (Press) বা জনমত। আমাদের সৌভাগ্য বহুদেশের ঈর্ষার বিষয়। আমি যতদূর জানি জাপানই এশিয়া মহাদেশে আমাদের একমাত্র সহযাত্রী। এটাও লক্ষ করবার মতো বিষয়। ভারতের মতো জাপানও একটি ধর্মনরিপেক্ষ রাষ্ট্র।

তবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র আরো কয়েকটি আছে। যেমন চীন, যেমন ভিয়েতনাম, যেমন তুরস্ক, যেমন মায়নমার, যেমন ইন্দোনেশিয়া। সবাই যে গণতন্ত্রী তা নয়। অর্থাৎ ভোট যার মুলুক তার সর্বত্র প্রযোজ্য নয়। এটা সব দেশের ওপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না। আমরা সবাইকে দৃষ্টান্ত দেখাব। তবে এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে আইন ও শৃঙ্খলার প্রশ্ন। কোথাও

একটা দল বা একাধিক দল যদি কথায় কথায় বন্ধ ডাকে, জনজীবন বিপর্যস্ত হবে। তবে আইন ও শৃঙ্খলা বলতে বিশেষ কিছু থাকবে না। বাঙালিরা বহুক্ষেত্রে মহৎ দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে। আবার তারাই উদ্ভাবন করেছে ঘেরাও ও বন্ধ। তাদের মাথা থেকেই এসেছে নকশাল মতবাদ।

বাংলাদেশও বাঙালিদের দেশ। সেখানে নির্বাচনের পরে বিরোধী দল পার্লামেন্টে যায় না। যখন-তখন বন্ধ ডাকে। তাও দুদিন কি তিনদিনব্যাপী। রেলপথও বন্ধ থাকে। যানবাহনও বন্ধ থাকে। নির্বাচনের পরে যদি পার্লামেন্ট বয়কট করা হয় তবে নির্বাচনের দরকারটা কী? অথচ বন্ধ যাঁরা ডাকেন তাঁরা চান আবার নির্বাচন। এবার নির্বাচনটা যথাসময়ে নয়, তার অনেক আগে। ভারত যেমন একটা দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছে, পাকিস্তানও তেমনই আর একটা দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশও তেমনই আরো একটা দৃষ্টান্ত। আশাকরি ভারতের দৃষ্টান্তই শেষ পর্যন্ত আর সকলের উপর প্রভাব বিস্তার করবে।

ষোল

স্বরাজের সংজ্ঞা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে মহাত্মা গান্ধী তাঁর 'হরিজন' পত্রিকায় লেখেন, "স্বরাজের সংজ্ঞা কী এই নিয়ে আমি প্রাচীন ঋষি বাক্যের মতো 'নেতি', 'নেতি' করে ভেবেছি। এখন আমার ধারণা স্বরাজ হচ্ছে সেই রাজ যে রাজ্যে বিদেশী সেনা নেই।"

তিনি ইংরেজদের ডাক দেন এদেশ থেকে তাদের সৈন্য সরাতে। সেটা ১৯৪২ সালে। "কুইট ইন্ডিয়া টু গড আর অ্যানার্কি।" ইংরেজরা তখন সে ডাকে কান দিল না। কিন্তু ১৯৪৮ সালের ৩১শে জানুয়ারি গান্ধীজির অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার দিন করাচী থেকে শেষ ব্রিটিশ সৈন্য অপসারণ করে। ভারত ও পাকিস্তান প্রায় দু-শো বছর পরে বিদেশী সেনার হাত থেকে মুক্ত হয়।

কয়েক বছর বাদে বিখ্যাত ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক J.B.S. Haldane প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের Indian Statistical Institute-এ যোগ দেন। তিনি স্বেচ্ছায় ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। একজন ইংরেজ স্বেচ্ছায় ব্রিটিশ সাবজেক্ট না হয়ে ভারতীয় নাগরিক হচ্ছেন দেখে যাঁরা কৌতূহলী হন তাঁদের তিনি বলেন, "ব্রিটেন এখন আর স্বাধীন দেশ নয়। সেখানে মার্কিন সৈন্য মোতায়েন হয়েছে।"

মার্কিন সৈন্য মোতায়েন ছিল ফ্রান্সেও। জেনারেল দে গল রাষ্ট্রপতি হয়ে মার্কিন সৈন্যকে বিদায় দিলেন। তাঁরও মতে বিদেশী সৈন্য থাকলে স্বাধীনতা থাকে না।

কিন্তু জার্মানীতে ও জাপানে মার্কিন সৈন্য এখনো মোতায়েন রয়েছে। জার্মানী থেকে রুশ সৈন্য বিদায় নিয়েছে, কিন্তু ব্রিটিশ তথা ফরাসী সৈন্য এখনো বিরাজ করছে। যতদূর জানি।

তা হলে কী জার্মানী ও জাপান স্বাধীন নয়? আমি যখন জাপানে যাই তখন শুনি জাপানীরা বলছে, "মার্কিন সৈন্যকে থাকতে দাও। ওরা ডলার নিয়ে আসছে। সেটা আমাদের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করছে।"

জার্মানী ও জাপান এখন ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়ার চেয়ে সেরা অর্থনৈতিক শক্তি। সকলে পাল্লা দিচ্ছে আমেরিকার সঙ্গে।

সতেরো

নান্য পন্থাঃ

ছেলেবেলায় যেসব পেন্সিল কিনতুম তাদের একটায় লেখা থাকত Made in Germany. আরেকটায় লেখা থাকত Made in Bavaria। তখন ভাবতুম বাভেরিয়া আর জার্মানি কি দুটো দেশ? ভূগোলে লেখা ছিল জার্মানির একটা অঙ্গ হচ্ছে বাভেরিয়া। এর রহস্য ভেদ করতে পারলাম না। পরে যখন কলেজে পড়ি, তখন ইউরোপের ইতিহাস পড়তে গিয়ে জানতে পারি যে জার্মানি এমপায়ার করার সময় বিসমার্ক বাভেরিয়াকে অটোনমি দিয়েছিলেন। কারণ, বাভেরিয়ার লোক প্রধানত ক্যাথলিক, আর জার্মানির লোক প্রধানত প্রটেস্ট্যান্ট। ক্যাথলিকরা জার্মানিতে মাইনরিটি (সংখ্যালঘু)। তাদের সন্তুষ্ট করতে হলে তাদের একটা স্বতন্ত্র অঙ্গরাজ্য দিতে হত। আর সেই অঙ্গরাজ্য হত স্বশাসিত। পরবর্তী বয়সে আমি পশ্চিম জার্মান সকারের আমন্ত্রণে সে দেশে যাই। আমার ভার দেওয়া হয় ইন্টারনেস নামে একটি সংস্থার হাতে। তখন রাজধানী ছিল বন। বন থেকে আমাকে কোলনে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর নিয়ে যাওয়া হয় স্টুটগার্টে। তারপর যাই মিউনিখে। এই মিউনিখ হল বাভেরিয়ার রাজধানী। সেখানে ইন্টারনেস আমাকে নিয়ে গেল বাভেরিয়ান সরকারের অফিসে। সেখানে ওরা আমাকে সম্প্রদান করল বাভেরিয়ান সরকারের হাতে। আমি ওদের অতিথি হয়ে তিন দিন মিউনিখে ছিলাম।

সেই সময় লক্ষ্য করি বাভেরিয়ার একটি স্বতন্ত্র পতাকা। সেখানে জার্মান পতাকার স্থান নেই। তিন দিন পরে আমাকে আবার ফিরিয়ে দেওয়া হল ইন্টারনেসের হাতে। আমি আবার হলুম পশ্চিম জার্মান সরকারের অতিথি। সেখান থেকে গেলুম বার্লিন, তারপর হ্যামবুর্গ। এই যে পশ্চিম জার্মানি সফর, এর থেকে আমার শিক্ষা হল, বাভেরিয়া জার্মানির অঙ্গরাজ্য হলেও তার একটি স্বতন্ত্র পরিচয় আছে। আবার সে অনেক বিষয়ে স্বতন্ত্র হলেও বাভেরিয়ার লোকের ন্যাশনালিটি জার্মান ন্যাশনালিটি। এবং তারই জোরে একজন বাভেরিয়ান নেতা পশ্চিম জার্মানির চ্যান্সেলার নির্বাচিত হন। তিনি ভিলি ব্রান্ট। আমি ১৯৪২-এর যেদিন জার্মানি পৌঁছাই সেদিনই তিনি চ্যান্সেলার হন।

বাভেরিয়াকে অটোনমি দেওয়া হলেও সৈন্যদল, বৈদেশিক ও কূটনীতি বিষয় তাদের দেওয়া হয়নি। এটাই আমার জানা ছিল। অর্থাৎ অন্যান্য দেশে তাদের রাষ্ট্রদূত ছিলেন না। অন্য দেশের রাষ্ট্রদূতরাও বাভেরিয়ায় ছিলেন না। এই যে সমাধান এটা এখনো জার্মানিতে বলবৎ রয়েছে। তার মানে প্রায় ১৩০ বছর এই ব্যবস্থা চলছে ভালোভাবেই। কলকাতায় জার্মানির যে কন্সাল জেনারেল আছেন একবার তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তিনি একটু হেসে বললেন, 'বাভেরিয়াকে সেই দুটি বিষয়েও অটোনমি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ওরা তা ব্যবহার করে না।' তাহলে দেখা যাচ্ছে, জার্মানি একটাই নেশন এবং সেই নেশনের অঙ্গ

অন্যান্য অঙ্গের চেয়ে বেশি ক্ষমতা ভোগ করে কারণ ওরা ক্যাথলিক। আর সবাই প্রোটেস্ট্যান্ট। এর মূলে রয়েছে একটা পারস্পরিক সমঝোতা—শুধু সংবিধান নয়।

আমার মতে, জার্মান আদর্শই আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত। কাশ্মীর হচ্ছে হিন্দুপ্রধান রাষ্ট্রে একমাত্র মুসলিমপ্রধান অঙ্গরাজ্য। অন্য রাজ্যের সঙ্গে কোনও তুলনা হয় না। তার স্বকীয়তা রক্ষার জন্য সে যদি স্বশাসন চায় তাহলে সেটা এক কথায় খারিজ করে দেওয়া যায় না। জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভার, স্বশাসনের প্রস্তাব প্রায় সবাই সমর্থন করেছে। কাশ্মীর পণ্ডিতদের নানা বিষয়ে মতভেদ থাকলেও এ বিষয়ে তারা একমত। যেক্ষেত্রে হিন্দু সংখ্যালঘুদের আপত্তি নেই সে ক্ষেত্রে ভারতের লোকসভার হিন্দু সংখ্যাগুরু সদস্যদের উচিত ছিল এ ব্যাপারে কথাবার্তা চালানোর, একটা সমঝোতায় পৌঁছানোর। সে সমঝোতা গত পঞ্চাশ বছরেও হয়নি। কাশ্মীরের মহারাজ হরি সিং মাত্র তিনটি বিষয় ভারতকে দিয়েছিলেন—সৈন্যদল, বৈদেশিক ও কূটনীতি এবং যোগাযোগের ব্যবস্থা। কিন্তু ক্রমে ক্রমে আরো অনেকগুলি বিষয় ভারত সরকারের কুক্ষিগত হয়। মহারাজা জীবিত থাকলে এ হতে দিতেন না। মহারাজার স্থান যারা নিয়েছিলেন তারা এক এক করে আরো অনেকগুলি বিষয় ছেড়ে দেন। তার ফলে কাশ্মীরের জনসাধারণ নিজেদের বিড়ম্বিত মনে করে। পাকিস্তানে তারা যেতে চায় না। ভারতেই থাকতে চায়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মতো বা বিহারের মতো মর্যাদায় তারা সন্তুষ্ট নয়। তারা চায় মহারাজার আমলে যে মর্যাদা ছিল সেই মর্যাদা। মহারাজা হরি সিংয়ের আমলে ব্রিটিশ ভারতীয় প্রদেশগুলির সঙ্গে কাশ্মীরের কোনও সমতা ছিল না। পরে কিন্তু দেখা গেল সমতার জন্য একটা প্রবল চাপ—জম্মু ও কাশ্মীরকে অন্যদের সমতুল্য না করে শ্যামাপ্রসাদের শান্তি নেই। তেমনি আজকের ভারতেও হিন্দুত্ববাদী দলগুলির কোনও শান্তি নেই—তারা ছলেবলে, কৌশলে জম্মু-কাশ্মীরকে আরেকটি মহারাষ্ট্রে পরিণত করবেন, কিংবা আরেকটি উত্তরপ্রদেশে। এর ফলে জম্মু-কাশ্মীর ভারতের অঙ্গরাজ্য হতে পারে, কিন্তু পঞ্চাশ বছর আগে যে সমস্যা ছিল এখনো সেই সমস্যাই রয়েছে। সমস্যা রয়েছে বলেই প্রতিদিন মানুষ খুন হচ্ছে। আমরা তাদের রক্ষা করতে পারছি না। এই সেদিন অমরনাথ তার্থযাত্রী সহ ১০৬ জন নির্মমভাবে নিহত হয়েছে। পরে এর পুনরাবৃত্তি যে হবে না, কে বলতে পারে? হয়তো অমরনাথ তীর্থযাত্রা পরের বছর অনুষ্ঠিত হবে না। অবস্থার উন্নতি না হলে হয়তো আর কোনদিনই হবে না। এর একমাত্র প্রতিকার কাশ্মীরের বর্তমান সরকারের সঙ্গে আন্তরিক সমঝোতা। এর মধ্যে অবশ্য পাকিস্তানের কোনও ভূমিকা নেই। তা হলেও .পাকিস্তানের সঙ্গে একটা সমঝোতা হলেই ভালো কারণ জঙ্গিরা অনেকেই আসছে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর এলাকা থেকে। তাদের বাধা দেওয়ার ক্ষমতা ভারত সরকারের নেই। পাকিস্তানের সঙ্গে কথাবার্তা একদিন না একদিন চালাতেই হবে। তখন যদি বলা হয়, কাশ্মীর ভারতীয় ইউনিয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ তাহলে পাকিস্তানের সে কথাবার্তা আরম্ভ হলেও অগ্রসর হতে পারে না। তারপর যে কোনও দিন যুদ্ধ বাধবে। তখন কেবল কার্গিল সীমান্তে নয়, সব সীমান্তেই। এখন তো পাকিস্তানের হাতে পরমাণু বোমা এসেছে। কে জানে, একদিন হয়তো পারমাণবিক বোমা দিল্লির ওপর পড়বে। যুদ্ধ বন্ধ করতে না পারলে, সবচেয়ে যেটা খারাপ সেটার জন্যই প্রস্তুত থাকতে হবে। সেই খারাপটা হচ্ছে পারমাণবিক বোমার ব্যবহার। ভারত সি টি বি টি-তে সই করতে রাজি নয়, পাকিস্তানও নারাজ। এদের রাজি করানোর জন্য আমেরিকা উদ্যোগী ছিল। এখন আর

উদ্যোগী নয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এটা একটা অরাজক অবস্থা। যে কোনও দিন যুদ্ধ হতে পারে। যে কোনও দিন পরমাণু বোমা ব্যবহার হতে পারে। এটা ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে ভাগ্যের ওপর। মানুষ হয়েও আমরা অসহায় দর্শক।

সর্বনাশ সম্বন্ধে যারা সচেতন তাদের কর্তব্য, সমঝোতার জন্য প্রয়োজন হলে ত্যাগ করা। প্রয়োজন হলে সংবিধান সংশোধিত করা। চার্চিলও তো বলতেন, ভারত নাকি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ব্রিটিশ জনমত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বদলে যায়। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করে। ভারতও কমনওয়েলথে সদস্যপদ গ্রহণ করতে রাজি হয়। ব্রিটেন তার সাম্রাজ্য হারালেও বাণিজ্য হারায় নি, বরঞ্চ বাণিজ্যের উন্নতি হয়। আজকাল তো দলে দলে ভারতীয় ইংলণ্ডে কাজকর্ম করছে। কেউ কেউ স্থায়ীভাবে বাসও করছে। কেউ কেউ ইংলণ্ডে গিয়ে কোটিপতি হয়েছে। লর্ড সভায় আসন পেয়েছে। আমি তো মনে করি যে পাকিস্তানের সঙ্গে সমঝোতা হলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো দক্ষিণ এশিয়ায় ইউনিয়ন হবে, পাকিস্তান যার অপরিহার্য অঙ্গ। ইউনিয়নের কথা মাথায় রেখে কাশ্মীর সমস্যার দ্রুত সমাধান একান্ত আবশ্যক। তার জন্য চাই আন্তরিক সমঝোতা। যথাসম্ভব ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। প্রতিদিন কত নিরীহ মানুষের প্রাণ যাচ্ছে। আরো কত মানুষের প্রাণ যাবে। তা যদি নিবারণ করতে হয় তবে অবিলম্বে সবাইকে নিয়ে এক টেবিলে বসা উচিত। কিছু না ছাড়লে কিছু পাওয়া যায় না। কিছু পেতে হলে কিছু ছাড়তে হয়। যুদ্ধের প্রস্তুতির চেয়ে শান্তির প্রস্তুতি বেশি জরুরি। মনটাকে তার জন্য তৈরি করতে হবে। কাশ্মীরের সমস্যার কোনও সামরিক সমাধান নেই, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি এক প্রকার আত্মপ্রতারণা। শান্তিপূর্ণ সমাধানই একমাত্র সমাধান। নান্য পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়।

আঠারো
কাশ্মীর, তুমি কার?

তেলের শিশি ভাঙলো বলে
খুকুরপরে রাগ করো
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করো

এ আমার ছড়া। ছড়ার মধ্যের যে মূল ভাব সেও আমার। ভারত-পাকিস্তান ভাগ আমি পছন্দ করিনি। কিন্তু দেশের স্বার্থ তো ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের উপর চলবে না। সেখানে দেখতে হবে অধিকাংশ কী চেয়েছে? ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভার ভোটে সেইসময় একজন কি দু'জন মুসলিম প্রতিনিধি বাদে বাকি সবাই চেয়েছিলেন মুসলিম রাষ্ট্র। মুসলিম প্রতিনিধিরা দাবি জানায় স্বতন্ত্র, স্বাধীন রাষ্ট্র। পাকিস্তানের দাবি তারাই করে।

এই দাবি রোধ করার একটা চেষ্টাও চলেছিল। লর্ড প্রিভিসিল এর ক্যাবিনেট মিশনে স্বয়ং বড়লাট এবং ক্রিপস একটা চেষ্টা চালিয়েছিলেন, যাতে ভাগ আটকানো যায়। ক্যাবিনেট মিশন বলেছিল কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তিনটি বিষয় থাকবে, ১) সেনাবাহিনী,

২) বিদেশনীতি ৩) যোগাযোগ ব্যবস্থা। বাকি থাকবে তিনটি গ্রুপের হাতে এ, বি, সি। প্রথম গ্রুপে থাকবে মুসলিম প্রধান বাংলা আর আসাম, আর একটি গ্রুপে থাকবে পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধু প্রদেশ। বাকি গ্রুপে আর সব হিন্দু প্রদেশ। এর মধ্যে দেখা যায় তিনটির মধ্যে দুটোতেই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ, এর ফলে আসাম আর উত্তর পশ্চিম কংগ্রেসের থেকে হাতছাড়া হয়ে যাবে। কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ এই পরিকল্পনা পছন্দ করেনি।

এরপর আরো একটি প্ল্যান হয়, মাউন্টব্যাটন প্ল্যান। এই প্ল্যানে মুসলিম লিগকে পাকিস্তান দেওয়া হয়, পরিবর্তে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব-পাঞ্জাব ভারতে রাখা হয়। ছেড়ে দিতে হয় সিলেট ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে। পাকিস্তান চলে যাবার পর নতুন ভারতবর্ষর জন্ম হল। তার নতুন নাম হল ভারত বা ইন্ডিয়া। এই দেশ সেকুলার রাষ্ট্র হিসাবে নিজেকে প্রকাশ করল। এই দেশ হিন্দু রাষ্ট্র হল না। এখানে হিন্দু মুসলিমের সমান অধিকার থাকবে। এই দেশের এক সংবিধানও তৈরি হল, তাতে স্পষ্ট করে বলা হল, যে যার ধর্ম পালন করতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র কোনও ধর্মের অধীনে নয়। এই দেশ হিন্দু মেজরিটি হলেও তাই এখনো হিন্দুরাষ্ট্র নয়। কংগ্রেস এটা মেনে নেয়। মহাত্মা গান্ধী দেশভাগ ও প্রদেশ ভাগ পছন্দ করেননি। তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে একমত হলেন না। তিনি ভারত ভাগও চান না, আবার বাংলা ভাগও চান না। কিন্তু সাধারণ হিন্দু বিশেষত বাঙালি হিন্দু গান্ধীজীর মত মেনে নেননি।

আমি তখন ময়মনসিংহ জেলার জজ। আমার জেলায় একজন সাব জজ ছিলেন তাঁর পদবি উকিল ব্যানার্জি (নামটা এখন মনে পড়ছে না) তাঁর মতো মানুষ, সদালাপী ভদ্রলোক আমি খুবই কম দেখেছি। সেই ভদ্রলোকই একদিন উত্তেজিতভাবে আমায় বললেন, 'আমাদের সেই সোনার চাঁদ ছেলেরা কোথায়? এরা কেউ গান্ধীজীকে গুলি করে মারছে না কেন?'

আমি বললুম, 'গান্ধীজীর কী অপরাধ?' তিনি বললেন, 'গান্ধীজী বাংলাভাগের বিরোধিতা করছেন কেন? বাংলা ভাগ না হলে কি হিন্দুরা বাঁচবে?' এই ছিল তার মনোভাব।

আমার মত অন্যরকম। আমি পরিষ্কারভাবেই বলেছি হিন্দু-মুসলিম ভাগ আমি চাইনি। সেই জন্য আমার এক খুব প্রিয় ডাক্তার বন্ধু নরেন্দ্রনাথ ঘোষ আমাকে চিঠি লেখেন, চিঠিতে বলেন, '...বুঝতে পেরেছি, আপনি কেন দেশ ভাগ চাইছেন না। মুসলিম লীগ আপনাকে জেলা জজ করেছে, সেই জন্য তাদের কাছে আপনি কৃতজ্ঞ।' আমি পরিষ্কারভাবে তাকে জানালুম, আমাকে জেলা জজ করেছে গভর্নর, মুসলিম লীগ নয়। আমি ইতিমধ্যে তিনটি জেলার জেলা-জজ হয়েছিলুম সিনিয়ারিটির দিক থেকে। ময়মনসিংহ আমার প্রাপ্য ছিল।

পার্টিশনের সময় প্রত্যেক অফিসারের কাছ থেকে অপশন দেওয়া হল কে ইন্ডিয়ায়, কে পাকিস্তানে কাজ করবে। বেশির ভাগ হিন্দু অফিসাররাই ইন্ডিয়ার জন্য অপশন দিল। অপশন দিল হিন্দু কেরানিরাও। এমনকি হিন্দু পিওন, চাপরাশি ওরাও একবাক্যে অপশন দিল ইন্ডিয়ায় আসবে বলে। ভারত ভাগের আগেই তাদের আর্থিক অবস্থা ছিল বেশ খারাপ। তখন তারা যে মাইনে পেত, তাতে একেবারেই চলত না। তাদের যে জমি ছিল, কেউ কেউ তাতে চাষ করত, কেউ কেউ গরু পুষত। দুধ বিক্রি করে সংসার চালাত। দেশ ভাগ হয়ে গেলে তাদের কী করে চলবে। এই চিন্তাতেই থাকতাম। কিন্তু তারা জোর গলাতেই বলল,

যেতেই হবে। আমার কর্মচারী মনোরঞ্জন ছিল সেই দলে। মনোরঞ্জন গরু পুষত আমার বাংলো চত্বরেই। সেই গরুর দুধ বিক্রি করে সংসারও চালাত সে। মনোরঞ্জনকে ডেকে বললাম, 'এভাবে সব ছেড়ে ইন্ডিয়াতে চলে গেলে তোমার চলবে কী করে? এভাবে চলে যাওয়া বোকামি।' দেখলাম আমার কথায় মনোরঞ্জনের কিছুই ভাবান্তর ঘটল না। আসলে আমার চারিদিক দেখে যা মনে হল, সরকারি কর্মচারীরা সবাই খুবই শঙ্কিত। অফিসার থেকে চাপরাশি পর্যন্ত সবারই মনে তখন ভীষণ ভয়। তারা মনে করছে মুসলিম রাজত্বে কোনও হিন্দুই টিকতে পারবে না। অতএব ইন্ডিয়া চলো। তাই যেভাবে পারো চলে যাও।

এটাও ঠিক পাকিস্তান সেকুলার নয়। মুসলিম রাষ্ট্র। সেখানে মুসলমানদের যে মর্যাদা হিন্দুদের সে মর্যাদা নয়। তাই হিন্দুরা পাকিস্তান রাষ্ট্র (এখনকার বাংলাদেশ সহ) নাম শুনলেই আঁতকে উঠত। দেখা গেল ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ হবার পর হিন্দু এক্সোডাসরা একধারে এদেশে চলে এল। এদের মধ্যে সরকারের উচ্চস্তরের অফিসার থেকে অধঃস্তন পিওন সবাই, কে নেই। তাদের কোথায় কিভাবে চাকরি দেওয়া হবে, সেটাই ছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রধান ভাবনা।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের কয়েকদিন আগে আমি গিয়েছিলুম মহাকরণে। ততদিনে আমি ময়মনসিংহ থেকে হাওড়ার জেলা জজ হিসাবে চলে আসি (যদিও হাওড়ায় আমার থাকার মেয়াদটা খুবই কম ছিল)। আমার মহাকরণে যাবার উদ্দেশ্য ছিল, আমার পরবর্তী বদলির কোনও আদেশ বেরিয়েছে কিনা তা খোঁজ করা। দেখি মহাকরণের বারান্দা একেবারে ভিড়ে ঠাসা। কোথাও এতটুকু তিল ধারণের জায়গা নেই। সব সরকারি কর্মীই সেখানে হাজির হয়েছে—জানার জন্য কোথায় তাদের পোস্টিং দেওয়া হবে। এর মধ্যে কয়েকজন ইংরেজ সাহেবকেও দেখলুম, যারা কিছুদিন আগেও দোর্দণ্ডপ্রতাপে রাজত্ব করেছে। তাদের চেহারাই সেদিন ছিল অন্যরকমের। তারা এসেছিল Last pay certificate নিতে। যাতে পরবর্তীকালে চাকরির ক্ষেত্রে তাদের কোনও অসুবিধা না হয়। এরা সবাই ভারতে এসেছিল বিদেশ থেকে। এদের কেউ তখন ফিরে যাচ্ছে বিলেতে, কেউ বা যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়ায়, কেউ বা দক্ষিণ আফ্রিকায়। একদল ইন্ডিয়া ছাড়ছে, আরেকদল ইন্ডিয়ায় আসছে। এই দুই দলেরই ভীড় ছিল সেদিন মহাকরণের বারান্দায় বারান্দায়। আমি ভিড় দেখে অনুমান করলুম সবকিছু মিটতে অনেক দেরি হবে। অলিন্দে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে আমি তখন নারাজ। হাওড়ায় ফিরে গেলুম, আমার এক কর্মচারীকে আমি পাঠিয়ে দিলুম আবার মহাকরণে।

দীর্ঘক্ষণ বাদে সে ফিরে এসে আমাকে এক মজার কথা জানাল। আমার সেই কর্মচারী আমাকে বলল, 'আপনাকে ১৪ আগস্ট অবধি মাইনের বিল করতে হবে।' কারণ সেদিন অবধিই ব্রিটিশ রাজত্ব, তারপর তাদের জমানা শেষ হয়ে যাবে। তাই ১৪ তারিখ অবধি আমাদের যা পাওনা গণ্ডা ছিল, ওরা তাই মিটিয়ে দেবে, তারপরদিন থেকে মাইনে দেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সবার মতো আমিও ওই ১৪ দিনের মাইনের বিল করে দিয়েছিলাম। এটা আমাকে ওই অধস্তন কর্মচারী মনে না করিয়ে দিলে আমার ১৪ দিনের মাইনে চিরদিনের জন্য হারিয়ে যেত।

হাওড়ায় যখন ছিলুম, তখন থাকতুম সার্কিট হাউসে। ১৪ তারিখ রাত্রে আমার বিছানায় শোওয়ার পর একটু তন্দ্রা মতো এসেছিল। আমার স্ত্রী রাত ১২টায় ঘুম ভাঙিয়ে

দিয়ে বললেন, 'ওঠো, ওঠো, দেশ স্বাধীন হয়ে গেল।' তারপর অদ্ভুত ব্যাপার সারারাত আর ঘুমই এল না। খুব ভোরবেলায় আমি কলকাতা যাবার জন্য তৈরি হচ্ছি, এমন সময় হাওড়ার কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিক আমাকে ধরে নিয়ে যান হাওড়া ময়দানে। সেখানে আমি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করি। সেখানে গিয়ে দেখি এক মুসলমান চুপ করে দাঁড়িয়ে পতাকা উত্তোলন দেখছে। আমি তার কাছে গিয়ে তার সঙ্গে কোলাকুলিও করলাম। বললাম, 'এখন থেকে তোমরা নিরাপদ।' হাওড়ায় যতদিন ছিলুম, প্রত্যেক রাত্রেই বাইরে থেকে চিৎকার শুনতে পেতুম, মুসলমানদের উপর আক্রমণ চলেছে। পুলিশ সেটা থামাচ্ছে।

স্বাধীনতা দিবসের সকালে হাওড়া থেকে কলকাতা যাবার পথে আমি দেখি ইংরেজদের ইউনিয়ন জ্যাক কোথাও নেই। নতুন গভর্নর হয়ে এসেছেন কংগ্রেস নেতা রাজাগোপাল আচারি। তার বাসভবনের উপর উঠছে তার নিজস্ব পতাকা। কলকাতা সেদিন আনন্দে মুখর। হিন্দু-মুসলমান ভাই-ভাই। হিন্দুরা মুসলমানদের আবির মাখাচ্ছেন। মুসলমানরা হিন্দুদের মাথায় গোলাপ জল ছিটোচ্ছেন। একবছর ধরে দাঙ্গা-হাঙ্গামার পর কলকাতায় এখন শান্তি। '৪৬ সালের ১৬ আগস্ট, মুসলিম লীগের ডাইরেক্ট অ্যাকশন সাম্প্রদায়িক অনর্থ ডেকে আনে, '৪৭ সালের ১৫ আগস্ট সেই অনর্থরই পরিণাম। ভারত দু'ভাগ, বাংলা দু'ভাগ, স্বাধীনতা পেয়েও আমি আনন্দ করতে পারছিনে। মহাত্মা গান্ধীর মনেও সেদিন আনন্দ নেই। তিনি সেদিন সারাদিন উপবাসে ছিলেন। সাত-আটদিন ধরে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে কলকাতার হিন্দুদেরকে শান্ত করেছিলেন। তা না হলে ১৫ আগস্ট হিন্দুরা মুসলমানদের উপর প্রতিশোধ নিত। ইতিমধ্যে আমি কলকাতায় বদলি হয়েছিলুম। আমার কলকাতা অফিসের চাপরাশিদের মধ্যে একজনের নাম ছিল কালীচরণ। সে ছিল বিহারী হিন্দু। আমি ওকে বললুম 'কালীচরণ ভালোই হল আর দাঙ্গা বাঁধবে না।' কালীচরণ চোখ পাকিয়ে আমায় বলল, 'আজ সেই শোধবোধ হত। মুসলমানদের আমরা কিছুতেই আজ ছেড়ে দিতুম না, ওদের মেরে ঠাণ্ডা করে দিতুম। ওরা বেঁচে গেল।' কালীচরণকে আমি কীভাবে বোঝাব, কলকাতায় হিন্দুরা যা করত, ঢাকায়, চট্টগ্রামে তার প্রতিক্রিয়া হত। আবার সেই দাঙ্গা-হাঙ্গামা। কলকাতাকে শান্ত করে দেবার ফলে ঢাকা-চট্টগ্রাম শান্ত হয়েছে। সেইসব জায়গার হিন্দুরা নিরাপদে বাস করতে পারছে। এটাই প্রমাণ করে গান্ধীজীর শান্তির অভিযান সফল হয়েছে। ক্ষমতাচ্যুত সুহারাবর্দী সাহেব এব্যাপারে তাঁকে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশের ব্যবস্থা করেছিলেন। দেশ ভাগ, প্রদেশ ভাগ মোটের উপর শান্তিপূর্ণই হয়। কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতার হস্তান্তর। সেটা কিছুতেই সম্ভব হত না। যদি না, মুসলিম লীগকে একভাবে না অন্যভাবে তার প্রাপ্য বখরা না দেওয়া হত। মুসলিম লীগ ক্ষমতার বখরা চেয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকার ও বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারে সমান ক্ষমতা। সেটা সম্ভব না হলেও ভূমির বখরা। মোটের উপর সমান সমান যদি বাংলা বা পাঞ্জাব ভাগ না হত, তাহলে দেশভাগ এতটা শান্তিপূর্ণভাবে হত কিনা সন্দেহ। পার্টিশানের ফলে ব্রিটিশ ভারতের চেহারা একেবারে বদলে গেল। ব্রিটিশ ভারতের প্রায় এক তৃতীয়াংশ বর্তমান ভারতের চেহারায় রূপ নিল। এরপর দেশীয় রাজ্যগুলিও প্রধানত স্বাধীন ভারতে যোগদান করে। তার ফলে মুসলিম লীগ প্রায় সমগ্র ভারতের পায় এক চতুর্থাংশ। সমগ্র ভারতে মুসলমানের

সংখ্যা ছিল শতকরা বাইশ, অর্থাৎ ভারতের মোটামুটি জনসংখ্যার প্রায় এক চতুর্থাংশ। সুতরাং মুসলিম লীগের পক্ষে অভিযোগের কোনও কারণ ছিল না।

মুশকিলটা হল জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য নিয়ে। সে রাজ্যে মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। সেই সূত্রে মুসলিম লীগ প্রত্যাশা করেছিল, মহারাজা পাকিস্তানে যোগ দেবেন। এদিকে মহারাজা তখনো মনস্থির করতে পারছিলেন না। এমন সময় কয়েকটি মুসলিম উপজাতি পাকিস্তানের পথ দিয়ে কাশ্মীর আক্রমণ করে। মহারাজা ভয় পেয়ে স্বাধীন ভারতের কাছে সৈন্য প্রার্থনা করেন। ভারত সৈন্য পাঠাতে রাজি হয়। ভারত সরকার এক শর্ত আরোপ করে বলেন সৈন্য তারা পাঠাতে পারেন, যদি কাশ্মীর ভারতের সঙ্গে যোগ দেয়। মহারাজা সেই শর্তে রাজি হন। ভারত থেকে তখন সৈন্য পাঠানো হয় কাশ্মীরে। ভারতীয় সৈন্য ওই অঞ্চল আক্রমণ করে সমস্ত শত্রুদের বিতাড়িত করে।

পাকিস্তান সরকার ভারতের এই ক্ষমতা প্রদর্শন ক্ষমা করতে পারেন না। তারাও সৈন্য পাঠিয়ে কাশ্মীরের পার্বত্য অঞ্চল বেদখল করেন। কিন্তু কাশ্মীর উপত্যকা থেকে যায় তাদের নাগালের বাইরে। তখন থেকেই কাশ্মীর নিয়ে ভারত-পাকিস্তান পরস্পর পরস্পরের শত্রু। মাঝে মাঝে বেঁধে যায় দস্তুরমতো লড়াই, অন্য সময় ঠাণ্ডা লড়াই। ইংরাজিতে যাকে বলে Cold war, ভারত থেকে সৈন্যবাহিনী গিয়ে কাশ্মীরে মোতায়েন হয়েছে, পাকিস্তানের পথ দিয়ে জঙ্গিরা কাশ্মীর উপত্যকায় এসে হানা দিচ্ছে। এই ৫০ বছর ধরে কাশ্মীর সমস্যা যেমনকে তেমন। ইউনাইটেড নেশনস মিটিয়ে দিতে পারেনি, গণভোট হয়নি, দুই পক্ষের হাতেই এখন পারমাণবিক বোমা। যেকোনও মুহূর্তে যুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ না হলে পরমাণু বোমায়, ভারত-পাকিস্তানের বড় বড় শহর বিধ্বস্ত হবে। কাশ্মীর সমস্যার কোনও সামরিক সমাধান নেই। দুই পক্ষের কথাবার্তা যদি সফল হয়, তবে সমাধানের এক সূত্র পাওয়া যাবে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত দুই তরফের কথাবার্তার সূত্রপাতই হয়নি।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ি উদ্যোগী হয়ে লাহোরে গিয়েছিলেন, কিন্তু ওদের তরফ থেকে কেউ দিল্লিতে আসেননি। পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ অনেকটা নরম হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি নিজেই এখন গদিচ্যুত হয়েছেন। পাকিস্তানে ক্ষমতা বেদখল করেছে প্রধান সেনাপতি পারভেজ মুশারফ। পাকিস্তানে পার্লামেন্ট বলে এখন কিছু নেই। যতদিন না পার্লামেন্ট ফিরে আসছে ততদিন পাকাপাকি কোনও কিছুরই মীমাংসা সম্ভব নয়। পাকাপাকি মীমাংসা বলতে, কাশ্মীর উপত্যকা কার সামিল হবে? ভারতের না পাকিস্তানের? না, কোনও পক্ষেরই নয়?

কাশ্মীর উপত্যকা হবে কি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র, যেমন বাংলাদেশও স্বাধীন রাষ্ট্র। এক্ষেত্রে ধর্মই একমাত্র নিয়ামক নয়, ধর্ম অনুসারে ব্রিটিশ ভারত ভাগ হয়েছে, কিন্তু দেশীয় রাজ্যের বেলায়? মহারাজা বা নবাব যা কিছু করবেন সেটাই মেনে নিতে হবে। দেশীয় রাজ্যগুলোর উপরে ব্রিটিশ রাজাপ্রতিনিধি ছিলেন Paramount, দেশীয় রাজন্যরা ছিল প্যারামাউন্টের অধীন। ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি বিদায়ের পূর্বে Paramount power ত্যাগ করেন। রাজন্যরা নিজের নিজের স্বাধীনতা ফিরে পান, তাদের সেই স্বাধীনতা ব্রিটিশ সরকার মেনে নেয়। ব্রিটিশ সৈন্য ভারত ত্যাগ করার সময়, জানিয়ে দিয়ে যায় যে রাজন্যদের রক্ষার ভার ব্রিটেন বহন করবে না। স্বাধীন ভারত ও স্বাধীন পাকিস্তান বহন করতে পারে। কিন্তু রাজন্যরা তাদের ইচ্ছামতো ভারত বা পাকিস্তানে যোগ দেন।

কাশ্মীর সমস্যাটা ইংরেজদের সৃষ্টি নয়, ভারত যদি অবিভক্ত থাকে তাহলে এই সমস্যা আদৌ দেখা যেত না। কাজেই বলা যেতে পারে দেশ ভাগই যদি না হত, তাহলে এই সমস্যার উদ্যোগ হত না। কিন্তু দুঃখের বিষয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ দেশভাগ না করলে শাজাহানের পুত্রদের মতো উত্তরাধিকার নিয়ে যুদ্ধ বাঁধিয়ে রাখত। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় ওয়ার অফ সাকসেশন। আমরা গৃহযুদ্ধের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম। কলকাতার পর নোয়াখালি, নোয়াখালির পর বিহার, এইভাবে দাঙ্গা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়েছিল। এই যুদ্ধ এড়াবার একমাত্র উপায় ছিল পার্টিশান। পারিবারিক জীবনে আমরা বাঁটোয়ারায় সুপরিচিত, জাতীয় জীবনে এটা অবশ্যই অভূতপূর্ব। তাবলে সব মুসলমান পাকিস্তানে চলে যায়নি। সব হিন্দু পাকিস্তান থেকে ভারতে আসেনি। বাংলাদেশে এখনো আড়াইকোটি হিন্দু বাস করছে।

কিন্তু কাশ্মীর যদি পাকিস্তানে যায় তাহলে সেখানে একজনও হিন্দু তিষ্ঠোতে পারবে না। তারা দেশত্যাগ করে শরণার্থী হবে। তাদের দুর্দশা দেখে হিন্দুরা খেপে যাবে। প্রতিবেশী মুসলমানদের উপর হামলা করবে, তাদের বলবে পাকিস্তান চলে যেতে। আমাদের সেকুলার স্টেট তার ধর্মনিরপেক্ষতা হারাবে। গণতন্ত্র হিন্দু মুসলমান ভেদ আর সইতে পারবে না। আমরা গণতন্ত্র হারাব। কাজেই আমরা কাশ্মীর রাজ্যকে কিছুতেই পাকিস্তানের সামিল হতে দেব না। তাই বলে বারবার যুদ্ধ করতে হবে, এর জন্যও আমরা প্রস্তুত নই। আমি যদ্দূর দেখতে পাচ্ছি, কাশ্মীরের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ অবশ্যম্ভাবী। তার মানে আর একটা মাউন্টব্যাটেন প্ল্যান। সেটা ছিল দ্বিপাক্ষিক, এটা হবে ত্রিপাক্ষিক। এতে খাস কাশ্মীরের অধিবাসীদেরও সম্মতি নিতে হবে। তাদের ভাগ্য নির্ধারণে তাদেরও অংশ থাকুক।

তবে আমি বলতে পারছিনে মানচিত্রে কাশ্মীরের চেহারা কিরকম হবে? সে কি আর একটি বাংলাদেশ? না ভারতের অন্তর্গত স্বশাসিত অঙ্গরাজ্য। জার্মানির যেমন বাভেরিয়া নামক অঙ্গরাজ্য। সেই বিসমার্কের আমল থেকে ক্যাথলিক প্রধান বাভেরিয়া প্রোটেস্টান্ট প্রধান জার্মানির একমাত্র স্বশাসিত অঙ্গরাজ্য। ১৩০ বছর ধরে এই ব্যবস্থা চালু রয়েছে। আমরা কি এই ব্যবস্থার অনুসরণ করতে পারিনে। মানুষকে বিশ্বাস করতে হয়, মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ।

উনিশ
২৬শে জানুয়ারি উপলক্ষে

এক একটি ইংরেজি শব্দ বিদেশ থেকে আসে আর আমরা তার জায়গায় একটা দেশী শব্দ বসিয়ে মনে করি যে অর্থটা একই, এই যেমন নেশন শব্দটা। আমরা এর তর্জমা করলুম জাতি। আর আমাদের হিন্দিভাষী বন্ধুরা করলেন রাষ্ট্র। রাষ্ট্র শব্দটি ওরা ইংরেজি State শব্দটির জন্যও ব্যবহার করে। এতে বুঝতে পারা যাচ্ছে, যে নেশন শব্দটি বলতে জাতিও বোঝায় না, রাষ্ট্রও বোঝায় না। বহু জাতি মিলে নেশন তৈরি করতে পারে। আবার একটি জাতি বহুভাবে বিভক্ত হয়ে একাধিক নেশন তৈরি করতে পারে। ইউরোপ-আমেরিকায় এরকম অনেক উদাহরণ দেখতে পাচ্ছি।

সুতরাং আমাদের দেশে নেশন কথাটি এসে পৌঁছলে আমরা বাঙালিরা করলুম জাতি,

হিন্দি ভাষায় এর অর্থ করলে দাঁড়ায় রাষ্ট্র, আর ইংরেজি শিক্ষিত ভারতীয়রা নেশন শব্দটিকে মেনে নিলেন এবং বললেন, সারা ভারতই একটি নেশন।

কোন সুবাদে একটি নেশন? আমাদের হিন্দু সমাজের এতগুলো জাত, হিন্দু সমাজের বাইরে মুসলমান, খ্রিস্টান, শিখ ধর্ম সম্প্রদায়, আমাদের এতগুলি ভাষা, আমাদের এতগুলি লিপি, আমাদের এতগুলি অঞ্চল, সব মিলিয়ে একটা নেশন এর পেছনে কী যুক্তি আছে? আমাদের আছে একই motherland অর্থাৎ মাতৃভূমি। এই যে motherland এটিও বিদেশ থেকে আমদানি। আমাদের দেশে, আমাদের ভাষায় জন্মভূমি ছিল, জননীও ছিল, কিন্তু জননী ও জন্মভূমি এক এ ধারণা ছিল না। সেজন্য বলা হচ্ছে জননী জন্মভূমিশ্চ। এখন আমরা কিন্তু বলতে আরম্ভ করলুম, যিনি জন্মভূমি, তিনিই জননী। ভারতবর্ষ আমাদের মাতৃভূমি এবং জননীতুল্য। আমরা হিন্দু-মুসলমান সেই জননীর সন্তান। সুতরাং আমরা একই নেশন। এই যুক্তিটি কিন্তু মুসলিম নেতারা স্বীকার করেননি। তাঁদের মতে ভারত একটি দেশ, কিন্তু নেশন নয়।

কিন্তু কংগ্রেসি নেতাদের মতে যার নাম দেশ তারই নাম নেশন। এই নিয়ে মতপার্থক্য এমন এক স্তরে পৌঁছয়, যে কংগ্রেসের পালটা দল হয় মুসলিম লিগ। তাদের মতে দুনিয়ার সব মুসলমান এক। ভারতীয়-অভারতীয় ভেদাভেদ নেই। ন্যাশনালিজম তত্ত্বটা মুসলিমদের মতে ভারতীয় মুসলমানদের বেলায় সত্য নয়, তারা স্বতন্ত্র নির্বাচন দাবি করেন ও পান।

এই নির্বাচন কথাটি এটিও আমাদের দেশে ছিল না। অনেকগুলো দেশীয় রাজ্য ছিল, কিন্তু কোথাও নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল না। কোথাও আইন সভা ছিল না। আইনসভার কাছে সরকার দায়ী হবে, আইনসভার আস্থাভোটের ওপর সরকারের অস্তিত্ব নির্ভর করবে, এর কোনও নজিরই আমাদের ইতিহাসে ছিল না। এটি ইংরেজদের ইতিহাসে ছিল, আমরা ইংরেজদের কাছ থেকে এটি পেলুম। একে বলা হয় Parliamentary Democracy, একে বাংলায় সংসদীয় গণতন্ত্র বললে এর সম্যক অর্থ হয় না। কারণ বিষয়টি একেবারেই ভারতের ইতিহাসে নজিরবিহীন। কিন্তু আমাদের কংগ্রেস নেতারা ধরে নিলেন, ভারতেরও একটি আইনসভা থাকবে, ভারত সরকার তার কাছে দায়ী হতে বাধ্য। সেই সভার সদস্যরা হবেন নির্বাচিত, যেমন ইংরেজদের পার্লামেন্টে হয়ে থাকে।

কংগ্রেস কথাটাই বিদেশী। তার যে আদর্শ তাও বিদেশী। কিন্তু কংগ্রেস যা চাইছে তা স্বদেশের স্বার্থে। তাই কংগ্রেসের দাবি হল, ভারতের জন্য চাই হোমরুল। এই কথাটিও বিদেশী। এটি প্রথম আয়ারল্যান্ড দাবি করেছিল। ভারতীয় নেতারা দাবি করলেন হোমরুল অর্থাৎ স্বরাজ। এই স্বরাজ কথাটাই নতুন। ইতিহাসে এর কোনও নজির নেই। সেকালের কংগ্রেসের নেতারা প্রজাতন্ত্রের কথা ভাবতে পারতেন না। তাঁরা রাজতন্ত্রই চেয়েছিলেন। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান মতপার্থক্য এড়াবার জন্য তাঁরা চেয়েছিলেন, ব্রিটেনের রাজাই ভারতের রাজা হন। ব্রিটেনের রাজার মতো সে রাজারও নিজের কোনও ক্ষমতা থাকবে না। ক্ষমতা ন্যস্ত হবে মন্ত্রিসভার ওপরে। সুতরাং স্বরাজ বলতে বোঝাত বিদেশী রাজতন্ত্রের মোড়কে স্বদেশী গণতন্ত্র। এক্ষেত্রে মুসলিম লিগ নেতাদের সঙ্গে তাঁদের মতভেদ ছিল। কারণ তাঁদের মতে স্বরাজ হলে সেটা দাঁড়াবে হিন্দু মেজরিটিরাজ।

কী করে সেটাকে হিন্দু-মুসলিম যৌথ রাজত্বে পরিণত করা যায়, এরজন্য সকলেই চিন্তিত ছিলেন। কারণ এটা কেউই চাননি, যে স্বতন্ত্র নির্বাচনসূত্রে দুই স্বতন্ত্র রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত

হোক। হিন্দু মুসলমান একতার জন্য কংগ্রেস ও লিগের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়েছিল ১৯১৬ সালে। পরবর্তীকালে দেখা গেল ইংরেজরা কিছুতেই ভারতকে স্বরাজ দেবে না, তার জন্য অহিংসভাবে লড়তে হবে। আশা করা গিয়েছিল, যে কংগ্রেস ও লিগ একই সঙ্গে লড়বে, কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনে লিগপন্থী মুসলিমদের সাড়া পাওয়া গেল না। যারা এগিয়ে এলেন, তারা খেলাফৎপন্থী। খেলাফৎ আন্দোলন থেকে যাবার পর, তাদের অনেকেই হলেন কংগ্রেসপন্থী, মুসলিম সম্প্রদায়ের সকলেই লিগপন্থী এটা কখনই সত্যি ছিল না। কংগ্রেসপন্থীরা সকলেই হিন্দু ছিলেন, এটাও তেমনি অসত্য। কংগ্রেসের বাইরে ছিলেন হিন্দুমহাসভাপন্থীরা, কমিউনিস্টপন্থীরা, মানবেন্দ্রনাথ রায়ের র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্টরা।

কংগ্রেস লিগের দ্বন্দ্বটা ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদীদের, কিন্তু তা বলে তাঁরা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র চাইতেন না। ৩০ এর দশকের গোড়ায়, পাকিস্তান কথাটার উদ্ভব হয়। গোড়ার দিকে মুসলিম লিগ পাকিস্তানের প্রস্তাবে কর্ণপাত করেনি, কিন্তু পরে দেখা গেল, আটটি প্রদেশে কংগ্রেস সরকার গঠন করল। একটিতেও মুসলিম লিগের সদস্য কারোকেও মন্ত্রী করল না। কংগ্রেসের কাজকর্ম দেখে লিগপন্থীদের সন্দেহ হল যে ভারতে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করা হবে, তখনো কংগ্রেস একাই সরকার গঠন করবে। মুসলিম লিগকে একটিও আসন দেবে না। মুসলিম লিগ তাহলে করবে কী? চিরকাল সরকারের বাইরে থেকে যাবে ও কেন্দ্রীয় আইনসভায় বিরোধীপক্ষ হবে? জিন্নাহ সাহেব ছিলেন, যখন কেন্দ্রীয় আইনসভার এক জন অতি পুরাতন সদস্য এবং ইংরেজ সরকারের সমালোচক, তিনি আশা করেছিলেন, যে কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁদের সমঝোতা হবে। সেই ১৯১৬ সালের মতো একটি কংগ্রেস লিগ চুক্তি হবে। কংগ্রেসেও অনেকে ছিলেন যারা লিগের সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে নিতে চাইতেন। কিন্তু জিন্নাহ সাহেব একটি পুরনো শর্ত আরোপ করলেন, কংগ্রেসকে মেনে নিতে হবে যে মুসলিম লিগই সারা ভারতের সব মুসলমানের একমাত্র প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান। তার মানে কংগ্রেসে মুসলমানের স্থান নেই, কেবল হিন্দুর স্থান। কংগ্রেস সেটা মেনে নিতে পারে না। কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনে এবং পরে সত্যাগ্রহ ও ভারত ছাড়ো আন্দোলনে বহু মুসলমান কারাবরণ করেছিলেন। তাছাড়া উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ তো ছিল কংগ্রেসপন্থী মুসলমানদের, যারা গঠিত সরকারের অধীন। কংগ্রেস তাদেরকে লিগের হাতে সমর্পণ করতে চায়নি। সুতরাং কথাবার্তা ভেস্তে গেল।

এর পরের অধ্যায় হচ্ছে, পাকিস্তানের জন্য মুসলিম লিগ আন্দোলন, তার ফলে ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে পাকিস্তানি ইস্যুতে কেন্দ্রীয় আইন সভাতে এবং সরকার প্রাদেশিক আইনসভায় মুসলিম লিগের সদস্যদের জয়জয়কার। তাদের একটাই দাবি, হিন্দুস্থান, পাকিস্তান নামে দুই রাষ্ট্র হোক, যেহেতু হিন্দু ও মুসলমান দুই নেশন। হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায় হতে পারে, কিন্তু দুই নেশন, এটা একেবারেই মেনে নেওয়া যায় না। এমনকি ইংরেজরাও তা মনে করতেন না। মুসলিম লিগদের এই দাবি মানতেন না, পাঞ্জাবের ইউনিয়নস পার্টি, বাংলাদেশের কৃষকপ্রজা পার্টি ও আরো কয়েকটি মুসলিম সংস্থা। তাঁরা ছিলেন ভারত-পাকের বিরোধী।

এই যখন পরিস্থিতি তখন দেখা গেল ইংল্যান্ডে লেবার পার্টি ক্ষমতায় এসেছে। তারা ভারতকে একটি স্বশাসিত রাষ্ট্রের মর্যাদা দিতে চায়। কিন্তু তাদের শর্ত হচ্ছে, কংগ্রেস-মুসলিমলিগ এই দুটি দল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা গঠন করবে। একটি অন্তর্বর্তী কেন্দ্রীয় সরকার

গঠন করা হল, তাতে কংগ্রেসের আসনসংখ্যা বেশি হতে যাচ্ছে দেখে, জিন্নাহ্ সাহেব দাবি করেন, যে কংগ্রেস ও লিগকে সমানসংখ্যক আসন দিতে হবে। এবং তিনিই ঠিক করে দেবেন, খ্রিস্টান, শিখ ও পারসি সদস্যদের কে কে তাঁর দিকে থাকবেন। মোট কথা তিনি চান, কেউই মেজরিটি নয়, কেউই মাইনরিটি নয় দুই পক্ষই সমান। দুই পক্ষের মধ্যে যদি মতভেদ হয় ও তারপর সরকার অচল হয়, তাহলে তৃতীয় পক্ষ হস্তক্ষেপ করবে। তার মানে ইংরেজরাই বড়লাট হিসাবে মাথার ওপর থাকবে। এর নাম স্বাধীনতা নয়। ইতিমধ্যেই ইন্ডিপেন্ডেন্স বা স্বাধীনতা কথাটির আগের মতো ব্যবহার করা হত না।

কংগ্রেস ১৯২৯ সালে প্রস্তাব নিয়েছিল, ভারতকে স্বাধীনতা দিতে হবে। Dominion Status নয়। গান্ধীজী এর অর্থ করেছিলেন পূর্ণ-স্বরাজ। লাহোরের সেই প্রস্তাবেই স্থির হয়ে যায়, ২৬ জানুয়ারি তারিখে স্বাধীনতা দিবস পালিত হবে। কংগ্রেসের ত্রিবর্ণ পতাকাই সেই দিবসে উত্তোলন করা হবে। সেই ত্রিবর্ণ পতাকায় গান্ধীজীর ইচ্ছায় একটি চরকাও অঙ্কিত ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতাকায় যেন কাস্তে হাতুড়ি, স্বাধীন ভারতের পতাকায় তেমনি চরকা। তাহলে আর কেউ বলতে পারবে না, যে কংগ্রেস হচ্ছে শুধুমাত্র উচ্চাসনের মানুষদের প্রতিষ্ঠান। চরকা হচ্ছে খেটে খাওয়া মানুষদের প্রতীক, দীন দরিদ্র জনগণের প্রতীক যারা সুতো কেটে দিনে অন্তত দু-চার আনা রোজগার করতে পারে। যেটা সেকালে সকলের ভাগ্যে জুটত না।

২৬ জানুয়ারি তারিখের যে ত্রিবর্ণ পতাকা সেটি প্রথম উত্তোলিত হয় ১৯৩০ সালে। তার সঙ্গে আমার জীবনের কিঞ্চিৎ সম্পর্ক আছে। আমি তখন রাজসাহী জেলার নওগাঁও মহকুমার ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট। আমার এলাকার মধ্যে ছিল আত্রাই ঘাটের সঙ্কটত্রাণ কর্মীদের আশ্রম। সেটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উত্তরবঙ্গ বন্যার সময় সেবা করবার জন্য। তার সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু সেকালের যাঁরা সেবাকর্মী ছিলেন, তাঁরাও ২৬ জানুয়ারি তারিখে তাদের আশ্রমের জমিতে একটি ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলন করেন, সেটিকে তাঁরা নামান না সেই অবস্থায় রেখে দেন। জেলাশাসক পিরেন সাহেবের সেটি নজরে পড়ে। তিনি আমাকে বলেন, আশ্রমকর্মীদের অনুরোধ করতে তারা যেন পতাকাটি সরিয়ে দেয়, নতুবা তাদের আশ্রমকে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য করা হবে এবং সরকার বিরোধী কার্যকলাপের জন্য আশ্রমটি বন্ধ করে দেওয়া হবে। আমার ওপর ভার পড়ে, আশ্রমিকদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে পতাকাটিকে নামানোর। এই আশ্রমিকদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল। এরা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের শিষ্য। এবং ত্যাগী পুরুষ। আমি তাদেরকে বুঝিয়ে বলি, যে ২৬ জানুয়ারি পার হয়ে গেছে, এখন আর পতাকাটিকে উড়িয়ে রাখার কী দরকার। সেটাকে নামিয়ে দেওয়া হোক। তাঁরা বলেন, নামাতে যদি হয়, তাহলে আপনিই নামান। তখন আমাকেই সেই অপকর্ম সম্পাদন করতে হয়। কিন্তু সেই পতাকাটিকে আমি নিজ হেপাজতে বাক্সের মধ্যে রেখে দিই, পুলিশের মালখানায় পাঠাই না। সেই পতাকা আমার বাক্সবন্দী হয়ে পনেরো বছর নানা জেলায় ঘুরেছে। কেউ টের পায়নি। স্বাধীনতার পরে সেই পতাকার কোনও মহিমা আর রইল না। ত্রিবর্ণ পতাকা থেকে চরকা বাদ গেল। তার স্থানে এল চক্র। সেটি একটি বৌদ্ধ প্রতীক। বুদ্ধ স্বয়ং ধর্মচক্র আবর্তন করেছিলেন। সেটি একটি উচ্চ আদর্শ।

যাই হোক স্বাধীনতার আগে আমি যখন হাওড়ার সার্কিট হাউসে বদলির অপেক্ষায় আছি সেই সময় হঠাৎ এক মধ্যরাত্রে ভারত স্বাধীন হয়। ভোরবেলা হাওড়ায় স্থানীয় নেতারা

আমাকে পাকড়াও করে ধরে নিয়ে যান। হাওড়া ময়দানে। তাঁদের ইচ্ছায় আমি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করি। সেটি কংগ্রেস পতাকা নয়, তাতে চরকা নেই। কিন্তু সেটিও ত্রিবর্ণ পতাকা। সেই অনুষ্ঠান শেষ হবার পরে আমায় হাওড়ার জজকোর্টের কর্মীরা ধরে নিয়ে যান, আমি আবার সেখানেও পতাকা উত্তোলন করি। এগুলি হল অবশ্য ১৫ আগস্টের ঘটনা। এরপর ২৬ জানুয়ারি এল যখন তখন কী হল জানিনে, আমায় কেউ ডাকেনি, আমিও যাইনি। ত্রিবর্ণ পতাকা নামানোর অভিজ্ঞতা যেমন হয়েছে তেমনি উত্তোলনেরও অভিজ্ঞতা হয়েছে।

আবার এল ১৫ আগস্ট। আমি তখন বহরমপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। ২৬ জানুয়ারি আর স্বাধীনতা দিবস ছিল না, পরে হয়ে গেল প্রজাতন্ত্র দিবস। প্রজাতন্ত্র দিবসের অভিজ্ঞতা জীবনে হয়নি। অর্থাৎ স্ব স্ব রূপে এমনিই দর্শকরূপে হয়তো কোনওবার অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছি, তা মনে নেই। আমি তো ৫১ সালে সরকার থেকে চলে এসেছি, কংগ্রেসের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। তবে প্রত্যেকবার ২৬ জানুয়ারি আমাকে সকালবেলা প্যারেড দর্শন করবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়, আমি যাই না। আর প্রত্যেকবার রাজভবনে চায়ের নিমন্ত্রণ করা হয়। আমি প্রত্যেকবারই সেখানে যেতুম, যতদিন আমার স্ত্রী জীবিত ছিলেন। নিমন্ত্রণ এখনো পাই, কিন্তু যাই না।

ইতিমধ্যে দেশভাগ হয়ে গেছে, প্রদেশ ভাগ হয়ে গেছে, নেশন বলতে আমরা যা বুঝতুম তা বদলে গেছে। আমার হৃদয় দু'ভাগ হয়ে গেছে। আমি এক চোখে হাসি, এক চোখে কাঁদি। স্বাধীনতা আমার কাছে নিছক আনন্দের ব্যাপার নেই। এর সঙ্গে নিরানন্দ মিশে আছে। কোথায় সেই আত্রাই ঘাট, কোথায় সে পতাকা অপসারণ, কোথায় সে ব্রিটিশ আমল। সবই এখন বিস্মৃতির অতলে।

কুড়ি
হুঁশিয়ারি

আইনের শাসন ভেঙে পড়লে কী হয় তার জন্যে বেশি দূর যেতে হবে না। আমাদের প্রতিবেশী বাংলাদেশের দিকে চেয়ে দেখুন। আইনের শাসনের বিকল্প সামরিক শাসন। অসামরিক আইনের বিকল্প সামরিক আইন। ওরা আর আমরা দুটো স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের নাগরিক হলেও একই ধাতুতে গঠিত। কথায় কথায় আইনকে নিজের হাতে নিতে ওদের বা আমাদের একটুও বাধে না। পুলিশের সংখ্যা ব্রিটিশ আমলের চেয়ে বহুগুণ বেড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেটের সংখ্যা। জজের সংখ্যাও। উকিল ব্যারিস্টারের তো লেখাজোখা নেই। কিন্তু কোথায় সেই নিরাপত্তাবোধ, যে কোনো লোক যে কোনো অজুহাতে নরহত্যা করতে পারে, নারীনির্যাতন করতে পারে, সম্পত্তি লুঠ করতে পারে, কিন্তু সাজা হয় ক'জনের, আর সে সাজাও তো পরে মকুব হয়ে যায়। আসামী হাসতে হাসতে ফিরে এসে সাক্ষীকে সাজা দেয়। এমন অরাজক অবস্থায় সাক্ষী দিতে সাহস হবে ক'জনের। সনাক্ত করতে নারাজ হলে তো মামলাই হবে না। জঘন্যতম অপরাধও সমাজ সহ্য করবে।

সমাজ সহ্য করলেও ধর্ম সহ্য করে না। ধর্মের মার নেমে আসে সামরিক শাসন রূপে। পূর্ব পাকিস্তানে ও বাংলাদেশে সামরিক শাসন বার বার নেমে এসেছে। তবুও

লোকের শিক্ষা হয়নি। তারা আইনের শাসনের মূল্য বোঝে না। যতদিন না বুঝতে শিখছে ততদিন তাদের কপালে আছে সামরিক শাসন। সামরিক শাসন ব্যর্থ হলে বিদেশী শাসন। আমরাও যদি দেখে না শিখি তবে আমরাও একদিন ঠেকে শিখব। বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে যা শুনছি তা লিখতে কষ্ট হচ্ছে। বিচার-বিভাগীয় তদন্তের উপরেও তাঁদের অনেকের আস্থা নেই। পুলিশের উপর আস্থা তো নেইই, রাজনীতিকদের উপরেও না। কোনো দলকেই তাঁরা বিশ্বাস করেন না। একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক আমাকে বলেছিলেন, প্রত্যেকটি দলের গুণ্ডাবাহিনী আছে। গুণ্ডাদের সঙ্গে রাজনীতিকদের সম্পর্ক আজ কারো কাছে সংবাদ নয়। পুলিশের সঙ্গে গুণ্ডার সম্পর্কও কাউকে বিস্মিত করে না। এখন পর্যন্ত আস্থা আছে একমাত্র বিচারকদের উপরেই। কিন্তু সেটাও সকলের উপরে নয়। এই যে দেশের অবস্থা সেদেশে আইনের শাসন টিকবে আর কদ্দিন! কোথায় সেই মেরুদণ্ড যার জোরে খাড়া থাকবে গণতন্ত্র? গড়ে উঠবে সমাজতন্ত্র?

একুশ
১৫ আগস্ট উপলক্ষে

স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে পরিমাণ সংগ্রাম করার দরকার ছিল, আমাদের তা করতে হয়নি। আমরা একটা শর্টকাট পেয়ে গেলাম, তা হল দেশ বিভাগ। অবশ্য সে সময় এ ছাড়া অন্য কোনো উপায়ও ছিল না। এইভাবে স্বাধীনতা পাওয়ার দরুন স্বাধীনতা যে কত মূল্যবান, সেই বোধ কমে গিয়েছে। ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে, পুত্রদের উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া পিতার উপার্জিত সম্পত্তির ভোগদখলের মত। দুঃখ হয় দেখে আমরা স্বাধীনতার দিনটিতে ফরাসিদের মতো স্বতঃস্ফূর্ত উৎসবে মত্ত হইনে। ওদেশে বিপ্লবের দিনটিতে (১৪ জুলাই) উন্মাদনা প্রায় ২০০ বছর ধরে সমানে সক্রিয়। আমাদের উন্মাদনা কয়েক বছরের মধ্যেই স্তিমিত। কিন্তু এর কোন প্রতিকার নেই। হা হতাশ করেও কোন ফল হবে না। আসলে স্বাধীনতা পাওয়ার পর স্বাধীন নাগরিক হয়ে ওঠার কোন চেষ্টা করা হয়নি। এটা নেতাদেরই ভুল। তাঁরা ভাবলেন দেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তপস্যা শেষ। আসলে তপস্যা চালিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। রাজনীতি একটা খুব খারাপ মোড় নিয়েছে। দুর্নীতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে। ব্যাপক কালোবাজারির ছত্রছায়ায় ছোট বড় আমরা সবাই দিশেহারা। এই অবস্থায় যদি নতুন প্রজন্মের কাছে স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য উপলব্ধি না হয়ে থাকে, তার জন্য তাদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। তবু বলব, হতাশ হওয়ার কিছু নেই। রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজীর দেশে সমূহ সর্বনাশের সম্ভাবনা নেই।

বাইশ
উপায় ও উদ্দেশ্য

দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতে গান্ধীজী যেসব পরীক্ষানিরীক্ষা চালান তাদের দুই ভাগে বিভক্ত করতে পারা যায়। এক ভাগ হচ্ছে means বা উপায় নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা, আর এক ভাগ হচ্ছে ends বা উদ্দেশ্য নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা। তার ফলে তিনি স্থির-নিশ্চিত হন যে

অহিংসাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ উপায়। সেই অহিংসা রাজনীতিতেও প্রয়োগ করতে পারা যায়। সেক্ষেত্রে তার নাম অহিংস অসহযোগ বা ব্যক্তি সত্যাগ্রহ বা গণসত্যাগ্রহ। ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে এগুলি তিনি একে একে প্রয়োগ করেন। কিন্তু যে উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এগুলি প্রয়োগ করেন সেটা কেবল দেশের স্বাধীনতা নয়, সেই সঙ্গে এবং তারপরে প্রত্যেকটি ব্যক্তির স্বাবলম্বন ও প্রত্যেকটি গ্রামের স্বয়ংসম্পূর্ণতা, সেই সঙ্গে গ্রামস্বরাজ। এ বিষয়ে তাঁর পরিকল্পনার নাম দেন সর্বোদয়। তার মানে সকলের উন্নতি বা প্রগতি। কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় ধনিকের নয়, বা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নয় বা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের নয়।

গান্ধীজী অনুভব করেন দেশের সর্বসাধারণ বলতে প্রধানত বোঝায় গ্রামবাসী দীনদরিদ্র মানুষ, যারা কাজ করতে চাইলেও কাজ পায় না, ক্ষুধার অন্ন কায়িক পরিশ্রমের দ্বারাও উপার্জন করতে পারে না, যাদের কাছে ভগবান দেখা দেন রুটি রূপে। এরা রুটির অন্বেষণে ভিড় করে শহরে, সেখানে স্থান হয় শহরের নিকৃষ্ট অংশে। সেখানেও যে তারা রোজকার অন্ন রোজ উপার্জন করতে পারে তা নয়।

স্বাধীনতার জন্য যাঁরা সংগ্রাম করতেন তাঁদের অধিকাংশের ধারণা দেশটাকে ইংল্যান্ড আমেরিকার মতো যন্ত্র-শিল্পায়ন করলেই সকলের বরাত খুলে যাবে। যন্ত্র-শিল্পের উপর এই অপরিসীম বিশ্বাস গান্ধীজীর ছিল না। দশজন মানুষ যা করত যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে একজন তা সম্পন্ন করতে পারে। ফলে বাকি দশজন নিষ্কর্মা হয়। সেই অবস্থাকে কখনো তাদের উদয় বা উন্নতি বলা যায় না। যন্ত্র-শিল্প যে আদৌ থাকবে না তা নয়। ইস্পাতের কারখানা থাকতে পারে, কিন্তু কাপড়ের কল কেন থাকবে? চরকায় কাটা সুতো দিয়ে তাঁতে কাপড় বোনা যায়, তাতেই অনেকতর লোকে অন্ন-সংস্থান। অধিকতর লোকের অন্নসংস্থান যদি মূলনীতি হয় তবে চরকায় কাটা সুতো দিয়ে খদ্দর তৈরি করাই হবে মূলনীতি-সংগত। এখানে চরকা বলতে বোঝায় যাবতীয় হস্ত-শিল্প। ইংল্যান্ড তো হস্ত-শিল্পকে প্রায় বিলুপ্ত করেছে। ভারতের হস্ত-শিল্পেরও সেই দশা হবে ভারত যদি তার চিরাচরিত মূলনীতি থেকে ভ্রষ্ট হয়। এই মূলনীতির প্রশ্নে গান্ধীজী তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অবিচল ছিলেন। তাঁর নিধনের ঠিক একদিন আগে একজন মার্কিন মহিলা সাংবাদিক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। সাক্ষাৎকারের সমস্ত সময়টা তিনি চরকা কাটায় নিবিষ্ট থাকেন। চরকা কাটতে কাটতেই প্রশ্নের উত্তর দেন। মহিলাটি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, এর কারণ কী? গান্ধীজী উত্তর দেন, এটাই আমার 'bread labour' এইভাবেই আমি আমার অন্ন উপার্জন করছি।

প্রায় দশ বছর বাদে আমি জাপানে গিয়েছিলুম একটি সাহিত্যিক সমাগমে যোগ দিতে। সেই সূত্রে কিয়োতোয় আমাকে জেন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের একটি মঠে একরাত কাটাতে হয়। মঠাধীশ সেই রাত্রে অন্য কোথাও গিয়েছিলেন। আমি হলুম তাঁর ঘরে সমাসীন। এমন সৌভাগ্য আমার জীবনে কখনো হয়নি। পরের দিন মঠের অন্যান্য সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে শুনতে পেলুম পূর্ববর্তী মঠাধীশের জীবন কাহিনী। তিনি অতি বৃদ্ধ বয়সেও প্রতিদিন কোদাল হাতে নিয়ে মাটি কেটে রাস্তা তৈরি করতেন মঠের চৌহদ্দির মধ্যে। তাঁর শিষ্যরা তাঁকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে তাঁর কোদালটি লুকিয়ে রাখেন। তিনি সেটি খুঁজে না পেয়ে নিরাশ হয়ে অনশনে বসেন। তাঁর শিষ্যরা অনুনয় করলে তিনি বলেন, নেই কাজ তো নেই ভাত। কাজ যদি না করতে পারি তো ভাত খাব কেন! অর্থাৎ কোদাল দিয়ে মাটি

কাটাই তাঁর bread labour. যিশুখ্রিস্টও তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন, তোমরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজকার রুটি রোজগার করবে। এই নীতির উপর নির্ভর করে রাসকিন লিখেছিলেন তাঁর গ্রন্থ 'Unto this Last.' গান্ধীজী তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সেটি গুজরাটি ভাষায় অনুবাদ করেন ও তার নাম রাখেন 'সর্বোদয়'। তাঁর স্বদেশের জন্য সর্বোদয়ই হয় তাঁর অভিষ্ট। দেশে ফিরে এসে তিনি সত্যাগ্রহ আশ্রম স্থাপন করেন।

শুরু হয়ে যায় সত্যাগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে সর্বোদয়ের প্রস্তুতি যার নাম রচনাত্মক কার্যক্রম। একদল অনুগামীকে তিনি রচনাত্মক কার্যক্রম নিয়ে নিবিষ্ট থাকতে নির্দেশ দেন। তাঁরাই পরবর্তীকালে সর্বোদয় সাধনে একনিষ্ঠ কর্মী। একদিন তাঁরা তাঁদের লক্ষ্যভেদ করবে। এটাই আমার বিশ্বাস ও প্রত্যাশা।

তেইশ
গান্ধী চিন্তাধারার প্রাসঙ্গিকতা

ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থা যুগে যুগে হাত বদল করতে করতে অবশেষে একদল বিদেশী বণিকের হাতে পড়ে। সেই সূত্রে ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও তাদের হস্তগত হয়। যেমনটি আগেকার যুগে কখনো ঘটেনি। যিনি শাসক তিনি শোষক ও যিনি শোষক তিনি শাসক, এটা একটা অপূর্ব যোগাযোগ। এদেশের লোক সুশাসনে প্রীত হয়, কিন্তু পরে উপলব্ধি করে যে তাদের ধনসম্পদ বাইরে চলে যাচ্ছে, পল্লীশিল্প ধ্বংস হচ্ছে, তারা রফতানি করছে কাঁচামাল, আমদানি করছে কলকারখানায় তৈরি মাল। ধীরে ধীরে স্বরাজের তথা স্বদেশীর দাবি ওঠে। দাবি যারা তোলে তারা স্বদেশের ধনিক তথা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোক। ইংরেজরা জানত এরা কত দুর্বল। তাই ক্ষমতার কতকটা ছেড়ে দিয়ে অনেকটা হাতে রাখে। এমন সময় রাজনীতি ক্ষেত্রে গান্ধীজীর প্রবেশ।

গান্ধীজীর লক্ষ্য উভয়বিধ ক্ষমতার উপরে। তিনি চান এক হাতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, আরেক হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা। তাঁর এক চোখ ছিল রাজনীতির উপরে, আরেক চোখ অর্থনীতির উপরে। দুই চোখই মূল নীতির উপরে। যে মূলনীতির সার কথা সত্য ও অহিংসা। সংগ্রামের নেতৃত্ব তিনি গ্রহণ করেন এই শর্তে যে তাঁর অনুগামীরা সত্যনিষ্ঠ তথা অহিংসানিষ্ঠ থাকবেন। তা ছাড়া তাঁর আবেদন তো জনগণের কাছে, যেমন আগেকার দিনের নেতাদের আবেদন ছিল সরকারের কাছে। জনগণের স্বার্থই তাঁর কাছে বৃহত্তর, বিত্তবানগণের স্বার্থ নয়, যেমন ছিল আগেকার দিনের নেতাদের কাছে। তাই তাঁর প্রোগ্রাম রচিত হয় জনগণের দিক থেকে যা ভালো সেই কথা ভেবে। চরকার সুতো কাটা জনগণের দিক থেকে ভালো। বিত্তবানদের দিক থেকেও ভালো। তাদের সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করলে তবেই না তারা সংগ্রামে অংশ নেবে। তাদেরই খাতিরে কিছু ত্যাগ স্বীকার না করলে তাদের বিশ্বাস পাওয়া যাবে কোন্ সূত্রে? চরকার সূত্রই সেই সূত্র।

গান্ধীজীর নেতৃত্ব যাঁরা বরণ করলেন তাঁরা সত্য ও অহিংসাকে মেনে নিলেন পলিসি হিসাবে, মূলনীতি হিসাবে নয়। জনগণের দ্বারস্থ হলেন তাদের ভোটের আশায়, তাদের ভোট পেয়ে তাদের উপর কর্তৃত্ব করার মানসে। তাঁদের মধ্যে সত্যিকার গান্ধীপন্থী ছিলেন শতকরা দশজন কি বারো জন। সেই ক'জনকে নিয়ে হয়তো ব্যক্তি-সত্যাগ্রহ চলে, কিন্তু গণ-সত্যাগ্রহ

সম্ভব নয়। গণসত্যাগ্রহের জন্যে তাঁদের সহযোগিতা অত্যাবশ্যক। গান্ধীজী নাচার হয়ে আপস করেন। তাঁরা চান পার্লামেন্টারি নির্বাচন, মন্ত্রিত্ব, ক্ষমতা। তিনি তাঁদের ইচ্ছা পূরণ করেন। পরে তাঁরাও তাঁর ইচ্ছা পূরণ করেন। মন্ত্রিত্ব ছেড়ে ক্ষমতা ছেড়ে কারাগারে যান ও সেখানে বছরের পর বছর কাটান। এমন দৃশ্য পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায়নি যে যুদ্ধকালে রাতারাতি বড়লোক না হয়ে পার্লামেন্টারি রাজনীতিকরা জেলখানায় গিয়ে দুঃখ কষ্ট সইছেন। যুদ্ধ যতদিন না শেষ হয়।

যাদৃশী সাধনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। কংগ্রেস নেতারা ফিরে যান প্রাদেশিক সরকারে। তার পরে যোগ দেন কেন্দ্রীয় সরকারে। ইংরেজরা তাঁদের হাতে অধিকাংশ ভারত সঁপে দিয়ে বিদায় নেয়। অবশিষ্ট মুসলিম লীগ নেতাদের হাতে। সংগ্রামের আর কোনো দরকার থাকে না। আর গান্ধীজীও হয়ে যান অদরকারী। গণসত্যাগ্রহের প্রয়োজন না থাকলে জনগণও হয় অনাবশ্যক। কেবল পাঁচ বছর অন্তর নির্বাচনের সময় তাদের মনে পড়ে। নির্বাচনের পরে আবার যে কে সেই। তবে তারা আগের চেয়ে স্বাধিকার সচেতন হয়েছে। ভোটে কংগ্রেসকে হারিয়ে দিতেও জানে।

কিন্তু আজকের ভারতে গান্ধীজী কোথায়? গান্ধীপন্থীরা কোথায়? সত্যাগ্রহ নামে যেটা মাঝে মাঝে দেখা যায় সেটা অসঙ্গত কারণে। সত্য থেকে দূরে। অহিংসা বলতে বোঝায় দিন কয়েকের কারাবাস। চরকা অনুষ্ঠাননিষ্ঠতায় পর্যবসিত। খাদি চলে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায়। বিদেশী মালটিন্যাশনাল স্বদেশী সহযোগিতায় সুপ্রতিষ্ঠ। বিদেশী যন্ত্রে কলকারখানার বিস্তার হয়েছে। মুনাফা যাচ্ছে স্বদেশী ধনিকদের ভাণ্ডারে। গ্রাম থেকে যে কাঁচামাল শহরে যাচ্ছে সেটাই গ্রামে ফিরে আসছে কারখানার মাল হয়ে। প্রত্যেকটি রাজ্যে লোক চাইছে কলকারখানার বৃদ্ধি। শহরের সংখ্যা বাড়ছে, শহরের জনসংখ্যাও বাড়ছে। ফুটপাথের বাসিন্দার সংখ্যাও বাড়ছে। বস্তির লোক মোটা টাকায় বস্তি বেচে দিচ্ছে ধনীদের। তারা বহুতল অট্টালিকা নির্মাণ করছে।

বিকেন্দ্রীকরণ? কেন্দ্রীয় সরকার ব্রিটিশ আমলেও এত ক্ষমতাশালী ছিলেন না। কারণ পাবলিক সেক্টর সরকারের হাতে ছিল না। সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশও তাঁদের সৃষ্টি নয়। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সও না। আর্মি, নেভী, এয়ার ফোর্স সব ফেঁপে উঠেছে ফাঁপা টাকায়। আরো ফাঁপবে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আরো খারাপ হলে পারমাণবিক অস্ত্রের প্রতিযোগিতায় ভারত যোগ দেবে না এমন কোনো প্রতিজ্ঞা করেনি। শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্যে পারমাণবিক প্রস্তুতি বহুদূর অগ্রসর হয়েছে। সরকার যদি আদেশ দেন আমাদের বৈজ্ঞানিকরা মাস কয়েকের মধ্যে বোমা বানাতে পারবেন।

গান্ধীজীর চিন্তাধারার প্রাসঙ্গিকতা তবে কোনখানে? আছে ক্রমবর্ধমান বেকারসংখ্যার চাপে। আছে শতকরা পঞ্চাশজন নাগরিকের দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থানে। আছে নকশাল আন্দোলনের ভয়াবহতায়। আছে যত্র তত্র বিচ্ছিন্নতার দাবিতে আন্দোলনে। আছে সরকারি কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়নে। বিশেষ করে পুলিশের। একটিমাত্র বিভাগ আছে যার উপর সরকার শেষ অবধি নির্ভর করতে পারেন। সেটি মিলিটারি। সেখানেও যদি ট্রেড ইউনিয়ন হয় তবে ধর্মঘটও একদিন হবে।

গান্ধীবাদ শব্দটি গান্ধীজী পছন্দ করতেন না। আমার মতে গান্ধীপন্থা শব্দটি সুপ্রযোজ্য। যেমন নানকপন্থী বা নানকপন্থ। যেমন কবীরপন্থা বা কবীরপন্থ। গান্ধীপন্থা বা

গান্ধীপন্থ চিরকাল থাকবে। বৌদ্ধধর্মের মতো ভারতের বাইরেও সমাদৃত হবে। তার লক্ষণ এখন থেকেই দেখা যাচ্ছে। গান্ধীজীর উপরে গ্রন্থ আজকাল নানা দেশে লেখা হচ্ছে। গান্ধীজী চেয়েছিলেন নীতিনিষ্ঠ জীবিকা। সেই সঙ্গে প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন। যেটা শহরে নয় গ্রামেই সম্ভব। গ্রাম যদি স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়। 'ক্ষুদ্রই সুন্দর' নামে মিস্টার E.F. Schumacher যে বই লিখেছেন সেটি একই প্রকার চিন্তার ফল। পশ্চিম জার্মানির সবুজ আন্দোলনও সেই চিন্তাধারায় অভিষিক্ত। বর্তমান পুস্তকের প্রণেতা শ্রীমলয় দেওয়ানজী গান্ধীপন্থার অন্যতম প্রবক্তা। গান্ধীজীর চিন্তা ভাবনা তিনি যথাযথভাবে তুলে ধরেছেন। তবে বর্তমান ভারতে তা প্রাসঙ্গিক কিনা পাঠকরাই বিচার করবেন। বর্তমান জগতে যে প্রাসঙ্গিক এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

স্বেচ্ছায় ও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পরমাণু অস্ত্র ত্যাগ বা বর্জনই এর প্রথম ধাপ। দ্বিতীয় ধাপ কেমিকাল, বায়োলজিকাল প্রভৃতি অস্ত্র ত্যাগ বা বর্জন। তারপর তৃতীয় ধাপ কনভেনশনাল বা প্রথাসিদ্ধ অস্ত্র হ্রাস। কিন্তু এর ফলে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিতে পারে। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি যেখানে এসে পৌঁছেছে বোধহয় সেখানে অস্ত্রনির্মাণের একটা অর্থনৈতিক আবশ্যকতা আছে। নইলে বহু লোক বেকার হয়। ধনতন্ত্রী জাপান বোধ হয় মন্দা নিবারণের জন্যে অস্ত্রনির্মাণের মুখাপেক্ষী নয়। সমাজতন্ত্রী সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্বন্ধে আমি অতটা নিশ্চিত নই। যুদ্ধপ্রস্তুতির খাতে যে অপরিমেয় অর্থ ব্যয় হচ্ছে তা যদি খাদ্য উৎপাদনের খাতে বইয়ে দিতে পারা যেত তবে সারা পৃথিবীতে অভুক্ত ও অর্ধভুক্ত কোটি কোটি মানুষকে ও গবাদি প্রাণীকে ক্ষুধামুক্ত করতে পারা যেত। খাল ইত্যাদি খনন করলে জলের অভাবও দূর হত। তৃষ্ণার্তকে তৃষ্ণামুক্ত করতে পারা যেত।

এর জন্যে চাই অহিংসার উপর সুদৃঢ় বিশ্বাস। তার মানে মানুষের উপরে অবিচল বিশ্বাস। এ বিশ্বাস গান্ধীজীর ছিল। কিন্তু আমাদের ক'জনেরই বা আছে? কিছুতেই কি আমরা পাকিস্তানকে বিশ্বাস করতে পারছি? বা গণচীনকে? বা আমাদের ঘরের ছেলে নকশালদের বা খলিস্তানীদের বা গোর্খা ন্যাশনালিস্টদের বা ঝাড়খণ্ড আন্দোলনকারীদের? গান্ধীজী বেঁচে থাকলে ঝুঁকি নিতেন। নাচার হলে প্রাণ দিতেন। গান্ধীপন্থীরা এসব চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে প্রস্তুত নন। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক সমাধান প্রয়োজন। তাঁদের কেউ কি বলতে পারছেন রাজনৈতিক সমাধানটা কী? সরকারের উপরে ছেড়ে দিয়েই তাঁরা ক্ষান্ত। পদযাত্রা যে প্রত্যাশা জাগায় তা পূর্ণ করে না। নোয়াখালিতেও তা পূর্ণ করেনি। করলে কি কেউ বঙ্গ ভঙ্গ চাইত বা মেনে নিত? না, সব প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং গান্ধীজীও দিয়ে যেতে পারেন নি।

যার কাছে যেটুকু অহিংসা পাওয়া যায় সেটুকু নিয়েই গান্ধীজী দেশব্যাপী সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে যদি কেউ তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চান তবে তাঁকেও সেইটুকু নিয়েই পথে চলতে হবে।

গান্ধীপন্থার তাত্ত্বিক দিগ্দর্শনে এই পুস্তক সাহায্য করবে। স্বল্প পরিসরের মধ্যে অনেক কথাই আছে। গান্ধীজীর দিকে একটু একটু করে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মন ফিরছে। তার সেরা নিদর্শন শ্রীপান্নালাল দাশগুপ্তের 'গান্ধী গবেষণা'। শ্রীমলয় দেওয়ানজীর বই আরেক নিদর্শন।

দীনহীনদের পক্ষ নিয়ে লড়তে যাঁরা এগিয়ে আসবেন তাঁরা যদি গান্ধীপন্থী না হয়ে মার্কসপন্থী বা মাওপন্থী হয়ে থাকেন তবে তাঁদেরই পথ নেবে ভারতের দীনহীন জনগণ। গান্ধীপন্থীদের পক্ষ নয়। গঠনকর্ম নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু যথেষ্ট নয়। গান্ধীজীর পরে

ভারতে আর একজন গান্ধীপন্থীও শহীদ হননি। হয়েছেন আমেরিকায় মার্টিন লুথার কিং। কারাবরণ যাঁরা করেছেন তাঁরা ইন্দিরা হাটানোর জন্যে করেছেন। ইন্দিরা আবার অধিকাংশের ভোটে জিতেছেন। শেষ জয়টা জয়প্রকাশের নয়, ইন্দিরারই। জয়প্রকাশ নিয়েছিলেন গান্ধীহত্যার সঙ্গে জড়িত একটি গোষ্ঠীর মদত। এদের নিয়েই জনতা সরকারে ভাঙন ধরে। গান্ধীপন্থীরা যদি কট্টর হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধেন তবে সম্পূর্ণ অহিংস হলেও তাঁদের সংগ্রাম পর্যবসিত হবে নিষ্ফলতায়। কারণ সত্য আর অহিংসার মধ্যে সত্যই প্রথম। সত্য কট্টর হিন্দু জাতীয়তাবাদের মধ্যে নেই। ভারতকে যাঁরা স্বাধীন করেছিলেন তাঁরা সর্ব সম্প্রদায়ের সমান অধিকারে পূর্ণ বিশ্বাসী ভারতীয় জাতীয়তাবাদী। কেউ তাঁদের পর নয়, সবাই আপন।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখি যে টলস্টয়ের 'কিংডম অভ্ গড' গান্ধীজীর অনুবাদে হয়েছিল 'রামরাজ্য'। 'রাম' এক্ষেত্রে 'ভগবানের' প্রতিশব্দ, ভগবানেরই অন্য একটি নাম। রবীন্দ্র শতবার্ষিকীতে আমন্ত্রিত এক সিন্ধী কবি 'গীতাঞ্জলি' অনুবাদ করেছিলেন সিন্ধী ভাষায়। সভায় পড়ে শোনালেন। রবীন্দ্রনাথের 'ভগবান' বা 'ঈশ্বর' হলেন সিন্ধীভাষায় 'রাম'। অবতারবাদবিরোধী ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথের মুখে রাম নাম! গান্ধীজীর মুখে রাম নাম ছিল গুজরাতি ভাষায় ভগবানের বা ঈশ্বরের নাম। তাঁর রাম রাজ্য তুলসীদাসের রাম রাজ্য নয়। বর্ণাশ্রমের কথা তিনি বলতেন বটে, কিন্তু সেটাও পুরাতন অর্থে নয়। পুরাতন বর্ণাশ্রমে উচ্চ-নীচ ভেদ ছিল। গান্ধীজীর বর্ণাশ্রমে কেউ উচ্চ বর্ণ, কেউ নিম্ন বর্ণ নয়। শেষ বয়সে তিনি উপলব্ধি করেন যে বিভিন্ন জাত হচ্ছে অস্পৃশ্যতার বিভিন্ন স্তর। "Caste is a graded form of untouchability"। অস্পৃশ্যতা দূর করতে হলে জাতপাত তুলে দিতে হবে। মার্কসের আদর্শ যেমন শ্রেণীশূন্য সমাজ গান্ধীজীর আদর্শ তেমনি জাতশূন্য সমাজ। কাস্টলেস সোসাইটি। তিনি সেবাগ্রামে ব্রাহ্মণ হরিজনের বিবাহ দেন। বর হরিজন, কনে ব্রাহ্মণ। অন্য একটি বিবাহের পুরোহিত করেন এক হরিজনকে। এসব করতে গিয়ে তিনি কট্টর হিন্দু বর্ণাশ্রমীদের জাতশত্রু হন। তাঁর নিধনের অন্যতম কারণ তাঁর হিন্দু সমাজসংস্কার।

এমন যে গান্ধীজী তিনি ভূমিসংস্কারে মনোযোগ দেবার অবকাশ পাননি। বিনোবাজী সে কাজে কিছুদূর এগিয়েছিলেন। তারপর থেকে গান্ধীপন্থীরা নিষ্ক্রিয়। ভূমিহীনরা যদি ভূমি না পায় শুধুমাত্র পল্লীশিল্প তাদের সকলের জীবিকা জোগাতে পারবে না। হয় তারা লড়বে, নয় তারা পালাবে। গঠনকর্মীরা যেন এটা মনে রাখেন। অতীতে স্বরাজ যেমন ছিল জীবন মরণের প্রশ্ন, বর্তমানে ভূমি-সংস্কারই তেমনি জীবন মরণের প্রশ্ন। এ প্রশ্নের উত্তর যদি মার্কসপন্থীরা দিতে পারেন, গান্ধীপন্থীরা না পারেন, তবে আখেরে কাদের জিত হবে, কাদের হার হবে?

চব্বিশ
গরীবের মা বাপ গান্ধী

ভারতের স্বাধীনতার এগারো বছর আগে আমার ভাই অভয় জাপান থেকে ফিরে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে। সে বলে জাপানের খবরের কাগজে মহাত্মা গান্ধীর অসুখের খবর

বেশ ফলাও করে বেরিয়েছিল। প্রতিদিন জাপানী বন্ধুরা এসে আমার কাছে জানতে চাইতেন, গান্ধী আজ কেমন আছেন। আমি বলতুম, গান্ধী এমন কে যার জন্য আপনাদের এত ভাবনা? ওরা বলত, গান্ধী যে গরীবের মা-বাপ। আমি তাদের কাছে জানতে চাইতুম কে বড়, গান্ধী না মেকাডো? উত্তরে তারা বলত, 'গান্ধীই বড়। মেকাডোকে মান্য করি আমরা জাপানীরাই। কিন্তু গান্ধীকে মান্য করে দুনিয়ার সব লোক।'

আমার ভায়ের মুখে একথা শুনে অবাক হই। আমরা তাকে একজন মহাপুরুষ বলে জানি, একজন রাজনৈতিক নেতা বলে জানি, কিন্তু গরীবের মা-বাপ এটা তো নতুন কথা।

তাঁর এই ভাবমূর্তি জাপানীদের চোখে পড়েছে, অথচ আমাদের চোখে পড়ে নি। আমি নিজে খদ্দর পরতুম, আমার স্ত্রীও খদ্দর পরতেন। এটা সেই ১৯২১ সাল থেকে আরম্ভ। এর মূলে ছিল গান্ধীজীর নির্দেশ ও আমার বাবার দৃষ্টান্ত। গান্ধীজীর নামডাক হবার আগেই একদিন বাবা আমাকে বলেছিলেন, এই লোকটি তাঁত বুনে খায় কিন্তু তাঁতের কাপড় কেউ কিনছে না। আমরা যদি মিলের কাপড় না কিনে তাঁতের কাপড় কিনি, খরচ হবে দু-টাকার জায়গায় ২ টাকা ৫ পয়সা। তাহলে এই লোকটি বেঁচে যাবে। একই যুক্তি বাবা দেখালেন খদ্দরের বেলায়। গ্রামের তাঁতীরা যদি মিলের সুতো না কিনে চরকার সুতো কেনে তবে কাপড়ের দাম কিছু বাড়বে, কিন্তু গ্রামের কাটুনীরা, অর্থাৎ যেসব মেয়ে চরকায় সুতো কাটে তাদের কিছু উপার্জন হয়।

এটাও আমার যুক্তিযুক্ত মনে হলেও আমি একজন ভদ্রলোক হয়ে খদ্দর পরি কী করে? আমার যেখানে জমি সেখানে আমার ছেলেবেলায় রেললাইন ছিল না, মোটর রাস্তাও ছিল না। পাড়া-গাঁয়ে লোকেরা যে ধুতি পরতো তাকে বলা হতো খাদি। সেটা খুবই খাটো, কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঝুল। তাদের গায়ে জামা থাকত না। গান্ধীজীও তাদের মতো খাটো ধুতি পরতে আরম্ভ করেছেন, তাঁর গায়ে জামা নেই। একদিন তাঁকে দর্শন করতে গিয়েছিলুম পাটনা কলেজে পড়াশুনার সময়ে, ১৯২৪ সালে। আমি গিয়ে দেখলুম, অনেক কংগ্রেস নেতা সেই বৈঠকে উপস্থিত, কিন্তু কেউ তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলেন না। এমন কি আমার বাবাও না। তিনি লম্বা খদ্দর ধুতি পরতেন। খদ্দরের জামাও পরতেন।

এখন আমরা কি চাইব জনগণ আবার সেই খাটো ধুতির যুগে ফিরে যাক? জামা পরা ছেড়ে দিক? এই প্রশ্ন তখন আমার মনে আসে, আমি বাবার সাথে তর্ক জুড়ে দিই। তিনি বললেন, তবু তো আমরা কতগুলি লোককে কাজ দিচ্ছি, তোমরা কয়জনকে কাজ দিতে পারছ?

সেইসব পুরানো কথা মনে আসলে প্রশ্ন থেকেই যায়।

পঁচিশ
সাধু সাবধান

আমার জন্মের সময় আমার দাইমা ছিলেন একজন শবর-নারী। আমার জন্মস্থানের নাম ঢেঙ্কানাল। অনেকদিন আগে তার রাজা ছিলেন ঢেঙ্কা নামের এক শবর। ঢেঙ্কা নাম থেকে ঢেঙ্কানাল। ঢেঙ্কা শবরকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে তার রাজ্য দখল করেন এক রাজপুত বীর। এইরকম পালাবদল ঘটে ওড়িশার আরো কয়েকটি দেশীয় রাজ্যে। শবর, কন্ধ প্রভৃতি

উপজাতিরা তাদের রাজ্য হারায়। কন্ধদের রাজ্য ছিল কন্ধমাল। সেটা ইংরেজরা দখল করে। শবর, কন্ধ, সাঁওতাল, মুণ্ডা, কোল প্রভৃতি উপজাতিরা তাদের রাজত্ব হারায়।

কিন্তু তারা হিন্দুসমাজের এক-একটি জাতি বা 'কাস্ট' (Caste) বনে যায় না, তারা হিন্দুসমাজের বাইরে উপজাতি বা 'ট্রাইব' (tribe) থেকে যায়। এদের কতক খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়। খ্রিস্টান হলেও তারা 'ট্রাইব'ই থাকে।

পাটনা কলেজে আমার সহপাঠী ছিল কয়েকজন মুণ্ডা খ্রিস্টান ছাত্র। তারা রাঁচী অঞ্চল থেকে এসেছিল। খ্রিস্টান হলেও তাদের মুণ্ডা বলে চিনতে পারা যাচ্ছিল। তেমনই কটক কলেজে আমার সহপাঠী ছিল খাসি। সে-ও শিলং অঞ্চলের লোক। সে থাকত কটকে তার দিদির বাড়িতে। তার জামাইবাবু ছিলেন একজন ওড়িয়া খ্রিস্টান অধ্যাপক। খাসিরাও উপজাতি বা 'ট্রাইব', হিন্দুসমাজের জাতি বা 'কাস্ট'-নয়।

'কাস্ট' ও 'ট্রাইব' এক জিনিস নয়। খাসিরা কোনও কালেই হিন্দু ছিল না। শবররা না, সাঁওতালরা না, কোলরাও না, মুণ্ডারাও না। সুতরাং খ্রিস্টান হয়ে এরা হিন্দুসমাজের বাইরে চলে যায়নি। এদের হিন্দুসমাজে ফিরিয়ে আনার কথা ওঠে না। এরা যদি হিন্দু হয় তবে কোন 'কাস্ট'-এ যোগ দেবে ব্রাহ্মণ কায়স্থ নবশাখ সুবর্ণবণিক ইত্যাদি কোন 'কাস্ট' এদের স্থান দেবে? এরা নতুন এক 'কাস্ট' হবে সেটা সম্ভব নয়। এরা এক-একটা 'ট্রাইব'ই থেকে যাবে। হিন্দুধর্ম বলতে বোঝায় বৈষ্ণব শাক্ত শৈব সৌর গাণপত্য প্রভৃতি বিভিন্ন হিন্দু সম্প্রদায়। হিন্দু হয়ে এরা কোন সম্প্রদায়ে যোগ দেবে? কোন সম্প্রদায় এদের নিতে রাজি হবে? এরা কি কোনও হিন্দু মন্দিরে ঢুকতে পারবে? পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে ঢুকলে অপবিত্র হবে, অপবিত্র স্থানকে পবিত্র করার জন্য যা খরচ হবে তা মেটাবার জন্য জরিমানা দিতে হবে। এরা যদি কোনও মন্দিরে ঢুকতে না পায় তাহলে গির্জায় ফিরে যাবে।

আমরা একবার কালিম্পঙে গিয়েছিলুম। সেখানে আমাকে বুদ্ধ-জয়ন্তী-সভায় সভাপতি করা হয়। আমার সামনে তর্ক বাধিয়ে দেন এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও এক হিন্দু সন্ন্যাসী। বুদ্ধের জন্মদিনে বুদ্ধের নিন্দা করেন হিন্দু সন্ন্যাসী। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এর প্রতিবাদ করেন। আমি এঁদের থামিয়ে দিই। সভার কাজ শেষ হয়ে এলে হিন্দু সন্ন্যাসী আমার কাছে এসে বলেন, 'ওই বৌদ্ধ সন্ন্যাসী কী করছিলেন জানেন? তিনি লেপচাদেরকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দিচ্ছেন। লেপচারা বৌদ্ধ হয়ে যাচ্ছে সেটা কি আমরা হতে দিতে পারি?'

তাঁর ধারণা লেপচারা হিন্দুজাতি, কিন্তু আসলে তা নয়। তারা একটি উপজাতি বা 'ট্রাইব'। তাদের সমাজ আলাদা, তাদের ধর্ম বিশ্বাস আলাদা। হিন্দু সন্ন্যাসী তাদের হিন্দু করতে পারেন না। খ্রিস্টানরা খ্রিস্টান করতে পারে। কত লেপচা খ্রিস্টান হয়েছে। হিন্দু সন্ন্যাসীরা সেটা ঠেকাতে পারেননি। তাদের হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনতে পারছেন না। আসলে তারা হিন্দুই নয়। হিন্দু মন্দিরে কোথাও তাদের প্রবেশ নেই।

একই কথা খাটে গারো খাসি মিজো নাগা ইত্যাদি উপজাতিদের বেলা। খ্রিস্টানরা তাদের শিক্ষা দিয়ে, চিকিৎসা দিয়ে, কাজকর্ম দিয়ে, সমাদর দিয়ে আপনার করে নিয়েছে। তাই তারা খ্রিস্টান হয়েছে। হিন্দুরা কি কোনখানে কোনও উপজাতির কিছুমাত্র উপকার করেছে? ব্যক্তিগতভাবে করে থাকতে পারে, কিন্তু সমষ্টিগত ভাবে নয়। কেউ কি শবরের হাতে জল খায়? অথচ প্রসবের সময় শবর দাই না হলে চলে না।

দুই হাজার বছর আগে রোমান সাম্রাজ্যে আদি খ্রিস্টানদের উপরে যে অত্যাচার

হয়েছিল তার ফলে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপের লোক খ্রিস্টান হয়ে গেল। কে জানে হয়তো ভারতেও সেইরকম কিছু হতে পারে। আজকে ভারতেও হয়তো সেইরকম কিছু হতে যাচ্ছে। সাধু, সাবধান!

ব্রাহ্মণরা খ্রিস্টান হয়ে গেলেও তাদের জাত বজায় থাকে। তারা প্রায়শ্চিত্ত করে আবার হিন্দু হতে পারে। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় তো রোমান ক্যাথলিক ছিলেন, সেইসঙ্গে ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ বলে তাঁর গর্ব ছিল। প্রায়শ্চিত্ত করে কায়স্থ নবশাখ চামার ডোম ইত্যাদি সকলেই হিন্দুসমাজে নিজের জাতে ফিরে আসতে পারে। আবশ্যক এক গ্রাস গোবর ও এক গ্লাস গঙ্গাজল। এর জন্য আগুন জ্বেলে, ঘি পুড়িয়ে, মন্ত্র পড়ে এত কাণ্ড করার কী দরকার?

মুশকিল হচ্ছে ব্রাহ্মণ কায়স্থরা ফিরে আসতে চাইতে পারে, চণ্ডালরা ফিরে আসতে চাইবে কোন দুঃখে? এটা এমন একটা দেশ যেখানে যিনি অস্পৃশ্য হিন্দু তিনি রাষ্ট্রপতি হতে পারেন, কিন্তু যান দেখি পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে! সেখানে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে অপমান ও বৈষম্য। যে-সমাজে ওপর থেকে তল পর্যন্ত বৈষম্য সে সমাজে প্রায়শ্চিত্ত করে ফিরে আসতে পারলেও সমান অধিকার ও সমান ব্যবহার পাওয়া যাবে না। তখন আবার ধর্মান্তর গ্রহণ করতে হবে। নতুবা ধর্মান্তরের বদলে জন্মান্তর।

জন্ম-জন্মান্তর পরে একজন শূদ্র ব্রাহ্মণ হতে পারে। তার আগে নয়। কিন্তু ধর্মান্তর গ্রহণ করলে আইনের চোখে ব্রাহ্মণে শূদ্রে তফাত নেই। আজকাল তো ব্রাহ্মণের ছেলেরা চাকরির আশায় তফসিলি হিন্দু বা অনগ্রসর হিন্দু বলে পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত নয়। এর পেছনে রয়েছে যুগান্তর, আর হিন্দুধর্মের বদলে যুগধর্ম, হিন্দুত্ববাদের বদলে মানবিকত্ববাদ। মানুষমাত্রেই জন্মসূত্রে সমান। মৃত্যুর সময়ও সমান সাম্যই এযুগের কাম্য। তার জন্য সমাজবিপ্লবও হতে পারে। তখন কে-ই বা চাইবে খ্রিস্টান পাদরিদের পোড়াতে, তাদের গির্জা পোড়াতে, তাদের বাইবেল পোড়াতে।

ছাব্বিশ
স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিনিশ্চয়

সালটা বোধহয় ১৯২৮। স্থানটা ইংলন্ড। একদিন 'টাইমস্' বা 'ম্যানচেস্টার গারডিয়ান' খুলে দেখি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট ছাপা হয়েছে। সেটি ভারতেই প্রদত্ত। যতদূর মনে পড়ে পাঞ্জাবে। এতকাল পরে তাঁর সমস্তটা মনে নেই। যেটুকু মনে দেগে গেছে সেটুকু এই যে, মানুষের প্রতি মানুষের ফিজিক্যাল রিপালসন বা কায়িক ঘৃণা ভারতের লোকদের মজ্জাগত।

অর্থাৎ মানুষ মানুষকে ভিন্ন জাতের বা ছোট জাতের মানুষ বলে ঘেন্না করে। আশ্চর্যের ব্যাপার সে নিজেও তথাকথিত উচ্চতর জাতের দ্বারা ঘৃণিত। এমন কি, একশ্রেণীর ব্রাহ্মণও অপর শ্রেণীর ব্রাহ্মণকে ঘৃণা করে। অন্তত কিছুদিন আগেও করত।

কিন্তু যে কথাটা রবীন্দ্রনাথ বলেননি সে কথাটাও সমান সত্য। ঘৃণা জিনিসটা দিনের বেলা সকলের সামনে। রাতের বেলা নারীর সঙ্গে অন্ধকার কক্ষে নয়। সে নারী দাসীও হতে

পারে, বেশ্যাও হতে পারে, জন্মসূত্রে হাড়িও হতে পারে, ডোমও হতে পারে, চণ্ডালও হতে পারে, ম্লেচ্ছও হতে পারে, যবনও হতে পারে। উচ্চবর্ণীয় পুরুষ তাকে উচ্চবর্ণীয়া নারীর মতই সাদরে গ্রহণ করে। মানুষটা তো ঘৃণ্য নয়ই, কাজটাও ঘৃণ্য নয়। পুরাণে ইতিহাসে এর ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত আছে। দৈনন্দিন জীবনেও এর যথেষ্ট উদাহরণ মেলে।

বিবাহ যেখানে সম্ভব নয় মিলন সেখানে সম্ভব। মিলনের ফলে যেসব সন্তান জন্মায় তারা সাধারণত মায়ের সমাজেই স্থান পায়, নয়তো তাদের নিয়ে আলাদা একটা জাত সৃষ্টি হয়। সেই জাতের জন্যে একটা পেশাও নির্দিষ্ট হয়। এমনি করে চার বর্ণের থেকে চার হাজার জাতের উৎপত্তি হয়েছে। কে কার চেয়ে বড়, কে কার চেয়ে ছোট এ নিয়ে তর্ক বিতর্ক চার হাজার বছর ধরে চলে এসেছে। যে বড় সে ছোটকে ছোঁবে না, তার হাতে খাবে না। তার সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক পাতাবে না। যে বড় সে শুচি, যে ছোট সে অশুচি। এর সঙ্গে আবার খাদ্য-অখাদ্যেরও সম্পর্ক আছে। তবে ডুবে ডুবে জল খেতে অরুচি নেই। উক্ত ক্রিয়া আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। হিন্দু সমাজ এটা স্বীকারও করে নিয়েছে। হিন্দু আইনে অবৈধ সন্তানকেও সম্পত্তি দানের ব্যবস্থা আছে। অবৈধ সন্তানেরও সম্পত্তি থাকলে বৈধ বিবাহ হয়। কাঞ্চন থাকলে কৌলীন্য পেতে সাধারণত দু-পুরুষের বেশি সময় লাগে না। পিতার পদবীর পরিবর্তে আর একটা গালভরা পদবী জুটে যায়। কিছু টাকা খরচ করলে জাল কুলজীও তৈরি হয়।

আমার ছেলেবেলায় আমার বাবা আমাকে বলেছিলেন, 'ভারতে এতগুলো জাত আছে। ইংরেজরা যদি এদেশে থেকে যেত তা হলে আরো একটা জাত বাড়ত। তাতে আমাদের কি ক্ষতি হত?' অর্থাৎ ভারতীয় সমাজে ইংরেজরাও হতো আরো একটা কাস্ট। কেবল হিন্দু মানস নয়, হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রিস্টান নির্বিশেষে ভারতীয় মানস মানুষকে কাস্ট অনুসারে ভাগ করতে অভ্যস্ত। সেদিন উত্তরপ্রদেশে ব্যাকওয়ার্ড কাস্টের একটা তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে দেখা গেল বেশ কয়েকটি কাস্ট ধর্মে মুসলমান। মুসলমানরাও যে কাস্ট মানে এটা আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। চাষী মুসলমান ও তাঁতী মুসলমান ও জেলে মুসলমান এদের কারো সঙ্গে কারো 'জ্ঞাতা' নেই। অর্থাৎ কেউ কারো জাতি নয়। একই গ্রামে পাশাপাশি দুই মসজিদ। একটি গেরস্তিদের, তার মানে চাষীদের। অপরটি 'মোমিনদের', তার মানে জোলাদের। ধীবর বা 'ধাওয়াদের' মর্যাদা আরো নিচে। অবস্থাও আরো খারাপ।

এটা লক্ষণীয় যে ছোট ও বড় বিচার করার সাধারণ মাপকাঠি হচ্ছে সম্পত্তি ও পেশা। কতকগুলো পেশা খুবই নোংরা বা নিন্দনীয়। তেমন অর্থকরীও নয়। যেমন মুচি, মেথর ও মুদ্দফরাসের কাজ। চামার শুনলেই হিন্দুর মনে ঘৃণা জাগে। ওরা মরা গরু তুলে নিয়ে যায়, চামড়া ছাড়ায়, কেউ কেউ সন্দেহ করে যে মাংসটাও কাজে লাগায়। চণ্ডাল বললে শ্মশানের অনুষঙ্গ মনে আসে। সেকালে ওরাই অপরাধীকে শূলে চড়াত বা তার মাথা কাটত। নিন্দনীয় পেশার মধ্যে একটি ছিল অর্থকরী। সেটি শৌণ্ডিকের। সমাজে প্রতিষ্ঠা পেতে হলে তাকে জমিদারি কিনতে হত। প্রাসাদ বানাতে হত, দান খয়রাত করতে হত। কসাই বৃত্তিও তেমনি হীনবৃত্তি। আমার আদালতে শহরের বেশ্যারা সাক্ষী দিতে এলে তাদের পেশার ঘরে লেখা হত 'বেশ্যা' নয়, 'পেশাকার'। লিখতে গিয়ে আমার পেশকারের মুখখানা গম্ভীর হয়ে যেত। জিজ্ঞাসা করতুম, 'তোমার নাম কী?' উত্তর পেতুম, 'পারুলবালা পেশাকার'। ওটিও একটি নিন্দিত পেশা, মর্যাদায় খাটো, কিন্তু কারো কারো জীবনে বেশ

অর্থকরী। প্রাচীন সাহিত্যে গণিকাদের মর্যাদা প্রায় শ্রেষ্ঠীদের অনুরূপ। এটা কেবল প্রাচীন ভারতে নয়, প্রাচীন, গ্রীস, রোমেও। প্রাচীন তথা আধুনিক জাপানেও। কিন্তু গেইশাদের অধিকাংশই গরিব দুঃখী।

মোটের উপর বলা যেতে পারে, যে যত নিচে সে তত শোষিত, যে যত শোষিত সে তত নিচে। কিন্তু এমনও দেখা গেছে যে, পুরোহিত পেশার লোকেরা খেতে পরতে পায় না, কুঁড়ে ঘরে থাকে, অথচ তাদের হাতেই শাস্ত্র, তাদের সঙ্গেই ঠাকুরদেবতাদের নিবিড় সম্পর্ক, অন্নপ্রাশন থেকে অন্ত্যেষ্টি পর্যন্ত দশকর্ম তাদের দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়, তাদের অভিশাপ সর্বনাশা, তাই তাদের ভয় করে রাজা-প্রজা, ধনিক শ্রমিক নির্বিশেষে প্রত্যেকটি হিন্দু। ইউরোপেও ভয় করত রোমান ক্যাথলিক পুরোহিতকুলকে। তাঁরা ছিলেন দারিদ্র্য ও ব্রহ্মচর্যব্রত ধারী। তাঁদের ধর্মগুরু পোপ ইচ্ছা করলে রাজাকে সমাজচ্যুত করতে পারতেন, তখন তাঁর সিংহাসন টলমল করত। তিনি মারা গেলে তাঁর শেষকৃত্য দুষ্কর হত। বিয়ে করতে চাইলে বিয়ের মন্ত্রই বা পড়বে কে? ব্যাপটিজম না হলে কেউ খ্রিস্টান বলেই গণ্য নয়। সুতরাং একঘরে। গত কয়েক শতাব্দীতে বার্থ রেজিসট্রেশন, সিভিল ম্যারেজ, বৈদ্যুতিক চুল্লীতে ক্রিমেশন প্রভৃতি প্রবর্তিত হয়েছে। পুরোহিতকুলের সে একচেটে পশার আর নেই। কিন্তু তাদের প্রভাব, প্রতিপত্তি ও মর্যাদা এখনো প্রভূত। কারণ ক্যাথলিক হয়ে থাকলে তাঁরা কামিনীকাঞ্চনত্যাগী। প্রটেসস্টান্ট হয়ে থাকলে কাঞ্চনত্যাগী। শোষক শ্রেণী বনাম শোষিত শ্রেণীর ছকের মধ্যে তাঁদের ফেলা যায় না।

মানুষের ইতিহাসে বিভিন্ন দেশে লক্ষিত হয় শাস্ত্র, শস্ত্র ও ধনসম্পদ এই তিনটি যাদের অধিকারে তারাই সমাজের তথা রাষ্ট্রের উপরতলার অধিবাসী। আর সকলে নিচের তলার। তারা শ্রমজীবী। তারা কৃষিজীবী। তারা সাধারণ পদাতিক সৈনিক। নিচের তলার নিচেও একটা বেসমেন্ট থাকে। সেখানে বাস করে দিনমজুর, ভিক্ষুক, পতিতা, জাতিচ্যুত, মেথর, মুদ্দফরাস, চামার, হিজড়ে প্রভৃতি মানুষ। অবাক কাণ্ড! জাপানেও অস্পৃশ্য জাত আছে। 'সদগতি' নামক কাহিনীতে প্রেমচন্দ একটি চামারের জীবনের ট্র্যাজেডি এঁকেছেন। তাকে টেলিভিশনে রূপায়িত করেছেন সত্যজিৎ রায়। এই লোকটি চামার না হয়ে কামার হলে ওর তেমন দুর্গতি হত না। চামার বললেই তার সঙ্গে আসে হিন্দুদের উপাস্য দেবতা গোমাতার সঙ্গে তার ম্লেচ্ছসুলভ সম্পর্ক। আর ম্লেচ্ছের প্রতি হিন্দুসমাজ হৃদয়হীন। শুধু ওই ব্রাহ্মণটিকে দোষ দিয়ে কী হবে। যাদের উত্তরপ্রদেশে 'ঠাকুর' বলা হয় সেই রাজপুতরাই-বা কম কী? খুন জখম পুড়িয়ে মারার মামলাগুলোতে ব্রাহ্মণ, রাজপুত, যাদব কেউ কারো কম যায় না। দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণদের চেয়ে অব্রাহ্মণদেরই ক্ষমতা বেড়ে গেছে। তাই অত্যাচারও বেড়ে গেছে। সূর্যের চেয়ে বালির তেজ বেশি। স্বাধীনতার পরে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের প্রতাপ কমে গেছে, বৈশ্য ও সৎশূদ্ররা আজকাল উপবীত নিয়ে ক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দেয়। গোকুলের গোপগোপীরা নাকি যদুবংশের যাদব-যাদবী। জোত যার জোর তার। জমিদার গেছে। জোতদার এখন গ্রামের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। দিনমজুর শ্রেণীর হরিজনদের মাথা তুলতে দেখলে তারা মাথা গুঁড়িয়ে দেবে। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণাম গ্রাম থেকে শহরে পলায়ন। শহরে এসে এরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। ফুটপাতে পড়ে থাকে। সেখানে আহার নিদ্রা মৈথুন। নতুন এক সমস্যা সন্দেহ নেই, কিন্তু আমরা কি তেমনি নেশন যে স্বেচ্ছায় উপবীত ত্যাগ করব, উপনয়ন ত্যাগ করব, দেব আর দাস বলে সমাজকে

দুইভাগে বিভক্ত করব না? এদেশে দেবদেবীদের এত বেশি প্রভাব যে ছোট বড় সবাই চায় দেবদেবী বলে পরিচয় দিতে। মানবমানবী বলে নয়। তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর উপর আরো তিপ্পান্ন কোটি দেবদেবী।

আরো গভীরে যেতে হবে। ভারতে যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোক এসেছে। জাতি অর্থে 'রেস'। 'কাস্ট' নয়। ভারত বরাবরই চেষ্টা করেছে 'রেস'-কে 'কাস্ট'-এ পরিণত করতে। কারণ সেইটেই ভারতের কাঠামো। গ্রীক আর পারসিক, শক আর কুশান, হুন আর আহোম, প্রত্যেকেই এক বা একাধিক 'কাস্টে'র সামিল হয়ে গেছে। হয়নি কেবল তুর্ক, মোগল, পর্তুগীজ আর ইংরেজ। কারণ এরা ধর্মে মুসলমান বা খ্রিস্টান। আমি পার্শী আর ইহুদীদের উল্লেখ করলুম না। তারা মুষ্টিমেয়। তবে হিন্দু সমাজে 'কাস্ট' হিসাবে গণ্য না হলেও তারাও প্রকারান্তরে এক একটি 'কাস্ট'। যদিও তাদের বেলা 'রেস' হিসাবে আইডেনটিটি শেষ কথা। সেই অভিমান ইংরেজদের বেলাও সত্য, তাই ওরা এদেশে বসবাসই করল না। আমার বাবার থিওরি কাজে লাগল না। তুর্ক, মোগল ও পর্তুগীজ বংশীয়রা এদেশে বসবাস করতে করতে ভারতীয় বনে গেছে, কিন্তু হিন্দু বনেনি। ফলে হিন্দুদের কাস্ট সিসটেমের সঙ্গে খাপ খায়নি। এই অসামঞ্জস্যের পরিণাম হয়েছে দেশভাগ। তা সত্ত্বেও অসামঞ্জস্য দূর হয়নি। আমাদের অনেকের মতে এর একমাত্র সমাধান কাস্ট সিসটেম লোপ করা। ডক্টর আম্বেদকার গান্ধীজীকে এই মন্ত্রণা দিয়েছিলেন। তখন অগ্রাহ্য করলেও গান্ধীজীও পরে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন।

তিনিও চেয়েছিলেন 'কাস্টলেস সোসাইটি'। তাঁর শেষ সিদ্ধান্ত ছিল, 'Caste is a form of graded untouchability.'

তার মানে প্রেমচন্দের ওই চামারটিও আরো নিচু জাতের বেলা অস্পৃশ্যতা মানে। বিয়ে সাদীর বেলা সেটা প্রকট হয়। জাতিভোজনের বেলাতেও। চামার যদি শহরে গিয়ে কলমজুর হয় কেউ তাকে চামার বলে চিনতে পারবে না, সে অনায়াসে জলচল হবে, কিন্তু গ্রামের গরু মারা গেলে সৎকার করবে কে? চামড়া ছাড়াবে কে? চামড়ার ব্যবসা মার খাবে না? একই কথা খাটে মেথর মুদ্দফরাস প্রভৃতির বেলা। হিন্দু সমাজের চিরাচরিত শ্রমবিভাগ বিপর্যস্ত হবে। গ্রামীণ অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হরিজন সমস্যার মোক্ষম সমাধান হচ্ছে ভারতের শিল্পায়ন। ভারতকে আর একটা রাশিয়ায় বা আমেরিকায় বা জাপানে পরিণত করা। কিন্তু পরে হয়তো মালুম হবে যে রোগটার চেয়ে দাওয়াইটাই আরো খারাপ। হরিজন হবে প্রোলিটারিয়ান, কিন্তু ক'জন প্রোলিটারিয়ান নিম্নতর স্তর থেকে উচ্চতম স্তরে ওঠবার সুযোগ পাবে? তখন ওরা সবাই মিলে একটা সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটাবে। চীনদেশে তেমন বিপ্লব সফল হয়নি। ভারতে কি হবে?

'সদগতি'র মতো ঘটনা বাংলাদেশে ঘটতে পারত না। বাংলাদেশ বলতে আমি অবিভক্ত বাংলার কথাই বলছি। এখানে প্রত্যেকটি জাতের নিজস্ব 'ব্রাহ্মণ' আছে। নমঃশূদ্রদের 'ব্রাহ্মণ'রাও অন্তত পঞ্চাশ বছর আগে থেকে মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, লাহিড়ী, ভাদুড়ী ইত্যাদি পদবী ধারণ করেছেন। এরাও উপবীতধারী। উপবীত আজকাল কে না নিচ্ছে? বাংলাদেশে কেবল ব্রাহ্মণদেরই উপবীত ছিল, আর কোন জাতের ছিল না। গত শতাব্দীতে বৈদ্যরাও উপবীত ধারণ করেন, এ শতাব্দীতে কায়স্থরাও, এঁদের দেখাদেখি অন্যান্য জাত। একদিন এক স্কুল পরিদর্শন করতে গিয়ে শুনি মাস্টার মশায়ের পদবী নৈ

শর্মা, সেন শর্মা, দাশ বর্মা এঁদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, কিন্তু নৈ শর্মা। আজকাল কাউকে তার জাত নিয়ে প্রশ্ন করা অভদ্রতা। তখনকার দিনে অভদ্রতা ছিল না। মাস্টারমশায়কে জিজ্ঞাসা করিনি। কিন্তু সেক্রেটারি মশায়কে করেছি। উত্তর পেয়েছি, নাপিত। নাপিতরা আর নাপিত নয়, ওরা নৈ। নবশাখ নয়, ব্রাহ্মণ। অতএব শর্মা। ঘটনাটা ১৯৩৫ বা ৩৬ সালের। তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। ওরা এখন নৈ ব্রাহ্মণ নয়, সবিতৃ ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের ছেলে ছুতোরমিস্ত্রির কাজ করছে দেখলে আজকাল কেউ আশ্চর্য হয় না, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার ছুতোরমিস্ত্রিকে তার পদবী জিজ্ঞাসা করলে উত্তর পাওয়া যাবে চক্রবর্তী বা শর্মা। তাঁরও উপবীত আছে। শর্মার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বর্মার সংখ্যাও অগণ্য। সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক উন্নতির নানান দরজা খুলে গেছে। জাতব্যবসা ছাড়াও অন্য ব্যবসা করা চলে। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ সবাই তাই করছেন। অতএব কামার, কুমোর, ছুতোর কেন করবে না। মহাত্মা গান্ধী যাঁদের হরিজন বলে চিহ্নিত করেছিলেন ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তাঁদের তপশীলভুক্ত করে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দিয়ে যান। স্বাধীনতার পরেও তাঁরা তেমনি তপশীলভুক্ত। কিন্তু 'হরিজন' শব্দটা তাঁদের পক্ষে অসম্মানকর, তাঁরা এখন যে যার জাত রক্ষা করে পৈতে নিয়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বর্ণভুক্ত হতে তৎপর। অর্থাৎ তাঁরাও দ্বিজ। পঞ্চাশ বছর বাদে শূদ্র বলে কেউ থাকবে না। চারটি বর্ণের একটি অচলিত হবে।

তার মানে কি কাস্ট অদৃশ্য হবে? কাস্ট অদৃশ্য হওয়া দূরে থাক, কাস্ট ওয়ার নানা স্থানে যাচ্ছে। যে যা কাস্ট রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর। সেটাই তার আইডেনটিটি। হিন্দুর যখন জাত যায় সে বৈষ্ণব হয়। কালক্রমে বোষ্টমও একটা কাস্ট। জৈনদের মধ্যে, বৌদ্ধদের মধ্যে, শিখদের মধ্যেও কাস্ট আছে। খ্রিস্টান মুসলমানদের মধ্যেও আমার এক সহকর্মী বলেন, 'আমরা রাজপুত মুসলমান।' ওঁরা আর কোন মুসলমানের সঙ্গে বিয়ে সাদী করেন না। কিন্তু অবাক কাণ্ড, তাঁদেরই হিন্দু রাজপুত জ্ঞাতিদের সঙ্গে করেন। দ্বিজাতিতত্ত্বের জ্বলন্ত প্রতিবাদ। এক মুসলমান সহযাত্রী আমার জামাতাকে বলেছিলেন, 'আমরাও গোত্র মানি। বাপ যখন মারা যান তখন ছেলেকে বলে যান গোত্রের নাম।' সমাজে ওটা গোপন রাখা হয়।

আমার নিজের ধারণা ট্রাইব ছিল সকলের আগে, তার পরে এল কাস্ট, তারপরে এল বর্ণ। এল শ্বেতকায় আর্যভাষী বিদেশীদের সঙ্গে। সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে জানা গেছে যে 'আর্য' বলে কোন একটা 'রেস' ছিল না। কিন্তু 'আর্য' বলে একটি ভাষাগোষ্ঠী ছিল। আমরা এতদিন একটা ভ্রান্তি পোষণ করে এসেছি। 'আর্য' আর 'অনার্য' বলে দুটো ভাষাগোষ্ঠী ছিল। দুটো 'রেস' ছিল না। সব দেশে যেমন দেখা যায় এদেশেও তেমনি। বিদেশীরা বিজেতা হয়ে শাসনযন্ত্র দখল করে বসে। ওদের সঙ্গে আসে একদল বণিক। তারা ব্যবসা-বাণিজ্য করে। আসে একদল ধর্মপ্রচারক। তারা 'নেটিভদের' ধর্মান্তরিত করে। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও ব্রাহ্মণ এই তিনটি শাখা কেবল ভারতে নয়, ভারতের বাইরেও দেখা গেছে। দেশভেদে নাম ভিন্ন। এই তিনটি শাখাই এদেশে তিনটি বর্ণ বলে অভিহিত হয়। এই তিন বর্ণেরই উপবীত ধারণে অধিকার। এরাই দ্বিজ। আগে থেকে যারা ছিল সেই 'নেটিভরা' হল শূদ্র। অর্থাৎ ক্ষুদ্র। অর্থাৎ ছোটলোক বা ছোট জাত।

কিন্তু 'নেটিভরাও' তো সবাই সমান ছিল না। তাদের মধ্যেও ছিল আরো পুরাতন স্তরভেদ। একেবারে নিচের স্তরে যারা ছিল তারাই আদিম, আদিম বলেই অন্ত্যজ। দক্ষিণ ভারতে এমন কয়েকটি জাত আছে যারা শুধু অস্পৃশ্য নয়, অদৃশ্য। তাদের মুখ দেখতে নেই।

তারা যদি মুখ দেখাতে যায় তবে কঠোর সাজা পায়। ভারতে আর্যভাষীদের আগমনের পরেই এদেশের সমাজব্যবস্থায় ট্রাইব ছিল, কাস্ট ছিল, অস্পৃশ্যতা ছিল, অদৃশ্যতা ছিল। সে সমাজের নাম কী ছিল কেউ জানে না। তাকে হিন্দু সমাজ বলা শুরু হল ইসলামধর্মী আরব ও তুর্কদের সমাজের থেকে পৃথক করতে। এরাও তিন শাখায় বিভক্ত। একদল রাজত্ব করে, একদল বাণিজ্য করে, একদল ধর্মপ্রচার করে। এরাও একপ্রকার দ্বিজ। এদের বলা হয় আশরাফ। ধর্মান্তরিত 'নেটিভ' মুসলমানরা আতরাফ। প্রকারান্তরে শূদ্র বা ছোটলোক। এর পরে আসে ইংরেজ ফরাসী পর্তুগীজরা। এরাও তিন শাখায় বিভক্ত। শাসক, বণিক, ধর্মপ্রচারক। এরাও একপ্রকার দ্বিজ। ধর্মান্তরিত 'নেটিভ' খ্রিস্টানরা প্রকারান্তরে শূদ্র বা ছোট লোক। শ্বেতাঙ্গরা গেছে, আশরাফরা আছে, দ্বিজরা আছে।

আগন্তুকরা সঙ্গে করে যথেষ্ট সংখ্যক নারী নিয়ে আসত না। সেকালে পথঘাট ছিল বিপদসঙ্কুল। নারী হরণের আশঙ্কা ছিল। এদেশে এসে আর্যভাষীরা নারীর অভাব অনুভব করেন। কখনো বৈধভাবে, কখনো অবৈধভাবে দেশীয় নারীর সঙ্গে মিলিত হন। আরব, তুর্ক ও মোগলদের বেলাও তাই। ইংরেজ, ফরাসী, পর্তুগীজদের বেলাও তাই। এটা একটা 'লৌহ নিয়ম' (Iron Law)। এ নিয়ম সর্বত্র সক্রিয়। একে অতিক্রম করার জন্যে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গরা আপার্টহাইড (apartheid) প্রবর্তন করেছে। কিন্তু তার তিন শতাব্দী পূর্বেই রক্তের মিশ্রণ শুরু হয়ে গেছে। আমাদের পূর্বপুরুষরাও রক্তের মিশ্রণ রোধ করার জন্যে একপ্রকার আপার্টহাইড প্রবর্তন করেছিলেন। কারা থাকবে গ্রামের বা শহরের ভিতরে, কারা বাইরে। কারা থাকবে কোন পাড়ায়, কোন মহল্লায়। এসব আমি দেশীয় রাজ্যে ছেলেবেলায় চাক্ষুষ করেছি। ব্রাহ্মণদের বসতির নাম 'ব্রাহ্মণ শাসন'। সেখানে ঢুকতে ভয় করত। আমার এক প্রাইভেট টিউটরের আমন্ত্রণে তাঁর অতিথি হয়েছি। কটকের কাছে একটি 'ব্রাহ্মণ শাসন' আছে, সেখানে এখনো অব্রাহ্মণের প্রবেশ নিষেধ। একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে রজক। সে কাপড় কাচতে নিয়ে যায়, কেচে দিয়ে যায়।

পৃথিবীতে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ভারতের হিন্দুদের আপার্টহাইড। এর জন্যে দায়ী শুধু ব্রাহ্মণরা নয়, দায়ী ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরাও, দায়ী উচ্চশ্রেণীর শূদ্ররাও। উদারতা যেটুকু দেখা যাচ্ছে সেটুকু উনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁস ও রেফরমেশনের কল্যাণে। সেইসঙ্গে শিল্পায়ন তথা নগরায়ণের প্রভাবে। নারীজাগরণ ও শূদ্রজাগরণ যদি অব্যাহত থাকে আমূল পরিবর্তন আশা করতে পারি। স্ত্রীশূদ্রকে অবদমিত রাখাই ছিল শাস্ত্রকার ও শস্ত্রধারীদের চিরাচরিত নীতি ও রীতি। এতে স্ত্রীশূদ্রও সহযোগিতা করেছিল। বিদ্রোহের বা বিপ্লবের কথা পুরাণে ইতিহাসে লেখে না। প্রতিরোধ না করলে সব অন্যায়ই চিরস্থায়ী হয়। তখন তাকে বলা হয় ধর্মের অঙ্গ।

সাতাশ

বাংলাভাষা অবিভক্ত ও অবিভাজ্য

আজ থেকে আটান্ন বছর আগে আন্তর্জাতিক পি.ই.এন সংস্থার ভারতীয় কেন্দ্রের অনুরোধে আমি বাংলা সাহিত্যের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ইংরেজি ভাষায় লিখেছিলুম। দাঁড়ি

টেনেছিলুম উনিশশো বিয়াল্লিশ সালে। সম্প্রতি আমাদের বাংলা আকাদেমি থেকে সেটির একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। চেষ্টা করলে ইতিহাসটিকে আরো পাঁচ বছর বাড়াতে পারতুম। কিন্তু সেইখানেই আমাকে থামতে হত। কারণ, বাংলা দুই ভাগ হয়ে যাওয়ার পর বাংলা সাহিত্যও দুই ভাগ হয়ে গেল। যেমন গঙ্গোত্রী থেকে হাজার মাইল বয়ে এসে নুরপুর নামক গ্রামে গঙ্গা নদী দুই ভাগ হয়ে যায়। নুরপুরে গিয়ে সে-দৃশ্য আমি দেখেছি। এক ভাগের নাম পদ্মা, আর এক ভাগের নাম ভাগীরথী। এখন হাজার চেষ্টা করলেও এই দুই নদীকে সংযুক্ত করতে পারা যাবে না। তেমনই পূর্ববাংলার সাহিত্য ও পশ্চিমবাংলার সাহিত্যকে বন্ধনীভুক্ত করতে পারা যাবে না। সেরকম একটা চেষ্টা আমি করেছিলুম দেশভাগের পাঁচ বছর বাদে শান্তিনিকেতনের সাহিত্যমেলায়। আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন দুই পারের কবি, ঔপন্যাসিক, লোকসাহিত্যিক ইত্যাদি কয়েকজন। তাঁদের মুখে শুনতে পারা যেত তাঁদের অংশের সাহিত্য বিকাশের বিবরণ। সব মিলিয়ে পাঁচ বছরের বাংলা সাহিত্যের একটা পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লাভ করা যেত। আমাদের উদ্দেশ্য কতকটা সফল হয়েছিল। তাই আমাদের অভিপ্রায় ছিল যে ওই রকম সমাবেশ প্রতি পাঁচ বছর বাদে অনুষ্ঠিত হবে। দুঃখের বিষয়, সেটা সম্ভব হয়নি। আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরে। ওপার থেকে বাংলা বই আসা বন্ধ হয়ে যায়। পাকিস্তানি কর্তারা সেটা পছন্দ করতেন না।

মুক্তিযুদ্ধের পরে ওপার থেকে বই আসা শুরু হয়ে যায়। কিন্তু কী জানি কেন ওপারের বই এখানে সহজলভ্য নয়। কিছু কিছু বই আমি পাই উপহার হিসেবে। তার থেকে বুঝতে পারি যে ওপারের বাংলা সাহিত্য অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। তার পেছনে রয়েছে ঢাকার বাংলা একাডেমি, তার পেছনে রয়েছে বাংলাদেশ সরকার। শুনতে পাই বাংলা একাডেমির প্রেসিডেন্ট-এর সম্মান সরকারের একজন মন্ত্রীর সমান। আমাদের এই বাংলা আকাদেমি স্থাপিত হয় ঢাকার বাংলা একাডেমিকে মনে রেখে। আমরাও যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছি। আরো অগ্রসর হব বলে আশা রাখি। কিন্তু আমরা কেউ এককভাবে দুই পারের বাংলা সাহিত্যের একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করতে পারব না। আমরা যা লিখব তা হবে পশ্চিমবাংলার সাহিত্যের ইতিহাস আর ওপারে যাঁরা লিখবেন তা হবে পূর্ববাংলার সাহিত্যের ইতিহাস। কোনওটাই পূর্ণ বাংলার ইতিহাস নয়।

এই সমস্যার সমাধান হতে পারে আমাদের কোনও প্রতিষ্ঠান যদি নিয়মিতভাবে ওপারে প্রকাশিত নাম-করা বই সংগ্রহ করে আমাদের পড়তে দেন। আর একই কাজ করেন ওপারের কোনও প্রতিষ্ঠান। উদ্দেশ্য হল, সাহিত্যক্ষেত্রে একপেশে ভাব কাটিয়ে ওঠা। অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ কী? তাঁরা ধরে নেন বাংলা সাহিত্য মানে পশ্চিমবাংলার সাহিত্য। যেমন আগেকার কালে অনেকে মনে করত, বাঙালি মানেই বাঙালি হিন্দু। কেউ কেউ এখনো তা মনে করেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে যা হবার তা হয়েছে। কিন্তু বাংলাভাষা এখনো অবিভক্ত ও অবিভাজ্য। বেগম সুফিয়া কামাল কেবল ওপারের নন, এপারেরও কবি। আখতারুজ্জমান ইলিয়াস কেবল ওপারের নন এপারেরও ঔপন্যাসিক। তেমনই জীবনানন্দ দাশ দুই পারেরই কবি। তেমনই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দুই পারেরই ঔপন্যাসিক। বাংলা সাহিত্যের একটি সামগ্রিক ইতিহাস একদিন কেউ-না-কেউ এককভাবে অথবা দ্বৈতভাবে লিখবেন এটাই আমার বিশ্বাস, এটাই আমার আশা।

মে ২০০০

আঠাশ
বাংলার রূপকথা

আমার যখন বছর সাতেক বয়স তখন আমার হাতে আসে 'ঠাকুরমার ঝুলি'। তার গোড়াতেই ছিল কলাবতী রাজকন্যার রূপকথা। আমি সেটি তন্ময়ভাবে পড়ি। তাতে দুটি চরিত্র ছিল—বুদ্ধু আর ভুতুম, বানর আর প্যাঁচা। শেষে জানতে পেলুম তারা দুই ছদ্মবেশী রাজকুমার। তাদের নাম বুধকুমার ও রূপকুমার। আর একটি রূপকথা ছিল ঘুমন্তপরীর। সেখানে সবাই যে যার জায়গায় ঘুমিয়ে। হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া। রাজপুত্র সেখানে গিয়ে আবিষ্কার করেন কে এক রাজকন্যা ঘুমিয়ে আছেন সোনার পালঙ্কে। তাঁর পাশে দুটি কাঠি ছিল—সোনার কাঠি আর রূপোর কাঠি। রাজপুত্র সোনার কাঠি ছোঁয়াতেই রাজকন্যা জেগে ওঠেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমন্তপুরীর সকলে জেগে ওঠেন। আর ওই যে রূপোর কাঠি সেটি ছোঁয়ালেই আবার সবাই ঘুমিয়ে পড়ে। আর একটি রূপকথা ছিল সাত ভাই চম্পা ও তাদের পারুল বোনের। আসলে ওরা ছিল রাজপুত্র ও রাজকন্যা। রাজা তাদের উপর অবিচার করেছিলেন তাদের জন্মবৃত্তান্ত না জেনে রাজবাড়ির চক্রান্তে। দু-একটি কথা মনে আছে—'সাত ভাই চম্পা জাগোরে। কেন বোন পারুল ডাকো রে!' এসেছে রাজার মালী, ফুল দেব কি দেব না। 'দেব না দেব না ফুল উঠিব অনেক দূর।' আগে আসুন রাজা। অবশেষে রাজা এলেন। সাত ভাই চম্পা হল সাত রাজপুত্র আর বোন পারুল হল রাজকন্যা।

এমনই অনেক রূপকথা ছিল। নাম মনে আছে, কিন্তু বিষয় মনে নেই। যেমন ডালিমকুমার, শীতবসন্ত, লালকমল-নীলকমল। আমার সবচেয়ে ভালো লাগত অরুণ-বরুণ-কিরণমালার মায়াপাহাড় থেকে সঞ্জীবনী ঝরণার জল আনার গল্প। এমন এক রূপকথার থেকে প্রেরণা পেয়ে আমি 'হাসনসখী' বলে একটি গল্প লিখেছিলুম।

'ঠাকুরমার ঝুলি' পড়েছিলাম প্রায় নব্বই বছর আগে এইটুকুই যে মনে আছে সেটাই আশ্চর্য।

'ঠাকুরমার ঝুলি'র দ্বিতীয় অংশে ছিল রাক্ষস-রাক্ষসীর কাহিনী। সেগুলি অত্যন্ত ভয়ানক। এক পরমাসুন্দরী নারীর সঙ্গে পাশা খেলতে যেতেন যেসব রাজপুত্র তাঁদের হারিয়ে দেওয়া হত কৌশলে। তার পর সেই নারী রাক্ষস মূর্তি ধারণ করে রাজপুত্রদের একে একে গ্রাস করত। তার নাম বোধ হয় ছিল পাশাবতী। তার পরিণাম কী হল ঠিক মনে পড়ছে না। বোধ হয় কৌশলটা ধরা পড়ায় তার শাস্তি হয় মৃত্যু। এরকম আর একটি কাহিনীতে জানতে পারা যায় যে রাক্ষসদের প্রাণ লুকানো থাকত একটি ভোমরার মধ্যে, ভোমরাটি থাকত একটি কৌটোর মধ্যে আর কৌটোটি থাকত জলের নীচে। যতক্ষণ না সেই ভোমরা মারা যাচ্ছে ততক্ষণ সেই রাক্ষসরাও মারা যেত না। শেষে একদিন এক বৃদ্ধা রাক্ষসী তার পাতানো নাতনি এক মানবীকে বিশ্বাস করে এই তথ্যটি ফাঁস করে দেয়। পরিণামে ভোমরার মৃত্যু ও সেই সঙ্গে রাক্ষসদের মৃত্যু।

'ঠাকুরমার ঝুলি'র তৃতীয় একটি বিভাগ ছিল। তাতে ছিল কয়েকটি মজার গল্প। আমার ঠিক মনে পড়ছে না তাদের একটিও।

এসব গল্পের সংকলন করেছিলেন দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। তার বলার ভঙ্গিটি তাঁর নিজের। সেটি ছিল কবিত্বপূর্ণ। পরবর্তী বয়সে আমার হাতে আসে লালবিহারী দে'র

'Folktales of Bengal' নামক বিখ্যাত গ্রন্থ। এটি 'ঠাকুরমার ঝুলি'র অনেক আগে লেখা। পড়ে দেখলুম তাতেও ছিল 'ঠাকুরমার ঝুলি'র কয়েকটি গল্প। যেমন ডালিমকুমার। দক্ষিণারঞ্জন তাঁর বিষয়বস্তু প্রচলিত রূপকথা থেকেই নিয়েছিলেন।

ঠাকুরমারা নাতিনাতনিদের ঘুম পাড়াবার সময় এমনই সব রূপকথা শোনাতেন। তাঁরাও শুনে থাকবেন তাঁদের ঠাকুরমাদের মুখে। ওঁদের ঠাকুরমারা শুনেছিলেন ওঁদের ঠাকুরমাদের কাছে। এইসব রূপকথা অতি পুরাতন। কালক্রমে বদলেও গেছে। এগুলিকে পুস্তকাকারে সংগ্রহ করার কথা লালবিহারী দে-র আগে বোধহয় কেউ ভাবেননি। আমার আবছা আবছা মনে পড়ছে 'ঠাকুরমার ঝুলি' পড়ার আগে আমি আমার ঠাকুমার মুখে সাতভাই চম্পা ও পারুল বোনের কথা শুনেছিলুম। তিনি নিশ্চয়ই সেটি কোনও বই থেকে পাননি।

'ঠাকুরমার ঝুলি' বইখানি অনেকগুলি রূপকথার সংকলন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এর ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। যতদূর মনে পড়ছে তিনি বলেছিলেন যে ঠাকুরমার ঝুলির মতো এমন স্বদেশী বস্তু আর কি আছে! যুগটা ছিল স্বদেশীর যুগ। তার মানে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের যুগ। 'ঠাকুরমার ঝুলি' তখনকার দিনে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়। আজকের দিনের ছেলেমেয়েরা রাক্ষস খোক্কসের গল্প বিশ্বাস করে না। তবু এমন অনেকগুলি রূপকথা আছে যা কালজয়ী। যেমন সাত ভাই চম্পা বা অরুণ-বরুণ-কিরণ মালা।

উনত্রিশ
কৈশোর স্বপ্ন

কৈশোরে আমার ধারণা ছিল, বাঙালিরা ভারতবর্ষের ফরাসি আর ওড়িয়ারা ভারতবর্ষের ইটালিয়ান। আমি স্বপ্ন দেখতুম যে একদিন বাংলাদেশ একটা স্বাধীন রাষ্ট্র হবে। তার নিজের জাহাজ থাকবে, তাই দিয়ে সে সমুদ্রযাত্রা করবে, যেমন একদা করত তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে। একালের বন্দর কলকাতা তো হবেই, চট্টগ্রামও তো হবেই, সুন্দরবনে নতুন নতুন বন্দর হবে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতরা পৃথিবীর নানান দেশে যাবে। বাংলাদেশের পতাকা নানান দেশে উড়বে। বিমানযাত্রার কথা তখন চিন্তা করতে পারিনি।

ভারতবর্ষও থাকবে। ভারতবর্ষের লোক এক মহাজাতি। দেশটাও মহাদেশ সদৃশ। অনেকগুলি স্বাধীন রাষ্ট্র নিয়ে ভারতবর্ষ হবে এক প্রকার কমনওয়েলথ।

আমার সেই স্বপন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল বাস্তবের আঘাতে সাতচল্লিশ সালে। হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু একাত্তর সালে সেই ভাঙা স্বপ্ন খানিকটা উদ্ধার হল। জন্ম নিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। তার নিজস্ব পতাকা, নিজস্ব সুপ্রিম কোর্ট, নিজস্ব নৌবহর, নিজস্ব বিমান সার্ভিস—এমনই নিজস্ব কত কী যা পশ্চিমবঙ্গের নেই।

বাংলাদেশের জন্য আমি উল্লসিত, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের জন্য দুঃখ করার কারণ নেই। সে এক বিশাল স্বাধীন রাষ্ট্রের অঙ্গ। আমি তার জন্য গর্বিত। তার 'জনগণমন অধিনায়ক' এখন সারা ভারতের জাতীয় সঙ্গীত। তার 'বন্দেমাতরম' এখন সর্বভারতের জাতীয় বন্দনা। এখানকার বাঙালিরা এখনো বিশ্ববিখ্যাত। যেমন সত্যজিৎ রায়, রবিশঙ্কর, আলী আকবর খান, অমর্ত্যকুমার সেন।

এখন প্রশ্ন হল ফরাসিজাতির সঙ্গে তুলনীয় কারা? এপারের বাঙালিরা, না ওপারের বাঙালিরা, না দুই পারেরই বাঙালি। ফরাসি বিপ্লবের বামপন্থীদের মতো পশ্চিমবঙ্গে একদল বামপন্থী ক্ষমতা অধিকার করেছে গণতান্ত্রিক উপায়ে। ফরাসি বিপ্লবের জ্যাকোবিনদের মতো একদল বাঙালি ক্ষমতা দখল করতে চায় সহিংস উপায়ে। তাদের নাম নকশাল। ইতিমধ্যে এক দফা সংঘর্ষ ঘটে গেছে। নকশালরা পরাস্ত হয়েছে বটে, কিন্তু নিরস্ত হয়নি।

সংস্কৃতির দিক থেকেও পশ্চিমবঙ্গে বাঙালিরা সাহিত্যে সঙ্গীতে নাটকে চিত্রকলায় ভাস্কর্যে নৃত্যকলায় যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিচ্ছে। কাজেই এপারের বাঙালিরা এই উপমহাদেশের ফরাসি বলে পরিচিত হতে পারে।

ওপারেও সাংস্কৃতিক ব্যাপারে একটা পট পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। ওরা এখন আর এই উপমহাদেশের তুর্কি নয়, যদিও কিছুকাল সে রকম লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। তবে ওপারের রাজনীতি ক্ষেত্রে বামপন্থী প্রভাব অতি সামান্য। তেমনি ওদেশে একদল জ্যাকোবিনও নেই। ফরাসি বিপ্লবের সঙ্গে একমাত্র সাদৃশ্য—জমিদারি বিলুপ্ত হয়েছে। জমিদারকুল বিতাড়িত অথবা জোতদারকুলে রূপান্তরিত। ফরাসিদের সঙ্গে এ বিষয়ে কতকটা মিল আছে।

আমার কৈশোর স্বপ্নের খানিকটা অবশিষ্ট আছে, সম্পূর্ণ চূর্ণ হয়নি। বলা বাহুল্য ফরাসির সঙ্গে বাঙালির তুলনা তর্কসাপেক্ষ। কেউ কেউ হয়তো বলবেন, ইংরেজের সঙ্গেই বাঙালির বেশি মিল। তা না হলে ওরা ইংরেজিকে এতকাল আঁকড়ে রয়েছে কেন। এখন আড়াই বছরে শিশুকেও বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পাঠানো হয়। বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলও প্রচুর। দাবি উঠেছে সরকারি স্কুলেও প্রথম শ্রেণী থেকে ইংরেজি শেখাতে হবে। স্থির হয়ে গেছে, অল্পস্বল্প শেখানো হবে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ অন্যপথ নিয়েছে। সেখানে ওরা কট্টর বাঙালি। তবে ওরাও ছেলেমেয়েদের ইংল্যান্ডে আমেরিকায় পাঠাতে চায় ও তার জন্যে তাদের প্রস্তুত করে। ওরা মানে উচ্চতর শ্রেণী। এ নিয়ে ওদের মধ্যে গুরুতর মত-পার্থক্য রয়েছে। আমরা আর কারো মতো হতে যাব কেন? আমরা আমাদের মতো হব। সুতরাং কারা ফরাসি কারা ইটালিয়ান কারা ইংরেজ এই ধরনের স্বপ্ন নেহাত কিশোরসুলভ। এর অন্তরালে ছিল প্রমথ চৌধুরী ও 'সবুজপত্রে'র প্রভাব।

ত্রিশ
বঙ্গদর্শন-এর রূপান্তর

আবার বঙ্গদর্শন?

এবার কোন্ বঙ্গের দর্শন?

বঙ্কিমের সময় বঙ্গ বলতে বোঝাত বেঙ্গল যার সামিল ছিল বিহার ওড়িশা ঝাড়খণ্ড। সুবা বাঙ্গালা সুবা বিহার ও সুবা ওড়িশা ইংরেজরা মুর্শিদাবাদের নবাবদের কাছ থেকে পেয়েছিল। এই তিনটি সুবা নিয়ে ইংরেজরা গড়েছিল বেঙ্গল বা বঙ্গপ্রদেশ। তার সঙ্গে জুড়ে ছিল ঝাড়খণ্ড। সেটাও ইংরেজরা জয় করেছিল। এই যে বেঙ্গল বা বঙ্গপ্রদেশ তার লোক সংখ্যা বঙ্কিমের আমলে ছিল সাত কোটি। সেই সুবাদে এল 'সপ্তকোটীকণ্ঠ-কলকল-নিনাদকরালে, দ্বিসপ্তকোটী ভুজৈর্ধৃতখরকরবালে'। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে এরা সকলেই দুর্গা লক্ষ্মী

সরস্বতীর ভক্ত। কিন্তু আসলে ওই সাতকোটির মধ্যে অন্তত অর্ধেক ছিল মুসলমান। তার পরে একটা বৃহৎ অংশ বিহারী ও ওড়িয়া, আর ছোটো নাগপুরী। বাকি রইল আন্দাজ দু কোটি বাঙালি হিন্দু। এই হিন্দুরা মনে করত একমাত্র হিন্দুরাই বাঙালি। তারা বলত, আমরা বাঙালি ওরা মুসলমান। অপর পক্ষে মুসলমানরাও বলত, ওরা বাঙালি আমরা মুসলমান। তার মানে যে বাঙালি সে মুসলমান নয়, যে মুসলমান সে বাঙালি নয়। বাঙালির সংজ্ঞা বঙ্গের সংজ্ঞার সঙ্গে মেলে না। বঙ্গদর্শন ছিল একাধারে বাঙালি জাতীয়তাবাদের তথা হিন্দু জাতীয়তাবাদের মুখপত্র। বন্দেমাতরম ছিল তার মূলমন্ত্র।

এর পরিণাম হল লর্ড কার্জনের দ্বারা পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে একটি মুসলিম প্রধান প্রদেশ গঠন। এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন হয়। সে সময় বঙ্গদর্শন পত্রিকাটি পুনঃপ্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায়। রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলমানের রাখীবন্ধন ঘটিয়েছিলেন। তাঁর মতবাদ বঙ্কিমের মতবাদ থেকে ভিন্ন। তাঁর মতে বাঙালি হিন্দু-মুসলমান এক জাতি। তাঁর সোনার বাংলা উভয় সম্প্রদায়ের মাতৃভূমি। কাজেই তাঁর সম্পাদনায় বঙ্গদর্শন হয় বাঙালি জাতীয়তাবাদের মুখপত্র। বাঙালি জাতীয়বাদ এক্ষেত্রে ধর্মনির্বিশেষে বাংলাভাষীদের সকলের একতাসূচক।

বঙ্গভঙ্গ রদ হবার পরে পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ আবার সংযুক্ত হয়। তার থেকে বিযুক্ত হয় বিহার, ওড়িশা ও আসাম তথা ঝাড়খণ্ড। এই যে যুক্তবঙ্গ তার ভিত্তি সম্পূর্ণ রূপে বাংলা নামক ভাষা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই মতবাদ প্রকাশ করেন সবুজপত্র-র মাধ্যমে। সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী ছিলেন গোঁড়া বাঙালি জাতীয়তাবাদী। সবুজপত্র-য় প্রথম বর্ষে প্রথম সংখ্যায় তাঁর সেই ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ হয় দেশভিত্তিক জাতীয়তাবাদের সঙ্গে একাকার। সবুজপত্র যতদিন ছিল ততদিন তার চরিত্র ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদী চরিত্র। সেখানে হিন্দু জাতীয়তাবাদের কোনো নিদর্শন আমি দেখিনি। তাঁর একটি প্রবন্ধে তিনি স্বীকার করতে চাননি যে হিন্দুসংগীত বলে কিছু আছে।

যুদ্ধের পরে কাজী নজরুল ইসলাম দেশে ফিরে আসেন। তিনি যোগ দেন স্বনামধন্য মুজাফ্‌ফর আহ্‌মদের সঙ্গে। বাঙালি মুসলমান সাহিত্য সমিতি বলে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। একই কালে মোসলেম ভারত নামে একটি মাসিকপত্র আফজল উল হক পিতা মোজাম্মেল হককে সম্পাদক করে প্রকাশ করতে থাকেন। তাতে প্রকাশিত হয় কাজী নজরুল ইসলামের সুবিখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতা। প্রবাসী-তে সেটি উদ্ধৃত হয়। ধীরে ধীরে স্বীকৃত হয় যে মুসলমানরাও বাঙালি। আর বাঙালি বলতে মুসলমানদেরও বোঝায়।

এরপরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্ররা মিলে একটি বাঙালি মুসলমান সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। সেটিকে বলা হয় শিখা গোষ্ঠী। তাঁদের মুখপত্রের নাম শিখা। সেই গোষ্ঠীতে যাঁরা ছিলেন তাঁদের একজন কাজী আবদুল ওদুদ, আর একজন কাজী মোতাহের হোসেন। এঁদের দুজনের সঙ্গে আমার ঢাকায় আলাপ হয়। এঁদের সেই শিখা পত্রিকাও বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা। হিন্দুদেরও তাঁরা তাঁদের পত্রিকায় লিখতে বলতেন। এর পরে কলকাতা থেকে বুলবুল বলে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সম্পাদকদ্বয় ছিলেন বেগম শামসুল নাহার ও হবীবুল্লাহ বাহার। তাঁদের অনুরোধে আমিও বুলবুল পত্রিকায় লিখি। জেমস্ র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোন্যাল্ড-এর কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড-এর পরে হিন্দুরা মনে করে যে মুসলমানরাই আবার রাজত্ব করতে যাচ্ছে।

প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্তনের সময় প্রধানমন্ত্রী হন ফজলুল হক সাহেব। তারপর দশ বছর ধরে বাংলার প্রধানমন্ত্রীর পদটি হয় মুসলমানের একচেটে। শুধু প্রধানমন্ত্রীর পদটি নয়, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদটিও তাঁদের একচেটে। তাতেও তাঁরা সন্তুষ্ট হয় না। লিগপন্থী মুসলমানরা দাবি করেন পাকিস্তান। কাজী আবদুল ওদুদ এর সম্পূর্ণ বিরোধী। আবুল মনসুর আহ্‌মদ বলেন, পাকিস্তান না গোরস্থান। অবশেষে মহাসভাপন্থী হিন্দুরাও দাবি তুললেন, বাংলাকে দুভাগ করে হিন্দুদের আলাদা একটি প্রদেশ দাও। নীট ফল হল পশ্চিমবঙ্গ নামে আলাদা একটি প্রদেশ যা স্বাধীন ভারতের একটি অঙ্গ রাজ্য। আর পূর্ববঙ্গ হল পাকিস্তান নামে স্বাধীন একটি দেশের অঙ্গ রাজ্য। কিছুদিন পরে পূর্ববঙ্গ হল পূর্ব পাকিস্তান। ঢাকার এক মুসলিম বন্ধু লিখলেন, পূর্ব পাকিস্তানের নাম হওয়া উচিত মাসরেকি পাকিস্তান।

এইভাবে বাংলা-ভাষাকে বর্জন করা হয়। এর প্রতিফল একুশে ফেব্রুয়ারিতে বাংলা ভাষার জন্য প্রাণদান। ক্রমে ক্রমে জনমত বদলে যায়। মুসলমানরাই চায় ভাষাভিত্তিক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। লক্ষ লক্ষ মানুষ অকাতরে প্রাণ দেন। নীট ফল পূর্ববঙ্গ হয়ে যায় বাংলাদেশ। ইতিহাসে ফিরে আসে সুলতানী আমলের পূর্বে যে অঞ্চলের নাম ছিল বঙ্গ যা পার্শ্ববর্তী গৌড়ের থেকে স্বতন্ত্র, সেই রূপ এক স্বকীয় রাষ্ট্র। ইতিহাসের পরিহাসে গৌড়ের নতুন নাম হয় পশ্চিমবঙ্গ যা কোনো কালেই বঙ্গ ছিল না। গৌড় কথাটিও এখন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে নিবদ্ধ।

এবার তাহলে বঙ্গদর্শন হবে কোন বঙ্গের দর্শন? পশ্চিমবঙ্গের? ক-জন পাঠক এতে সন্তুষ্ট হবেন? ক-জন লেখকই বা এতে সায় দেবেন? আমার মনে হয় বঙ্গ কথাটির মর্ম হবে বঙ্গ-ভাষা। বঙ্গ-সাহিত্য। বঙ্গ-সংস্কৃতি,—যার পরিধি অনেক বিস্তৃত। এবারকার বঙ্গদর্শন-এ থাকবে বাংলাদেশের লেখকদের রচনা, তাঁদের রচিত পুস্তকের পরিচিতি ও সমালোচনা, তাঁদের ধ্যান-ধারণা ও প্রগতির বিবরণ। এক কথায় এটি হবে ভাষাভিত্তিক বঙ্গের দর্শন।

আমার মতে বাংলাভাষীরা সকলে মিলে বাঙালি জাতি। সুতরাং এবারকার বঙ্গদর্শন হবে ধর্ম-নিরপেক্ষ বাঙালি জাতির দর্শন। এই জাতির জনসংখ্যা, কারো কারো মতে, বাইশ কোটির কাছাকাছি। এই বাইশ কোটি মানুষ এক মত হয়ে গাইতে পারে এমন সংগীত কোথায়? বন্দেমাতরম? সেই সংগীত এখন সীমান্তের ওপারে কেউ গায় না। মুসলমানরা তো নয়ই, হিন্দুরাও নয়। নতুন বঙ্গদর্শন বন্দেমাতরম-এর মতো আর একটি সংগীত প্রকাশ করতে পারে কি? এমন কী দিতে পারে যার জন্য এর প্রকাশ সার্থক? শুধুমাত্র পুরাতন বঙ্গদর্শন-এর রোমন্থন করে কী হবে? বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার জন্য অন্য কিছু করা কি সম্ভব নয়? এর জন্য পাঠকদের মত সংগ্রহ করা উচিত।

একত্রিশ
শুভ সূচনা

এবছরের ১৯ জুন ছিল আমাদের ইতিহাসে একটি 'রেড লেটার ডে' লাল অক্ষরের দিন। সেদিন কলকাতা ঢাকা বাস চলাচল শুরু হয়। বাস চলাচল মানে লোক চলাচল। লোক চলাচল মানে মেলামেশা ও ভাব বিনিময়। সেই সূত্রে পরস্পরকে চেনা ও ঠিক বোঝা।

আমরা আশা করতে পারি যে অর্ধশতাব্দীর ভুল বোঝাবুঝি একটু একটু করে দূর হবে ও তার ফলে পারস্পরিক সম্পর্কের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে। আমরা কেউ কারো পর নই, পরস্পরের নিকট আত্মীয়। এই সরল সত্যটা দ্বন্দ্ববিরোধে ঢাকা পড়ে গেছে। সেইজন্যে ১৯ জুনের বাস চলাচল তো ছিল! তার ফলে স্বাভাবিক সম্পর্ক আসেনি কেন? এর উত্তর কলকাতা-ঢাকা বিমান চলাচল আধ ঘন্টায়ই সমাপ্ত হয়ে যায়। কথাবার্তা যেটুকু হয় সেটুকু পাশের আসনে যিনি বসেন শুধু তাঁর সঙ্গে। কথাবার্তা যা হয় তা নেহাত মামুলি। মনে দাগ রেখে যায় না। বাস মাঝে মাঝে থামে, যেখানে যেখানে থামে সেখানে সেখানে লোকজনের সঙ্গে আলাপের সুযোগ পাওয়া যায়। স্থানীয় অবস্থাও দুচোখে দেখা যায়। বলাবাহুল্য খরচ বাঁচে। যারা বড়লোক নয় তাদের পক্ষে এটা একটা আশীর্বাদ।

আমি আশা করি কলকাতা থেকে যে-বাস ঢাকা যাবে সে-বাস কুমিল্লা হয়ে চট্টগ্রাম যেতে পারবে। আজকাল চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত যাবার স্থলপথ হয়েছে। আগে কেবল জলপথ ছিল। স্টিমারে চড়ে আমি সেখানে গিয়েছি। অমন সুন্দর সমুদ্রতীর পশ্চিমবঙ্গে নেই। যাদের হাতে সময় আছে ও পকেটে টাকা, তাদের একবার কক্সবাজার ঘুরে আসা উচিত। আজকাল ইউরোপ লন্ডনের বাসে উঠে ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে প্যারিসে যাওয়া যায় ও সেই বাসেই রোম। চট্টগ্রামের মুস্তারি বেগম তাঁর লন্ডন থেকে রোম যাত্রার বর্ণনা লিখেছেন। তাই যদি হল তবে আমরা কেন কলকাতা থেকে কক্সবাজার যেতে পারব না। আর ওরাই বা কেন একই বাসে ঢাকা থেকে পুরী আসতে পারবে না?

পর্যটনের উপরে সব দেশেই আজকাল জোর দেওয়া হচ্ছে। সব দেশই আজকাল পর্যটক চায়। বাংলাদেশে পুরাকীর্তি ছড়ানো আছে নানান জায়গায়। সেসব পুরাকীর্তি আমাদেরও পূর্বপুরুষদের পুরাকীর্তি। নওগাঁর পাহাড়পুরের বৌদ্ধ কীর্তি মতান্তরে হিন্দু কীর্তি দেড় হাজার বছরের পুরনো। সার্থক জনম আমার—আমি সে কীর্তি চাক্ষুষ করেছি। তবে বগুড়ার মহাস্থানগড় দেখা হয়নি। কুমিল্লার ময়নামতীও দেখা হয়নি। দিনাজপুরের কান্তজীর টেরাকোটা মন্দির নিয়ে একটি চমৎকার বই বেরিয়েছে। ভবিষ্যতে কলকাতা থেকে বাসে চড়ে একটি বাসে পাহাড়পুর, মহাস্থান, দিনাজপুরের কান্তজীর মন্দির পর্যন্ত যেতে পারা যাবে। তারপর সেখান থেকে যমুনা নদীর উপর বঙ্গবন্ধু সেতু দিয়ে ময়মনসিংহ পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব হবে। বঙ্গবন্ধু সেতু একটি আধুনিক কীর্তি যার জন্য বাংলাদেশ গর্বিত ও আমরা যারা বাংলাদেশ ভালোবাসি তারাও।

ওরাও ইচ্ছে করলে বাসযোগে কলকাতা নবদ্বীপ মুর্শিদাবাদ মালদা ঘুরে যেতে পারবে। সম্ভব হলে শান্তিনিকেতনও। এসব স্থান বাঙালি মাত্রের অবশ্য দর্শনীয়। নইলে ইতিহাসকে ঠিকমতো জানা যাবে না। সেই ইতিহাস আমাদের যৌথ ইতিহাস।

আগেকার দিনে যখন বাস যাত্রার সুযোগ ছিল না তখন ট্রেন ও স্টিমার যাত্রার সুযোগ ছিল। আসাম মেল-এ শিয়ালদহ থেকে সান্তাহার যেতে আমার লেগেছিল পাঁচ ঘন্টা। আসাম মেল যেত পার্বতীপুর পর্যন্ত ব্রডগেজে, পার্বতীপুর থেকে পাণ্ডুয়া যেত মিটার গেজে। পাণ্ডুয়া ব্রহ্মপুত্রের তীরে গৌহাটির উলটো দিকে। সেকালে দার্জিলিং মেল যেত শিয়ালদহ থেকে সান্তাহার ও পার্বতীপুর হয়ে শিলিগুড়ি পর্যন্ত। শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত যেতে হতো হয় টয়ট্রেনে নয় মোটরে। আজকাল দার্জিলিং যাবার পথ বদলে গেছে বাংলাদেশকে এড়াতে। তেমনই আসামের পথও বদলে গেছে একই কারণে। এতে খরচও

বেশি হয়। দুই সরকার যদি একমত হন তাহলে দার্জিলিং মেল ও আসাম মেল দুইপথেই যেতে পারে।

দার্জিলিং মেল আগেকার দিনে যে পথে যেত সেই পথেই যেত নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস। আত্রাইঘাট স্টেশনে থামত। রবীন্দ্রনাথ সেই ট্রেনে আত্রাইঘাট স্টেশনে নেমে হাউস বোট দিয়ে পতিসর যেতেন। একবার আমি তাঁকে পতিসর থেকে হাউস বোটে আত্রাইঘাট স্টেশনে আসতে দেখি। সেখান থেকে তিনি কলকাতা ফিরে যান নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেসে। আমি তাঁর সহযাত্রী হই নাটোর পর্যন্ত। তখন আমি রাজশাহীর জেলাশাসক।

তখনকার দিনে ঢাকা মেল যেত শিয়ালদহ থেকে গোয়ালন্দ অবধি, তারপর স্টিমারে নারায়ণগঞ্জ, সেখান থেকে ট্রেনে চড়ে ঢাকা। চিটাগং মেল যেত শিয়ালদহ থেকে গোয়ালন্দ, গোয়ালন্দ থেকে স্টিমারে চাঁদপুর, সেখান থেকে ট্রেনে চট্টগ্রাম। আমাকে কয়েকবার স্টিমারে যাতায়াত করতে হয়েছিল। মনে পড়ে যেত রাইন নদের উপর স্টিমার যাত্রা। স্টিমার যাত্রার যে আনন্দ তার তুলনা নেই।

দুঃখের বিষয় আজকাল নদীর যেভাবে গভীরতা কমে গেছে তাতে গোয়ালন্দ থেকে নারায়ণগঞ্জ বা চাঁদপুর স্টিমারে যাতায়াত করা যায় না। তবে ঢাকা-বরিশাল স্টিমার সার্ভিস এখনো চালু আছে। অন্য একটা কারণ হতে পারে—ঢাকা মেল ও চিটাগং মেল দুটোই পার্টিশনের পরে বন্ধ হয়ে গেছে। কারণ কলকাতার সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন। অধিকাংশ যাত্রী হয় কলকাতা থেকে যেত নয় কলকাতায় আসত। মনে হয় না, ঢাকা মেল ও চিটাগং মেল আবার চালু হবে। এখানে বলে রাখি যে রবীন্দ্রনাথ চিটাগং মেলে কুষ্টিয়া গিয়ে সেখান থেকে শিলাইদা যেতেন হাউস বোটে। কিন্তু শিলাইদার জমিদারি ভাগ্যকুলের জমিদাররা কিনে নেওয়ায় তাঁর শিলাইদা যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। তাঁর হাউস বোটটিও স্থানান্তরিত হয়। আমি সে হাউস বোটে চড়ার সুযোগ পাইনি। তবে পতিসরের হাউস বোটে চড়ার সৌভাগ্য হয়েছে।

তখনকার দিনে কোনো কোনো জায়গায় লঞ্চের ব্যবহার ছিল। কিন্তু পাবলিকের জন্যে নয়। সরকারি লঞ্চে চড়ে আমি নদীয়া জেলার হাঁসখালি থেকে চুয়াডাঙ্গা গেছি। লঞ্চটা আমিই লিখে কলকাতা থেকে আনিয়েছিলাম বন্যা পরিদর্শনের জন্য। হঠাৎ দেখি সেই লঞ্চে কলকাতা থেকে এসেছেন স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন ও খান বাহাদুর আজিজুল হক। নাজিমুদ্দিন তখন বাংলার লাটসাহেবের শাসন পরিষদের সদস্য আর আজিজুল হক শিক্ষামন্ত্রী। চুয়াডাঙা পর্যন্ত আমরা একসঙ্গে যাই। তাঁরা চুয়াডাঙা থেকে কলকাতা ফিরলেন ট্রেনে। আর আমি বন্যা পরিদর্শন করে বেড়াই।

আরো কয়েকবার লঞ্চে চড়েছি বিভিন্ন জেলায়। সবচেয়ে আনন্দ পেয়েছি কর্ণফুলি দিয়ে রাওজান পর্যন্ত গিয়ে। সেখানে দেখেছি বৌদ্ধদের মহামুনি মিলন। মগরাজা নানুমা আমাদের আপ্যায়ন করলেন। রাজা কিন্তু পুরুষ নন, নারী। সেটাই পার্বত্য চট্টগ্রামের মগদের প্রথা। আনন্দের আশায় চট্টগ্রাম থেকে কক্‌সবাজার গিয়েছিলুম লঞ্চে, কিন্তু লীলা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আনন্দ পরিণত হল নিরানন্দে। তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে হল। সেই লঞ্চ গিয়েছিল খানিকটা নদীপথে, খানিকটা সমুদ্রপথে। এরকম সুযোগ পশ্চিমবঙ্গে কেউ কখনো পায়নি ও পাবে না। যদি না সরকার উদযোগী হন।

বাংলাদেশে নানান জায়গা আছে যেখানে লঞ্চ চলে। শুনছি চেষ্টা হচ্ছে কলকাতা

থেকে ঢাকায় লঞ্চ সার্ভিসের। সেটাও দুপক্ষের কাছে ভালো হবে। একদা কলকাতা থেকে স্টিমারে চড়ে জলপথে ডিব্রুগড় পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব ছিল। যতদূর মনে পড়ে, অতুলচন্দ্র গুপ্ত গিয়েছিলেন। সে সুযোগ আর ফিরবে না। জলের সে গভীরতা আর নেই।

আমি হাতির পিঠে চড়েও বেড়িয়েছি। একবার হাতির পিঠে চড়ে পতিসর গিয়েছিলুম। সেটা রাজশাহী জেলায়। আর কোনো জেলায় সে সুযোগ ছিল না। সান্তাহার থেকে নওগাঁয় যেতে হতো টমটমে চড়ে। এক ঘোড়ার টমটম। যারা টমটম চালাতো তারা বিহারী ও তাদের পদবি ছিল পাসোয়ান। সমাজের পরিবর্তন হয়েছে। একজন পাসোয়ান ছিলেন কেন্দ্রের রেলমন্ত্রী। শুনছি টমটম উঠে গেছে। তার জায়গা নিয়েছে বাস। রাস্তারও উন্নতি হয়েছে। শিলাইদা থেকে ফেরবার পরে একবার আমাকে পালকিতে চড়তে হয়েছিল। শুনেছিলুম সেটা নাকি রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করতেন। কী করে তিনি পারতেন জানিনে। আমি হাত-পা মুড়ে বসতে সম্পূর্ণ অক্ষম ছিলুম। বেহারাদের ছুটি দিয়ে নেমে পড়লুম রাস্তায়। মাইল তিনেক পথ অনায়াসে হাঁটলুম।

তবে লীলাকে ওরা যে পালকি দিয়েছিল সেটা শিলাইদার ম্যানেজারের। সেটা ছিল আরো বড়। তাঁর কষ্ট হয়নি। হতে পারে সেটাই গুরুদেব ব্যবহার করতেন। তখনকার দিনে শিলাইদা যাওয়া-আসার যে কাঁচা রাস্তা তাতে যাতায়াতের অন্য কোনো ব্যবস্থা ছিল না। এখন শুনছি খুব ভালো রাস্তা হয়েছে। মোটর চলে।

কুষ্টিয়া থেকে যেতে হলে পার হতে হয় গোরাই নদী। এককালে গোরাই নদীতে স্টিমার চলত। আমি যখন কুষ্টিয়ার মহকুমা শাসক তখনো গোরাইয়ে স্টিমার সার্ভিস ছিল। রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি'-র স্টিমারযাত্রা বোধহয় নেহাত কবিকল্পনা নয়।

মোট কথা যেভাবে হোক বাংলাদেশে বেড়াতে যাওয়া এখন একান্ত প্রয়োজন। আর সেখান থেকে এখানে বেড়াতে আসাও তেমনই। শুধু আকাশপথে নয়, জলপথে ও স্থলপথে। এই শুভ সূচনা দেখে আমি খুশি। বয়স থাকলে ও সামর্থ থাকলে আমি ঢাকায় বাস যাত্রা করতুম। যাঁরা করতে পারছেন তাঁদেরকে অভিনন্দন জানাই।

বত্রিশ

সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি

একুশে ফেব্রুয়ারিকে আমরা কেন স্মরণ করি? কারণ এই তারিখে নির্ণীত হয়ে যায় বাঙালি বলে যারা পরিচিত তাদের ধর্ম ও রাষ্ট্র দুই হলেও ভাষা একটি। দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রবক্তা, তাঁরা ঢাকার রাস্তায় পাঁচ ছয়টি তরুণকে অকাতরে নিহত হতে দিয়ে মনে করেছিলেন উর্দুই হবে সব মুসলমানের একমাত্র ভাষা, যেহেতু বাংলা কেবলমাত্র হিন্দুর ভাষা। কিন্তু দেখা গেল ভাষার প্রশ্নে হিন্দু মুসলমান এককাট্টা। রবীন্দ্র-নজরুল একবৃন্তে। ভাষার ইতিহাসের কাছে রাজনীতির ভূগোল পরাস্ত। ভাষার জয়যাত্রা একুশে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালে শুরু হয়ে ১৯৭১ সালের ষোলোই ডিসেম্বর দেশকে মুক্ত করে। বাংলাভাষা থেকে বাংলাদেশ। যার সীমানা পূর্ববঙ্গের সমতুল হলেও উত্তরাধিকার সমগ্র বঙ্গের অনুরূপ। তাকে ধর্মের গণ্ডিতে

নিবদ্ধ করা অসম্ভব।

বাংলাদেশের মুক্তির পর আমি চারবার আমন্ত্রিত হয়ে ঢাকায় যাই। দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপন উপলক্ষে। সেদিন রাত বারোটা থেকে শুরু হয়ে যায় শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ। আমি অত রাতে যেতে পারিনে। যাই ভোরবেলা সস্ত্রীক। দেখি মাইলজোড়া লাইন। শম্বুকগতিতে চলি আবালবৃদ্ধবনিতার অনুসরণে। সে এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। কেউ লাইনচ্যুত হয়নি। অসাধারণ শৃঙ্খলা। কারো মুখে বাক্য নেই। মুখে নেই হাসি। বাঙালির মতো একটি বাচাল জাতি মূক হল কোন মন্ত্র বলে!

"আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি"—এটাও একপ্রকার জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত হয়েছে। বাহান্ন সালে ওই ঘটনাটি ছিল তুচ্ছ একটি গুলিচালনার ঘটনা। অমন তো কত হয়। তার গুরুত্ব কেউ অনুধাবন করেনি। কিন্তু বছরের পর বছর তার স্মৃতি মানুষের চিত্তকে আবেগে উদ্বেল করে। ওই তরুণরা শহীদের মর্যাদা ও অমরত্ব পায়। তাদের সম্মানে নির্মিত শহীদ মিনার একটি গাম্ভীর্যময় সৃষ্টি। ঢাকার একটি অবশ্য দর্শনীয় দৃশ্য। কী জানি কেন, 'ঢাকা, পাস্ট, প্রেজেন্ট' নামক বিরাট গ্রন্থে এর প্রতিলিপি নেই এবং গ্রন্থের ভিতরেও এর উল্লেখ অনুপস্থিত।

বাঙালির প্রতি বাঙালির স্বাভাবিক সহানুভূতি থেকে এপারেও একুশে ফেব্রুয়ারির স্মারক সভা অনুষ্ঠিত হয় একবছর বাদে ঠিক সেই দিনে শান্তিনিকেতনে সাহিত্যমেলা রূপে। এরপরে কলকাতায় আমরা বহুবার একুশে ফেব্রুয়ারি স্মরণ করেছিলুম ষাটের দশকে। তাতে রাজনীতির গন্ধ ছিল না। রাজনীতি আমরা সযত্নে পরিহার করেছি। একবার এই নিয়ে এক দেশপ্রেমিক সহযোগীর সঙ্গে আমার মতবিরোধ ঘটে। তাঁর লক্ষ্য, আরো একবার যুক্ত বাংলা গঠন। আমি বলি, বারবার বঙ্গভঙ্গের নিশ্চয়ই কোনও গভীরতর কারণ ছিল। সেই গভীরতর কারণ দূর না হলে যুক্ত বাংলা আবার বিযুক্ত বাংলা হবে। হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার পর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত একশো বছর ছিল বাঙালি হিন্দুর স্বর্ণযুগ। কী সাহিত্যে, কী বিজ্ঞানে, কী নাট্যকলায়, কী রাজনীতিতে, কী আইনে, কী চিকিৎসাবিদ্যায়, কী স্থাপত্যবিদ্যায় বাঙালি হিন্দুরা ছিল ইংরেজদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অগ্রণী। বাঙালি মুসলমানরা তা নয়। অসহযোগ আন্দোলনে, গণসত্যাগ্রহ আন্দোলনে, ভারত ছাড়ো আন্দোলনে, সামন্তবাদী কার্যকলাপে তাদের যে রেকর্ড, তা অতুলনীয়। দেশ শাসনের বেলা ধর্মভিত্তিক সংখ্যাগরিষ্ঠতাই কি সব? কিন্তু প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের সময় দেখা গেল ধর্মভিত্তিক সংখ্যাগরিষ্ঠতাই সব। তার থেকে বেরোনোর একমাত্র উপায় ছিল ব্রিটিশ অপসারণের সময় প্রদেশভাগ।

কেউ এতে সুখী হয়নি, সকলেই অসুখী। বাদ পেশাদার রাজনীতিক ও পেশাদার আমলা। কিন্তু এর প্রতিকার কোথায়? দেশের জন্য যিনি কারাবরণ করেছিলেন সেই দেশপ্রেমিক চান আবার যুক্ত বাংলা। আমি বলি, না। ও কথা মুখে আনলে রাজনীতি এসে পড়বে, অনুষ্ঠান মাটি হবে। আমরা চাই সাংস্কৃতিক মিলন। রাজনৈতিক মিলন নয়। সাহিত্যে, দর্শনে, ইতিহাসে, বিজ্ঞানে, চিত্রকলায়, নাট্যকলায়, অন্যান্য বিদ্যায় ও কলায় ওপারের মুসলমানদের সমান হতে হবে। ওরা আমাদের গর্ব খর্ব করুক। ওদের মধ্যে প্রতিযোগিতার আগ্রহ জাগুক। ধর্মসংস্কার হোক, সমাজসংস্কার হোক। বিদ্যাসাগররা জন্মাক। দেশের প্রতি মমত্ববোধ জন্মাক। দেশের জন্যে প্রাণ দিতে শিখুক। শুধু ভাষার জন্য নয়। সত্যিসত্যি ঘটে

গেল এক আশ্চর্য কাণ্ড। লক্ষ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে পূর্ব পাকিস্তান হল স্বাধীন বাংলাদেশ। যুক্তবাংলা নয়, মুক্তবাংলা। এটাই বা কম কীসে? এটা একটা মিরাকল। আমরা শতকণ্ঠে অভিনন্দন জানালুম। পঞ্চাশজনকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। দেড়শো জন এসে হাজির। সাত দিন ধরে সম্মেলন। সাদর আতিথেয়তা। এরপর ওপার থেকেও আমন্ত্রণ। আরো সাদর আতিথেয়তা। এত ভালোবাসা ওদের অন্তরে ছিল। আমরা অভিভূত। মহিলারা আমাদের কাছে পর্দা রাখেননি। মনে হল বাড়িতেই আছি।

শেখ মুজিবুর রহমান বললেন, "আমরা সতেরো কোটি বাঙালি একজোট হলে কী না করতে পারি।" সর্বনাশ। আমরা চুপ। একজন আলাপী অন্য এক সময় বললেন, "আপনারা ভারতের অধীনে রয়েছেন কেন? আমাদের সঙ্গে মিশে গেলে স্বাধীন হবেন।" সর্বনাশ। এ যে আরেক কুইট ইন্ডিয়া। আমি বলি, দেখুন আমরা আপনাদের মতো শুধুমাত্র বাঙালি নই, আমরা সেই সঙ্গে ভারতীয়। আমরা কাশী, কাঞ্চীম, উজ্জয়িনী, গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, পুরীর মন্দির, আগ্রার তাজমহল, অজন্তা, এলোরা, বিন্ধ্য, হিমালয়, রামায়ণ, মহাভারত, অশোক, আকবর ত্যাগ করতে পারব না। তার চেয়ে বরং পদ্মা, মেঘনা, কর্ণফুলী, বুড়িগঙ্গা, পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, ময়নামতী, সোনারগাঁও, ঢাকেশ্বরী, চন্দ্রনাথ ছাড়ব। তা বলে কৃত্তিবাস, চন্দ্রাবতী, আলাওল, দৌলত কাজী, লালন ফকির, হাসন রাজা, ময়মনসিংহ গীতিকা, বিষাদসিন্ধু, সারিজারি, ভাটিয়ালি, ঢাকাই শাড়ি, নকশিকাঁথা, মসলিন ছাড়ব না। সুযোগ পেলেই দেখতে আসব। শুনতে আসব। এটা হল পঁচিশ বছর আগেকার। পঁচিশ বছরে এর কোনও পরিবর্তন হয়নি। পরেও হবার নয়। ইতিমধ্যে শেখ মুজিব নিহত হয়েছেন। সেই সঙ্গে নিহত হয়েছে তাঁর মতবাদ। তর্ক বেধে গেছে, ওঁরা বাঙালি না বাংলাদেশি। সেদিন কলকাতায় অধ্যায়নরত ওপারের একটি ছাত্র এসে আমাকে বলল, আপনি ওদের অনুষ্ঠানে যাবেন না ওরা বাংলাদেশি। আমাদের অনুষ্ঠানে আসবেন। আমরা বাঙালি।

হ্যাঁ, দু'দলই মুসলমান। মুসলমানে মুসলমানে বিভেদ ভাষা নিয়ে নয়, ভাষা দুজনেরই বাংলা। বিভেদ জাতীয়তার ভিত্তি নিয়ে। একজনের জাতীয়তা দেশভিত্তিক। দেশের নাম বাংলাদেশ। অপর দলের জাতীয়তা জাতিভিত্তিক। বাঙালি একটি জাতির নাম। সে তার জাতির নামেই পরিচয় দিতে চায়।

দেশ দু'ভাগ হয়ে গেলেও জাতি দু'ভাগ হয়ে যায়নি। ওরা আর আমরা একই জাতি। তবে দেশভাগের পর দুই রাষ্ট্র থেকে দুই নেশন হয়েছে। দুই নেশন থেকে দুই রাষ্ট্র নয়। তফাতটা মনে রাখতে হবে। দুই নেশন সত্ত্বেও আমরা দুই জাতি নই, এক জাতি। মুখ দেখে চেনা যায় না কে হিন্দু কে মুসলমান। দাড়ি হিন্দুরাও রাখে। দাড়ি মুসলমানরাও রাখে। ফজলুল হক সাহেবের দাড়িও ছিল না, গোঁফও ছিল না। কাজী নজরুল ইসলামেরও না। ঢাকায় নবাব পরিবারে কারো দাড়ি দেখিনি। যতদূর মনে পড়ে নবাব হাবিবুল্লার গোঁফও ছিল না। তবে উনি বাঙালিও ছিলেন না। তিনি কাশ্মীরি।

বাঙালি না বাংলাদেশি, এর একটি গূঢ় অর্থ আছে। বাঙালি যেমন আমি, তেমনি কবি শামসুর রহমান। যদিও আমরা দুই রাষ্ট্রের নাগরিক। বর্তমানে যারা নিজেদের বাঙালি না বলে শুধুমাত্র বাংলাদেশি বলেন, এঁরা কেউ উর্দুভাষীও নন, কাশ্মীরিও নন। অথচ বাঙালিও নন। বাংলায় কথা বলেন অথচ বাঙালি নন, এটা একটা হেঁয়ালি। ইংরেজিতে কথা বলার

সময় এরা বলেন এঁদের ভাষা 'বেঙ্গলি', কিন্তু নাগরিকত্বর পরিচয় দেবার সময় এঁরা বাংলাদেশি।

একুশে ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠান আশা করি মিলিতভাবেই হবে। বাঙালিদের একটা, বাংলাদেশিদের আরেকটা নয়। বাহান্ন সালে বাংলাদেশ হয়নি, বরকত, সালামরা বাংলাদেশি ছিলেন না। ছিলেন বাঙালি। এখন তাঁদের বাংলাদেশি বললে ইতিহাসের অপলাপ হয়। মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা নিহত হয়েছিলেন সেই লক্ষ লক্ষ মানুষও বাঙালি। বহু হিন্দু মুখে শুনেছি, আমরা বাঙালি, ওরা মুসলমান। বহু মুসলমানদের মুখে শুনেছি 'ওরা বাঙালি, আমরা মুসলমান।' পার্টিশনের এটাও ছিল একটা গভীরতর কারণ। এখন বাংলাদেশের মুসলিম রাজনীতিকরা, বুদ্ধিজীবীরা ও ছাত্ররাও দুভাগ হয়ে যাচ্ছে। এটা ভৌগোলিক নয়, মানসিক। একদল বলছে, 'ওরা বাংলাদেশি আমরা বাঙালি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাঙালি।' আরেক দল বলছে, 'আমরা বাঙালি নই, আমরা বাংলাদেশি। সেনাপতি জিয়াউর রহমান ছিলেন বাংলাদেশি।'

এই হল রহমানে রহমানে মানসিক পার্টিশান। পাঁচ দশ বছর বাদে শোনা যাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে বাঙালিদের ঘাঁটি আর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশিদের। বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টির সদর দফতর হবে বাংলাদেশিদের আস্তানা। আওয়ামী লীগের সদর দফতর বাঙালিদের। পার্লামেন্টে এর প্রতিফলন লক্ষিত হবে। সরকারি কর্মচারী মহলেও, জনসাধারণের জীবনেও।

আমরাও তো কথায় কথায় বলেছি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী, বাংলাদেশি টাকা, বাংলাদেশি গায়িকা, বাংলাদেশি ফিল্মের নায়িকা। এটা ওই শব্দের অপপ্রয়োগ নয়। কিন্তু কেউ যদি বলেন, 'শামসুর রহমান বাঙালি নন, বাংলাদেশি কবি', তা হলে সেটা নিশ্চয়ই অপপ্রয়োগ। তিনি যে বাংলাদেশি নাগরিক, এ কথা অনস্বীকার্য কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি বাঙালি কবি বলে গণ্য। তিনি যদি কোনও দিন নোবেল প্রাইজ পান আমরাও গান ধরব, 'জগৎ কবিসভায় মোরা তোমার করি গর্ব, বাঙালি আজি সমান গুণী বাঙালি নহে খর্ব।'

যে যাই বলুক, বাঙালি বলে একটি জাতি ছিল, সে জাতি এখনো আছে, পরেও থাকবে। তবে এই শতাব্দির মাঝখানে একটা ছেদ পড়ে গেছে। এপার আর ওপারের মাঝখানে এক দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান। এখন পাসপোর্ট নিতে হয়, ভিসা নিতে হয়। ডলার কিংবা পাউন্ড নিয়ে যেতে হয়। পাকিস্তান আমলে এমন কড়াকড়ি ছিল না, আগেকার দিনে কলকাতায় ঢাকার বেশ কয়েকটা দৈনিকপত্র কিনতে পাওয়া যেত। আমি রোজ একখানা বাংলা ও একখানা ইংরেজি কাগজ কিনতুম। ছাপার মান কলকাতার চেয়ে কিছুতেই নিচু নয়। ওরাই তো প্রথমে শুরু করে দেয় সাধু ভাষার পরিবর্তে চলতি ভাষা ব্যবহার। কলকাতার চলতি ভাষা। পার্টিশান হয়ে একটা লাভ হয়েছে, এখানকার চলতি ভাষা এখন ওখনকারও চলতি ভাষা। ওদের রেডিও আমি মাঝে মাঝে শুনি। ওদের টেলিভিশন মাঝে মাঝে দেখি। ভাষার দিক থেকে কোনও তফাত নেই। যিনি বলছেন তিনি হিন্দু না মুসলমান, পূর্ববঙ্গীয় না পশ্চিমবঙ্গীয় তা বোঝা শক্ত। রবীন্দ্র জন্মদিনে একবার বেগম খালেদা জিয়ার ভাষণ শোনারও সৌভাগ্য হয়েছিল। ওটা বোধহয় লিখিত ভাষণ। কিন্তু ভাষা তো এখানকার মতোই। রবীন্দ্রনাথকে তিনি আপনার করে নিয়েছেন মনে হল।

বাঙালি না বাংলাদেশি এটা একটা বৃথা তর্ক। আমরা কি বাংলাদেশী নই? আমরা কি

বাংলাদেশ নামটির উপর আমাদের পৈত্রিক দাবি ছেড়ে দিয়েছি? ওপার থেকে কেউ যদি এপারে এসে বলে 'আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি' আমি তাকে বলি 'তুমি বাংলাদেশেই এসেছ। এটাও বাংলাদেশ।' রাজনৈতিক অর্থে নয়, কিন্তু বহুকালের প্রচলিত অর্থে। আমরা নিজেদের মধ্যে এর ব্যবহার অপ্রচলিত করিনি। রাজনীতিই কি জীবনের সব কিছু?

একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠান রাজনীতিবর্জিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় আমি প্রস্তাব করি, 'এবার গাওয়া হোক আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।' সকলে উৎসাহের সঙ্গে গান করেন। আমরা তখন স্বপ্নেও ভাবিনি যে সেই গান হবে মুজিবনগরে স্বাধীনতা ঘোষণার সময় মুক্তিযোদ্ধাদের সমবেত সঙ্গীত ও পরবর্তী কালে জাতীয় সঙ্গীত। এখন আমাদের বিপদ হয়েছে এই যে, কলকাতার রেডিওতে বা দূরদর্শনে সেই গানটি শোনার সুযোগ নেই। স্বদেশী সঙ্গীতের তালিকা থেকে সেই গানটি বর্জিত। একজন দূরদর্শন কর্মীকে জিজ্ঞাসা করি, 'আপনারা সোনার বাংলা বাদ দিলেন কেন?' তিনি আমাকে চমকে দিয়ে বললেন 'ওটি একটি বিদেশি রাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত। আপত্তি উঠতে পারে।' কার আপত্তি কেন আপত্তি? আমরা আমাদের আপন সঙ্গীত থেকে বঞ্চিত হতে পারিনে।

অপরপক্ষে এটাও ঠিক যে ঢাকায় দেখেছি জাতীয় সঙ্গীতের সুর যখন বাজানো হয় তখন রাষ্ট্রপতি থেকে আরম্ভ করে হাজার হাজার শ্রোতা একসঙ্গে দাঁড়িয়ে ওঠেন ও দাঁড়িয়ে থাকেন। সে মহিমা তো আমরা এখানে দিতে পারিনে। এখানে আমরা জনগণমন অধিনায়ককে সে মহিমা দিই, কিন্তু 'সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'কে নয়। তাই এ গান কেউ শুনতে পায় না।

তেত্রিশ

আমি আশাবাদী

বি.এ. অনার্স পরীক্ষায় সফল হওয়ার জন্য আমাকে খুব বেশি পরিশ্রম করতে হয়নি। কারণ প্রতিযোগিতা ছিল সীমাবদ্ধ। প্রতিযোগী বলতে ইংরেজি অনার্সের মাত্র একজনই। তার দৌড় কতদূর, তা আমি জানতুম। আমি জানতুম যে আমি তাকে হারিয়ে যেতে পারব। ভাবনা কেবল ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া নিয়ে। নিজের ওপরে আমার যথেষ্ট বিশ্বাস ছিল। ফার্স্ট ক্লাস পেতে খুব কষ্ট হল না।

এরপর যখন ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসেস পরীক্ষার প্রতিযোগিতায় বসতে হল, তখন পরীক্ষার হলে সারা ভারতের সেরা ছাত্রদের ভিড়। দু-একজন ছাড়া কাউকেই চিনি না। প্রতিযোগিতার নিয়ম অনুসারে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি প্রথম দিকের কয়েকটি স্থানের অধিকারীরাই নির্বাচিত হত। প্রথম বছর আমি পঞ্চম স্থান অধিকার করেছিলুম। সেবার মাত্র তিনজনকেই প্রতিযোগিতার সূত্রে নেওয়া হল। অন্য দুজনকে মনোনয়নসূত্রে। কাজেই চতুর্থ আর পঞ্চম স্থানের অধিকারীরা গৃহীত হলেন না। যেহেতু তাঁরা হিন্দু। তাঁদের জায়গায় দুজন মুসলমানকে নেওয়া হল, যাঁদের স্থান অনেক নিচে। আমি দারুণ আঘাত পেলুম। কিন্তু আরো একটা বছর আমার হাতে ছিল। পণ করলাম যে আমি প্রথম হবই। তাহলে যদি একজনকেও নেওয়া হয়, আমিই হব সেইজন। বাবাকে বললুম যে আসছে বার আমি

পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করবই। প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্য আমাকে দিন-রাত পড়তে হত। খেতে গেলে বই হাতে করে যেতুম। শৌচাগারে গেলে বই থাকত হাতে। খেলাধুলো বন্ধ। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে হত। সকালবেলায় গঙ্গায় সাঁতার কেটে সব গ্লানি কাটিয়ে উঠতুম। গঙ্গা মানে পাটনার গঙ্গা। আমি ছিলুম পাটনা কলেজের ছাত্র। এম.এ. দিয়েছিলুম, কিন্তু জানতুম ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসেস-এ সফল হলে এম.এ. দেওয়ার দরকার হবে না। তার আগেই বিলেত যেতে হবে। কাজেই এম.এ.-টা আমি অবহেলা করেছি। একদিন ইংরেজির ক্লাসে বসে ইতিহাসের বই পড়ছি, লক্ষ্য করলেন অধ্যাপক নিরঞ্জন নিয়োগী। জানতে চাইলেন, ওটা কীসের বই। আমায় কবুল করতে হল, ইতিহাসের বই। আদেশ করলেন, এক্ষুনি ওই বই ফেলে দাও। আর নয়ত ক্লাস থেকে বেরিয়ে যাও। আমি ক্লাস থেকে বেরিয়েই গেলুম। আর ফিরলুম না। জানতুম যে আই সি এস পরীক্ষায় সফল হলে এম.এ. দেওয়া দরকার হবে না। কিন্তু বিফলও তো হতে পারি। তখন এম.এ. ডিগ্রিটাও তো হাতের পাঁচ। একটা কিছু জুটে যেত। কিন্তু আমি মনকে বোঝালাম, হয় এসপার নয় উসপার। হয় আমি আই সি এস হব, নয়ত আমি আমার বি. এ. ডিগ্রির জোরে খবরের কাগজের অফিসে চাকরি করব। কাজেই কলেজ যাওয়া বন্ধ করলুম। পার্সেন্টেজ খোয়া গেল। স্কলারশিপ বাজেয়াপ্ত হল। আমি হস্টেল থেকেও বেরিয়ে গেলুম। সেটা ১৯২৭ সাল। চলে গেলুম শান্তিনিকেতনে। সেখানে কিছুদিন কাটালুম। তারপরে গেলুম পুরী। সেখানে থাকতেন আমার সেজ কাকা, ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার। তাঁর ওখানে থেকে প্রতিদিন সমুদ্রে স্নান করি, সমুদ্রের ধারে বেড়াই। একদিন খবর এল, আমি সত্যি সত্যিই ফার্স্ট হয়েছি। আমার বাবা থাকতেন ঢেঙ্কানলে। সেখানে গিয়ে বাবাকে বললুম যে আমি কথা রেখেছি। ফার্স্ট হয়েছি। এরপর শিক্ষানবিশের জন্যে বিলেতযাত্রা। দু'বছর বাদে ফিরে এসে, অবিভক্ত বাংলাদেশে কর্মজীবন শুরু করা। ইতিমধ্যে 'পথে প্রবাসে' লিখে সাহিত্যিক মহলে পরিচিত হয়েছিলুম। 'বিচিত্রা' সম্পাদকের অনুরোধে উপন্যাস লিখতে শুরু করলুম।

এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই, নিজের ওপর বিশ্বাস রাখতে হয়। কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। সফল হয়েও চাকরির জন্যে গৃহীত না হলে দমে যাওয়া উচিত নয়। আবার চেষ্টা করতে হয়। আরো বেশি পরিশ্রম করতে হয়। প্রচণ্ড ঝুঁকি নিতে হয়। পুরুষাকার যতদূর নিয়ে যেতে পারে, ততদূর যাওয়ার জন্যে প্রাণপাত সাধনা করতে হয়। বাকিটা ভাগ্য। কেমন করে জানব আর কোনও পরীক্ষার্থী আমার চাইতে আরো কঠিন সাধনা করছেন না? তখনকার দিনে সারাভারত থেকে বাছাই করা শ'দুয়েক ছাত্র পরীক্ষায় বসতেন। সুতরাং প্রথম হবই, একথা বলা আঁধারে ঢিল ছোঁড়া। দৈবাৎ লেগে যেতে পারে। লেগেও গেল। আমি ভগবানকে ধন্যবাদ দিলুম। এরপরে যে কাজটি করলুম, সেটা বিস্ময়কর। এবার আমি পণ করলুম, পাঁচ বছর চাকরি করার পর অকালে বিদায় নিয়ে সাহিত্য সেবা করব। সরস্বতীর সঙ্গে আমার আগে থেকেই পুত্র-সম্পর্ক ছিল। লক্ষ্মীর সঙ্গে নয়। সরস্বতী সদয় হলে আমি যতদূর যেতে পারব, লক্ষ্মী সদয় হলে ততদূর নয়। অর্থাৎ সাহিত্যিক হিসেবেই আমি আমার প্রকৃত পরিচয় দিতে পারব। একজন জজ ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নয়। সেই পাঁচবছর যেদিন পূর্ণ হল, তখন দেখলুম আমি বিয়ে করে সংসারী হয়েছি, দুটি পুত্রসন্তান হয়েছে। সুতরাং পারিবারিক কারণে অপেক্ষা করতে হবে। তারপর আমি দেখলুম,

লেখক হিসেবে তেমন কিছু উপার্জন হয় না। রোমাঁ রোল্যাঁও আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, টাকার জন্য লিখবেন না। আনন্দের জন্যে লিখবেন। আমি তেমন সাহিত্যিক নই যে জনপ্রিয় উপন্যাস লিখে সংসার চালাতে পারি। আমার উপন্যাস জনপ্রিয় উপন্যাস নয়। তাছাড়া যে উপন্যাসে আমি হাত দিয়েছিলুম, তা ছয় খণ্ডে শেষ হল, বারো বছর তপস্যার পরে। সেই সময় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জাপানি বোমার ভয়ে কলকাতা ছেড়ে বাঁকুড়ায় এসে বাস করছিলেন। আমি তখন বাংলা সাহিত্যের ওপর একটি ক্ষুদ্র ইংরেজি পুস্তিকা লেখার ভার নিয়েছি। তাতে আমি সার্থক প্রবন্ধ লেখকদের অন্যতম বলে তাঁর নাম করেছিলুম। সেটা তাঁকে দেখাতেই, তিনি বললেন, আমার নামটা এ থেকে বাদ দাও। কারণ, আমি সাহিত্যিকই নই। আমি যা লিখেছি, তা সাহিত্যই হয়নি। আমি অবাক হলাম। আমি 'প্রবাসী'তে নিয়মিতভাবে তাঁর বিবিধ প্রসঙ্গ পড়তুম। অমন সরস প্রবন্ধ যদি সাহিত্য না হয়, তবে কী? আমি চিন্তা করে দেখলুম, সে সব প্রবন্ধ সরস হলেও, স্থায়ী হয়নি। সাহিত্যের একটা শর্ত হচ্ছে— স্থায়িত্ব। তখন আমি উপলব্ধি করি—আমি যদি তাঁর অনুকরণে সাংবাদিক হই, তাহলে আমার লেখা সাহিত্যই হবে না। আমি সাহিত্যিক বলে গণ্যই হব না। তখন আমি সাংবাদিক হবার সঙ্কল্প ত্যাগ করলুম। অগ্যতা চাকরিতে আরো কিছুকাল পায়চারি করতে হল। অকালে অবসর নিলে আনুপাতিক পেনশন পাওয়া যাবে। ইংরেজরা যাওয়ার সময় এ ব্যবস্থা করে যায়। আমি আনুপাতিক পেনশনের ওপর নির্ভর করে সংসার চালাতে পারব, এই বিশ্বাসে চাকরিতে ইস্তফা দিই। তার আগে শরীর ভেঙে পড়ছিল। একই সঙ্গে সরকারি কাজ ও সাহিত্যের কাজ করতে গেলে শরীর সইবে কেন? কাজেই আমি সময় থাকতে সাবধান হয়ে অকালেই অবসর নেওয়ার জন্যে চিঠি লিখি। সেটা গৃহীত হয়। তারপরে সরকার থেকে আমাকে অনুরোধ করা হয় একমাসের জন্যে উচ্চতর পদে কাজ করতে। কারণ বিচার বিভাগের সেক্রেটারি অসুস্থ। তিনি বারবার অসুখের জন্য ছুটি নেন। আর আমি বারবার তাঁর জায়গায় কাজ করি। ছ'মাস পরে যখন আমি সম্পূর্ণভাবে দায়মুক্ত হই, তখন জানতে পারলুম যে আমি আনুপাতিক নয়, পুরো পেনশন পাব। তখন আমার বয়স ৪৭ বছর। আমি আরো ১৩ বছর চাকরিতে বহাল থাকতে পারতুম। আমার এক বন্ধু বললেন, তুমি ঠিক করেছ। তুমি আরো অনেকদিন বাঁচবে। আমার সহকর্মীরা সত্তর অতিক্রম করতে পারেননি। আমি পঁচানব্বই বছর বয়সে বেঁচে আছি।

সেকালের প্রতিযোগিতার সঙ্গে একালের প্রতিযোগিতার তফাত আছে। একালে মেয়েদেরও প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে দেওয়া হয়। তাঁরা সফল হয়ে সমান শর্তে চাকরি করেন। অনেক সময় পুরুষদের চেয়েও উঁচু পদে নিযুক্ত হন। দ্বিতীয়ত, এখন একই সঙ্গে পাঁচ-ছটা প্রতিযোগিতামূলক চাকরির পরীক্ষা হয়। সফল হলে কেউ যান ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসে, ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসেস-এ, কেউ যান ইন্ডিয়ান রেভিনিউ সার্ভিসে, কেউ যান ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিসে। কেউ যদি একটাতে সফল না হন, তিনি আর একটাতে সফল হতে পারেন। তৃতীয়ত, আজকাল পরপর দুটো পরীক্ষা দিতে হয়। প্রথমটাতে পাঁচ হাজার পরীক্ষার্থী বসলে, দ্বিতীয়টায় এদের থেকে বাছাই করে পাঁচশ কি ছশ পরীক্ষার্থী বসতে পারে। সাধারণের ধারণা, বাঙালিরা তেমন সুবিধা করতে পারছে না। সেটা ঠিক নয়। ভারত সরকারের একজন বাঙালি সেক্রেটারি মিস্টার সমাদ্দার আমাকে বলেছিলেন, ভারত সরকারের ৩৩ জন সেক্রেটারির মধ্যে আমরা ১২ জন বাঙালি। সেই

১২ জন কিন্তু সকলেই পশ্চিমবঙ্গের নয়। কেউ দিল্লির, কেউ মহারাষ্ট্রের, কেউ রাজস্থানের। একবার একজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তিনি রাজস্থান ক্যাডার থেকে সেক্রেটারি হয়েছিলেন। আর একজনের সঙ্গে পরিচয় হয়, তিনি মহারাষ্ট্র থেকে সেক্রেটারি হয়েছিলেন। বাঙালিরা কোন রাজ্যের ক্যাডারে ক'জন আছেন, সে খবর আমরা রাখি না। মোটের ওপর, এই পর্যন্ত বলতে পারা যায়, পশ্চিমবঙ্গের রেকর্ড খুব একটা ভালো নয়। কারণ পশ্চিমবঙ্গে পড়াশুনো আগের মতো উচ্চাঙ্গের নয়। বাঙালি যদি পিছিয়ে পড়ে থাকে, তবে এই কারণেই। কলকাতায় থেকে মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করায় সুবিধে হয় না। একশ রকম আকর্ষণ, বিকর্ষণ, হাঙ্গামা, হুজ্জত, মিছিল। বাঙালির প্রতিভা কিছুমাত্র কম হয়নি। কলকাতা থেকে যেসব ছাত্র দিল্লিতে যায়, তারা সেখানে গিয়ে আরো ভালো ফল দেখায়। যারা বিলেত যায়, যারা আমেরিকা যায়, তারা আরো ভালো ফল দেখায়। এর থেকেই এ সিদ্ধান্তও করা যায়, বাঙালি ছাত্রদের প্রতিভায় কমতি নেই। কিন্তু আমাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সেই প্রতিভার অনুকূল নয়। এটা হল বর্তমান অবস্থা। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাবাদী যাঁরা, তাঁরা বলবেন, নিখিল ভারতীয় প্রতিযোগিতার জন্য কতগুলো ছাত্রকে আগে থেকে চিহ্নিত করে নিয়ে তাদের জন্যে উপযুক্ত পরিবেশ দিতে হবে। শুনেছি, উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় নিখিল ভারতীয় প্রতিযোগিতার জন্য প্রতিভাশালী ছাত্রদের বিশেষভাবে তালিম দেয়। কলকাতায় তেমন কোনও ব্যবস্থা নেই। নিরাশাবাদীরা বলবেন, তেমন কোনও অবস্থা হবেও না। সেই স্বল্প সংখ্যক চিহ্নিত ছাত্রদের অন্যরা তিষ্ঠোতে দেবে না। আর অধ্যাপকরাই বা বাড়তি খাটুনি খাটতে যাবেন কেন? কে তাঁদের অতিরিক্ত মাইনে দেবে? আসলে এটা ত্যাগস্বীকারের প্রশ্ন। সেকালের গুরুরা শিষ্যদের বিনা খরচে পড়াতেন। কেউ কেউ ছাত্রদের ভরণ-পোষণও করতেন। একালের গুরুরা বিনা পারিশ্রমিকে বাড়তি পরিশ্রম করতে রাজি নন। ছাত্ররাই বা কোথায় এত টাকা পাবে, যে বাড়তি খরচ বহন করবে? এক্ষেত্রে সরকারের মনোযোগ থাকা দরকার। কিন্তু রাজ্যের সরকার কেন নিখিল ভারতীয় প্রতিযোগিতার জন্যে মাথা ঘামাবেন? না ঘামালে জবাবদিহি কেই বা দাবি করবে? তাহলে শেষ পর্যন্ত অভিভাবকদেরই পরীক্ষার্থীদের জন্যে আরো খরচ করে টিউশনের ব্যবস্থা করতে হবে। তাঁরাই বা করবেন কেন যদি নিশ্চিত না হন যে, তাঁদের সন্তান নিখিল ভারতীয় প্রতিযোগিতায় সফল হবে? অতএব, শেষ কথা হচ্ছে, নিখিল ভারতীয় প্রতিযোগিতায় বাঙালি পরীক্ষার্থীর সাফল্য অনিশ্চিত। তার মানে এই নয় যে দৃঢ় আত্মবিশ্বাস থাকলে সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে কেউ সফল হতে পারছে না। হচ্ছে যখন, তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে যে হবেও। আমি আশাবাদী।

কলকাতায় আমেরিকান কনস্যুলেটের এক উচ্চপদস্থ মার্কিন অফিসারের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তাঁর নাম আমি ভুলে গেছি। সেই ভদ্রলোক অবসর নিতে যাচ্ছেন শুনে বলেছিলাম, অবসরের পর কী করবেন? তিনি বললেন, আমি আমেরিকায় একটা স্টেটে কিছু জমি কিনেছি। সেই জমিতে না আছে ঘরবাড়ি, না আছে পানীয় জল, না আছে ইলেকট্রিক। তা সত্ত্বেও সেইখানে আমি সপরিবারে বসবাস করব। আমার দুই ছেলেকেও সেই কাজে লাগিয়ে দেব। তিনি তাঁর দুই ছেলেকে বেশিদূর পড়াননি। হাতের কাজ শিখিয়েছেন। আমি বললাম, আপনি রিটায়ার করে যা টাকা পাবেন, সেটা তো ব্যবসা-বাণিজ্যে ইনভেস্ট করতে পারতেন। তিনি বললেন, না, জমি সবসময়ই থাকবে। জমির দাম

সবসময়ই বাড়বে। ব্যবসা-বাণিজ্য 'ফেল' করতে পারে, কিন্তু চাষবাস 'ফেল' করবে না। তা আমি এই উত্তর প্রত্যাশা করিনি। কিন্তু সেই হচ্ছে আসল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতাদের মনোভাব। তাঁরা নির্ভর করতেন তাঁদের দুই হাতের ওপরে। সেই দুইহাত দিয়ে তাঁরা জঙ্গল কেটে বসতি করেন, কাঠ কেটে কাঠের বাড়ি বানান, মাটি খুঁড়ে জল বার করেন, একটু একটু করে একটা নতুন রাষ্ট্র গড়ে তোলেন। সেই মনোভাব থাকলে আমরা গ্রাম গঠন করতে পারি। প্রধানত হাতের সাহায্যে। দ্বিতীয়ত যন্ত্রের সাহায্যে। তৃতীয়ত বিদ্যুতের সাহায্যে। সব সময় পারস্পরিক সহযোগিতায়, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তি যোগ করে কো-অপারেটিভ সোসাইটির সুবিধা নিয়ে। কাজ করার জন্যে প্রচুর ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে। কলকাতাই একমাত্র ক্ষেত্র নয়। মনটাকে বোঝাতে হবে যে চাকরিই একমাত্র পুরুষার্থ নয়। কিংবা দাঁও মেরে বড়লোক হওয়া যায় না। সবকাজের জন্যে মনটাকে খোলা রাখা দরকার। আমি 'ভদ্রলোকের ছেলে' আমি 'চাষী' হব কেন, 'কর্মকার' হতে যাব কেন, 'সূত্রধর' হতে যাব কেন, এমনতর সংস্কার বর্জন করতে হবে।

লোকে আমাদের 'ভদ্রলোক' বলবে না, এই ভয় কাটিয়ে উঠতে হবে। তথাকথিত 'ভদ্রলোক' না-ই বা হলুম, স্বাবলম্বী তো হতে পারব। বেকার হয়ে জীবনটা নষ্ট তো করব না। আমার মেজভাই, সে এই সংস্কার কাটিয়ে উঠেছিল। হাতের কাজ করত, মিস্ত্রিরা যা করে, তাও সে করত। বাবা কিছু জমি কিনে দিয়েছিলেন, সে সেখানে গিয়ে চাষও করত। তারও একটা সংস্কার ছিল, চাষের জন্য ট্রাক্টর চাই। ট্রাক্টর চাইলে তার জন্যে তেলও চাই। এত কিছু না করলে চাষ লাভজনক হবে না, সেজন্যে সে অন্য ব্যবসাতে হাত দিয়েছিল। মোটের ওপর আত্মনির্ভর হয়েছিল। আত্মনির্ভরতা সবচেয়ে কাম্য। এই কথাটি মনে রাখতে হবে নতুন প্রজন্মের সবাইকে।

বাঙালির সঙ্কট, সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনার কথা বলতে গিয়ে নিজের অভিজ্ঞতার কথা এত বললাম এই কারণেই যে হাজার বক্তৃতার চেয়ে একটা উদাহরণ অনেক বেশি কার্যকর। সঙ্কট যদি হয় জেদের অভাব, তাহলে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠতে হবে। সীমাবদ্ধতা যদি হয় তথাকথিত 'ছোট কাজ' বা ব্যবসা না-করা সংস্কার, তবে সেই কুসংস্কার তাড়াতে হবে। আর সম্ভাবনা? তার তো কোনও সীমা নেই। সঙ্কট, সীমাবদ্ধতা পেরতে পারলে সম্ভাবনার দরজা হাট করে খুলে যাবে। এ হল পারস্পরিক ব্যাপার। হতাশ হলে চলবে না। ঘুরে দাঁড়ানোর প্রতিজ্ঞা নিয়ে দাঁড়ালে যে কেউ পারে বিশ্বজয় করতে। বাঙালি কেন পারবে না? বাঙালি পেরেছে, পারছে, ভবিষ্যতেও পারবে। এই আশাই তো বাঁচিয়ে রাখে।

চৌত্রিশ

বাঙালির ভবিষ্যৎ

বাঙালি বলতে যদি বাংলাভাষী বোঝায় তবে বাঙালির সংখ্যা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের মতে ছিল ১৭ কোটি। এখন শুনছি ওপারের কারো কারো মতে ২২ কোটি। যে হারে বাঙালির সংখ্যা বাড়ছে সেই হারে বাড়তে থাকলে বাংলাদেশের বা পশ্চিমবঙ্গের কোনওখানেই বাঙালিদের কুলোবে না। বাধ্য হয়েই তারা অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়বে।

ইতিমধ্যেই অনুপ্রবেশের অভিযোগ উঠেছে। ১৯৯৬ সালে ঢাকা যাওয়ার সময় বিমানের একজন সহযাত্রীর মুখে শুনলুম, দুবাই থেকে বাঙালিদের মেরে তাড়িয়ে দিচ্ছে ও মালেশিয়ায় ঢুকতে দিচ্ছে না। যদিও ওরা ধর্মে মুসলমান ও সেই সুবাদে ভাই ভাই। জনসংখ্যার বিস্ফোরণ পোখরানের বিস্ফোরণের মতোই ভয়ঙ্কর। হিন্দিভাষী উর্দুভাষী তামিলভাষী মারাঠিভাষী এরাও যদি অবাধে বাড়তে থাকে তা হলে ভারতের ভেতরেই এক রাজ্যের লোক অন্য রাজ্যে ঠাঁই পাবে না। সেখান থেকে মার খেয়ে ফিরবে।

রবীন্দ্রনাথের গানে আছে, 'জেনেশুনে বিষ করেছি পান'। তেমনই আমরাও বলতে পারি, জেনেশুনে দেশ করেছি ভাগ। মুসলিম মাইনরিটি হিন্দু মেজরিটির কৃপা-নির্ভর হবে না বলে ভারত ভাগ চায় ও পায়। তেমনই হিন্দু মাইনিরিটি মুসলিম মেজরিটির কৃপা-নির্ভর হতে চায় না বলে বাংলা ভাগ চায় ও পায়। এর পরিণাম হয় ভয়াবহ।

প্রায় এক কোটি হিন্দু পূর্ববঙ্গ থেকে ভারতে চলে আসে ও ছিন্নমূল হয়। তেমনই ভারত থেকে বহু লক্ষ বিহারি মুসলমান ও বাঙালি মুসলমান পূর্ববঙ্গে যায় ও ছিন্নমূল হয়। কর্তৃপক্ষ বাধা না দিলে তখন এক প্রকার লোক-বিনিময় হয়ে যেত। অনেকের মতে সেটাই নাকি হত যথার্থ সমাধান। কিন্তু নানা দিক ভেবে ভারতের নেতারা করেন একটি ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে হিন্দুমুসলমানের সমান অধিকার। কাজেই ভারতের নেতারা লোকবিনিময়ে উদযোগী হন না, বরঞ্চ বাধা দেন।

কাশ্মীরের উপর ভারতের যে-দাবি সেটা নাকচ হয়ে যেত ভারতের নেতারা যদি ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র বানাতেন ও এখান থেকে মুসলমানদের হটাতেন। অপর পক্ষে জিন্নাসাহেবের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও পাকিস্তান ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হয়নি। তাই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে হিন্দু ও শিখরা প্রায় সবাই চলে এসেছে ও তাদের চাপে বহু মুসলমান পাকিস্তানে যেতে বাধ্য হয়েছে।

মহাত্মা গান্ধী কলকাতায় এসে সক্রিয় না হলে ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট ভীষণ দাঙ্গা বাধত ও তার প্রতিক্রিয়ায় পূর্ব বাংলায় বিপুল পরিমাণে হিন্দুদের প্রাণহানি হত। তাই গোড়ার দিকে খুব বেশি হিন্দু এপারে আসেনি। পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তানের ধর্মীয় গোঁড়ামি বেড়ে যায়। হিন্দুরা ক্রমে ক্রমে প্রাণের ভয়ে দেশান্তরী হয়। তার সঙ্গেও ছিল অন্য একটা কারণ। ভারত রাষ্ট্রে হিন্দুর পক্ষে সুযোগ সুবিধা যত বেশি পাকিস্তানে তত নয়। কাজেই সন্তানদের ভবিষ্যৎ ভেবে অনেক হিন্দু পরিবার পাকিস্তান ত্যাগ করেন।

এই যে ভবিষ্যৎ-ভাবনা এটা পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের মনেও কাজ করছিল। সন্তানদের ভবিষ্যৎ ভেবে তাঁরাও চলে যান পূর্ব পাকিস্তানে। তবে হিন্দুদের তুলনায় সুযোগসুবিধা ছিল না। যত হিন্দু এল তত মুসলমান গেল না। এটা হল মুসলমানদের উপর আক্রোশের একটা কারণ। এবং সে আক্রোশ এখনো তলে তলে কাজ করছে। এটা কবে দূর হবে কেউ বলতে পারে না। তবে মুসলমানদের মুখে শুনেছি, আমরা মরে গেলেও পাকিস্তানে যাব না এবং আমরা মরে গেলেও বাংলাদেশে যাব না। অপর পক্ষে নাছোড়বান্দা হিন্দু পূর্ব পাকিস্তানে কিছু ছিলেন, বাংলাদেশে এখনো আছেন। তাঁরা মরে গেলেও ভিটে মাটি ছাড়বেন না।

ফল হয়েছে এই যে ওপারে যথেষ্ট হিন্দু রয়েছেন এবং এপারে যথেষ্ট মুসলমান। তাঁদের বেলায় দ্বিজাতিতত্ত্ব ব্যর্থ হয়েছে। রাজনৈতিক অর্থে তাঁরা দুই জাতি হতে পারেন,

কিন্তু ভাষার সূত্রে একজাতি, দু'পারের হিন্দু সমাজ একই সমাজ, দুই পারের খ্রিস্টান সমাজ একই সমাজ। তাই যদি হয় তা হলে আমরা বলতে পারি দুই পারের বাঙালি একই জাতি।

ভালো লাগত যদি বলতে পারতুম একই জাতির একই ভবিষ্যৎ। কিন্তু তার কোনও সম্ভাবনা দেখছিনে। বাংলাদেশ মুক্ত হবার সময় দেখা গিয়েছিল বাঙালি হিন্দুমুসলমান একই ভাবাবেগের দ্বারা চালিত। একই বাড়িতে বাস করছে। একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করছে। হিন্দুরা মুসলমানদের অর্থ জোগাচ্ছে, অস্ত্র জোগাচ্ছে। কলকাতায় অস্থায়ী সরকার গঠনে সাহায্য করছে। সেই সরকারকে নয় মাস ধরে আশ্রয় দিয়েছে। এর জন্য কোনও প্রতিদান চায়নি। পায়ওনি।

ভবিষ্যতে সে-রকম সঙ্কট আর কখনো ঘটবে না—মনে আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু কিছুই জোর করে বলা যায় না। এপারে যদি কমিউনিজম প্রবল হয়, কতক হিন্দু পরিবার হয়তো বাংলাদেশে গিয়ে নিরাপত্তা চাইবে। বিপরীতটাও হতে পারে। আমাদের সম্পর্ক এমন অবিচ্ছেদ্য যে কান টানলে মাথা আসবেই। বিপদে পড়লে আশ্রয় মিলবেই।

আগে আমার মনে হত যে বঙ্গপ্রদেশ ভাগ ভুলই হয়েছে। কিন্তু তা যদি না হত তবে চল্লিশ বছর পরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অভ্যুত্থান ঘটত না। এটা যদি ঠিক হয়ে থাকে তা হলে ওটাও ঠিক হয়েছে। এখন ভবিষ্যতের কথা ভাবা যাক।

বাংলাদেশ কয়েক বছরের জন্য সেকিউলার রাষ্ট্র হয়েছিল। পরে সংবিধান পাল্টে দেওয়ায় যা হয়েছে তা একটি মুসলিম রাষ্ট্র, অথচ একটি ইসলামিক রাষ্ট্র নয়। ইসলামিক রাষ্ট্র তাকেই বলে শরিয়ত যার সংবিধান, যার অন্য কোনও সংবিধান নেই। মুসলিম রাষ্ট্র সম্বন্ধে সে-কথা বলা চলে না। তার সংবিধান শরিয়তের থেকে ভিন্ন হতে পারে। বাংলাদেশের সংবিধানে নারীকেও পুরুষের সঙ্গে সমান রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া হয়েছে। সে সমানভাবে ভোট দেয়, পার্লামেন্টারি আসনও পায়, দু'জন মহিলা প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। রাষ্ট্রপতি হতেও আইনের বাধা নেই। সুপ্রিম কোর্টে জজ হতেও বাধা নেই। চিফ জাসটিস হতেও বাধা নেই। ইসলামিক রাষ্ট্রে নারীকে ব্যভিচারের দায়ে ঢিল ছুঁড়ে মারার বিধান আছে। পুরুষকে চুরির দায়ে হাত কাটার বিধান। ফৌজদারি আদালতে একজন নারীর সাক্ষ্য সত্য বলে গৃহীত হয় না যতক্ষণ না আরো দু'জন নারীর সাক্ষ্য তার সমর্থন করে। ধর্ষণের মামলায় আরো দু'জন নারীর সাক্ষ্য পাওয়া যাবে কী করে। সাক্ষী থাকলে তো! কাজেই ধর্ষক পুরুষ অব্যাহতি পেয়ে যেতে পারে।

নরনারীর বৈষম্য শরিয়তের অভ্রান্ত বিধান। মৌলবাদীরা তা অক্ষরে অক্ষরে জানেন। বাংলাদেশের সংবিধান এখনো কট্টর মৌলবাদী সংবিধান হয়নি। বলা যায় না, একদিন হতেও পারে। ইরানে হল কী করে! ইরান তো অনেকটা উদার মুসলিম রাষ্ট্র ছিল। অন্তত বর্তমান শতাব্দীতে। ইরানের মৌলবাদী বিপ্লব ইতিমধ্যে পাকিস্তানকে প্রভাবিত করেছে। কালক্রমে বাংলাদেশকেও প্রভাবিত করতে পারে।

স্বাধীনতা কেবল ভালো হবার স্বাধীনতা নয়, তা মন্দ হবারও স্বাধীনতা, কেবল উদার হবার স্বাধীনতা নয়, অনুদার হবারও স্বাধীনতা, কেবল গণতন্ত্রী হবার স্বাধীনতা নয়, অগণতন্ত্রী হবার স্বাধীনতা। কোন জাতি স্বাধীন হয়ে কোন পথ ধরে তা কেউ আগে থেকে বলতে পারে না। গ্যয়টের দেশে হিটলারও জন্মায়। ভারতের মাটিতে বাবরি মসজিদও ভাঙা হয়। সুতরাং স্বাধীন বাংলা কোন পথ ধরবে তা নিয়ে ভবিষ্যৎ-বাণী করা এক প্রকার

বিলাসিতা। একই কথা বলতে পারা যায় পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধেও—যদি সে একদিন স্বাধীন রাষ্ট্র হয়। স্বাধীন রাষ্ট্র হবে না যে তা-ই বা কে বলতে পারে! পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠাতারা কি জানতেন যে এখানে বাইশ বছর ধরে কমিউনিস্টরা সরকার চালাবেন! এবং কংগ্রেসের চেয়ে জনপ্রিয় হবেন। এখন পর্যন্ত তাঁরা ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে রয়েছেন বলেই ভারতীয় সংবিধান মেনে চলছেন। নয়ত তাঁরা লেনিন-পন্থা বা স্টালিন-পন্থা অনুসরণ করতেন। কেন্দ্রে একটা ওলটপালট সম্ভবপর।

বাঙালির ভবিষ্যৎ বলতে আমরা সাধারণত বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভবিষ্যৎ মনে করে থাকি। এই শ্রেণীর মানসিকতায় এখন inferiority complex প্রবেশ করেছে। আগেকার দিনে ছিল superiority complex, কতকটা কলকাতা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী হবার ফলে। কতকটা কলকাতায় বাঙালি ভদ্রলোকদের উদ্‌যোগে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে। কতকটা কলকাতা সামুদ্রিক বাণিজ্যের কেন্দ্র বলে। এমনই অনেকগুলি কারণে বাঙালি মধ্যবিত্তশ্রেণী মস্ত বড় একটি start পেয়ে যায়। সারা উনবিংশ শতাব্দী ধরে সর্বত্র বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তের অগ্রগতি। সেই অগ্রগতি বহাল ছিল রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ পাওয়া পর্যন্ত। তার পরে বাঙালির অনেক প্রতিযোগী জোটে। যেমন রাজনীতির ক্ষেত্রে তেমনই উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে, যেমন সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে তেমনই সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। প্রতিযোগিতায় বাঙালি হটে যাচ্ছে এই ধারণা এখন এই শ্রেণীর মানসে বদ্ধমূল। সকল প্রতিযোগী কেবল দক্ষিণ ভারতীয় হিন্দু কি কেবল উত্তর ভারতীয় হিন্দু কি কেবল ওড়িয়া হিন্দু! সকলেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর।

ব্রিটিশ আমলে তপসিলি হিন্দুর জন্য একটা জায়গা ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। ইদানিং অনগ্রসর হিন্দুদেরও আর একটা জায়গা। ব্রিটিশ আমলে প্রতিযোগিতামূলক সার্ভিসগুলোতে নারীর স্থান ছিল না। এখন মেয়েরাও সফল হয়ে যথাযোগ্য পদ পাচ্ছে। এইসব পরিবর্তনের ফলে বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সেই বাড়বাড়ন্ত নেই। কিন্তু চাকরির সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত এখনো আগেকার দিনের তুলনায় কম সংখ্যক নয়। তবে আগেকার দিনের তুলনায় সংখ্যানুপাতে কম। এই অনুপাত ভবিষ্যতে বাড়তে পারে যদি প্রতিযোগীদের আগে থেকে ভালোভাবে প্রস্তুত করা হয়।

ওকালতি ডাক্তারি ইঞ্জিনিয়ারিং চার্টার্ড-অ্যাকাউন্টেন্সি প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাঙালি এখনো তার স্থান বজায় রেখেছে। তার সঙ্গে এখন যোগ দিয়েছে computer training। সুতরাং হতাশ হবার সময় আসেনি। তা হলেও মধ্যশ্রেণীর হিন্দুকে মনে রাখতে হবে যে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে উচ্চে ওঠার অভিলাষ ক্রমেই ব্যাপক হচ্ছে। বিপ্লব না ঘটতেও পারে, কিন্তু বৈপ্লবিক পরিবর্তন ধীরে ধীরে ঘটতে পারে। যেমন ঘটেছে ইংল্যান্ডে। শ্রমিকশ্রেণী গত ষাট বছরে নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে, নিম্নবিত্ত শ্রেণী মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে, মধ্যবিত্ত পরিণত হয়েছে উচ্চবিত্ত শ্রেণীতে। অথচ এর জন্য রক্তপাত ঘটাতে হয়নি, অভিজাতদের কি বুর্জোয়াদের মাথা কাটতে হয়নি বা তাড়িয়ে দিতে হয়নি। ভারতেও সে-রকম একটি upward mobility কাজ করছে। পোশাক-পরিচ্ছদে সেটা দেখতে পাওয়া যায়। শ্রমিকশ্রেণীর পুরুষেরা এখন সবাই শার্ট ও ট্রাউজার্স পরে। আমার বাড়ির কাজের মেয়েকেও দেখি, প্রত্যেকদিন ভিন্ন রঙের শাড়ি পরে আসতে। শাড়ির নীচে সাদা পেটিকোটও পরে। বলা বাহুল্য ব্লাউজ ও ব্রা-ও পরে। সে তার নিজের টাকাতেই এসব কেনে, স্বামীর টাকাতে নয়। একদা আমি যে

New Womanএর স্বপ্ন দেখতাম এ হচ্ছে সেই নিউ উম্যান। ভবিষ্যতে নিউ উম্যানকেও আমরা বাড়ির বাইরে দেখতে পাব। এরা ট্রাম-বাস-ট্যাক্সি চালাবে। সরকারি ও বেসরকারি চাকরির সর্বস্তরে দেখতে পাওয়া যাবে।

একবার পাসপোর্ট ফোটোর জন্য আমি একটা স্টুডিয়োতে গিয়েছিলুম। পরপর চারটি মেয়ে। একজনের পরনে স্কার্ট, একজনের পরনে জিন্স, একজনের পরনে সালোয়ার-কামিজ ও ভগবানকে ধন্যবাদ যে একজনের পরনে শাড়ি। এঁরাও এসেছিলেন পাসপোর্টের ছবি তোলাবার জন্য। নিশ্চয়ই যাচ্ছিলেন ইউরোপ-আমেরিকায়। বাঙালি মেয়েরা এখন গৃহকোণে বন্দি নন। নদীয়ার মহারানি মহাদেবাকেও আমি চোখে দেখতে পাইনি। তিনি ছিলেন চিকের আড়ালে। সেইখানে বসেই তিনি আমার কাছে তাঁর অভিযোগ ব্যক্ত করেছিলেন। আমি ছিলুম জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। এখন সেই শ্রেণীই লুপ্ত হয়ে গেছে। তাঁদের কন্যারা আর পাঁচজন বাঙালি মেয়ের মতো শাড়ি বা সালোয়ার-কামিজ পরে রাস্তায় বেরোন। এটাও এক প্রকার বৈপ্লবিক পরিবর্তন, যদিও ক্রমে ক্রমে হয়েছে।

ভবিষ্যৎ বলতে এক-আধ শতাব্দী বোঝায় না, বহু শতাব্দী বোঝায়। সুতরাং আমরা অধৈর্য হব কেন? ধৈর্য ধরলে এখন এই inferiority complex নিশ্চয়ই দূর হবে। তবে উনবিংশ শতাব্দীর সেই সোনালি যুগ আর ফিরবে না। সেটা ছিল বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তদের স্বর্ণযুগ।

পঁয়ত্রিশ
বাঙালির ভবিষ্যৎ

অতীতের সঙ্গে বর্তমান ও বর্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যৎ কার্যকারণসূত্রে গ্রথিত। তাই ভবিষ্যতের ভাবনা-ভাবতে বসে অতীতের কথা আবার স্মরণ করতে হচ্ছে। শুধু বাঙালি নয় ভারতবাসী সবাই ছিল ব্রিটিশ রাজের অধীন প্রজা। স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম চলে। মহাত্মা গান্ধী তো তার জন্যে শতবর্ষ জীবিত থাকতে প্রস্তুত ছিলেন, যাতে আরো একবার বা একাধিকবার সংগ্রাম পরিচালনা করতে পারেন। কিন্তু হিটলারের পতনের পর দেখা গেল রুশ সৈন্য জার্মানি তথা পূর্ব বার্লিন দখল করে বসে আছে। সুতরাং পশ্চিম জার্মানি তথা পশ্চিম বার্লিন দখল করার জন্যে ইঙ্গ-মার্কিন ফরাসি সৈন্য চাই। যতদিন না রুশ সৈন্য স্বস্থানে ফিরে যায় ততদিন ইঙ্গ মার্কিন ফরাসি সৈন্যও স্বস্থানে ফিরবে না। কে জানে সেটা হয়তো তাঁদের অগস্ত্য যাত্রা। তা যদি হয় তবে ভারত দখল করে ইংরেজ সৈন্য দূরে পড়ে থাকবে কদ্দিন? হঠাৎ যুদ্ধ বেধে গেলে রুশ সৈন্যের সঙ্গে মোকাবিলা করবে কে? তখন যে তাদের মাতৃভূমি বিপন্ন হবে। অনুরূপ অবস্থায় রোমান সৈন্য ব্রিটেন থেকে অপসারণ করেছিল। তারই পুনরাবৃত্তি ঘটবে। ব্রিটিশ সৈন্য অপসারণ করবে ভারত থেকে।

মহাত্মা গান্ধী তো ১৯৪২ সালেই এর নোটিস দিয়ে রেখেছিলেন। সে সময় ইংরেজ কর্তাদের হোঁশ হয়নি। কিন্তু স্টালিনগ্রাডের পর রুশ সৈন্যের অব্যাহত অগ্রগতি দেখে আমাদের কারো মনে সন্দেহ থাকে না যে জার্মানি ভাগাভাগি হবে। আমরা মানচিত্র সামনে

নিয়ে বসে পার্টিশনের লাইন টানতে শুরু করি। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যদি এড়াতেই হয় তবে কোনো এক জায়গায় লাইন টানতেই হবে। হায়, তখন কি স্বপ্নেও ভেবেছি যে মানচিত্র সামনে রেখে ভারত ভাগ্যবিধাতাও কোন জায়গায় লাইন টানবেন তা ভাবছেন। আমরা বুঝতে পারি যে ইংরেজের মধ্যে যাঁরা দূরদর্শী তাঁদের চেষ্টা হবে ভারতকে স্বাধীনতা দিয়ে নিজেদের শিবিরে সন্ধিসূত্রে আকর্ষণ করা। তা হলে ভারতীয় সৈন্যরা আবার ইউরোপে গিয়ে ইঙ্গ-মার্কিন-ফরাসিদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়বে। এবার সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে। যাতে স্টালিনের পতন ঘটে। ক্রিপস প্রস্তাব তখনকার মতো প্রত্যাহৃত হলেও বরাবরের মতো পরিত্যক্ত হয়নি। সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় সদস্যদের নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার পুনর্গঠিত হলে ও তার হাতে অন্যান্য দফতরের সঙ্গে দেশরক্ষা দফতর ছেড়ে দিলে কংগ্রেস হয়তো তাতে যোগ দিতে রাজি হবে। তবে মুসলিমপ্রধান প্রদেশগুলির বিচ্ছিন্নতার অধিকার মেনে নেওয়া চাই। যদি তারা সেরকম দাবি করে। তার মানে বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ মিলে ইচ্ছা করলে স্বতন্ত্র এক ফেডারেশন গঠন করতে পারবে। ক্রিপস প্রস্তাব নানাকারণে প্রত্যাখ্যাত হয়। প্রধান কারণ মহাত্মা চান না যে ভারত ইংরেজের শিবিরভুক্ত হয়ে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। পরে আবার রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। অমন স্বাধীনতার কী মূল্য যে স্বাধীনতা পরের শিবিরে যোগ দেবার শর্তাধীন? তিনি চান বিনা শর্তে স্বাধীনতা। স্বাধীনতার পরে কয়েকটি প্রদেশ যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে চায় তবে দুই পক্ষ সরাসরি কথাবার্তা বলে নিজেদের মধ্যে ঘরোয়া বন্দোবস্ত হিসাবে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হবে। ইংরেজদের দিয়ে নতুন কোনো কমিউনাল অ্যাওয়ার্ড করিয়ে নেওয়া চলবে না। অর্থাৎ বন্দোবস্ত যেটা হবে সেটা ত্রিপাক্ষিক নয়, দ্বিপাক্ষিক।

ওদিকে কায়দে আজম ঝীণা সাহেবের পলিসি কিন্তু তার বিপরীত। তিনি যা চান তা হচ্ছে হিন্দু মুসলমান এই দুই নেশনে'র মধ্যে বিভক্ত হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান। দুই দিকের পাল্লা সমান ভারী হবে। একদিকে বোম্বাই, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার আর ওড়িশা। অন্যদিকে বাংলা, আসাম, পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ আর বেলুচিস্তান। এদিকেও ছয়, ওদিকেও ছয়। সমান সমান। কেউ যদি বলে, আসাম কবে থেকে মুসলিমপ্রধান প্রদেশ হল, তিনি বলবেন, হতেই হবে। নইলে সমতা থাকবে না। ইংরেজিতে যাকে বলে ব্যালান্স অব পাওয়ার। কেউ যদি বলে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ তো কংগ্রেস শাসিত প্রদেশ, সেখানকার মুসলমানরা লিগপন্থী নয়, তিনি বলবেন, মুসলমান মাত্রেরই এক আল্লা, এক রসুল, এক লিগ, ও এক কায়দে আজম। হিন্দুদের কংগ্রেস মুসলমানদের সংহতি বিনষ্ট করছে। ইসলাম বিপন্ন।

তবে ঝীণা সাহেব কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন করতেও রাজি ছিলেন, কংগ্রেস যদি তাতে রাজি হত তিনি পাকিস্তান দাবি মুলতুবি রাখতেন। কিন্তু তাঁর শর্ত হল প্রাদেশিক মন্ত্রীমণ্ডলগুলিতে লিগপন্থী ব্যতীত অপর কোনো মুসলমান থাকবেন না, হিন্দু মেজরিটির সিদ্ধান্তকে মুসলিম মাইনরিটি যখন ইচ্ছা তখন ভিটো করতে পারবে আর সেটা যে কেবল ধর্মীয় বিষয়ের বেলা তা নয়, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক বা শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ের বেলাও। এরপর কেন্দ্রীয় সরকার পুনর্গঠিত হলে সেক্ষত্রেও একই শর্তে কোয়ালিশন হবে। উপরন্তু আর একটা শর্তও থাকবে। কংগ্রেস ও লিগের ভোটসংখ্যা হবে সমান সমান। আবার সেই

ব্যালান্স অব পাওয়ার। দুই পক্ষের দুই মত হলে ইংরেজ বড়লাট যা বলবেন তাই হবে। তাঁর হাতেও ভিটো থাকবে।

এ ধরনের শর্ত চাপাতে চায় কারা? যাঁরা যুদ্ধে জয়ী হয়ে বিজিত পক্ষকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে তাঁরা। মুসলিম লিগ কি কংগ্রেসকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছে? হ্যাঁ, ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসি মুসলিম প্রার্থীদের অধিকাংশকেই নির্বাচনকেন্দ্রে হারিয়ে দিয়েছে। কেন্দ্রীয় আইনসভার কংগ্রেসি মুসলিম সদস্যদের সংখ্যা একটি কি দুটি। প্রাদেশিক আইন সভায় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কিছু বেশি, অন্যত্র একটি কি দুটি কিংবা শূন্য। নির্বাচনের মূল ইস্যু পাকিস্তান। সুতরাং পাকিস্তানের ম্যান্ডেট পেয়েছে মুসলিম লিগ। আজ হোক কাল হোক একদিন না একদিন ইংরেজ বিদায় নেবেই। বিদায়কালে তার মুসলিম মিত্রদের পাকিস্তান দিয়ে যাবে। তারা তো ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়েনি। লড়েছে কংগ্রেস। শত্রু হয়ে কংগ্রেস যদি হিন্দুস্থান পায় তো মিত্র হয়ে মুসলিম লিগ পাকিস্তান পাবেই। কায়দে আজম এ-বিষয়ে নিশ্চিত। তাই এক এক করে সবরকম আপস প্রস্তাব তিনি নাকচ করে দেন। এমনকি ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাবও। যাতে আসামকে বন্ধনীভুক্ত করা হয়েছিল বাংলার সঙ্গে। ইনটারিম গভর্নমেন্টেও তাঁর দল যাবে না, যেহেতু তাতে একজন কংগ্রেসি মুসলিম থাকবে। সংবিধান সভাও তাঁর দল বয়কট করবে। যেহেতু জবাহরলাল নাকি বলেছেন যে কংগ্রেস কোনরকম শর্তে আবদ্ধ থাকবে না। তাছাড়া এটাও ততদিনে স্পষ্ট হয়েছিল যে সারা ভারতের উপর ইংরেজরাজের উত্তরাধিকারী যদি কংগ্রেসরাজ হয় তবে সারা ভারতে হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়বে, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও বাংলা কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ মান্য করবে না, অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্যে মুসলিম রেজিমেন্ট পাঠানো চলবে না, হিন্দু-শিখ রেজিমেন্ট পাঠালে ও তাদের গুলিতে মুসলমান মারা গেলে মিউটিনি বেধে যাবে। জবাবদিহির দায় এড়াবার জন্যে ইংরেজরা কোনো পক্ষের সঙ্গে বন্দোবস্ত না করে ভগবানের হাতে বা অরাজকতার হাতে ভারতকে সঁপে দিয়ে কুইট করবে। গান্ধীজী যেমনটি চেয়েছিলেন।

সঙ্কটকালে দেখা গেল কংগ্রেস অরাজকতার দায়িত্ব নিতে নারাজ। সর্বনাশ সমুৎপন্ন দেখে পণ্ডিত ও সর্দার অর্ধেক নয়, এক-চতুর্থাংশ ত্যাগ করতে সম্মত হন। তখন যেটা হয় সেটা ডিভাইড অ্যান্ড কুইট। কায়দে আজম যেমনটি চেয়েছিলেন। তবে বাদসাদ দিয়ে তাঁর পরিকল্পিত পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাঞ্জাব ও পশ্চিম বাংলা তথা আসামের অধিকাংশ ত্যাগ করতে হয়। নইলে তাঁকেও অরাজকতার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হত। কিংবা লড়কে লেঙে পাকিস্তানের জিগির তুলে সত্যি সত্যি লড়তে হত হিন্দু-শিখ সৈন্যের সঙ্গে। বিনা যুদ্ধে শিখরা কি সারা পাঞ্জাব ছেড়ে দিত? এদিকে বাঙালি হিন্দুদের সৈন্য না থাকলেও স্টেনগান ছিল, বোমা ছিল, রিভলভার ছিল। কলকাতা তাঁরা কিছুতেই ছেড়ে দিত না। মাইল্ড হিন্দু তখন ওয়াইল্ড হিন্দু। এর জন্য দায়ী লিগের ডাইরেক্ট অ্যাকশন।

মহাত্মা চেষ্টা করেছিলেন বাংলাকে অবিভক্ত রাখতে। তাঁরই পরামর্শে বা তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করেই সুহরাবর্দী সাহেব ও শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় যুক্তবঙ্গের আবেদন নিয়ে দিল্লি যান। মাউন্টব্যাটেন তাঁর পরিকল্পনায় একটা ধারা জুড়ে দেন। বাংলার আইনসভার হিন্দু-মুসলমান সদস্যরা যদি একাত্ম হয়ে বাংলাকে অবিভক্ত রাখতে চান তো বাংলা বিভক্ত হবে না, স্বতন্ত্র একটি রাষ্ট্র হবে। জবাহরলাল তা দেখে বলেন, 'অমন করলে ভারত বলকান হয়ে উঠবে। কংগ্রেসকে আমি কিছুতেই রাজি করাতে পারব না।' মাউন্টব্যাটেন তাঁর প্রস্তাবিত

ধারা বর্জন করেন। বাংলার আইনসভার সদস্যরা একমত হয়ে বাংলাকে দু-ভাগ করার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। একভাগ পড়বে পাকিস্তানে, একভাগ ভারতে। মাস তিনেকের মধ্যে দেশভাগ প্রদেশ-ভাগ সমাপ্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে সংবিধান-ভাগ। যে যার নিজের সংবিধান তৈরি করার স্বাধীনতা পায়। এই স্বাধীনতা প্রয়োগ করে কংগ্রেস নেতারা ভারতকে করেন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। যৌথ নির্বাচন প্রবর্তন করেন। ওয়েটেজ তুলে দেন। সরকারি চাকরি থেকেও সাম্প্রদায়িক কোটা আর ওয়েটেজ উঠে যায়। তার আগে দেশী রাজ্যগুলির অধিকাংশ হয় ভারতভুক্ত। ফলে স্বাধীন ভারতে আয়তন ও জনসংখ্যা হয় পাকিস্তানের পাঁচগুণ। পাকিস্তানিরা যা পায় তা এক-চতুর্থাংশও নয়, এক পঞ্চমাংশ। অবিভক্ত ভারতে মোট মুসলমান সংখ্যা ছিল শতকরা বাইশ। সরকারি চাকরিতে তাদের ভাগ ছিল শতকরা পঁচিশ। আর আইনসভার আসন তার চেয়েও বেশি। এ তো গেল কেন্দ্রীয় স্তরে। প্রাদেশিক স্তরে তারা সর্বত্র লাভবান হয়েছিল। সমস্ত বিসর্জন দিল স্বতন্ত্র ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্যে। তাও তো পরে ভেঙে দু-খানা হল।

ইংরেজরা সময়ের পূর্বেই প্রস্থান করে। তার আগে থেকেই শুরু হয়ে যায় মহাপ্রস্থান পর্ব। তিন সপ্তাহের মধ্যেই পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবে হিন্দু মুসলমান শিখ মিলিয়ে পাঁচ লক্ষ নরনারী ইহলোক থেকে পরলোকে লোকান্তরিত। এককোটি হিন্দু-মুসলমান ও শিখ ঘরবাড়ি জায়গা জমি হারিয়ে দেশান্তরিত। সিন্ধুতে বা পশ্চিম পাঞ্জাবে হিন্দু বলতে বিশেষ কেউ থাকে না। পূর্ব পাঞ্জাবে মুসলমান বলতে বিশেষ কেউ থাকে না। দিল্লিতেও এই জিনিসটি ঘটতে যাচ্ছিল, অতখানি স্বতঃস্ফূর্তভাবে নয়, বেশ সুপরিকল্পিতভাবে। গান্ধীজী জীবন পণ করে বাধা দেন। সুপরিকল্পিতভাবেই নিহত হন। বলপূর্বক লোকবিনিময় বন্ধ হয়। সেই পরিমাণ ধর্মান্ধতা আমাদের এদিকে ছিল না। থাকলে চার সপ্তাহের মধ্যেই পূর্ববঙ্গ হিন্দুশূন্য ও পশ্চিমবঙ্গ তথা বিহার মুসলিমশূন্য হয়ে যেত। আসামে হিন্দু মুসলমান দুপক্ষ সমান বলবান। সুতরাং উভয়পক্ষে বহু লোক নিহত হত। কলকাতার হিন্দুদের নিবৃত্ত করেন গান্ধীজী। তাঁর দৃষ্টান্ত দেখে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের নিবৃত্ত করেন ওপারের বন্ধুরা। পরবর্তীকালে জুনাগড় কাশ্মীর হায়দ্রাবাদ প্রভৃতির পাল্টা দিতে না পেরে পাকিস্তান হিন্দুবিদ্বেষ জাগিয়ে তোলে। তার প্রতিক্রিয়ায় এপারেও মুসলিমবিদ্বেষ নতুন করে জাগে। দুইপক্ষে নিহতের সংখ্যা পাঞ্জাবের মতো না হলেও এপারে চলে আসে মোটামুটি ষাট লক্ষ, ওপারেও চলে যায় মোটামুটি ষাট লক্ষ। বেশির ভাগ উর্দুভাষী। এটাও একপ্রকার লোকবিনিময়, তবে তিন চার সপ্তাহের মধ্যে নয়। পনেরো বিশ বছরের মধ্যে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে নয়। পেছনে ছিল ধর্মান্ধদের বা স্বার্থান্বেষীদের প্রেরণা বা চাপ। এদের বক্তব্য হল, পশ্চিমের মতো পুরোপুরি লোকবিনিময় হল না কেন? হলে নাকি সমস্যাটা চিরকালের মতো মিটে যেত। সেটা হয়নি বলেই রক্ষা, নইলে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ষাট লক্ষ মুসলমানকে উচ্ছেদ করলেও তাঁদের জায়গায় এককোটি তিরিশ লক্ষ হিন্দুকে বসানো যেত না। তাঁদের বসাতে হত বিহারে, মধ্যপ্রদেশে, ওড়িশায়। সেখানে তাঁরা বাংলা ভুলে গিয়ে স্বকীয়তা হারাত বা স্বকীয়তা রাখতে গিয়ে বাঙালিবিরোধী মনোভাব উদ্রেক করত। যেমন করেছে আসামে, মণিপুরে, মেঘালয়ে, ত্রিপুরায়। পশ্চিম পাঞ্জাব ও সিন্ধু থেকে যাঁরা এসেছে তাঁরা চটপট হিন্দি শিখে নিয়েছে ও বেমালুম মিশে গেছে। যেখানে তা পারেনি, সেখানে ভাষা নিয়ে বিরোধ বেধেছে। সে বিরোধ মেটাতে গিয়ে পূর্ব পাঞ্জাবের একটুকরো জুড়ে দেওয়া

হয়েছে হিমাচল প্রদেশে, এক টুকরো কেটে নিয়ে হরিয়ানা হয়েছে। বাকিটুকুকেই বলা হচ্ছে পাঞ্জাবিভাষী। এক পাঞ্জাবি শিখ মিলিটারি অফিসার আমার কাছে আফসোস করেন যে, সিমলা আর তাঁদের নয়। আফসোস তো হবেই। ধর্মান্ধতার জন্যে লাহোর গেল। ভাষান্ধতার জন্যে সিমলা গেল।

আরেক পাঞ্জাবী শিখ অফিসার আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। প্রশ্ন করলে বলেন, 'যা হয়েছে ঠিকই হয়েছে। বরাবরের জন্যে হয়ে চুকেছে। আমরা শিখরা আর সর্বত্র মাইনরিটি নই। একটা রাজ্যে আমরাই মেজরিটি। এতে মনের জোর বাড়ে। সারা ভারতে আমরা শিখরা এখন সর্বঘটে। যেমন আর্মিতে তেমনি সিভিল সার্ভিসগুলিতে তেমনি ব্যবসায় বাণিজ্যে আমরা এখন সুপ্রতিষ্ঠিতও সর্বত্র। কেন আফসোস করব?' আমি তাঁর সেন্টিমেন্টে তা দিই। জন্মভূমির জন্যে মন কেমন করে না? নানকানা সাহেবে ফিরে যেতে ইচ্ছা করে না? তাঁর চোখ ছলছল করে ওঠে। বলেন, 'আমাদের দৈনিক প্রার্থনার পদগুলির সঙ্গে আমার মনে মনে আর একটি পদ জুড়ে দিই। একদিন যেন নানকানা সাহেবে ফিরে যেতে পারি।' অবিকল ইহুদিদের প্রার্থনা। দু'হাজার বছর ধরে ওঁরা প্রার্থনা করে এসেছে যেন জেরুজালেমে ফিরে যেতে পারে। ইতিহাস সে প্রার্থনা অবশেষে পূরণ করেছে।

তেমন কোনো প্রার্থনা কি পূর্ববঙ্গ থেকে চলে আসা হিন্দুদের অন্তরে রয়েছে? তাঁরাই জানেন। আমি এইটুকু জানি যে পূর্ব পাকিস্তান যেদিন মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপ দেয় এঁরাও সেদিন ধর্মীয় বিরোধ ভুলে যান ও যোদ্ধাদের আশ্রয় দেন, অর্থ দেন, অস্ত্র দেন। তাঁরা যেদিন মুক্ত হয়ে দেশে ফিরে যান এঁরাও সঙ্গে সঙ্গে যান ঘরবাড়ি জায়গা জমি ফিরে পাবার প্রত্যাশায়। কিন্তু গিয়ে দেখেন সব বেদখল হয়েছে। এক দেশের নাগরিক হয়ে অন্য দেশের নাগরিকের সঙ্গে মোকদ্দমা করে সম্পত্তি উদ্ধার করা কি সম্ভব? নয়া সরকার অসহায়। তখন স্বাধীন বাংলাদেশের উপরেই এঁদের অশ্রদ্ধা জন্মে যায়। লোকগুলো কী অকৃতজ্ঞ! নেতারাও কী বেইমান! বাস্তবিক, বাংলাদেশের পশ্চাদ্ অপসরণ সেই সময় থেকেই শুরু। হিন্দুর প্রত্যাবর্তন রোধ করে তার সম্পত্তি ভোগ করার এই তো মোক্ষম উপায়। শুরু হয় বাংলাদেশের ইসলামের দিকে মোড় ফেরা। এবার সে পূর্ব পাকিস্তান নয়, সে এখন 'পাক বাংলা' বা 'মুসলিম বাংলা'। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান সাহেব আমাদের যা বলেছিলেন। তিনি গোড়া থেকেই ছিলেন যুক্তবঙ্গের পক্ষপাতী। বারো কোটি বাঙালি এক হলে কী না করতে পারে? পৃথিবী জয় করতে পারে। কিন্তু তা যখন হল না, কংগ্রেস বা লিগ কেউ তাতে রাজি নয়, তখন তিনি কলকাতা থেকে পূর্ববঙ্গ ফিরে যান ও বাংলা ভাষার নামে আন্দোলনে নামেন। আন্দোলন ভাষার নামে শুরু হলেও স্বাধিকারের জন্যে আন্দোলন। আন্দোলনে সাফল্যের আশা বুঝতে পেরে নেতা তাঁর অনুগামীদের শুধান, 'আমাদের এই দেশের নাম কী হবে?' এর উত্তরে কেউ বলেন, 'পূর্ব বাংলা'। কেউ বলেন, 'পাক বাংলা'। নেতা তা শুনে বলেন, 'না বাংলাদেশ।'

এরপরে তিনি শুধান, 'আমাদের জয়ধ্বনি কী হবে?' কেউ বলতে পারে না। তখন তিনি বলেন, 'আমাদের ধ্বনি হবে জয় বাংলা।' তা শুনে তাঁর অনুগামীদের কেউ কেউ উপহাস করেন। বলেন, 'জয় বাংলা না জয় মা কালী'। ওঁরা তাঁকে ভুল বুঝেছিলেন। বাংলা বলতে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন বাংলাদেশ, বাংলাভাষা ও বাঙালি জাতি। তিনটেই ছিল তাঁর কাছে সত্য। কিন্তু বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমান মিলে যে এক জাতি এ সত্য বহু

পূর্বেই তাঁর অনুগামীদের কারো কারো কাছে অসহ্য হয়ে গেছে। হিন্দুকে তাঁরা সঙ্গে নিতে চান না, অথচ হিন্দুকে বাদ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ চালানো যায় না। 'জয় বাংলা' ধ্বনি হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে মুক্তিযোদ্ধাদের সবাইকে রক্তদানের প্রেরণা জোগায়। ত্রিশ লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করে। তাঁরা সবাই যে মুসলমান তা নয়। খান সেনা কাউকে রেয়াত করেনি। হিন্দুদের উপরেই তাদের রাগ বেশি। যেহেতু তাঁরা পৌত্তলিক। রমনার সেই প্রসিদ্ধ কালীবাড়ি তো ধ্বংস হয়ই আরো অনেক মন্দির ধ্বংসের খবরও পরে আমার কানে আসে। এটাও কি প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার চেয়ে কোনো অংশে কম ত্যাগ? এসব প্রাচীন কীর্তি আর পুনর্গঠিত হবে না। হলেও তাদের সে মহিমা থাকবে না। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে মসজিদ মন্দির সব প্রাচীন কীর্তিই সকলের উত্তরাধিকার।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর আমি চারবার আমন্ত্রিত হয়েছি। প্রথমবার একবছর বাদে। 'জয় বাংলা' ধ্বনি ক্ষীণ হয়ে এসেছে। তবু শোনা গেছে। দ্বিতীয়বার যাই চোদ্দ মাস পরে। বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণের শেষে ধ্বনি দেন 'জয় বাংলা।' আর কারো কণ্ঠে তার প্রতিধ্বনি শুনেছি বলে মনে পড়ে না। তৃতীয়বার যাই আরো একবছর বাদে। তখন সকলের মুখে ইমারজেন্সির কালো ছায়া। কোথায় 'জয় বাংলা'। অনুভব করি যে পাঁচবছর যেতে না যেতেই তার প্রেরণা নিঃশেষ হয়েছে। কিন্তু তখনো আমি অনুমান করতে পারিনি যে সঙ্গে সঙ্গে তার উদ্‌গাতার পরমায়ুও নিঃশেষ। অনেকেই ভেবেছিলেন যে এরপর পতাকা বদলে যাবে, জাতীয় সঙ্গীত বদলে যাবে, দেশের নাম বদলে যাবে, এমন কি যৌথ নির্বাচনও উঠে যাবে। না, তেমন বিপর্যয় এখনো ঘটেনি। যাবার মধ্যে গেছে ধর্মনিরপেক্ষতা। তার সম্বন্ধে আমি নিজেই তো সন্ধিহান ছিলুম। আমার তখনকার লেখাতেই তার উল্লেখ রয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতা ধোপে টেকেনি, গণতন্ত্রও ধোপে টেকেনি, সমাজতন্ত্রও ধোপে টেকেনি। কেবল জাতীয়তাবাদ এখনো টিকে। তবে সেটা বোধহয় বাঙালি জাতীয়তাবাদ নয়। মুসলিম বাংলার মুসলিম বাঙালি জাতীয়তাবাদ।

আমার ঢাকার বন্ধুরা আমাকে শুধান, 'বাঙালিদের এই রাষ্ট্রে পশ্চিমবঙ্গ কেন যোগ দেয় না? তাহলে তো বারো কোটি বাঙালি এক হয়ে যুক্তবঙ্গ রচনা করত। সেটা কি আপনারা চান না?' এর উত্তরে আমি বলি, 'যুক্তবঙ্গ যদি ভারতের বাইরে হয় তবে পশ্চিমবঙ্গ তাতে রাজি হবে না, কারণ আপনারা যেমন বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্যে লড়েছেন, আমরাও তেমনি ভারতের স্বাধীনতার জন্যে লড়েছি। পরে সংবিধান রচনা করেছি, সে সংবিধানে বিচ্ছিন্নতা নিষেধ। অপরপক্ষে, পাকিস্তানের তো কোনো সংবিধানই হয়নি, ইয়াহিয়া খান হতে দেননি, আপনাদের কেস আলাদা।' বিচ্ছিন্ন হলে আর যোগদানের প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া বাংলাদেশ এখন মুসলিম বাংলা। বিশ্ব মুসলিম সম্মিলনীর সদস্য। তারসঙ্গে যোগদান অসম্ভব। ভারতভুক্ত বাঙালি এখন সংখ্যায় চার কোটি। হিন্দিভাষীদের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। অথচ বাংলা হল বারো কোটি মানুষের ভাষা। এশিয়ায় সে তৃতীয় স্থানের অধিকারী, পৃথিবীতে পঞ্চম স্থানের। চীনা, ইংরেজি, রাশিয়ান, হিন্দি, বাংলা এই পাঁচটিই প্রধান ভাষা। স্প্যানিশ, জার্মান, জাপানি, ইন্দোনেশিয়ান বা মালয় এগুলিও বাংলার কাছাকাছি যায়। হয়তো ইতিমধ্যে তাকে অতিক্রম করেছে, আমি জানিনে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আসামকে আতঙ্কিত করে। বছর সাত-আট আগে এক অসমিয়া অধ্যাপক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে বলেন, 'আপনারা বাংলাদেশ পেয়েছেন,

পশ্চিমবঙ্গ পেয়েছেন, ত্রিপুরাও পেয়েছেন, আসামকেও পেতে চান। আপনাদের সংখ্যা বারো কোটি। আমাদের সংখ্যা এক কোটিও নয়। আমরা কি তবে বৃহত্তর বঙ্গের সামিল হব?' আমি তাঁকে বলি যে আমাদের তেমন কোনো অভিসন্ধি নেই। তিনি ভারতীয় সংবিধানকে সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুরূপ করতে চান। আসাম তা হলে হবে স্বতন্ত্র এক রেপাবলিক। বিনা পাশপোর্ট ভিসায় বহিরাগতদের ঢুকতে দেবে না। যাঁরা ঢুকেছে তাদের তাড়াতে পারবে। আমি কিন্তু ভারতীয় ইউনিয়নের আওতার মধ্যে একরাশ রেপাবলিকের অস্তিত্ব সমর্থন করিনে। ভারত একটাই নেশন, একরাশ নেশনের সমবায় নয়।

বাঙালিরা যেদিক থেকেই আসুক না কেন—বাংলাদেশের দিক থেকে বা পশ্চিমবঙ্গের দিক থেকে—তাদের সংখ্যাধিক্য ঘটলে অসমিয়ারা সংখ্যালঘু হবে ও তাদের 'আইডেনটিটি' লোপ পাবে। অতএব 'বিদেশী নাগরিকদের' বহিষ্কার চাই। আপাতত এই পর্যন্ত দাবি করা হচ্ছে। এর পরের ধাপ 'বহিরাগতদের' আগমন রোধ। বলাবাহুল্য 'বিদেশী নাগরিক' বলতে প্রধানত বাঙালিদেরও বোঝায়। 'বহিরাগত' বললেও প্রধানত তাঁরাই। অসমিয়াদের আইডেনটিটি বিপন্ন। ভারত যদি বাঙালিদের হাত থেকে অসমীয়াদের রক্ষা না করে তবে তাঁরা হয়তো একদিন বাংলাদেশের অনুকরণে ছয় দফা দাবি পেশ করবে ও দাবি না-মঞ্জুর হলে বিচ্ছিন্নতার জন্যে লড়বে। শ'খানেক বছরের বাঙালি প্রাধান্যের স্মৃতি তাদের মনের উপর কাজ করছে। বাঙালিদের সদিচ্ছার প্রতি তারা সন্দিহান। দুই পক্ষই ভারতীয়, তবে জুজুর ভয়। বাংলাদেশ ভয়ানক, সেখান থেকে হিন্দু শরণার্থী আর চাষী মুসলমান ঢুকছে। পশ্চিমবঙ্গ ভয়ানক, সেখান থেকে ভারত সরকারের কর্মচারী ঢুকছে। ভারত ভয়ানক। তার সৈন্য সামন্ত ভয়ানক। এই .. সর্বব্যাপী ভয়ের থেকে পরিত্রাণ চাই। এটাই আসাম আন্দোলনের সার কথা। অসমিয়াদের অভয় না দিলে তাঁরা বাঙালিবিরোধী থেকে ভারতবিরোধী হয়ে উঠবে।

তিন পুরুষ ধরে আসামে বসবাস করছেন এরূপ এক বাঙালির সঙ্গে সেদিন আলাপ হল। তিনি বললেন, 'এ সমস্যার কোনো সমাধান নেই। এটা সমাধানের অতীত। গৃহযুদ্ধের জন্যে তৈরি হতে হবে।' অর্থাৎ সম্পত্তির মায়া কাটিয়ে বাঙালিরা চলে আসবে না। মারবে ও মরবে। তাঁরাও তো চল্লিশ-পঞ্চাশ লক্ষ। এই কথাটাই আরেকজন বাঙালির মুখে শুনেছিলুম বছর খানেক আগে। তিনি বলেছিলেন, 'পালিয়ে গেলে আমি থাকবার জায়গা পাব, জানি। কিন্তু আমাকে চাকরি দেবে কে? তাই আমরা লড়বার জন্যেই তৈরি হচ্ছি।' সমস্যাটা যদি সত্যিই সমাধানের অতীত হয়ে থাকে তবে হয় গৃহযুদ্ধ, নয় দেশ ভাগ বা রাজ্য ভাগ। পরিস্থিতিটা ক্রমেই ১৯৪৬ সালের অনুরূপ হয়ে উঠছে। সমাধানের জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা চাই।

'বাঙালিরা বারো কোটি, অসমিয়ারা এক কোটিও নয়' এই মনোবৃত্তি যদি দুই পক্ষে বদ্ধমূল হয় তবে সব চেষ্টাই ব্যর্থ হবে। বাঙালিরাও যে এর থেকে মুক্ত তাই বা কেমন করে বলি? জার্মানদের মধ্যেও এই মনোবৃত্তি বদ্ধমূল ছিল। তার পরিণাম কী হয়েছে সকলেই জানে। প্রথমত, অস্ট্রিয়াকে আবার পৃথক করে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত, জার্মানিকে পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানি এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে যাতে ওঁরা এক না হয় তার জন্যে দুই রাষ্ট্রের এলাকা দখল করে রয়েছে বিদেশী সৈন্য। তৃতীয়ত, পোল্যান্ড থেকে, চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে, বালটিক উপকূল থেকে জার্মানদের সবাইকে বহিষ্কার করা হয়েছে। সেসব অঞ্চলের মালিক

এখন পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া ও রাশিয়া। বৃহত্তর জার্মানি তাই ত্রিভঙ্গ। জার্মানদের রাজধানী বার্লিনটাও দ্বিভঙ্গ। তবে অপর রাজধানী ভিয়েনা অভগ্ন। জার্মানদের চিরকালের স্বপ্ন পূর্ণ হল না। যতদূর মনে হয় এই বন্দোবস্তই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। যেমন ঘটেছিল দেড়শো বছর ধরে পোল্যান্ডের বেলা। তাকে তিন প্রতিবেশী মিলে তিন ভাগে ভাগ করে নিয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর পোল্যান্ড আবার জোড়া লাগে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় দু'ভাগ হয়। পরে রাশিয়া তার একাংশ কেটে রাখে ও পরিবর্তে জার্মানির একাংশ কেটে নিয়ে পোল্যান্ডকে দেয়। রাশিয়ার অধিকৃত অংশ থেকে পোলরা বহিষ্কৃত হয়। যদিও তারা রাশিয়ানদের মতোই কমিউনিস্ট। কমিউনিস্টরাও বুর্জোয়াদের মতোই ন্যাশনালিস্ট এটা তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

ন্যাশনালিজম নেপোলিয়ানের দ্বিগ্বিজয়ের সময় থেকেই ইউরোপের সর্বত্র জাগ্রত হয়েছে ও জাগ্রত রয়েছে। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র ছিল বহুভাষী। ন্যাশনালিজমের কল্যাণে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র ক্রমশ অচল হয়। সেটা একদিক থেকে বিরাট ক্ষতি, অপরদিক থেকে বিরাট লাভ। ক্রমশ গড়ে ওঠে এক এক করে ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র। কিন্তু ভাষা অনুসারে নেশন ও নেশন অনুসারে রাষ্ট্র গঠিত হলে সব রাষ্ট্রের জনবল বা ধনবল সমান হয় না। বাহুবলেরও তারতম্য ঘটে। রেষারেষি বাড়ে। নেশনরা পরস্পরের বিরুদ্ধে জোটবন্দি হয়। ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র থেকেও বাধে যুদ্ধবিগ্রহ। যেমন ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র থেকে। তা সত্ত্বেও এটা ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্রেরই যুগ। দ্বিভাষী রাষ্ট্রও ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র। তাদের কারো কারো ভিতরেও একভাষাভিত্তিক আন্দোলন শুরু হয়েছে। যেমন কানাডায় ও বেলজিয়ামে।

আমাদের এই ভারতীয় ইউনিয়ন পৃথিবীতে অভিনব। এই রাষ্ট্র ভাষার দিক থেকে বহুভাষী আর ধর্মের দিক থেকে ধর্মনিরপেক্ষ। বহুধর্মী ও ধর্মনিরপেক্ষ একই জিনিস নয়। আমাদের স্বপ্ন ছিল আমরা বহুধর্ম রাষ্ট্র গঠন করব, কিন্তু বেশির ভাগ মুসলমান পৃথক হয়ে যাওয়ায় দেশভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নভঙ্গ হয়। তার বদলে আমরা নতুন এক স্বপ্ন দেখছি। সে স্বপ্ন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের। যাঁরা ধর্ম মানে না, অবতার মানে না, ব্রাহ্মণ মানে না তাঁরাও এ রাষ্ট্রের প্রথম শ্রেণীর নাগরিক হতে পারে ও সমান সুযোগ সুবিধা পেতে পারে। দায়িত্বও তেমনি সমান। প্রয়োজন হলে দেশের জন্য প্রাণ দিতে হবে। যোগ্য হলে ও বিশ্বাসভাজন হলে তাঁদের একজন রাষ্ট্রপতি বা সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বা সেনাপতি হতে পারেন। কাউকেই জিজ্ঞাসা করা হবে না তাঁর ধর্ম কী। জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দিতে বাধ্য নন।

এমন যে রাষ্ট্র এটি ধর্মনিরপেক্ষতার দিক থেকে অদ্বিতীয় নয়, কিন্তু ভাষা সংখ্যার দিক থেকে একেবারে অদ্বিতীয়। এখন আসাম যদি ভাষাগত কারণে ভারতীয় ইউনিয়ন থেকে বিদায় নেয় তা হলে সেই একই কারণে আরো কয়েকটি রাজ্যও বিদায় নিতে পারে। বিদেশী নাগরিক হয়তো সব ক'টি রাজ্যে যায় না কিন্তু স্বদেশী নাগরিক তো যায়। তাঁদের যদি 'বহিরাগত' বলে বহিষ্কার করা হয় বা বাইরে রাখা হয় তবে তেমন 'বহিরাগত' কোন্ রাজ্যেই বা নেই? আজকাল প্রত্যেকটি রাজ্যেই কলকারখানা স্থাপন করা হচ্ছে। খনি থেকে তেল উদ্ধার করা হচ্ছে, লোহা উদ্ধার করা হচ্ছে, কয়লা উদ্ধার করা হচ্ছে। স্থানীয় অধিবাসীদের দিয়ে সব কাজ করানো কি সম্ভব? বহিরাগতদের বর্জন করলে তো রাজ্যের সম্পদ বৃদ্ধি হবে না। সম্পদ না বাড়লে স্থানীয় অধিবাসীরা সম্পদের ভাগ পাবে কী করে? বাঙালি ইঞ্জিনিয়ার আসামে গিয়ে যে মাইনে পান তার বেশিরভাগ তো খরচ করেন আসামে। অসমীয়ারই একভাগে না একভাগে তার থেকে লাভবান হয়।

ধর্মের প্রশ্নে পাকিস্তান আলাদা হয়ে যাওয়ায় আমাদের বহুধর্মী রাষ্ট্রের স্বপ্নভঙ্গ হয়। ভাষার প্রশ্নে আসাম যদি বেরিয়ে যায় ও তার অনুষঙ্গে মেঘালয়, মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড ও অরুণাচল, তা হলে তো আমাদের বহুভাষী রাষ্ট্রেরও স্বপ্নভঙ্গ হয়। অনেকেই হয়তো থেকে যাবে, কিন্তু সেই অনেককে নিয়ে তো ইন্ডিয়া বলে পরিচয় দেওয়া যায় না। সবাই মিলে আমাদের যে আইডেনটিটি সেটার সংজ্ঞা সঙ্গে সঙ্গে বদলে যাবে কিন্তু বদলে গিয়ে কী হবে তা কেউ বলতে পারবেন কি? অসমীয়াদের কাছে তাদের আইডেনটিটি যেমন গুরুতর তেমনি ভারতীয় বলে যাদের পরিচয় তাদের কাছে তাদের আইডেনটিটি তার চেয়েও গুরুতর। অসমীয়াদের পায়ের তলায় থাকবে ভাষার ভিত্তি। ভারতীয়দের পায়ের তলায় থাকবে কিসের ভিত্তি? হিন্দিভাষীদের সংখ্যানুপাত আরো কমে যাবে।

আচার্য সুনীতিকুমার একদা হিন্দি একাধিপত্যের প্রচণ্ড সমর্থক ছিলেন, পরে তেমনি প্রচণ্ড বিরোধী। বাইরে কেমন ছিলেন বলতে পারব না, ঘরে কিন্তু আমাদের সঙ্গে কথাবার্তায় হিন্দি সার্বভৌমতার প্রবল প্রতিপক্ষ। একবার কথা ওঠে ভারতীয় একতার খাতিরে বাংলাও কি দেবনাগরী লিপিতে ছাপা হবে? তিনি বলেন, 'না। তাহলে পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র ছিন্ন হবে।' অথচ আমি যতদূর জানি ভারতীয় সংবিধান যখন বাংলায় প্রথমবার তর্জমা হয় তখন সেটি নাকি ছাপা হয় দেবনাগরী লিপিতে আচার্য সুনীতিকুমারের পরামর্শে। সে বই আমরা কেউ কোনোদিন দেখিনি। না দেখলে, না পড়লে জাতীয় একতা হবে কী করে?

ইংরেজ চলে গেলে তার শূন্যস্থান পূরণ করবে হিন্দু। এই চিন্তার পরিণাম কী হল তা সকলেই জানেন। ইংরেজি উঠে গেলে তার শূন্যস্থান পূরণ করবে হিন্দি। এই চিন্তারও পরিণাম কী হবে তা অনুমান করা শক্ত নয়, যদি বাংলাদেশের দিকে তাকাই। সেখানেও ইংরেজির শূন্যস্থান পূরণ করার অভিপ্রায় ছিল উর্দুকে দিয়ে। সেখানকার বাংলাভাষীরা বিদ্রোহী হয়ে সেটল্ড ফ্যাক্টকে আনসেটল করে। এখানেও একই অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে একই বিদ্রোহী ভাব। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইংরেজির শূন্যস্থান অন্যান্য বিষয় দিয়ে পূরণের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তার বিরুদ্ধে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের অনেক বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। আশ্চর্য ব্যাপার। একজন আমাকে বলেন, 'বুঝতে পারছেন না? এই ফাঁকে হিন্দি এসে হাজির হবে ইংরেজির শূন্যস্থান পূরণ করতে। তখন তাকে রোধ করবে কে?' হিন্দিকে ইংরেজির শূন্যস্থানে বসাতে হবে, এটাই তো ভারত রাষ্ট্রে সরকারি নীতি। তার জন্যে প্রথমেই প্রয়োজন হয় শূন্যতার। শূন্যতার নীতি অমান্য করবেন কী করে?

চাকুরিজীবী বাঙালির কাছে ইংরেজি হচ্ছে জীবনমরণের প্রশ্ন। তাই আজকাল ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের এমন ছড়াছড়ি। এসব বিদ্যালয়ে কিন্ডারগার্টেন ক্লাস থেকেই ইংরেজি শেখানো শুরু হয়ে যায়। এইসব ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক স্তরে হিন্দিও শেখানো হয়। অভিভাবকরাই চান যে হাতের পাঁচ হিসাবে হিন্দিটাও যেন জানা থাকে। ইংরেজির পরেই হিন্দি। হিন্দির পরে বাংলা। হিন্দির বিপক্ষে কেউ নয়। অথচ ইংরেজির স্বপক্ষে সবাই। বাংলা সম্বন্ধে অভিভাবকদের ধারণা আগে যা ছিল এখনো তাই। 'বাংলা? তো বাড়িতেই শিখছে। ওর জন্যে আবার বিদ্যালয়ে যেতে হয় নাকি?' ফলে বাংলাই সবচেয়ে অবহেলিত। বাংলার এম.এ. শুনলে কেউ মেয়ের বিয়ে দিতে চায় না। গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না যদি না সে জনপ্রিয় উপন্যাস লিখে লক্ষ্মীমন্ত হয়। কিংবা রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে নেমে রাজ্যের

ভাগ্যবিধাতা হয়।

আমরা যতদূর দেখতে পাচ্ছি ইংরেজ চলে গেলেও ইংরেজি এদেশে থাকতে এসেছে। এর একটা মস্তবড় কারণ হচ্ছে এটা বিজ্ঞান আর টেকনোলজির যুগ। আধুনিকতম প্রামাণিক গ্রন্থগুলির জন্যে ইংরেজির শরণ নিতে হয়। তাছাড়া উচ্চতর শিক্ষার জন্যে বিদেশে না গেলে চলে না। আমাদের হিন্দিভাষী ভ্রাতারাও ইংরেজি-মাধ্যম স্কুলে পুত্রদের পড়াচ্ছেন। ভর্তির জন্যে যখন লাইন পড়ে তখন এমন দৃশ্যও দেখা যায় যে বাঙালিকে গায়ের জোরে ঠেলে রাজস্থানি এগিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর পুত্র বড়ো হয়ে কমার্স পড়বে। তারপরে ম্যানেজমেন্টে যাবে। ব্যবসাবাণিজ্যেও ইংরেজির কদর। সেক্ষেত্রে ইংরেজের শূন্যস্থানে বসছেন সাধারণত রাজস্থানি বা গুজরাটি। কিন্তু এঁরাও ইংরেজিতে কারবার করতে উৎসুক।

তারপর ইংরেজি এই বহুভাষী দেশের যোগাযোগের ভাষা হয়ে উত্তরের সঙ্গে দক্ষিণকে ও পূর্বের সঙ্গে পশ্চিমকে বেঁধেছে। দক্ষিণীরা তাকে ছেড়ে হিন্দিকে ধরতে নারাজ। নাগা মিজো গারো খাসিরা তাকে ছেড়ে হিন্দিকে ধরতে অনিচ্ছুক। বাঙালিই একমাত্র ইংরেজিনবীশ নয়। তবে পাঁচ পুরুষ ধরে ইংরেজি শিখে আসছে বলে সারা ভারতে তার একটা বনেদি আসন। ইংরেজ, ইংরেজের পরেই বাঙালি বা পার্সি। আই.সি.এস. পরীক্ষার সূত্রপাতের সময় থেকেই পার্সি আর বাঙালি হয়েছে অগ্রণী। প্রথম পরীক্ষার্থী ছিলেন পার্সি। তিনি বিফল হন। দ্বিতীয় পরীক্ষার্থী বাঙালি। তিনি সফল হন। ব্যারিস্টারিতেও তেমনি পার্সি আর বাঙালি। বাঙালিরাই বড়লাটের শাসন পরিষদের আইন সদস্য হতেন বার বার। দক্ষিণের ওঁরাও ইংরেজিনবীশ বলে নাম করেছেন। উচ্চপদ পেয়েছেন। দক্ষিণেও ইংরেজি শিক্ষার বনেদ অতি গভীর। বাঙালিও একদিন বামপন্থীদের চাপে ইংরেজি ছাড়তে পারে। কিন্তু তামিলরা কখনো ছাড়বে না। আর ছাড়বে না নাগা মিজো গারো খাসিরা। বহু ভাষিকতা যদি আমাদের রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হয়ে থাকে তবে বহুভাষার মধ্যে ইংরেজিও অন্যতম। তাকে বাদ দিলে আবার সেই আইডেনটিটির সংজ্ঞা নিয়ে তর্ক উঠবে। জাতীয়তাবাদীদের অভিমানে বাধবে, কমিউনিস্টদের তত্ত্বজ্ঞানে বাধবে, হিন্দিভাষীদের মর্যাদায় বাধবে, তা সত্ত্বেও ইংরেজি এদেশে থাকতে এসেছে। যেমন এসেছে আরবি-ফারসির ধারাবাহী উর্দু। ইংরেজির শূন্যতা হলে তো শূন্যতা পূরণের প্রশ্ন উঠবে। শূন্যতা হতে দিচ্ছে যাঁরা দিক, কিন্তু এ রাজ্যের লোক হতে দেবে না। এমনি আরো কয়েকটি রাজ্যের লোকও হতে দেবে না। জবাহরলাল তো প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছেন যে এঁরা যতদিন না সম্মতি দিচ্ছে ইংরেজি ততদিন সরকারি কাজকর্মে বহাল থাকবে। ইংরেজদের বা আমেরিকানদের ইচ্ছায় নয়, তথাকথিত অনার্যদের ইচ্ছায়। সংস্কৃত ও হিন্দি তাঁদের কাছে ইংরেজির চেয়ে কম বিজাতীয় নয়।

কায়ার স্বাধীনতা, মনের স্বাধীনতা, বাক্যের স্বাধীনতা, বিবেকের স্বাধীনতা, বিশ্বাসের স্বাধীনতার মতো শিক্ষার স্বাধীনতাও মানুষের একটি মৌল স্বাধীনতা বা অধিকার। সেইজন্য এখনো এদেশে সংস্কৃত টোল ও আরবি-ফারসি মাদ্রাসা রয়েছে। তাদের অস্তিত্ব যদি বিতর্কের অতীত হয় তবে ইংরেজি স্কুল কলেজ নিয়ে এত বিতর্ক কেন? কেনই বা এক্ষেত্রে সরকার হস্তক্ষেপ করবেন, বা আইনসভা হস্তক্ষেপ করবেন? এক্ষেত্রে মেজরিটির ইচ্ছাই একমাত্র নিয়ামক নয়। মেজরিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়। ছাত্রদলকে আজকাল ইউনিফর্ম পরানোর চল হয়েছে। যেকোনো স্কুলে গেলে পাওয়া যায় ছাত্র বা ছাত্রদের একই পোশাক। শৃঙ্খলার দিক থেকে এর একটা মূল্য আছে। কিন্তু এ নিয়ম কি শিক্ষণীয় বিষয়

তথা শিক্ষার সম্বন্ধেও মূল্যবান? বাঙালির ছেলে যদি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান স্কুলে পড়তে যায় তা হলে সেটা কি আইন অনুসারে নিষিদ্ধ হতে পারে? সেই ধাঁচের স্কুল যদি বাঙালিরাই স্থাপন করেন ও সেসব স্কুলে যদি বাঙালির ছেলেমেয়েরা পড়তে যায় সেটা কি বেআইনি হতে পারে? সরকারি স্কুল থেকে ইংরেজি উঠে যাচ্ছে শুনে বেসরকারি স্কুলে এখন ছাত্র-ছাত্রীর ভিড় বাড়ছে। বেসরকারি স্কুলের বিভাগ বাড়ছে, সংখ্যা বাড়ছে। এই যে চাহিদা এটাকে কৃত্রিম উপায়ে রোধ করা উচিত নয়। করলে এক রাজ্যের ছাত্র অন্য রাজ্যে পড়তে যাবে। এক রাষ্ট্রের ছাত্র অন্য রাষ্ট্রে পড়তে যাবে। বাংলাদেশ থেকে ছাত্ররা আসে পশ্চিম-বঙ্গের দার্জিলিং-এ পড়তে, আসাম থেকে ছাত্ররা আসে নরেন্দ্রপুরে পড়তে। চাহিদা অনুসারে জোগান এটাই তো নিয়ম। জোর করে ইউনিফর্ম পরানোর মতো ইউনিফর্ম শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তন করলে যে যেখানে পারে পালাবে। যদি জায়গা পায় ভর্তি হবে। ভারতের সংবিধান শিক্ষাকে রাজ্য সরকারের অধীন করেছে বলে রাজ্য সরকার যা খুশি করলে বাধ্য হয়ে আদালতের আশ্রয় নিতে হবে। সুপ্রিম কোর্ট কিছুকাল আগে ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে রুলিং দিয়েছেন। সেটা যদি স্কুল বা কলেজ কর্তৃপক্ষ আবশ্যিক মনে করেন।

সরকারি স্কুল কলেজে সরকার নিজের ইচ্ছা খাটাতে পারেন, কিন্তু এখনো এদেশে যাবতীয় স্কুল কলেজ সরকারি হয়নি। যারা সরকারি আনুকূল্য চায় না তাদের অস্তিত্বে আপত্তি করা উচিত নয়। ধর্মান্ধতার মতো এটাও একপ্রকার অন্ধতা। ভাষান্ধতা বা মতবাদান্ধতা। আপত্তি যাঁরা করছেন তাঁরা হয় ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী, নয় একপ্রকার না একপ্রকার সাম্যবাদী। এই পর্যায়ে গান্ধীপন্থী মার্কসপন্থী ও মাওপন্থীরাও পড়েন। এঁরা প্রতিকূল হলে সাম্যের দোহাই দিয়ে একদিন হয়তো বেসরকারি স্কুল-কলেজ থেকেও ইংরেজির পাট উঠে যাবে। মাধ্যমে হিসেবে তো বটেই শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবেও। পুরোপুরি উঠে যাবে না হয়তো। কিন্তু সেটুকুতে অগ্রসর ছাত্রদের জ্ঞানের চাহিদা মিটবে না। চীনদেশের সাংস্কৃতিক বিপ্লব দেখা দেবে। যারা অগ্রসর নয় তারা আর কাউকে অগ্রসর হতে দেবে না। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেবে। উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থাটাই বানচাল করবে। তুমি কেন উপরে উঠবে, আমি যদি না উঠি?

অপরপক্ষে এটাও আমি ন্যায়সঙ্গত মনে করিনে যে যারা ইংরেজি শিখতে চায় না বা ইংরেজিতে বার বার ফেল করে তাদের উপরেও ইংরেজি চাপাতে হবে। আমার মতে ইংরেজি হবে ঐচ্ছিক, কোনোটাতেই আবশ্যিক নয়। যারা শিখবে তারা কষ্ট করেই শিখবে। ফেল করলে নাম কাটা যাবে। শিক্ষকদেরও ট্রেনিং নিতে হবে। ফেল করলে তাঁরাও ছাঁটাই হবেন। নমো নমো করে সবাইকে ইংরেজিনবীশ করতে গেলে অযোগ্যতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। নমো নমো করে সবাইকে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তরেও তুলে দেওয়া উচিত নয়, আরো উপরে তো নয়ই।

উপরে যাঁদের কথা বলা হল তারা বিশ্বের বারো কোটি বাঙালি নয়, তাঁরা ভারতের চার কোটি বাঙালি। তাঁদের কোনো আন্তর্জাতিক পরিচিতি নেই। তাঁরা ভারতের পাশপোর্ট নিয়ে বিদেশে যায়। এমনকি বাংলাদেশেও যায় অন্যান্য ভারতীয়দের মতো ভারতীয় পরিচিতি বহন করে। আট কোটি বাঙালি যে রাষ্ট্রে বাস করে সে রাষ্ট্র ভারতের অঙ্গ নয়, তাঁরা ভারতীয় নয়, তাঁদের ভাষা ভারতের রাষ্ট্রভাষা নয়, তাঁদের সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতির সামিল নয়, তাঁরা ভারতের থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র একটি জনস্রোত। আর তাঁরাই হলেন

বাঙালি জাতির মুখ্য স্রোত। হ্যামলেট নাটকে তাঁরাই ডেনমার্কের রাজপুত্র। তাঁদের বাদ দিয়ে হ্যামলেট অভিনয় হয় না।

ওঁরা যেমন ভারতের থেকে বিচ্ছিন্ন এঁরাও তেমনি বাংলাদেশের থেকে বিচ্ছিন্ন। আগেকার দিনে অবিভক্ত সংখ্যানুপাত ছিল শতকরা বারো। এখন বিভক্ত ভারতে বিভক্ত বাঙালির সংখ্যানুপাত শতকরা ছয় থেকে সাত। ফলে সর্বভারতীয় ব্যাপারে বাঙালির অংশ কমে গেছে। শিক্ষা-দীক্ষার অগ্রসরতার কল্যাণে বাঙালির ওজন ছিল সংখ্যানুপাতের তুলনায় বেশি। এখন সে ওজন আর নেই। বাঙালি তাঁর নেতৃত্ব হারিয়েছে। বাঙালি এখন বিবর্তনের পথ ছেড়ে বিপ্লবের পথ ধরতে চায়, সেটার জন্যে দেখি বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ি। অথচ বিবর্তনের পথও ছাড়তে নারাজ। তাই পার্লামেন্টারি পদ্ধতিতে নির্বাচনও লড়ে। বিবর্তনের পথ ধরে দক্ষিণীরা চলছে, পশ্চিম-ভারতীয়রা চলেছে, পাঞ্জাবিরা চলেছে। বিপ্লবের জন্যে তাঁদের তাড়া নেই।

আর ওদিকে যে আটকোটি বাঙালি আছে তাঁদের রাষ্ট্রে তারাই শতকরা নিরানব্বই। কয়েক লক্ষ বিহারি পাকিস্তানে প্রস্থানের আশায় দিন গুনছে। এ বিষয়ে কি কোনো সন্দেহ আছে যে আগেকার দিনে হিন্দুর তুলনায় মুসলমান ছিল অনগ্রসর, কলকাতার আর তার আশপাশের তুলনায় পূর্ববঙ্গ ছিল অনগ্রসর, জমিদারদের তুলনায় তাদের প্রজারা ছিল সুযোগসুবিধাহীন, মহাজনদের তুলনায় খাতকরা নিঃস্ব? পার্টিশন না হলে চাকা ঘুরত না। তাঁর ফলে কারো পৌষমাস কারো সর্বনাশ। ইতিহাসবিধাতাই চাকা ঘুরিয়ে দিয়েছেন।

এই তেত্রিশ বছরে পূর্ববঙ্গের বা পূর্ব পাকিস্তানের বা বাংলাদেশের মানুষ অনেকটা অগ্রসর হয়েছে। বহু পরিমাণ সুযোগ-সুবিধা পেয়েছে। আগের মতো নিঃস্বও নয়। তাঁদের বেশিরভাগই মুসলমান। যেসব ঐতিহাসিক পরিবর্তন ইউরোপে ঘটে গেছে, ভারতে ও হিন্দুসমাজে সেই সূত্রে এসেছে, মুসলমানদের মধ্যেও সেসব এতদিন পরে দেখা দিচ্ছে। বিলম্বে হলেও অবশেষে হচ্ছে বাংলাদেশের সাহিত্যে ও শিল্পে রেনেসাঁস, বাঙালি মুসলমানের ধর্মে রেফরমেশন। সুধীমহলে এনলাইটেনমেন্টের লক্ষণ পরিস্ফুট। কিছুদিন আগেও কোরানের বাংলা অনুবাদ ছিল ক্ষমার অযোগ্য এক অপরাধ। কাজী আবদুল ওদুদের নিন্দাবাদই শুনেছিলুম। তাঁর কোরানের অনুবাদটা মূলানুগ নয় বলে নিন্দনীয় হলে কথা ছিল না, কোরানের অনুবাদ করাটাই ছিল গর্হিত কাজ। কিন্তু দিনকাল বদলেছে। বহু স্বধর্মনিষ্ঠ মুসলমান এখন কোরান হাদিস পড়েন বাংলাভাষায়, তর্জমা করেন যাঁরা তাঁরাও ধর্মপ্রাণ মৌলানা মৌলভী। ইউরোপে যে-কাজ করেছিলেন মার্টিন লুথার। রেফরমেশনের সূত্রধার।

ভবিষ্যতের কথা যখন ভাবি তখন কেবল চার কোটি বাঙালির নয় আট কোটি বাঙালির ভবিষ্যতের কথাও ভাবি। বিবর্তন সকলেরই হচ্ছে। নাই-বা হল একইভাবে।

ছত্রিশ
বাঙালির ভবিষ্যৎ চিন্তা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর আমি কয়েকবার ঢাকায় যাই। একবার যাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। সেসময় তিনি আমাকে ও আমার সহযাত্রীদের

বলেন, 'আমরা বাঙালিরা সংখ্যায় সতেরো কোটি। ইচ্ছে করলে আমরা কীই না করতে পারি!' কিছুদিন আগে ঢাকার এক পত্রিকা লিখেছে, আমরা বাঙালিরা এখন বাইশ কোটি। বলা বাহুল্য এটা ভাষার ভিত্তিতে, ধর্মের ভিত্তিতে নয়। এর মধ্যে ধর্ম এসে পড়লে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান চার ভাগ হয়ে যায়। তখন বাঙালি হিন্দু দাবি করেন, তাঁরাই বাঙালি, আর কেউ নন। মুসলমানদের মধ্যেও এক দল আছেন—তাঁদের মতে তাঁরা বাঙালিই নন, তাঁরা মুসলমান। তাঁদের মতে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধটা মুক্তিযুদ্ধই নয়। এখনো তাঁরা মনেপ্রাণে পাকিস্তানি।

মুশকিল হয়েছে এই, আমার কাজের লোক অজয়ের মতো সাধারণ মানুষ মনে করে যে মুসলমানরা বাঙালি নয়, কেবল হিন্দুরাই বাঙালি। শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যেও কারো কারো মুখে একই কথা শোনা যায়। বাঙালির ভবিষ্যৎ বলতে তাঁরা বোঝেন শুধু বাঙালি হিন্দুর ভবিষ্যৎ। সে সময় তাঁদের খেয়াল থাকে না, এখনো দু কোটি হিন্দু বাংলাদেশের নাগরিক। তাঁদের ভবিষ্যতের কথাটাও বিবেচনা করতে হবে। কোনও কোনও মহাপণ্ডিত মনে করেন, বাংলাদেশ থেকে বেবাক হিন্দুর চলে আসা উচিত, বাংলাদেশে এখনো যেসব হিন্দু আছেন তাঁদের কোনও ভবিষ্যৎ নেই।

অপরপক্ষে বাংলাদেশে যেসব হিন্দু এখনো আছেন তাঁদের কারো কারো মুখে শুনেছি, তাঁরা নিজেরা বাংলাদেশে থাকবেন, আর তাঁদের সন্তানরা থাকবেন পশ্চিমবঙ্গে বা ভারতের অন্যান্য রাজ্যে। মাটির মায়া তাঁরা কাটাতে পারছেন না। এখনো তাঁদের দখলে বহু ভূসম্পত্তি। সে সম্পত্তি ছেড়ে এসে অনুরূপ ভূসম্পত্তি পশ্চিমবঙ্গে বা ভারতের অন্য কোথাও পাবেন না। তাঁদের ছেলেদের অনেকেই কলকাতায় পড়তে আসেন।

আমার সঙ্গে যাঁরা দেখা করতে আসেন তাঁদের জিজ্ঞাসা করি, পড়াশুনো শেষ হলে তাঁরা কোথায় যাবেন ও কী করবেন। কয়েকজন উত্তর দেন, তাঁরা বাংলাদেশেই ফিরে যাবেন ও সেখানেই কাজকর্মের সন্ধান করবেন। সরকারি চাকরি যদি না পান তাহলে বেসরকারি চাকরি পাবেন অথবা আদালতে গিয়ে ওকালতি করবেন। আমি একটি তরুণকে জানি—তিনি দেশে ফিরে গিয়ে একটি বিদেশী বিজ্ঞাপন কোম্পানিতে ছবি আঁকছেন। একজন হিন্দু তরুণী আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি ঢাকার গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্কে কাজ করেন। উন্নতিরও আশা রাখেন। একটি ছাত্রের মুখে শুনলুম, তার বাবার ধানচালের লাভজনক ব্যবসা আছে, কিন্তু সে চায় আমেরিকায় গিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করতে। আমি একদা নওগাঁর মহকুমা হাকিম ছিলুম। সেখান থেকে মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা করতে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই আসেন। নওগাঁ এখন একটি জেলা, শহরটিও এখন জেলার সদর, সেখানে এখন একটি চেম্বার অফ কমার্স স্থাপিত হয়েছে, চেম্বারের অধীনে নাকি বিশটি না ত্রিশটি ধানকল। একদিন এই চেম্বারের কয়েকজন প্রতিনিধি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। চেম্বারের সদস্যদের মধ্যে একজন হিন্দুও ছিলেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলে শুনলুম ব্যবসার ক্ষেত্রে হিন্দুর কোনও বাধানিষেধ নেই। এর আগে একজন হিন্দু শরণার্থীর মুখে শুনেছিলুম, নওগাঁয় ধানচালের ব্যবসা এখনো পুরোপুরি হিন্দুদেরই হাতে। কিছুদিন বাদে তিনি নওগাঁয় ফিরে যান।

প্রকৃত সত্য এই আগন্তুকদের অনেকেই সুযোগ পেলেই ফিরে যান। কেউ কেউ আসে আর যায়, যায় আর আসে। কেউ কেউ এখানকার নাগরিক না হয়েও বেনামী সম্পত্তি

কেনেন ও বাড়ি করেন। অথচ ওপারেও এক-পা রাখেন। বাংলাদেশের হিন্দুদের অবস্থাটা এখন পেণ্ডুলামের মতো। এই পেণ্ডুলাম পঞ্চাশ বছর পরেও দোদুল্যমান। দণ্ডকারণ্য থেকে যাঁরা মরিচঝাঁপিতে গিয়েছিলেন তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল এপার ওপার দুই পারের সুবিধা ভোগ করা। সেদিন একজন বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন কী একটা কাজে। তিনি বললেন, এপারের সীমান্ত জুড়ে বাস করছে ওপারের শরণার্থীরা। তিনি গর্ব করে বললেন, ওরা সবাই বাঙাল। বাঙাল ও বাঙালি ভেদও তলে তলে কাজ করছে, শুধু হিন্দু মুসলমান ভেদ নয়। বাঙালত্ব রক্ষা করতে হলে সীমান্তজুড়ে বাস করাই সুবুদ্ধির কাজ। আমি যতদূর জানি, তাঁদের জীবনোপায় হচ্ছে সরকারি অর্থসাহায্যের উপর নির্ভরতা নয়, আত্মনির্ভর ক্রয়বিক্রয়, যাকে নিন্দুকরা বলে চোরাকারবার। সরকার ইচ্ছে করলেই এটাকে আইনসঙ্গত করতে পারে। এটাই প্রয়োজনীয় আমদানি রপ্তানি যা বহু লোকের জীবনোপায়।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে এটা স্বতঃসিদ্ধ যে দুইপারের ভাষা একই, সঙ্গীত একই, সাহিত্য একই, চিত্রকলা একই, পুরাকীর্তি একই, উত্তরাধিকার একই, সাতচল্লিশ সাল পর্যন্ত ইতিহাস একই। শুধু ভূগোল এক নয়, দুই। সেইজন্য রাজনীতি এক নয়, যাতায়াতের পদে পদে বিঘ্ন। চিঠিপত্র যেতে এক মাস লাগে। এপারের খবরের কাগজ ওপারে যায় না, ওপারের খবরের কাগজ এপারে আসে না।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত যতটা বিচ্ছিন্ন ফ্রান্স-জার্মানির সীমান্ত তার চেয়েও বেশি। ওদের মধ্যে দুশো বছর ধরে লড়াই হয়েছে। এই শতাব্দীতেই দু-দুটো মহাযুদ্ধ। অথচ এখন তারা ইউরোপীয় ইউনিনে একতাবদ্ধ। অনেক দিন পর্যন্ত তুরস্ককে ইউনিয়নে ঢুকতে দেওয়া হত না যেহেতু তুর্করা মুসলমান আর ইউরোপীয়রা খ্রিস্টান। এই সেদিন কাগজে পড়লুম তুরস্ককেও ঢুকতে দেওয়া হয়েছে। তার কারণ তুরস্ক ছাড়া ইউরোপ হয় না, আর ইউরোপ ছাড়া তুরস্ক হয় না। অথচ তুরস্কের সঙ্গে গ্রিসের সম্পর্ক এখনো স্বাভাবিক হয়নি। দুই শক্তি সাইপ্রাস ভাগ করে নিয়েছে। সাইপ্রাস ছোট একটা দ্বীপ, অথচ দ্বিধাবিভক্ত।

এখন বাঙালির প্রসঙ্গে ফিরে আসি। একদা বাঙালি হিন্দুরা বলত আমরা বাঙালি, ওরা মুসলমান। তার মানে মুসলমানরা বাঙালি নয়। আশ্চর্যের বিষয় বাঙালি মুসলমানরাও বলত, আমরা মুসলমান, ওরা বাঙালি। অধ্যাপক আহমদ শরিফ এক জায়গায় লিখেছিলেন, বাঙালি মুসলমানরা এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শেষ অবধি স্বীকার করত না যে বাংলা তাদের মাতৃভাষা। তাদের নামকরণ হয় আরবিতে, অতএব উর্দুই সব ভারতীয় মুসলমানের ভাষা। আহমদ শরিফ বলেন, এই ধারণাটা বদলে যায় আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের তথা কাজী নজরুল ইসলামের প্রভাবে। আমি তার সঙ্গে যোগ করতে চাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'শিখা' গোষ্ঠীর প্রভাব। অর্থাৎ কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী মোতাহের হোসেন, আবদুল কাদির, আবুল ফজল প্রভৃতির উদ্‌যোগ।

ফজল একটি মজার গল্প লিখেছিলেন। কাহিনীর নায়ক কউর মুসলমান। সে বাঙালি হয়েও বাংলা কথা বলে না। সে মক্কায় হজ করতে গিয়ে এক আরব মেয়েকে বিয়ে করে আনে। মেয়েটি বাংলা বোঝে না। বাড়ির অন্যান্য মেয়েরা আরবি বোঝে না। একদিন মেয়েটি গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। আর্তস্বরে বলে, 'মা, মা'। বাড়ির অন্যান্য মেয়েরা বোঝে যে মেয়েটি মায়ের জন্য আকুল হয়ে পড়েছে। সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে। মেয়েটি মারা যায়। স্বামী তখন বাড়িতে ছিল না, অফিসে গিয়েছিল। ফিরে এসে শোনে, মেয়েটি 'মা,

মা' বলে ডাকতে ডাকতে মারা গেছে। তখন স্বামী ক্রুদ্ধ হয়ে বলে, 'তোমরা এমন বেয়াকুব যে বুঝতে পারলে না মেয়েটি পানি চেয়েছিল?' তাঁর মানে আরবি ভাষায় 'মা' বলতে বোঝায় 'পানি'। আসল বেয়াকুব স্বামী নিজেই। সে তার বিবিকে বাংলা শেখায়নি। বাংলা তার ভাষা নয়। পরিণামে তার বিবির মৃত্যু।

তৃতীয় দশকে মোটামুটি স্থির হয়ে যায়, বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা উর্দু নয়, বাংলা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলা ভাষায় কথা বললেই কি বাঙালি হয়? অনেকে তো ইংরেজিতে কথা বলে। তাই বলে কি তারা ইংরেজ? যাই হোক ততদিনে অনেক মুসলমান লেখক বাঙালি বলে পরিচয় দিতে অভ্যস্ত হয়েছেন। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন হবার পরে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন ফজলুল হক, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন, অন্য এক মন্ত্রী শাহেদ সুরাবর্দী, আরো এক মন্ত্রী নৌসের আলি, আরো এক মন্ত্রী নবাব খ্‌বাজা হাবিবুল্লাহ, আরো এক মন্ত্রীর নাম ঠিক মনে পড়ছে না, বোধহয় নবাব মোশারফ হোসেন। এখন দেখা গেল নাজিমুদ্দিন, সুরাবর্দী, হাবিবুল্লাহ ও মোসারফ হোসেন উর্দুভাষী, অপর কয়েকজন বাংলাভাষী। উর্দুভাষীদেরই প্রাধান্য। ফজলুল হকসাহেবও দ্বিতীয়বার নিকা করেন এক উর্দুভাষী মহিলাকে। তিনি উর্দুভাষীদের পাল্লায় পড়ে লাহোরে গিয়ে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র সহাবস্থান-সূচক প্রস্তাব পেশ করেন। সেটাকেই বলে পাকিস্তান প্রস্তাব। অতে একাধিক স্বতন্ত্র রাষ্ট্র দাবি করা হয়েছিল। কিন্তু পরে জিন্নাসাহেব তা অস্বীকার করে বলেন States শব্দটা ছাপা ভুল, আসলে ওটা State হবে।

সাধারণ নির্বাচনের সময় পাকিস্তানই হয় মুসলিম লিগের তরফ থেকে নির্বাচনী ইস্যু। কেন্দ্রে ও বিভিন্ন প্রদেশে সব ক-টা মুসলিম আসনেই জয়ী হয় মুসলিম লিগ। পরে জিন্নাসাহেব ডাইরেক্ট অ্যাকশনের ফতোয়া দেন। তাঁর দলের লোক আওয়াজ তোলে, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান। বছর শেষ না হতেই হাসিল হল পাকিস্তান নামক স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। ভারত দু'ভাগ হয়ে যায়। বঙ্গপ্রদেশ দু'ভাগ হয়ে যায়। পাঞ্জাব দু'ভাগ হয়ে যায়। তারপর দেখা গেল মুসলমানদের রাষ্ট্রে হিন্দুরা টিকতে পারে না বলে তারা ভারতে পালিয়ে আসতে আরম্ভ করে। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা পড়ে যায় দোটানায়। তারা তো চায়নি যে বাংলাও দু'ভাগ হোক। তাদের হোমল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গ কি পূর্ববঙ্গ? পশ্চিমবঙ্গ থেকে মুসলমান আমলা ও রাজনৈতিক নেতারা পূর্ববঙ্গে যান। কিন্তু সাধারণ মুসলমান ঘরবাড়ি জায়গাজমি ছাড়ে না। নতুন ভারত সরকার ঘোষণা করে যে ভারত একটি সেকেউলার স্টেট। সেখানে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান সকলের সমান অধিকার।

কিছুদিন পরে দেখা গেল, যত হিন্দু পূর্ববঙ্গ থেকে আসছে তত মুসলমান পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ববঙ্গে যাচ্ছে না। ওটা নাকি ওয়ান-ওয়ে ট্রাফিক। তখন টু-ওয়ে ট্রাফিকের দাবি ওঠে। তার মানে মুসলিম খেদাও। সেটা ভারত সরকারের নীতিবিরোধী, পশ্চিমবঙ্গ সরকারেরও নীতিবিরোধী। কিন্তু দুঃখের বিষয়, জেলা বিনিময় চাই। নেহরু বলেন, ভারত সরকার এটা 'নৌকোর লম্বা লগি' দিয়েও স্পর্শ করবে না। তিনি ঘোষণা করেন, হিন্দুরা শরণার্থী হয়ে এলে তাদের জন্য ভারতের দরজা খোলা—তাদের সংখ্যা যতই হোক-না কেন। ভারত সরকারের সেটাই হয় পলিসি।

কিছুদিন পরে আমি সরকারি চাকরি থেকে অকালে অবসর নিয়ে শান্তিনিকেতনে বসবাস করি। রোজ সন্ধ্যেবেলা শান্তিনিকেতন থেকে শ্রীনিকেতনের পথে বেড়াতে যাই।

একদিন আমার সামনে যাচ্ছিলেন দু'জন ভদ্রলোক। আমি শুনতে পাচ্ছিলুম তাঁদের কথাবার্তা। একজন বলছিলেন আরেকজনকে, পণ্ডিত নেহরু কি বুঝতে পারছেন না, পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম মাইনোরিটি হবে মুসলিম মেজোরিটি। তখন পশ্চিমবঙ্গও পাকিস্তান হয়ে যাবে।

প্রায় চল্লিশ বছর পরে আজকেও শুনতে পাওয়া যাচ্ছে তার প্রতিধ্বনি। মুসলমানদের সংখ্যা হুহু করে বাড়ছে, তারাই একদিন হবে পশ্চিমবঙ্গের মালিক। আজকাল মুসলমানদের তাড়িয়ে দেবার কথা বলা হচ্ছে না, তবে তাদের ব্যক্তিগত আইন বদলে দিয়ে বহুবিবাহ বন্ধ করার উদ্‌যোগ নিতে বলা হচ্ছে। তারা নাকি সবাই চার-চারটে বিয়ে করে ও তার ফলে তাদের সন্তানসংখ্যা চতুর্গুণ হয়। আদমসুমারির রিপোর্টে কিন্তু তার কোনও প্রমাণ নেই। প্রমাণের কী দরকার? ভোটের জোর যদি থাকে তাহলে ভোটের জোরে আইন বদলে দেওয়া হয়।

ইতিমধ্যে পূর্ব পাকিস্তান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে নামান্তরিত হয়েছে। তার জাতীয় সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালিরা সবাই ছিল মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা প্রাণ দেয়নি বটে, কিন্তু আর-সবকিছু দিয়েছে। ভারতের সৈন্যরা গিয়ে লড়াই করে নিহত হয়েছে। নিহতের সংখ্যা বারো হাজারের কম নয়। কেউ কেউ বলে, আঠারো হাজার। পাকিস্তানের সঙ্গে একটা শত্রু-সম্পর্ক ছিল। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের শত্রু-সম্পর্ক নেই। তবে সম্পর্ক এখনো স্বাভাবিক নয়। স্বাভাবিকতার জন্য চেষ্টা করতে হবে। ইতিমধ্যে কলকাতা-ঢাকা বাস সার্ভিস চালু হয়েছে। রেল সার্ভিস চালু হবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। যেখানে বিবাদ নেই সেখানে মিলনটাই তো স্বাভাবিক।

অনেকে স্বপ্ন দেখছেন যে দুই বাংলা আবার এক হয়ে যাবে। সেটা হবার নয়। কারণ পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা ভারতীয় নাগরিক। তারা ভারতীয় নাগরিকত্বকে অত্যন্ত মূল্যবান মনে করে। সেটা তারা কিছুতে ত্যাগ করতে চাইবে না। অপরপক্ষে বাংলাদেশ একটা স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। সেখানকার নাগরিকরা কোন দুঃখে তাদের নাগরিকতাকে ত্যাগ করে ভারতের নাগরিক হতে রাজি হবেন? সুদূর ভবিষ্যতে কী হবে বলা যায় না। তবে অদূর ভবিষ্যতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের আদলে একটি সাউথ এশিয়ান ইউনিয়ন গঠিত হতে পারে। তার সদস্য হবে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ। এই সাতটি দেশকে বলা যাক সাত ভাই চম্পা।

আমাদের ভবিষ্যৎ এই সাত ভাই চম্পার সম্মিলিত ভবিষ্যৎ। বাঙালির ভবিষ্যৎ আর কোনও বিচ্ছিন্ন ভবিষ্যৎ নয়। আমরা বাঙালিরা হিন্দুই হই আর বাংলাদেশিই হই, আমরা দুই হয়েও এক, আবার এক হয়েও দুই। এই একত্ব যেমন সত্য, দ্বিত্বও তেমনই সত্য।

আমাদের ভাষা এক, সাহিত্য এক, সংস্কৃতি এক, কিন্তু রাজনীতি এক নয়। যতদূর দৃষ্টি যায়—হবেও না। ভাবতেই পারা যায় না যে কলকাতা হবে সকল বাঙালির জন্য রাজধানী অথবা ঢাকা হবে সব বাঙালি হিন্দু মুসলমানের মক্কা। জার্মানরা যেমন বার্লিনকে তাদের একমাত্র রাজধানী মনে করে না, ভিয়েনাকে মনে করে তাদের অপর রাজধানী, তেমনই আমরাও কলকাতাকে ও ঢাকাকে আমাদের দুই কেন্দ্র মনে করব। দুই কেন্দ্রের জন্য সমান গর্ব অনুভব করব। আদানপ্রদান অব্যাহত থাকবে। এপারের অধ্যাপকরা ওপারে

যাবেন, ওপারের ছাত্ররা এপারে আসবে। এপারের নাটক ওপারে যাবে, ওপারের লোকসঙ্গীত এপারে আসবে। প্রযুক্তিবিদ্যায় এপার ওপার পরস্পরকে সাহায্য করবে। উভয়ই সমৃদ্ধ হবে। বাংলাদেশের পুরাকীর্তি দেখবার জন্য এপার থেকে হাজার হাজার পর্যটক ওপারে যাবে, তাদের জন্য ওপারে হোটেল তৈরি হবে।

পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের দিল্লি আগ্রা আজমীর দেখবার জন্য বাংলাদেশ থেকে হাজার হাজার পর্যটক আসবে। তাদের জন্যও হোটেলে জায়গা দিতে হবে। মোট কথা আমরা পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে আনব যতদূর সম্ভব। এখনো কারো কারো মনে অপরের প্রতি বিদ্বেষ রয়েছে। তার মূলে রয়েছে তিক্ত অভিজ্ঞতা। তাই আমরা চাইব হৃদয়ের পরিবর্তন। এপারের হৃদয় ওপারের হোক, ওপারের হৃদয় এপারের হোক। উভয়ের হৃদয় সৃজনমুখী হোক। আসুন, আমরা সকলের ভবিষ্যতের জন্য সৃষ্টি করে যাই যা কিছু সুন্দর ও যা কিছু স্থায়ী। উত্তরপুরুষ ভুলে যাক পূর্বপুরুষের তিক্ত অভিজ্ঞতা। ফরগিভ অ্যান্ড ফরগেট।

সাইত্রিশ
বাঙালিরা একটাই জাতি

যাঁরা বাংলাভাষায় কথা বলেন এবং ভূগোলের একটি নির্দিষ্ট অংশে চিরকাল বসবাস করে এসেছেন, তাঁরা স্বভাবতই একটি নেশন। এই কথাটিকে আলোচনার মৌল একটি প্রস্থানবিন্দু হিসেবে ধরে নেওয়া হচ্ছে এখানে। 'জাতি' অর্থে 'নেশন'-এর প্রতিশব্দগত অর্থটিকে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময় ঢাকার একদল বুদ্ধিজীবী স্বীকার করেছিলেন। তাঁরা ধর্মে যদিও মুসলমান, তবু ধর্মনির্বিশেষে বাঙালি। তাঁরা বঙ্গভঙ্গ চাননি, কিন্তু বাধাও দেননি। একথা মেনে নেওয়া ভালো যে বঙ্গভঙ্গ রদ হয় প্রধানত হিন্দুদের আন্দোলনের ফলে, তবে সেই আন্দোলনে আবদুল রসুল, আবুল কাশেম প্রভৃতি মুসলমান নেতারাও যুক্ত ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ যখন রদ হয় এক ঐতিহাসিক লগ্নে, তখন কেবল হিন্দুরা নয়, মুসলমানরাও একাত্ম হয়েছিলেন সেই বাঙালির বিজয়ে। পরবর্তীকালে দেখা গেল চাকরিবাকরি নিয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মনোমালিন্য। রবীন্দ্রনাথ 'কালান্তর'-এর মধ্যে দেখিয়েছেন কীভাবে বিষবৃক্ষ বেড়ে উঠছিল ক্রমশ। মুসলিম নির্বাচনমণ্ডলী থেকে নির্বাচিত এক মন্ত্রী তাঁর অধস্তন কর্মচারীকে স্পষ্ট বলে দিলেন আপনি একজন হিন্দু। আপনাকে প্রমোশন দিয়ে আমার লাভ কী? আপনার বদলে একজন মুসলমানকে প্রমোশন দিলে আমি আবার ভোটে জিতে মন্ত্রী হব।

এমন সব মন্তব্য ছিল ইতিহাসের দেওয়ালে লিখনের মতো। এর প্রতিক্রিয়া যা হওয়া তাই হল। হিন্দু কর্মচারীরা ভাবতে শুরু করলেন মুসলিম লিগ থাকলে তাঁদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। উদাহরণ স্বরূপ আরেকটি মন্তব্যের কথা বলি। মন্তব্যটি করেছিলেন এক হিন্দু সাবজজ আমারই উদ্দেশে। তিনি খোলাখুলি আমাকে বললেন—গান্ধীকে কেউ গুলি করে মারছে না কেন?

আমি বললাম—গান্ধীর কী দোষ?

তিনি বললেন—গান্ধী কেন বাংলা ভাগে বাধা দিচ্ছেন? দোষ এবং মারাত্মক দোষ

এটাই। বাংলা ভাগ না হলে কি হিন্দু বাঁচবে?

বুঝলাম গৃহদাহ শুরু হয়ে গেছে। হিন্দু বলতে তিনি বোঝালেন অবশ্য হিন্দু আমলা শ্রেণী। যেই বাংলা ভাগ স্থির হয়ে গেল, তখন দেখা গেল একধার থেকে বেবাক হিন্দু কর্মচারী পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে এলেন। যে দু-চারজন থেকে গেলেন, তাঁরাও তিষ্ঠোতে পারলেন না। দ্বিতীয়বার বঙ্গভঙ্গ হল হিন্দু শিক্ষিত শ্রেণীর আন্দোলনের ফলে, এটা নিঃসঙ্কোচে বলা যেতে পারে। মজা এই যে যাঁরা একদিন বঙ্গভঙ্গ রদ করতে চেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে যারা জীবিত ছিলেন, তাঁরাও চাইলেন দ্বিতীয়বার বঙ্গভঙ্গ। এমনতরো ডিগবাজি ইতিহাসে অভূতপূর্ব। এই ঘটনা যেন এল নিয়তির নির্মম পরিহাসের মতো। তবে যে কোন কারণেই হোক এই দেশভাগ সমর্থনকারী অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু প্রতিনিধি। সুতরাং একথা বলতে পারা যায় যে অধিকাংশ হিন্দুই দ্বিতীয়বার বঙ্গভঙ্গের সমর্থনকারী ছিলেন। এখনো পর্যন্ত তাঁদের মনে বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য তেমন কোনো তাগিদ নেই, বরং হয়তো উল্টোটাই সত্যি। তারা এখনো এই বিভাজনেরই পক্ষপাতী আছেন। তাঁদের আশঙ্কা আবার যদি দুই বাংলা এক হয়ে যায়, তবে তাঁদের প্রতি অবিচার হবে। আজ অবধি তেমন কোনো গ্যারান্টি পাওয়া যায়নি মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছ থেকে যে যুক্তবঙ্গ হবে সেটি হবে একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। সেখানে কেউ হিন্দু বলে উপেক্ষিত হবে না বা মুসলিম বলে অন্যায় পক্ষপাতিত্ব পাবে না।

বাংলাদেশ থেকে এখনো হিন্দু চলে আসছে। শতকরা ৩৩ ভাগ থেকে কমে তাদের সংখ্যা এখন শতকরা ১১ বা সেইরকম। এই জলতরঙ্গ রোধিবে কে? আসলে দুই বাংলা এক হোক এটা হৃদয়ের দিক থেকে সত্য, কিন্তু লাভক্ষতির খতিয়ানের দিক থেকে গ্রাহ্য নয়। এই ইচ্ছাপ্রকাশে হৃদয়ের উত্তাপ যতটা আছে, বাস্তবের সত্যকার যৌক্তিকতা বোধহয় ততটুকু নেই। এই মিলনের আগে সর্বপ্রথম একটা বোঝাপড়া দরকার। একটি পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থার সার্বিক বোঝাপড়া যা হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের কাছেই গ্রহণযোগ্য।

কাজী আবদুল ওদুদ বলতেন ইতিহাস এখনো শেষ হয়ে যায়নি। ধৈর্য ধরতে হয়। তাঁর মতো এমন দেশপ্রেমিক ও ভাষাপ্রেমিক আমি দেখিনি। দেশভাগের পরে তিনি একখানি বই লেখেন ও তার নাম দেন 'শাশ্বত বঙ্গ'। তাঁর চিত্রপটে সেই আবহমান বাংলার মানস ছবিটিই আঁকা ছিল। তাঁর মত যারা শাশ্বত করবেন সে বাঙালি হিন্দু বাঙালি মুসলমানের অন্তর পরিবর্তন ঘটুক। তার জন্যে এক শতাব্দীও লাগতে পারে। কাল নিরবধি, আমরা জানি। তাছাড়া রাজনীতিতে কিছুই চূড়ান্ত নয়। শেষ কথা বলার কেউ নেই। একশো বছরের উপর লড়াই করার পর ফরাসীতে ও জার্মানে এখন গলাগলি বন্ধুত্ব। তারা এখন আরো কয়েকটি দেশ নিয়ে ইউরোপীয় কমিউনিটি গঠন করেছে। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকতে পারে বলে বিশ্বাস করি না। এইরূপ একটি কমিউনিটি গঠন করা ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের পক্ষেও সম্ভব। ইতিহাস সেইদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। ঢাকা-কলকাতা বাস চলাচল তাঁরই পূর্বাভাস।

আরো তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে ঐতিহাসিক ২১শে ফেব্রুয়ারি ছিল একটি বিভাজন রেখা। একদিকে উর্দুভাষী মুসলমান ও অন্যদিকে বাংলাভাষী মুসলমান। অবশেষে বাংলাভাষী মুসলমানই জয়ী হল। আর মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিলেন বাংলাভাষী হিন্দুরাও। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি হিন্দুরও যোগ ছিল সেই মুক্তিযুদ্ধে। এটা সম্ভব হল কেন? হল, কারণ

বাঙালিরা তলে তলে একটাই জাতি। একজনের সুখদুঃখে অন্যজন সুখী বা দুঃখিত। এটার সূচনা সেই '৫২-র ২১শে ফেব্রুয়ারিতেই লক্ষিত হয়েছিল। সেইজন্য পশ্চিমবঙ্গে আমরাও ২১শে ফেব্রুয়ারি পালন করে থাকি। এই ঐতিহাসিক দিবসের প্রথম বার্ষিকীতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল শান্তিনিকেতনের সাহিত্যমেলা। দুইপারের সাহিত্যিকেরা সেখানে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন সেই মিলনোৎসবে। সেইরূপ মেলা আবার হওয়া চাই। ভারত ভেঙে ভাগ করার বেদনা তাতে কিছুটা জুড়োবে।

আটত্রিশ

এক জাতি দুই দেশ

'আমার ভালোবাসার দেশ'-এর ভূমিকা

দ্বিজাতিতত্ত্ব যদি সত্য হত তাহলে স্বাধীন ভারতে একজনও মুসলমান থাকত না, পশ্চিম পাকিস্তানে না হোক, পূর্ব পাকিস্তানে অর্থাৎ বাংলাদেশে এখনো দুকোটি কি আড়াই কোটি হিন্দু থাকত না। এই তত্ত্বটা আসলে দ্বিজাতিতত্ত্ব ছিল না, ছিল দ্বিপার্টিতত্ত্ব—কংগ্রেস পার্টি আর মুসলিম লিগ পার্টি। ওরাই বখরার জন্য ঝগড়া করে ও মাউন্টব্যাটেন-এর মধ্যস্থতায় দেশ ভাগাভাগি ও প্রদেশ ভাগাভাগি করে নেয়। পরে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ আলাদা হয়ে যায়। কিন্তু ভারত ও বাংলাদেশ দুই রাষ্ট্রেরই একই জাতি থাকে। সীমান্তের দুই পারেই একই জাতি।

সকলেই জানে যে আরবদের দেশ বলতে বোঝায় সাউদি আরবিয়া, ইরাক, সিরিয়া, লেবানন, প্যালেস্টাইন, মিশর, সুদান, লিবিয়া, টিউনিসিয়া, মরোক্কো প্রভৃতি। এই যে এতগুলি দেশ এগুলি কিন্তু এতগুলি জাতি নয়, একটাই জাতি, সে জাতি আরব জাতি। আরবদের মধ্যেও খ্রিস্টান মুসলমান ভেদ আছে। লেবাননে খ্রিস্টানদের প্রাধান্য। মিশরের কোপটিক খ্রিস্টানরা একটি প্রভাবশালী সম্প্রদায়। ইংল্যান্ডে যখন ছিলুম তখন একবার ছুটি কাটাই ওয়াই-এম-সি-এর আইল অব ওয়াইট-এর শাখায়। সেখানে আমার সাথী হন একজন কোপটিক খ্রিস্টান। তাঁর বাড়ি মিশরে, পড়াশুনো করেন ইংল্যান্ডে। তাঁর মুখে কোনও অভিযোগ শুনিনি। সত্তর বছর আগে এটাই ছিল স্বাভাবিক অবস্থা।

অনেকদিন বাদে মিশরের রাষ্ট্রপতি হন নাসের। তাঁর আমলে মিশরের দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট ঐক্য ছিল। পরে মিশরের মৌলবাদী মুসলমানরা প্রবল হয়। রাষ্ট্রপতি সাদাত খুন হয়ে যান। খ্রিস্টানদের উপরে মুসলিম মৌলবাদীরা দুর্ব্যবহার করে। মিশর এখনো তার ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র ফিরে পায়নি। এইরূপ অবস্থা আরো কয়েকটি আরব দেশেরও। লেবাননেও ঝগড়া বাধে। ওখানকার সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি হন খ্রিস্টান, প্রধানমন্ত্রী সুন্নি সম্প্রদায়ের মুসলমান, পার্লামেন্টের অধ্যক্ষ শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমান। সংবিধান সংশোধনের দাবি উঠেছিল। তাতে খ্রিস্টানরা রাজি নয়। বেশ কিছুকাল লেবাননের রাজধানী বেইরুট ছিল দাঙ্গাহাঙ্গামায় বিধ্বস্ত। অথচ ওর মতো কসমোপলিটন নগর আরব দুনিয়ায় আর ছিল না। ওর বর্তমান অবস্থা কীরকম তা আমার জানা নেই।

মৌলবাদী মুসলমানরা আজকাল বাংলাদেশেও যথেষ্ট প্রভাবশালী। বুদ্ধিজীবীদের

ওপর ওদের জাতক্রোধ। কবি শামসুর রাহমান অল্পের জন্য বেঁচে যান। চোট লাগে তাঁর স্ত্রীর হাতে। তিনি গিয়েছিলেন তাঁর স্বামীকে বাঁচাতে। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা কেমন করে আত্মরক্ষা করবেন, জানিনা। আমরা চেষ্টা করেছিলুম আন্তর্জাতিক পি.ই.এন. সংস্থা থেকে তসলিমা নাসরিনকে রক্ষা করতে। তসলিমা শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে বিদায় নিয়ে সুইডেনে যায়। এখন ফ্রান্সে আছে। তসলিমা কিছুদিন আগে কলকাতায় এসেছিল। আমার প্রশ্নের উত্তরে বলে, 'আমি বাংলাদেশে যাব কী করে? আমি যে একজন ক্রিমিনাল।' তার নামে নাকি এখনো মামলা চলছে। ধর্মদ্রোহের মামলা। যাহোক, প্যারিসে সে ভালোই আছে। বাংলা লেখা ফরাসিতে অনুবাদ করা হয়। সেই সূত্রে তার যথেষ্ট আয়। ওর 'লজ্জা' উপন্যাস ইউরোপের অনেকগুলি ভাষায় তর্জমা হয়েছে। আরবি ভাষাতেও। মিশরে সেটি নাকি সুখ্যাতি পেয়েছে। বাংলাদেশের সবচেয়ে বিখ্যাত নারী এখন তসলিমা। কিন্তু তার স্বদেশে তার বই নিষিদ্ধ।

আমরা প্রয়োজন হলে আরো কয়েকজন বাংলাদেশী বুদ্ধিজীবীকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু আমাদেরই-বা সীমা কতটুকু। ভারতেও মৌলবাদী হিন্দুদের প্রভাব বেড়ে চলেছে। তবে আমাদের আদালতগুলি এখনো মৌলবাদীদের চেয়ে শক্তিশালী। আমরা আশা করব বাংলাদেশের আদালতগুলিও মৌলবাদীদের চেয়ে শক্তিশালী হবে। মুজিব-হত্যা মামলায় ঢাকার দায়রা জজ কাজী গোলাম রসুল যে ঐতিহাসিক রায় দিয়েছেন তার কপি পড়ার সুযোগ আমার হয়েছে। তিনি যেমন নিরপেক্ষ তেমনই নির্ভীক ও তেমনই ন্যায়পরায়ণ। তাঁর মতো বিচারক যে দেশে আছেন সে দেশ নিশ্চয়ই বুদ্ধিজীবীদের নিরাপত্তা দিতে পারবে। রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন-এর উপর আমার অসীম শ্রদ্ধা। বাংলাদেশ তাঁর জন্য গর্ব বোধ করতে পারে। আমরা আশা করব তিনি বুদ্ধিজীবীদের অভয় দিতে পারবেন।

কোন দেশের ভবিষ্যৎ কী হবে তা কেউ আগে থেকে বলতে পারে না। হিটলারের অভ্যুদয়ের পূর্বে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির জামানায় আমি দুবার জার্মানি ঘুরে এসেছিলুম। সেই জমানায় অনেক ভালো কাজ হয়েছিল। আমি তো ভেবেছিলুম সেই জমানা স্থায়ী হবে। হিটলারের অভ্যুদয়ের পরে নাৎসিদের আমলে বহু বিখ্যাত সাহিত্যিক ও দার্শনিক আত্মরক্ষার জন্য দেশান্তরী হন। ইহুদিদের উপর নৃশংস অত্যাচার চলে। ষাট লক্ষ ইহুদি নাকি গ্যাস চেম্বারে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়। সংখ্যাটা ষাট লক্ষ না হয়ে ছয় লক্ষ হলেও সভ্যতার কলঙ্ক। গ্যেটের জার্মানি, বেটোফেনের জার্মানি কত নীচে নেমে গেল তা ভেবে আমার দুঃখ হয়।

এত কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতেরও একদিন এ রকম পতন ঘটতে পারে যদি না আমরা নিত্য সজাগ থাকি। বিখ্যাত আইরিশ স্বাধীনতা সংগ্রামী John Curran বলেছিলেন 'Eternal vigilance is the price of Liberty.' কথাটা শুধু ভারতের পক্ষে নয়, বাংলাদেশের পক্ষেও প্রযোজ্য।

আমার এই গ্রন্থ বাংলাদেশের বিখ্যাত প্রকাশক মফিদুল হকের অনুরোধে আমার হয়ে সুরজিৎ দাশগুপ্ত সম্পাদনা করেছেন। বাংলাদেশ রাজনৈতিক অর্থে না হলেও আর সব বিষয়ে আমার আপনার দেশ। রাজনৈতিক প্রসঙ্গে আমি কিছু বলতে চাইনে। বলতে গেলে ভুল বোঝাবুঝি হবে।

আমার মূল কথা এই যে দুই পক্ষের মধ্যে ঝগড়াঝাটি যথেষ্ট হয়েছে, এখন একটু ভালোবাসাবাসি হোক। আমরা যেন পরস্পরের সুখে সুখী হই ও দুঃখে দুঃখী হই। পরস্পরকে বিশ্বাস করি। মিলেমিশে বাঁচতে পণ করি। তাহলেই আমরা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারব।

উনচল্লিশ
ভ্রান্তিবিলাস

প্রথমেই মনে রাখতে হবে, যা কিছু রোমান হরফে লেখা হয় তাই ইংরেজি নয়। রোমান লিপি আর ইংরেজি ভাষা একই জিনিস নয়। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' নামক বাংলা উপন্যাস রোমান হরফে ছাপা হয়ে বিলেতে সিভিলিয়ানদের পাঠ্য হয়েছিল। সেটি পড়ে তাঁরা বাংলা ভাষায় পরীক্ষা দিতেন। তাই বলে এই রোমান লিপিতে মুদ্রিত 'স্বর্ণলতা' একটি ইংরেজি উপন্যাস হয়ে গেল?

তেমনই রোমান হরফে মুদ্রিত কলকাতা নামটি কি ইংরেজি ভাষার শব্দ? অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষায় মুদ্রিত বই ছিল না। কাজেই কলকাতা শব্দটির বাংলা রূপ ইংরেজরা জানত না। তারা চোখে না পড়ে কানে শুনে কলকাতাকে রোমান হরফে লিখল CALCUTTA সেকালে রোমান K-র স্থলে C ব্যবহারের দৃষ্টান্ত সেই একটি নয়। কালিকট CALICUT, কুমিল্লা COMILLA, কটক CUTTACK, কোয়েম্বাটুর COIMBATORE, কাবেরী CAUVERY, কানপুর CAWNPORE, কর্ণাটক CARNATIC, কান্নানোর CANNANORE, কাশীপুর COSSIPORE—এগুলির আদ্যক্ষর রোমান লিপিতে K নয় C, ইংরেজদের মুখে K-র উচ্চারণ অপেক্ষাকৃত রূঢ়, C-র উচ্চারণ অপেক্ষাকৃত কোমল। KOLKATA লিখলে ইংরেজদের মুখে সেটা শোনাত 'খোলখেটা'। বানানের দিক থেকে শুদ্ধ, উচ্চারণের দিক থেকে অশুদ্ধ।

এখন যাঁরা লিখতে চান তাঁদের জানা উচিত যে তাঁরা শুদ্ধ বানান লিখতে গিয়ে অশুদ্ধ উচ্চারণ করছেন—অন্তত ইংরেজদের মতে। তারপর বাঙালিদের মুখে CALCUTTA 'ক্যালকাটা' হতে পারে, কিন্তু তিনশ বছর আগে প্রতিষ্ঠার সময় ইংরেজদের মুখে CALCUTTA ছিল 'কলকাটা'। 'কল' এসেছে ইংরেজি CALL শব্দের অনুকরণে। এরকম আরো অনেক শব্দ আছে, যেমন, CALDWELL (সমালোচক), CALDERON (চিত্রশিল্পী) ইত্যাদি। তারপর CUTTA তে দুটো T ব্যবহার করা হয়েছে। একটা ব্যবহার করলে উচ্চারণ হত 'কিউটা' বা 'কুটা'। দু'টো T ব্যবহার করাতে ওটা হয়েছে 'কাটা'।

পরবর্তীকালে ইংরেজি শব্দটির উচ্চারণ হয়ে যায় 'ক্যালকাটা'। সেটা বানানের দোষে নয়। বানান নির্ভর করেছিল কানের উপর, চোখের উপরে নয়। কানের উপরে নির্ভর করার ফলে 'ঠাকুর' হল রোমান হরফে TAGORE, 'লাহা' হল LAW, 'সাহা' হল SHAW, 'চন্দ্র' হল CHUNDER বঙ্কিমচন্দ্রের লিখিত রূপ হল BANKIMCHUNDER.

দু'শ বছর পরেও কলকাতা যেমন রোমান হরফে CALCUTTA চন্দ্রও তেমনি রোমান হরফে CHUNDER, যথা PRATAP CHUNDRA CHUNDER, SUPRIYA TAGORE, লাহা বংশধররাও এখনো LAW, সাহা বংশধররা SHAW, আইন করে এঁদের নিরস্ত করা যাবে না।

কারণ এটা হল তাঁদের বংশধারা। এটা সাহেবিয়ানা নয়, বনেদিয়ানা। এঁরা জানাতে চান এঁরা অভিজাত পরিবার। অন্তত দুই শতাব্দীর সম্ভ্রান্ত। এঁদের আর কিছু না থাকলেও সম্ভ্রমটুকু আছে। তেমনই কলকাতার বাবুরাও মুখুজ্যে, বাঁড়ুজ্যে, চাটুজ্যে বলে পরিচয় দিতে চান না,[১] এঁরা মুখার্জি, ব্যানার্জি, চ্যাটার্জি। শুধু রোমান হরফে নয়, বাংলা হরফে। দু'শ বছর পরে এঁরা পুনর্মুষিক হতে চান না। মুখুজ্যে, বাঁড়ুজ্যে, চাটুজ্যে লিখলে এঁরা খেপে যাবেন। যদিও সেটাই ছিল রীতি। একটা বংশের ইতিহাসে দু'শ বছর বড় কম সময় নয়। সেই ইতিহাসকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে হবে।

একই কথা খাটে কলকাতা সম্বন্ধে। রোমান হরফে লেখা CALCUTTA শব্দটি বানান ভুল হতে পারে, উচ্চারণ ভুল হতে পারে, কিন্তু ইতিহাস তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পরবর্তী শতাব্দীতে কানের বদলে চোখের উপর নির্ভর করা হয়, ছাপা অক্ষর পড়ে কতকগুলি রোমান হরফে লেখা নাম নতুন করে লেখা হয়। ROY-কে প্রথমে করা হয় RAI, তারপর RAY, তা বলে RAMMOHAN ROY-কে RAI করা যায় না। বা RAY করা যায় না, করলে রামমোহনের সম্ভ্রমহানি করা হবে। যেন রবীন্দ্রনাথের TAGORE-কে THAKUR লিখলে সম্মানহানি। এই দু'জনের পদবী দুটি আন্তর্জাতিক প্রসিদ্ধি পেয়েছে। অপরপক্ষে SATYAJIT RAY-কে ROY করা যায় না। কিংবা RAI BAHADUR-কে RAY BAHADUR করা যায় না। এসব কাজ করলে ইতিহাসের বিকৃতি করা হয়।

পিটার দ্য গ্রেট রুশ দেশের রাজধানী মস্কো থেকে নিয়ে যান সমুদ্রের নিকটে এক নতুন নগরে। তাঁর নাম রাখা হয় ST. PETERSBURG. সে সময় জার্মানদের সঙ্গে রাশিয়ানদের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। অভিজাত বংশের পুত্র-কন্যারা জার্মান পরিবারে বিবাহ করতেন। সুতরাং কেউ আশ্চর্য হল না যখন নতুন রাজধানীর নাম জার্মান ধাঁচে করা হল সেন্ট পিটার্সবুর্গ। পিটারের পরে ক্যাথারিন দ্য গ্রেট ছিলেন জার্মান বংশধর। রুশদেশের লোক তাঁর জন্যেও গর্বিত।

পরবর্তীকালে জাতীয়তাবাদ প্রবল হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মানির সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধ বেঁধে যায়। তখন রাতারাতি সেন্ট পিটার্সবুর্গ হয়ে যায় পেট্রোগ্রাড। 'বুর্গ' বিদেশী, 'গ্রাড' স্বদেশী। কিছুকাল পরে হয়ে গেল জারবিরোধী বিপ্লব। পেট্রোগ্রাড হয়ে গেল লেনিনগ্রাড। সোভিয়েত ইউনিয়নের জীবিতকাল চুয়াত্তর বছর। তারপর লেনিনগ্রাড নামটি পরিত্যক্ত হয়। ফিরে আবার সেই সেন্ট পিটার্সবুর্গ। জারের আমলের জার্মান গন্ধী নাম। কারণ সেই নামের একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল। সে ঐতিহ্য গৌরবময়। অনেক অত্যাচার হয়েছিল সে কথা ঠিক, কিন্তু সাহিত্যে সংগীতে নৃত্যকলায় চিত্রকলায় কত অপূর্ব কাজ হয়েছিল যার তুলনায় পরবর্তী আমলের কাজ তেমন কিছু নয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নকে আমি দোষ দিচ্ছি না। সে আমলে মানুষ গেছে মহাশূন্যে উপগ্রহ নিয়ে। একটা কুকুর মহাশূন্য ঘুরে এল। মহাশূন্য জয় করে এলেন ভ্যালেন্তিনা তেরেসকোভা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রাশিয়ানরাও জার্মানদের হারিয়েছে। দখল করেছে অর্ধেক জার্মানি, এমনকী অর্ধেক বার্লিন। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সেই নতুন ঐতিহ্য সমাপ্ত হল। মানুষ চাইল একটা পরিবর্তন। সেটা অতীতমুখে।

এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই : পঞ্চাশ বছর পরে আমাদের উত্তরপুরুষও বলতে পারে, দাও ফিরে সেই CALCUTTA লও ফিরে এই KOLKATA। যাদের আদলে KOLKATA

হয়েছে সেই MUMBAI ও CHENNAI হয়তো একই কারণে লোকের আনুগত্য হারাতে পারে। তিন শতাব্দীর BOMBAY, MADRAS-এর তুলনায় এমন কী কীর্তি দেখাতে পারে MUMBAI এবং CHENNAI যার জন্য লোকে তাদের মোহে মজে থাকবে। তারাও চাইবে বনেদিয়ানা, যদিও সেটাকে মনে হবে সাহেবিয়ানা। (তিন শতাব্দীর গৌরবময় ঐতিহ্যকে সাহেবিয়ানা ভ্রমে খারিজ করেছি, পঞ্চাশ বছর পরে অতীতমুখী পরিবর্তন ঘটতে পারে। ফিরে আসতে পারে CALCUTTA যার বাংলা উচ্চারণ 'কলকাতা'। বিদেশীরা K-কে কী উচ্চারণ করত তাতে কী এসে যায়। তারা তো KOLKATA-কেও 'খোলখাটা' উচ্চারণ করতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের আদি নাম গৌড়। বঙ্গ ছিল পূর্ববঙ্গের আদি নাম। ইতিহাসের কৌতুকে গৌড় নামটি হল বিলুপ্ত। তার সাক্ষী রইল গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়। বঙ্গও উড়ে এসে জুড়ে বসল। এর কারণ সুলতানী আমলে বঙ্গ হল বাঙ্গালা, মুঘল আমলেও তা-ই। ভাষার নাম বাঙলা, রাজ্যের নাম বাঙ্গালা। ওপারের বাংলাদেশ নামকরণ কিন্তু কেবল ভাষাভিত্তিক নয়, ইতিহাসভিত্তিকও। কবি কৃত্তিবাস রামায়ণে লিখেছেন তিনি বঙ্গদেশ ছেড়ে চলে এসেছেন। কারণ সেখানে তখন ঘোর অশান্তি। বঙ্গদেশ থেকে যেখানে তিনি এলেন সেই ফুলিয়া তখন ছিল বঙ্গদেশের বাইরে। তখন বোধহয় রাঢ় নামটি ব্যবহার করা হত। যার থেকে রাঢ়ী ব্রাহ্মণ। উত্তররাঢ়ী কায়স্থ, দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ।

'পশ্চিম' বিশেষণটি কী অপরাধ করল জানি না। 'পশ্চিম' কথাটি মনে করিয়ে দেয় দেশ বা প্রদেশ আগে একটাই ছিল যার নাম ইংরেজিতে BENGAL পতুর্গীজ ভাষায় BENGALA মুঘল আমলে বাঙ্গালা, আরো আগে বঙ্গ। একটা তুলনা দিচ্ছি। আমেরিকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, একটা স্টেটের নাম VIRGINIA গৃহযুদ্ধের সময় সেটি দু'ভাগ হয়ে যায়। বিদ্রোহীদের অংশের নাম হয় WEST VIRGINIA আর অবশিষ্ট অংশের নাম শুধুমাত্র VIRGINIA, EAST VIRGINIA নয়। গৃহযুদ্ধ কবে শেষ হয়ে গেছে। এখনো পাশাপাশি দু'টি স্টেটের নাম VIRGINIA এবং WEST VIRGINIA. বিজেতারা WEST কথাটা তুলে দেননি। রেখে দিয়েছেন ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষা করতে। একই কারণে EAST BENGAL নামটি রাখা হয়েছিল। WEST বিশেষণটি মনে করিয়ে দিত EAST BENGAL বলে একটি অংশ ছিল, যার থেকে ইস্টবেঙ্গল ফুটবল টিম। আশাকরি সেই টিমটির নাম বদলে দেওয়া হবে না। তারও একটা গৌরবময় ইতিহাস আছে।

যাই হোক সরকার যা খুশি করুন, তাঁদের ফতোয়া বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি মানতে বাধ্য নন। CALCUTTA CLUB সেই নামেই থাকবে। BENGAL CLUB তো এখন পর্যন্ত BENGAL CLUB-ই রয়েছে। সে WEST BENGAL CLUB-এ পরিণত হয়নি, BENGAL CLUB-এও নামান্তরিত হবে না। যতদূর জানি, BOMBAY STOCK EXCHANGE ওই নামেই রয়েছে। BOMBAY DYEINGও BOMBAY DYEING-ই রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে আইনসভার সিদ্ধান্ত বলবৎ নয়।

সমাধানের একমাত্র সূত্র আমি দেখছি বাংলার সঙ্গে প্রদেশ জুড়ে দেওয়া। যেমন অন্ধ্রপ্রদেশ, অরুণাচল প্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ। রাজ্যকে প্রদেশ বললে ভুল হবে না। অন্যান্য রাজ্যের বেলাতেও তাই হয়েছে।

আমি চাই বাংলাদেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য। ওদের মত না নিয়ে এক তরফা সিদ্ধান্ত

নেওয়া উচিত নয়। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারসাম্য রাখতে হলে বাংলার সঙ্গে একটা কিছু জুড়ে দিতে হয়—হয় পশ্চিম, নয় প্রদেশ। মুঘল আমলে সুবা বাঙ্গালা ব্রিটিশ আমলে হয়েছিল বঙ্গ প্রদেশ। সুতরাং প্রদেশ আখ্যাটা নজিরবিহীন নয়। আর পশ্চিম একটা ঐতিহাসিক ট্রাজেডির সঙ্গে জড়িত। সুদীর্ঘকালের বাঙালি জাতি সহসা দ্বিধাবিভক্ত হল। এটা যদি বাঙালি ভুলে যায় তাহলে সে একটা আত্মবিস্মৃত জাতি। পূর্ব নেই বলে পশ্চিম আরো মূল্যবান। পশ্চিম পূর্বের অভাব পূরণ করছে।

চল্লিশ
কলকাতা আমার ভালোবাসার শহর

আমি কলকাতার লোক নই। আমি মানুষ হয়েছি ওড়িশার ঢেঙ্কানল নামক দেশিয় রাজ্যে। ম্যাট্রিকুলেশনের পর প্রথম কলকাতায় আসি। সেটা ১৯২১ সালের মে কিংবা জুন মাসে। উদ্দেশ্য সাংবাদিক হওয়া। কিন্তু কোথাও সুবিধে করতে পারিনি। শেষ পর্যন্ত একজন সম্পাদকের পরামর্শে শর্টহ্যান্ড-টাইপরাইটিং শিখতে শুরু করি। ভালো লাগছে না বলে ছেড়েও দিই। মাসখানেক কলকাতায় ছিলাম। প্রথমে একটি অনাথ আশ্রমে আমার কাকার অতিথি হয়ে। তারপর একটা মেসে উঠি। সেখান থেকে এক ডাক্তারের বাড়িতে। একখানা ঘরে একটা খাট ভাড়া করে। অনেকরকম বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়। তখনকার দিনে কলকাতায় পাইস হোটেল ছিল। সেখানে চোদ্দ পয়সায় একটা মিল পাওয়া যেত। তাতে এক টুকরো মাছও জুটত। পয়সা ফুরিয়ে যাওয়ায় পশ্চিমা হালুয়ার দোকান থেকে চাপাটি কিনে খেতাম। চার পয়সায় চার চাপাটি। সঙ্গে তরকারি থাকত। এই সব খেয়ে শরীর খারাপ হয়ে যায়। ট্রামের ভাড়া জোগাড় করতে না পেরে হাঁটতে শুরু করি। পা কন কন করে ব্যথা শুরু হয়ে যায়। আমাকে বাধ্য হয়েই কটকে ফিরে যেতে হয়।

সে সময়ের কলকাতায় ট্রাম ছিল কিন্তু বাস ছিল না। ঘোড়ার গাড়ি ছিল কিন্তু ট্যাক্সি ছিল না। রোজ সকাল বেলায় রাস্তায় জল দেওয়ার বন্দোবস্ত ছিল। কলকাতা ছিল অনেক বেশি পরিষ্কার। রাত্রে ইলেকট্রিক লাইট ছিল না। গ্যাসের আলো ছিল। দোকান বাজারে এত বেশি ভিড় ছিল না। তখন দেশে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছে। স্কুলে কলেজে বয়কট হয়েছিল। সে সময়ে ছাত্রদের সঙ্গে মেশার সুযোগ পাইনি। পর্দা প্রথা তখনো বেশ জোরদার ছিল। ভদ্রঘরের মেয়েদের বাইরে বিশেষ দেখতে পাওয়া যেত না। ট্রাম গাড়িও তারা কোনদিন দেখেনি। কেনাকাটা করতেও পথে বেরুতো না।

অবস্থার পরিবর্তন একটু একটু করে হয়। বাস চলতে দেখা যায়। ১৯২৩ সাল পর্যন্ত কিন্তু কলকাতায় বাস দেখিনি।

বাস চলা শুরু হবার কয়েক বছর বাদে বাসে 'লেডিজ সীট' চালু হয়।

তখনকার কলকাতার বাড়ি ঘর ছিল ফাঁকা ফাঁকা, এত বেশি ঘিঞ্জি ছিল না।

এক সময় অবাক হয়ে দেখি পথে ডবলডেকার বাস চলতে শুরু করেছে। দেশভাগের আগেও কলকাতায় ঘোড়ার গাড়িতে চড়েছি। পরে তা অদৃশ্য হয়ে যায়। ট্যাক্সির যুগ আসে।

. আগের দিনে ট্যাক্সি বেশ সস্তাই ছিল।

যখন ঘোড়ার গাড়ির ভাড়া ছিল পৌনে দু টাকা তখন ট্যাক্সি নিত দু'টাকা। ফলে ঘোড়ার গাড়ি প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারল না। ঘোড়া পোষার খরচও অনেক। ফিটনে চড়ে বেশ আরামও ছিল। ফিটনে মাথার ওপর ছাত ছিল না। সব দিক দেখতে পাওয়া যেত। ফিটনে চড়ে আমরা হাওয়া খেতে যেতাম। তখনকার দিনে সাহেব পাড়ায় অনেক বড় বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোর দেখতে পাওয়া যেত। হোয়াইটওয়ে লেডল, হল অ্যান্ড অ্যান্ডারসন, আর্মি অ্যান্ড নেভি স্টোর্স—এই জাতীয় দোকানে সব রকম জিনিস কিনতে পাওয়া যেত।

শস্তা এবং দামি সব রকমই। দেশভাগের পর কলকাতা থেকে এ সব দোকান অদৃশ্য হয়ে যায়। দেশভাগের পরেও আমি বড় বড় জাহাজ দেখেছি কলকাতার গঙ্গায়।

প্রথমবার যখন কলকাতায় আসি তখন আমার মতলব ছিল কোনও এক বিদেশি জাহাজে চড়ে আমেরিকা যাবো। জানতুম না যে পাশপোর্ট লাগে, ভিসা লাগে, আর খালাসি হয়ে যাওয়া সহজসাধ্য নয়।

যাই হোক, জাহাজগুলো দেখলেও বিদেশের ছোঁয়া গায়ে লাগত।

কলকাতা তিনশো দশ বছরে পা দিল। আদতে এই কলকাতা ছিল একটা বন্দর। এই বন্দরের প্রতিষ্ঠাতা জোব চার্নক। তার আগে কলকাতা নামে যে গ্রাম ছিল তার সঙ্গে বন্দরের কোনও সম্পর্ক ছিল না। এই যে নতুন বন্দর কলকাতা তা কালক্রমে সুবে বাংলা বিহার ওড়িশার রাজধানী হয়ে উঠল। এর নামের বানানটা রোমান হরফে লেখা হলেও এটা ইংরেজি শব্দে পরিণত হয়নি। তখনকার দিনে বানানের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ছিল না। যে কারণে ঠাকুর হয়ে গেল TAGORE সেই কারণে কলকাতা হয়ে গেল 'Calcutta'. উচ্চারণ গোড়ায় বাংলার মতোই ছিল। পরে হয়ে যায় ইংরেজির মতো। তখনকার সাহেবদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সাহেব ঘেঁষা বাঙালিরাও 'ঠাকুর'কে বলতো TAGORE, সাহেবদের 'কোলকাটাকে' উচ্চারণ করতো CALCUTTA, উচ্চারণ অন্যরকম হয়ে গেল। তার জন্য আগেকার বাংলাকে দোষ দেওয়া যায় না। পরবর্তীকালে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়।

হান্টার সাহেব সেই পদ্ধতির প্রবর্তক। হান্টার সাহেবের পদ্ধতি অনুসরণ করলে 'ঠাকুর' হয়ে যেত 'THAKUR' আর কলকাতা' হয়ে যেত 'KALKATA' এখন যাঁরা লিখছেন 'KOLKATA' তাঁরা হান্টারের পথ অনুসরণ করছেন না।

মনে রাখতে হবে 'কলকাতা' শহরটা শুধু বাঙালিদের নয়, এর ওপর অধিকার সারা বিশ্বের। বাঙালিরা উচ্চারণ করে 'কলকাতা' ওড়িয়ারা 'কলকাতা', পশ্চিমারা কলকাত্তা, একজন পূর্ববঙ্গীয় জমিদার তনয়ের মুখে শুনেছি, 'কলকাত্তা'। কলকাতার আদি বাসিন্দারা বলেন, 'কলকেতা'।

শহরের নাম পরিবর্তন করতে হলে শুধুমাত্র বাঙালিদের মত নয়, আর সকলের মতও নিতে হবে। একদলের ইচ্ছাকে সকলের বলে চাপিয়ে দেওয়া চলবে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অত বিখ্যাত পদবীকেও কেউ কেউ উচ্চারণ করেন "TAGORE" কেউ কেউ "TAGOREE" জাপানীরা "TANGORE". কলকাতাকে জার্মানরা উচ্চারণ করে, 'কালকুট্টা'।

এ সব ক্ষেত্রে উচ্চারণটাই আসল নয়, বানানটাই আসল। আর সে বানান সর্বসম্মত হলেই ভালো।

এখন পর্যন্ত তিনশো বছরের ওপর কলকাতার নাম 'CALCUTTA' চলে আসছে।

এর একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। ইতিহাসের বইগুলোকে আমরা খুশিমতো পাল্টাতে পারব না। সরকারি দলিলগুলোকেও বদলাতে পারা যাবে না। বড় বড় কোম্পানির নথিপত্র পাল্টানো যায় না। সব বিবেচনা করলে পুরনো বানানটাকেই প্রাধান্য দিতে হয়। তবে নতুন বানানেও আপত্তি নেই। অবশ্য সেটা যদি হয় বহুলোকের পছন্দ। এই যেমন 'INDIA' নামও চলছে আবার 'HIND' নামও চলছে। শব্দটা একই। বানান দু রকম।

যে কলকাতা তিনশো দশ বছরে পা দিল সে কলকাতা গ্রাম কলকাতা নয়, বন্দর কলকাতা। তার প্রতিষ্ঠাতা জোব চার্নক একজন ইংরেজ। তিনি না এলে কলকাতা গ্রামই থাকতো, বন্দর হত না। ইংরেজরা না জিতলে কলকাতা রাজধানীও হত না। এই হল কলকাতার নেপথ্য ইতিহাস। এটা শুধু বাঙালির ইতিহাস নয়, ভারতের তথা পৃথিবীর ইতিহাস।

কলকাতা আমার ভালোবাসার শহর। এ শহর আছে আমার রক্তের সঙ্গে জড়িয়ে।

একচল্লিশ

নাম বদল

সাতচল্লিশ সালের আগে আমরা কেউ স্বপ্নেও ভাবিনি যে বঙ্গ আবার দু ভাগ হবে। দুই ভাগের নাম পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ। ইংরেজিতে ইস্টবেঙ্গল ও ওয়েস্টবেঙ্গল। এই ভাগাভাগি হয়েছিল আমাদের ইচ্ছায় তথা সম্মতিতে।

এরপর কেটে গেল চব্বিশ বছর। আমরা যারা এপারে বাস করি তারা ভাবতেই পারিনি যে ওপারে একটা মুক্তিযুদ্ধ বাধবে। আমরা খবরই রাখতুম না যে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর সহকর্মীদের জিজ্ঞাসা করবেন, 'আমাদের দেশ যখন স্বাধীন হবে তখন তার নাম কী হবে?' এর উত্তরে একজন বলবেন, 'পুব বাংলা' আর একজন বলবেন, 'পাক বাংলা'। মুজিবর রহমান তখন বলেন, 'না, আমাদের দেশের নাম হবে বাংলাদেশ।' তিনিই স্থির করেন, জাতীয় সংগীত হবে 'আমার সোনার বাংলা।' বাংলাদেশ নামটির একটি ঐতিহ্য ছিল আর সোনার বাংলা গানটির একটি জাদু ছিল। অমন প্রেরণাদায়ক নাম ও গান আর ছিল না। লক্ষলক্ষ মানুষ অকাতরে প্রাণ দিল এই প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে। নয় মাস তুমুল যুদ্ধের পর দেশ যখন স্বাধীন হল তখন তার নাম রাখা হয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। ভারত সর্বপ্রথম—অন্যান্য দেশ একে একে—সেই নামকরণ স্বীকার করে নিল।

এটা একাত্তর সালের ঘটনা। এর বছর দুই বাদে রব উঠল, ওপার থেকে 'পূর্ব' যদি লুপ্ত হয় তবে এপারে 'পশ্চিম' কেন থাকবে? চাইনে আমরা পশ্চিমবঙ্গ, চাইনে ওয়েস্ট বেঙ্গল। কিন্তু কোনটা চাই সেটা নিয়ে নানা মুনির নানা মত। কেউ বলেন 'বাংলা', কেউ বলেন 'বঙ্গ', কেউ বলেন 'বঙ্গভূমি'। সর্বসম্মত বিকল্প খুঁজে পাওয়া গেল না। সেই কারণে স্থিতাবস্থা বহাল রইল।

তারপর কেটে গেল চব্বিশ-পঁচিশ বছর। আবার রব উঠল 'পশ্চিমবঙ্গ' চাইনে, আমরা চাই 'বাংলা'। 'ওয়েস্টবেঙ্গল' চাইনে, আমরা চাই রোমান হরফে বাংলা। সেবারকার

পুরনো যুক্তি তো ছিল, এবারে নতুন যুক্তি হল—ভারতের রাজ্য তালিকায় 'ওয়েস্টবেঙ্গল' সকলের শেষে। যেহেতু রোমান বর্ণমালায় 'ডবলিউ' প্রায় শেষের কাছাকাছি। এর ফলে কেন্দ্রীয় স্তরে রাজ্যের দাবি অবহেলিত হচ্ছে। অতএব এর প্রতিকার—নতুন নামকরণ। এই নামটি হবে 'বাংলা', রোমান হরফে 'Bangla'. ভারতের রাজ্য তালিকায় বাংলা আসবে অন্ধ্রপ্রদেশ, অরুণাচল প্রদেশ ও অসমের পরে। তার ফলে রাজ্যের দাবি আর অবহেলিত হবে না।

কিন্তু এর জন্য বিধানসভার প্রস্তাবই যথেষ্ট নয়, চাই সংবিধান সংশোধন। তার জন্য লোকসভায় দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোট। উপরন্তু অর্ধেক সংখ্যক রাজ্যের অনুমোদন। এই দুটি শর্ত পূরণ করতে পারলে দিল্লিতে গিয়ে দরবার করতে হবে। সভায় পশ্চিমবঙ্গের আসন সংখ্যা মাত্র ৪২ আর দুই-তৃতীয়াংশ সংবিধান সংশোধনের জন্য আবশ্যক ৩৩৭টি ভোট। তার জন্য নির্ভর করতে হবে অন্যান্য রাজ্যের প্রতিনিধিদের উপরে। তাঁদের মধ্যে নীচের দিকে স্থান ওয়েস্ট বেঙ্গলের মতো তামিলনাড়ু ও উত্তরপ্রদেশের। তারাও তো অবহেলিত বোধ করতে পারেন। তাঁরাও তো নাম পরিবর্তন চাইতে পারেন। উত্তর প্রদেশ চাইতে পারে তার নাম হোক আর্যাবর্ত। তামিলনাড়ুও চাইতে পারে তার নাম হোক আদি দ্রাবিড়। এই ধরনের খেলা আরো কেউ কেউ খেলতে পারে। সুতরাং বাংলার পক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা আমরা আশা করতে পারিনে। বড় জোর এই মর্মে একটি ফয়সলা হবে যে ওয়েস্ট বেঙ্গলের স্বদেশী নাম হবে 'পশ্চিমবঙ্গ'। আর সেটাই হবে রোমান হরফে 'Paschim Banga'.

শেষ পর্যন্ত এবারেও সেবারের মতো স্থিতাবস্থা বহাল থাকবে। ওয়েস্ট বেঙ্গল রদ করতে পারো, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ বদল করতে পারবে না। এটাই সাতচল্লিশ সালের প্রতিষ্ঠাতাদের ইচ্ছা। এবং তাঁদের সেই সিদ্ধান্তই শেষ পর্যন্ত বলবৎ হবে, যদি না আমরা হিন্দিপ্রধান ভারতের বাহুপাশ থেকে মুক্ত হবার জন্যে লক্ষ লক্ষ প্রাণ বিসর্জন দিতে রাজি হই।

বিয়াল্লিশ
রবীন্দ্র পুরস্কার প্রসঙ্গে

কলেজ জীবনে পড়েছিলুম ব্রাউনিঙ-এর লেখা Rabbi Ben Ezra শীর্ষক কবিতা, তাতে ছিল 'Grow old along with me! The best is yet to be'– তখন সেকথা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারিনি। আমার মতে, বার্ধক্য হচ্ছে ক্ষয়ের বয়স, জয়ের বয়স নয়। আমি চাই যৌবন শেষ হতেই চলে যেতে। ওড়িয়াতে একটি কবিতা লিখেছিলুম, তাতে ছিল 'যৌবন সাথে যাউ জীবন মোর', তার মানে যৌবনের সাথে যাক জীবন আমার। আমার মায়ের মৃত্যু হয়েছিল পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে। আমি ধরে নিয়েছিলুম যে পঁয়ত্রিশ বছরই আমার পরমায়ু। সেইজন্য আমার পরিকল্পনা ছিল, পাঁচ খণ্ডে "সত্যাসত্য" উপন্যাস শেষ করে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেই আমার জীবনযাত্রা শেষ করব। তখন খেয়াল হয়নি, বিয়ে করতে হবে, সন্তানের জনক হতে হবে। তারপর এটাও ভাবতে পারিনি যে ছয় খণ্ড লিখে শেষ করতে আটত্রিশ বছর বয়স হবে। যাইহোক, "সত্যাসত্য" লেখা শেষ করে আমার মনে হল, আমার জীবনের

কাজ শেষ হয়েছে। এখন যা বাকি আছে তা ছোটখাটো সাহিত্যকর্ম। যেমন ছড়া, যেমন গল্প, যেমন প্রবন্ধ।

কিন্তু লিখতে লিখতে দেখা গেল আর একটি উপন্যাস না লিখে আমি মুক্ত হতে পারব না। সেটি একটি প্রেমের উপন্যাস। বুদ্ধদেব বসু তা শুনে বললেন, 'এই কাহিনী আপনি লিখবেন না, কাহিনীই আপনাকে দিয়ে নিজেকে লিখিয়ে নেবে।' সেই কাহিনীর পরিকল্পনা আমাকে বাঁচতে প্রেরণা দেয়। অগত্যা ছেষট্টি বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকতে হল। এইবার আমার ছুটি।

কিন্তু এক এক করে হাজির হতে লাগল বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ। এমনই করে পৌঁছে গেলাম পঁচাত্তর বছর বয়সে। একজন জ্যোতিষী বলেছিলেন যে সেইপর্যন্ত আমার পরমায়ু। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আমার পরমায়ু শেষ হতে চায় না। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, গণ সত্যাগ্রহ, ডাইরেক্ট অ্যাকশন, পার্টিশন, স্বাধীনতা ও মহাত্মা গান্ধীর মহাপ্রয়াণ অবলম্বন করে আর একটি উপন্যাস আরম্ভ করি। তার নাম "ক্রান্তদর্শী"। সেটি যখন শেষ হল তখন আমার বয়স বিরাশি। আমার স্ত্রী বললেন, 'এইবার তোমার জীবনের কাজ শেষ হল।'

দেখলুম আমার আরো কিছু কর্তব্য আছে যা সম্পন্ন করে যেতে না পারলে আমার মনে অতৃপ্তি থেকে যাবে। দেখতে দেখতে ৯০ পার হলুম। এমন সময় "সানন্দা" পত্রিকা থেকে অনুরোধ এল, একটি প্রবন্ধ লিখতে হবে—তিনটে বিষয়ের একটি নিয়ে। যেটি আমার কাছে সহজ মনে হল সেটি "নব্বই পেরিয়ে' শীর্ষক প্রবন্ধ। "সানন্দা"-য় প্রকাশের পর সেটির সঙ্গে আরো কয়েকটি সমসাময়িক বিষয়ের প্রবন্ধ যোগ করে আমি বই বার করে দিই। নব্বই পার করে যেকোনো দিন চলে যেতে পারি। এরজন্যে আমি ছিলুম প্রস্তুত। হাতের কাজ মোটামুটি শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু এখনো আর দু'খানি বই লেখা বাকি।

ভগবানকে প্রার্থনা জানাই, আমি পুরস্কার চাইনে, আমায় পুরস্কার দিয়ো না, আমাকে শুধু এই দুখানি বই লেখার প্রেরণা জোগাও। কিন্তু তাঁর উলটো বিচার। আমার সুপারিশ অগ্রাহ্য করে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রক আমাকে দিলেন রবীন্দ্র-পুরস্কার। রবীন্দ্র পুরস্কার না হলেও আমি অন্য কয়েকটা পুরস্কার পেয়েছি। যেমন সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার, বিদ্যাসাগর পুরস্কার, নজরুল পুরস্কার, শিরোমণি পুরস্কার, আনন্দ পুরস্কার, বাংলাদেশ থেকে বেগম জেবুন্নেসা ও কাজী মাহবুবুল্লাহ জনকল্যাণ ট্রাস্ট-এর পুরস্কার। এই শেষের পুরস্কারটির অর্থমূল্য ভারতীয় মুদ্রায় অষ্ট-আশি হাজার টাকা। এর অর্ধেক টাকা আমি আমাদের বাংলা আকাদেমিকে দিয়েছি। সেই টাকা থেকে প্রত্যেক বছর লীলা রায়স্মারক বক্তৃতা দেওয়া হবে। মাঝে মাঝে বাংলাদেশ থেকেও সাহিত্যিক বিষয়ের বক্তা আসবেন। এই কথা শুনে আমার ছোটছেলে বলে, লীলা রায় স্মারক বক্তৃতার বদলে লীলা রায় স্মারক পুরস্কার দিলেই ভালো হত। বাকি অর্ধেক টাকা মজুদ রেখেছি লীলা রায়ের অপ্রকাশিত রচনা প্রকাশ করার জন্য। সে টাকা আমি হাতছাড়া করতে পারব না। তাই আমি চিন্তিত ছিলুম, লীলা রায় স্মারক পুরস্কারের জন্য আমি টাকা পাই কোথায়? সেই চিন্তা দূর হল রবীন্দ্র পুরস্কারের সংবাদ শুনে। এই পুরস্কারের সমগ্র অর্থই পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমিকে দেব। তার থেকে লীলা রায় স্মারক পুরস্কার দেওয়া হবে।

এবারের রবীন্দ্র পুরস্কারের স্বাদটি খুবই চমকপ্রদ। ছিয়ানব্বই বছর বয়সে এক ব্যক্তি

পুরস্কার পাচ্ছেন নব্বই বছর বয়স পার হয়ে একখানি প্রবন্ধ পুস্তক লেখার সুবাদে। এর কোনও নজির আমি খুঁজে পাচ্ছিনে। আমি শুধু বলতে পারি যে আমি রবীন্দ্র পুরস্কারের প্রত্যাশী ছিলুম না। সে প্রত্যাশা অনেক আগেই আমার মন থেকে মুছে গিয়েছিল। এই পুরস্কার আমার কাছে এক মহাবিস্ময়। আমি এর জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ।

লেখকের পক্ষে পুরস্কার পাওয়াটাই সবচেয়ে বড় কথা নয়, লেখক কী পেয়ে গেলেন তার চেয়ে বড় কথা তিনি কী দিয়ে গেলেন। আমি যদি হাতখালি করে আমার যা দেবার তা দিয়ে যেতে পারি তাহলেই আমি কৃতার্থ। সেইটেই হচ্ছে 'the best is yet to be'.

রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের পরে কয়েকজন সাহিত্যিক বন্ধু প্রস্তাব করেন যে কবিগুরুর স্মরণে একটি পুরস্কার প্রবর্তন করা হোক। তাঁদের মধ্যে আমি ছিলুম একজন। উদ্যোক্তারা চাঁদা তুলতে আরম্ভ করেন। আমিও যৎকিঞ্চিৎ চাঁদা দিয়েছিলুম। সকলে বুঝতে পারেন যে বেসরকারিভাবে পুরস্কার দেওয়া প্রত্যেক বছর সম্ভব নয়। সুতরাং এ দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে। সরকার তখন অবিভক্ত বঙ্গের সাম্প্রদায়িক সরকার। তাঁদের আনুকূল্য চাইতে কেউ রাজি হন না। কিছুদিন পরে বাংলা দুভাগ হয়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস সরকার গঠন করেন। রবীন্দ্র পুরস্কারের প্রসঙ্গটা তাঁদের কাছে পেশ করা হয়। তাঁরা সানন্দে গ্রহণ করেন। তখন কোনও কমিটি ছিল না। আমিও সে কমিটির সদস্য ছিলুম না।

প্রথম বছরের পুরস্কারটি দেওয়া হয় একজন অজ্ঞাতনাম গ্রন্থকারকে। নাম সতীনাথ ভাদুড়ী। 'জাগরী' নামক তাঁর উপন্যাসটিও অখ্যাত। শোনা গেল মফস্বলের একটি অনামী পত্রিকায় উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল। ভাগ্যক্রমে অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের নজরে পড়ে। তিনিই নাকি সরকারকে পরামর্শ দেন 'জাগরী'র জন্য সতীনাথ ভাদুড়ীকে পুরস্কার দিতে। একটি কপি আসে আমার বাড়িতে।

লীলা রায় 'জাগরী' পড়ে মুগ্ধ হন। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সেটি তিনি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। তার ইংরেজি নাম দেন 'Vigil'; তারপর পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দেন আমেরিকায় তাঁর এক বন্ধুর কাছে। কিন্তু নিউ ইয়র্ক-এর এক বিশিষ্ট প্রকাশক অনুবাদটি পড়ে বলেন, 'বইটি তো ভালোই, কিন্তু দশ হাজার কপি বিক্রি হবেনা। আমাদের লোকসান হবে।' এরপরে পাণ্ডুলিপিটি পাঠিয়ে দেওয়া হল লন্ডনে। একজন বিশিষ্ট প্রকাশক সেটি পড়ে বললেন, 'বইটি তো ভালোই কিন্তু পাঁচ হাজার কপি বিক্রি হবে না। আমাদের লোকসান হবে।' দৈবক্রমে Unesco-র একজন কর্মকর্তার সঙ্গে লীলা রায়ের পরিচয় ছিল। তাঁর নামটি বোধহয় রোজের থল। তিনি পাণ্ডুলিপি পড়ে আশ্বাস দেন, ইউনেস্কো-র তরফ থেকে সেটি প্রকাশিত হবে। তিনি কথা রাখলেন। ইউনেস্কো-র অর্থানুকূল্যে বোম্বাইয়ের ইন্টারন্যাশনাল বুক হাউস সেটি প্রকাশ করেন। একটি কপি পাঠানো হয় সতীনাথ ভাদুড়ীকে। তিনি ছিলেন গুরুতর অসুস্থ। বইখানি হাতে পাওয়ার একদিন কি দুদিন বাদে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

রবীন্দ্র পুরস্কার প্রবর্তিত না হলে 'জাগরী'' পুরস্কার পেত না। লীলা রায়ের হাতে না এলে তিনি ইংরেজিতে অনুবাদ করতেন না। তিনি অনুবাদ না করলে ইউনেস্কো-র আনুকূল্যে সেটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেত না। সতীনাথ ভাদুড়ীর নামও বাংলার বাইরে কেউ জানত না। এইখানেই রবীন্দ্র পুরস্কারের গুরুত্ব।

এরপরে একদিন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের ছেড়ে যান। তখন আমরা প্রস্তাব করি, তাঁর "ইছামতী" উপন্যাসটির জন্য তাঁকে মরণোত্তর পুরস্কার দেওয়া হোক।

এরপরে আর কাকে কাকে কী কী বইয়ের জন্য পুরস্কার দেওয়া হল তা আমি বলতে পারব না। ততদিনে আমি কলকাতা ছেড়ে শান্তিনিকেতনে।

ষাটের দশকের মাঝখানে একবার আমার ডাক পড়ে রবীন্দ্র পুরস্কারের বৈঠকে যোগ দিতে। দেখলুম সেটি কেবল সাহিত্যের জন্য পুরস্কার প্রদান উপলক্ষে নয়, বিজ্ঞানের জন্যেও এবং ইংরেজিতে লিখিত বাঙালির জীবন সম্বন্ধে গ্রন্থের জন্যেও বটে। এরপরে সেই কমিটি তিন ভাগ হয়ে যায়। সাহিত্যের জন্য যে কমিটি হয় তার চেয়ারম্যান করা হয় আমাকেই। আমার সাথীরা ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী, ক্ষুদিরাম দাস, হরপ্রসাদ মিত্র প্রমুখ কয়েকজন।

প্রত্যেক বছর আমরা মোটামুটি একমত হয়ে পুরস্কারের জন্য বইয়ের নাম ও লেখকের নাম সুপারিশ করতুম। বছর দশেক ধরে আমি সভাপতিত্ব করেছি। কোনবার কোনও বিতর্ক হয়নি। কিন্তু শেষকালে ঘটে গেল এক বিভ্রাট। সতীকান্ত গুহের 'নাট্যকার'' উপন্যাসটি যখন আমাদের সামনে আসে তার একমাত্র বিকল্প বই ছিল ''হুগলি জেলার ইতিহাস।'' অধিকাংশের ভোটে স্থির হয় ''নাট্যকার'' উপন্যাসটির জন্য সতীকান্ত পাবেন রবীন্দ্র পুরস্কার। আমরা কেউ ভাবতেই পারিনি যে ''নাট্যকার'' নিয়ে হুলুস্থুল পড়ে যাবে।

ঠিক সেই সময়েই সতীকান্তবাবুর বাড়িতে একটা দুর্ঘটনা ঘটে। সেটি তাঁর পুত্রবধূর অস্বাভাবিক মত্যু। পুলিশ তাঁকে, তাঁর স্ত্রীকে ও তাঁর পুত্রকে ধরে নিয়ে যায়। পরের দিন তিনি ও তাঁর স্ত্রী ছাড়া পান। পুত্রের বিরুদ্ধে মামলা চলে। পুরস্কারের সঙ্গে মামলার কী সম্পর্ক? কিন্তু লোকমানসে দুটো একাকার হয়ে যায়। আর সতীকান্তবাবু হন সর্বজননিন্দিত। তাঁর সঙ্গে জড়িয়ে আমরাও।

রবীন্দ্র পুরস্কার প্রথমে দেওয়া হয় গ্রন্থের খাতিরে গ্রন্থকারকে। যেমন 'জাগরী'র খাতিরে সতীনাথ ভাদুড়ীকে। পরে দেওয়া হয় গ্রন্থকারের খাতিরে গ্রন্থকে। যেমন বিভূতিভূষণের খাতিরে ''ইছামতী''কে। তারপর থেকে কখনো গ্রন্থের খাতিরে গ্রন্থকারকে কখনো গ্রন্থকারের খাতিরে গ্রন্থকে। এই রীতি অনুসারে সতীকান্তবাবুর খাতিরে 'নাট্যকার'-কে। সে বই তিনি না লিখে যদি আর কেউ লিখতেন তাহলে আমরা নিশ্চয়ই ইতস্তত করতুম। আমি নিজে একটি নিয়ম প্রবর্তন করেছিলুম। এবছর যদি কোনও বই পুরস্কার যোগ্য না হয় তাহলে আগের বছরের পুরস্কার না পাওয়া কোনও উপযুক্ত গ্রন্থকে পুরস্কার দেওয়া হবে। কথাটা আমার মনে ছিল না। ''নাট্যকার''কে পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্ত পাস হয়ে যাওয়ার পরে আমার মুখে একটা কিন্তু-কিন্তু ভাব লক্ষ করে আশাপূর্ণা দেবী বলেন,'মৈত্রেয়ী দেবীর ''ন হন্যতে'' বইখানিকে গতবার পুরস্কার দেওয়া হয়নি—এবার পুনর্বিবেচনার কথা ছিল।' আমি তখন বললুম, 'আপনি আমাকে মনে করিয়ে দিলেন না কেন?'

আসলে ''নাট্যকার'' বইখানি ছিল সুলিখিত। তার ভাষা ভালো, তার শৈলী ভালো, কিন্তু তার বিষয় ছিল হত্যার পর হত্যা। আমার সেটা একটুও ভালো লাগেনি। কিন্তু কী করি? সতীকান্তবাবুর কাছে আমরা ছিলুম বহু ব্যাপারে কৃতজ্ঞ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরে কলকাতায় আমরা একটি প্রীতি সম্মেলনের আয়োজন করি। আমাদের দূত হয়ে একজন ঢাকায় গিয়ে দশ-পনেরোজনের বদলে পঞ্চাশজনকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আসেন। কার্যকালে দেখা গেল দেড়শোজন এসে উপস্থিত। অধিকাংশই অসাহিত্যিক। এই বিপদে

আমাদের মুখরক্ষা করেন সতীকান্তবাবু। তিনিই বাড়তি একশোজনকে তাঁর নিজের খরচে আশ্রয় ও আতিথ্য দেন। বাংলাদেশ থেকে যাঁরা আসেন তাঁদের অভ্যর্থনা করতে দমদম বিমানবন্দরে আমার সঙ্গে যান সতীকান্তবাবু।

এছাড়া সতীকান্তবাবুর আরো একটি ভূমিকা ছিল। ভারত সরকারের আমন্ত্রণে ইউরোপ থেকে যেসব সাহিত্যিক আসতেন কলকাতায় তাঁদের জন্য সান্ধ্য পার্টির আয়োজন করতে বলা হত সতীকান্তবাবুকে। তিনি নিজের খরচে তাঁর বৈঠকখানায় সান্ধ্যপার্টি দিতেন। বিদেশীদের সঙ্গে আলাপ করার জন্য ডাকা হত আমাদের ও প্রেমেন্দ্র মিত্রকে। সমস্ত খরচ বহন করতেন সতীকান্তবাবু। এছাড়া কলকাতায় যেকোনও বড় মাপের অনুষ্ঠান করলে অর্থের জন্য যেতে হত সতীকান্তবাবুর কাছে। লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন এটা ছিল সে কালের প্রবাদ। একালের গৌরী সেন সতীকান্ত গুহ। এমন একটি মানুষকে সামান্য পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দিতে গিয়ে আমরা এমন নাকাল হব আর তিনি নিতে গিয়ে এমন নাকাল হবেন এটা ছিল কল্পনাতীত।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখি যে একবার সতীকান্তবাবুর সান্ধ্য পার্টিতে একজন রোমানিয়ান লেখক এসেছিলেন। তিনি বলেন তাঁদের ভাষায় "মৈত্রেয়ী" নামে একটি উপন্যাস আছে। সেই গ্রন্থের নায়িকা নাকি তখনো জীবিত আছেন। ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান, কিন্তু ঠিকানা জানেন না। আমরা তাঁকে ঠিকানা জানাই। মৈত্রেয়ী দেবী তাঁর মুখ থেকেই প্রথমে শুনতে পান যে রোমানিয়ান ভাষায় তাঁর নামে একটি উপন্যাস আছে। ফরাসি ভাষায় সেটির তর্জমা বেরিয়েছে। তিনি বইটির ফরাসি তর্জমা পড়ে বাংলা ভাষায় তার একটি উত্তর লেখেন। সেই উত্তরের নাম "ন হন্যতে"। বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে দুটি বিভিন্ন ভাষায় লেখা দুজন বিভিন্ন লেখক লেখিকার একই কাহিনী অবলম্বন করে দুখানি বইয়ের দৃষ্টান্ত এর আগে কখনো দেখা গেছে কিনা বলতে পারব না। এই-ই বোধহয় প্রথম। এর জন্য ধন্যবাদ দিতে হয় সেই রোমানিয়ান ভদ্রলোককে ও তিনি যাঁর সান্ধ্যপার্টির অতিথি সেই সতীকান্ত গুহকেও। এরকম যোগাযোগ না ঘটলে মৈত্রেয়ী দেবী কোনদিনই "ন হন্যতে" লিখতেন না। আর আমরা তার জন্য তাঁকে পুরস্কার দেওয়ার কথা বিবেচনা করতুম না।

এখন মনে হচ্ছে মৈত্রেয়ী দেবীকে "ন হন্যতে"র জন্য প্রথমবারেই রবীন্দ্র পুরস্কার দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সেটা দিলে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে বঞ্চিত করা হত। আমাদের সামনে ছিল অচিন্ত্যকুমারের কাব্য সংকলন। তিন-চারটে বাদে আর সমস্ত কবিতাই পুরস্কারের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমার পূর্বে লিখিত। সেই কয়েকটি কবিতার সুবাদে অচিন্ত্যকুমারকে রবীন্দ্র পুরস্কার দিতে প্রেমেনের ঘোর আপত্তি ছিল। আমি সেটা খণ্ডন করে বলি, 'সেই দু-চারটে কবিতা যদি পুরস্কারযোগ্য হয়ে থাকে তবে সেই সুবাদে কবিকে পুরস্কার দেওয়া অহেতুক নয়।' অচিন্ত্যকুমারকে পুরস্কার দেওয়া হয়। সেটি পাবার কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর জীবনাবসান ঘটে। তাঁকে সে বছর বঞ্চিত করা হলে আর কখনো তাঁর ভাগ্যে পুরস্কার জুটত না। অথচ তাঁকে বঞ্চিত না করতে গিয়ে মৈত্রেয়ী দেবীকে বঞ্চিত করতে হল। এর জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত। আমায় এটাও কবুল করতে হবে যে সতীকান্তবাবুকে বঞ্চিত করলে আমার দুঃখ কিছুমাত্র কমত না। যদিও তাঁর বইখানি পুরস্কারের অযোগ্য।

যাইহোক, এ বিভ্রাটের নিট ফল হল রবীন্দ্র পুরস্কার কমিটি উঠে গেল। পুরস্কারের

যাবতীয় দায়দায়িত্ব নিলেন সরকার স্বয়ং। প্রত্যেক বছর আমার কাছে চিঠি আসত কোনও একজন যোগ্য ব্যক্তির নাম সুপারিশ করতে ও তাঁর লেখা বইগুলির নাম উল্লেখ করতে। এবারেও আমি একজন সুপরিচিত সাহিত্যিকের নাম সুপারিশ করেছিলুম। পুরস্কারটি তাঁকে না দিয়ে আমাকে দেওয়া হবে এটা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। ইংরেজিতে একটা কথা আছে সব ভালো যার শেষ ভালো।

তেতাল্লিশ
গৌরী

গৌরী দত্ত ছিল আমার জ্যেষ্ঠপুত্র পুণ্যশ্লোকের সহপাঠিনী শান্তিনিকেতনের বিদ্যাভবনে। দুজনেই বি.এ. অনার্স পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়। তাদের বিষয় ছিল দর্শনশাস্ত্র। শান্তিনিকেতনে সে সময় এম.এ. পড়ার ব্যবস্থা ছিল না। পুণ্যশ্লোক চলে যায় জার্মানিতে আর গৌরী কলকাতায়।

ঐতিহাসিক একুশে ফেব্রুয়ারির বর্ষপূর্তির দিন শান্তিনিকেতনে আমরা পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের নিমন্ত্রিত সাহিত্যিকদের নিয়ে সাহিত্যমেলার আয়োজন করি। সেসময় নিমাই চট্টোপাধ্যায় ও গৌরী দত্ত মেলার সাফল্যের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিল। গৌরীর একটি সাইকেল ছিল। সেটি চড়ে সে দুয়ারে দুয়ারে সাহায্য চাইত।

এরপরে ওর সঙ্গে আমার কদাচিৎ দেখাসাক্ষাৎ হত।

আইয়ুব সাহেবের সঙ্গে গৌরীর বিয়ে আমাদের সবাইকে চমকে দেয়। ওর বাবা অধ্যাপক ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত দারুণ আঘাত পান। যে মেয়েকে তিনি প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন সে মেয়ের তিনি মুখদর্শন করেন না। আইয়ুব সাহেব কিছুদিন শান্তিনিকেতনে পড়িয়েছিলেন। সেই সূত্রে আমার পুত্র পুণ্যশ্লোকের সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। তিনি Quest বলে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। পুণ্যশ্লোক ও আমি দুজনেই সেই পত্রিকায় লেখা দিতুম। আমি শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় এলে মাঝে মাঝে আইয়ুব ও গৌরীর বাসভবনে গিয়ে দেখা করতুম।

কলকাতার পড়া সাঙ্গ করে গৌরী একটি কলেজে অধ্যাপনা শুরু করে কিন্তু আর কোনদিন শান্তিনিকেতনে আসে না। শান্তিনিকেতনের পক্ষে এটা একপ্রকার ক্ষতি। আমরা ঘটনাচক্রে শান্তিনিকেতন ছেড়ে কলকাতায় বাস করতে বাধ্য হই। তখন আইয়ুব ও গৌরীর সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখাসাক্ষাৎ হয়। আইয়ুব সাহেবের মৃত্যুদিন আমরা তাঁর বাসভবনে হাজির হই। গৌরীই স্থির করে আইয়ুবের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ইসলামিক শরিয়া মতে হবে। আইয়ুব কোনও ধর্মমতে বিশ্বাস করতেন না। তাঁদের পুত্র মুসলিম মতে মানুষ হয়নি। গৌরী তাকে সুন্নত করতে দেয়নি। পূষণ চম্পাকলি নামে একটি ব্রাহ্মণকন্যাকে বিবাহ করে। আমি সেই বিবাহসভায় উপস্থিত ছিলুম।

এর কিছুদিন পরে গৌরী কঠিন অসুখে পড়ে। মাঝখানে পূষণের কাছে বম্বেতে গিয়ে খানিকটা সুস্থ হয়ে এসেছিল। তার শেষ জীবন খুবই দুঃখের। তা সঙ্গে দেখা করতে গেলে সে দেখা দিতে রাজি হত না। তার মৃত্যুসংবাদ শুনে আমরা মর্মাহত হই। সে তার প্রাণহীন

দেহ দান করে গিয়েছিল। হিন্দু বা মুসলিম কোনও মতেই তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয় না। তার স্মরণসভায় আমি উপস্থিত ছিলুম। তার অগণ্য বন্ধুবান্ধব সভায় সমবেত হয়েছিলেন।

শুনেছি তার পিতার মৃত্যুর পূর্বে মৈত্রেয়ী দেবী গৌরীকে শান্তিনিকেতনে তার পিতার কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তাকে আশীর্বাদ করেন।

গৌরী মৈত্রেয়ী দেবীর খেলাঘরের কাজে সহকর্মী ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় শরণার্থীদের সাহায্য করতে মৈত্রেয়ী ও গৌরী প্রাণপাত পরিশ্রম করেছিলেন। শরণার্থীরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মুসলমান ছিলেন। গৌরী নিজে মুসলমান হননি। কিন্তু তিনি তাদের সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন।

চুয়াল্লিশ
গরবাচভ-রাজীব দলিল

সহ-অস্তিত্ব না সহ-নাস্তিত্ব? এই প্রশ্নটা দিন দিন জরুরি হয়ে উঠছে। মারণাস্ত্রের ঘোড়দৌড় এখন পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্রের সীমানা ছাড়িয়ে মহাশূন্যচারী অস্ত্রের সন্ধানে বেরিয়েছে। সেটা মারণাস্ত্রের মারণাস্ত্র। এরপরে হয়তো দেখা যাবে তারও কাটান আছে। দেখতে তো সাধ যায়। কিন্তু যুদ্ধ একবার শুরু হয়ে গেলে এ যাত্রা কেউ বেঁচে থাকবে না। মানুষ তো নয়ই, পশুপাখি গাছপালা পোকামাকড়ও না।

তাহলে যুদ্ধ বাধতে না দিলেই হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতেও পশ্চিম ইউরোপের কতক চিন্তাশীল ব্যক্তি এই কথাই ভেবেছিলেন। একটা আন্তর্জাতিক ফেডারেশনের কল্পনা তাঁদের মনেই প্রথম উদয় হয়। কিন্তু শতাব্দীর শেষ দশকে যুদ্ধ না বেধে যায় আর সেই বিপ্লবকে প্রতিহত করতে যে প্রতিবিপ্লব বাধে তার পরিণতি হয় যুদ্ধবিগ্রহে। নেপোলিয়নের সৈন্যরা মস্কো পর্যন্ত ধাওয়া করে যায়। ওয়াটারলুতে তাঁর চরম পরাজয়ের পরে আবার প্রশ্ন ওঠে যুদ্ধ নিবারণের। সেই সূত্রে আন্তর্জাতিক এক বন্দোবস্তের।

মোটামুটি শতখানেক বছর বড় মাপের যুদ্ধ বাধে না। কিন্তু দীর্ঘকালীন অস্ত্র প্রতিযোগিতার পর নেপোলিয়নীয় যুদ্ধের চেয়ে আরো ভয়ঙ্কর মহাযুদ্ধ বাধে। যুদ্ধের পর আবার যুদ্ধ নিবারণের চিন্তা। ফেডারেশন হয়, লীগ অফ নেশনস্ প্রতিষ্ঠা। আশাবাদের পুনরুদয়।

কিন্তু ইতিমধ্যে ঘটেছিল আবার এক বিপ্লব। রুশ বিপ্লব। ফরাসী বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছিল যেসব কারণে সেসব খতিয়ে দেখে লেনিন প্রস্তুত হয়ে বিপ্লবের পথে নেমেছিলেন। কিন্তু প্রথম তিনিও সফল হননি। দ্বিতীয়বার তিনি আরো প্রস্তুত হয়েছিলেন। দেশ বিদেশের পরিস্থিতিও তাঁকে সাহায্য করে। লেনিন ও তাঁর প্রলেতারিয়ানদের শিকল ছাড়া হারাবার আর কিছু ছিল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বিপ্লবী সোবিয়েত রাষ্ট্র দু'কোটি প্রাণের বিনিময়ে প্রতিবিপ্লবী নাৎসী জার্মানীকে পরাস্ত করে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ইউনাইটেড নেশনস্ বলে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বিজেতাদের মধ্যেই মন কষাকষি শুরু হয়ে যায়। এর একটা কারণ সোবিয়েত ইউনিয়ন প্রায় অর্ধেক জার্মানি তথা অর্ধেক বার্লিন দখল করে বসে। তাকে সেখান থেকে সরাতে না পারলে অর্ধেক ইউরোপের বিপদ। আমেরিকা তাদের রক্ষক। আর একটা কারণ

সোবিয়েত ইউনিয়নের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রোলেতারিয়ানরা বিপ্লবী হতে পারে। যুদ্ধে হেরে যাওয়ার চেয়ে বিপ্লবে প্রাইভেট প্রপার্টি হারানো আরো দুঃসহ। এক পক্ষের ধনুর্ভঙ্গ পণ রুশ বিপ্লবকে তারা ফরাসী বিপ্লবের মতো ব্যর্থ হতে দেবে না। আরো দু-তিন কোটি প্রাণ বিসর্জন দেবে। অপর পক্ষের পরমাণুভঙ্গ পণ দুনিয়ার আর কোথাও তারা বিপ্লব প্রবাহিত হতে দেবে না। তারাও কোটি কোটি মানুষকে বলি দেবে। তাছাড়া আছে আরো এক কারণ। অস্ত্র নির্মাণ বন্ধ করলে ধনতন্ত্রী দেশে মন্দা দেখা দেবে। ছোট বড় মাঝারি বহু কর্মীর দানাপানি যাবে। যারা অস্ত্র ব্যবসায়ী তাদের কলকারখানার দরজায় তালা ঝুলবে। তার ফলে শাসক দলের মসনদ টলমল করবে। অবশ্য অন্য উপায়েও মন্দা নিবারণ করা যায়। জাপান তার প্রমাণ। কিন্তু আমেরিকা ও ব্রিটেন তাতে নারাজ। তাদের আছে মিলিটারি ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স। জাপানের তো নেই। জাপানের মতো তারা যদি মিলিটারি বর্জিত হয় আর সোবিয়েত ইউনিয়ন না হয় তবে ত আগে থেকেই হার মেনে নেওয়া হল।

কিন্তু এমনো ত হতে পারে যে মিলিটারি আছে, তার হাতে প্রথাগত অস্ত্রশস্ত্র আছে, যেমনটি ছিল পারমাণবিক মারণাস্ত্র উদ্ভাবনের পূর্বে। সেই পূর্বযুগে ফিরে গেলে ক্ষতি কী? পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ সদ্ব্যবহার ভালো, কিন্তু যুদ্ধকালে যথেচ্ছ ব্যবহার ভালো নয়। তাতে মানবজাতি ধ্বংস হতে পারে। পারমাণবিক মারণাস্ত্র নির্মাণকার্যে আমেরিকাই অগ্রণী। কয়েক বছর স্টার্ট পেয়ে সে বারবার এগিয়ে রয়েছে। সোবিয়েত ইউনিয়ন কিছুতেই তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না। সমকক্ষতা অর্জন অসম্ভব দেখে হিতোপদেশ দিচ্ছে তুমিও পারমাণবিক মারণাস্ত্র বর্জন কর, আমিও বর্জন করি রাতারাতি নয় ধাপে ধাপে। আমেরিকা কর্ণপাত করতে চায় না। পারমাণবিক অস্ত্র বর্জন করলে প্রথাগত অস্ত্র যার হাতে বেশি তারই জয় হবে। আপাতত সোবিয়েতের হাতে বেশি। সে কি সেটা কমাবে? কার হাতে কত যে গুপ্ত অস্ত্র রয়েছে কে-ই বা তার খবর রাখে? কেউ কি হাতের তাস পরকে দেখায়?

ধরে নেওয়া যাক সোবিয়েত ইউনিয়ন আমেরিকার সঙ্গে সমঝোতার খাতিরে প্রথাগত মারণাস্ত্র হ্রাস করল। কিন্তু চীন যদি সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র হ্রাস না করে সোবিয়েত পড়ে যাবে বেকায়দায়। তখন সাইবেরিয়ার একাংশ চীনকে ছেড়ে দিতে হবে, তার সেখানে শতখানেক বছরের পুরনো দাবি। কমিউনিস্ট হলেও কেউ কারো দাবি ছাড়তে চায় না, তার জন্যে লড়তেও পারে। প্রলেতারিয়ানও প্রলেতারিয়ানের শত্রু হতে পারে। মার্কস যতই বলুন, ওয়ার্কিং মেন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ইউনাইট—তাদের মধ্যেও দেশাত্মবোধ তেমনি প্রখর যেমন বুর্জোয়াদের মধ্যে। কমিউনিস্ট চীনের পয়লা নম্বর শত্রু আমেরিকা একদা ছিল। কিন্তু এখন সেকথা বলা চলে না। চীনকেও আর কমিউনিজম প্রসারণ করতে দেখা যাচ্ছে না। ভিয়েতনামের সঙ্গে তার আদায় কাঁচকলায়। সম্ভবত তলে তলে আমেরিকার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হয়ে গেছে চীনের। তাই যদি হবে রুশ-মার্কিন যুদ্ধ চীন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে। সুযোগ পেলেই সাইবেরিয়ার একাংশ দখল করবে।

এই জটিল পরিস্থিতিতে ভারতের নীতি হচ্ছে কোন পক্ষের সঙ্গে জোটবন্দী না হয়ে পারমাণবিক অস্ত্র বর্জনের জন্যে সচেষ্ট হওয়া। সোবিয়েত নেতা গরবাচভ ভারতীয় নেতা রাজীব গান্ধী সঙ্গে মিলিত হয়ে দিল্লিতে যে ঘোষণাপত্র সই করেছেন তার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই। এই ঘোষণা সর্ব মানবের স্বার্থে। কেবলমাত্র দুই জাতির

স্বার্থে নয়। ফলাফল যাই হোক না কেন আমি ত মনে করি এই ঘোষণাপত্রটি একটি স্মরণীয় ঐতিহাসিক দলিল। আজ না হক কাল এতে আরো একশটা রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা স্বাক্ষর করবেন। সেসব রাষ্ট্রের জনমতও ধীরে ধীরে বদলাবে। ইতিমধ্যে কথার সঙ্গে কাজের সংগতি রক্ষা করা ভারতের তথা সোবিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্র নায়কদের কর্তব্য। স্বদেশেও ত বিরোধীর অভাব নেই তাঁদের পক্ষে যুক্তিরও অভাব নেই। পাকিস্তান পারমাণবিক বোমা তৈরি করলে ভারতের জনপ্রতিনিধিদের কণ্ঠেও আওয়াজ উঠবে, "আমরাও বানাব।" ভারত বানালে নেপাল চুপ করে থাকবে না। চীন তাকে মদত দেবে। আমরা যে যুগে বাস করছি সেটা যুক্তির যুগ বলে কীর্তিত হলেও প্রকৃতপক্ষে তা নয়। যেসব দেশের লোকে পুরুষানুক্রমে যুক্তিবাদী তারাও আপৎকালে অন্ধ হিংসাবাদী। মানুষ যদি আপৎকালের পরীক্ষায় যুক্তির প্রমাণ দিতে না পারে তবে সব দলিলই প্রথম মহযুদ্ধের সময় জার্মান কাইজারের ভাষায় 'স্ক্র্যাপ অফ পেপার'। কাগজের টুকরো। এই ঘোষণাপত্রও হয়তো একদিন ছেঁড়া কাগজের টুকরিতে ঠাঁই পাবে।

সোবিয়েত নেতা গরবাচভ ভারতীয় নেতা রাজীব গান্ধীর সঙ্গে মিলিত হয়ে দিল্লিতে যে ঘোষণাপত্র সই করেছেন তার ধারাগুলি এবার খতিয়ে দেখা যাক। এই দশটি ধারাকে দশ শীল বলতে পারা যায়। যেমন বান্ডুং শহরে গৃহীত ঘোষণাপত্রের পাঁচটি ধারাকে বলা হয় পঞ্চশীল। শীলগ্রহণ ছিল বৌদ্ধ ধর্মের অঙ্গ। নেহরুর ছিল বৌদ্ধপ্রীতি।

প্রথম শীল হচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান হবে বিশ্বের সর্বত্র অনুসৃত আদর্শ। সঙ্ঘর্ষ নয়, সহযোগিতা। সাময়িক সমাধান নয়, রাজনৈতিক সমাধান। তা না হলে এই পারমাণবিক মারণাস্ত্রের যুগে সকলের নির্বাণ।

আমার মন্তব্য, এই শীলটি সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত। কিন্তু ইরান ইরাককে একথা মানায় কে? রাজনৈতিক সমাধানের সূত্রটাও কি কেউ বাতলাতে পারছেন? ওদিকে ইজরাইল বনাম ফিলিস্তিন রাষ্ট্র সংস্থাপনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সিরিয়া প্রমুখ দেশ। পশ্চিম জার্মানি এখনো পূর্ব জার্মানিকে স্বীকৃতি দেয় নি। পূর্ব জার্মানিও পশ্চিম জার্মানিকে। পশ্চিম জার্মান রাষ্ট্রের নাম ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মানি। অর্থাৎ নিখিল জার্মানির ফেডারেল প্রজাতন্ত্র, শুধুমাত্র পশ্চিম জার্মানির নয়। পূর্ব জার্মান রাষ্ট্রের নাম জার্মান ডেমোক্রাটিক রিপাবলিক। অর্থাৎ শুধুমাত্র পূর্ব জার্মান নয়। এক রাষ্ট্র আরেক রাষ্ট্রর সমূল উচ্ছেদ চায়। তাকে উচ্ছেদ করে তার দখলী জায়গা সাঙ্গীভূত করবে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক সমাধানটা কী!

দ্বিতীয় শীল, সবার উপরে মানুষের প্রাণ, এই সত্যটিকে স্বীকার করে নিতে হবে। হিউম্যান লাইফ ইজ সুপ্রিম।

আমার মন্তব্য নাৎসীরা বেঁচে থাকলে তা স্বীকার করত না। তাদের সেই মানসিকতা কি বেবাক বিলুপ্ত হয়েছে? না বিশ্বময় ছড়িয়ে গেছে? কথায় কথায় নরহত্যা তো স্বদেশেই জলচল হয়ে গেছে।

তৃতীয় শীল, অহিংসাই হবে সামাজিক জীবনের ভিত্তি। আমার মন্তব্য, মার্কসবাদী গরবাচভ যে অহিংসার ভিত্তির উপর সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করতে সম্মত হয়েছেন এর মতো আশ্চর্য পরিবর্তন আর কী হতে পারে? আর রাজীব গান্ধী যদি মনেপ্রাণে মহাত্মা গান্ধীর উত্তরসূরী হয়ে থাকেন তবে ত ভারতই অন্যান্য দেশকে আবার অহিংসার শক্তি প্রদর্শন করতে পারে। কিন্তু দৃষ্টান্তের যেমন অভাব বিশ্বাসেরও তেমনি।

চতুর্থ শীল, ভয় ও সন্দেহের স্থান নেবে পরস্পরকে বোঝা ও বিশ্বাস করা।

আমার মন্তব্য, ভুল বোঝাবুঝি ও অবিশ্বাস থেকে প্রলয়কাণ্ড ঘটতে পারে, ইতিহাসে এর অজস্র প্রমাণ আছে। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ভুল বোঝাবুঝি ও অবিশ্বাসের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি, কোটি কোটি মানুষের ছিন্নমূল অবস্থা ত আমরা স্বদেশেই দেখলাম।

পঞ্চম শীল, প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা মানতে হবে ও মান্য করতে হবে। জগৎ জুড়ে এমন এক নতুন শৃঙ্খলা গড়ে তুলতে হবে যা সমস্ত নেশনকে দেয় অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার ও সমান রাজনৈতিক নিরাপত্তা। মারণাস্ত্র প্রতিযোগিতা দূর করলে এটা সম্ভব।

আমার মন্তব্য, ইউনাইটেড নেশনস যদি তার ছত্রতলে আশ্রয় না দেয় তো ছোট ছোট নেশনগুলি বড় বড় নেশনের শরণ নেবেই। তাছাড়া কটা ছোট রাষ্ট্রই বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর? ধারকর্জ করলে মহাজনের খপ্পরে পড়তে হয়।

ষষ্ঠ শীল, যে সম্পদ মারণাস্ত্র নির্মাণে ব্যয় হয় সে সম্পদ সামাজিক তথা অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য ব্যয় করতে হবে। এর জন্যে চাই নিরস্ত্রীকরণ। পশ্চাৎপদ ও দরিদ্রদশার সঙ্গে তবেই হবে মুক্তির সংগ্রাম।

আমার মন্তব্য, সদ্য স্বাধীন দেশগুলির প্রত্যেকেই তাদের সম্পদ উজাড় করে বৃহৎ শক্তিদের কাছ থেকে মারণাস্ত্র কিনছে ও অমনি করে শক্তিমান হওয়ার চেষ্টা করছে। বিক্রেতারা বিক্রয় বন্ধ না করলে নিরস্ত্রীকরণ সহজসাধ্য নয়।

সপ্তম শীল, ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্যে উপযুক্ত অবস্থার নিশ্চয়তা দিতে হবে। সংস্কৃতি, শিল্প, বিজ্ঞান, শিক্ষা ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্যে সব নেশনকেই মানবতার অনুরোধে একযোগে কাজ করতে হবে।

আমার মন্তব্য, ব্যক্তির উপর এতখানি জোর দেবার কথা আর কোনও সমাজতন্ত্রী নেতার মুখে শোনা যায় নি। সোবিয়েত লেখকদের ব্যক্তি স্বাধীনতার সুযোগ উন্মুক্ত করলে আমরা আনন্দিত হব।

অষ্টম শীল, জাগতিক সমস্যা সমাধান কল্পে মানবজাতির আধিভৌতিক তথা বৌদ্ধিক সভ্যতাকে ব্যবহার করতে হবে। অন্নের অসদ্ভাব, জনসংখ্যা স্ফীতি, নিরক্ষরতা ও পরিবেশঘটিত অবনতির মতো সমস্যার সমাধান পেতে হবে পৃথিবীর সম্পদের সুনিপুণ ও যথোপযুক্ত প্রয়োগ দিয়ে। সমুদ্র, সমুদ্রতল ও মহাশূন্য মানবজাতির যৌথ উত্তরাধিকার। পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করে এসব দিকে মন দেবার মতো অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে।

আমার মন্তব্য, সকল প্রকার সভ্যতার সামূহিক সুপ্রয়োগে নিশ্চয়ই সর্ব মানবের শ্রীবৃদ্ধি হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে অপরিমিতি সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটলে কী উপায়। ম্যালথাস বর্ণিত যুদ্ধ, মহামারী ইত্যাদি।

নবম শীল, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সন্ত্রাসের সমতার পরিবর্তে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার সবকিছু ব্যবস্থা করতে হবে। জগৎ এক। নিরাপত্তাও অবিভাজ্য। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ বিভিন্ন সমাজব্যবস্থা, বিভিন্ন মতবাদ, জাতি/ধর্ম নির্বিশেষে নিরস্ত্রীকরণ তথা বিকাশের জন্যে একজোট হতে হবে।

আমার মন্তব্য, এর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে? শুভস্য শীঘ্রম।

দশম শীল, পারমাণবিক অস্ত্রবর্জিত অহিংস জগতের জন্যে অবিলম্বে নিরস্ত্রীকরণের উদ্যোগ করা হক। এই শতাব্দী শেষ হবার আগেই যাবতীয় পারমাণবিক অস্ত্র ধ্বংস করতে হবে। মহাশূন্য থেকে অস্ত্র নিক্ষেপ নিষেধ করতে হবে। পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বারণ করতে হবে। নতুন নতুন অস্ত্র উদ্ভাবন বন্ধ করা চাই। রাসায়নিক অস্ত্র নিষেধ করে জমে থাকা অস্ত্র ধ্বংস করতে হবে। প্রথাগত অস্ত্রের ও সৈন্যবলের পরিমাণ হ্রাস করতে হবে।

আমার মন্তব্য, বেঁচে থাকার এটাই একমাত্র পথ। মানবজাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে সবাই মিলে অভয় দেওয়ার উপর। এই ঘোষণাপত্র সেই অভিমুখে একটি সুচিন্তিত পদক্ষেপ। এর অর্ধেক কৃতিত্ব ভারতের, অর্ধেক সোবিয়েত ইউনিয়নের। আসুন, অন্যান্যরাও আসুন, কৃতিত্ব ভাগ করে নিন।

পঁয়তাল্লিশ
হইচই এড়াতে শান্তিনিকেতন যাচ্ছি

এবারকার পুজোর ছুটিতে আমি কলকাতায় থাকছি না। থাকছি না মানে, কলকাতার ধুমধাম আর হইচই এড়াবার জন্যই শান্তিনিকেতনে যাচ্ছি। অবশ্য তার আশেপাশেও যে পুজোর মাতামাতি দেখব না তা নয়। তবে সেটা আমাকে তেমনভাবে অসহ্য করে তুলবে না। আমার এখন বাকি কাজ সারা করার বয়স। সে কাজে যদি ব্যাঘাত আসে, তাহলে আমি লক্ষ্যভ্রষ্ট হই। তাই ছুটি আজকাল আমার কাছে আমোদ করার অবসর নয়। বরং আরো নিভৃতে, আরো বেশি চিন্তা করার সুযোগ। এটা শান্তিনিকেতনে সম্ভব হবে বলে মনে হয়। তবে বলা যায় না—শান্তিনিকেতন আজকাল শহর হয়ে উঠেছে। শহর মানেই তো সমস্তক্ষণ উত্তেজনা। হইচই। গোলমাল।

ছেলেবেলায় আমরা পুজো দেখেছি, পুজো করেছি। কিন্তু সেটা মোটের ওপর ছিল সাত্ত্বিক। কেবল বড়লোকদের বাড়িতে রাজসিক। এখনকার পুজো সর্বজনের চাঁদায় মাত্রাতিরিক্ত রাজসিক। এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তামসিক। বাঙালি এখনো তামসিকতার গহ্বরে নেমে যায়নি। এটাই আমাদের পরম আশার কথা।

প্রতিমা শিল্পে বাঙালির রুচি এখনো প্রশংসনীয়। যদিও সে রুচি ঠিক সাত্ত্বিক নয়। এই সব মূর্তি, যা আজকাল তৈরি হচ্ছে। জলে ফেলে দেওয়ার মতো নয়। কোনো এক উপায়ে এদের সংরক্ষণ করতে পারলে ভালো হত। কেননা এসব মূর্তি সংরক্ষণেরই যোগ্য মর্যাদা কেড়ে নিয়েছে শিল্পের কাছ থেকে। কিন্তু সংরক্ষণ আমাদের প্রথাবিরুদ্ধ। তাতে কারিগরদের আর্থিক ক্ষতিও হবে। সৃষ্টি-ক্ষমতাও কমে যেতে পারে। তাই এই শিল্পীদের বাঁচিয়ে রাখাও আমাদের জাতীয় কর্তব্য। এরা ধীমান বীটপালদের বংশধর। সুদূর পাল যুগের সঙ্গে এরাও আমাদের সংযোগসূত্র।

শুধু এরাই নয়। এরপর আছে পুজোর বাদ্য। যে বাদ্যেরও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। ঢাক ঢোল যারা বাজায় তারাও শিল্পী। তারাও সেই পাল যুগের কিংবা আরো পুরনো যুগের স্মৃতি বহন করে আনে।

পুজোর জিনিসটাই পণ্ডিতদের মতে দ্রাবিড়দের দান। আর্যদের নয়। আর্যদের ছিল যজ্ঞ। সেটা বাঙালিরা ভুলতে বসেছে। ভুলে গেছে অনেকে। কিন্তু পুজো ভুলে যাওয়ার

কোনো লক্ষণ দেখছিনে। ভুলে যাওয়ার প্রয়োজনও নেই। তবে একে আরো তামসিক না করে আরো সাত্ত্বিক করতে হবে।

পুজোর আর একটা অঙ্গ—বলিদান। বলিদান আজকাল ক্রমশ উঠে যাচ্ছে। কিন্তু এখনো সম্পূর্ণ উঠে যায়নি। এটা যেদিন উঠে যাবে, সেদিন কেবল ছাগ আর মহিষ নয়, সমগ্র প্রাণীজগৎ পুজোর আনন্দের অংশীদার হবে। এক অসুর মহিষের রূপ ধারণ করেছিল বলে নিরীহ মহিষের মুণ্ডচ্ছেদ করতে হবে, এটা বর্বরতা। নেপালে এখনো এ বর্বরতা মহাপুজোর অঙ্গ।

ছেলেবেলায় আমি একবার বলিদানের সময় ছাগকণ্ঠের চিলস্বর বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে শুনতে পাই। আমাকে আটক করে রাখা হয়েছিল ওই ঘরের ভেতরে। যাতে বলিদান আমি দেখতে না পাই। কেননা বলিদান দেখে আমি সহ্য করতে পারব না, এটা বাড়িতে সবাই জানত। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওই ছাগকণ্ঠের আর্তস্বর শুনে বন্ধ ঘরের ভেতরে আমি ছটফট করে উঠেছি। বেদনা বোধ করেছি ও বলিদানের পরে ঘরের বাইরে এসে ছিন্নমুণ্ড ও জমাটবাধা রক্ত দেখেছি। কিন্তু দেখেও স্থির থাকতে পারিনি। মনটা গুমরে উঠেছিল ভয়ে আর কান্নায়। পরে বুঝেছি শিশুর মনের ওপরে এর ক্রিয়া মারাত্মক।

আমার বিশ্বাস হয় না যে বাঙালিজাতি যুগ-যুগ ধরে এই পাতকের ভাগী হয়নি। এটা হল আমাদের বংশপরম্পরাগত দুর্গাপুজোর স্মৃতি। কিন্তু এরপর আমার বাবা সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেখানে রাজকর্মে নিযুক্ত ছিলেন, সেখানকার প্রথা অন্যরূপ। কখনো এরকম বীভৎসতা নিরীক্ষণ করতে হয়নি আমাকে।

মনে আছে, আমাদের বাড়িতে আমরা অসি (তরোয়াল) পুজো করতাম। আমাদের একটি পারিবারিক তরোয়াল ছিল, সেটি বেদীর ওপরে রেখে আমরা তাতে পুষ্পাঞ্জলি দিতাম। এই সঙ্গে একটি তামসিকতাও যুক্ত ছিল। বাড়ির যারা বড়, তারা ভাঙ খেয়ে আমাদেরও খাইয়ে দিত। বিজয়ার দিন। বিজয়ার দিন ভাঙ খাওয়াটাই নিয়ম ছিল। শুনছি এখনো এই প্রথা আছে। তবে আমাদের বাড়িতে নয়। বাড়ি থেকে ও নিয়ম উঠে গেছে। ইতিমধ্যে আমার মা-বাবা এরপরে, বৈষ্ণবদীক্ষা গ্রহণ করেন। ফলে তারপর দুর্গাপুজো আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যায়। তার বদলে আসে বৈষ্ণবদের রকমারি পুজো।

আমাদের সময়ে বারোয়ারি পুজো জিনিসটা ছিল না। ফলে এই পুজো সম্পর্কে, আজকালকার মতো অভিজ্ঞতাও ছিল না তখন। পুজোর সংখ্যা ছিল খুবই কম, তবে যেখানে যেখানে হত, অত্যন্ত সাত্ত্বিক উপায়ে। নিষ্ঠা আর আন্তরিকতা নিয়ে। আর পুজোর আড়ম্বরও ছিল তেমনি পরিমিত।

আজকাল আড়ম্বর ও বাইরের সাজ-পোশাকটাই বেশি। আন্তরিকতা ও হৃদয়ের প্রসারতা অনেক কমে গেছে। কাজেই আজকের আড়ম্বর দেখে বিদেশীর ধারণা জন্মাতে পারে যে, আমরা সর্বত্রই রাজা। আমাদের রাজার রাজত্বে। এটা একটা মোহ। এই মোহ থেকে দেশকে মুক্ত করা উচিত। নয়তো ধন সঞ্চয় হবে না। ধন সঞ্চয় না হলে ইনভেস্টমেন্ট হবে না। ইনভেস্টমেন্ট না হলে জাতীয় উপার্জন বাড়বে না। জাতীয় উপার্জন না বাড়লে বেকার সমস্যা দূর হবে না।

বিদেশ থেকে ক্রমাগত ঋণ নিয়ে কোনো দেশ কখনো সমৃদ্ধ হয়নি, যদি সে অনাবশ্যক আড়ম্বরে তার সঞ্চয়কে দু-হাতে উড়িয়ে দেয়।

ছেচল্লিশ
আমার প্রেরণার উৎস আর্ট ও প্রেম

আমার জন্ম ওড়িশার ঢেঙ্কানালে। আমি ছিলাম প্রথমে ঢেঙ্কানাল হাইস্কুল ও পরে পুরী জেলা স্কুলের ছাত্র। প্রথমোক্ত স্কুলটিতে পড়ার সময়ই প্রধান শিক্ষক রূপে আমি যাঁর সস্নেহ আস্থা পেয়েছিলাম তিনি হলেন শ্রদ্ধেয় রাজেন্দ্রলাল দত্ত। তিনি আমায় ভার দেন স্কুলের ম্যাগাজিন সেকশনের। ফলে আমি সেখানে অনেকগুলি মাসিকপত্র দেখা ও পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। তখনকার দিনের সব থেকে সেরা মাসিকপত্রও আমার হাতে পড়েছিল। আমি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতুম 'সবুজপত্র'। যার সম্পাদক ছিলেন প্রমথ চৌধুরী। এতে রবীন্দ্রনাথও লিখতেন। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতাও দেখেছি। প্রমথ চৌধুরী ছাড়াও অতুলচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন 'সবুজপত্রে'র অন্যতম প্রধান লেখক। সেই বার বছর বয়সে ওটাকেই বলতে পারা যায় আমার সাহিত্যিক উপনয়ন। এছাড়া ছেলেমেয়েদের পত্রিকা। শিশু, সন্দেশ, মৌচাক এইসব পড়তে পড়তে আমার মনে লেখার বাসনা জাগে।

কিছু ইংরেজি পত্রিকাও আমার হাতে আসে। বিলেতের 'My Magazine', 'Children's Newspaper' এবং স্বদেশের 'Modern Review' তাছাড়া ছেলেবেলা থেকেই আমার খবরের কাগজের দারুণ নেশা। এ ব্যাপারে বাবাই প্রথম পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন সাপ্তাহিক 'বসুমতী' ও সাপ্তাহিক 'বেঙ্গলী' (ইংরেজি)-র সঙ্গে। এতে দুনিয়ার খবর পাওয়া যেত। আর সেসব খবর যে দেশের সে সব দেশের মানচিত্র সম্বন্ধেও আমি ওয়াকিবহাল ছিলুম। একটা World Atlas ছিল আমার সর্বক্ষণের সাথী। যে সব আইডিয়া আমি ১২/১৩ বছর বয়সে পাই তাদের মধ্যে ছিল প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সমন্বয়। আরেকটা হচ্ছে আর্ট। অন্যটি হচ্ছে 'Eternal Vigilance is the price of Liberty। এ সময় যাঁদের প্রভাবে আমি আসি তাঁদের মধ্যে তলস্তয়, রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী প্রধান। তলস্তয়ের উপকথাগুলি আমি স্কুল থেকে পুরস্কার পাই। এর থেকে একটি উপকথা বাংলায় তর্জমা করে 'প্রবাসী'তে পাঠিয়ে দিই। সেটি সঙ্গে সঙ্গে ছাপা হয়ে যায়। সেই আমার বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রবেশ। তখন আমি স্কুলের ছাত্র। বয়স সবেমাত্র ষোল।

পরে ওড়িয়া, বাংলা ও ইংরাজি সাহিত্যের ব্যাপক চর্চায় আমি কলেজে গিয়ে পাঁচজনকে নিয়ে একটা Group তৈরি করি। পরে তার নাম রাখা হয় 'সবুজ গ্রুপ'। অনেকটা সবুজপত্রের অনুসরণে। এই গ্রুপের মধ্যে আমরা যে পাঁচ জন ছিলুম তার মধ্যে কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী ও বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়ক হন পরে ওড়িয়া সাহিত্যের দুই দিকপাল। বছরপাঁচেক আমি ওড়িয়াতে কবিতা ও প্রবন্ধ লিখেছি। একটি বারোয়ারি উপন্যাসের কয়েক পরিচ্ছদও লিখেছি। মাসিকপত্রেও অনেক সময় আমাকে প্রথম স্থান দেওয়া হত। সেই সূত্রে আমি সুপরিচিত ছিলুম। ওড়িয়া সাহিত্য আকাদেমি থেকে দুবার আমাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাসে 'সবুজ যুগ' (গ্রুপ)-কে একটি বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হয়। তাতে আমার কথা আছে।

ওড়িয়া যখন লিখি তখন আমি বাংলাতে আর ইংরেজিতেও লিখছি। বাংলা রচনা 'প্রবাসী' ও 'ভারতী'-তে প্রকাশিত হয়। আমার ইচ্ছে ছিল জীবিকা হিসেবে ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষায় সাংবাদিকতাতেই বরণ করে নেব। সরকারি চাকরি করতে এতটুকুও

ইচ্ছে ছিল না। আমার বাবাও তা চাননি।

তখন অসহযোগের যুগ। গান্ধীজীর লেখা প্রত্যেক সপ্তাহে পড়তুম। খদ্দর সবসময়েই গায়ে দিতুম। তবে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে আমি গান্ধীজীর সব কথা মেনে নিতে পারিনি। ইউরোপে যাবার তীব্র বাসনা ছিল। এবং সে বাসনা পূর্ণ হত না যদি না আমি আই সি এস প্রতিযোগিতায় উচ্চস্থান অধিকার করে নির্বাচিত হতুম। বিলাতে দুই বছর থাকি। সেই তখন থেকেই আমার চিন্তা কবে আমি চাকরি থেকে অকালে বিদায় নেব ও সাংবাদিকতাকেই আমার জীবিকা করব। ইতিমধ্যে আমি মনস্থির করি কেবল বাংলা ভাষাতে কবিতা ও উপন্যাস ইত্যাদি লিখব, নয়ত তিনটে ভাষায় কৃতিত্ব অর্জন করা সহজ নয়।

যেমন তেমন সাহিত্যিক হতে আমি চাইনি। আর্ট সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করেছি। শান্তিনিকেতনে গিয়ে। তিনি বলেছেন তিনি আমার প্রশ্নের উত্তর দেবেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষণে। আমাকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন উপস্থিত থাকতে, কিন্তু আমি যেতে পারিনি। পরে পত্রিকায় তার বিবরণ পড়েছি। তাতে আমার জিজ্ঞাসার নিরসন হয়নি। কেননা তলস্তয় আমার মনে আর্ট সম্বন্ধে অন্যরকম ভাবনা জাগিয়ে দিয়েছিলেন। মূলত আমার প্রেরণার উৎস আর্ট ও প্রেম। বিলেতযাত্রী হবার সময় 'বিচিত্রা'র জন্য ধারাবাহিকভাবে 'পথে প্রবাসে' লিখতে আরম্ভ করি। তাতে সুইজারল্যান্ডে রম্যাঁ রল্যাঁর সাক্ষাৎকারের বিবরণ আছে। সেখানেও আর্ট সম্বন্ধে প্রশ্ন আছে।

আমি যখনই যা লিখি আর্ট সম্বন্ধে সচেতন থেকে লিখি। তা কবিতাই হোক, গল্পই হোক আর প্রবন্ধই হক। ইউরোপে থাকতে আমার মনে হয় 'পথে প্রবাসে'-র পরে আরো কিছু লিখতে হবে সেটা উপন্যাস আকারে এবং আরো গভীর বিষয়ে।

দেশে ফিরে এসেই সে উপন্যাস লেখা শুরু হয়। সেটা ৬ খণ্ডে বিভক্ত। প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র নাম। সমগ্রটির নাম 'সত্যাসত্য'। গোড়াতে ইচ্ছে ছিল ৩ খণ্ডে শেষ করব। আসলে তখনকার দিনে লোকে ২ খণ্ডও পড়তে চাইত না। কিন্তু আমি যা বলতে চাই তাতে অন্তত ৫ খণ্ড লাগবে। এবং আমার ধারণা তা আমি পাঁচ বছরে শেষ করব। লিখতে লিখতে দেখা গেল ১২ বছর লেগে গেল। ৫ খণ্ডের পরে, আমাকে আরেক খণ্ড যোগ করে ৬ খণ্ড করতে হয়। তার আগে চাকরি ছেড়ে যুদ্ধের মাঝখানে সাংবাদিকতায় ভাগ্য পরীক্ষা করা একজন বিবাহিত পুরুষের পক্ষে, বিশেষত তিনটি সন্তানের পিতার পক্ষে, একান্ত দায়িত্বহীন কাজ হত। গান্ধীজীও তা করতে বলেন নি। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম। বলতে ভুলে গেছি আমার বিবাহ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটে। শেষ পর্যন্ত ২১ বছর চাকরির পরে অবসর নিই। ততদিনে ২১ বার বদলি হয়েছি ও বিস্তর দেখেছি এবং শিখেছি। সরকারি বিভিন্ন বিভাগে কাজও করেছি। এসব অভিজ্ঞতা সাংবাদিক হয়ে কখনো লাভ করা যেত না। তবে সাহিত্যের দিক থেকে আমার বেশ কিছু ক্ষতি হয়েছে। 'সত্যাসত্যে'র পর বড় কিছু লিখতে প্রেরণা পাইনি। কেননা দেশজুড়ে তখন হয় স্বাধীনতা সংগ্রাম, নয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, নয় কমিউনিস্টদের সহিংস কার্যকলাপ নিয়ে আমাকে হয় ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে, নয় জজ হিসেবে, নয় সেক্রেটারী হিসেবে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। লাভ হয়েছে এই আমি ভেতরের খবর অনেক রাখি।

আমার লেখার ব্যাপারে অনেকে প্রশ্ন করেন, আমার রচনাশৈলীতে প্রমথ চৌধুরীর ছাপ আছে তা আমি সচেতনভাবে নিয়েছি কিনা! উত্তর গোড়ার দিকে নিয়েছি। পরে আমি

বুঝতে পারি যে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রমথ চৌধুরী মশাইয়ের অভিজ্ঞতার থেকে এত বেশি ভিন্ন যে আমাকে নিজের রাস্তাই তৈরি করে নিতে হবে। আমার রচনা প্রধানত রোমান্টিক ও আইডিয়ালিস্টিক। তবে আমিও কালক্রমে একজন ইন্টেলেকচ্যুয়াল হয়েছি। তাঁর সঙ্গে আমার সমভাব বহু পরিমাণে রয়েছে। কিন্তু আমি আরো বেশি পরিমাণে জনগণের দিকে গেছি। সেটা তলস্তয় ও গান্ধীজীর প্রভাবে। সবচেয়ে বড় কথা রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলার রেনেসাঁসের যে ঐতিহ্য প্রবাহিত তাতে তিনিও আছেন—আমিও আছি।

আমার কাছে দেশ যেমন সত্য, যুগও তেমনি সত্য। সুতরাং দেশের মাটি যেমন সত্য, যুগের আলো হাওয়াও তেমনি সত্য। গাছ যদি আলো না পায়, যদি মাটিতেই আবদ্ধ থাকে, তাহলে সে গাছে ফুল ধরে না, ফল ধরে না। যুগকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে আধুনিক সাহিত্য হতে পারে না। কেউ কোনদিন তাকে রেনেসাঁসের সাহিত্য বলবে না। আমাদের চিত্রকররা, ভাস্কররা সকলেই যুগের সঙ্গে পা রেখে চলেছেন। আমি যদি আর্টিস্ট হয়ে থাকি তবে একক নই। তাছাড়া আমি কি শুধু আর্টিস্ট। আমি একজন ইন্টেলেকচ্যুয়াল। একজন ইন্টেলেকচ্যুয়ালের কাছে সারা মানবজাতিটাই আত্মীয়। সংস্কৃত শ্লোকেই বলা হয়েছে—ইনি আপন, উনি পর এ গণনা লঘুচেতাদের গণনা। যাঁর উদারচরিত তাঁর কাছে সমগ্র বসুধাই তাঁর কুটুম্ব।

কাজেই আমি যদি সর্বমানবের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে কেবলমাত্র মাটির মানুষের উপরেই নিবদ্ধ করি তবে সেটা আমার পক্ষে উদারতার পরিচয় হয় না। তাছাড়া আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অসংখ্য শাখা-প্রশাখা সম্বন্ধে খোঁজ খবর রাখাও একজন ইন্টেলেকচ্যুয়ালের কর্তব্য। অধিকন্তু বিশ্ব রাজনীতি ও বিশ্ব অর্থনীতি সম্বন্ধে সজাগ না হলে একজন ভারতীয় নাগরিক হিসেবে স্বদেশেরই বা কতটুকুন সেবা করতে পারব? যুদ্ধ ও শান্তির মতো ভয়ঙ্কর গুরুতর বিষয়ে যে উদাসীন বা অজ্ঞ সে কাকেই বা কি নেতৃত্ব দেবে বা দিতে পারবে? আমাদের কাউকে না কাউকে ইনটেলেকচ্যুয়াল লিডারশিপ দিতে হবে, শুধু পলিটিক্যাল লিডারশিপ নয়। নইলে যা হবে তা অন্ধের দ্বারা নীয়মান যথা অন্ধ।

এখন আমি লিখছি 'ক্রান্তদর্শী' উপন্যাস। যেটা ৪ খণ্ডে সমাপ্ত হবে। তার সময়সীমা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরম্ভ থেকে মহাত্মা গান্ধীর মহাপ্রয়াণ। আপাতত আমি এই নিয়ে নিবিষ্ট। তবে এরপরও আমার কিছু বক্তব্য থাকবে। সময় পেলে আরো কিছু লিখব।

সাতচল্লিশ

একটি স্মরণীয় সন্ধ্যা

ছেলেবেলায় বিশ্বপথিক বিনয়কুমার সরকারের ভ্রমণকাহিনী 'গৃহস্থ' প্রভৃতি মাসিকপত্রে পড়ে আমারও ইচ্ছে করত তাঁরই মতো পথে বেরিয়ে পড়তে, বিদেশের পত্রিকায় লিখে পাথেয় জোটাতে, সেইসূত্রে স্বদেশের কথা বিদেশে প্রচার করতে আবার বিদেশের কথা বাংলায় লিখে স্বদেশে প্রচার করতে। এর মতো অ্যাডভেনচার আর কী আছে! এ যেন রূপকথার

রাজপুত্রের মতো সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে যাওয়া। হাতে অসি নয়, লেখনী। কে জানে একদিন রাজকন্যার সঙ্গেও বিয়ে হয়ে যেতে পারে। বিনয়কুমার সরকারের জীবনেও তেমন ঘটনা ঘটেছিল জাপান ও আমেরিকায় ঘুরে ইউরোপের মধ্যস্থলে ভিয়েনায়।

কলকাতায় ফিরে এসে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হন। কলকাতার রাজপথে একদিন আমার আই.সি.এস. প্রতিযোগিতায় সফল সতীর্থ দ্বিজেন্দ্রলাল মজুমদার আমাকে তার অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। পথের মাঝখানে দু'চার মিনিটের কথাবার্তা। তখনো আমি সাহিত্যক্ষেত্রে অজ্ঞাতনামা। কী বলে নিজের পরিচয় দেব? আমি চুপ করে থাকি। দ্বিজেনই বলেন যে আমরা দু'জনে শিক্ষানবীশ হয়ে বিলেত যাচ্ছি।

বিলেত যাবার পথে ও বিলেত প্রবাসকালে ধারাবাহিকভাবে আমি যা লিখি তার নাম 'পথে প্রবাসে'। সে রচনা বিনয়কুমার সরকারের মতো বিবরণাত্মক নয়। কিন্তু এক হিসাবে আমি তাঁরই উত্তরসাধক। তেমনি খোলা চোখে দেখি, খোলা মনে ভাবি, প্রাণ খুলে লিখি। তাঁর সঙ্গে আরো একটি মিল। আমিও এক বিদেশিনী রাজকন্যাকে বিয়ে করি। আক্ষরিক অর্থে রাজকন্যা নন যদিও।

বাংলার মফস্বলে নানান জায়গায় বদলির চাকরি। কলকাতা এলে এত কম সময় থাকি যে বিনয়কুমার সরকারের মতো বিদগ্ধজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারিনে। ততদিনে তিনিও বাংলা মাসিকপত্রে বড়ো একটা লিখতেন না। যোগাযোগের তেমন কোনো সূত্র ছিল না। তবে তাঁর একটি ছাত্র আমাকে জানায় যে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের নির্দেশে সে আমার সম্বন্ধে কী যেন লিখেছে। তিনি আমার বই পড়েছেন ও প্রশংসা করেছেন। তখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আগ্রহ বোধ করি কিন্তু কোনো মতেই সুযোগ ঘটে না।

পার্টিশনের পর কলকাতায় বদলি হয়ে আসি। গুছিয়ে বসতে না বসতে আবার বদলির হুকুম। যেতে হবে মুর্শিদাবাদ। সেখানে সীমান্ত নিয়ে বিরোধ চলছে। ওঁরা একজন আই.সি.এস. জেলা ম্যাজিস্ট্রেট চান। কলকাতার পাট তুলছি, এমন সময় মনে হয় যাবার আগে একবার বিনয়কুমার সরকারের বাড়ি গিয়ে দেখা করা উচিত। যেই মনে হওয়া অমনি সেই সন্ধ্যাবেলা টেলিফোন করে জানতে চাই তাঁর সঙ্গে কবে কখন দেখা হতে পারে। উত্তর পাই, "আসুন, আসুন, এক্ষুনি চলে আসুন। আমরা আর কিছুদিন পরে আমেরিকা রওনা হচ্ছি।" আন্তরিকতাপূর্ণ আহ্বান।

বালীগঞ্জ থেকে এন্টালি। কয়েক মিনিটের মোটরযাত্রা। অধ্যাপক মহাশয় স্বয়ং দরজা খুলে দিয়ে ভিতরে নিয়ে গিয়ে আমাদের দু'জনকে আলাপ করিয়ে দেন তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে। কথাবার্তা চলে তাঁদের আমেরিকা পরিক্রমা নিয়ে। অধ্যাপককে একরাশ লেকচার দিতে হবে। আমাদের মুর্শিদাবাদ বদলির প্রসঙ্গও ওঠে। তিনি মালদার সন্তান। মালদার প্রসঙ্গে কিছু বলেন। তাঁর বিরাট লাইব্রেরি ঘুরে ফিরে দেখান। তিনি বহুবিদ্যার সাগর। হেন বিষয় নেই যে বিষয়ে তাঁর পড়াশুনা নেই। যে বিষয়ে তাঁর লেখা নেই। প্রজ্ঞার ও প্রতিভার ছাপ মুখমণ্ডলে। উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব।

লাইব্রেরিতে বসে অধ্যাপকের সঙ্গে ভাব বিনিময় করছি এমন সময় বেল বেজে ওঠে। অধ্যাপক উঠে যান অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা করতে। প্রবেশ করেন আরো এক দম্পতি, তাঁরাও অপর দুই দম্পতির মতো শ্বেত-কৃষ্ণ। অধ্যাপক যখন পরিচয় করিয়ে দেন তখন কৃষ্ণ বলে ওঠেন, "আরে আপনি। আপনাকে আমি দেশে ফিরে আসার পর থেকে খুঁজে

বেড়াচ্ছি। চিনতে পারছেন আমাকে। আমি প্যারিসের সেই ঘোষ। প্রাণানন্দ ঘোষ। আর ইনি আমার স্ত্রী, অস্ট্রিয়ান কাউন্টেস।”

আমি তো অবাক। প্যারিসের ঘোষকে আমার বরাবর মনে ছিল, কিন্তু আঠারো বছর আগে দেশে ফিরে আসা অবধি না পেয়েছি তাঁর দেখা, না পেয়েছি তাঁর চিঠি বা সন্ধান। কেউ বলতে পারে না তিনি এখন কোথায়। দেশে না বিদেশে। আদৌ বেঁচে আছেন কিনা। প্যারিসে তিনি আমার গাইড ছিলেন। লোকটি অতি নিরীহ ও নিঃস্বার্থ। গরীবের ছেলে। সামান্য টাকায় প্যারিসের ডাক্তারি পড়ার খরচ চালাতে হয়। নিজেই রাঁধেন। হৃষ্ট পুষ্ট নন, রোগা পটকা। প্যারিসের বাঙালি ছাত্রদের সঙ্গে আড্ডা দেন না, দলবাজি করেন না, মেয়েদের পেছনে ছোটেন না, মদ খান না ও খাওয়ান না। পোশাক পরিচ্ছদও অতি সাধারণ।

আমি জানতুম যে প্যারিসের মেডিকেল ডিগ্রী নিয়ে দেশে ফিরলে ওঁর চাকরি জুটবে না। প্রাইভেট প্র্যাকটিস জুটলেও জুটতে পারে। ওঁর মতো যে দু'একজন ফিরেছেন তাঁরা অগতির গতি। যুদ্ধের মরসুমে আর্মি মেডিক্যাল কোরে যোগ দিয়ে পরে বেকার হয়েছেন। তাই ওঁর সম্বন্ধে আমার উদ্বেগ ছিল। কিন্তু এ যে দেখছি দিব্যি হৃষ্ট পুষ্ট, মূল্যবান পোশাক পরিহিত, সফল সুখী পুরুষ। অস্ট্রিয়ান কাউন্টেস লাভ তো রূপকথার রাজকন্যা লাভ।

ঘোষ সেদিন আমাকে একান্তে নিয়ে গিয়ে তাঁর জীবনকাহিনী শোনান। তার যতটুকু মনে আছে ততটুকু শোনাই।

ডাক্তারি পাশ করে ঘোষ প্যারিসেই থেকে যান। সেখানকার হাসপাতালে রাজকর্মের অভাব ছিল না। ফরাসীরা বিদেশীদের তাড়িয়ে দেয় না। কাজের লোক হলে আপনার করে নেয়। কালো মানুষ বলে বাছবিচার করে না। প্যারিসে সেটল করাই ছিল কল্পনা। তবে তিনি পরে একদিন দেশে ফিরে আসার আশাও ত্যাগ করেন না। তাই ব্রিটিশ সাবজেক্ট হিসাবে যে পাশপোর্ট পেয়েছিলেন সেটি রেখে দেন।

কে জানত জার্মানীতে হিটলার সর্বেসর্বা হবেন ও জোর করে অস্ট্রিয়া দখল করবেন? অস্ট্রিয়া থেকে নাৎসীবিরোধীরা পালিয়ে আসবেন? প্যারিসে আশ্রয় নেবেন? এমনি একটি ছিন্নমূল সম্ভ্রান্ত পরিবারের সঙ্গে চিকিৎসাসূত্রে এই বাঙালি ডাক্তারের পরিচয়। পরিচয় থেকে প্রণয়। প্রণয় থেকে পরিণয়। ফরাসীরা কেউ তাতে কোন দোষ দেখে না। ঘোষ দম্পত্তি শান্তিতেই বাস করেন। তাঁদের একটি কন্যাসন্তানও হয়। সাংসারিক প্রয়োজনে ঘোষকে প্যারিসের বাইরে আর একটু অর্থকরী জীবিকার সন্ধান করতে হয়। হল্যান্ডে মিলে যায় তেমন সুযোগ। হল্যান্ডের ছোট একটি শহরে। সেখানে সাদর অভ্যর্থনা পান। তিনি কিসের যেন স্পেসিয়ালিস্ট। কিছুদিনের মধ্যে জমিয়ে বসেন।

মাথায় বাজ ভেঙে পড়ে নাৎসীরা যখন যুদ্ধে নেমে হল্যান্ড অধিকার করে ও ঘোষকে ধরে নিয়ে গিয়ে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে বন্দী করে। ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই। তিনি ব্রিটিশ সাবজেক্ট। সুতরাং সন্দেহভাজন। কোন্ মুখে আপত্তি করবেন? করলে শুনবে কেন? কিন্তু টরচার করতে এলে বলেন,"ব্রিটিশ সাবজেক্টের উপর টরচার ব্রিটেন ক্ষমা করবে না। চাকা যদি ঘুরে যায় আপনাদের উপরেও টরচার হবে।" তাতে ফল হয়। কিন্তু এর পরে যে অত্যাচারটা শুরু হয় সেটা কায়িক নয়, মানসিক। তাঁকে বলা হয় তিনি কৃষ্ণাঙ্গ। শ্বেতাঙ্গিনীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ নাৎসীদের শাস্ত্র অনুসারে অবৈধ। সুতরাং তিনি তাঁর তথাকথিত স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবেন না। স্ত্রীকে আসতে দেওয়া হবে না। কন্যাকেও না। ওদিকে স্ত্রীকেও

বলা হয় যে তিনি যদি ভালো চান তো তাঁর তথাকথিত স্বামীকে ডাইভোর্স করুন। নইলে তাঁকে এই শহরেই থাকতে দেওয়া হবে না। ভদ্রমহিলা বলেন, "সে কী কথা! আমার স্বামীকে আমি কোন অপরাধে ত্যাগ করব? তিনি শ্বেতাঙ্গ নন, এটা কি একটা অপরাধ?"

এই মানসিক অত্যাচার মাসের পর মাস চলতে থাকে। শেষে ঘোষ তাঁর স্ত্রীকে বলেন, "নামকা ওয়াস্তে ডাইভোর্স করো। যুদ্ধের পরে আবার বিয়ে করা যাবে।" তিনি ডাইভোর্স করেন, কিন্তু এই শর্তে যে বাপের সঙ্গে মেয়ের দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ হবে না। মেয়ে নিয়ে আসবেন মেয়ের মা। কর্তারা অনুমতি দেন, কিন্তু এই শর্তে যে সাক্ষাৎকারের সময় প্রাক্তন স্বামীর সঙ্গে প্রাক্তন স্ত্রী কথা বলতে পারবেন না। মূকাভিনয় করতে হত দু'জনকে। এ ছাড়া আর কোনো যন্ত্রণা ছিল না। কালো মানুষ হলেও বন্দীটি তো ভারতীয়। ভারতীয়দের সঙ্গে তো শত্রুতা নেই।

"যুদ্ধ একদিন শেষ হয়ে যায়। আমি মুক্তি পাই। আবার আমাদের বিয়ে হয়। একই নারীকে আমি দুইবার বিয়ে করেছি।" ঘোষ রসিকতা করেন।

হল্যান্ড কিন্তু তাঁদের সহ্য হয় না। তাঁরা সুইজারল্যান্ডে চলে যান। সেখানে একটা চমৎকার বাড়ি কিনে বসবাস করেন। তাঁদের বাড়ির একাংশ হয় অতিথিশালা। অতিথিরা অবশ্য আতিথেয়তার প্রতিদান নেন। ডাক্তারি করতে দেওয়া হয় না, ব্যবসায়ে অর্থোপার্জন করা চলে। আপাতত তিনি এসেছেন একটি এয়ারলাইনের প্রতিনিধি হয়ে। উঠেছেন গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে। ইতিমধ্যেই জন্মভূমি ঘুরে এসেছেন। সেটা এখন পাকিস্তানে। কিন্তু প্রতিবেশী মুসলমানরা তেমনি বন্ধুভাবাপন্ন। ছাড়তে চায় না। কী করা যায়! ফিরে যেতেই হবে।

এর পর ঘোষ আমাকে মস্ত বড়ো চমক দেন। বলেন, "প্যারিসে শেষবার আপনি আমাকে একটা বিদায় উপহার দেন, মনে আছে? আপনার প্রবন্ধের বই 'তারুণ্য'। বইখানি আমি যত্ন করে তুলে রাখি। বাংলা বই তো আমার কাছে আর ছিল না। বন্দীশিবিরে যখন যাই তখন আপনার বইখানি নিয়ে যাই। আপনার 'তারুণ্য' আমাকে বাঁচবার প্রেরণা দেয়, বাঁচিয়ে রাখে। তাই আপনাকে আমি ভুলতে পারিনি। ভুলিনি।"

কথা ছিল আবার আমাদের দেখা হবে। কিন্তু পরে খোঁজ নিয়ে জানতে পেলুম তাঁরা কলকাতায় নেই। তারপর কেটে গেছে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর। ইতিমধ্যে আর দেখাও হয়নি, খবরও মেলেনি। মাঝখানের সূত্র ছিলেন অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার। তিনি সেদিন আমাদের বিদায় দিয়ে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেন। আমরা চলে যাই মুর্শিদাবাদ আর তাঁরা চলে যান আমেরিকা। কথা ছিল আবার আমাদের দেখা হবে, আলাপ আলোচনা হবে। কিন্তু আমেরিকায় বিনয়কুমার অসুস্থ হন, সে অসুখ সারে না। তিনি সেইদেশেই দেহরক্ষা করেন।

আমার জীবনের সেদিনকার সন্ধ্যাটি স্মরণীয়। মনে হয় দৈবানুগৃহীত।

আটচল্লিশ

বসুমতী ও আমি, সাতাত্তর বছর

বসুমতীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক প্রায় ৭৭ বছর ধরে। আমার বাবা ছিলেন সাপ্তাহিক বসুমতীর গ্রাহক। সপ্তায় সপ্তায় যখন বসুমতী আসত তখন আট বছর বয়স থেকেই আমি ছিলাম তার

পাঠক। বছর বছর বাবা বসুমতীর উপহার হিসাবে গ্রন্থাবলী কিনতেন। সেসব গ্রন্থাবলীরও আমি ছিলাম পাঠক।

আমার যেখানে জন্ম সেখানে বাংলা চর্চা ছিল কয়েকটি পরিবারে নিবদ্ধ। সুতরাং বসুমতী আমার জীবনের প্রথম দিকে বাংলা চর্চার সহায়ক হয়েছিল। সেই সূত্রে আমি সারা দেশের খবর বসুমতীর মাধ্যমেই পেতুম। দেশবিদেশের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটত। পরে বসুমতীর দৈনিক সংস্করণ বেরোয়, সেটাই এখন রয়েছে, সাপ্তাহিকটি অন্তর্ধান করেছে।

এই সাপ্তাহিক বসুমতীর সম্পাদক ছিলেন—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। আমি তাঁর লেখার পক্ষপাতী ছিলুম। আমিও ইচ্ছে করেছিলুম বসুমতী পত্রিকায় গিয়ে সাংবাদিক হব। ম্যাট্রিকুলেশনের পরে আমি কলকাতায় যাই এবং পিতৃবন্ধু দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের কাছ থেকে একটি পরিচয়পত্র নিয়ে হেমেন্দ্রবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি আমার সঙ্গে অত্যন্ত সহৃদয় ব্যবহার করেন। প্রায়ই আমি তাঁর কাছে গিয়ে বসতুম এবং বইপত্র নাড়াচাড়া করতুম। কিন্তু শিক্ষানবিশীর দিক দিয়ে কোন রকম সুবিধে হল না। তিনি আমাকে পরামর্শ দেন শর্টহ্যান্ড এবং টাইপ রাইটিং শিখতে। কিছুদিন শর্টহ্যান্ড ও টাইপরাইটিং শিখলুম। ক্রমশ উপলব্ধি করলুম যে, এসব আমার জন্য নয়। আমি লেখক হতে চাই।

কিন্তু তার কোন ভরসা না পেয়ে আমি কটকে চলে যাই ও সেখানকার কলেজে ভর্তি হই। তারপর একটার পর একটা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আমি বিলেত যাই। পথেপ্রবাসে লিখি ও বাংলা সাহিত্যিক মহলে প্রবেশ করি। বসুমতীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক তখনকার মতো ছিন্ন হয়। অনেকদিন পরে প্রাণতোষ ঘটক যখন মাসিক বসুমতীর সম্পাদনার ভার নেন তখন প্রাণতোষবাবুর অনুরোধেই আমি মাসিক বসুমতীর জন্য কিছু লিখি। প্রাণতোষবাবু যতদিন ছিলেন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তারপর আবার তা ছিন্ন হয়।

দৈনিক বসুমতী অনেকদিন পর্যন্ত আমার কাছে আসত। তারপর বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় যখন তার সম্পাদনার ভার নেন, তখন তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ আরো ঘনিষ্ঠ হয়। ইতিমধ্যে সাপ্তাহিক বসুমতী অন্য আকারে পুনঃপ্রকাশিত হয়। আমার অগ্রজ প্রতিম সুকুমার সেনের কন্যা জয়ন্তী সেন ছিলেন তার সম্পাদিকা। তাঁর অনুরোধে আমি সাপ্তাহিক বসুমতীর জন্য বারবার লেখা দিই। দুঃখের বিষয় পত্রিকাটি উঠে যায়। মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা দুটি অন্তর্ধানের পর কেবলমাত্র দৈনিক জীবিত থাকে। আরো বারবার পুনঃজন্ম হয়। তারপর দৈনিক বসুমতীর শারদীয়া সংখ্যার জন্য প্রায় প্রত্যেক বছরই অনুরোধ আসত একটি করে ছড়ার জন্য। আমি ছড়া লিখে পাঠাতুম। পরে শ্রীমান কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়—যার সঙ্গে আমার আলাপ সেই প্রাণতোষের আমল থেকেই, এসে আমার কাছে শারদীয়া সংখ্যার জন্য উপন্যাস চায়। তখন আমি ওকে আমার উপন্যাসের অংশ বিশেষ দিই। তারপর থেকে প্রবন্ধের অনুরোধ আসছে। প্রবন্ধ লিখছি। বসুমতীর পাঠক থেকে আমি হয়ে গেছি বসুমতীর লেখক। যেটা আমার ছিল অন্তরের বাসনা, সেই হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে আলাপের পর থেকেই। তখন আমি চেয়েছিলুম সম্পাদকীয় লিখতে। আমার উচ্চাভিলাষ ছিল সম্পাদক হবার, অন্তত সহকারী সম্পাদক। একটি ১৭ বছরের বালকের পক্ষে সেটা ছিল দুরাশা, সেটা আমার খেয়াল ছিল না। তবে আমার বয়সের পক্ষে আমি অনেক বেশি পড়াশোনা করেছিলাম। সে সব পড়াশোনা পরে কলেজের কাজে লাগে। মাসিক বসুমতীও পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে শুনে আমি আনন্দিত

হয়েছি। আমি আশা করি এর দ্বারা একটি অভাব পূরণ করা হবে।

বসুমতীর দৈনিক ও মাসিক সংস্করণের জন্য আমার আন্তরিক শুভ কামনা। বসুমতী গ্রন্থাবলী বিভাগের জন্যও আমি শুভ কামনা জানাই।

বসুমতীর গ্রন্থাবলী বিভাগ আমাদের দেশে 'হোম ইউনিভারসিটি'র কাজ করেছে। এই কাজ যেন বসুমতী আরো তৎপরতার সঙ্গে চালিয়ে যায়। সাধারণ গৃহস্থ পরিবার যেন সুলভ মূল্যে বিশ্ববিদ্যার সঙ্গে পরিচিত হয়। আমার মতে, এটাই বসুমতীর শ্রেষ্ঠ কাজ। আমার জীবনে আমি এর দ্বারা উপকৃত হয়েছি। আমার লাইব্রেরি গর্বিত হয়েছে বসুমতী গ্রন্থাবলী সমূহের দ্বারা। বসুমতী কর্তৃপক্ষের কাছে নববর্ষের এই পুণ্য লগ্নে আমার নিবেদন তাঁরা যেন এই বিভাগটিকে আরো সমৃদ্ধ করেন।

উনপঞ্চাশ

গুরুদেব আমাকে দেখতে চেয়েছিলেন

তখন আমি রাজসাহী জেলার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। ১৯৩৭ সাল। রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারি বা সেরকম কোন একজনের কাছ থেকে একটা টেলিগ্রাম পেলুম। তাতে লেখা, গুরুদেব আপনাকে দেখতে চান। আতরাইঘাট রেলস্টেশনে চলে আসুন।

আমি দেখলুম যে তক্ষুনি যদি রওনা হই, তাহলে রাজসাহী থেকে নাটোর যাব মোটরে, নাটোর থেকে আতরাইঘাট যাব ট্রেনে। ট্রেন থেকে নেমে গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করব। কাজেই সেদিন আমার দুপুরের খাওয়ার জন্য সময় বিশেষ ছিল না। কোন রকমে মুখে কিছু দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লুম।

আতরাইঘাট স্টেশনে পৌঁছে দেখি গুরুদেবের হাউসবোট ইতিমধ্যে পতিসর থেকে পৌঁছে গেছে। পতিসরে তার জমিদারি। সেখানে তিনি গিয়েছিলেন তাঁর জমিদারি পরিদর্শন করতে আর তাঁর প্রজাদের দর্শন দিতে। তা, গুরুদেব বোট থেকে বেরিয়ে আসছেন, এমন সময় আমি গিয়ে তাঁকে প্রণাম করি।

আমি লক্ষ্য করেছিলাম যে, গুরুদেবের সঙ্গে তাঁর প্রজারা সদলে নদীর পাড় ধরে পায়ে হেঁটে এসেছে। বেশিরভাগই দাড়িওয়ালা বুড়ো মুসলমান। গুরুদেব বললেন,—দেখছ তো, এরা আমায় কত ভালোবাসে। এরা বলে পয়গম্বরকে আমরা চোখে দেখিনি, আপনাকে দেখলুম আমাদের জীবন ধন্য।

তারপর ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে আমরা স্টেশনে উঠে সেখানে এক জায়গায় বসি। ফিরতি ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করি। ফিরতি ট্রেন মানে কলকাতায় ফেরার ট্রেন। ট্রেন এলে সবাই মিলে গুরুদেবকে ফিরতি ট্রেনে বসিয়ে দেয়। আমিও তাঁর সঙ্গে একই কামরায় উঠি। আতরাইঘাট থেকে নাটোর পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ মিনিট গুরুদেবকে আমি একা পাই। অবিস্মরণীয় সে অভিজ্ঞতা। সেসময়ে তাঁর সঙ্গে আমার সাহিত্য বিষয়ে নানারকম কথাবার্তা হয়। তিনি একটা নাটক লিখতে চেয়েছিলেন মহাভারত থেকে কাহিনী নিয়ে। কিন্তু তিনি লিখে উঠতে পারেননি। তিনি আমাকেই তা লিখতে বলেন। এছাড়াও তিনি আমাকে ছড়া লেখার জন্য খুবই উৎসাহ দেন।

এরকম সব কথাবার্তার পর ট্রেন এসে নাটোরে থামে, আমি নেমে যাই। ট্রেন ছেড়ে দেয়। তিনি চলে যান কলকাতা অভিমুখে, আমি চলে যাই রাজসাহী অভিমুখে।

পরে একদিন দেখি আমার নামে একখানা বই এসেছে, রবীন্দ্রনাথের লেখা 'সে'।

সেই রবীন্দ্র-দর্শন আমার কাছে দুটি কারণে স্মরণীয়। প্রথমত, সেই দেবনন্দিত পুরুষের দর্শন লাভ এবং দ্বিতীয়ত, তাঁর সঙ্গে আলোচনার সময় তিনি আমাকে সাহিত্য সম্পর্কে কিছু আইডিয়া দিয়েছিলেন। সেগুলো আমি গ্রহণ করি। সেই রবীন্দ্র দর্শনের দুটি ফলকেই আমি আজও আমার অন্তরে সযত্নে লালন করে চলেছি।

পঞ্চাশ

আমার ছেলেবেলা

আমার ছেলেবেলা কেটেছে আমার জন্মস্থান ঢেঙ্কানাল রাজ্যের রাজধানী নিজগড়ে। সেইরকম চব্বিশটি গড় নিয়ে চব্বিশটি দেশীয় রাজ্য। তাদের সমষ্টিকে বলা হয় গড়জাত। গড়জাত হচ্ছে ওড়িশার পাহাড়ি অঞ্চল। সমুদ্র উপকূলবর্তী তিনটি জেলা নিয়ে মোগলবন্দী। যেখানে মোগলরা এককালে রাজত্ব করত। মোগল সরকারে চাকরি নিয়ে আমার পূর্বপুরুষ মোগলবন্দীতে আসেন ও মোগল বাদশাহের দেওয়া তালুক পেয়ে জমিয়ে বসেন। শরিকে-শরিকে ঝগড়া করতে করতে এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে আমার ঠাকুরদাকে বালেশ্বর জেলার ভদ্রাসন ছেড়ে সপরিবারে কাজকর্মের খোঁজে বেরোতে হয়। আমাদের বংশে আঠারো বছর বয়সে আমার বাবাই নেন ইংরেজ সরকারের চাকরি। কিন্তু কর্মস্থলে হাই ইংলিশ স্কুল না থাকায় ছোট ভাইদের ইংরেজি পড়াশোনা হয় না। কিছুদিন পরে তিনি ঢেঙ্কানাল রাজ্যে চাকরি পেয়ে সেইখানেই ভাইদের পড়ান। ইংরেজ সরকারের চাকরি ছেড়ে কেউ কখনো দেশীয় রাজ্যে চাকরি নেয় না। রাজকুলের খামখেয়ালীর কথা কে না জানে। তবু তিনি সব ঝুঁকি নেন।

তাছাড়া গড়জাত বলতে বোঝায় বাঘ-ভাল্লুকের রাজ্য। কটকে আমার মামার বাড়ি। আমার বড়মামা জীবনে কখনো ঢেঙ্কানালে আসেননি। তাঁর ধারণা রাস্তায় রাস্তায় বাঘভাল্লুক ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমরা যে কী করে বেঁচে আছি এটাই তাঁর কাছে দুর্বোধ্য। শুনেছি আমার জন্মের আগে জঙ্গল আরো বেশি ছিল। তখন নাকি বাঘমামা রাতের বেলা বেড়াতে বেরোতেন। সবাই দরজা বন্ধ করে রাখত। কাছাকাছি জায়গায় বাঘের উপদ্রব মাঝে মাঝে হতো, এটা আমারও জানা। একবার আমাদের বাড়ির সামনের রাজপথে গোরুর গাড়িতে করে এক বিশালকায় মহাবল বাঘের মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যেতে দেখি। মহাবল মানে রয়্যাল বেঙ্গল। বিশ্রী গন্ধ। কিন্তু কী সুন্দর দেখতে। কে যে তাকে গুলি করে মারে তা হয়তো শুনেছি, কিন্তু মনে নেই। তখনকার দিনে নিয়ম ছিল রাজা ভিন্ন কিংবা তাঁর অনুমতি ভিন্ন কেউ বাঘ শিকার করতে পারবে না। রয়ালকে রয়াল ভিন্ন মারবে কে?

গড়জাতকে মোগলবন্দীর লোকেরা বলত অন্ধারি মুলুক। অন্ধারি মানে অন্ধকার। অবজ্ঞাসূচক। রাজারা অত্যাচারী, প্রজারা মূর্খ। কিন্তু গড়জাতবাসীরা চিরকাল স্বাধীন বা অর্ধস্বাধীন। মোগলবন্দীর লোক, তো বহু শতাব্দী ধরে বন্দী। অবজ্ঞা করার তারা কে?

তারাই তো অনুকম্পার পাত্র। আমিও জন্মত গড়জাতী। তাই গড়জাতের জন্যে আমি গর্ববোধ করতুম। গড়জাত হচ্ছে ওড়িশার হাইল্যান্ড। গড়জাতীরা হাইল্যান্ডার। আমিও তাই। সকালে ঘুম ভাঙলেই দেখতুম পাহাড়। বিকেলে সূর্য অস্ত যেত পাহাড়ের ওধারে। গ্রীষ্মকালে পাহাড়ে আগুন ধরে রোশনাইয়ের মতো দেখাত। গায়ে এসে লাগত গরম হাওয়া। কেউ হয়তো পাহাড়ে কাঠ কাটতে গিয়ে জ্বলন্ত বিড়ি বা পিকা ফেলে রেখে এসেছে। তার থেকেই দাবদাহ। অনেক পশুপাখি পুড়ে মরে। দুঃখের বিষয়, কিন্তু রোশনাই কার না নয়নহরণ করে?

আশেপাশে কত গাছ ছিল। বাড়ির সামনের রাস্তায় ওধারে দেবদারু গাছ। বাড়ির একপাশে মহানিম। আরেক পাশে তেমনি এক বৃহৎ বৃক্ষ। মনে পড়ছে না শিমুল না পালধুয়া না কী। তার তলায় ছিল বড়ো উইঢিবি আর মনসাসিজের ঝাড়। সাপখোপের ভয়ে আমরা সেদিকে ঘেঁষতুম না। বর্ষাকালে উইঢিবির ভিতর থেকে বেরিয়ে আসত ডানাওয়ালা উইপোকা আর তাদের ধরে ধরে খাওয়ার জন্যে অসংখ্য কাঁকড়াবিছা। পরে তারা গর্তে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে যেত। আমাদের কিছু করত না। আমরাও কিছু করতুম না। তবে দুটো একটা পথ ভুলে বাড়িতেও হাজির হত। বিষ তো তাদের মুখে নয়, ল্যাজে। রশি বেঁধে ঘোরাতে পারা যেত। তারপর তার বাসায় ছেড়ে দিলে চলত।

সাপের কথায় মনে পড়ে অঁইঠা কেলার কথা। কেলারা এমনিতেই অচ্ছুৎ। তার উপর অঁইঠা। অর্থাৎ এঁটো। যমের অরুচি হবে বলেই অমন নাম রাখা। শুধু কেলার ছেলের কেন, ব্রাহ্মণ, কারণ, খণ্ডায়েৎ, নায়েক ইত্যাদি জাতের পুত্রকন্যাদের। কারো নাম হাড়ি, কারো নাম পান, কারো নাম ডোম, কারো নাম কণ্ডরা। ইস্কুলে গেলে হাড়িবন্ধু বা হরিবন্ধু, প্রাণকৃষ্ণ বা প্রাণবন্ধু, ডম্ববতার, কন্ডুরি চরণ। তেমনি হাড়িয়ানি, পুলুনি, বেলুনি। ভদ্র নাম কার কী অত মনে নেই। মেয়েরা তো ইসকুলে আমার সহপাঠী ছিল না। বিয়েও হয়ে যেত দশ এগারো বছর বয়সে। যার কথা বলছিলুম সে কেলাজাতীয় বেদে। ঠিকানা অজানা। বছরে একদিন এসে হাজির হত। কাঁধে বাঁক। বাঁক থেকে ঝুলছে ছোট বড়ো মাঝারি গোল গোল পেড়ী। বড়োর পিঠে মাঝারি, তার পিঠে ছোট বাঁকটা নামিয়ে সে একটার পর একটা পেড়ী খোলে আর ফণা তোলে একটার পর একটা সাপ। নানা জাতের, নানা মাপের, নানা রঙের সাপ।

বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে 'ডালিয়া' বলে সে এক এক করে সাপগুলোকে খেলায়। সাপগুলো ফোঁস ফোঁস করে তেড়ে আসে, কামড়াতে উদ্যত হয়। সে পাশ কাটায়। হাত দিয়ে ঘাড় চেপে ধরে। ল্যাজ ধরে ঝোলায়। গলায় জড়ায়। আমাদের বলে ধরতে। আমরা শতহস্ত দূরে! সে আমাদের বোঝায় সে সাপগুলোর বিষদাঁত ভেঙে দেওয়া হয়েছে। সাপের কামড়ে, কেউ প্রাণে মরবে না। কামড়ালে ওষুধ তো তার কাছেই আছে। জারমহুরা। ক্ষতস্থানে লাগালেই বিষ টেনে নেয়। সেই মূল্যবান সামগ্রী এসে আমাদের দিয়ে যাবে। সাপে কাটলে ক্ষতস্থানে লাগাব। সঙ্গে সঙ্গে বিষমুক্ত হব। কতই বা দাম। পাঁচ টাকা। তার কাছে আরো একটি মূল্যবান দ্রব্য ছিল। গদ। বাগানে গদ পুঁতলে গাছ হবে। সাপ তার গন্ধ পেলে পালাবে। বাগানও হবে সর্পমুক্ত। কতই বা দাম! এক টাকা না দুটাকা।

সেলসম্যান হিসাবে অঁইঠা ছিল প্রখর বুদ্ধিমান। আমরা জারমহুরাও কিনতুম, গদও কিনতুম। জারমহুরা যে কী তার বর্ণনা দিতে পারব না। বোধহয় একরকম পাথর। কিন্তু অত কঠিন নয়। তবে ওটা বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না। সাপুড়েদের কাছেই মেলে। কখনো

ব্যবহার করার উপলক্ষ জোটেনি। বাগানে গদ পুঁতেছি। সাপ বেরোয়নি। কাকতালীয় কিনা কে জানে। অঁইঠা আমাকে বলেছিল সাপ ধরতে শিখিয়ে দেবে। আমি যদি তার সঙ্গে যাই। সাপ একবার সে ধরেও এনেছিল। মুখে হাত ঢুকিয়ে বিষদাঁত ভেঙেছিল। সে জবর জোয়ান। গায়ের রং মিশকালো। তার সাপগুলোর মধ্যে ছিল গোখরো, চিতি, কালনাগিনী ইত্যাদি। বিষম রাগী। চোখে যেন আগুন জ্বলছে। কিন্তু একটারও মাথায় মণি নেই। আমি বলি, "কই, মণি কোথায়? সাপের মাথার মণি। এরা দেখছি মণিহারা ফণী।" সে মুচকি হাসে। "ওঃ। এই কথা! আসছে বার যখন আসব তখন এনে দেব মণি। তার জন্যে অনেক ঢুঁড়তে হবে, খোকাবাবু।" আমি বিশ্বাস করি। পরের বছর সে যখন আসে তখন আমাকে নিরাশ করে। বলে, "মনে ছিল না। পরের বার আনব।"

কেলারা যখন আসে তখন দল বেঁধে আসে। সঙ্গে থাকে তাদের স্ত্রীলোকেরাও। মাটিতে একটা বাঁশ পুঁতে তারাও কতরকম কৌশল দেখায়। কিন্তু আমার স্মৃতি এবিষয়ে তেমন স্পষ্ট নয়। হয়তো এটা আমার শোনা কথা। যতদূর মনে পড়ে কাক মারাও কেলাদের ছিল এক অভ্যাস। গুলতি দিয়ে অঁইঠা বোধহয় আমাদের বাড়ির কাছের গাছ থেকে কাক শিকার করেছিল। কাকের অনুকরণে কা কা করে ডাকলে যত রাজ্যের কাক উড়ে এসে বসত। একটা মরলে আর সব কটা পালাত। এটাও আমার আবছা স্মৃতি। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়েও হতে পারে। আমাদের বাড়িতে রাজ্যের লোক আসত। একবার একদল ইরানী মেয়ে এসে সোজা অন্দরে ঢোকে আর ছোরাছুরি বার করে মাকে দেখায়। তাদের পরনে ঘাগরা। বুলি বোঝা ভার। ওরা চেয়েছিল ছোরাছুরি বিক্রি করতে। মা কী করে বুঝবেন? ভয় পান। আমাদের ছোরাছুরির দরকার ছিল না। বোধহয় একটা কিনতে হয়, নইলে তারা যাবে না। ওদের বিদায়ের পর এক একজন বলেন, "বুঝলে না। ছোরাছুরি বেচাটা ওদের ছল। ওরা এসেছিল ঘরের ভিতরটা দেখে নিতে। কোথায় কী আছে? ফিরে গিয়ে ওদের মরদদের জানাবে। রাতের বেলা মরদরা আসবে চুরি করতে। সাবধান।" সাবধান থাকি। কিন্তু চুরি হয় না। ইরানীরা কাঁহা কাঁহা মুলুক থেকে আসে। কাঁহা কাঁহা মুলুকে যায়। আর কখনো তাদের দেখিনি।

কুম্ভীপটুয়ারা আমাদের বাড়ির সামনের রাজপথ দিয়ে যাওয়া আসা করতেন। মাথায় বিরাট জটা, পিঠে বিরাট তালপাতার ছাতা বাঁধা। পরনে শুধু মাত্র কৌপীন। ওই প্রৌঢ় সাধুরা কথা বলতেন না। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে কোথায় যেতেন, কোনখান থেকে আসতেন ওঁদের জিজ্ঞাসা করিনি। তবে শুনেছি ওঁদের ধর্মকে বলে মহিমাধর্ম। ওঁরা যাঁরা উপাসনা বা ধ্যান করেন তিনি অলেখ। অলেখ তো শূন্যও হতে পারে। বৌদ্ধ ঐতিহ্য এখনো কোথাও কোথাও প্রচ্ছন্ন রয়েছে। ওঁদের গুরুর নাম যতদূর মনে পড়ে ভীম ভোই। যোরন্দা গ্রামে ওঁরা পর্ব উপলক্ষে সমবেত হন। সেইখানেই তাঁর সমাধি। শিষ্যরা জাতপাত মানেন না বলে শোনা যায়। যোরন্দায় মেলা বসে। নানা রাজ্য থেকে বিস্তর লোক আসে। শুনেছি, কিন্তু দেখিনি।

আমাদের বাড়িতে যাঁরা আসতেন তাঁদের কেউ মুসলমান, কেউ খ্রিস্টান, কেউ অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান। আশেপাশেই থাকতেন ব্রাহ্ম আর শিখ। আমার ঠাকুরদা, আমার বাবা সবাইকে অভ্যর্থনা করতেন। সকলের বক্তব্য শুনতেন। আমরা স্বধর্মে বিশ্বাস করলেও পরধর্মে সশ্রদ্ধ ছিলুম। বাড়ির পেছনেই থাকতেন একঘর ধর্মপ্রাণ মুসলমান। তাঁরাও স্বধর্মে

বিশ্বাস, পরধর্মের সঙ্গে মানিয়ে চলতে জানতেন। আমাদের গোঁড়ামিটা ছিল আচার নিয়ে, বিশ্বাস নিয়ে নয়। বাড়িতে বাইবেল ছিল, একটু বড়ো হয়ে আমি বাইবেলও পড়ি। গীতা ছিল অ্যানী বেসান্টের অনুবাদ। আচার, শিথিল হত, যখন বোখারি সাহেব সত্যপীরের সিন্নি দিয়ে যেতেন। আমরা কাড়াকাড়ি করে খেতুম। আর আতাহার মিঞা সঙ্গে করে আনতেন অতি উপাদেয় হালুয়া। হিন্দুর বাড়িতে ওরকম হালুয়া হয় না। আতাহার মিঞা উর্দুভাষী মুসলমান অফিসার। আর বোখারী সাহেবও উর্দুভাষী তা না বললেও চলবে। আর আমাদের প্রতিবেশী কোচম্যান মিঞা যে উর্দুভাষী সেটাও বলে রাখা উচিত। ওড়িশার মুসলমানদের পাঠান বলে পরিচয়। সকলেই উর্দুভাষী। কিন্তু আমাদের প্রতিবেশী পরিবারটি বিহার থেকে আগত।

এঁদের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম পাঠান মাস্টার। তিনি পাঠান হলেও কথা বলতেন বাংলায়। পরতেন ধুতি। গলায় দিতেন, কামিজের উপরে চাদর। গোঁফ রাখতেন, দাড়ি রাখতেন না। তখন কি ছাই জানতুম যে তাঁর বাড়ি বাংলাদেশের খুলনা জেলায় আর তাঁর মাতৃভাষা বাংলা! মুসলমান হচ্ছে সেই, যার দাড়ি আছে, যে উর্দুতে কথা বলে। পাঠান মাস্টার ছিলেন কাকাদের বন্ধু তাই আমাদের আর একটি কাকা। রোজ সন্ধ্যাবেলা আসতেন, চা-টা খেতেন, জমিয়ে বসতেন, আড্ডা দিতেন আমার ছেলেবেলার ফোটোতে দেখি তিনি আমার নবজাত বোনকে কোলে নিয়ে বসেছেন। আর আমি তাঁর একপাশে আলাদা একটা চেয়ারে বসেছি। তিনি আমাদের পরিবারে সঙ্গে এত বেশি একাত্ম হয়েছিলেন যে তাঁর চলে যাবার পর আমরা কেউ তাঁকে ভুলিনি। আমার ছোটকাকা তো আমার বাংলাদেশে চাকরির পর আমাকে বলে রেখেছিলেন পাঠান মাস্টার খোন্দকার সাহেবের খোঁজ নিতে। খুলনায় কখনো বদলি হইনি। তাই খোঁজ নেওয়াও হয়নি। তবে শুনেছিলুম তিনি মাস্টারি ছেড়ে মোক্তারি করেন।

কাছেই মাস্টারের বাসা। মাঝে মাঝে যেতুম। মাস্টারনী ডিম সেদ্ধ করে খাওয়াতেন। কী সর্বনাশ! মুরগীর ডিম। জাত থাকে কী করে! মুরগী আমাদের বাড়ির ত্রিসীমানায় নেই। এমনকি আমাদের মুসলমান প্রতিবেশীর বাড়িতেও না। মুরগীর মাংস প্রথম কবে কোথায় খাই তা মনে পড়ে না, মাছমাংস খাওয়া তো বন্ধ হয়ে যায় বাড়িতে আমার ঠাকুরদার মৃত্যুর পর আমার বাবা মা যখন রামদাস বাবাজীর কাছে বৈষ্ণব দীক্ষা নেন। খেতে চাইলে বাগানে গিয়ে লুকিয়ে রেঁধে খেতে হত। আমরা বহু শতাব্দীর শাক্ত। আমার নামকরণ শাক্ত মতে। আমরা তিন ভাই ও দুই বোন। প্রথম চারজনের শাক্ত নাম, শেষেরটির বৈষ্ণব নামকরণ। তবে এটাও বলে রাখি যে বৈষ্ণব নামও পূর্বপুরুষদের মধ্যে ছিল। আমার বাবার নাম নিমাইচরণ। ঠাকুরদার নাম শ্রীনাথ। শাক্ত আর বৈষ্ণব মিলে মিশে সহ-অবস্থান করে এসেছে।

আমরা জন্মের পর থেকে আমি ঠাকুরমার কোলেই মানুষ। তাঁর মুখে শুনেছি জন্মের সময় আমার সম্বল ছিল একটি মাথা আর কয়েকখানি হাড়। আমার ভার নিয়ে আমাকে তিনি ডুবিয়ে রাখতেন তেল আর হলুদের গামলায়। সে গামলা পড়ে থাকত উঠোনে। সারাদিন রোদ পড়ত গায়ে। একটু একটু করে আমার মাংস লাগে। বেশ কয়েক বছর আমার পথ্য ছিল উঠোনে কাঠের আগুনে দোরাঁধা ভাত। তার সঙ্গে আলুসিদ্ধ ও লেবুর রস। ঠাকুমাকেই আমি মা বলতুম আর মাকে খোকার মা। মার কোলে আমার একটি ভাই আসে। সেও ঠাকুমার কোলে মানুষ হয়। সে কিন্তু আমার মতো দুবলা পাতলা নয়। গায়ের

জোরে আমাকে হারায়। ঠাকুরমার দুই পাশে আমরা দুভাই শুতুম আর তাঁর শুকনো মাই টেনে মাতৃস্তন্যের সাধ মেটাতুম। তিনি আমাদের দেশ বিদেশের পুরাণ উপকথা টাটকা খবর শোনাতেন। রামায়ণ মহাভারত থেকে গোলেবকাউলি। মহারানী ভিক্টোরিয়া তাঁর স্বামীকে ধমক দিয়ে বলতেন, 'বেলা হয়েছে, বিছানায় পড়ে আছ কেন?' গল্পটা তিনি রসিয়ে রসিয়ে বলতেন। যেন তিনিই এ বাড়ির মহারানী আর ঠাকুরদা রাজকুমার আলবার্ট। ঠাকুরদা ছিলেন নিতান্ত গোবেচারি ভালোমানুষ। শরিকদের চক্রান্তে উদ্বাস্তু। আর স্ব গ্রামে ফেরেননি। কোথাও শিকড় লাগেনি। কিন্তু গোপালন, গোচিকিৎসা ইত্যাদিতে নিপুণ। তিনিও আমাদের পাশে বসিয়ে কতরকম বিষয় শেখাতেন।

ঠাকুমা যাঁর নিত্য পূজা করতেন তাঁর নাম পুনুমাসি। পুনুমাসি যে কার মাসি তা আমাকে কেউ বলেননি, আমিও জানতুম না তিনি কে। বড়ো হয়ে শুনলুম তাঁর প্রকৃত নাম পৌর্ণমাসি। তিনি নামান্তরে যশোদার গর্ভজাত কন্যা যোগমায়া। মতান্তরে শ্রীরাধার সখী। ঠাকুমা যখন ঠাকুরদার মৃত্যুর বছর কয়েক পরে বড়কাকার সঙ্গে আমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যান তখন তাঁর বিগ্রহটিকেও নিয়ে যান। তাঁর আগেই মা বাবা গোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন, নাম রাখেন গৌরগোপাল। ঠাকুমা যখন ছিলেন তখন আমার উপর ভার ছিল কবিকঙ্কণ চণ্ডী পড়ে শোনাবার। আমার বয়স তখন কত? দশের বেশি নয়। যে বছর প্রথম মহাযুদ্ধ বাধে সেই বছরই আমাদের বসতবাড়ির খড়ের চালে আগুন লাগে ও সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কবিকঙ্কণ চণ্ডীও। আমাদের মাথা গুঁজতে হয় উঠোনের ওপারের ঘরগুলোতে। সেগুলো রক্ষা পায়।

আমাদের শক্তি আরাধনা বলতে বোঝাত অসিপূজা। একটা জলচৌকির উপরে শোওয়ানো থাকত বহু পুরুষের পুরাতন অসি, তার মানে আমাদের পুঁথিপত্র, বেশ মোটাসোটা বলে ইংরেজি শেক্সপীয়ার গ্রন্থাবলীও তার সামিল। এ ব্যাপারে বাবা কাকারা ছিলে সম্পূর্ণ উদার। এটা ইংরেজি, ওটা বাংলা এরূপ গণনা তাঁদের ছিল না। বসুধৈব কুটুম্বকম্ আমার আশৈশব শিক্ষা। সেই বয়সেই আমি কাকা ও তাঁর বন্ধুদের জুলিয়াস সীজার ও মার্চেন্ট অভ্ ভেনিসের ইংরেজি অভিনয় দেখি। বেশি নয়, এক একটি অঙ্ক। জুলিয়াস সীজারের মৃতদেহের সামনে ব্রুটাস ও অ্যান্টনির বাগ্মিতা। ডিউকের দরবারে পোর্শিয়ার সওয়াল। শাইলকের ছোরা আমার স্পষ্ট মনে আছে। 'আই শ্যাল ফীড ফ্যাট মাই এন্‌সিয়েন্ট গ্রাজ।' বেচারা ছোটকাকা সেবার বেঁচে যান বাঙ্কনিধিবাবুর হাত থেকে। শাইলকের হাত থেকে অ্যান্টনিও।

আমার প্রথম দেখা নাটক বোধহয় 'ধ্রুব'। আমার সমবয়সী দুর্গাচরণ দেখতে আরো ছোট। পরিবারটি দুঃস্থ। স্বাভাবিক অভিনয় করে সে সবাইকে মুগ্ধ করে। এরপর দেখি 'নিমাই সন্ন্যাস।' দেওয়ানবাবুর বাড়িতে অভিনয়। এরপর যখন রাজবাড়িতেও অভিনয় হয় তখন আমার বাবা ব্রাহ্মণ সেজে ইয়া মোটা লাঠি হাতে মারতে যাচ্ছেন রাখালবাবুকে। 'ওহে নিমাই পণ্ডিত, বালক চোর।' বালকটি আর কেউ নয়, সেই দুর্গাচরণ। দুর্গার সৌভাগ্য দেখে আমার হিংসা হয়। তাছাড়া নাটক আরম্ভ হওয়ার আগে রাখালবাবুর মেজ ছেলে মনোরঞ্জন বাঁশি হাতে ত্রিভঙ্গ হয়ে গান করে, 'ফুটিল পীরিতের ফুল'। বাবা ছিলেন রাজবাড়ির থিয়েটারের অবৈতনিক ম্যানেজার। লজ্জার মাথা খেয়ে তাঁর কাছে নিবেদন করি, 'আমি কেন থিয়েটার করতে পারব না?' পরের ছেলের বেলা যিনি সদয় নিজের ছেলের বেলা

তিনি নির্দয়। মনের দুঃখ মনে চেপে রাখতে হয়। পরে একদিন মনোরঞ্জনরা তাদের দাদামশায়ের বাড়িতে 'মুকুট' অভিনয়ে আমাকে ডেকে নেয়। আমাকে দেয় রাজসভাসদ্ ধুরন্ধরের পার্ট। যুবরাজ নয়, মেজকুমার নয়, ঈশা খাঁ নয়, ধুরন্ধর। ক্ষুণ্ণ হব না? তবু সেই আমার এ জীবনের প্রথম ও শেষ পার্ট।

রাজাসাহেব অকালে পরলোকে যান। তখন আমার বয়স বোধহয় বারো। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন বছরে তিন চারবার নাটক অভিনয় হত। রংমহলের দর্শকদের মধ্যে আমিও একজন ছিলুম। রাজাসনের এক পাশে মেঝেতে পাতা ফরাসের উপরে গিয়ে বসতুম। অভিনয় শেষ হলে অভিনেতারা রাজবাড়ির একটি কক্ষে ভোজ লাগাতেন। আমিও বসে যেতুম পাত পেতে। ভোজ বলতে এমন কিছু রাজকীয় নয়। লুচি, ছোলার ডাল, ছক্কা তরকারি।

রাজহস্তের পুরস্কার পাওয়া আমার জীবনের অন্যতম সৌভাগ্য। সাত কি আটবছর বয়সে যখন হাই স্কুলে ভর্তি হই তখন ইংরেজি আমি একেবারেই জানতুম না বললে চলে। প্রশ্নের উত্তরে 'নো' না বলে বলি, 'নট'। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারি যে ওটা ভুল। বছর দুয়েক যেতে না যেতে আমার কাকা ও তাঁর বন্ধুরা আমাকে শিখিয়ে পড়িয়ে খাড়া করে দেয় রাজা-সাহেবের সমক্ষে স্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভায়। আমাকে আবৃত্তি করতে বলা হয় টেনিসনের 'চার্জ অভ্ দ্য লাইট ব্রিগেড'। চার্জ যে কী, লাইট যে কী, ব্রিগেড যে কী তখন আমার কিছুই জানা ছিল না। হাত পা নেড়ে আবৃত্তি করি, 'ক্যানন টু দ্য রাইট অভ্ দেম, ক্যানন টু দ্য লেফট অভ্ দেম, ক্যানন ইন ফ্রন্ট অভ্ দেম ভলিড অ্যান্ড থান্ডার্ড'। এরপরে হোঁচট খাই। আমতা আমতা করে দে দৌড়। হাসাহাসি পড়ে যায়। রাজাসাহেব মুচকি হাসেন। আমাকে কেউ প্রম্পট করবার জন্যে ছিলেন না। থাকলে কি অমন বিভ্রাট হত। যাই হোক, আসল জিনিসটা তো ওই পুরস্কার। সেটা আমি রাজহস্ত থেকে গ্রহণ করি। সেকালের ছ'পেনি দামের একখানা বিলিতী বই। বোধহয় ব্ল্যাকি অ্যান্ড সন্সের। মোটা কাগজে বড়ো বড়ো হরফে ছাপা। মনে আছে আমাকে সাহেব সাজতে হয়েছিল। কোট আর হাফ প্যান্ট পরে। যেদিন সকাল বেলা পুরস্কার বিতরণ হত সেদিন সন্ধ্যেবেলা হত সেই হলঘরেই ভোজ। ছাত্ররা সবাই মিলে আনন্দ করত। যারা পুরস্কার পায়নি সেটাই ছিল তাদের সান্ত্বনা পুরস্কার। অন্যান্য বছর আমরাও। এ প্রথা রাজাসাহেবের মৃত্যুর পর রহিত হয়।

দেশীয় রাজ্যে রাজা মহারাজার নেতৃত্ব ছাড়া কোনো পূজাপার্বণই অনুষ্ঠিত হত না। বিজয়া দশমীর দিন দশহরার শোভাযাত্রায় তিনিই হতেন পুরোগামী। রথযাত্রাতেও তিনি। দোলযাত্রাতেও তিনি। এইসব উৎসবে অন্যতম প্রধান ভূমিকা ছিল পাইকদের। এরা তলোয়ার ছেড়ে লাঙল ধরেছিল। প্রত্যেকেই ছিল নিষ্কর জমির মালিক। ব্রিটিশ শাসনে সৈন্যদল রাখার অনুমতি আমাদের রাজার ছিল না। ওই পাইকরাই একরকম মিলিশিয়া। মাঝে মাঝে রাজধানীতে এসে খেলা দেখাত। তাদের অস্ত্রশস্ত্র বলতে মরচে ধরা ভাঙা তলোয়ার বা গাদা বন্দুক। অনুমতি পেলে তাই দিয়ে বাঘ শিকার করত। বা হরিণ শিকার। শিকারের অধিকার একমাত্র রাজার বা রাজবংশীয়দের বা রাজ অতিথিদের ছিল। বিনা অনুমতিতে শিকার করলে জেল বা জরিমানা। বন্যজন্তুরা চাষীদের ক্ষেত খামার ধ্বংস, গোরু বাছুর ধ্বংস করছে শুনলে রাজা বা তাঁর অনুমতি নিয়ে অন্যান্যরা শিকার করতে যেতেন। পাইকরা সাহায্য করত। মাঝে মাঝে হাতি খেদা হত। বড়ো বড়ো দাঁতাল হাতি ধরা

পড়ত। তাদের পায়ে লোহার শিকল পরানো হোত। শিকলপরা দাঁতাল হাতিকে মাহুতরা 'মণ' করিয়ে দোরস্ত করত। 'মণ' করা যে কী ব্যাপার তা আমি জানিনে। বাড়িতে বসে প্রায়ই শুনতে পেতুম হাতিশালা থেকে হাতিদের হুঙ্কার। সেইসব ভয়ানক প্রাণী আমাদের বাড়ির সামনের রাজপথ দিয়ে রোজ যেত পুষ্করিণীতে অবগাহন করতে। একই পথ দিয়ে ফিরে যেত হাতিশালায়। হস্তিনীদের নামের সঙ্গে যুক্ত থাকত পিয়ারি। যেমন চঞ্চলপিয়ারি। হস্তীদের নাম আমি কিছুতেই মনে করতে পারছিনে। কেবল একটি নাম মনে আছে। মোহনলাল বা মোহনা হাতি। বিষম দুর্দান্ত। মাহুতরা সবাই মুসলমান। ঘোড়ার গাড়ির কোচোয়ানরাও তাই। ওরাই পারে দুষ্টু হাতি ও ঘোড়াদের শায়েস্তা করতে গিয়ে জান দিতে। পাইকদের দিয়ে ওসব কাজ হত না। যার কর্ম তারে সাজে। রাজবাড়ির কুকুর পরিচর্যার জন্যে আস্ত একটা জাতের সৃষ্টি হয়েছিল। তারা কুকুরিয়া। কুকুরগুলো অবশ্য বিলিতী কুত্তা। দেশী কুকুর সর্বত্র অনাদৃত। তখনো, এখনো।

রাজবাড়ির অদূরেই বলরাম মন্দির। জগন্নাথ মন্দিরের মতো তিন মূর্তিই ছিলেন সেখানে। পরে জগন্নাথের আলাদা একটি বিগ্রহ একই প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠিত হয়। মা ঠাকুমার সঙ্গে আমিও যেতুম সপ্তাহে একবার কি দুবার ঠাকুর দেখতে। রথ দেখার চেয়ে কলা বেচাই হত বেশি। ঠাকুর দেখার পর মন্দিরের বাইরে একপাশে সরে গিয়ে মহিলাতে মহিলাতে কথাবার্তা। জানা অজানা আরো অনেক মহিলা এসে যোগ দিতেন। বলা যেতে পারে মহিলা মজলিস বা মহিলাদের ক্লাব। আমি তার অনরারী মেম্বার। দিনের বেলা যাঁরা অন্তঃপুরবাসিনী, রাতের বেলা তাঁরা মুক্ত বিহঙ্গিনী। কী প্রাণচাঞ্চল্য, কী ফূর্তি। শাশুড়িরা একদিকে, বৌরা আরেকদিকে। কুমারীরা আরো একদিকে। কুমারীদের কারো কারো বয়স পনেরো ষোল। তখনকার দিনে ব্যতিক্রম। কথোপকথনের বিষয় আমি ভুলে গেছি, আধ্যাত্মিক যে নয় সেটা নিশ্চিত। ঘরসংসার, মেয়ের বিয়ে, পাত্রের সন্ধান, নাতির অসুখ, কর্তার অত্যাচার বা অনাচার, চাকরবাকর, বাজারদর, ভূতপ্রেত, জ্যোতিষী গণনা এমনি কত কথা। একটি ছোট ছেলেকে অকালে পাকাবার পক্ষে যথেষ্ট। বয়সের তুলনায় আমি অকালপক্ক হয়েই পড়ি।

রথযাত্রার সময় সেই মন্দির থেকে তিন বিগ্রহকে রাস্তায় বালিশ পেতে এক বালিশ থেকে আরেক বালিশে লাফাতে লাফাতে নিয়ে যাওয়া হত রথতলায়। সেই লাফা যাত্রাকে বলা হত পহণ্ডি। বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে রথ তৈরি করা চলত। তিন বিগ্রহের জন্য তিন রথ। রথের পাটাতনের চারদিকে বা ছয়দিকে বসানো হত ছোট ছোট কাঠের প্যানেল। প্রত্যেকটিতে এক একটি দেব দৈত্য গন্ধর্ব মানুষ বা পশুর প্রতিরূপ। রামায়ণ মহাভারত থেকে নেওয়া। কিংবা কাল্পনিক। লাল নীল হলুদ ইত্যাদি রঙে রঙিন। সুযোগ পেলেই আমরা ছেলেরা গিয়ে পাটাতনের উপর উঠে খেলা করতুম। রথযাত্রা একদিনে সমাপ্ত হত না। রথ রাস্তায় একধারে হেলে পড়ে ঘরবাড়ি জখম করত। সেই আটকে পড়া রথের উপর উঠে কাদের নর্তন? তা কি খুলে বলতে হবে? আমরা চলন্ত রথের উপরেও চড়েছি। আমাদেরও টেনে নেওয়া হয়েছে বামনের সঙ্গে বামনের মতো। রথে তু বামনং দৃষ্টবা পুনর্জন্ম না বিদ্যতে। রথের উপর বামনকে দেখলে পুনর্জন্ম হয় না। হাজার দশেক দর্শকের যদি পুনর্জন্ম ন হয় তবে তার জন্যে আমাদেরও ধন্যবাদ দিতে হয়। তবে দিনের বেলা গম্ভীর।

ইয়া ইয়া মোটা দড়ি যারা টানত তারাও ইয়া ইয়া জোয়ান। রাজার আদেশে বেগার খাটতে আসে গ্রাম অঞ্চল থেকে। পথের দু'ধারে দাঁড়িয়ে গেছে অসংখ্য স্ত্রীপুরুষ। বেশির ভাগই গ্রাম থেকে এসেছে রথ দেখতে ও কলা বেচতে। কলা বলতে অনেক সামগ্রীই বোঝায়। মেলা বসে যায়। রথের উপর থাকে একজন সারথি। সে বহুবার এই কাজ করেছে। করতে করতে বুড়ো হয়ে গেছে। তার হাতে এক বন্দুক। ফায়ার করলে রথ চলে। ফায়ার করলে রথ থামে। সে একটার পর একটা ছড়া কাটে আর সেই ছড়া শুনে মরদরা উদ্দীপ্ত হয়ে রথ টানে আর মেয়েরা খিল খিল করে হাসে। একটা কি দুটো ছড়া আমার এখনো মনে আছে। কিন্তু লিখতে ভরসা হয় না। বাবু ও বিবিরা বলবেন অপসংস্কৃতি। কী করে বোঝাব যে আমরা গড়জাতীরা ছিলুম মার্শাল রেশ। মার্শাল রেসের ঐতিহ্যই হল অশ্লীল ও অশালীন নৃত্য গীত চিত্র মূর্তি সঙ্গীত। ব্রিটিশ আমলে আমাদের নন-মার্শাল বানিয়ে সুসভ্য করা হয়েছে। কিন্তু বাঁধ ভেঙে যায় পালাপার্বণের সময়। ধর্মের মুখোশ পরেই আদিম উল্লাস।

বলরাম মন্দিরের মতোই রাতের বেলা রথের আশেপাশে মহিলারা জমায়েত হতেন ও দেবতাদের ভোগরাগ দিতেন। আবার সেইরকম মহিলাদের ক্লাব আমি তার অনরারী মেম্বার। অনরারী হলেও অনাহারী নই। ভোগের একটা ভাগ তো আমার হাতে পড়তই। আকর্ষণটা কিন্তু ভোজনের প্রতি নয়, মহিলাদের সান্নিধ্যের প্রতি। নারী যে রহস্যময়ী তা আমাকে বই পড়ে শিখতে হয়নি। গ্যেটের ভিলহেল্ম মাইস্টারের শিক্ষানবিশির মতো আমার শিক্ষানবিশিও ছেলেবেলা থেকেই শুরু হয়। কিন্তু আমার নিজের অজান্তে। বিদ্যালয়ের পড়ুয়া হিসাবে আমার তেমন সুনাম ছিল না। কারণ পাঠ্যপুস্তকে আমার মন ছিল না। গণিতে গোল্লা পেয়েই আমার বিদ্যারম্ভ। নিচু পোজিশন থেকে উঠতে উঠতে উঁচু পোজিশনও একদিন আমি পাই। কিন্তু ততদিনে আমার ছেলেবেলা সাঙ্গ হয়ে গেছে। ছেলেবেলা বলতে আমি বুঝি বারো বছর পর্যন্ত বয়স।

তবে স্কুলের ছাত্র হিসাবে আমি সবরকম খেলায় যোগ দিতে শিখি। সহপাঠীরা ধরে নিয়ে যায় খেলার মাঠে। সাধারণত ফুটবল খেলতে। কখনো কখনো ক্রিকেট। টেনিসও মাঝে মাঝে। ব্যাডমিন্টন তো প্রায়ই। কৃতিত্ব কোনোটাতেই দেখাতে পারিনি। একবারমাত্র পুরস্কার পেয়েছিলাম একটি রূপোর টাকা। ডিম আর চামচের দৌড়ে। সেটাও ফাঁকি দিয়ে। কারণ চামচের বোঁটা ধরে শুরু করলেও পরে একসময় চামচের গলা টিপে ধরেছি। সেটা গর্বের নয়, লজ্জার বিষয়। আমার কিছু কেরামত ছিল সাঁতারে। আর গাছে ওঠায়। গাছে উঠে সারাদিন জাম খেয়ে পেট ভরিয়েছি। আর একটা কথা কানে কানে বলছি। কাঁকড়ার গর্তে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে কাঁকড়া ধরেছি।

আর একটা গুপ্ত কথাও কবুল করি। লুকোচুরি খেলায় আমার ওস্তাদি ছিল। কিন্তু ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটি মেয়েকেই আমি প্রত্যেকবার ধরতুম বা ধরা দিতুম। আমার প্রিয় পড়োশিনী। কোথায় যে বিয়ে হয়ে গেল তার। কী যে হল পরে, জানিনে। অতি মিষ্টি স্বভাব। কিন্তু আমার প্রথম কবিতার প্রেরণাময়ী সে নয়। আরেকটি বালিকা। এটি একটি কলকাতার মেয়ে। খুব স্মার্ট। কিন্তু দেখতে এমন ভালো নয়। আমাদের ওই অজ মফঃস্বলে কলকাতার মেয়ে একটি দুর্লভ বিস্ময়। লিখেই ফেলি বাল্মীকির মতো আমার প্রথম শ্লোক। মনে পড়ছে না কী যে ছিল সেই কয় লাইনে। যে কাগজে লিখি সেটাকে এঁটে রাখি দেয়ালের গায়ে। এমন জায়গায় যেটা খুকুমণির চোখে পড়ে। খুকুমণি পড়ে অবাক হয়ে

যাবে যে আমি কবিতা লিখতে পারি, আমি একজন কবি। তার চেয়েও বড়ো কথা আমি ওকে ভালোবাসি। ভালোবাসা পেতে চাই। খুকুমণি আমার কবিতার দিকে ফিরেও তাকায় না। তার পড়াশুনাও ততদূর নয়।

বাবা আমাকে ডন বৈঠক শিখিয়েছিলেন। চর্চা করিনি। কাকা শিখিয়েছিলেন ডাম্বেল। চর্চা করিনি। শেষে এক পালোয়ান আসেন কুস্তি শেখাতে। হিন্দুস্থানী দারোয়ান। পরমেশ্বর তার নাম। সে আমাকে কুস্তিগীরের মতো কাপড় পরতে শেখায়। তার অনেক কায়দা কৌশল। প্যাঁচের পর প্যাঁচ। মল্ল সেজে কুস্তি করতে গিয়ে বার বার ধরাশায়ী হই। কাউকে ধরাশায়ী করতে পারিনে। লেগে থাকলে হতাম আমি একজন কুস্তিগীর। জীবনে অনেক কিছু হতে চেয়েছি কিংবা আমার গুরুজন চেয়েছেন যে আমি হই। বাবা বলেছিলেন আমি জর্জ ওয়াশিংটন হব। জর্জ ওয়াশিংটন না হয়ে আমি তাঁর দেশের একটি কন্যাকে বিবাহ করেছি। তিনি আশীর্বাদ করেছেন।

একান্ন

আপন কথা

এক যে ছিল সাধু, তাঁর গায়ে ছিল এক কম্বল। বারো মাস সেটা তিনি গায়ে জড়িয়ে রাখতেন, কী শীত, কী গ্রীষ্ম, কী বর্ষা, কী বসন্ত। যে দেখত সে-ই বলত, সাধুজী, এ কী ব্যাপার? আমরা এমনিতেই ঘামে ভাসছি আর আপনার গায়ে কম্বল! আপনার কষ্ট হচ্ছে না?

সাধুজী হেসে বলেন, ''আরে ভাই, কষ্ট সইব না তো সংসার ছেড়েছি কেন? কিন্তু সংসার ছাড়লে কী হবে, এই কমলীকে ছাড়তে পারছি নে। আমি ছাড়তে চাইলেও কমলী আমাকে ছাড়ছে না।''

হাস্যকর ব্যাপার। কিন্তু অমন হাস্যকর ব্যাপার ওই একটি নয়। অবিকল এক না হলেও দৃষ্টান্ত অনেক। কারো বেলা ছড়ি, কারো বেলা ছাতা, কারো কারো বেলা ওভারকোট। সাধুদের কারো কারো বেলা কান ঢাকা টুপি।

আমার বেলা চা আর খবরের কাগজ।

চা খেতে শিখি চার কি পাঁচ বছর বয়সে। রোজ বিকেলবেলা আমার ঠাকুরদা বসতেন চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে। একে একে জুটতেন তাঁর সমবয়সী প্রতিবেশী চা-সেবীগণ। কারো কারো হাতে নিজস্ব পেয়ালা বা গেলাস। চায়ের সঙ্গে বেশি করে দুধ মিশিয়ে তিনি আমাদেরও দিতেন, আমাকে আর আমার ছোট ভাইকে। আমাদের দুধ খাওয়াবার ওটাও এটা কৌশল। এরপর সাত আট বছর বয়সে ডাকঘরে গিয়ে বাবার নামের চিঠিপত্র নিয়ে আসি ও খবরের কাগজ থাকলে তার মোড়ক খুলে পড়ি। যতো বড়ো পাঠক নয় তত বড়ো কাগজ। মাটিতে পেতে শোওয়া যায়। নাম 'বসুমতী'। সেটা ছিল সাপ্তাহিক। প্রায় সমস্তটাই গোগ্রাসে গিলতুম। বুঝি আর না বুঝি ওটা পড়া আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়।

আরো একখানা পত্রিকা আসত। সেটা ইংরেজি 'দ্যা বেঙ্গলী'। প্রথমে সাপ্তাহিক সংস্করণ, পরে অর্ধসাপ্তাহিক। বুঝতে পারিনে, পড়তে চাইনে, কিন্তু উৎসাহ দেন আমার বাবা। ইংরেজি শেখাবার ওটাও একটা কৌশল। স্কুলে আর কতটুকু শেখায়!

কাকাদের একজন একটা ওড়িয়া সাপ্তাহিক পত্রিকাও নিতেন ও তাতে লিখতেন।

সেটাও আমি পড়তুম। একদিন দেখি তাতে ছাপা হয়ে গেছে বাড়ির বেড়ালের নাম। রসিকা কিন্তু স্ত্রী নয়, পুরুষ। ওকে আমার বেশ মনে আছে। ওর সন্তান-সন্ততির ধারা অনেকদিন প্রবাহিত ছিল।

চা আর খবরের কাগজ যে আমাকে সারাজীবন তাড়া করবে তা কি তখন জানতুম? ছাড়তে চাইলেও ছাড়ে না। কয়েকবার ছেড়ে দেখেছি। অভ্যাস ছাড়া অত সহজ নয়। অভ্যাস এখন নেশায় দাঁড়িয়েছে।

আগে বলি চা পানের বৃত্তান্ত। জাপানে টী সেরিমনি প্রত্যক্ষ করেছি। সে এক এলাহি কাণ্ড। তিন ঘণ্টা ধরে চলার কথা। আমরা বিদেশী অতিথি বলে সংক্ষেপিত হয়। যতদূর মনে পড়ে ঘণ্টাখানেক লাগে। মহিলারা পরিবেশন করেন। একজন পুরুষ অধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে। ওটা ধর্মের অঙ্গ। বৌদ্ধ ধর্মের 'জেন' বা ধ্যানী সম্প্রদায়ের।

চা আমাদের দেশে অর্বাচীন। এর সঙ্গে ধর্মের কোনো যোগ নেই। তবে সাধু সন্ন্যাসীরাও চা পান করতে ভালোবাসেন। পিতলের না কাঁসার বাটিতে এক বাটি গরম চা পান করেছিলুম লছমনঝোলার ছোট একটি মঠে। গঙ্গার ধারে বসে সেই চা পান করতে কত যে ভালো লেগেছিল! পান করালেন যিনি তিনি এক বর্ষীয়সী সন্ন্যাসী। আপ্যায়নটা ছিল বোধহয় আমার সহধর্মিণীর সুবাদে। আমি তো একটা প্রতিজ্ঞাই করে ফেলি যে আবার আমরা লছমনঝোলায় আসব ও থাকব। উদ্দেশ্য গঙ্গার শোভা দর্শন ও চা পান। ষাট বছর কেটে গেছে। এখনো তা পূরণ হয় নি।

নিজের বাড়ির প্রসঙ্গে ফিরে যাই। ঠাকুরদার পরলোকের পরেও চায়ের বৈঠক অব্যাহত থাকে। পৌরোহিত্য করেন বাবা। প্রতিবেশীরা আসেন না। কিন্তু বাড়িতে অতিথি থাকলে তাঁরা যোগ দেন। চলছিল বেশ, কিন্তু হঠাৎ ইউরোপে মহাযুদ্ধ বেধে যায়। সংসারযাত্রার খরচ বাড়ে, কিন্তু চাকরির মাইনে সেই অনুপাতে বাড়ে না। আয় ব্যয়ের সমতা আনতে না পেরে বাবা চায়ের জন্য খরচটা ছাঁটাই করেন। বলেন, 'এখন থেকে চা বন্ধ। ওতে ট্যানিক অ্যাসিড আছে। সেটা বিষ। তাছাড়া ওটা চা-কুলীর রক্ত।'

এতকালের অভ্যাস ছাড়তে আমাদের খুবই কষ্ট হয়। কিন্তু ওটাও তো একরকম নেশা। নেশা জিনিসটা কি ভালো? আমার ছোটকাকা বলেন, "আমাদের মতো লোকের পক্ষে একটা নেশাই যথেষ্ট! তারই খরচ কুলিয়ে উঠতে পারছিনে। তার নাম ভাত। তার উপরে আরো একটা নেশা!"

দু'দিনের বাসি পান্তা ভাতের আমানি খেলে একটু নেশার মতো ভাব আসে বইকি। আমার জন্মস্থানে ওটাও একটা ডেলিকেসি। ওর সঙ্গে একটু নুন লঙ্কা মিশিয়ে নিতে হয়। আরো কী মেশায়, মনে পড়ছে না। আমরা ওর তেমন পক্ষপাতী ছিলুম না। লোকে শুনলে ভাববে কী? আমরা যে "বাবু" বলে সম্মানিত।

যুদ্ধের ধাক্কায় কাপড়েও টান পড়ে। হেডমাস্টারমশায় স্কুলের ছাত্রদের ডেকে বলেন "তোমরা শার্ট, কোট বর্জন করো। শাল ও চাদরেরও দরকার কী। ধুতির কোঁচা গায়ে জড়িয়ে আসবে। মাস্টারমশায়েরা কেউ কিছু মনে করবেন না। কেবল ইনস্পেক্টর সাহেব যেদিন আসবেন সেদিনের কথা আলাদা।"

ওদিকে চায়ের কী হল বলি। এক দূর সম্পর্কেব পিসেমশায় আমাদের ওখানে চাকরির খোঁজে এসে আস্তানা গেড়ে বসেছিলেন। তিনি নেন রোজ বাজার করার ভার।

ঠাকুরকে ছাঁটাই করা হয়েছিল। রান্নার ভার নিয়েছিলেন মা। বিকেলে কাছারি থেকে ফিরে বাবা যখন জলখাবার খেতে বসতেন তাঁর সঙ্গে আমরাও বসতুম। তখন তিনি বলতেন, "আহা! জলের বদলে এক পেয়ালা চা যদি থাকত।"

তখন মহেন্দ্র পিসে বলতেন, "আছে। টিনটাতে কয়েকটা পাতা পড়ে আছে। চাও তো এনে দিতে পারি।"

সকলে তাঁর তারিফ করত। ভাঁড়ারের ভার তাঁর হাতেই নিরাপদ। বাবা খুশি হয়ে বলতেন, "ভাগ্যিস মহেন্দ্র ছিল।"

রোজ বিকেলে একই অভিনয় হয়। চা যেন আর ফুরোতে চায় না। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। বাবা আর উচ্চবাচ্য করেন না। ট্যানিক অ্যাসিড উদরস্থ করেন।

মাসকাবারের সময় মুদি এসে বলে, 'বাবুমশায়, এক টিন চা আনিয়েছিলেন, তার দামটা বাকি আছে।"

বাবা তো অবাক! মহেন্দ্র পিসেকে জিজ্ঞাসা করেন। পিসে ভিজে বেড়ালটি। কী একটা আজেবাজে জবাব দেন। সেইদিনই মহেন্দ্র বিদায়। আমাদেরও চা পান শেষ। যুদ্ধের পরে বাবার অবস্থা একটু ভালো হয়। তখন চা পান আবার শুরু। কিন্তু ততদিনে আমি চলে গেছি বাড়ি থেকে বহু দূরে। কলেজে। যাদের সঙ্গে এক কক্ষে থাকি তারা কেউ চা খায় না। কেন না পায় না। টাকায় কুলোয় না। আমিও কোনোমতে খরচ চালাই।

কলেজের বছর ছয়েক চা পান কদাচিৎ ঘটে। কলেজ বন্ধের সময় নিজের বাড়িতে। অন্য সময় আর কারো বাড়িতে। হাতে কিছু পয়সা জমলে একটা স্টোভ কিনি। তাতে চা নয়, কোকো বানাই। যাতে নিদ্রাকর্ষণ হয়। আমার এমন কপাল যে পরীক্ষায় সাফল্য যদি বা এল তার সঙ্গে সঙ্গে এল অনিদ্রা। যাকে বলে ইনসমনিয়া। বিলেতে গিয়েও তার হাত থেকে রেহাই মেলে না। সেখানেও কোকোই আমার সাথী। তবে চায়েরও খরচ জোটে।

জাহাজে ওরা রোজ ডিনারের পর একটি ছোট্ট পেয়ালায় কফি পরিবেশন করত। বিদঘুটে কালো কফি। চমৎকার গন্ধ! বলে কয়ে সেটাকে আমি ধলা করে নিই। প্রচুর দুধ মেশাই। লোকে হাসে। তা হাসুক। কফির টেস্ট থাকে না। না থাকুক। কিন্তু কফি খেলে আমার ঘুম আসে না। অগত্যা জাহাজের কফি পার্টিতে যাওয়া ছেড়ে দিয়ে জাহাজের ডেকে গিয়ে হাওয়া খাই। তাতে নিদ্রাকর্ষণ হয়।

পশ্চিমে সামাজিক মানুষ হতে চলে চা বা কফি বা মদ খেতে ও খাওয়াতে হয়। ফ্রান্সে তো খাবার জল চাইলে খনিজ জল এনে দেয়। অচেনা শয়তানের চেয়ে চেনা শয়তান ভালো। এটা ইংরেজদের প্রবাদ। আমি চায়ের পাট আবার শুরু করি। দেশে ফিরে এসেও তারই জের চলে।

খাবার আর খবর দুটোই আমার সামনে রাখলে আমি খাবার ছেড়ে খবরটাই আগে ধরি। খবরের কাগজ খুঁটিয়ে পড়ে তার পরে খাবারে মন দেওয়া। অবশ্য খেতে খেতেও পড়া যায়, পড়তে পড়তেও খাওয়া যায়। কিন্তু সেটা টেবিল ম্যানার্স নয়। তাতে অন্যের প্রতি অমনোযোগ বা অবহেলা প্রকাশ পায়।

খবরের কাগজ পড়তে পড়তে আমি দ্বিতীয় একটা নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ি। অর্থাভাব, বাড়িতে ইংরেজি কাগজ নেওয়া বন্ধ। বাইরে গিয়ে যখন যা পাই পড়ি। স্কুলের পত্রিকাঘর ছিল আমার জিম্মায়। বেড়ালের জিম্মায় মাছ। সেকালের অধিকাংশ বিখ্যাত

পত্রিকাই স্কুল থেকে নেওয়া হত। কিংবা হেডমাস্টারমশায়ের নিজের বাড়ি থেকেই আসত। এমনি করে আমার 'সবুজপত্রে'র সঙ্গে পরিচয় ঘটে। আমার জীবনে সেটা একটা স্মরণীয় ঘটনা। কিন্তু 'সবুজপত্র' বা 'ভারতী' বা 'মানসী ও মর্মবাণী' তো খবরের কাগজ নয়। মাস্টারমশায়ের বাড়ি গিয়ে 'প্রবাসী' পড়তুম। তাতে কিছু খবর থাকত। আর খবর সম্বন্ধে মন্তব্য। এই সময় বিলেত থেকে আসে 'মাই ম্যাগাজিন' ও 'চিলড্রেন্স' নিউজ পেপার'। আমি স্বর্গ হাতে পাই। বছর বারো কি তেরো তখন বয়স। বুঝি আর না বুঝি বিলিতী কাগজ পড়া আমার চাই। বেশ মনে আছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনের পত্নীর আগে কোনো এক পূর্বনারী ছিলেন রেড ইন্ডিয়ান প্রিন্সেস। খবরটা তারিফ করে ছাপা হয়েছিল।

বাড়িতে একদিন তুমুল উত্তেজনা। কাকারা কোথায় শুনে এসেছেন উড্রো উইলসন নাকি বলেছেন যে ভারতকে না—ভারত প্রভৃতিকে সেফ ডিটারমিনেশনের অধিকার দিতে হবে। তার মানে স্বরাজ আমরা চাইলেই পাব। কাকারা তা বিশ্বাস করেন। কিন্তু বাবা করেন না। স্বরাজ কি এত সহজে মেলে? ইংরেজরা কি সহজে তাদের সাম্রাজ্য গুটিয়ে নেবে? উইলসন বললেই হল? আমরা সেদিন বাবার উপর বিরক্ত হই।

কেমন করে যেন আমার হাতে কিছু টাকা আসে। 'প্রবাসীর' গ্রাহক হয়ে পড়ি। অন্যের কাছে 'মডার্ন রিভিউ' ধার করি। পরে কলেজে গিয়ে স্কলারশিপের টাকা থেকে 'মডার্ন রিভিউ'-য়ের চাঁদা পাঠাই। অমনি করে আমার খবরের তৃষা কতক পরিমাণে মেটে। কিন্তু দুধের সাধ কি ঘোলে মেটে? পড়তে হয় দৈনিক বা সাপ্তাহিক। বার্ষিক চাঁদা মাত্র দু'টাকা। পরে তিন টাকা হয়। যেমন করে পারি গোটা কয়েক টাকা জোগাড় করে গ্রাহক হয়ে পড়ি। সারা হপ্তার মোটা মোটা খবরগুলো সমস্তই তাতে থাকত। নেতাদের ভাষণের রিপোর্টও। প্রথম যে সংখ্যা আমার হাতে আসে তাতে বড়ো বড়ো হরফে ছাপা ছিল বারীন্দ্রকুমার ঘোষের মুক্তি। বারীন্দ্র যখন দ্বীপান্তরিত হন তখন আমি শিশু। একটু বড়ো হয়ে তার দাদা অরবিন্দ ঘোষের নাম শুনি, কিন্তু তাঁর নয়। অরবিন্দ ঘোষ নাকি যুদ্ধের সময় জার্মানীতে পালিয়ে গেছেন অস্ত্র দিয়ে দেশ উদ্ধার করবেন। আমার সমবয়সীরা তাঁর প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায়।

'টেলিগ্রাফ' খুলে দেখি পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে নির্মম হত্যাকাণ্ড। সামরিক আইন। খবরের উপর নিষেধাজ্ঞা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাইট উপাধি ত্যাগ। মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতাদের প্রতিবাদ।

এর আগে বা পরে সুখবরও পড়ি। মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিফর্মস। স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ লর্ড উপাধি পেয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাউস অব লর্ডসের মেম্বর। এক বাঙালির নাইট উপাধি ত্যাগ তো আরেক বাঙালির ব্যারন উপাধি লাভ। সাড়া পড়ে যায়।

ইতিমধ্যে আমি চিঠি লিখে সারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে খবরের কাগজের নমুনা আনাতে আরম্ভ করেছি। মাদ্রাজ থেকে আসে মিসেস অ্যানী বেসান্টের দৈনিক 'নিউ ইন্ডিয়া' আর সাপ্তাহিক 'কমনউইল'। আর অব্রাহ্মণদের মুখপত্র 'জাস্টীস'। মিসেস বেসান্টের নাম আমি আগে থেকেই জানতুম। আমাদের বাড়িতে তাঁর 'শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা' ও তার ইংরেজি অনুবাদ ছিল। পকেট সাইজ, দাম মাত্র দু'আনা। পরে বোধ হয় চার আনা হয়। হেডমাস্টার মশায় ছিলেন থিয়সফিস্ট, মিসেস বেসান্টের ভক্ত। কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে তিনি সভানেত্রী হয়েছিলেন। তার একটা কৌতুককর বিবরণ ছিল বীরবলের রচনায়। বীরবল তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'অম্ন বাসন্তী'। অধিবেশনে কেন যে মারামারি

হয়েছিল মনে নেই। কিন্তু বাঙালি তরুণদের সবুজ পরিধান রক্তে লাল হয়ে যায়। বীরবল ছিলেন বাঙালি পেট্রিয়ট। তাঁর হিন্দু মুসলিম ভেদবুদ্ধি ছিল না। তিনি ও তাঁর মতো হাইকোর্টের ব্যারিস্টার আর অ্যাটর্নিরাই ছিলেন তৎকালীন কংগ্রেসের নীতি ও নেতা নির্ধারক। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ও ভূপেন্দ্রনাথ বসু পর্যন্ত বাঙালি সভাপতিরা ছিলেন তাঁদের লোক। আর দীর্ঘকাল ধরে কংগ্রেসের সেক্রেটারী ছিলেন জানকীনাথ ঘোষাল, স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বামী। মিসেস বেসান্টের সময় থেকে কংগ্রেস চলে যায় কলকাতার বাঙালি মডারেট মহলের মুঠোর বাইরে। কিছুদিন পরে 'বেঙ্গলী'-তে দেখি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেস ছাড়লেন।

বোম্বাই থেকে আসে দৈনিক 'বোম্বাই ক্রনিকল' ও 'অ্যাডভোকেট অব ইন্ডিয়া'। করাচি থেকে দৈনিক 'নিউ টাইমস'। লাহোর থেকে লালা লাজপত রায়ের 'বন্দে মাতরম'। ওটা কিন্তু ইংরেজি নয়, উর্দু পত্রিকা। এলাহাবাদ থেকে আসে দৈনিক 'ইন্ডিপেন্ডেট' ও সাপ্তাহিক 'ডেমোক্রাট'। উভয়েরই সম্পাদক বিপিনচন্দ্র পাল। বিপিনচন্দ্র ততদিনে 'পরম বৈষ্ণব' হয়েছেন। 'ডেমোক্রাটে'র প্রথম কি দ্বিতীয় সম্পাদকীয় ছিল 'দ্য রোড টু বৃন্দাবন'। বিপিনচন্দ্র পদত্যাগ করনে। 'ডেমোক্রাট' বোধহয় উঠে যায়। কংগ্রেসের নীতি ও নেতা পরিবর্তনের পর ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় কংগ্রেসের বিশিষ্ট মুখপত্র। আমার চিঠির উত্তর দেন পত্রিকার ম্যানেজার জবাহরলাল নেহরু। তখনকার দিনে অজ্ঞাতনামা।

পাটনার 'সার্চলাইট' থেকে আমি আমার জীবনের অন্যতম মূলমন্ত্র পাই। 'ইটারনাল ভিজিলান্স ইজ দ্য প্রাইস অব্ লিবার্টি'। স্বাধীনতার মূল্য চির জাগৃতি। আরো কয়েকখানা কাগজও হাতে আসে। এসব পড়তে পড়তে আমি স্থির করি যে আমিও হব খবরের কাগজের সম্পাদকীয় স্তম্ভের লেখক। আমাদের স্কুলের লাইব্রেরিতে আমেরিকান 'সেলফ এডুকেটর' ছিল। তাতে ছিল সংবাদপত্র সম্পাদনা ও পরিচালনার প্রসঙ্গে প্রবন্ধ। এডিটর, সাব-এডিটর, রিপোর্টার কার কী কর্তব্য। আমি রিপোর্টার হব না সাব-এডিটরও না, উন্নতি করতে করতে এডিটর হব। তা যদি না হই তবে ফ্রী-লান্স হব। এই যেমন সন্ত নিহাল সিং। 'মডার্ন রিভিউ'তে আমেরিকাস্থিত ভারতীয় সাংবাদিকদের সম্বন্ধে পড়েছি। তাঁরা যা করছেন তাও তো দেশের কাজ।

অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। ম্যাট্রিক দেবার ইচ্ছে ছিল না, অনিচ্ছাসত্ত্বেও দিই। তারপরে কলকাতা যাত্রা, সেখান থেকে সম্ভব হলে পরে একসময় আমেরিকা পলায়ন। পিতৃবন্ধুর চিঠি নিয়ে 'বসুমতী' সম্পাদক হেমেন্দ্রকুমার ঘোষের সঙ্গে দেখা করি ও শিক্ষানবিশীর বাসনা জানাই। তিনি বলেন শর্টহ্যাণ্ড টাইপরাইটিং শিখে 'রিপোর্টার' হতে। 'সারভেন্ট' সম্পাদক শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি বলেন প্রুফ রিডিং শিখতে। কোথায় এডিটোরিয়াল লেখা আর কোথায় এইসব আজেবাজে কাজ। প্রুফ রিডারমশায় উপদেশ দেন আগে গ্রাজুয়েট হতে, তারপরে এ লাইনে আসতে। গোলামখানায় যাব না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলুম। ফিরলে মুখরক্ষা হতো না, যদি না কাকা ডেকে পাঠাতেন।

কলেজে ভর্তি হই। কিন্তু খবরের কাগজ পড়া সমানে চলে। রোজ মাইলখানেক হেঁটে ডাকঘরে যাই, হকার ডেলিভারি নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুই বন্ধুতে মিলে চার পয়সা দিয়ে 'সারভেন্ট' লুফে নিই। গরম গরম খবর তো থাকেই, সম্পাদকীয়ও তেমনি গরম। একদিন দেখা গেল 'আনন্দবাজার পত্রিকা' নতুন প্রকারে প্রকাশিত হচ্ছে। এখন আর বৈষ্ণবদের

ধর্মীয় সাপ্তাহিক নয়, স্বরাজের জন্যে অহিংস সংগ্রামীদের প্রেরণাসঞ্চারী দৈনিক। "পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ মহাত্মা গান্ধী আজ ৫৫ দিন কারাগারে।"

আমি 'ইয়াং ইন্ডিয়া' সাপ্তাহিকের নিয়মিত পাঠক ছিলুম। মহাত্মার পর তার সম্পাদক হন মৌলানা মহম্মদ আলীর জামাতা সোয়েব কুরেশী ও তাঁর পরে বা তাঁর আগে মহাত্মার পট্টু শিষ্য চক্রবর্তী রাজাগোপালচারী। সংক্ষেপে সি আর। কারাগার থেকে ফিরে মহাত্মা আবার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। কলেজে ছ'বছর পড়ার পর যখন বিলেতে যাই তখন সাপ্তাহিক 'ইয়াং ইন্ডিয়া' আর অর্ধসাপ্তাহিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা' নিয়মিত পাই। তাছাড়া আরো অনেক পত্রিকা।

বিলেতে আমার সকালের পাঠ্য ছিল 'টাইমস' আর বিকেলের পাঠ্য যেদিন যেটা আগে দেখি—'ইভনিং স্ট্যান্ডার্ড' বা 'ইভনিং নিউজ' বা 'স্টার'। রবিবার পড়তুম 'অবজারভার', 'জে এল গার্ভিন' যার প্রখ্যাত সম্পাদক। আর নাট্য সমালোচক সুপ্রসিদ্ধ সেন্ট জন আর্ভিন। অন্যান্য পত্রিকাও মাঝে মাঝে পড়তুম। বিশেষত 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' আর 'ডেলী এক্সপ্রেস'। বিদেশী সংবাদ সবচেয়ে বেশি দিত ডেলী টেলিগ্রাফ'। খুব ভালো কাগজ ছিল 'ডেলী নিউজ'। সেটা 'ডেলী ক্রনিকলের' সঙ্গে জুড়ে হয় 'নিউজ ক্রনিকল'। 'ওয়েস্টমিনস্টার গেজেট' বোধহয় আমার যাবার আগেই উঠে যায়। ওর বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। লিবারেল পার্টি তখন ডুবতে বসেছে। তাদের কাগজগুলোর অস্তিত্ব বিপন্ন। ভারতবিদ্বেষী 'মর্নিং পোস্ট' প্রায় উঠে যাবার দাখিল। রক্ষণশীলরাও এত রক্ষণশীল নয়। লেবার পার্টির মুখপত্র ছিল 'ডেলী হেরাল্ড'। ভালোই লাগত পড়তে। জর্জ ল্যান্সবেরী ছিলেন সম্পাদক। সরোজিনী নাইডুর সংবর্ধনা উপলক্ষে যে মধ্যাহ্নভোজন হয় তাতে তিনিও ছিলেন আর ছিলেন 'স্টেটসম্যানের' প্রাক্তন সম্পাদক ভগিনী নিবেদিতার বন্ধু এস কে র্যাটক্লিফ। এ'রা দুজনেই মহৎ ব্যক্তি। ভারতের মিত্র।

ইউরোপ থেকে ফিরে আসার পরেও কমলী আমাকে ছাড়েনি। বিলেত থেকে আসত 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান উইকলি' আর 'বার্লিনার টাগেব্লাট' নামক জার্মান দৈনিক পত্রিকার সাপ্তাহিক ইংরেজি সংস্করণ। লন্ডনের সাপ্তাহিক 'এভরিম্যান' পত্রিকাও পেতুম। আমেরিকা থেকে বেরোতে 'লিভিং এক' নামে এক অসাধারণ মাসিকপত্র। তাতে সব দেশের পত্রিকা থেকে বাছা বাছা ফিচার থাকত। লবণ সত্যাগ্রহ আরম্ভ করার আগে গান্ধীজী বড়লাটকে যে স্মরণীয় পত্র লেখেন তার বয়ান কলকাতার 'অ্যাডভান্স' থেকে তুলে দেয়। সম্পাদকের মতে ওটা একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। কাগজটা অকালে বন্ধ হয়ে যায়। আমেরিকায় বামপন্থী সাপ্তাহিক 'নিউ রিপাবলিক'ও নিতুম। পরে এসব ছেড়ে লন্ডনের 'নিউ স্টেটসম্যান' সাপ্তাহিক নিতে আরম্ভ করি। সাতচল্লিশ বছর হল আমি তার গ্রাহক। ইউরোপের সঙ্গে যোগসূত্র এখন ওটাই। আমেরিকার সঙ্গে 'ন্যাশানাল জিয়োগ্রাফিক ম্যাগাজিন'।

কলেজের সময়কার কথা পুরোপুরি বলা হয়নি। পাটনায় থাকতে এনতার কাগজ পড়েছি। দেশের নানা প্রদেশের দৈনিক ও সাপ্তাহিক। প্রধানত বিহারী ইয়াংমেনস ইন্সটিটিউটে, পরে সচ্চিদানন্দ সিংহ লাইব্রেরিতে। দু-তিনটি বাদে তখনকার বনেদী কাগজগুলির এখন অস্তিত্ব নেই। আমার যে সব কটা নাম মনে আছে তা নয়। এলাহাবাদের 'পাইয়োনীয়ার', লাহোরের 'সিভিল অ্যান্ড মিলিটারি গেজেট', কলকাতার 'ইংলিশম্যান', ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের এসব পত্রিকাও আমার নজর এড়ায়নি। সস্তার মধ্যে খুব ভালো

পত্রিকা ছিল 'ইন্ডিয়ান ডেলী নিউজ' মালিক ইউরোপীয়ান, কিন্তু সম্পাদক ভারতীয়। অতি উচ্চাঙ্গের পত্রিকা। আমার লেখা ছাপে।

গ্রাজুয়েট হওয়ার পর আমার কলকাতায় এসে সাংবাদিক হওয়ার কথা। সম্ভব হলে 'ফরওয়ার্ডে' অথবা 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য়। প্রফুল্লকুমার সরকার আমার পিতৃবন্ধু। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কৃতিত্বের পরিচয় দিই। সেই মূল্য দিয়ে আই সি এস প্রতিযোগিতায়ও কৃতী হই। সাংবাদিকতার জন্যে আমার যে প্রস্তুতি সেই প্রস্তুতি আমার এই প্রতিযোগিতায়ও কাজে লেগে যায়। এতে একটি প্রশ্নপত্র ছিল বর্তমান কাল সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান। তাছাড়া প্রবন্ধ লিখতে দেওয়া হত এমন সব বিষয়ে যার কোনো একটাতে খবরের কাগজ পড়া দরকারি। পরিশেষে নেওয়া হত মৌখিক পরীক্ষা। দেশবিদেশের তরতাজা হালচাল জানা থাকলে চটপট উত্তর দিতে পারা যেত। রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি সবই প্রাসঙ্গিক।

শিক্ষানবীশ হয়ে বিলেত যাই। সেখান থেকে ফিরে সরকারি চাকরিতে বহাল হই। কিন্তু বরাবরই জানতাম যে সরকারি চাকরি আমার জন্যে নয়। আমাকে স্বাধীনভাবে লিখতে হবে। আমার অন্যতম মূলমন্ত্র 'ইটারনাল ভিজিলানস ইজ দ্য প্রাইস অব্ লিবার্টি'। স্বাধীনতার মূল্য চির জাগৃতি। সাংবাদিকতাই আমার অভীষ্ট। আমার আদর্শ এইচ ডব্লিউ নেভিনসন, এইচ এন ব্রেলসফোর্ড, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সন্ত নিহাল সিং। খবরের কাগজে না লিখলেও আমি যোগসূত্র অব্যাহত রাখি। বিশেষ করে মহাত্মা গান্ধীর মুখপত্রের সঙ্গে। 'ইয়াং ইন্ডিয়া' বন্ধ হয়ে যায়, তার জায়গা নেয় 'হরিজন'। সে পত্রিকা যতদিন চলেছিল ততদিন আমি তার গ্রাহক ছিলুম। মহাত্মার পত্রিকাগুলিকে বলতে পারা যেত নিউজপেপার নয়, ভিউজপেপার। সেরকম ভিউজপেপার আরো কয়েকটিও ছিল। মৌলানা মহম্মদ আলীর 'কমরেড' দেখেছি। রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের। ভিন্ন ধর্মের পাঠকদের আকর্ষণ করবে কেন? নতুবা উচ্চমানের। আমার পছন্দসই ছিল 'ইন্ডিয়ান সোশ্যাল রিফর্মার'। সম্পাদক কে নটরাজন। মনে পড়ে না কবে উঠে যায়।

চাকরি থেকে অকালে অবসর নেওয়ার পর কিন্তু সাংবাদিকতায় মন যায় না। ইতিমধ্যে সাহিত্যে কিছুদূর অগ্রসর হয়েছি। আরো অগ্রসর হতে হলে অসপত্ন মনোযোগ চাই। সাংবাদিক হইনে, কিন্তু সংবাদপত্রকেও ছাড়তে পারিনে। সেও আমাকে ছাড়বে না। সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছি, চারখানা বাংলা ও চারখানা ইংরেজি দৈনিক আমার নিত্যপাঠ্য। এছাড়া সাপ্তাহিক তো আছেই। কেন এত পড়ি? কিসের জন্যে এ প্রস্তুতি? ওপারে গেলে চিত্রগুপ্ত প্রশ্ন করবেন, মর্ত্যের হালচাল কী? উত্তর দিতে পারলে স্বর্গ? নয়তো নরক? আসল কথা, আমি ওয়াকিবহাল হতে চাই। নইলে লোকে বলবে সেকেলে।

বাহান্ন

হারানো দিনের কথা

আমার যেখানে জন্ম, সেটা ছিল একটি দেশীয় রাজ্যের রাজধানী। ঢেঙ্কানাল। রাজধানীর নাম ঢেঙ্কানাল নিজগড়। অর্থাৎ নিজের গড়। তখনো গড়খাইয়ের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া

যেত। রাজপ্রাসাদ ছিল গড়খাইয়ে ঘেরা। বোধহয় পাঁচিলেও ঘেরা ছিল। ছেলেবেলায় পাঁচিলের ধ্বংসাবশেষ দেখিনি। কিন্তু গড়খাইয়ের একটা অংশে জল ছিল। স্থানীয় ভাষায় তার নাম ওটিয়াজরি। সংক্ষেপে জরি। সেখানে আমি রোজ চান করতে যেতুম। এর একটা অংশ আরো বড় পুকুর হয়ে গেছল। সেখানে পদ্মফুল যেমন ছিল, তেমনি ছিল সাপখোপ। কতরকম পানা, পদ্ম পাতা-টাতা, দাম। যার জন্যে জলে নেমে বেশি দূর যাওয়া যেত না। গোটা পুকুরটাই পদ্মপাতা আর ডাঁটা প্রায় গিলে নিয়েছিল। আর ছিল পাঁক। এত বেশি পাঁক, যে জলে নামাও শক্ত। পদ্ম ফুল তুলতে গেলে ডুবে যাওয়ার ভয় ছিল।

সেইখানে মাঝে মাঝে আমাকে নিয়ে যাওয়া হত সাঁতার শিখতে। একবার আমার এক কাকা আমাকে বেশ জোরে ধাক্কা দিয়ে জলের ভেতরে একটু দূরে ঠেলে দিলেন। তারপর বললেন, এইবার তুমি নিজে সাঁতার কেটে ফিরে এসো। প্রাণের দায়ে সাঁতার কাটতে কাটতে আমি কোন রকমে কূলে ফিরে এলাম। তখন থেকেই সহজ হয়ে যায় সাঁতার। তারপর একা একা সাঁতার কাটতে পারি। সাঁতার কাটাই বোধহয় সাঁতার শেখার একমাত্র উপায়।

এভাবে সাঁতার শেখার শুরু। তারপর পুরীতে স্কুল জীবনে সমুদ্রে সাঁতার দেয়ার সাহস পাই। পরে কলেজে পড়তে পড়তে পাটনার গঙ্গায় মাঝখান অব্দি গিয়ে ফিরে আসতে পেরেছি আগেকার অভিজ্ঞতার জন্যে।

আমার সবচাইতে প্রিয় ব্যায়াম ছিল সাঁতার। তবে একটু-আধটু সব খেলাতেই হাত লাগিয়েছি। স্কুল জীবনে ফুটবলও খেলেছি। ক্রিকেটও। টেবিল টেনিস আর ব্যাডমিন্টনও। হা-ডু-ডুও খেলতাম।

আর একরকম খেলা ছিল, সেটা বাংলাদেশে দেখিনি। আমগাছের ডাল থেকে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দেয়া হত কাঠের তক্তার দোলনা। তক্তার দু'পাশে দু'জন দাঁড়াত। একজন আর একজনকে ঠেলে নিয়ে যেত আকাশের দিকে। তার জবাব দিত আর একজন, অপর প্রান্তের ছেলেটিকে ঠেলে দিত আকাশপানে। কেউ একজনের পক্ষে, কেউ আরেকজনের হয়ে চিৎকার করত। সে এক তুমুল চেঁচামেচি। হৈ-চৈ। কখনো দোলনার মাঝখানে কেউ বসে থাকলে তার ভয়মাখা গলা শুনে সাবধান হতে হত খেলোয়াড়দের। কেউ না থাকলে যতবার খুশি, যতক্ষণ খুশি, দু'জনে রেষারেষি করে ঠেলাঠেলি করতে পারত। ওটাকে স্থানীয় ভাষায় বলা হত দোলি খেলা।

এ খেলার জন্যে প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ের মাঝামাঝি কয়েকটা দিন নির্দিষ্ট ছিল। প্রত্যেক বছর সেই ক'টা দিনের জন্যে আমি প্রতীক্ষা করতাম। যদিও পড়ে যাওয়ার ভয়ে বুক দুর দুর করত, তবুও উৎসাহে কমতি ছিল না। এক এক দড়ি ছিঁড়ে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটত। খুব শক্ত মজবুত দড়ি না হলে দোলায় চেপে হয়ত যমালয়েই যেতে হত। আর নয় ডাক্তারখানায়। পরে গাছগুলো কেটে ফেলা হয়। আমারও শখ মিটে যায়। বিদেশী খেলার চাইতে স্বদেশী খেলা কিছুমাত্র কম চিত্তাকর্ষক ছিল না। এই যেমন মহরমের লাঠিখেলা। প্রত্যেক বছর আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে মহরমের দল যেত। বাড়ির সামনে খেলা দেখাত। সেই লাঠিখেলায় যোগ দেয়ার বয়েস তখনো হয় নি। তবে ঠাকুমার মানত ছিল বড় হয়ে আমিও মহরমের লাঠি খেলব। এ ব্যাপারে হিন্দু-মুসলমান ভেদ ছিল না। মহরমের খেলায় বাঘ সাজত আমাদের পাড়ার এক নাপিতের ছেলে। নাম সিরিয়া। গায়ে রং-চং মেখে ডোরাকাটা বাঘ সেজে চোখে কালো চশমা পরে সে যখন বাজনার তালে তালে

বাঘের নাচ নাচত, তখন আমারও সাধ যেত, তার মতো বাঘ সেজে ব্যাঘ্র-নাচন নাচতে। সে সাধ আর মিটল না। কিন্তু ওই নাচের পা ফেলা, পা তোলার যে ছন্দ, তার সঙ্গে বাজনার বোলের মিশেল, তা আমার এখনো মনে আছে। মনে মনে এখনো সেই নাচ আমি নাচি। অনেক সময় আফসোস হয় যে, আমি নৃত্যশিল্পী হইনি। তার বদলে হয়ে উঠেছি সাহিত্যশিল্পী। সেটারও পদক্ষেপ স্কুল জীবনেই নেয়া হয়।

আমাদের বাড়িতে আমার উপর ভার ছিল কবিকঙ্কণের চণ্ডী পাঠ করার। তখন সেকালের রেওয়াজ অনুসারে আমি সুর করে কালকেতু আর শ্রীমন্ত সওদাগরের উপাখ্যান পাঠ করেছি। আত্মীয়-স্বজনেরা শুধু যে শুনতেন তাই নয়, তাঁরা প্রত্যেকটি পয়ার বা ত্রিপদীর পরে একটি ধুয়ো ধরতেন। প্রত্যেকটি চরণ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা বলে উঠতেন, 'কেমন দুর্গার নাম'। কিংবা, 'মায়ের মহিমা', বা সেরকম কিছু। যখন সওদাগরের নৌকো ডুবে যাচ্ছে, তখন ওঁরা যা বলে উঠতেন, তার মর্ম হত, তুমি না রাখলে মা কে রক্ষা করবে। আকাশে মেঘ, নৌকো দুলছে—এরকম বর্ণনা শোনার পর বলে উঠতেন—'হাইরে নাইরে নাইরে'। আমার ঠাকুর্দার মৃত্যুর পর আমার মা-বাবা বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নেন। তখন আমার চণ্ডীপাঠের পালা শেষ। তারপর শুরু হল কীর্তনপর্ব। খোল করতাল নিয়ে নগর-সংকীর্তনের দল যখন বেরত, তখন আমার ভাই বাজাত খোল, আর আমি করতুম বাহু তুলে নর্তন। কীর্তন আর নর্তনের দিনগুলিও শেষ হয়ে গেল, যখন আমাদের নাটের গুরু গোপালদাস বাবাজী আমার বাবার সহায়তায় একটি মঠের মোহন্ত হয়ে ধর্মকর্মের চেয়ে বিষয়কর্মে আরো মন দেন। মাঝে মাঝে আমাদের ডাকতেন জামগাছে উঠে জাম খেতে। আমি গাছের মগডালে অব্দি উঠে যত খুশি জাম পেড়ে খেতুম, আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাছের ওপর কাটিয়ে দিতুম।

পেয়ারা গাছে উঠে দিনভর পেয়ারা খাওয়াও ছিল আমার আর একটা শখ। আমি একটি/দুটিতে সন্তুষ্ট হওয়ার পাত্র ছিলুম না। আম গাছেও উঠেছি। তবে পাকা আম অত পাব কোথায়? টক কাঁচা আম পেড়ে নিয়ে বাড়িতে এসে একটু নুন মাখিয়ে খেতে বেশ লাগে। পরবর্তীকালে বৃক্ষারোহণ পর্বও শেষ হয়ে যায়।

তিপ্পান্ন

রহস্যে ভরা রাজার বাগানে

গরমের ছুটিতে দল বেঁধে হানা দিতাম গাছগাছালি ভরা রাজার বাগানে। মালির চোখে ধুলো দিয়ে চলত ফলপাকুড় চুরির মজার খেলা। সে খেলায় কখনো জিততাম আমরা, কখনো জিতত মালি। ধরা পড়েছি, তিরস্কারও জুটেছে প্রচুর।

ছোটবেলাটা কাটিয়েছি পাহাড়-জঙ্গলের কোলে ঢেঙ্কানলে। সবুজ গাছপালা, উঁচু পাহাড়-প্রকৃতির খামখেয়ালিপনায় ভরা ওড়িশার সেই গ্রামের মাটিতে হইহই করে কাটাতাম গরমের ছুটিটা। পড়তাম ঢেঙ্কানল হাই স্কুলে। মাস ছয়েকের জন্য পুরী জেলা স্কুলেও পড়েছি। গরমের ছুটির মস্ত আকর্ষণ ছিল রহস্যে ভরা ঢেন্‌কানল রাজার বাগান। বড়সড় ওই বাগানে ছিল বেশ কয়েকটা পুকুর আর সাঁতার কাটাটা ছিল সবচেয়ে প্রিয় খেলা। অনেকক্ষণ পড়ে

থাকতাম জলে, ঘণ্টাখানেক তো বটেই। এ নিয়ে অবশ্য বাড়ির লোকের মাথাব্যথা ছিল না। আর ওই সময়টা তো পড়ার চাপ থাকতই না। ফলে খেলাধুলো, সাঁতার, গাছে ওঠা, এইসব নিয়ে তপ্ত হাওয়ায় শুকনো গরমের দিনগুলো কাটত বেশ আনন্দে। আশেপাশের বাঙালি পরিবারগুলোর ছেলেরা মিলে দল পাকিয়ে ভরদুপুরে চুপিচুপি বাগানের আম, জাম, জামরুল, লিচু গাছে চড়াও হতাম। এমনও হয়েছে যে, সারাদিন জাম গাছে বসে জাম খেয়েছি কিংবা উঠেছি আম গাছে, সারাদিন নামিনি। হঠাৎ যমদূতের মতো মালি এসে হাজির। চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় তুলে সে কতদিন আমাদের শাপ-শাপান্ত করেছে।

১৯০৪ সালে জন্ম আমার। ম্যাট্রিক পর্যন্ত ঢেন্‌কানলেই কাটিয়েছি। বাংলা পড়তে হত বাড়িতে। স্কুলে ওড়িয়া পাঠ্য ছিল। তবে মাস্টারমশাইরা কিন্তু অধিকাংশই ছিলেন বাঙালি। স্কুলে যেতাম ধুতি আর শার্ট পরে। মহাযুদ্ধের সময় ঘটল বস্ত্র-সঙ্কট, শার্ট বাজার থেকে লোপাট। তখন মাস্টারমশাইরা বললেন খালি গায়ে শুধু ধুতি পরে আসতে, আর দরকার হলে ধুতির খুঁটটা গায়ে জড়িয়ে নিতে। আসলে তখন আমাদের অবস্থাও ভালো ছিল না। এখনো মনে পড়ে আমাদের মাটির বাড়িটায় আগুন লেগে গিয়েছিল। মাঝরাতে সে কী হইচই। ছোটবেলায় ছোট্ট মনে এইটুকুই মনে হয়েছিল যে, আমরা গৃহহারা হলাম। আশ্রয় নিয়েছিলাম অন্য জায়গায়। আমার বয়স তখন দশ।

ভয় ছিল বইকী। দিনের বেলায় নয়, রাতে। ভূতের ভয়। ভরদুপুরে রাজার বাগানের গাছে বসে ঠ্যাং দুলিয়েছি অনেক। কিন্তু রাত্রে অদ্ভুত একটা ব্যাপার হত। বাড়ি থেকে দেখতাম আলো-আঁধারিতে একটা বড় গাছের ডগা হঠাৎ বেড়ে-বেড়ে অনেক উঁচু হয়ে গিয়ে আবার একটু পরে আস্তে-আস্তে ছোট হয়ে আসত। এরকম হত বারবার—খুব ভয় পেতাম। জানি না কেন এরকম হত। তবে এটাই দেখতাম। সে সময় বিদ্যুৎ কোথায়? কেরোসিনের বাতি, লণ্ঠন জ্বলত। ঠাকুর্দা-ঠাকুমার সঙ্গে। রাত হলে জঙ্গল থেকে নানা আওয়াজ কাঁচা মনটাকে আতঙ্কের আবেশে অবশ করে দিত বইকী। চারদিক জঙ্গলে ঘেরা, তার পাশে মাথা উঁচু-করা কালো-কালো পাহাড়। বাঘের ভয় ছিল খুব। আমার জন্মের আগে আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে বাঘ যাতায়াত করত। রয়াল বেঙ্গল টাইগার, যাকে মহাবল বাঘ বলে। রাতে বন-পাহাড় কাঁপিয়ে ওরা ওদের অস্তিত্বের কথা জাহির করত। ভয়ে কুঁকড়ে যেতাম আমরা। জ্যান্ত বাঘ দেখিনি, তবে মৃত বাঘ দেখেছি। ডোরাকাটা বিভীষিকার বিশাল দেহ নিথর হয়ে গোরুর গাড়িতে শুয়ে, ভয়ানক দুর্গন্ধ তার গায়ে।

বেড়াতে যাওয়া? সে অবস্থা ছিল না আর তখন বেড়াবার এত রেওয়াজও ছিল না। তবে বনভোজন হত। গরমের ছুটিতে মাঝেমধ্যে মামার বাড়ি যেতাম কটকে। আর বাড়িতে থাকলে তো কীভাবে সময় কেটে যেত বোঝাই যেত না। আমরা প্রকৃতির কোলেই মানুষ মাঠ-ঘাট, ধুলোমাটি, গাছগাছালি এইসব নিয়ে আমাদের ছোটবেলার স্বপ্নভরা দিনগুলো রঙিন ছিল।

ওহো। গ্রীষ্মের ছুটির দুর্দান্ত আকর্ষণটার কথাই তো বলা হয়নি। 'চন্দনযাত্রা'। তোমরা বোধহয় চন্দনযাত্রার কথা শোননি।

রাজবাড়ির পুকুরে নৌকো সাজিয়ে ভাসানো হত রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি, জ্যৈষ্ঠে কৃষ্ণের নৌকো-বিহারের কথা মনে রেখেই এই অনুষ্ঠান। ছোটবেলা থেকেই আমার ধর্মের উপর খুব টান ছিল। বয়স তখন নয়-দশ। তখন থেকেই কীর্তন গাইতাম। সে দারুণ

আনন্দের ব্যাপার। একদল মানুষ সন্ধেবেলা রাজবাড়ির মণ্ডপে জড়ো হয়ে কীর্তন-গান গাইছে। সেই সঙ্গে চলত আমের ভুরিভোজ। অঢেল আম খাওয়া হত ওই মণ্ডপে কীর্তন করতে গিয়ে। খোল বাজাত আমার ভাই। আমাকেও শিখিয়েছিল, তবে খোলের হাত আমার নয়। হল না। তবে ওই ক'দিন পরিপাটি ভজন আর ভোজন দুটোই হত। পুকুরের ধারে বসে সংকীর্তন আর আম খাওয়া ভুলতে পারি না। নগর-সংকীর্তনে বেরিয়ে নেচে-নেচে গানও গেয়েছি, সে যে কী আনন্দ কীভাবে বোঝাব? আসলে প্রকৃতির আকর্ষণ আজও আমার কাছে দুর্নিবার। এই ইট-কাঠের জঙ্গলে মাঝে-মাঝে হাঁপিয়ে উঠি। সেই ঢেঙ্কানলের পাহাড়, জঙ্গল, রাজার বাগান, চন্দনযাত্রা সব বিবর্ণ হয়ে আসা মনের পটে ভাসে। এখন তো কাক আর পায়রা ছাড়া পাখি দেখি না, কত বুনো পাখি ঢেঙ্কানলের জঙ্গলে বিচিত্র তাদের ডাক, ইচ্ছে করে, ভীষণ ইচ্ছে করে, শান্ত সুন্দর প্রকৃতির কোলে ফিরে যেতে।

চুয়ান্ন

বাল্যকাল

আমার ছেলেবেলা কেটেছে ওড়িশার এক দেশীয় রাজ্য ঢেঙ্কানালে। রাজধানীর চারপাশে ছিল বন-জঙ্গল ও পাহাড়। আর ছিল ব্রাহ্মণী নদী, তবে বাড়ি থেকে বেশ দূরে। এই বন-জঙ্গল আর পাহাড়ের কোলেই আমি মানুষ। সারা ভারতবর্ষ কখনো পুরোপুরি ব্রিটিশের প্রত্যক্ষ শাসনে আসে নি। দেশীয় রাজাও ছিলেন বিভিন্ন রাজ্যে। আমাদের রাজ্যের রাজা ছিলেন তখন সুরপ্রতাপ। সুরপ্রতাপ ওড়িয়া হলেও বেশভূষায় আচার-ব্যবহারে ছিলেন বাঙালির মতো। বাবা রাজ্যসরকারের কাজ করতেন। তাছাড়া রাজবাড়ির নাটকের ভারও ছিল বাবার ওপর। তাই রাজবাড়িতে ছিল আমাদের মাঝে মাঝে যাতায়াত। যখনই কোন অনুষ্ঠান হত তিন চারদিন ধরে চলত আমাদের আনন্দের জোয়ার। স্কুলে আমি খুবই সাধারণ ছেলে ছিলাম। আর পাঁচজনের মতই বইপত্র, খেলাধুলা নিয়ে আমার ছেলেবেলা কেটেছে। ফার্স্ট হয়েছিলাম ফার্স্ট ক্লাসে ওঠার সময় আর টেস্ট পরীক্ষায়। তা নইলে চিরকাল সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ। অঙ্কের বইয়ের সঙ্গে কী শত্রুতা ছিল কে জানে? কোনদিনই আমাকে খুব একটা সুনজরে দেখত না। পড়তে ভালো লাগত ইতিহাস, ভূগোল, ইংরেজি। বাড়িতে বাংলা গল্প, উপন্যাস, রামায়ণ, মহাভারত, এই সব মিলে এক আলমারি বই ছিল। আমি ছিলাম বাড়ির বড় ছেলে, তাই একটু বড় হতেই বাবা সেই আলমারির ভার দিলেন আমার হাতে। আর আমিও যেন হাতে পেলাম এক সোনার খনি। রামায়ণ, মহাভারত থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস কিছুই বাদ গেল না। তখন তো আর এত বেছে পড়ার বয়স হয়নি, হাতের কাছে যা পেতাম তাই গোগ্রাসে গিলতাম। সেসময় বসাক অ্যান্ড সন্সের এক টাকার বিশ্ব-সাহিত্যের বাছা বাছা কাব্য-উপন্যাসের একটা বই বেরিয়েছিল।

সেই বই পড়েই আমি প্রথম পৃথিবীর নামী লেখকদের লেখার সঙ্গে পরিচিত হই। তারপর যখন আমার বছর বারো বয়স তখন একদিন আমাদের স্কুলের হেডমাস্টারমশাই রাজেন্দ্রলাল দত্ত আমাকে স্কুলের কমন রুমের চাবি দিলেন। স্কুলে তখন ভারতী, সবুজ পত্র, মানসী ও মর্মবাণী ইত্যাদি পত্রিকা রাখা হত। আমি সব পত্রিকাই পড়তাম। তবে সবচেয়ে

ভালো লাগত কিন্তু সবুজ পত্র। সবুজ পত্রে তখন রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে উপন্যাস, প্রমথ চৌধুরীর চারইয়ারি কথা বের হচ্ছে। তাছাড়া সবুজপত্র ভালো লাগার আর একটা কারণ ছিল। কথ্যভাষায় লেখা। ইংরিজিতে কিন্তু আমি ছেলেবেলা থেকেই বেশ আগ্রহী ছিলাম। আমাদের বাড়িতে তখন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দি বেঙ্গলী' (সাপ্তাহিক সংখ্যা) রাখা হত। বাবার ইচ্ছায় বুঝি আর না বুঝি একটু আধটু সেটা পড়তে হত। তাছাড়া পাঠ্য অপাঠ্য বইপত্র পড়তে পড়তে ইংরিজিতে বেশ অভ্যস্ত হয়ে উঠি। তারপরে যখন চোদ্দ পনেরো বছর বয়স তখন নিজেই দি টেলিগ্রাফ নামে এক সাপ্তাহিকের গ্রাহক হয়ে যাই। লেখালেখি শুরু করি বছর ষোল বয়স থেকে। প্রথম লেখা বের হয় প্রবাসীতে। আমার প্রাইজ পাওয়া টলস্টয়ের টোয়েন্টি থ্রী টেলস-এর একটা উপকথার অনুবাদ। তারপর উৎসাহ পেয়ে আবার একটা লেখা পাঠাই। সেটা ফেরত আসে। উৎসাহ কমে যায়। কলেজে গিয়ে আবার লেখা দিই। ছাপা হয়। প্রবাসীতে, ভারতীতে বাংলা, উৎকল সাহিত্য পত্রিকাতে ওড়িয়া। এ তো গেল পড়ালেখার কথা। এছাড়া মেতে থাকতাম ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন, টেনিস আর ফুটবল নিয়ে। আমাদের সময়ে ক্রিকেটের রবারের বল ছিল এমন শক্ত। তাই সেই বল যে কেবল আমরা খেলতাম কাপড়ের পাড় দিয়ে বল করে। টেনিসের পুরনো বল নিয়েও খেলতাম। এক বন্ধুর বাড়িতে টেনিস কোর্ট ছিল। সেই কোর্টেই টেনিস খেলতাম। বাড়ি, স্কুল আর বন্ধু। এই নিয়ে মেতে থাকতে থাকতেই সতের বছর কেটে গেল। ম্যাট্রিক পাশ করলাম। ঢেঙ্কানল থেকে কটকে গিয়ে কলেজে পড়াশুনা ও পাটনায় গিয়ে শেষ। তারপর বিলেত। স্কুল জীবনে মাস ছয়েক পুরী জেলা স্কুলেও পড়েছি। সেখানে প্রায়ই ঠাকুমাকে নিয়ে জগন্নাথ মন্দিরে যেতুম। সমুদ্রের সঙ্গে বেড়াতাম। পাহাড় থেকে সমুদ্র। আমার জীবনে এই দুটির প্রভাব অনেক।

পঞ্চান্ন

পুরনো দিনের কথা

আমার পুরো ছেলেবেলাটা কেটেছে ওড়িশাতে। মনে আছে যখন দশ বছর বয়স, আমার এক কাকা আমাকে মাসিক 'শিশু' পত্রিকার গ্রাহক করে দিলেন। সেই আমার বলতে পারো পত্রপত্রিকার সঙ্গে প্রথম পরিচয়। 'শিশু'র সম্পাদক ছিলেন বরদাকান্ত মজুমদার। 'সন্দেশ', 'মৌচাক' এসব আরো পরে। সন্দেশ তো নিশ্চয় জানো রায় পরিবারের কাগজ ছিল, প্রথম উপেন্দ্রকিশোর তারপরে সুকুমার ছিলেন এই পত্রিকার দায়িত্বে।

বড়দের কাগজ বলতে প্রথমেই মনে পড়ে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রবাসী' পত্রিকার কথা। প্রবাসী আর ভারতবর্ষই ছিল সে আমলের সবথেকে নাম করা মাসিক পত্র— চলছিলোও দীর্ঘকাল। 'প্রবাসী' তাঁর বিষয় বৈচিত্র্যে ছিল অনন্য। প্রতিটি সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের লেখা থাকত, তা সে গল্প, নাটক, প্রবন্ধ, কবিতা যাই হোক না কেন। রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' প্রথম ছাপা হয়েছিল প্রবাসীতেই। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক সম্পাদকীয় ছিল অসাধারণ। উপন্যাস ও প্রবন্ধ লিখতেন চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কবিতা বেশি থাকত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের। 'পঞ্চশস্য' বলে একটা বিভাগ ছিল, যাতে থাকত

দেশ বিদেশের খবর। ভালো লেখার নির্বাচিত অংশ ছাপা হত 'কষ্টিপাথর' বিভাগে। 'প্রবাসী'র পরেই আসে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার কথা। সাধারণ গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস সবই থাকত 'প্রবাসী'রই মতো। তবে 'ভারতবর্ষে'র বিশেষত্ব ছিল অন্যান্য ভাষার মাসিক সাহিত্যের অনুবাদে। 'বীণার ঝঙ্কার' বলে আলাদা একটি বিভাগই ছিল এই জন্যে। প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হল 'সবুজপত্র' স্বাদে, মেজাজে, বিষয় বৈচিত্র্যে একেবারে অনন্য। 'সবুজপত্রে' সাধারণ গল্প উপন্যাসের থেকে একটু সিরিয়াস লেখা বের হত বেশি। অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ধূর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুনীতি চট্টোপাধ্যায় এঁরা সব লিখতেন। 'সবুজপত্রে' বিজ্ঞাপন ছাপা হত না। সাধারণ পত্রিকার থেকে একটু অন্য রকম বলে 'সবুজপত্রে'র বেশি গ্রাহকও ছিল না।

আরো অনেক পত্রিকাই ছিল আমাদের সময়—কোনটা আগে, কোনটা পরে। 'কল্লোল' পত্রিকা ছিল বেশ ভালো। 'কল্লোল', 'কালি কলম', 'বিজলি', 'নারায়ণ', 'মানসী', 'মর্মবাণী'। (মানসী ও মর্মবাণী পরে এক হয়ে যায়)। ভারতী আর বিচিত্রা এই সব কাগজই তো ছিল। আমার প্রথম লেখা প্রকাশিত 'প্রবাসী'তে টলস্টয়-এর অনুবাদ। তোমরা যাকে আজকাল লিটল ম্যাগাজিন বল, সে ধরনের দুটো কাগজ ছিল—প্রীতি আর আলোচনা। আজকে তো বেশি দেখি সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক পত্রিকা তার মধ্যে আবার কত বিশেষ সংখ্যা। যতদূর মনে পড়ে ৩০ সালে আনন্দবাজারই বোধহয় প্রথম পূজা সংখ্যা বের করল।

পত্র পত্রিকার বাইরে সাধারণ বইয়ের বাজার এখনকার মতো নিশ্চয় ছিল না, কিন্তু ছিল। গল্প উপন্যাস তো বিক্রি হত। সাধারণত তৎকালীন সামাজিক বিষয় নিয়েই সাহিত্যিকেরা লিখতেন। যেমন বিধবা বিবাহ, জাতিভেদ এইসব। সাধারণ প্রেমের রোম্যান্টিক গল্পও জনপ্রিয় ছিল খুব এবং এই ধরণের গল্পের বিখ্যাত লেখক ছিলেন মণীন্দ্রলাল বসু।

শুধু কি লেখা আর পত্র-পত্রিকা? সে আমলে এক একটা পত্র-পত্রিকাকে ঘিরে এক-একটি সাহিত্য গোষ্ঠী গড়ে উঠত—যেমন 'ভারতী'গোষ্ঠী, 'সবুজপত্র'গোষ্ঠী,'ভারতবর্ষে'র আড্ডা, শনিবারের চিঠির মজলিস। আজকাল তো আর সেরকম সাহিত্যিকদের আড্ডাও দেখি না। এক রয়েছে 'আনন্দবাজার' গোষ্ঠী। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি ও গোষ্ঠী তো চাকরি সূত্রে। শুধু কি সাহিত্য আড্ডা মারবার জন্যে ওখানে এক হয়েছে সবাই? আর এক 'দেশ' ছাড়া সত্যিকার সাহিত্য নির্ভর পত্রিকাও কমে এসেছে—সব কাগজেই কিছুটা সাহিত্য আর তার সঙ্গে মিশেছে রাজনীতি, খেলা, সিনেমা থিয়েটার। প্রবন্ধগুলোর লেখক এখন প্রধানতঃ সাংবাদিকেরাই, সাহিত্য নিয়ে লেখবার জায়গাও তো এত কমে এসেছে। তুমি যদি খেলা নিয়ে লেখ, লেখ সিনেমা নিয়ে, লেখবার অনেক জায়গা পাবে। কিন্তু শুধু সাহিত্য নিয়ে লেখবার মতো কাগজ কই।

আমার মনে হয় সাহিত্যে যে রাজনীতি ঢুকতে আরম্ভ করেছে এটাই আজকে কতকাংশে সাহিত্যের এই অবস্থার জন্যে দায়ী। রাজনীতি ঢুকে সাহিত্যকে নষ্ট করে দিল। ভেঙে দিল সেই শিল্প বোধটাকে। সম্ভবত এই কারণেই আজকে কাগজ বা পত্র পত্রিকা অনেক বাড়লেও সত্যিকার সাহিত্যের আড্ডা বা সাহিত্য গোষ্ঠী একেবারে নেই বললেই চলে।

ইস্কুলের গল্প

বাবা ছিলেন ওড়িশার ঢেঙ্কানাল স্টেটের রাজকর্মচারী। আমার ছেলেবেলাটা বলতে গেলে ওখানেই কাটে। চমৎকার পাহাড়ি জায়গা। পড়তাম ঢেঙ্কানাল হাই ইস্কুলে। তখন ওই ইস্কুলের সারা ওড়িশা জুড়ে খুব নামডাক। ছেলেবেলায় পাঠ্যবইয়ের চেয়ে বাইরের বই পড়ায় আমার আগ্রহ ছিল অনেক বেশি। বিশেষ করে দেশবিদেশের ইতিহাস আর ভূগোলের বই পেলে তো কথাই নেই, গোগ্রাসে গিলতুম।

তা বলে খেলাধুলোতেও আমি পেছিয়ে ছিলুম না। ইসকুলের মাঠে এবং বাইরে ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস সবরকমের খেলাতেই আমি কমবেশি হাত পাকিয়ে ছিলুম। টেনিস খেলতে খুব ভালোবাসতুম। সবচেয়ে তুখোড় ছিলুম সাঁতারে। তাছাড়া সুযোগ পেলেই এ বাগানে সে বাগানে দলবল নিয়ে ঢুঁ মারতাম। গাছে চড়ে মহানন্দে ফলপাকুড় সাবাড় করতুম।

দস্যিপনার জন্যে ইস্কুলে যে সাজা পাইনি এমন নয়। একবার ক্লাশে গণ্ডগোল করায় মাস্টারমশাই বেজায় খাপ্পা হয়ে গিয়ে আমাকে বললেন, স্ট্যান্ডআপ অন দি বেঞ্চ। লজ্জায় অপমানে চোখমুখ লাল হয়ে উঠল। তারপর যেই না উঠে দাঁড়িয়েছি অমনি ঘটল এক অঘটন। হুড়মুড় করে বেঞ্চ পড়ল ভেঙে। জোড়াতাড়া দিয়ে ঠিক করা হল। ফের আমাকে উঠে দাঁড়াতে হয়। তখন দেখা গেল আরেক সমস্যা। যারা আমার পাশে বসেছিল তারা ভয়ে ভয়ে আর কিছুতেই ওই নড়বড়ে বেঞ্চে বসতে চাইছে না। তখন মাস্টারমশাই আর কী করেন। গম্ভীর গলায় আমাকে বললেন, যথেষ্ট হয়েছে, নামো।

আর একবার অল্পের জন্যে আমি দারুণ এক শাস্তির হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলুম। কী একটা কারণে যেন সেবার মাস্টারমশাই আমার ওপর ভীষণ রেগে গেছেন। কিন্তু হাতের কাছে এমন কিছু ছিল না যা দিয়ে শাস্তি দেন। তখন বললেন, 'যাও, শিগগির জঙ্গল থেকে বেত কেটে নিয়ে এসো'—বুঝতেই পারছ তখন আমার মনের কী অবস্থা। যে বেত আমার পিঠে পড়বে সেটা আমাকেই কেটে আনতে হবে। মাথা নিচু করে ক্লাশ থেকে বেরিয়ে পড়লুম। ইস্কুলের কাছেই ছিল বেত বন। সেখানে ঢুকে দেখেশুনে খুব নরম একখণ্ড বেত নিয়ে ফিরে এলুম। মাস্টারমশাই সেটা একটানে আমার হাত থেকে কেড়ে নিলেন। ভয়ে আমার সারা শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। এরপর সবে তিনি আমাকে মারবার জন্য বেতটা শূন্যে তুলেছেন এমন সময় ঢং ঢং করে ঘণ্টা বেজে উঠল। কী জানি কী ভেবে মাস্টারমশাই বেতখানা আস্তে করে টেবিলে রাখলেন। তারপর থমথমে গলায় বললেন, 'যাও, এবারের মতো মাপ করে দিলুম। আর কখনো ক্লাসে দুষ্টুমি করো না কিন্তু।'

উঁচুর দিকে ক্লাসে উঠতে ইস্কুল লাইব্রেরির পত্রপত্রিকা দেখাশুনোর ভার আমার ওপরে এসে পড়েছিল। ভারতী, প্রবাসী, গৃহস্থ, ভারতবর্ষ, সবুজপত্র, বাংলা-ইংরেজি-ওড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত তখনকার দিনের নামকরা সব পত্রপত্রিকা ইস্কুলে আসত। সব আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তুম মনে পড়ে, কতদিন ওইসব পত্রিকা পড়তে পড়তে ক্লাস কামাই করেছি। আর এসব পড়েই আমার ভেতরে লেখালেখি করার ইচ্ছেটা জেগে ওঠে। আমার প্রথম লেখা ইংরেজিতে ছাপা হয়েছিল, কলকাতা থেকে প্রকাশিত পাদ্রীদের কাগজ 'এপিফেনি'তে। সে এক মজার কাণ্ড। ওই কাগজে লেখকরা বাইবেল থেকে নানারকম প্রশ্ন করতেন। পরের

সংখ্যায় তার জবাব দেওয়া হত। আমার লেখা নিয়ে সম্পাদকীয় স্তম্ভে কঠোর মন্তব্য বেরোয়। ওঁরা জানতেন না—নাটের গুরুটি নেহাতই এক ইস্কুলে পড়া ছেলে। প্রবাসীতে আমার 'তিনটি প্রশ্ন' লেখাটি ছাপা হলে সবচেয়ে আনন্দ পেয়েছিলুম। ওটা ছিল টলস্টয়ের একটা গল্পের অনুবাদ। ওড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত আমার প্রথম লেখাটিও মজাদার। বেরিয়েছিল উৎকল দীপিকায়। কোনো এক সার্কাস পার্টির বিরুদ্ধে লেখা একখানা চিঠি।

পড়াশুনোয় ভালো হওয়াটাও যে বিপদের কারণ হয়ে উঠতে পারে সেরকম অভিজ্ঞতাও একবার আমার হয়েছিল। সেবার অ্যানুয়াল পরীক্ষায় দারুণ ভালো ফল করেছিলুম। নতুন ক্লাসে ওঠবার মাসখানেক বাদে আমাকে ডবল প্রমোশন দেওয়া হল। ফলে এবার আমাকে দু'ক্লাস উঁচুতে গিয়ে বসতে হল। পরীক্ষায় ফল অনুযায়ী ছাত্রদের প্রথম থেকে পর পর বেঞ্চে বসা ছিল রেওয়াজ। সকলের শেষে গেছি। তাই আমার জায়গা হল লাস্ট বেঞ্চে শেষের সীটে। একদিন এক মাস্টারমশাই ক্লাসে এসে হঠাৎ এক প্রশ্ন করে বসলেন। ফার্স্ট বয় থেকে শুরু করে কেউ সঠিক উত্তর দিতে পারল না। সবার শেষে এল আমার পালা। উত্তরটা ঠিক হল। মাস্টারমশাই তো আমার ওপর খুব খুশি। কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, 'এখন থেকে তুমি ফার্স্ট বেঞ্চের প্রথম সীটে বসবে। আর এক এক করে সবক'টা ছেলের কান মলে দাও তো।'—ক্লাসের সবাই আমার চেয়ে বয়সে বড়। সেদিনের মতো তো সকলের কান মলে হাতের সুখ করে নিলাম। কিন্তু পড়ে গেলাম মহা দুশ্চিন্তায়। এবার যদি কখনো আমি কোন প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দিতে না পারি। তাহলে তো সবার আগে আমারই দু'কান কাটা যাবে। ভয়ে ভয়ে রইলুম। শেষে একদিন সামান্য ভুল করায় মাঝখানের এক বেঞ্চে চলে গিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম।

সাতান্ন

দোলের দুদিন বড়দের আমরা ভয় করতুম না

আমি জন্মেছিলুম একটি দেশীয় রাজ্যে। ওড়িশার ঢেঙ্কানল-এ। আমার বাল্য-কৈশোর কেটেছে সেখানেই। সেখানে দোল উৎসব হত দুদিন ধরে। দোল পূর্ণিমার ভোর হবার আগেই ঘুম ভেঙে যেত। কখনো বা সদ্য জেগেই চোখ কচলাতে-কচলাতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তুম। দেখতুম—রাজপথ দিয়ে শোভাযাত্রা চলেছে। তাতে আছে অঘাসুর, বকাসুর, পুতনা প্রভৃতি রাক্ষস-রাক্ষসী। তারা সবাই চলেছে রাজবাড়ির দোল মণ্ডপের দিকে। উদ্দেশ্য কৃষ্ণকে মেরে ফেলা। মিছিলে বক চলেছে। বকের মস্ত লম্বা ঠোঁট। বকাসুরও চলেছে পাশে। বিকট রাক্ষসের চেহারা। সেসময় আমরা বুঝতেই পারতুম না যে আসল বক নয়, আসল অসুর রাক্ষস-রাক্ষসীও নয়। মিছিলে সেইসব দেখে খুব ভয় পেতুম। একটু বড় হয়ে অবশ্য নিচে মানুষের পা আর ওপরে অসুরের বা বকের আকৃতি দেখেই বুঝতে পারতুম আসল রহস্য। আমি তো কখনো সকালে রাজবাড়িতে যাইনি তাই রাধা-কৃষ্ণকে মারতেও দেখিনি।

কিছুক্ষণ পরে রাজামশাইও যেতেন দোল মণ্ডপে। তাঁর নাম ছিল সুরপ্রতাপ মহেন্দ্র

বাহাদুর। তিনি যেতেন ঘোড়ায় টানা সুন্দর সাজানো গাড়িতে। সঙ্গে থাকত হাতি, ঘোড়া, মন্ত্রী-সেপাই, রাজ অনুগত বর্গ আর বিভিন্ন বাহারী পোশাকের নানারকম বাজনাদারের সারি। আগে থেকে রাক্ষস-রাক্ষসীর কাগজের মুখোশ-টুখোশ, কাপড়ের পোশাক-টোশাক রাজবাড়ি থেকেই তৈরি করানো হত। রাজবাড়ি থেকেই দিত। দেশীয় রাজ্যের রাজাই তো সব। সেকালের সাধারণ প্রজারা আর এসব যোগাড় করবেন কী করে।

রাজবাড়ির দোল মণ্ডপে আমরা যেতুম সন্ধেবেলা। দেখতুম আসনের ওপর বসে রয়েছে স্বয়ং কৃষ্ণমূর্তি। নাচ-গানের আসর বসেছে। সবাই খুব হই-চই উল্লাসে মত্ত। সেসময় রাজবাড়ি থেকে আমাদের আবির আর অভ্র গুঁড়োয় রাঙিয়ে দিত।

পরের দিন আসল দোল। তাকে বলা হত ঢুলন্ডি। ওইদিন জাতি ধর্ম ছোট বড় ইত্যাদির কোনো ভেদাভেদ লক্ষ্য করার অবকাশ হত না কারোরই। বাড়িতে বালতি গামলা বাটি এইসব ভর্তি করে রঙ গোলা থাকত। সেইসব লাল নীল হলুদ সবুজ বেগুনি রঙ পিচকারিতে ভরে বেরিয়ে পড়তুম। পিচকারিগুলো সাধারণত বাঁশের অথবা টিনেরই বেশি হত। পিতলেরও ছিল কারো কারো। সবরকম রঙই বাজারে কিনতে পাওয়া যেত। আবার কেউ কেউ বাড়িতেও বানাত। তবে এখনকার মতো আলকাতরা ইত্যাদির পাট তখন ছিল না। তবে কালো রঙের একটা কিছু ছিল। সেটা কী তা অবশ্য কখনো বুঝতে পারিনি। একটা রঙ ছিল তার নাম 'খুনখারাপি'। সেই রঙ নিয়ে বেরতুম রঙ খেলার জন্য। যাকে দেখতুম তার গায়েই রঙ দিতুম। কোনো বাধা-নিষেধ মানতুম না। পিচকারি দেখে 'দিও না, দিও না' বললেও কে শোনে কার কথা। রঙ দিয়ে ভূত সাজিয়ে দিতুমই।

দোলের দুদিন বড়দের আমরা ভয় করতুম না। বড়রাই আমাদের ভয় করতেন। আমরাই পিছন থেকে রঙ-চঙ দিয়ে পালিয়ে যেতুম। আমি অবশ্য পাড়ার বাইরে যেতুম না। কেন না পাড়ার বাইরেই বাজার। সেখানকার লোকেরা মোটেই শিষ্ট নয়। তাই সেই বয়েসে কোনো দিনই ওদিকে পা বাড়াই নি। দোলের আনন্দ তাই পাড়ার ছেলেদের মধ্যেই ভাগ করে নিতুম। বাইরে যেতুম না।

দোল খেলে বাড়ি ফেরার সময় শরীরের কোনো অংশই রঙহীন থাকত না। ভূতের মতন চেহারায় বাড়ি ফিরতুম দুপুর গড়িয়ে ১টা দুটো। তারপর স্নান করে আবার মানুষের রূপ ফিরে পেতুম। যদিও সেদিন আর বাড়িতে নয় পুকুরেই স্নান করতে যেতুম। জামা কাপড়ের রঙ ধোপার বাড়ি দিয়েও উঠত না। বাড়িতে মা অবশ্য দোল খেলার জন্য পুরনো পোশাক আগের দিনই আলাদা করে দিতেন যা নষ্ট হলেও গায়ে লাগত না।

আটান্ন

ছোটদের জন্যে লেখা

অন্নদাশঙ্কর রায়ের সঙ্গে কিশোর সাহিত্য বিষয়ে ধীমান দাশগুপ্তের সাক্ষাৎকার

অন্নদাশঙ্কর ।। ছোটদের জন্যে লেখা আর বড়োদের জন্যে লেখা একই কলমেই লেখা। যে লেখে সে একই মানুষ। তার মানসে বা হৃদয়ে দুটো পরিচ্ছন্ন ভাগ নেই। তবু সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে একই লেখকের দুই চরিত্রের ভূমিকা দেখতে পাওয়া যায়। যেমন আমার

নিজের কথায় বলতে পারি আমার মধ্যে একজন ছেলেমানুষও ছিল। যে চাইত ছেলেমানুষের সঙ্গে ছেলেমানুষি করতে।

ধীমান ॥ হ্যাঁ। আপনি অন্যত্র বলেছেন কলেজে পড়াশুনো করে বড়ো বড়ো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরকারি চাকরি করতে করতে আপনার মনে পাক ধরেছিল। আপনার উপন্যাস প্রবন্ধ বা গল্প পড়তে গেলেই সেটা টের পাওয়া যেত। কিন্তু সেই আপনি যখন সব রকম কৃত্রিমতা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ছোটদের লেখা লিখতে বসে পড়েন তখন আপনি অন্য ধাতের মানুষ। আপনার অন্য এক স্বরূপ।

অন্নদাশঙ্কর ॥ তাই। একই সময়ে লেখা হয়েছিল 'বিচিত্রা'র জন্যে 'পথে প্রবাসে' আর 'মৌচাক'-এর জন্যে 'ইউরোপের চিঠি' কিস্তিতে কিস্তিতে। তবে আমি যে ভিতরে ভিতরে একটি শিশু আমাকে দেখে অনেকেই তা বিশ্বাস করতে চায় না। কিছুদিন পরে আমি নিজেই বিশ্বাস করিনে। তখন ছেলেমানুষির জন্যে অবসর পাইনে, সরকারি কাজে জড়িয়ে পড়ি, যদি-বা একটু সময় মেলে সেটুকু আমার বড়োদের উপন্যাসের জন্যে বাঁধা। আমি প্রাণপণে চেষ্টা করি প্রবীণদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাঁদের সমকক্ষ হতে। সেটাই যেন মোক্ষ।

ধীমান ॥ কিন্তু রবীন্দ্রনাথও ছিলেন এক মহাশিশু। মহাশিশু ও মহাশিল্পী। ছোটদের লেখার জন্যে তেমনি শিশু হতে হয়।

অন্নদাশঙ্কর ॥ কী ভাগ্যি সেই মহাশিশুর সঙ্গে রেলপথে নিভৃত ভ্রমণ। তিনি বলেন, 'আমি আজকাল ছড়া লিখছি। তুমিও লেখ না কেন'? আমি সবিনয়ে নিবেদন করি, 'ছড়া আমার হাত দিয়ে হবে না।' তিনি কলকাতা ফিরে গিয়ে কী মনে করে আমাকে তাঁর 'সে' বইখানি পাঠিয়ে দেন। তাতে তাঁর নিজের অনেকগুলি ছড়া ছিল। তিনি কি চেয়েছিলেন যে আমিও সেরকম কিছু লিখি? তেমন ক্ষমতা বা অভিলাষ আমার ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বুদ্ধদেব বসুর অনুরোধে কবিতা লিখতে গিয়ে হঠাৎ আমার ছড়ার হাত খুলে যায়। কিন্তু সেসব ছড়া ছোটদের জন্যে লেখা নয়। বড়োদের জন্যে লেখা। ছোটদের জন্যে লেখার খেয়াল যখন জাগে তখন যোগীন্দ্রনাথ সরকারের সংকলিত "খুকুমণির ছড়া" আমার আদর্শ হয়। রবীন্দ্রনাথের ছড়া নয়। তাঁর ছড়া আমার কানে ঠিক ছড়ার মতো লাগেনি। ছড়ার লাইন ওভাবে শেষ হয় না। ও ধাঁচটাই ছড়ার নয়। তবে তার ভাব ভাষা ছন্দ বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। আর সুর। যেসব কারণে আমি তাঁর ছড়ার ভক্ত।

ধীমান ॥ সুকুমার রায়ের ছড়াও আপনার আদর্শ হয়নি। যদিও তাঁর ছড়ারও আপনি ভক্ত। আপনার ভাষায় দেশের শিশুমানসে সুকুমারের আদর চিরদিনের। কেউ তাঁকে ভোলেনি ও ভুলবে না।

অন্নদাশঙ্কর ॥ তাঁর সব মজার মজার ছড়া। কারই বা মাথায় আসে এসব কৌতুক কল্পনা। মুখে আসে এসব ছন্দ ও মিল। তবে ঠাকুমা দিদিমা মাসিপিসিমা বা চাষাভূষার মুখে-মুখে-কাটা, কানে-শুনে-মনে-রাখা অশিক্ষিত মৌখিক ছড়া এক জিনিস আর চালাকচতুর সেয়ানা লেখকের কাগজ-কলম নিয়ে মাথা খাটিয়ে বানানো পাকা হাতের ছড়া আর-এক জিনিস। আমি মৌখিক ঐতিহ্যকেই অনুসরণ করতে চাই। তাই অচেনা অজানা ছড়াকারদেরই গুরুবরণ করি। ছল চাতুরি সযত্নে পরিহার করি। আমি মনে করি ছড়া যদি কৃত্রিম হয় তবে তা ছড়াই নয়, তা হালকা চালের পদ্য। গল্প উপন্যাস বানিয়ে বানিয়ে লেখা যায়, ছড়া বানাতে গেলে তা ছড়ার মতো শোনায় না। পদ্যের মতো শোনায়। তাতে বাহাদুরি

থাকতে পারে, কারিগরি থাকতে পারে কিন্তু তা আবহমানকাল প্রচলিত খাঁটি দেশজ ছড়ার সঙ্গে মিশ খায় না। মিশ খাওয়ানোটাই আমার লক্ষ্য। যদি লক্ষ্যভেদ করতে পারি তবেই আমার ছড়া মিশ খাবে নয়তো নয়। আমি যে একটি শিশু তা যখন নিজেই বিশ্বাস করি না বা ভুলে যাই, তখনই আমার ছড়ার কৃত্রিম হয়ে পড়ে। ছড়া ক্ষেত্রে আমি তবু আমার কর্তব্যটুকুর দায়িত্ব নিয়েছি। জনগণের হৃদয়ে যদি সামান্যতম স্থান পাই, আমার একটা ছড়াও যদি তাদের মনে গাঁথা থাকে, কানে কানে সঞ্চারিত হয়, মুখে মুখে পুরুষানুক্রমিক হয়, তা হলেই আমি ধন্য।

ধীমান ।। আপনার বহু ছড়াই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে হস্তান্তরিত হয়েছে এবং আপনার ছোটদের জন্য লেখা ছড়াও বহু বয়স্ক ব্যক্তি নিয়মিত পড়েন ও পড়ে মনে রাখেন আর রাখবেন।

অন্নদাশঙ্কর ।। আমি জানি বহু বয়স্ক ব্যক্তি আমার ছড়া পড়েন ও কেউ কেউ মুখস্থ বলতে পারেন। কই, আমিতো তাঁদের কথা ভেবে লিখিনি। আবার এটাও এক আশ্চর্যের ব্যাপার যে আমার সঙ্গে সম্প্রতি সাক্ষাৎ করতে এসে আমাকে বলে গেছেন আলাদাভাবে কলকাতার এক মহিলা ও আলিগড়ের এক অধ্যাপক যে, স্কুলের পড়া শেষ না করতেই তাঁরা পড়েছিলেন আমার ছয় খণ্ডের মননপ্রধান উপন্যাস 'সত্যাসত্য'। সে বয়সে সবটা বুঝতে পারেননি, পরে আবার পড়ে বুঝেছেন। না, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। আমি নিজেই তো বারো বছর বয়সে 'সবুজপত্র'-এ প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের 'চার ইয়ারী কথা' আবিষ্কার করে বুঁদ হয়ে পড়েছি।

ধীমান ।। হ্যাঁ, আপনার কিশোর উপন্যাস 'পাহাড়ি'তে আপনার দশ, বারো, চোদ্দ বছর বয়সের সেই সব অভিজ্ঞতার কথা ধরা পড়েছে। প্রকৃত সাহিত্যের জগৎ সমৃদ্ধ মাসিক পত্রের জগৎ চঞ্চলের সামনে একটু একটু করে কীভাবে উন্মুক্ত হল। যে সময়টাতে বাংলা সাহিত্য-জগতে বিশ্বভাবের বন্যা এসেছে রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির পিঠ-পিঠ।

অন্নদাশঙ্কর ।। 'পাহাড়ি' সত্যিকার কাহিনী-ই। ছোটদের জন্যে লেখা আমার ছোটবেলার কাহিনী। কাহিনীর প্রতাপগড় জীবনের ঢেঙ্কানলগড়। এখনকার ঢেঙ্কানাল তখন ছিল ওড়িশার এক দেশীয় রাজ্য। ওখানেই আমার জন্ম, ছেলেবেলা, লেখাপড়া।

ধীমান ।। তখন তো আপনি ওড়িয়াতে লিখছেনও। পরে ওড়িয়াতে নব্যপন্থী 'সবুজ দল'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতাও হবেন আপনি।

অন্নদাশঙ্কর ।। সেটা কলেজে পড়ার সময়। তার আগেই আমি যখন স্কুলের ছাত্র আমার অনুবাদ-গল্প প্রকাশিত হয় 'প্রবাসী'তে। গল্পের নাম 'তিনটি প্রশ্ন'। টলস্টয়ের 'টোয়েন্টি থ্রী টেলস' বই থেকে অনুবাদ।

ধীমান ।। হ্যাঁ। এই সময়েই আপনি উপলব্ধি করেন আর্ট হচ্ছে ম্যাজিক। সাহিত্য হচ্ছে ম্যাজিক লণ্ঠন। স্লাইড তার অসংখ্য, বিচিত্র, সবাক, বহুবাক, সজীব, অমর। আবিষ্কার করেন যে আপনিও স্লাইড বানাতে পারেন। এমন কি কোনো কোনো স্লাইড আপনার হাতেই বনে ভালো। তখন আপনি ম্যাজিসিয়ান না হয়ে সাহিত্যের কারিগর হলেন।

অন্নদাশঙ্কর ।। এই বিষয়ে ছোটদের জন্যে আমার একটা গল্পও আছে 'ম্যাজিক লণ্ঠন'।

ধীমান ।। ছোটদের জন্য বিশেষ কোন লেখার পরিকল্পনা আছে?

অন্নদাশঙ্কর ।। আমার পণ—ইংরেজিতে কত সুন্দর সুন্দর ব্যালাড আছে, বাংলায় নেই, আমি চেষ্টা করছি ব্যালাড লিখতে, যদি ছেলেমানুষ হতে ভুলে না যাই তবে ব্যালাড আমি লিখবই।

উনষাট
অন্নদাশঙ্কর রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

আপনার শৈশব ও ছাত্রজীবনের প্রায় পুরোটাই কেটেছে ওড়িশা এবং বিহারে। শুনেছি আপনার প্রথম জীবনের বেশ কিছু লেখা ওড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। এ অবস্থায় তরুণ বয়সে বলতে গেলে ছাত্র জীবনেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হল কি করে?

অন্নদাশঙ্কর ।। বাংলা আমার মাতৃভাষা যোগাযোগ আজন্মের। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ইত্যাদি সব রকম বই ছিল। আগ্রহ ছিল। স্বভাবতই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে আমার নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

মাত্র ২২/২৩ বছর বসে প্রবাসে (ইউরোপে) বসে লেখা "পথে-প্রবাসে"র মতো এত ঝক্‌ঝকে লেখার শিক্ষানবিশী হল কোথা থেকে?

অন্নদাশঙ্কর ।। ১২ বছর বয়স থেকে প্রবাসী ইত্যাদি মাসিক পত্রিকা পড়তাম। সবুজপত্রের ভাষার প্রভাব ছিল। কথ্য ভাষায় লিখতাম। সেই ভাষায় লেখা হয় পথে প্রবাসে।

ওড়িয়া ভাষা দিয়েই যখন সাহিত্যকর্ম শুরু করলেন, তখন সে ভাষায় পরবর্তীকালে আর কোন চর্চাই কি করেন নি?

অন্নদাশঙ্কর ।। বাংলা, ইংরাজি, ওড়িয়া এই তিনটি ভাষাতেই লিখতাম। কিন্তু তিনটি ভাষায় এক সঙ্গে লিখলে লেখা মাঝারি মানের হবে। তিনটে ভাষায় সমান দক্ষতা কারো নেই, তাই বাংলা ভাষাকেই আমি গুরুত্ব দিয়েছি। রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর আমি শিষ্য। তাঁদের পরম্পরায় আমার স্থান।

আপনি ইংরেজ আমলে আই.সি.এস. হিসাবে আমলাতন্ত্রের শক্ত কাঠামোর মধ্যে জেলাশাসক ইত্যাদি দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছেন। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যখন আসমুদ্র হিমাচলে কোটি কোটি মানুষের অহিংস আন্দোলন চলছে, তখন দেশপ্রেমিক ও সচেতন সংবেদনশীল মানুষ হিসাবে সরকারি কাজের সঙ্গে বিবেকের কোন বিরোধ অনুভব করেন নি? করলে কিছু ঘটনার কথা জানালে ভালো হয়।

অন্নদাশঙ্কর ।। হ্যাঁ। রাজশাহীর নওগাঁ মহকুমাতে ১৯৩২ সালের আন্দোলনে যাঁরা যোগ দেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন বন্ধু স্থানীয়। এঁরা ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রতিষ্ঠিত কর্মী। ২৬শে জানুয়ারি ওঁরা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। আমাকে বলা হয়েছিল এঁরা তো আশ্রমের কর্মী সমাজসেবা ওঁদের কাজ, ওঁরা রাজনৈতিক আন্দোলন করছেন কেন? ওঁদের পতাকা নামাতে বলুন, না হলে আশ্রমের ক্ষতি হবে। আমি ওঁদের পতাকা নামাতে বললাম। ওরা বলল, আমরা পতাকা উত্তোলন করেছি, আমরা নামাব না,

নামালে আপনাকে নামাতে হবে। বাধ্য হয়ে আমাকেই পতাকা নামাতে হল। কিন্তু সেই পতাকা আমি ইংরেজ সরকারের হাতে দিইনি। আমার কাছেই রেখে দিয়েছিলাম। আর একটি ঘটনা মুনসেফের আদালতে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের অপরাধে ১২/১৩ বছরের একটি কিশোরকে আমার আদালতে নিয়ে আসা হয়। পুলিশ চেয়েছিল তাকে কারাদণ্ড দিতে। বয়সের কথা বিবেচনা করে ছেলেটিকে শুধু ধমকে ছেড়ে দিয়েছিলাম। এরজন্য ইংরেজ পুলিশ সাহেব আমার উপর ভীষণ ক্ষেপে যায়! যাইহোক এরকম অনেক ঘটনা আছে।

আপনি চিরকাল টলস্টয় ও গান্ধীজীর মতাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবান। এঁদের কোন দিক আপনাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে?

অন্নদাশঙ্কর ॥ টলস্টয় একসময় "ভায়োলেন্সে" বিশ্বাসী ছিলেন, যুদ্ধও করেছিলেন। পরে সেসব ছেড়ে দেন। গান্ধীজী "নন-ভায়োলেন্সের" কথা বলতেন। গান্ধীজী, টলস্টয়ের প্রভাবে নন ভায়োলেন্সে বিশ্বাস করতেন।

পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক জাতীয় পরিস্থিতিতে এবং প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতির যুগে এই দুই মনীষীর চিন্তাধারার কোন প্রাসঙ্গিকতা আছে বলে মনে করেন?

অন্নদাশঙ্কর ॥ হ্যাঁ বর্তমান সময়ে যুদ্ধের দরকার নেই। টলস্টয় গান্ধীজীও যুদ্ধ বিরোধী ছিলেন—এটা তাঁদের প্রভাব। পরমাণু যুদ্ধ এক ভয়ঙ্কর আকার নিতে পারে। এটা কখনই হওয়া উচিত নয়। বর্তমানে প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতির যুগে গান্ধীজী ও টলস্টয়ের এখানেই প্রাসঙ্গিকতা।

কার্গিলের যুদ্ধ কি এড়ানো যেত না? পোখরানে পারমাণবিক বিস্ফোরণ কি এড়ানো যেত না? আপনার কি মত?

অন্নদাশঙ্কর ॥ আমি তথ্য জানি না কি করে বলব? ইন্দো-পাক চুক্তি হলে এ রকম হতেই থাকবে। পোখরানে পারমাণবিক বিস্ফোরণের আমি পক্ষপাতী নই। এতে অনেক কোটি কোটি খরচ হয়েছে অকারণে।

বাংলাভাগের বিষয়ে আপনার মনোবেদনা, ক্ষোভ গত ৫০ বছর ধরে আপনি আপনার গল্প, ছড়া, প্রবন্ধে প্রকাশ করে চলেছেন—দেশ ভাগের আর কোন প্রতিকার ছিল বলে মনে করেন?

অন্নদাশঙ্কর ॥ আমি বঙ্গ-ভঙ্গের বিরোধী। ওটা কংগ্রেসীরা চেয়েছিল। গান্ধীজী দেশ ভাগ চাননি।

ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সংকীর্ণ ধর্মীয় ও জাতপাত, বর্ণভিত্তিক অসহিষ্ণুতা বার বার প্রকাশ পাচ্ছে। ধর্ম নিরপেক্ষ মানুষ হিসাবে এ সম্পর্কে আপনার অভিমত জানতে ইচ্ছা করে।

অন্নদাশঙ্কর ॥ ধর্মনিরপেক্ষতাই একমাত্র শর্ত যা দেশকে ঐক্যবদ্ধ করে রাখতে পারে—তা না হলে দেশ টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। যারা সঙ্কীর্ণ ধর্মীয় জাতপাত ও সাম্প্রদায়িকতা কথা বলে, তারা ভারতীয়ত্ব চায় না, তারা হিন্দুত্ব চায়। ওরা বুঝতে পারছে না ওরা দেশের কি ক্ষতি করছে। ওরা দেশকে প্রতিদিন একটু একটু করে ভাঙছে। একদিন এভাবে দেশকে পুরোটাই ভাঙবে। আমি একেবারেই একে সমর্থন করি না। আমাদের সংবিধান আদর্শ সংবিধান। ভারতের ঐতিহ্য হিন্দু-মুসলমানের যৌথ ঐতিহ্য।

শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার অনুপ্রবেশ ঘটানোর প্রচেষ্টা সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

অন্নদাশঙ্কর ॥ শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্ম অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে আরো কঠোর হতে হবে।

আপনার রাজনৈতিক মতামত বা নির্বাচনে ভোট দেন কিনা জানি না। কিন্তু সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের বামফরন্ট সরকার আয়োজিত শিক্ষা-সংস্কৃতি চর্চ্চার অনেক স্থানে আপনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন। বামঘেঁষা সংস্থা আয়োজিত সেমিনার, আলোচনা সভাতেও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করছেন।

অন্নদাশঙ্কর ॥ নেতৃত্ব? আমি নেতৃত্ব দিচ্ছি না। আমি সহযোগিতা দিচ্ছি। পশ্চিম-বঙ্গের বাংলা একাডেমির প্রতিষ্ঠার গোড়া থেকে আমার সহযোগিতা রয়েছে।

ছোটগল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস ছাড়াও ছড়া রচনায় নিঃসন্দেহে আপনি সেরাদের অন্যতম কয়েকটি ছড়া ইতিমধ্যে প্রবাদে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ইদানীং আর ছড়া লেখা তেমন দেখতে পাই না—এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

অন্নদাশঙ্কর ॥ এখন খুব কম ছড়া লিখছি। "তেলের শিশি ভাঙল বলে খুকুর ওপর রাগ কর"—ছড়া লিখেছিলাম রাগ করে। এইমাত্র যে মেয়েটিকে দেখলেন সেই মেয়েটি তখন খুবই ছোট। আমার অভ্যাস তেল মেখে স্নান করা। মেয়েটির পায়ের ধাক্কায় শিশিটা ভেঙ্গে যায়। মেয়েটির ওপর বকাবকি চলল। এর ওপর ভিত্তি করেই ছড়াটা লিখেছিলাম। ছড়া আপনা থেকে আসে—জোর করে লেখা যায় না। আজকাল তেমন প্রেরণা পাই না।

বিশদ তথ্য না জানলেও শুনেছি আপনার কিছু গল্প, উপন্যাস বিদেশী ভাষায় অনূদিত হয়েছে—এ সম্পর্কে কিছু তথ্য দেবেন কি?

অন্নদাশঙ্কর ॥ সম্প্রতি কেম্ব্রিজ ইন্ডিয়া থেকে বেরিয়েছে "ডেঞ্জার পয়েন্ট" (আগুন নিয়ে খেলা), ছোটগল্প—এইসব।

আপনার লেখা গল্প-উপন্যাস চলচ্চিত্রায়িত হয়নি—এ বিষয়ে কখনো কোন প্রস্তাব পেয়েছিলেন কি?

অন্নদাশঙ্কর ॥ না, চলচ্চিত্র থেকে কোন প্রস্তাব পাইনি।

শিক্ষা সম্পর্কে অনেক ভেবেছেন—গত ২২ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট শিক্ষাক্ষেত্রে যে উন্নতির চেষ্টা করেছেন—সে সম্পর্কে আপনার অভিমত জানতে চাই।

অন্নদাশঙ্কর ॥ শিক্ষা আমার বিষয় নয়।

আপনি প্রায় এই শতাব্দীর সমবয়স্ক। এই দীর্ঘ জীবনে বহু রাষ্ট্রনেতা, শিল্পী, সাহিত্যিক, মনীষীদের অন্তরঙ্গ সাহচর্যে এসেছেন। বিচ্ছিন্নভাবে কিছু লেখা থাকলেও এঁদের সম্পর্কে আরো বিস্তৃতও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ স্মৃতিকথা লিখে যেতে পারলে খুব ভালো হত। এ সম্পর্কে কিছু ভেবেছেন কি?

অন্নদাশঙ্কর ॥ লিখেছি। রবীন্দ্রনাথ, জর্জ বার্নার্ড শ প্রভৃতির সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখেছি, প্রকাশ হয়েছে।

প্রাথমিক ভাষা-শিক্ষা সম্বন্ধে আপনার মতামত কি?

অন্নদাশঙ্কর ॥ যদি ভালো ব্যবস্থা করতে পারেন তবে প্রথমে বাংলা পড়িয়ে ইংরাজি শেখান। জোর করে ইংরাজি শেখানো পছন্দ করি না। আবার উলটোটাও ভুল। ১০ বছর

অবধি ইংরাজি শিখবে না এটা ঠিক নয়। আমার মতে ৮ বছর থেকে ইংরাজি শেখানো উচিত।

প্রাথমিকে শিশুদের কিভাবে শেখানো উচিত বলে আপনি মনে করেন?

অন্নদাশঙ্কর ॥ প্রথমে মুখে মুখে বেশি শেখানো উচিত। এত বইয়ের বোঝা থাকা সঠিক নয়। আগে এত বই ছিল না। শিশুদের বাঁচাতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষকরা গল্পমালার মতো মুখে মুখে শেখাবেন। আর একটা জিনিস করবেন রামায়ণ, মহাভারত থেকে উপযুক্ত গল্প বেছে বেছে শোনাবেন। রাম, অর্জুন এঁরা সবাই মানুষ—এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গল্প শোনাবেন, শেখাবেন। কোন ধর্মীয় আবেগ নিয়ে নয়। জাতির ঐতিহ্য জানার জন্য এটা দরকার।

ভোগবাদ মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটাচ্ছে—এ বিষয়ে আপনার অভিমত কি?

অন্নদাশঙ্কর ॥ অবক্ষয় যেমন ঘটাচ্ছে এটা যেমন ঠিক, উন্নতিও হচ্ছে।

মানুষ আগের থেকে বেশি আত্মকেন্দ্রিক হচ্ছে না কি?

অন্নদাশঙ্কর ॥ না, বিশ্বকেন্দ্রিক হচ্ছে।

বিশ্বায়ন, উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ—এই নীতির ফলে দেশের শিল্প বিপর্যস্ত হচ্ছে না কি?

অন্নদাশঙ্কর ॥ আমি অর্থনীতি সম্পর্কে কম জানি, তবে দেখতে হবে ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা যাতে বাঁচে।

আপনার প্রিয় লেখক কে?

অন্নদাশঙ্কর ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নতুন কিছু লিখেছেন?

অন্নদাশঙ্কর ॥ ভারতীয় সভ্যতার পুনর্জীবন নিয়ে লিখছি।

ষাট

আমার ছোট মেয়েই আমার সেই বিখ্যাত ছড়া সৃষ্টির প্রেরণা

এখনো কি নিয়মিত লেখেন?

অবশ্যই। তবে, দুপুরটা এখন ঘুমিয়ে কাটাই। আর, তোমাদের অর্থাৎ সাংবাদিকদের জন্য প্রতিদিন অনেকটা সময় দিতে হয়। সবাই সাক্ষাৎকার নিতে আসে। তার উপর আছে সাহিত্যসভার ডাক। যেতেই হয়। আমি বিভিন্ন সাহিত্য সংস্থার সভাপতি। এ সবের জন্য দিনের অনেকটাই খরচ হয়ে যায়। বাকি সময়টা লেখালিখি নিয়েই কাটে। সকালে অনেকগুলি সংবাদপত্র পড়ি রোজ।

শুনলাম একটি নামী প্রকাশন সংস্থা শীঘ্রই আপনার জীবন-কাহিনীমূলক বই প্রকাশ করবে?

ঠিকই শুনেছো। এ পর্যন্ত আমার জীবনে যা যা ঘটে গেছে সে সব কথাই থাকবে ওই

বইয়ে।

আপনার প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা কত?

তা প্রায় শতাধিক তো হবেই। এখন সব নাম মনে রাখতে পারি না।

পুরস্কৃত বইয়ের সংখ্যা?

বললাম তো, অত মনে থাকে না। তবে, আমার লেখা ভ্রমণকাহিনী 'জাপানে' প্রথম পুরস্কৃত হয়েছিল।

আপনি তো প্রথম জীবনে সাংবাদিকতায় আসতে আগ্রহী ছিলেন?

হ্যাঁ। স্কুলের পড়া শেষ করে তাই বসুমতী অফিসে গিয়েছিলাম। তখন কলকাতার অনেকগুলি কাগজেই লেখালেখি করতাম। তো, ওঁরা বললেন কলেজের পড়া শেষ করে স্নাতক হয়ে সাংবাদিকতায় আসতে। ফিরে এসেছিলাম। এরপর ভাগ্যচক্রে সাংবাদিকতায় না গিয়ে হয়ে গেলাম আইসিএস অফিসার।

আপনার প্রথম লেখা কোন্ কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল?

আমার নিজের সম্পাদনায় প্রকাশিত হাতে লেখা পত্রিকা 'প্রভা'য়। পত্রিকাটি ওড়িয়া ভাষায় লিখতাম। আমিই প্রকাশক, আমিই লেখক, আমিই সম্পাদক এবং বিজ্ঞাপন সংগ্রাহক ছিলাম। এমন মজাদার পত্রিকার কথা ভাবতে পারো?

আপনি তো ওড়িশায় মানুষ হয়েছেন?

হ্যাঁ। আমার বাবা নিমাইচরণ রায় ও মা হেমনলিনী দেবী ওড়িশার ঢেঙ্কানলে থাকতেন। আমার জন্ম ঢেঙ্কানলেই ১৯০৪ সালের ১৫ মার্চ। আমিই বাবা-মায়ের প্রথম সন্তান।

আপনার অন্যান্য ভাই-বোনেরা জীবিত?

না। দুই ভাই অভয়াশঙ্কর ও অজয়াশঙ্কর আর, দুই বোন রাজরাজেশ্বরী ও ব্রজেন্দ্রমোহিনী—সবাই প্রয়াত।

পড়াশুনা করেছেন কোথায়?

প্রথমে ঢেঙ্কানল হাইস্কুলে এবং তারপর পুরী জেলা স্কুলে পড়ি। পুরীতে পড়ার সময় বর্তমানে প্রয়াত ওড়িয়া সাহিত্যিক কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী আমার সহপাঠী ছিলেন। আর, ঢেঙ্কানলে সহপাঠী ছিলেন বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়েক। এরপর কটক রেভেনশ কলেজে পড়ি কিছুদিন। পরে বিহারের পাটনা কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করি ইংরাজিতে সাম্মানিকসহ এবং প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হই। সেটা ছিল ১৯২৫ সাল।

শুনেছি আপনারা ক'জন মিলে না কি একটা সাহিত্যগোষ্ঠী গড়েছিলেন?

কলেজে পড়ার সময়ে ১৯২১ সালে আমি, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, হরিহর মহাপাত্র প্রমুখ মিলে *'সবুজ দল'* নামে একটা সাহিত্যগোষ্ঠী গড়েছিলাম।

তারপর কি ইংরাজিতে এম.এ. পড়েছিলেন?

পাটনা কলেজেই ইংরাজি সাহিত্যে এম.এ. পড়তাম। তখন কলেজেই এম.এ. পড়ানো হত। তা আমি এম.এ. পড়তে পড়তেই মনস্থির করে ফেলি আইসিএস পরীক্ষা দেব বলে। প্রথমবার পরীক্ষা দিতে তৃতীয়, পরের বার পরীক্ষা দিয়ে প্রথম হই। ইচ্ছা ছিল সাংবাদিক হবার। আইসিএস হয়ে সে বাসনা ভুলতে হয়।

আপনার সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত কিভাবে?

আমাদের পারিবারিক গ্রন্থাগারে নানা ধরণের বহু বইপত্র ছিল। স্কুলের গ্রন্থাগারেও বহু বইপত্র ছিল। তাছাড়া আমাদের স্কুলের কমনরুমে থাকতো প্রচুর পত্র-পত্রিকা। আমাদের প্রধান শিক্ষক রাজেন্দ্রলাল দত্ত এসব দেখভালের ভার দিয়েছিলেন আমার উপর। তখন আমার বয়স মাত্র বারো বছর। প্রধান শিক্ষক ছিলেন খুবই সাহিত্যরসিক। এ সব করতে গিয়ে আমারও সাহিত্য করতে ইচ্ছে হতো। আমাদের বাড়িতে তখনকার দিনের বিখ্যাত পত্রিকা 'প্রবাসী' ও 'ভারতবর্ষ' কেনা হতো। এছাড়া বন্ধুদের বাড়িতে বই পড়ার সুযোগ পেতাম। সাহিত্যিক দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু থাকতেন ওখানেই। ওঁর বাড়িতেও অনেক বই পড়ার সুযোগ পেতাম।

আমার সেজকাকা আমাকে কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'শিশু' নামের ছোট্ট একটা পত্রিকার গ্রাহক করে দিয়েছিলেন। তখন আমি দশ-এগারো বছরের। ওই 'শিশু' পত্রিকাটি পড়তে পড়তেই আমার লেখার ইচ্ছে হতো খুব। লিখতে শুরুও করি। প্রথমদিকে ওড়িয়াতেই বেশি লিখতাম। এভাবেই লেখার জগতে আমার প্রবেশ।

প্রথম দিকে কোন্ কোন্ পত্র-পত্রিকায় লিখতেন?

কটকের 'উৎকল সাহিত্য-পত্রিকা'য় বেশি লিখতাম। ১৯২৬ সাল পর্যন্ত এই পত্রিকায় লিখেছি। এছাড়া 'প্রবাসী', 'ভারতী' প্রভৃতি বিখ্যাত পত্রিকায় ছড়া, কবিতা, প্রবন্ধ লিখতাম।

কি কি ভাষায় লিখতেন?

ওড়িয়া, বাংলা এবং ইংরাজিতে লিখতাম।

আপনার প্রথম বই প্রকাশিত হয় কবে?

সেটা ১৯২৮ সাল। আমি তখন আইসিএস হবার পরে ইংল্যান্ডে দু বছর শিক্ষানবিশী করছিলাম।

বইটির নাম কি ছিল?

ওই বইটি একটি প্রবন্ধের বই। নাম 'তারুণ্য'।

আপনার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস কোন্‌টি?

আমার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'আগুন নিয়ে খেলা'।

আপনার এ পর্যন্ত প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে সব শেষে প্রকাশিত বই কোন্‌টি?

প্রবন্ধের বই 'বিদগ্ধ মানুষ'।

আইসিএস-এর চাকরি করার ইচ্ছা না কি ছিল না আপনার?

ঠিক কথা। চাকরিতে যোগদানের সময় ঠিক করেছিলাম মাত্র বছর পাঁচেক চাকরি করব। তারপর চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বই লিখব। কিন্তু, হঠাৎই সংসার পেতে ফেলায় তা আর হয়ে ওঠেনি।

বিয়ে কি হঠাৎই হয়েছিল?

হ্যাঁ। আইসিএস পরীক্ষা দেবার পর থেকেই ১৯২৭ সালে আমার জন্য পাত্রী দেখা শুরু করেন অভিভাবকরা। ইংল্যান্ডে যখন দু বছর ছিলাম তখন বিয়ের প্রস্তাবও এসেছিল। ইংল্যান্ড থেকে ফেরার পরে আমি যখন বহমরমপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে কাজ করছিলাম তখনো বিয়ের প্রস্তাব এসেছিল। তখনই বিয়ে করব না ভেবে কোন না কোন অজুহাতে তা খারিজ করে দিচ্ছিলাম। আসলে আমার সঙ্কল্প ছিল আমি তেমন মেয়েকেই বিয়ে করব যে মেয়ে আমাকে ভালোবাসে এবং আমিও যাকে ভালোবাসি! বিয়ের ব্যাপারে জাতি, ধর্ম, দেশ ইত্যাদি

নিয়ে আমার কোনই বাছবিচার ছিল না। এভাবেই চলছিল। আমি লেখালেখি নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। ওই সময়েই লিখছিলাম 'আগুন নিয়ে খেলা' উপন্যাসটি। আর ওই একই সময়ে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিল আমার লেখা 'সত্যাসত্য'। বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলত টেনিস আর বিলিয়ার্ড খেলা। ভালোই চলছিল। কিন্তু বিয়ের ফুল ফুটে গেলে কি আর বিয়ে এড়িয়ে চলা যায়। ১৯৩০ সালের অক্টোবরে বিয়েটা হয়েই গেল।

আমরা তো জানি আপনি বিদেশিনীকে বিয়ে করেন?

আগেই বলেছি, জাতি-ধর্ম-দেশের বাছবিচার আমার ছিল না। আমি বহরমপুরে থাকার সময়েই একদিন এক আমেরিকান ভদ্রমহিলার চিঠি পেলাম। লন্ডনে ওই ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার বন্ধু ভবানী ভট্টাচার্যের আলাপ হয়েছিল। ভবানীর কাছে উনি জানতে চেয়েছিলেন ভারতে এলে উনি কার কার সঙ্গে দেখা করবেন, কোথায় কোথায় যাবেন, কি কি দেখবেন ইত্যাদি। ভবানী বলেছিল আমার কাছে এলেই ওঁর সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তাই তিনি চিঠি লিখেছেন আমাকে। আমি ওঁকে বহরমপুরে আসার জন্য লিখি। এভাবেই পত্রালাপ।

তারপর উনি বহরমপুরে এলে আমি সার্কিট হাউসে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম আমি আর আমার বন্ধু দ্বিজেন্দ্রলাল মজুমদার যে বাসায় থাকতাম সেখানেই। সেই প্রথম দেখা। চিঠির ভাষা পড়ে তাঁর বয়স যা ধারণা করেছিলাম, চাক্ষুষ দেখে তার চেয়ে কম বলেই বুঝলাম। আমরা দুজনে সাইকেল চড়ে গিয়ে মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারি প্রাসাদ দেখলাম। দিনটা ছিল ১৯৩০ সালের ৩১ আগস্ট। এবার তিনি বহমরমপুর থেকে যান কলকাতায়। তারপর স্বদেশে যাবার কথা। মাঝে বার দুয়েক চিঠি লেখালেখি।

শেষ পর্যন্ত তিনি স্বদেশে না গিয়ে কলকাতায় থেকে যান। পরে রাঁচিতে আদিবাসীদের লোকসঙ্গীত নিয়ে গবেষণা শুরু করেছিলেন। রাঁচিতে তিনি আমার বন্ধু শরৎ ও তাঁর স্ত্রী শান্তার অতিথি হয়ে থাকতেন।

সেখানেই হঠাৎ এই বিদেশিনী এলিস ভার্জিনিয়া অর্নডর্ফের সঙ্গে প্রেম এবং বিয়ে। ১৯৩০ সালের ৬ অক্টোবর হয়েছিল গন্ধর্বমতে বিয়ে এবং ওই মাসেরই ২৩ অক্টোবর রেজিস্ট্রি করে বিয়ে।

বিয়ের পরই আমি ওর নতুন নাম দিই লীলা। ওই সময়ে আমি 'লীলাময়' ছদ্মনামে লিখতাম। ওকে বলি, 'আমাদের ছেলেমেয়েদের কিন্তু অ্যাংলো ইন্ডিয়ান করব না। ওরা হবে বাঙালি। আর তোমাকেও বাংলা শিখতে হবে। আমি সাহিত্য নিয়ে থাকব। তুমি সাহায্য করবে, আমার সব প্রস্তাবই ও মেনে নেয়।

আপনাদের কয় সন্তান?

জীবিত দুই ছেলে। বড় পুণ্যশ্লোক রায়। ও জার্মানী এবং শিকাগোতে অধ্যাপনা করেছে। কলকাতায় ফিরে কাজ পায়নি। ওর বয়স এখন ৬৫ বছর। আর ছোট ছেলে আনন্দরূপ রায় আমেরিকায় বিশ্ব ব্যাঙ্কের কর্মী। মেজ ছেলে ১৯৩৯ সালে ঢেঙ্কানলে ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রি রোগে মারা যায়। দুই মেয়ে আছে। বড়মেয়ে জয়া রায় কটকের কলেজে রিডার ছিল। এখন অবসর নিয়েছে। ছোট তৃপ্তি রায় মুম্বাইয়ের একটি স্কুলের অধ্যক্ষা।

ওঁরা কি বিবাহিতা?

হ্যাঁ। ওদের শ্বশুরবাড়ির পদবীও রায়।

আপনার 'তেলের শিশি ভাঙলো বলে খুকুর পরে রাগ করো...' গানটির কথাগুলি তো আপনার ছোট মেয়েকে নিয়েই লেখা?

ঠিকই বলেছো। তৃপ্তির বয়স তখন সবে দেড় বছর। ওই সময়ে একদিন তেল মাখার জন্য আমি তেলের শিশিটা উঁচুতে এক জায়গায় রেখেছি সবে। এমন সময় কোথা থেকে ও এসে উঁচুতে হাত বাড়িয়ে সেই শিশিটা পাড়তে গেলে পড়ে ভেঙে যায়। আমার ভীষণ রাগ হয়েছিল। কিন্তু দেড় বছরের শিশুকে কি বকাঝকা-মারধোর করা যায় এরজন্য? তাই রাগ মনেই চেপে রেখে তখনই ছড়াটা লিখে ফেললাম, আর, মনটাও হাল্কা হয়ে গেল তাতে। তখন কি আর জানতাম সেই সামান্য ছড়াটা গান হয়ে এত জনপ্রিয় হবে কোনদিন? আমার ছোট মেয়েই আমার সেই বিখ্যাত ছড়া সৃষ্টির প্রেরণা।

আপনার ছড়া তো খুবই সুন্দর। আপনি তো দীর্ঘদিন 'মৌচাক' পত্রিকায় ছড়া লিখতেন, তাই না?

তা তো লিখতামই। তাছাড়া 'প্রবাসী' ও 'ভারতী'তেও বহু ছড়া লিখেছি।

আমরা জানি আপনার সাহিত্যিক জীবনের নেপথ্যে লীলাদেবীর যথেষ্ট অবদান আছে। এ কথা কি ঠিক?

অস্বীকার করব কি করে। সে না হলে এতদিক সামলাতাম কিভাবে। বাংলা সাহিত্যের প্রতি তার নিষ্ঠা ছিল যথেষ্টই। আমার ইচ্ছামতো আমাদের সন্তানদের সে পুরোপুরি বাঙালি করে গড়ে তুলেছিল।

পুণ্যশ্লোক এবং জয়া তো শান্তিনিকেতনে পড়াশুনো করেছেন?

হ্যাঁ। গুরুদেব আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন। আমাকে চাকরি ছেড়ে দিয়ে শান্তিনিকেতনে চলে আসার জন্য প্রায়ই বলতেন।

আপনি তো চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত?

হ্যাঁ। আমি চাকরির ২১ বছরে পুরো পেনশন পেয়ে চলে আসি। চাকরির শেষ দিকে কলকাতায় ১৯৪৯ থেকে ১৯৫১ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত তিন বছর ছিলাম। লেখার তাগিদেই এই ইস্তফা।

চাকরি ছাড়ার পর তো আপনি ও লীলাদেবী শান্তিনিকেতনে চলে যান, তাই না?

হ্যাঁ। গুরুদেবের সঙ্গে আমার মধুর সম্পর্ক ছিল। আমাদের 'হঠাৎ বিয়ে'র পরে আমি লীলাকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলাম গুরুদেবকে প্রণাম করতে। গুরুদেব তাকে আশীর্বাদ করেছিলেন। গুরুদেবের ইচ্ছা ছিল আমি বিশ্বভারতীতে যোগ দিই। তা যখন হয়ে উঠল না, তখন অবসর নেবার পর শান্তিনিকেতনে আশ্রমের বাইরে আমরা বাসা নিয়ে থাকতাম।